সুবোধ ঘোষ
রচনা সমগ্র

সুবোধ ঘোষ
রচনা সমগ্র

সম্পাদনা

উত্তম ঘোষ

সমীরকুমার নাথ

নাথ পাবলিশিং

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ☐ কলকাতা-৭০০ ০০৯

SUBODH GHOSH
RACHANA SAMAGRA
PART VIII

Published by
Samir Kumar Nath
Nath Publishing
73 Mahatma Gandhi Road
Kolkata 700 009

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৯৯

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
চারু খান

অক্ষর বিন্যাস
পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

ভূমিকা

সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র আরো আগে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। সুবোধবাবু ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে আমাদের ছেড়ে হঠাৎ চলে গেলেন। যাবার আগের দিনও আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি তাঁর শেষ সম্পাদকীয় লেখা লিখে রেখে গেলেন : 'ওমর খৈয়াম স্মরণে'।

সুবোধবাবু সম্পর্কে আমি আমার বই 'সম্পাদকের বৈঠকে'—বেশ অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার কথা লিখেছি, যা শুধু লেখক সুবোধ ঘোষকে নয়, ব্যক্তি সুবোধবাবুকেও হয়তো অনেকটা তুলে ধরতে পারে। তাঁর মৃত্যুর পর আমি আনন্দবাজারে লিখেছিলাম ঃ 'একসঙ্গে যোগ দিই, সেই যোগ।'।

এ রচনাবলীতে প্রথম খণ্ডে সুবোধবাবুর 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসটি স্থান পেয়েছে। এটা কেন জানি না বহুদিন অমুদ্রিত অবস্থায় ছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে—এর কভার এঁকেছিলেন, প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়। সুবোধবাবু যে সময় 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এই উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন তখনই পাঠকেরা বুঝে গিয়েছিল, শুধু 'ফসিল' বা 'অযান্ত্রিকে'র মতো অসাধারণ ছোট গল্প নয়, একটি নতুন স্বাদের উপন্যাস রচয়িতা এক বলিষ্ঠ লেখকের আবির্ভাব ঘটলো। সেই সময়কার রাজনৈতিক ডামাডোলের চিত্র—যা তিনি এই উপন্যাসে প্রকাশ করেছিলেন—তা পরবর্তীকালের পুস্তকাকারে বের হবার সময় একটা সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকাশককে কেউ কেউ ভয় দেখিয়েছিলেন—এই বই প্রকাশ করলে তাকে জেলে যেতে হবে।

সুবোধবাবু তখন অসুস্থ, হাসপাতালে। তিনি প্রকাশককে আমার কাছে পাঠালেন। আমি বললাম—আপনি অনায়াসে প্রকাশক হিসেবে আমার নাম দিতে পারেন। আমি জেলখাটা লোক, জেলে যেতে আপত্তি নেই।

তাই হয়েছিল। প্রথম সংস্করণে প্রকাশক হিসেবে আমার নামই ছেপে বের হয়েছিল। অবশ্য আমাকে শেষ পর্যন্ত তার জন্য জেল খাটতে হয়নি।

১৯৪০ সালের পয়লা জানুয়ারী আমি আর সুবোধবাবু একই সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিই।...তার আগে তিনি গৌরাঙ্গ প্রেসে প্রুফরিডারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, আর আমি ছিলাম যুগান্তর পত্রিকার একজন জুনিয়র সাব এডিটর। আনন্দবাজার রবিবাসরীয় বিভাগে মন্মথনাথ সান্যালের তিনি ছিলেন সহকারী আর আমাকে যোগ দিতে হল দেশ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে। সেই সময় বর্মন স্ট্রীটের পূর্ব দিকে দোতলায় একটি ঘরেই ছিল দেশ ও আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় দফতর।

আমরা একই ঘরে বসে এই দুই পত্রিকার সাহিত্য সম্পর্কিত কাজে নিযুক্ত ছিলাম। সুবোধবাবুকে সে সময় যেভাবে দেখেছিলাম, সেই স্মৃতি আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিরিশের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু দেখে মনে হয় এখনও যেন যৌবনে পা দেননি। অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন তিনি, যাকে বলা যায় রোমান্টিক পুরুষ। কথা তিনি খুবই কম বলতেন। সব সময় দেখতাম, ডাকে আসা পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে মগ্ন হয়ে আছেন। কখনও বিভাগীয় সম্পাদকের নির্দেশে তিনি সেই পাণ্ডুলিপি সংশোধনে নিমগ্ন থাকতেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হত, এ মানুষটি বোধহয় খুবই অভিমানী ও গম্ভীর। কিন্তু দিনের পর দিন একঘরে বসে কাজ করতে যখন মধুরভাষী মানুষটির হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়ার সুযোগ ঘটল, তখন দেখলাম যে, মানুষটি আসলে নীরব, নিরহঙ্কার, মধুরভাষী। যাকে বলা যায় অত্যন্ত বন্ধুবৎসল এক আড্ডাবাজ মানুষ। আমাদের চাকরী জীবন শুরু একই সঙ্গে। মারকাস স্কোয়ারের সংলগ্ন মারকাস বোর্ডিং-এ

একই সঙ্গে পাশাপাশি দুটি ঘরে আমাদের প্রাকবিবাহ যুগের বেশ কয়েকটি বছর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সন্নিবেশে কেটেছে। সেই সময় সুবোধবাবুকে নানা দিক দিয়ে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে জানবার নানা সুযোগ আমার ঘটেছিল।

ওঁর চরিত্রের একটি গুণ যা আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করেছে, তা হলো বাঙালী হয়েও 'বাঙালীয়ানা'র কোন ছাপ তাঁর মধ্যে সচরাচর দেখা যেত না। তার একটা কারণ তিনি বাংলাদেশের বাইরে মানুষ হয়েছিলেন। হাজারিবাগ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃঢ়তার প্রভাব তাঁর চরিত্রেও ছিল।...

সুবোধবাবু বাংলা সাহিত্যকে যে একটি উজ্জ্বলরত্ন দিয়েছেন, সেই 'ভারত প্রেমকথা' দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর 'শতকিয়া।' অন্য স্বাদের উপন্যাস তাছাড়া ওঁর বহু গল্প—যা এই রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে—তার মধ্যে অনেকগুলোই দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছে। তাঁর অন্যত্র প্রকাশিত রচনাগুলিও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকালীন মর্যাদা পাবে।

সুবোধবাবুর একটি গল্প সংকলন 'গল্প মণিঘর' শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল ও আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন। লিখেছিলেন ঃ 'ভ্রাতৃপ্রতিম দুই বন্ধু—করকমলেষু...।'

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমরা একই প্রতিষ্ঠানে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে এসেছি। আমাদের দুজনের সম্পর্ক ছিল অটুট বন্ধুত্বের, প্রগাঢ় সহমর্মিতার। আমাদের দুজনের ভাগ্য ছিল এক সুতোতেই গাঁথা। তাঁর মৃত্যুতে সেই সুতো ছিঁড়ে গেল। গেল কি? সত্যি?

সম্পাদকের কথা

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শংকর লিখেছেন ঃ

'পঞ্চাশ দশকে যখন আমার সাহিত্য ক্ষেত্রে কুণ্ঠিত প্রবেশ তখন সুবোধ ঘোষ খ্যাতির মধ্যগগনে। চল্লিশ দশকের যে বিস্ময় সৃষ্টির মধ্যে সাহিত্য গগনে তার উদয় তার রেশ কিছুটা কেটেছে, কিন্তু বিপুল পাঠক সমাজের কৌতূহলের অভাব নেই। সকলের মুখে তখন এক প্রশ্ন, তিনি আরও বেশি লেখেন না কেন? সুবোধ ঘোষ তার উত্তর দিতেন না, কিন্তু সাহিত্য কর্মের সঙ্গে যাঁরা কিছুটা যুক্ত তাঁরা সহজেই বুঝতে পারতেন, সুবোধ ঘোষ যে ধরণের গল্প লেখেন, তা বেশি লেখা যায় না, প্রতিটা গল্পের পিছনে থাকে গভীর চিন্তার অদৃশ্য ভিত্তিভূমি।'

সুবোধ ঘোষের রচনা সমগ্র সম্পাদনার সময় আমরা এটা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। সত্যি, বেশি লেখেন নি তিনি, তিরিশ বত্রিশটি উপন্যাস, তার মধ্যে আয়তনে বৃহৎ মাত্র তিন-চারটি (ত্রিযামা, শতকিয়া ও জিয়াভরলি), আর বাকীগুলি মাঝারি, কতগুলি তো ছোট উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে—যেমন সুজাতা, বর্ণালী, মুক্তিপ্রিয়া, কান্তিধারা, ছায়াবৃতা প্রভৃতি।

গল্পের সংখ্যাকে চার ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) সেই অযান্ত্রিক, ফসিল থেকে শুরু করে সিরিয়াস আলোড়নকারী গল্প থেকে জীবন বিচিত্রার বহু দিক, ব্যক্তি ও মানসিকতা নিয়ে কাহিনীর মধ্য দিয়ে হাল্কা মিষ্টি প্রেমের গল্প যার সংখ্যা প্রায় ১৬০।

(খ) ভারত প্রেমকথা—২০

(গ) কিংবদন্তীর দেশে—৩১

(ঘ) পুতুলের চিঠি—৮

(ঙ) ক্যাকটাস (জীবজগৎ পশু-পাখি-অরণ্য)—১৪

তাই যার মাত্র তিরিশটি উপন্যাস ও আড়াইশোর কম গল্প (পেশাগত সাহিত্যিক জীবন মধ্য চল্লিশ দশক থেকে সত্তর দশকে শেষ, অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ বছর। তাও একটানা নয়—হঠাৎ হঠাৎ কলম থেমে গেছে—বিশেষ করে জীবনের শেষ অধ্যায়ে) তিনি অবশ্যই পরিমাণের দিক দিয়ে বেশি লেখেননি (তাঁকে ঠিক Prolific writer বলা যায় না সেই অর্থে)—যার জন্য গণিতের দিক থেকে বিচার করে তাঁর সমগ্র রচনা বর্তমান বিজ্ঞানের মুদ্রণ যন্ত্রে ৬০০০ পাতার মধ্যে হয়তো সীমাবদ্ধ করা সম্ভব। এবং এর মধ্যে অবশ্যই তাঁর বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ, রম্যরচনা এবং একটি গীতিনাট্যকেও ধরা হয়েছে।

তাই আমরা হয়তো দশটি খণ্ডের মধ্যে তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক ফসলকে গোলায় ভরে ফেলতে পারব, যা অন্যান্য সাহিত্যিকের তুলনায় অনেক কম—পূর্বসূরী তারাশংকর, বিভূতিভূষণ—সমসাময়িক বিমল মিত্র বা উত্তরসূরী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—যাই হোক না কেন। শংকর সুবোধ ঘোষকে মহৎ স্রষ্টাদের পূর্ণকুম্ভ মেলায় 'নিজস্ব মহিমা' নিয়ে বিরাজ করার কথা বলেছেন। তাঁর জীবনসংগ্রামও বড় বিস্ময় জাগানো জীবন কথা, কিছু লিখিত, কিছু লোকমুখে শোনা যায়। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও নানা বিষয়ে গবেষণামূলক রচনা লিখেছেন তিনি, তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। প্রধানত ছোটগল্প লেখক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও তাঁর কলম দিয়েই বেরিয়েছে

বিভিন্ন বই যার বিষয় মনস্তত্ত্ব (ফ্রয়েড), কারুশিল্প (শিল্পভাবনা/রঙ্গবল্লী), আদিবাসী সমাজ, সামরিক বিজ্ঞান, গান্ধীজীবনী, নৃতত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞানের কথা। বিচিত্রপথে যাওয়া তাঁর রচনার এই 'সর্বত্রগামী' দিকটা বহুলাংশে অজানা বলে আমাদের মনে হয়েছে। তাই বোধ হয় চিন্তামণি কর মন্তব্য করেছেন : 'গল্প উপন্যাস পুরাকাহিনী প্রভৃতি লেখার জন্য এই লেখকের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সুবিদিত থাকলেও নাট্য, সংগীত, পুরাতত্ত্ব, রূপকথা সম্বন্ধে তাঁর আন্তরিক ও গভীর পরিজ্ঞানসম্ভূত প্রবন্ধগুলি বহুজনের প্রায় অজানা ছিল।'

অষ্টম খণ্ডে দুটি উপন্যাস স্থান পেয়েছে—বসন্ত তিলক ও বর্ণালী। বলে রাখা ভাল, নানা কারণে আমরা প্রথাগত সন-তারিখ বা কালক্রম অনুযায়ী খণ্ডগুলোকে সাজাইনি। আমাদের উদ্দেশ্য, প্রতিটি খণ্ড যেন একেকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বহুবিচিত্রা হয়ে ওঠে। তাই অষ্টম খণ্ডে আছে দুটি উপন্যাস, আঠারোটি সামাজিক গল্প এবং 'ভারত প্রেমকথা' থেকে দুটি এবং 'কিংবদন্তীর দেশ' থেকে একটি গল্প ও 'ক্যাকটাস' থেকে পাঁচটি গল্প।

অল্পকথায়, এই রচনা সমগ্র সম্পাদনায় আমরা চেয়েছি প্রতিটি খণ্ডে সুবোধ-প্রতিভার 'কামিনী-কাঞ্চন যোগ হোক (বলা বাহুল্য—বিশেষণটি এখানে রচনাগুলোর বৈশিষ্ট্যের ঐশ্বর্যের কথা ভেবে বলা হয়েছে)। কালপঞ্জি বা অ্যাকাডেমিক পাঠক্রম হিসাবে সাজালে পরিবেশন রসলাভের দিক থেকে ততটা সার্থক হতো না বলে আমাদের মনে হয়েছে। পাঠকরা এটাই বিচার করবেন।

সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যায়নটা আমাদের কাছে সম্পাদনার মানদণ্ড স্থির করতে সাহায্য করেছে : তিনি (সুবোধ ঘোষ) সাহিত্য করেছেন। শতকরা একশোভাগ সাহিত্য।... আছে সচেতন বিদ্রোহ, সেই কারণে তিনি এক ভিন্ন নামের নদী। স্রোত কম, অবগাহনে তৃপ্তি।... সব্যসাচী অজাতশত্রু।'

মহাশ্বেতা দেবী বলেন, 'যে লেখক পরুষ, রুক্ষ ঋজুতা থেকে সহজ সাবলীল মিষ্টিলেখা—তা থেকে সংস্কৃত কাব্যের মতো অলংকার ঝংকৃত বাংলায় এমন অনায়াসে যাতায়াত করতে পারেন, তিনিই সুবোধ ঘোষ।' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন—'ছাত্র বয়সে 'দেশ' পত্রিকা পেলেই দুজনের গল্প আগে পড়ে ফেলতাম—পরশুরাম ও সুবোধ ঘোষ। বাংলার ছোট গল্পের সেই স্বর্ণযুগে কারুর সঙ্গে কারুর তুলনা চলে না। তবু এক একজন লেখক সম্পর্কে কিছু কিছু পাঠকের পক্ষপাতিত্ব থাকেই। আমার পক্ষপাতিত্ব ছিল সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে—যাকে ব্যক্তিজীবনে তাঁর দূর থেকে দেখা।'

সন্তোষকুমার ঘোষ একটি রচনার শীর্ষনাম দিয়েছিলেন—'যে বনস্পতির নাম সুবোধ ঘোষ।'

সমরেশ মজুমদার প্রশ্ন করেছেন নিজেকেই—'এখনও নিজের লেখার পাশে ওঁর লেখা রেখে দেখতে গেলেই লজ্জা পাই...ইনি অবশ্যই আমার পূর্বসূরী, কিন্তু আমি, আমরা কতটা উত্তরসূরী?'

আশাপূর্ণা দেবী মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন : তিনি এলেন, দিলেন, জয় করলেন, এই 'দিলেন' শব্দটা লেখিকার তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন—শেক্সপীয়ারের নাটকের বিখ্যাত উক্তি 'vidi'-র (দেখলাম-এর) পরিবর্তে।

সম্পাদনা করতে করতে সম্পাদক হিসেবেই কিছু স্বাভাবিক প্রশ্ন মনে জাগে। বোধ হয় এই ধরনের প্রশ্ন পাঠকদের হয়েই আমরা উপস্থাপনা করতে পারি। সবচেয়ে ভাল, একটি জিজ্ঞাসা

আমাদের ভাষায় না বলে, এক প্রসিদ্ধ প্রকাশনা সংস্থার জ্যাকেটে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতির উল্লেখ করলেই পরিষ্কার হতে পারে। তাঁরা লিখেছেন ঃ

প্রথম গল্প অযান্ত্রিক। বন্ধুদের অনুরোধে লেখা, এরপর ফসিল। বাংলা সাহিত্যে বিস্ফোরণ জাগিয়ে আবির্ভাব। বহু গল্প-উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত। আনন্দ পুরস্কার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক। এছাড়া অন্য পুরস্কার পাননি। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবের মতোই বিস্ময়কর এই ঘটনা।...

সম্পাদনার কাজ করতে করতে যখন মহাশ্বেতা দেবীর কথা স্মরণ বিশেষ ভাবে করছি (আবার হব মুগ্ধ), তখন এই 'বিস্ময়কর ঘটনাটা' পাঠকের দৃষ্টিতে একটা বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন থেকে গেছে বলে মনে হয়েছে। রচনা সমগ্রের 'সম্পাদকের কথা'য় তাই তার উল্লেখ বা পুনঃ-উল্লেখ। উত্তরের জন্য নয়, আক্ষেপ হিসেবে নয়,—শুধু সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রশ্নটিকে স্থায়ী স্থানদানের জন্য, পরবর্তী প্রজন্মকে এই বিষয়ে সতর্ক করার দায় অনুভব করেছি আমরা।

তাই বোধ হয় শংকরের দুঃসাহসী মন্তব্য ঃ 'অনেকের কীর্তন গাইবার দল থাকে, সুবোধ ঘোষের (সেসব) কিছু নেই।'

উত্তম ঘোষ
সমীরকুমার নাথ

সুচীপত্র

উপন্যাস

বসন্ত তিলক ১৫
বর্ণালী ১৩৯

গল্প

সুনিশ্চিতা ২২১
শ্মশানচাঁপা ২৩৪
কাঞ্চনসংসর্গাৎ ২৪৭
থিরবিজুরি ২৫৮
চিত্তচকোর ২৭১
মানশুল্কা ২৮১
জয়ন্তী ২৯২
কালাগুরু ৩০৬
পারমিতা ৩১২
দেবতারে প্রিয় করি ৩২২
শুক্লাভিসার ৩২৬
স্বর্গ হতে বিদায় ৩৩৪
সাধ না মিটিল ৩৪৬
কোন মিল নেই, তবু মিল ৩৫১
মাটির দীক্ষা ৩৫৮
সমীক্ষা দক্ষিণ পলাশপুর ৩৬২
ধূলিস্নান ৩৭৫
নিকষিত হেম ৩৮১

ভারত প্রেমকথা

পরীক্ষিত ও সুশোভনা	৩৯৩
সুমুখ ও গুণকেশী	৪০৬

কিংবদন্তীর দেশে

সনকা ও মেনকা	৪১৫

ক্যাকটাস

চেতনপুরের বিশপ হ্যাটো	৪২১
শ্রীমতি নিনা ভরদ্বাজ ও হরিণী	৪২৯
তিন পাহাড়ীর বুড়ো বট	৪৪০
একজন দ্বিতীয় জনমেনজয়	৪৪৬
হরেন বাবুর হরিণী মেয়ে	৪৫৪

উপন্যাস

বসন্ততিলক

ভোর হয়েছে। হঠাৎ একটা ঝড় এল আর চলে গেল। এই তো ব্যাপার। এর মধ্যে একেবারে আশ্চর্য হয়ে যাবার মত কী আছে?

কিন্তু চন্দ্রবাবু সত্যিই আশ্চর্য হয়েছেন। এই ভোরের ঝড়ের বাতাসটা যে এদিকের আর ওদিকের সারি সারি যত ঘুমন্ত বাড়ির বন্ধ কপাটের কড়া নেড়ে দিয়ে চলে গেল। তবু কি কেউ জাগলো?

কে জানে এই ছোট শহরের কোনও বাড়ির কোনও ঘরে কোনও মানুষ সত্যিই জেগেছে কিনা। কিন্তু চন্দ্রবাবু জেগেছেন, ছটফট করেছেন, মোষের শিঙের লাঠিটাকে ব্যস্তভাবে খুঁজেছেন। চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে পাশের ঘরের ঘুমন্ত চাকরটারও ঘুম ভাঙিয়েছেন।—মধু ওরে মধু! এখন জাগ তো বাবা!

মাসটা আশ্বিন। ভোরবেলার বাতাসে এমনিতেই একটু শীত-শীত ভাবের কাঁপুনি থাকে। তার উপর এই হঠাৎ-আসা ঝড়টা কিছু গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি ছড়িয়ে গাছপালা ভিজিয়ে দিয়ে গিয়েছে। কাজেই বুঝে নিতে হয়, বাইরে বাতাসের ঠাণ্ডাটা নিশ্চয় এতক্ষণে বেশ কনকনে হয়ে উঠেছে।

খসখসে ধারিওয়াল কম্বল কেটে তৈরি-করা একটি ঢিলে-ঢালা প্রকাণ্ড ওভারকোট আছে চন্দ্রবাবুর। ব্যস্তভাবে ওভারকোট গায়ে চাপালেন। কিন্তু লাল ইমলির মোটা পশমের একটি গলাবন্ধ, আর এক জোড়া ভুটিয়া মোজাও যে আছে। না, আর দেরি করতে পারলেন না চন্দ্রবাবু। গলায় গলাবন্ধ জড়ানো হল না, পায়ে মোজাও পরা হল না। মোষের শিঙের লাঠিটা হাতে নিয়ে আর কাঁঠাল কাঠের খড়ম-জোড়া পায়ে দিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

মেঘলা ভোরের আকাশে কোনও আলো-জাগানি আভা ঝিমঝিম করে না। কিন্তু চন্দ্রবাবুর দুই চোখে যেন একটা বিস্ময় চিকচিক করে জ্বলছে। সত্তর বছর বয়সের মানুষটি, মাথায় প্রকাণ্ড টাকের তিনদিক ঘিরে লম্বা-লম্বা সাদা চুল এলেমেলো হয়ে ঝুলছে। ভুরু দুটিও একেবারে সাদা। ভুরুর কাছেই দুটি ছায়াময় কালো চোখে শিশুর চোখের কৌতুহল টলমল করছে। তাঁর ছিপছিপে শুকনো শরীরটা এই বয়সেও যেন ছেলেমানুষের মত তড়বড় করে হাঁটতে চায়।

এপাড়া আর ওপাড়ার যত বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল চন্দ্রবাবুর কাছে অনেক মজার গল্প শুনেছে। তার মধ্যে বিশেষ মজার গল্পটি হল তাঁর নিজেরই জীবনের একটি সাংঘাতিক শখের গল্প। —আমি যখন কলকাতায় ছিলাম, তখন বছরের মধ্যে অন্তত তিনশো দিন থিয়েটার দেখতাম। থিয়েটার না পেলে যাত্রা, যাত্রা না পেলে কবিগান তরজা কিংবা হাফ-আখড়াই।

—কিছুই না পেলে?

—সেটি কখনও হয়নি। কিছু না কিছু পেয়েই গেছি। ধাঙড়দের ঝুমুরও দেখতে ছাড়িনি।

চন্দ্রবাবুর চোখ দুটো কি সেই দেখার অভ্যাস আর দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবার অভ্যাস আজও ছাড়তে পারেনি? আজকের ভোরের এই ঝড়টাও কি তবে একটা থিয়েটার নাটুকে কাণ্ড?

হতে পারে; চন্দ্রবাবু হয়ত তাই মনে করেন। কিন্তু এই ছোট শহরের অনেকেই আবার একথাও জানেন যে, ভাল ঘুম হয় না চন্দ্রবাবুর; কোনও কাজকর্ম কিংবা কোনও চিন্তার বালাই নেই। তাই কী আর করবেন? ভোর হতে না হতেই বের হয়ে পড়েন আর দোরে দোরে হাঁক দিয়ে লোকের ঘুম ভাঙিয়ে বেড়ান। ভোরে ঝড়-টড় দেখে আশ্চর্য হওয়া মানে হাঁক ডাক করবার একটা ছুতো তৈরি করে নেওয়া। যা দেখবেন আর যা শুনবেন, তাতেই আশ্চর্য হওয়া চন্দ্রবাবুর মন-প্রাণের একটা অভ্যেস হয়ে উঠেছে।

চন্দ্রবাবুর বিস্ময়ের প্রশ্নটি হল—ঝড় এল কেন? কিন্তু আজ ভোরে যদি কোনও ঝড় দেখা না দিত, তা হলেই বা কী হত! তা হলে শেষ রাতের ট্রেনের শব্দ শুনেই বের হয়ে পড়তেন চন্দ্রবাবু; আর দোরে দোরে হাঁক দিয়ে লোকের ঘুম ভাঙাতেন—ওহে জয়ন্তবাবু জেগেছ নাকি? নাইন আপ আজ এত লেট হল কেন?

চন্দ্রবাবু হলেন এই ছোট শহরের একজন পুরনো বাসিন্দা। চন্দ্রবাবু যখন এখানে এসেছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ কি চৌত্রিশ? এখানে তাঁর চেয়ে পুরনো যাঁরা ছিলেন, তাঁদের একজনও এখন আর নেই।

এপাড়া আর ওপাড়ার বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা চন্দ্রবাবুর জীবনের আরও কিছু খবর রাখে। এখানে এসে দাদু হবার আগে তিনি কোথায় ছিলেন আর কী ছিলেন? ওদের কাছে মজার গল্প বলতে গিয়ে চন্দ্রবাবু কয়েকবার সেসব কথাও বলে ফেলেছেন। এই গল্পও যেন চমৎকার এক বিস্ময়ের থিয়েটার দেখার গল্প। যেন অনেক-অনেক দিন আগের এক ভোরবেলার ঘুমের একটা স্বপ্নের গল্প।—আমি তখন ঠিক এই চিনুরানীর মেজদার মত...।

চিনু বলে—ধেৎ; মিথ্যে কথা।

চন্দ্রবাবু—বিশ্বাস কর। তখন ঠিক তোর মেজদার মত আমারও মাথায় আলবার্ট-করা চুলের তেড়ি...।

চিনু—ধেৎ।

চন্দ্রবাবু—আমি তখন হাজারিবাগে একটি বাসা নিয়ে থাকতাম।

ঠিকই, একদিন হাজারিবাগের এক জমিদারের কাছারিতে সাতাশ টাকা মাইনের ইংলিশবাবু ছিলেন চন্দ্রবাবু; তার মানে ইংরাজি ভাষায় চিঠি আর দরখাস্ত লেখবার কাজ করতেন। স্ত্রী ছিল। দুটি মেয়ে ছিল—সীতু আর মিতু। আর ছিল একটি ছেলে, তিন ভাই-বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটি। মিতুর অভ্যেস, বাপের বুকের উপর পা দুটো তুলে দিয়ে ঘুমোবে। ইয়া মোটা গোলগাল একটা খরগোসের মত তুলতুলে, ওই অতটুকু বয়সের মেয়েটার নাক ডাকত কত জোরে—গুর গুর গুর গুর। ভুসভুস ভুসভুস...।

চিনুরা আর সন্তুরা হেসে লুটিয়ে পড়ে। চন্দ্রবাবু বলেন—হ্যাঁ রে, সত্যিই, বিশ্বেস কর। সীতুর অভ্যেসটা আরও মজার। আমি খেতে বসলেই কোথা থেকে ছুটে এসে হুট করে আমার কোলে বসে পড়বে।

সন্তু—কেন?

চন্দ্রবাবু—কুমড়োর ডাঁটা চিবোবে। আলু না, বড়ি না, বেগুনভাজা না; শুধু কুমড়োর ডাঁটা। ছোট্ট ছোট্ট দাঁত, কিন্তু কী ধার! সীতু শুধু চুপ করে ডাঁটা চিবোতে থাকে—কুচুর কুচুর কুচুর কুচুর।

নিউমোনিয়া হয়েছিল সীতুর, তাই একদিন খুব ভোরে, জ্বলজ্বলে শুকতারাটা যখন নিবুনিবু হয়ে এল, ঠিক তখন সীতু মরে গেল। মিতুটা ঠিক পরের বছরের বিজয়া দশমীতে, ঠিক মাঝরাতে, ঘুমের মধ্যেই ছটফট করে চন্দ্রনাথের বুকের উপর থেকে পা নামিয়ে নিল আর মরে গেল। অনেক দিন আমাশাতে ভুগে মিতুটা একেবারে এইটুকু একটা...

—কী? প্রশ্ন করে সন্তু।

—একেবারে এইটুকু একটা শুকনো চামচিকে হয়ে গিয়েছিল।

চিনুর চোখ দুটো ছলছল করে।—তারপর কী হল?

চন্দ্রবাবু কিন্তু চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন।—তারপর একদিন ড্রপসিন পড়ে গেল রে দিদি।

একদিন সন্ধ্যায় কাছারি থেকে ঘরে ফিরে এসেই চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ—শুনছ, আমার সাত টাকা মাইনে বেড়েছে।

এক মাস ধরে রোজ আজও তেমনি, সন্ধ্যাবেলাতেই বিছানার উপর শুয়ে আছেন সীতুর মা। বুকের ভিতরে কিরকম একটা ব্যথা দেখা দিয়েছে। কবিরাজের শিমুল ছালের গুঁড়ো ছেড়ে দিয়ে এল এম এস আশু ডাক্তারের দামি ওষুধ খাওয়ানো হল, তবু ব্যথাটা সারছে না। কিন্তু চন্দ্রনাথের এমন চেঁচিয়ে বলা কথার উত্তরে একটা কথা তো এখন বলতে পারেন সীতুর মা; বললেই তো হয়, ব্যথাটা বেড়েছে।

না, আর কথা বলেননি সীতুর মা; বিছানার কাছে এগিয়ে যেতেই বুঝেছিলেন চন্দ্রনাথ, সীতুর মা আর কোনও দিনই কথা বলবেন না।

চিনু বলে—চল সন্তু।

সন্তু বলে—ছোট ছেলেটার নামটা বললে না, দাদু?

চন্দ্রবাবু একেবারে বিনীত অপরাধীর মত কাঁচুমাচু হয়ে হাসতে থাকেন—ভুলে গেছি। বিশ্বাস কর দাদা; সত্যি ভুলে গেছি। শুধু মনে আছে; ওটার দাঁত ছিল না।

ছোট ছেলেটিকে সীতারামপুরে তার মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ। সে ছেলে মামার বাড়িতে বড় হয়েছে। শুনেছেন চন্দ্রবাবু, সে ছেলে কলকাতায় চাকরি করছে। বিয়েও করেছে। এর বেশি আর কিছুই জানেন না চন্দ্রবাবু। জানতে চেষ্টা করেননি, জানবার ইচ্ছাও হয়নি। সে ছেলেও এমন বাপের কোনও খোঁজ নেয়নি।

সেই যে জমিদারের কাছারির চাকরি ছেড়ে দিলেন চন্দ্রবাবু, তারপর থেকে তিনি এখানে। তিন শো এগারো টাকা খরচ করে তৈরি করা এই ছোট্ট বাড়িটি আছে আর চাকর। আর আছে রাস্তার তেমাথায় তিনটি দোকানঘর, তৈরি করতে তিনশো টাকা খরচ পড়েছিল। দোকান ঘরের ভাড়া মাসে মাসে পাওয়া যায়। চন্দ্রবাবুর দিন চলে যায়। নিজের হাতেই দু'মুঠো চাল ফুটিয়ে নেন, আর শুধু মেথি ফোড়ন দিয়ে বিনা মশলায় কাঁচা পেঁপের তরকারি রাঁধেন। এ ছাড়া চন্দ্রবাবুর জীবনে আজ আর কোনও কাজের ঝঞ্ঝাট নেই।

ভোর হয়েছে, একটা ঝড়ও এসেছে আর চলে গিয়েছে তবু কোনও সাড়া দিয়ে জেগে ওঠে না, এটা কেমন শহর? চন্দ্রবাবুর মত মানুষ যার পুরনো বাসিন্দা, তার বয়স কতই বা হতে পারে? ঠিকই, আকারে প্রকারে এটা একটা কচি শহরই বটে।

গ্র্যান্ড কর্ড লাইনের পরেশনাথ আর চৌধুরীবাঁধ পার হয়েই সব ট্রেন যে স্টেশনে থামে, তার নাম রামবাগ রোড। কিন্তু জায়গাটার নাম সরিয়াডি।

খুব ছোট আর খুব ছিমছাম এই ছোট্ট শহর সরিয়াডি পুরনো বস্তি আর বাজারের ছোঁয়াচ থেকে একটু দূরেই সরে আছে। স্টেশনটার সঙ্গে বেশ বড় একটা নিমবাগিচার আড়াল রেখেছে। শহর হয়েও সরিয়াডির সেরকম কোনও শহরেপনার হই হই নেই।

সরিয়াডি একটি হাওয়ানগর; তার মানে হাওয়া বদলের জন্য বাইরের মানুষের আনাগোনা এখানে লেগেই আছে। তাঁরা একটা চেঞ্জ-এর জন্যে আসেন; তাই তাঁরা 'চেঞ্জার'। রাস্তার দু'পাশে সারি-সারি যত ভিলা, কটেজ, ভবন, আলয় আর নিবাস। ম্যানসন-ট্যানসন নেই। হ্যাঁ, বেশ শৌখিন আর রঙিন চেহারার বাড়ি অনেক আছে। যেমন নাগ সাহেবের বাড়িটি, যার নাম হাওয়াই। এই বছরেই তৈরি হয়েছে রঙিন হাওয়াই; বছরের অন্তত তিনটে মাস এই হাওয়াইয়ে থাকবেন বলে আশা করেন নাগসাহেব। শ্রীলেখা কটেজও কম রঙিন নয়। এই দুই বাড়ির নিজেদেরই বিজলি-বাতি আছে।

এখানে শালবনের হাওয়া পাওয়া যায়, দূরের পরেশনাথ পাহাড়ের নীলচে চেহারাটা যখন তখন দেখা যায়। কুয়োর জল ভাল; জংলি নদী তিরছির জলও ভাল। হাওয়া-বদলের জন্য বছরের বারো মাসের প্রায় সব মাসেই নতুন মানুষের আনাগোনা কমবেশি চলছেই। শুধু হাওয়া-বদলের মানুষ নয়, ফুর্তির মানুষই আসেন। শখের মানুষও কম আসেন না। আঁকবার মানুষ, কবিতা লেখবার মানুষ; তা ছাড়া শুধু মুরগির মাংস খাওয়ার মানুষও আসেন।

আজ পিকনিক, কাল শিকার, পরশু শুধু ধানোয়ার রোড ধরে চার মাইল বেড়িয়ে আসা। বাড়ির কুয়োর জল বারবার খেয়ে ক্ষিদে বাড়াতে হয়; তিরছি নদীর জল খেয়ে চোঁয়া ঢেঁকুর তাড়াতে হয়।

মঙ্গলবারের হাটে যত ইচ্ছে টমেটো কেনা যায়; খাসি মোরগও পাওয়া যাবে। আঁটসাট ঠাসা চেহারার কত বাঁধাকপি। কী ডাঁটো ফুলকপি। দেহাতিনী পসারিনী দাম হাঁকে—টাকে সের। তাতে চমকে উঠবার কিছু নেই। তার মানে এক টাকা সের নয়; দু'পয়সা সের। খাও, বেড়াও গান গাও। ছুটোছুটি করো। জোরে গাড়ি চালাও, চেঁচিয়ে হাসো।

রোগী আর রোগিনী হয়ে যাঁরা আসেন, সরিয়াডির জল বাতাসের কাছে তাঁদেরও আশার দাবি কিছু কম নয়। শোথের পায়ের ফুলো কমে যাক; অজীর্ণতার পেট খাসি মোরগের মাংস হজম করুক। অনিদ্রার চোখ এগারো ঘণ্টা ঘুমোবে; যক্ষ্মার ফ্যাকাশে ঠোঁটে রক্তের আভা লালচে হয়ে ফুটে উঠবে। এই তো চাই; সারিয়াডির একমেসে কিংবা দু'মেসে আশ্রয়ের জীবনে ওরা কতই না আশা আরাম সুখ আর তৃপ্তি পেতে চায়।

সরিয়াডির এই জীবনটা যেন যত যাযাবর কামনা আর বাসনার ক্ষণকালের ভিড়ের জীবন। একটা অস্থায়িত্বের উৎসবের জীবন। গয়া পাটনা হাজারিবাগ আর কলকাতার মানুষ শখ করে নানা ঢঙের আর নানা রূপের এত বাড়ি এখানে তৈরি করে ফেলেছেন বলেই তো সরিয়াডি আজ একটা ছোট শহরের মত চেহারা পেয়ে গিয়েছে। ভাড়া খাটে, এমন বাড়ির সংখ্যাই সব চেয়ে বেশি। আজ খালি, কাল ভরতি। আবার একটানা তিন মাস ধরে খালি, তারপর একমাসের জন্য ভরতি। আসছে আর চলে যাচ্ছে, সবই নতুন মুখ; সরিয়াডির চোখে একটু পুরনো হতে না হতেই ওরা চলে যায়। এবাড়িতে একটা রুমাল, ওবাড়িতে একটা ছেঁড়া বই কিংবা ভাঙা পুতুল, এ ছাড়া তাদের জীবনের আর কোনও চিহ্ন এখানে থাকে না। তাও বা কদিন থাকে? চুনকামের ঠিকেদার হাজরাবাবু হঠাৎ একদিন এসে সব জঞ্জাল পরিষ্কার করে দেন। বাড়িওয়ালার টেলিগ্রাম—হাজরাবাবু নতুন ভাড়াটিয়া আসবে।

এরই সঙ্গে সরিয়াডির এইসব মরশুমি ভাড়ার বাড়িগুলিরই আশে-পাশে ভিন্ন এক জাতের বাড়ি আছে, সেগুলি কিন্তু স্থায়িত্বেরই নীড়। স্থায়ী বাসিন্দাদের বাড়ি। অনেক অনেক বাড়ি, যেখানে চিরকাল থাকবার জন্যেই মানুষগুলি থাকে ও আছে। কেউ চাকরি করেন, কেউ পেন্সন পান। কারও কারও ব্যবসা আছে—ইটখোলা, কাঠের গোলা, বাড়ি মেরামতের ঠিকেদারি, ফার্মাসি, ফুলের নার্সারি আর মণিহারি স্টোর। কেউ বাস সার্ভিসের বুকিংবাবু, কেউ পেট্রল পাম্পের ক্যাশমেমো লেখার কেরানি, কেউ বা পাঁচটা ভাড়া-খাটা বাড়ির কেয়ারটেকার।

এঁদেরই বাড়িগুলি হল বারমাসের সুখ-দুঃখের কলরবের বাড়ি। খুঁজলে এখনও হয়ত দেখতে পাওয়া যাবে, এঁদের বাড়ির ভিটে এখনও আছে—খানাকুলে বীরনগরে আর পাত্রসায়রে অশুালে ঘাটালে আর হরিনাভিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইদিলপুর আর টাঙ্গাইলে; সাতক্ষীরা কাটোয়া আর হালিশহরে; কাজললতা আর কেয়াকুলের জঙ্গল এখনও ঘন হয়ে সেসব ভিটে ছেয়ে ফেলেনি। যাই হোক না কেন আজ এঁদের জীবনের সঙ্গে গ্র্যান্ড কর্ড লাইনের ট্রেনের শব্দ, পরেশনাথের নীলচে চেহারা, শালবনের ঝড়, কাঁকরভরা লাল মাটি, মঙ্গলবারের দেহাতি হাটের বোঙা ধানের চাল আর মোটা অড়হরের ডাল, জংলি নদী তিরছির জলের তিতপুঁটি খুব ভাল করেই মিলে মিশে গিয়েছে।

বাড়ির দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়, ওটা স্থায়ী বাসিন্দার বাড়ি। পাঁচিলের উপর পড়ে আর রোদ খেয়ে কুড়ি বছরের পুরনো লেপ শুকুচ্ছে। বারান্দায় সাইকেল। আদুড় গা নিয়ে ছেলেগুলো ছুটোছুটি করে কিংবা কানামাছি খেলে। উস্কো-খুস্কো চুল, চিরুনি হাতে নিয়ে একটি মেয়ে জানালার কাছে বসে আছে তো বসেই আছে। মাথা আঁচড়ায় না, কোনও তাড়া নেই। গাঁয়ের বুড়ির ঝিঙের ঝুড়ির দিকে তাকিয়ে বিধবা মহিলা দর করছেন; কিন্তু সে কী দরাদরি।

একটি পয়সা কমাবার জন্য পনেরো মিনিট ধরে বুড়ির সঙ্গে কত তর্ক আর কত কথা কাটাকাটি। বুড়িও জানে, সামনের বাড়ির ফটকের কাছে ওই যে কলকাতিয়া মাইজি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি এমন নিদারুণ দরাদরি করবেনই না; এক কথায় পয়সা ফেলে দিয়ে দু সের ঝিঙে কিনে ফেলবেন।

তাই বলতে হয়, হাওয়ানগর সরিয়াডি একটু মজার শহরও বটে। একই মাটি, একই বাতাস আর একই রান্নাঘর; কিন্তু দু'রকম জীবনের শিবির। ওরা আর এরা। ওরা হল তিষ্ঠ ক্ষণকাল; করো ত্বরা; নাই যে সময় নাই নাই। নিতে চাও তো তাড়াতাড়ি নিয়ে ফেল। এরা হল—আছি চিরকাল; কিছুই ফুরিয়ে যাচ্ছে না; কিসের তাড়া? ব্যস্ত হতে গিয়ে ঠকব নাকি শেষে?

কিন্তু এই দুই জীবনের মধ্যে কি মেলামেশার কোনও তাগিদ নেই? হাওয়া খেতে আর বেড়াতে যাঁরা আসেন, তাঁরা কি তাঁদের আশেপাশে এইসব স্থায়ী বাসিন্দাদের বাড়িগুলির কাছে একেবারে অচেনা ও অজানা হয়ে থাকেন আর চলে যান?

না, তাও নয়। এই যে সেদিন নৈহাটির দয়ালবাবু পুরো তিনটে মাস এখানে থাকার পর চলে গেলেন, তাঁরই স্ত্রী মনোরমা রোজ সকালে কালী ভট্‌চাজের নাত বউয়ের কোলের ছেলেটাকে নিজের কোলে নিয়ে ধানোয়ার রোডে বেড়াতে যেতেন। যাবার আগে ছেলেটার জন্যে একটা টিয়ে পাখি উপহারও দিয়ে গেছেন।

কিন্তু তারপর? কালী ভট্‌চাজের নাত-বউ আশা করেছিল, নৈহাটি থেকে মনোদির অন্তত একটা চিঠি আসবেই আসবে। কিন্তু আসেনি কোনও চিঠি।

শান্তিপুরের বসন্তবাবু কিন্তু চলে যাবার দিন সরিয়াডির সামন্তবাবুর সঙ্গে কোলাকুলি করেছিলেন।—এই তো, ঠিক আর পাঁচটি মাস পরেই, অক্টোবর পড়তে না পড়তেই আমি আবার আসছি। গৃহিণীরও তাই ইচ্ছে। কেউ না আসুক, আমি না এসে পারব না মশাই। আসতেই হবে।

সেই বসন্তবাবু পাঁচ বছরের মধ্যে আর আসেননি।

২

নয়াপাড়ার সড়ক ধরে এগিয়ে যেতেই চন্দ্রবাবু দেখলেন, দুটো ল্যাম্পপোস্টের ঘাড় কাত হয়ে হেলে পড়েছে। টেলিগ্রাফের খুঁটির মাথা থেকে একটি শালিকের বাসা ছিটকে পড়ে রাস্তার পাশের নালার জলে আধ-ডোবা হয়ে ভাসছে। পিঁক পিঁক পিঁক, শব্দ করে কোঁকাচ্ছে শালিকের ছানা। ক্যাকর্ ক্যাকর্ করে উড়ছে আর ঘুরছে দুটো ধাড়ি শালিক। রায় সাহেবের সাধের বাগানের কৃষ্ণচূড়াটার ঘাড় মটকে গিয়েছে।

বেশ কিছুদূর এগিয়ে এসেছেন চন্দ্রবাবু। কিন্তু আবার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন। কী কাণ্ড? ঝড়ের বাতাস একটা ডাস্টবিনকে রাস্তার উপর দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় ফেলেছে দেখ? জঞ্জালের এক একটা স্তবক রাস্তার উপর ঢেলে দিয়ে ডাস্টবিনটা একেবারে গোষ্ঠবিহারীর বাড়িটার পাঁচিলের গায়ের উপর পড়েছে।

কিন্তু এ কী, জঞ্জালের মধ্যে এত চিঠি কেন? লাল সিল্কের সুতো দিয়ে বাঁধা রঙিন খামের চিঠির তিনটে তাড়া কেন?

চন্দ্রবাবু ডাকেন—গোষ্ঠ, ওহে গোষ্ঠবিহারী? জেগেছ নাকি?

দরজা খুলে আর চোখ মুছতে মুছতে বের হয়ে আসেন গোষ্ঠবাবু—ঘুমোতে একটু রাত হয়েছিল, চন্দর কাকা। বুলুর মার আবার ফিট হয়েছিল।

—কেন?

—স্বপ্নে দেখেছে ওর হাতে শাঁখা নেই আর ঘরের ভিতরে একটা কালো ছায়া।

চন্দ্রবাবুর চোখের তারার চিক্‌চিকে হাসিটা যেন ফুরফুর করতে থাকে। চেঁচিয়ে হেসেও ফেলেন চন্দ্রবাবু—কিছুর মধ্যে কিছু নেই, খামকা একটা মজার স্বপ্ন, অ্যাঁ?...

—কিন্তু এটা কী ব্যাপার বলতে পার?

—কী?

—ডাস্টবিনের জঞ্জালের মধ্যে এত গোটা-গোটা চিঠি কেন?

চিঠির তিনটে তাড়ার দিকে যেন দম বন্ধ করে আর অপলক চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকেন গোষ্ঠবাবু। খামের গায়ে লেখা নামটা পড়ে নিয়েই হাঁফ ছাড়েন।—কণিকা ভরদ্বাজ।

চন্দ্রবাবু—কে সে?

—ওই যে ওই বাড়ি, ওই স্মৃতিধামে ছিলেন যে ভদ্রলোক হর্ষনাথ ভরদ্বাজ, বর্ধমানের মুন্সেফ; তাঁর মেয়ে কণিকা। তিন মাস ছিল, পরশু দিন ওরা চলে গিয়েছে।

—তিন মাসের মধ্যেই এত চিঠি?

গোষ্ঠবাবু অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকেন—চিঠির গায়ে আবার ডাকটিকিট নেই দেখছি। লোকাল ব্যাপার বোধ হয়।

—কী বললে?

—কী আর বলব বলুন; হঠাৎ শুনলাম, মিস্টার ভরদ্বাজ চলে যাচ্ছেন, কারণ মেয়ের বিয়ে হবে। ডাকতে হয়নি, পাশের বাড়ি থেকে হাবুলবাবু নিজেই বের হয়ে এসেছেন। হাবুলবাবু কিন্তু বেশ একটু চড়া রাগের স্বরে কথা বলেন—না, ঠিক লোকাল ব্যাপার নয়। ওরা বাইরের; ওরা ওই করতেই এখানে আসে। দু'দিনের ফুর্তির যত জঞ্জাল এখানে রেখে দিয়ে সরে পড়ে। জানেন না গোষ্ঠদা, এসব কার লেখা চিঠি?

গোষ্ঠবিহারী—না।

হাবুল—সিন্‌হা লজের ভাড়াটে এক ছোকরা চেঞ্জার।

চন্দ্রবাবু—সে এখন কোথায়?

হাবুল—সে তো এখন এখানেই আছে আর স্বপ্ন দেখছে।

চন্দ্রবাবু ব্যস্তভাবে বলেন—চলি হে গোষ্ঠবিহারী; চললাম হাবুল; তোমাদের চায়ের সময় হয়েছে মনে হচ্ছে।

হাবুল—আপনিও একটু...।

চন্দ্রবাবু—না না, আমি তো পঁয়ত্রিশ বছর আগেই চা খাওয়ার লোভ ছেড়ে দিয়েছি। অথচ আমি, তোমরা সে খবর জান না, দিনে আটবার চা খেতুম। ছেলের মা ভয় দেখিয়ে বললেন, উনি মরে গেলে আমি নাকি ভয়ানক জব্দ হব; এত ঘন ঘন আমাকে চা করে দেবে কে? কিন্তু...আমি একটুও জব্দ হইনি হাবুল; চা খেতে ইচ্ছেই করে না।

মোষের শিঙের লাঠি দুলিয়ে আর হেসে হেসে এগিয়ে চললেন চন্দ্রবাবু। দেখতে পেলেন, জয়ন্ত মল্লিকের বাড়ির গেট খোলা, গরু ঢুকে বাড়ির বারান্দার টবের গাছ চিবিয়ে খাচ্ছে।

—জয়ন্ত, জয়ন্ত। শিগগির বাইরে এসো।

জয়ন্তবাবু বের হয়ে আসেন; গরুটাকে তাড়িয়ে চন্দ্রবাবুর সঙ্গে কথা বলেন—কী আর করা যাবে বলুন? কাল রাত্তিরে নাগ সাহেবের গাড়ি ঠিক এখানেই রাস্তার উপর ব্যাক করতে গিয়ে আমার বাঁশের জাফরির গেটটাকে কড়মড়িয়ে ভেঙে দিল।

—তারপর?

—তারপর আর কী? নাগ সাহেব বললেন, যদিও তাঁর গাড়ির বডিতে তিনটে বড় বড় স্ক্র্যাচ পড়েছে, তবু তিনি কোনও কমপ্লেন করতে চান না।

মুখ টিপে হাসতে থাকেন জয়ন্ত মল্লিক।

চন্দ্রবাবু বলেন—চলি।

মনে হচ্ছে, এইবার মেঘলা ভোরের আকাশে আলোর আভা জেগে উঠবে মানুষের ঘুম ভাঙ্গাবার বেশি সুযোগ পাবেন না চন্দ্রবাবু।

না, এই রাস্তায় আর বেশি এগিয়ে না যেয়ে ডাইনে কিংবা বাঁয়ে কোনও একটা ছোট রাস্তায় ঘুরে যাওয়াই ভাল। রজনীধামের গেট পর্যন্ত এসে বাঁদিকের কালীবাড়ি রোডে ঘুরে গেলেন চন্দ্রবাবু।

থমকে দাঁড়ালেন; ডাক দিলেন চন্দ্রবাবু।—দিবাকর। ওহে দিবাকর। জেগেছ নাকি?

দরজা খুলে বের হয়ে আসে আর বাড়ির বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে কথা বলে দিবাকর।—ঘুমোলাম কখন যে জাগব?

চন্দ্রবাবু—অ্যাঁ? তাইতো! তোমার চোখ দুটো বেশ লাল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

—হবে না কেন? চিতের ধোঁয়া লাগলে...।

—কী ব্যাপার?

দিবাকর—এই তো, আধঘণ্টাও হয়নি, আমি পরেশ মাধব আর বিমল ঘাট থেকে ফিরেছি। মাস দুই হল ওই রজনীধামে নতুন যাঁরা এসেছেন...।

—কারা?

—নাম জানি না। এক বুড়ো বাঙালি ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী; সঙ্গে একটা মাদ্রাজি চাকর।

বারান্দা থেকে নেমে এসে এইবার রাস্তার উপর চন্দ্রবাবুর কাছেই দাঁড়িয়ে কথা বলে দিবাকর।—ভদ্রলোকের স্ত্রী কাল সন্ধ্যাবেলাতেই মারা গেলেন। মল্লিক ডাক্তার এসে খবর দিয়ে গেলেন! একটা ব্যবস্থা করো।

বুড়ো ভদ্রলোক নিজেও রুগী; তার উপর কেঁদেকেটে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছেন। কাজেই, পরেশ মাধব আর বিমলকে ডাকতে হয়েছে। খাটিয়া যোগাড় করতে হয়েছে। চারজনের মধ্যে একজনের পক্ষেও কাঁধ ছাড়বার সুযোগ হয়নি; ঘাট পর্যন্ত সারাটা পথ একটানা মড়া বইতে গিয়ে কাঁধ টাটিয়ে গিয়েছে।

চন্দ্রবাবু—যাক, তোমরাই তা হলে কাজটা ভালভাবে সেরে দিয়েছ?

—দিয়েছি বইকি। বলতে গিয়ে হেসে ফেলে দিবাকর।—পাঁজির পাতা থেকে মন্তর পড়েছে বিমল; আর আমি...।

আবার হেসে ফেলে দিবাকর।—আমি মুখাগ্নি করেছি।

চন্দ্রবাবু—এঃ, একটা কাণ্ডই করেছ তা হলে?

দিবাকর—কী করব বলুন? বুড়ির কোনও ছেলে-টেলে এখানে যখন নেই, তখন বাধ্য হয়েই কাণ্ডটা করতে হল, চন্দর কাকা।

এগিয়ে চললেন চন্দ্রকান্তবাবু। চন্দ্রবাবুর চোখের তারার সেই চিকচিকে হাসিটার যেন একটুও ক্লান্তি নেই।

—হেই হেই হেই! এটা আবার কে রে? থমকে দাঁড়ালেন, চেঁচিয়ে উঠলেন চন্দ্রবাবু।

একটু দূরে মায়া ভিলার বন্ধ ফটকের লোহার গরাদের উপর দুটো পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বেশ প্রকাণ্ড কিন্তু বেশ কুৎসিত চেহারার একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর। ভিতরে ঢোকবার জন্যে যেন আঁকু-পাঁকু করছে কুকুরটা। বন্ধ ফটকের গরাদগুলিকে শুঁকছে চাটছে আর দু'পায়ের নখ নিয়ে আঁচড়াচ্ছে।

নিকটের একটা ছোট্ট বাড়ির জানালা খুলে কথা বলে ছোট্ট একটা ছেলে—ওর নাম হেন্‌রি। হেন্‌রি খুব ভাল লোক। কাউকে কিচ্ছু বলে না। আপনি এগিয়ে যান দাদু।

চন্দ্রবাবু—যাব তো; কিন্তু কী ব্যাপার? কে এটা?

এইবার ছোট্ট বাড়ির একটি বড় ছেলে ঘরের বাইরে এসে কথা বলে—মায়া ভিলাতে ছিলেন যে দত্তসাহেব, তাঁরই কুকুর হেন্‌রি। দত্তসাহেব হেন্‌রিকে এখানে ফেলে রেখেই চলে গিয়েছেন।

—কেন?

—হেন্‌রির গায়ে পোকা হয়েছে। এখন পাড়া ঘুরে সব বাড়ির এঁটোকাঁটা খায় আর ঘুরে বেড়ায়; আর, রোজই ভোরে একবার এসে ওরকম পা তুলে দিয়ে মায়া ভিলার ফটকের গরাদ চাটে।

এগিয়ে চললেন চন্দ্রবাবু। কা কা, পিউ পিউ, পিক পিক—মেঘলা ভোরের নীরব বাতাসে এইবার পাখির ডাকের সাড়াও বেশ মুখর হয়ে উঠেছে। বলাইদের বাড়ির সামনের চালতে গাছের মাথায় অনেক পাখি কিচির মিচির করছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, বলাইটা তবু বাইরের বারান্দার তক্তপোষের উপর পড়ে আছে আর ঘুমোচ্ছে। বলাইয়ের নাক-ডাকার শব্দও শোনা যায়।

জানেন চন্দ্রবাবু, বলাইয়ের এম-এ পরীক্ষা এগিয়ে এসেছে। রাত জেগে পড়া-শোনা করে বলাই। তবু চন্দ্রবাবু ডাকেন।—ওহে বলাই, আর কত ঘুমোবে।

চমকে জেগে ওঠে বলাই। আর, বেশ বিরক্ত ও অপ্রসন্ন চোখ দুটোকে একটু কুঁচকে দিয়ে কথা বলে—আঃ, কী যে করেন চন্দর কাকা।

চন্দ্রবাবু—একটা ঝড় যে এল আর চলে গেল, টের পেয়েছ কি?

—না; তাতে হয়েছে কী?

—একটু আশ্চর্য হতে হচ্ছে, এ ছাড়া আর কী?

—আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে মাঝরাতে যে একটা ঝড় বয়ে গেছে, সে খবর রাখেন কি?

—অ্যাঁ? কী হয়েছে? সেটা আবার কী ব্যাপার?

—পাগল ধরবার জন্যে মাঝরাতে ছুটোছুটি করতে হয়েছে। শুধু কি আমি? হারান আর নরেনও ভুগেছে। পাগলের ঘুষি লেগে নরেনের কপালে কালশিরে পড়েছে।

—পাগল কোথা থেকে এল?

—ওই যে অমিয় ভবনে যাঁরা এসেছেন, তাঁদেরই একজন। ইয়া হট্টাকট্টা চেহারা আমাদেরই বয়সের এক পাগল। সব সময় ইংরেজি গান গাইছেন। পাগলকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু কাল ঠিক মাঝরাতে ঘরের দরজা ভেঙে অন্ধকারের মধ্যে সোজা তিরছি নদীর দিকে ছুটে চলে গেল। কাজেই...।

কাজেই অমিয় ভবনের চেঁচামেচি শুনে আর পাগলের বউটির কান্নার শব্দ শুনে বলাই হারান ও নরেনকে বের হতে হয়েছে। রোড চৌকিদার বলেছে, দিন দশ হল একটা বুড়ো নেকড়ে তিরছি নদীর আশে পাশে ঘুরঘুর করছে।

—তাই বেশ একটু আশঙ্কা হয়েছিল, চন্দরকাকা।

কিন্তু ভাগ্যি ভাল তিন ঘণ্টা ধরে খোঁজাখুঁজির পর পাগলকে তিরছি নদীর একটু এদিকেই মাঠের মধ্যে পাওয়া গেল। কিন্তু ধরতে যেতেই বাধা দিল পাগল, একটা ধস্তাধস্তি হয়ে গেল। শেষে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে আসতে হল।

—যাক, শেষ পর্যন্ত...।

—হ্যাঁ, ধরে এনেছি। পাগলকে আবার ঘরে বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু...। হেসে ফেলে বলাই।—পাগলের বউ আজ সকালে একবার যেতে বলেছিলেন, আমাদের তিনজনকে আট আনা করে বকসিস দেবেন।

এগিয়ে চললেন চন্দ্রবাবু। তাড়াতাড়ি পা চালাতে চেষ্টা করেন, যদিও ধারিওয়াল কম্বলের ওভারকোটের ভারে ততটা তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হয় না। এদিকে পুবের আকাশও লাল হয়ে উঠেছে।

এই তো; খাপরার চালার উপর লাল লাল ফুলে ভরা একটা কাঁটালতার ঝাড় চড়ে বসেছে আর ছড়িয়ে আছে; তার উপর বসে দুটো শালিক ডাক ছাড়ছে; এটা প্রদোষ সরকারের বাড়ি।

কিন্তু বাড়িটা যেন অনেকক্ষণ আগেই জেগেছে বলে মনে হচ্ছে। জানালাটা খোলা; কে যেন জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। কী ব্যাপার? সত্যিই যে প্রদোষ সরকারের মেয়ে আত্রেয়ী খোলা জানালার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

কী দেখছে আত্রেয়ী? পুবের আকাশের লালচে আলোটাকে? কী শুনছে আত্রেয়ী? দূরের তিরছি নদীর ঝর্নার কলকলে শব্দটাকে? ভাবছেই বা কী? একটা স্বপ্ন দেখে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছে, সেই স্বপ্নটাকেই ভাবছে নাকি অত্রেয়ী?

চন্দ্রবাবুর মনে অবশ্য এসব প্রশ্নের কোনও প্রশ্নই ছটফট করছে না। তিনি ভাবছেন, ব্যাপার কী? প্রদোষ সরকারের মেয়ে আত্রেয়ী আজ এত ভোরে জেগে উঠল কেন? কোনওদিনও তো এ সময়ে ওই জানালাটিকে খোলা দেখতে পাননি, আর আত্রেয়ীকে জানালার কাছে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখেননি চন্দ্রবাবু।

—আত্রেয়ী নাকি? ডাক দিলেন চন্দ্রবাবু।

চমকে উঠে আত্রেয়ী।—হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই।

—ঝড় এসেছিল, টের পেয়েছিলে কি?

—পেয়েছি।

—অ্যাঁ। তা হলে তো অনেকক্ষণ হল জেগেছ।

—হ্যাঁ।

—আর সব খবর ভাল?

—হ্যাঁ, ভালই।

—তোমার হাতে ওটা কী?

পুব আকাশের সব আলোর আভা যেন রক্তমাখা হয়ে প্রদোষ সরকারের মেয়ে আত্রেয়ীর মুখের উপর চমকে ওঠে। হাতটাও কেঁপে উঠেছে।

বোধহয় আত্রেয়ীর কাছ থেকে একটা উত্তর আশা করছেন চন্দ্রবাবু। কিন্তু আত্রেয়ী আর কথা বলবে মনে হয় না। চন্দ্রবাবুর চোখের তারাতে কোনও বিস্ময়ও আর চিকচিক করে না। যেন ভয়ানক জটিল ও কঠিন একটা হেঁয়ালির থিয়েটার দেখছেন। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছেন না।

আত্রেয়ী বলে—বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, জ্যাঠামশাই। আপনি একটা আলোয়ান গায়ে দিয়ে বেড়াতে বের হলে ভাল করতেন।

—আচ্ছা, আমি চলি। বাবাকে বলো, আমি এসেছিলাম।

মোষের শিঙের লাঠিটাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়েই চলতে থাকেন চন্দ্রবাবু।

৩

এই ছোট হাওয়ানগর সরিয়াড়ির স্থায়ী বাসিন্দা প্রদোষ সরকারের বাড়ির খাপরার চালার উপরে এই কাঁটালতার বিপুল বোঝা কোনও ঝড়ের হাওয়াতে উড়ে যেতে পারে না। ওটা যেন একটা অচলতার ভার। প্রদোষ সরকার নিজেও একটা অচলতা। ভদ্রলোকের একটি পায়ের আধখানা নেই। ক্রাচের উপর ভর করে আস্তে-আস্তে হাঁটতে পারেন। ঘরের ভিতর থেকে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতে পাঁচ মিনিট লেগে যায়।

দানাপুরের গোরাবারিকের একশো টাকা মাইনের জিমনাস্টিক মাস্টার ছিলেন প্রদোষ সরকার। দেশি মানুষ হয়েও গোরা সোলজারকে কসরত শেখাবার মাস্টারি শুধু এক প্রদোষ সরকার ছাড়া আর কেউ করেছেন বলে শোনা যায় না। আজও প্রদোষ সরকারের এই বাড়ির একটি ঘরের দেয়ালে পুরনো ফটো ঝুলছে; ব্রিগেডিয়ার সাহেবের চোখের সামনে একটি লনের ঘাসের উপর দুটি হাতের উপর ত্রিশ বছরের বয়সের শক্ত-মজবুত শরীরটার ভর রেখে আর পা-জোড়া টান উর্ধ্বে তুলে দিয়ে পিকক হয়েছেন প্রদোষ সরকার। সেই উর্দ্ধমুখী দুই পায়ের পাতার উপর দু'মণ ওজনের একটি বারবেল সুস্থির হয়ে রয়েছে।

ছাত্রদের সামনে প্যারালাল বারের উপর কসরত করতে গিয়ে একদিন মাস্টারের হাতের কব্জি হঠাৎ মট্ করে বেজে উঠল; ছিটকে পড়ে গেলেন মাস্টার। একটি পা ভেঙে গেল। সেই ভাঙা পা কেটে ফেলতেও হল। অকালে পেনসন পেলেন প্রদোষ সরকার। তারপর থেকে সরিয়াডির এই বাড়িতে একটানা বিশ বছর ধরে একটা অচলতার জীবন।

খুব ছোট বাড়ি কিন্তু মানুষ কম নয়। প্রদোষ সরকার ছাড়া আর যাঁরা থাকেন, তাঁরাও যেন এক-একটা অচলতা।

প্রদোষ সরকারের স্ত্রী হৈমবতী একটি অচলতা। দিনে অন্তত দুবার শ্বাসকষ্ট হবেই। তখন পুজোর ঘরের দরজার কাছে একেবারে ধীর-স্থির হয়ে বসে থাকবেন। খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির জলের ছাঁট ঘরে ঢুকে বিছানা ভিজিয়ে দিচ্ছে; হৈমবতী শুধু তাকিয়ে দেখেন। কিন্তু ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসতে পারেন না, জানালাটাকে বন্ধও করতে পারেন না।

হৈমবতীর এক মাসিমা আছেন, মণিময়ী; আত্রেয়ীর মণিদিদা। একে তো বেশ বুড়ো মানুষ, তার উপর চোখে ভাল দেখতে পান না। দেয়াল ধরে ধরে হাঁটেন। হাতটাও সব সময় থরথর করে কাঁপছে। তাঁকে খাইয়ে দিতে হয়।

আছেন আত্রেয়ীর কাকিমা সুহাসিনী; প্রদোষ সরকারের খুড়তুতো ভাই সোমনাথের বিধবা স্ত্রী। ইনিও প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ভাসুরের এই সংসারের হেঁসেল আর ভাঁড়ার আগলে রয়েছেন। রাত বারোটার পরেও খইয়ের ডালা কোলে নিয়ে বসে থাকেন আর ধান বাছেন। কিন্তু তারপর আর উঠতে পারেন না; মেঝের উপরেই অসাড় হয়ে শুয়ে পড়ে থাকেন।

বুড়ো চাকর রামুয়া; সেটাও একটা অচলতা। দানাপুরের চাকরি জীবনে এই রামুয়া ছিল প্রদোষ সরকারের ঘরে চাকর। কে জানে কোথায় ওর দেশ? হাঁপানিতে ভোগে আর যখন ইচ্ছে হয় তখন একটা কাজ করে। রান্না হতে দেরি হলেই রাগ করে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন অনেক সাধাসাধি করে ওর ঘুম ভাঙাতে হয়। পেট ভরে ভাত খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে রামুয়া। এই তো সেই রামুয়া, যে লোকটা একদিন দানাপুরের গোরবারিকের ময়দানে ছুটে গিয়ে প্রদোষ সরকারের ভাঙা পা দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল।

অকালে পাওয়া পেনসন, মাত্র একচল্লিশ টাকা; তাতে যেভাবে থাকতে পারা যায়, সেইভাবেই থাকতেন প্রদোষ সরকার। কাঁটা-লতার প্রকাণ্ড ভার বাড়িটাকে বিঁধছে; কিন্তু বাড়িটা সেজন্য উঃ আঃ করে না।

এঁরা তো পথের শেষে পৌঁছে গিয়েছেন আর অচল হয়ে পড়ে আছেন। কিন্তু আত্রেয়ীও কি তাই?

সরিয়াডির স্থায়ী বাসিন্দাদের সকলেই জানে, বেচারা আত্রেয়ী মেয়েটার জীবনও একটা অচলতা।

সেই যে কবে, বোধ হয় পুরো তিনটে বছর পার হয়ে গিয়েছে, প্রদোষ সরকারের মেয়ে এই আত্রেয়ীর বিয়ে হয়েছিল। এখানে নয়, নদে জেলার বীরনগরে; আত্রেয়ীর মামা, গরিব জমিদার কান্তিবাবু খুব কম টাকা খরচ করে আর খুব ঘটা করে ভাগ্নির বিয়ে দিতে পেরেছিলেন। আত্রেয়ীর বয়স তখন কত? সতেরো কিংবা আঠারো। খোঁড়া মানুষ প্রদোষ সরকার অবশ্য মেয়ের বিয়েতে বীরনগরে যেতে পারেননি। আত্রেয়ীকে নিয়ে বীরনগরে গিয়েছিলেন শুধু আত্রেয়ীর মা আর কাকিমা।

মামা তাঁর ভাগ্নির জন্যে ভাল পাত্রই যোগাড় করেছিলেন। পঁচিশ ছাব্বিশ বয়স হবে, দেখতে বেশ ভাল, রাধাপুরের সাত-আনির মালিক হেমন্ত সেই বয়সে একজন জবরদস্ত জমিদার। ঘোড়ায় চড়ে ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে হেমন্ত, দেখতে পেলেই নয়-আনির প্রজা চাষীরা হাতের লাঙল ক্ষেতের উপর ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। নয়-আনির

জ্ঞাতিরা ভয় করে, কিন্তু বছরে তিনটে করে মামলা বাধিয়ে ছোকরা সাত-আনিকে সদরে ছুটোছুটি না করিয়েও ছাড়ে না।

সে কাহিনী জানেন চিনুর পিসিমা।—হ্যাঁ, ঠিক ফুলশয্যার দিনে সন্ধ্যাবেলাতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এল। একমাস আগে কোথায় যেন দাঙ্গা ফৌজদারি হয়েছিল; ন' আনিদের তিনটে লোক খুন হয়েছিল। পুলিশ এসে ছেলেটাকে ধরে নিয়ে চলে গেল। তখন মেয়েটার মনের অবস্থা কী হয়েছিল, একবার ভেবে দেখুন সন্তুর মা?

—ছেলেটার বাড়ির মানুষের অবস্থাটাও একবার ভাবুন।

—না, তেমন কান্নাকাটি করবার মত কেউ ছিল না। ছেলের মা-বাপ কেউ নেই। ছেলেমানুষ এক ভাই-পো ছিল, আর এক বিধবা খুড়ি ছিল। তারা দু'জনেই বা একটু কেঁদেছিল।

রাধাপুরের সাত-আনির প্রকাণ্ড দালান-বাড়ির একটি ঘরে সন্ধ্যা ঝাড়বাতির আলো ঝলমল করে জ্বলছে; তিন বছর আগের সেই ছবিটাকে যে এই সেদিনও স্বপ্নে দেখতে পেয়েছে আত্রেয়ী। তাঁর নামটা মনে পড়ে না, এক মহিলা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে আত্রেয়ীর চিবুক ছুঁয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—ওরে তোরা দেখ এসে, আমাদের হেমন্তের বউয়ের মুখটা কী সুন্দর!

বাইরে একটা সোর-গোল; মানুষের ছুটোছুটি, যেন একটা আতঙ্কের ব্যস্ততা। হেমন্তের গলার স্বর শোনা যায়; শান্ত ও গম্ভীর একটা গর্জন—চুপ; কেউ ছুটোছুটি করবে না।

ঘরে ঢোকে হেমন্ত।' গায়ে একটা গেঞ্জি, কাঁধের উপর একটি পুরনো কামিজ ফেলা, আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে হেমন্ত। —আমি এখন যাচ্ছি।

আত্রেয়ী আশ্চর্য হয়ে তাকায়। হেমন্ত বলে—তুমি কিন্তু মিথ্যে ভয় পেও না; আর আমার ওপর রাগ-টাগও করো না।

আত্রেয়ী—কী হল?

হেমন্ত—নুটুর কাছ থেকে সব জানতে পারবে। আমি এখন আসি, কেমন?

হয়ত আরও একটি-দুটি কথা বলত হেমন্ত। কিন্তু সেই মহিলা তখন হতভম্ব হয়ে ঘরের ভিতরেই দাঁড়িয়ে আছেন। হেমন্ত শুধু চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপরেই বলে—তুমি আমাকে এক গেলাস জল দাও, ওই যে ওখানে কুঁজো।

হেমন্তর হাতের কাছে জলের গেলাস এগিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আত্রেয়ী। ভয়ানক তৃষ্ণার্তের মত ব্যস্তভাবে ঢক ঢক করে জল খায় হেমন্ত; খালি গেলাসটাকে টেবিলের উপর রেখে দিয়েই বের হয়ে যায়।

পরের দিনই জমিদার মামা এসে ভাগ্নিকে বীরনগরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর, দিন সাত পরে একটি দিনে বলেই ফেললেন—তোরা এখন আত্রেয়ীকে নিয়ে তোদের জংলি সরিয়াডিতেই ফিরে যা, হেমি।

হেমন্ত সদরের জেল হাজতে আছে; এখন মামলা চলবে। কতদিন ধরে চলবে কে জানে? ঠিক কবে যে ফিরবে হেমন্ত; সেটাও ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

আবার সরিয়াডি; চমৎকার একটা নিশির ডাক যেন আত্রেয়ীকে কদিনের জন্য এখান থেকে নিয়ে গিয়ে একটা ঝাড়বাতির ঝলমলে আলোর কাছে বসিয়ে রেখেছিল। সরিয়াডির সকলেই শুনতে পেল আর দেখতেও পেল, আত্রেয়ী মেয়েটার মাথাটা শুধু সিঁদুরের একটা দাগ নিয়ে ফিরে এসেছে।

মাস ছয় পরে বীরনগরের কান্তিবাবুর একটা চিঠি পড়ে নিয়েই যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রদোষ সরকার, তখন, সবার আগে আত্রেয়ীই দেখতে পেয়ে প্রদোষ সরকারের কাছে এসে চিঠিটাকে হাতে তুলে নিয়েছিল। বোঝা গেল, কবে আসবে হেমন্ত। পাঁচ বছর পরে।

মামার চিঠিটা বেশ স্পষ্ট ভাষায় বলছে—হেমন্তের পাঁচ বছরের জেল হয়েছে। আর শেখ রহিম, তোরফান আলি, ভিকু সরকার ও ভোলা প্রামাণিক, প্রত্যেকের দশ বছর। এখন আলিপুর

জেলে আছে হেমন্ত। আত্রেয়ীকে দিয়ে একটা দরখাস্ত সই করে খুব তাড়াতাড়ি জেলারের কাছে পাঠাবেন, যেন বছরে অন্তত তিনটি বার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সুবিধা পায় অত্রেয়ী।

কিন্তু দু'দিন পরে আলিপুর জেল থেকে লেখা হেমন্তেরই একটি চিঠি পড়ল আত্রেয়ী—তুমি এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা-টেখা করো না, লক্ষ্মীটি। দেখা তো হবেই একদিন।

—আমারও পাঁচ বছরের জেল হল, কাকিমা। চিঠিটা কাকিমার হাতে তুলে দিয়েই সরে যায় আত্রেয়ী। কিন্তু সরে যেতে হলে কতদূরেই বা যাওয়া যেতে পারে? বাইরের ঘরের এই জানালাটা পর্যন্ত। বাস, তারপর আর যা-কিছু দেখা যায় ও শোনা যায়, সবই একটা অন্য দুনিয়ার ছবি আর শব্দ। শালবন, বিকেলের আকাশ, দূরের ট্রেনের শব্দ, সন্তুদের গরুটা ডাকছে; নতুন বাছুরটা ছুটোছুটি করছে। ওরা আত্রেয়ীর জীবনের, আত্রেয়ীর চোখ কান আর নিঃশ্বাসের কেউ নয়।

অন্য দিন হলে, এখনই বের হত আর সন্তুদের নতুন বাছুরটার গায়ে নিশ্চয়ই একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে ফিরে আসত আত্রেয়ী। কিন্তু আর পারবে না আত্রেয়ী, দরকারও নেই। গরুটা শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসবে, আত্রেয়ীর হাতটা গুঁতিয়ে সরিয়ে দেবে। আর, সন্তুটাও আত্রেয়ীকে হয়ত চিনতে পারবে না।

পশ্চিমের আকাশটা লাল হল। ঘরের সব জানালা বন্ধ করে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে আত্রেয়ী।

সরিয়াডির সন্ধ্যাতেও কী কুয়াশার ঘোর। তাই, ওদিকে চন্দ্রবাবুও তাঁর মোষের শিঙের লাঠিটাকে হাতে তুলে নিয়ে বের হয়ে পড়েছেন।

—ওহে গোষ্ঠবিহারী, আজ হঠাৎ এত কুয়াশা কেন? এটা তো পৌষ নয়।

গোষ্ঠবিহারী—তা তো নয়।

—কুয়াশাতে আবার এত ঝাঁজ কেন? তোমাদের চোখ জ্বালা করছে না?

—করছে। কোথাও কাঁচাকয়লাব পাইল পুড়ছে বোধ হয়; তাই খুব ধোঁয়া ছড়িয়েছে।

চন্দ্রবাবু চলে যেতেই হাবুলবাবু বলেন—শুনেছেন তো গোষ্ঠদা, আত্রেয়ীটা আজ বিকেল থেকেই ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে শুধু কাঁদছে।

—শুনেছি।

—ছক পাতবেন নাকি? না, ইচ্ছে করছে না?

—নাঃ, আজ আর কিছু ভাল লাগছে না।

—আমারও।

চিনুর পিসিমা দুধের বাটিটাকে এক ঠেলা দিয়ে সরিয়ে রেখে আর বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছেন—কী যন্ত্রণা, কোত্থেকে এমন চোখ-জ্বালানো ধোঁয়া এল রে বাবা। ওরে, ও চিনু; একবার দেখে আয় তো মা, আত্রেয়ী কিছু খেল কি না?

আষাঢ়ের মেঘ যেদিন বিকেলে দূরের নীলচে চেহারার পরেশনাথের গায়ের উপর গলে পড়ে যায়, সরিয়াডির শালবনের উপর দিয়ে জলো হাওয়া ছুটে যায়, আর, কিছুক্ষণ পরেই সব আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়ে শুধু তারা ঝিকমিক করে, সেদিন মনে করতে হয়, একটা বছর পার হয়ে গেল। বীরনগরের মামার বাড়ির সুপুরিবাগানের মাথার উপরে সেই আকাশের মত সরিয়াডির এই আকাশেও আজ তারা হাসে। কিন্তু সরিয়াডির সকলেই জানে, আত্রেয়ী এই এক বছরের মধ্যে কোনওদিনে কোনওক্ষণেও হাসতে পারেনি। সন্তুর মা দেখেছেন, কত হাসি-খুশি আর কত ফুর্তি নিয়ে ছুটোছুটি করত যে মেয়ে, সে আজ পাহাড়ের মত গম্ভীর। এক বছর আগে, ওই প্রদোষবাবু নিজেও একদিন দেখেছিলেন, আর খুশির আবেগে হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন—পা থাকলে আজ আমি তোরই সঙ্গে একবার ছুটোছুটি করে নিতাম রে আত্রেয়ী।

সেদিন বুড়ো চাকর রামুয়ার গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে একটা দেহাতি ভজন গাইতে গাইতে, আর ছুটোছুটি করে ঘরের কাজ করছিল আত্রেয়ী। তার কদিন পরেই তো বীরনগর চলে গেল।

৪

গোষ্ঠবাবুর বাড়িতে দাবা খেলার আনন্দের উল্লাসের মধ্যেও হঠাৎ হাত গুটিয়ে নিয়ে আর গম্ভীর হয়ে আক্ষেপ করেছিলেন হাবুলবাবু—মনে আছে তো গোষ্ঠদা, প্রদোষদার মেয়ে আত্রেয়ীটা একদিন কী কাণ্ড করেছিল?

মনে আছে গোষ্ঠবাবুর। আত্রেয়ী তখন নিতান্ত ছোট্ট মেয়েটি নয়। তেরো বছর বয়সের একটি মেয়ে; কোনওদিন ফ্রক পরে; কোনওদিন শাড়ি। বড় বড় দুটো বেণী দুলিয়ে আর ছুটে এসে একটা কাঠবিড়ালিকে ধরবার জন্যে পাঁচিলের উপরে উঠে পড়েছিল।

হাবুলবাবু বলেন—না, কাঠবিড়ালি নয়। সেই যে, চেঞ্জার ছোকরার সেই ক্যামেরাটা?

খুব মনে আছে। সরিয়াডিতে বেড়াতে এসেছিল ফটো তোলবার শখের একটি ছেলে। সব সময় ক্যামেরা হাতে নিয়ে সরিয়াডির এদিকে-সেদিকে ঘুর-ঘুর করত। গোষ্ঠবাবুর বাড়ির ফটকের মালতিলতার কাছে আত্রেয়ীকে দেখতে পেয়েই ক্যামেরা তুলে ধরল সেই চেঞ্জার ছোকরা—একটু পোজ করো তো; লতাটাকে একটু ছুঁয়ে দাঁড়াও তো; মাথাটা বাঁদিকে একটু হেলিয়ে দাও,...হ্যাঁ ঠিক আছে বাস্!

অচেনা আগন্তুক যা বলছে, ঠিক তাই করছে আত্রেয়ী। চোখ দুটোও ঝকমক করে হাসছে।

ফটোসুখী ছেলেটা বলে--রেডি! ক্যামেরা বলে—ক্লিক।

কিন্তু তার আগেই চোখ বন্ধ করে আর জিভ বের করে দুরন্ত-ধূর্ত একটা ভেংচানির মূর্তিকে ক্যামেরার চোখের উপর এঁকে দিয়েছে, আর গোষ্ঠবাবুর বাড়ির ভিতরে ঢুকেই খিলখিল করে হেসে উঠেছে আত্রেয়ী। —বেশ চমৎকার একটা ফটো তোলালাম, গোষ্ঠকাকা।

ঘুঁটি চালবার জন্য হাত তুলেই হাবুলবাবু বলেন—আমি ছেলেটাকে দু-চারটে বেশ কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিলাম। গোঁয়ার দিবাকরটা আবার কোথা থেকে ছুটে এসে ছোকরার ক্যামেরা ভেঙে দিতে চেয়েছিল। আমি অবিশ্যি অতটা গড়াতে দিইনি।

গোষ্ঠবাবু,—শুনেছি মেয়েটার মনে এখন আর কোনও ফূর্তি-টূর্তি নেই। শুধু জেলের চিঠির আশায় ছটফট করে।

আলিপুর জেল থেকে চিঠির আশায় ছটফট করা আর চিঠি এলে দুটি-একটি দিনের মত শান্ত হয়ে যাওয়া, আত্রেয়ীর প্রাণটাও যেন একটা জেলের কুঠুরীর মধ্যে কয়েদ খাটছে। বাড়ির বাইরে যাওয়া দূরে থাকুক, ঘরের জানালার কাছে গিয়েও দাঁড়াতে চায় না আত্রেয়ী।

হেমন্তর একটা চিঠিকে বার বার দশবার পড়েছে আত্রেয়ী। "দেখতে না এসে ভালই করেছ। একটা চোখের দেখা দিয়ে তুমি তখুনি চলে যেতে; সে যে আমার পক্ষে কী কষ্টের ব্যাপার হত, তুমি বুঝতে পারবে কিনা জানি না।"

চিঠির দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ীর চোখ দুটো অদ্ভুত বিস্ময়ে দুটো আলো হয়ে জ্বলজ্বল করে। চিঠি নয়; হেমন্ত যেন নিজেই এসে আর কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

চিঠি দিয়ে চোখ ঢেকে তখনি আবার ছটফট করেছে আত্রেয়ী; চাপা নিঃশ্বাসটা ফিসফিস করে কথা বলেও ফেলেছে—এতই যদি কষ্ট হয়, তবে পাঁচিল টপ্‌কে পালিয়ে এলেই তো পার।

কাকিমা ডাক দিয়েছেন—এদিকে একবার আয়, আত্রেয়ী।

অনেক রাতেও বিছানার উপর বসে জপ করেন যিনি, আর চোখে ভাল দেখতেও পান না, সেই মণিদিদাও এক মাঝরাতে হঠাৎ ডাক দিলেন—ও হেমি, ও সুহাস, তোমরা ঘুমোচ্ছ কোন সুখে? দেখতে পাচ্ছ না?

আত্রেয়ীর মা আর কাকিমা জেগে ওঠেন—কী দেখতে বলছ মাসি?

—ওঘরে কে যেন জেগে বসে আছে।

—তাই তো।

হৈমবতীর শ্বাসকষ্টের ব্যথাটা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে পারে; তাই হৈমবতী বলেন—আমি যাব না,তুমি একবার গিয়ে দেখে এসো, সুহাস।

আলো জ্বলছে। বাক্সের ভিতর থেকে হেমন্তের একটা ফটো বের করে নিয়ে টেবিলের উপর রেখেছে আত্রেয়ী। ঘরের ভিতরে যেন ভয়ানক একটা ঠাট্টার ভাষা রাগ করে বিড়বিড় করছে—বাঃ, বেশ কাণ্ড করলে।

আত্রেয়ীর মাথায় হাত রাখেন কাকিমা—ছিঃ, তুই না বলেছিস, রাগ করবি না। যাবার আগে হেমন্ত তোকে রাগ করতে মানা করে গিয়েছে।

আত্রেয়ী—আমি তো ওর ওপর রাগ করছি না। আমার নিজেরই ওপর রাগ হচ্ছে।

আত্রেয়ীর মাথায় হাত বুলিয়ে আদরের সুরে কথা বলেন কাকিমা—কেন রে আত্রেয়ী, বল আমাকে, কী মনে হচ্ছে?

—সে কি এখন চাদরপাতা বিছানায় পড়ে ঘুমোচ্ছে? ঘুমোতে পারছে? তোমাদের যত মুড়ির মোয়া আর সন্দেশ খাচ্ছে? সাবধান, আমাকে কাল থেকে চা খেতে দেবে না। আমাকে সাজতে বলবে না।

—চুপ কর, চুপ কর। আত্রেয়ীর মাথাটাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরেন কাকিমা।

সরিয়াডির শীতের হাওয়া যেমন শুকনো তেমনই কনকনে; মানুষের চোখ-মুখ রুক্ষ করে দেয়। কিন্তু সে রুক্ষতা আত্রেয়ীর চেহারাটাকে বড় বেশি উদাস করে দিয়েছে। চোখ দুটো এত শান্ত আর মুখটা এত গম্ভীর যে দেখে মনে হয়, ওর মনের গায়েও খড়ি পড়েছে। চিনুর পিসিমা তাই মনে করেন; কিন্তু কাকিমা বলেন—না, দিদি। প্রায় একুশ বছর বয়স হল মেয়েটার; সবই বুঝতে পারি।

একটা গল্পের বই হাতে নিয়ে ঘরের এক কোণে চুপ করে বসে আছে বলেই কি বই পড়ছে আত্রেয়ী? কাকিমা ওর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝে নিয়েছেন আর সরে গিয়েছেন।

বীরনগরের মামার বাড়ির উঠোনের সেই আলপনার উপর কে-যেন হলুদ-গুঁড়ো দিয়ে বড়-বড় প্রজাপতি এঁকে রেখেছে। তার গায়ের চাদরে গোলাপ আতরের গন্ধ। কপালের কাছে একটা দাগ। দিব্যি হেসে হেসে বলে দিল, ওটা ডাকাতের লাঠির দাগ। রাধাপুরের সে-বাড়ির ঘরে টেবিলের উপর সাদা পাথরের থালাতে গোলাচন্দন ভাসছে। দীঘির ধারে বাজি পুড়ছে; চমকে উঠছে নীল-লাল আলোর ঝলক। হঠাৎ এসে কানের কাছে ফিসফিস করে বলে গেল।—তোমার মামার অত বড় চিঠি পড়েও বুঝতে পারিনি যে, তুমি এত সুন্দর।

আত্রেয়ীর মুখটা যে সত্যিই চমকে ওঠে আর অদ্ভুত একটা লাজুক হাসির আভায় রাঙা হয়ে যায়।

বই রেখে দিয়ে, শক্ত করে বাঁধা রুক্ষ খোঁপাটাকে এক টানে ধসিয়ে দিয়ে বিনুনী ভাঙতে থাকে আত্রেয়ী। চোখের পাতাও বেশ ভারী হয়ে নুয়ে পড়ছে।

ঠোঁটের ফাঁকে একটা দুরন্ত অভিমানের ভাষা কেঁপে উঠতে চাইছে—কিন্তু তোমার পাঁচ বছর শেষ হবে কবে? আমি মরবার পর?

আয়নাতে আর দেখতে হবে কেন? সেদিনও হাতের কাছে আয়না ছিল না। বেশ বুঝতেই পারা যাচ্ছে, ভিজে গিয়েছে ঠোঁট আর লালচে হয়ে ফুলে ফুলে কাঁপছে। একটুও লজ্জা নেই ভদ্রলোকের; নিজেই আবার হাত বুলিয়ে অচেনা মেয়ের সেই মুখটার সব ভয় মুছে দিল।

জেলের অফিস চিঠি খুলে পড়ে; তা না হলে বেশ স্পষ্ট করেই লিখে দিতে পারা যায়, সব ভুলে গেলে কেন?

কাকিমা ডাক দিয়ে বলেন—চিঠি এসেছে, আত্রেয়ী।

হেমন্তের এই চিঠির অনেক কথার মধ্যে আত্রেয়ীর জীবনের এই নালিশটারও একটা জবাব যেন আছে।—আর কী লিখব? যা লিখতে ইচ্ছে করছে তা'ও ইচ্ছে করেই লিখলাম না। তুমি বুঝে নিও।

বিকেলবেলা বাইরের বারান্দায় নিথর হয়ে বসে আত্রেয়ীর মা'র সঙ্গে একদিন অনেক কথা বললেন প্রদোষ সরকার। —মেয়েটাকে একটু বুঝিয়ে বলো; বাড়ির বাইরে গিয়ে একটু ঘোরা-ফেরা করুক। আগের মত ঘরের কাজ-টাজ করুক।

—অনেক বুঝিয়েছি।

—এই তো, দেখতে দেখতে তিনটে বছর কেটে গেল; আর দু'বছর পরেই তো...।

আত্রেয়ী এসে প্রদোষবাবুর চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে।—কী রে? মেয়ের পিঠে আদর করে হাত বুলিয়ে প্রদোষবাবু হাসতে থাকেন।—এই তো এইরকম শান্তটি হয়ে থাকবি, তবেই না...।

আত্রেয়ী—জেলারের কাছে একটা দরখাস্ত পাঠাতে হবে, বাবা।

—অ্যাঁ? কিসের দরখাস্ত?

আত্রেয়ী—ওকে যেন ঘানিতে খাটিয়ে কষ্ট না দেয়।

—আরে না না; হেমন্তকে ওরকম সাংঘাতিক কোনও কাজ করতেই হয় না। তোর কান্তি মামা তিনবার দেখা করে এসেছে। প্রথম একটা বছর অবিশ্যি একটা খাটুনির কাজ করতে হয়েছিল, বাগানের কাজ করতে হয়েছিল। এখন জেল হাসপাতালের কাজ, শুধু একটা খাতা লিখতে হয়।

আত্রেয়ীর মা বলেন—তা ছাড়া, তোর মামা আরও ব্যবস্থা করেছে। হেমন্তকে এক ঝুড়ি আম পাঠানো হয়েছে। তুই সে খবর জানিস না?

আত্রেয়ী—কেমন করে জানব? তোমরা বলনি, সে'ও কিছু লেখেনি।

প্রদোষবাবু—কিন্তু ভাল আছে হেমন্ত। ভাববার কিছু নেই। তাই তোকেও বলছিলাম...।

আত্রেয়ী—কী?

প্রদোষ—তুইও একটু কাজ-টাজ নিয়ে থাক। একটু বাইরে ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে; অ্যাঁ? কে ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে? মেয়েটি হাত তুলে তোকেই ডাকছে বলে মনে হচ্ছে।

ফটকের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে আত্রেয়ী। সত্যিই যে তিনজন অচেনা মানুষ রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে প্রদোষ সরকারের বাড়ির এই বারান্দার দিকে তাকিয়ে আছেন।

আত্রেয়ীর মা বললেন—হয় ওঁদের এখানে আসতে বলো, নয় তো গিয়ে শুনে আয়, আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী—আমি পারব না। তুমি যাও।

আত্রেয়ীর মা এগিয়ে যেয়ে ডাকেন। —আসুন।

মেয়েটি বারান্দায় উঠেই হাসতে থাকে। —আমরা এখানে নতুন এসেছি। ইনি আমার বড় বউদি, ইনি মেজদা। আমরা মাত্র দুটি মাস থাকব।

প্রদোষবাবু—কোথায় উঠেছ তোমরা?

—আমরা আছি শ্রীলেখা কটেজে, সাতদিন হল আছি। কিন্তু একটা সত্যি কথা বলব।

ছটফটে খুশির ফোয়ারার মত কলকল করে হেসে, আত্রেয়ীর কাছে এগিয়ে আসে মেয়েটি; আত্রেয়ীর একটা হাতও ধরে ফেলে।—সাত দিন ধরে ঘুরছি, কিন্তু এই প্রথম একটি চমৎকার শ্রীর সাক্ষাৎ পেলাম। আপনাকে দেখে খুব আশ্চর্য লাগল: তাই না ডেকে থাকতে পারলাম না। তা ছাড়া, লোকের গায়ে পড়ে ভাব করা আমার স্বভাবও বটে।

আত্রেয়ী—বসুন।

—না, না, এখন বসব না; আজ শুধু আপনাকে একটু চিনে গেলাম, আর চেনা দিয়ে গেলাম। আমার নাম মঞ্জু। ...আচ্ছা, চলি। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

প্রদোষবাবু, আত্রেয়ীর মা আর আত্রেয়ীকে লক্ষ করে তিনটে নমস্কারের ভঙ্গি ছুঁড়ে দিয়েই চলতে শুরু করে মঞ্জু, সেই সঙ্গে মঞ্জুর বড় বউদি আর মেজদা।

প্রদোষ সরকারের বাড়ির কাঁটালতার ফড়িং তিড়বিড় করে উড়তে থাকে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় মঞ্জু। মুখ ফিরিয়ে আর আত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে কথা বলে।—ফুল নেব? আপনাদের এই লতার লাল ফুল? আচ্ছা থাক; কাল খুব ভোরে যখন বেড়াতে বের হব, তখন নিয়ে যাব। নিশ্চয়। মনে রাখবেন কিন্তু।

৫

বেশ বড় একটা রুমাল দিয়ে আলগা করে জড়ানো একগাদা লাল ফুল। কাঁটালতার ফুল বটে, কিন্তু বেশ মিহি-মিষ্টি একটা সুগন্ধও আছে। রুমালের চার কোণের মুখ ঢিলে গিঁট দিয়ে একসঙ্গে এমন করে বাঁধা হয়েছে, দেখে মনে হবে, ওটা একটা ফুলের সাজি। রুমালের কোণে হলদে সুতোয় আঁকা নামটাও আছে—আত্রেয়ী। ভালই তো। জানুক মঞ্জু; এবাড়িতে হঠাৎ এসে যার হাত ধরে হেসে-হেসে এত কথা বলে গেল মঞ্জু, তার নাম আত্রেয়ী।

বলেছিল মঞ্জু, খুব ভোরেই ওরা বেড়াতে বের হবে, আর এই রাস্তা দিয়েই যাবে; যাবার সময় ফুল নিয়ে যাবে।

কিন্তু এখন তো আর খুব-ভোর নয়। আকাশে এখনও একটু মেঘলা ভাব আছে বলেই সকালবেলার রোদ চাপা পড়ে আছে। নইলে এতক্ষণে সরিয়াডির আশ্বিনের এই সকালবেলার কাঁচাসোনা রঙের রোদ এতক্ষণে ছড়িয়ে গড়িয়ে কোথায় না চলে যেত। মহাদেও পাঁড়ের পোষা পায়রার ঝাঁক উড়ে এসে ওই খেলার মাঠের ঘাসের উপরে হুটোপুটি করত।

ছি ছি, এ কেমন ভুল হল? কী কথা জিজ্ঞেস করলেন জ্যাঠামশাই; আর, কী কথাই না তাঁকে বলা হল!

মনে পড়েছে আত্রেয়ীর, চন্দ্রবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার হাতে ওটা কী? বলে দিলেই তো হত, ওটা এবাড়ির লতার ফুল; একটি মেয়ে নিজেই যেচে এই ফুল চেয়েছে।

জ্যাঠামশাই সত্যিই কি অনেকদূর চলে গিয়েছেন?

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বারান্দার উপর দাঁড়ায় আত্রেয়ী; তারপর, আরও ব্যস্ত হয়ে, বাগান থেকে নেমে আর সোজা হেঁটে, একেবারে ফটকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু এখানে এসে দাঁড়ালেই বা এদিকের আর ওদিকের রাস্তার কত দূরের কতটুকু দেখতে পাওয়া যায়? কিছুই না।

ফটকের মুখে তারের জাল লাগানো তিন কাঠের একটি বেড়া; যেমন ছোট তেমনই হালকা। আস্তে একটু ঠেলা দিতেই, যেন ছোঁয়া মাত্র খুলে গেল আর সরে গেল ফটকের এই তিন কাঠের বেড়া। হেসে ফেলে আত্রেয়ী। সত্যিই তো, ফটকটা একটু আশ্চর্য না হয়ে পারবে কেন? তিন বছর পরে এই প্রথম বাড়ির বাইরে যাবার জন্য ফটকের তিন-কাঠের বেড়াটাকে আত্রেয়ী আজ ছুঁয়েছে।

কোথায় জ্যাঠামশাই? একটি কম্বলের ওভারকোট মোষের শিঙের লাঠি দুলিয়ে চলে যাচ্ছে, এমন মূর্তি রাস্তার কোনও দিকেই দেখা যায় না।

কিন্তু মঞ্জু এলেই তো হয়। শ্রীলেখা কটেজও তো এখান থেকে এমন কিছু দূরের বাড়ি নয়। বেশ মেয়ে মঞ্জু; ওর প্রাণটা যেন আলো-বাতাসের সঙ্গে হেলে-দুলে আর নেচে নেচে বেড়াতে চাইছে। মাত্র একমাসের জন্যে এসেছে; হেসে-খেলে ফুল কুড়িয়ে, আর শালবনের হরিণ দেখে

হাততালি দিয়ে একদিন চলে যাবে। ভালই তো! হাওয়া-বদলের মানুষগুলিকে কেন যে এত নিন্দে করেন হাবুলকাকা আর দিবাকরদা, কোনও মানে হয় না।

খেলার মাঠের উপর মহাদেও পাঁড়ের পায়রার ঝাঁক উড়ছে। মাঠের ভেজা ঘাসের উপর রোদের আলো চিকচিকিয়ে জ্বলছে। শ্রীলেখা কটেজের মঞ্জু এল না; যদিও এই রাস্তা ধরেই হাওয়া-বদলের অনেক আগন্তুক মানুষ তিরছি নদীর দিকে বেড়াতে চলে গেল।

—আত্রেয়ী যে; পিছন দিক থেকে হেসে যেন একটি ঝলমলে খুশির বিস্ময় আত্রেয়ীকে ডাক দিয়েছে আর এগিয়ে আসছে। এসেছেন বীণাদি। কালীবাড়ি রোডে হাজারিবাগের গুপ্তবাবুদের যে হলদে রঙের বাড়িতে বাড়ি-তৈয়ারি ঠিকেদারির লোহালক্কড় থাকে, তারই বাইরের দিকের একটি ছোট ঘরে চারটি বেঞ্চ, একটি টেবিল ও একটি চেয়ার আছে। ওই, ওরই নাম হল অন্নদা কিণ্ডারগার্টেন। সরিয়াডির উপকারের জন্য গুপ্তবাবু তাঁর মা'র নামে একটি দানের ফাণ্ড করেছেন; সেই ফাণ্ড বীণাদিকে কুড়ি টাকা মাইনে দেয়। সরিয়াডির কে না চেনে বীণাদিকে? তিনি ওই অন্নদা কিণ্ডারগার্টেনের টিচার দিদি।

বীণাদি হাসেন।—যাক, দেখে খুশি হলাম তুমি নিজেই বেরিয়েছ; আমি ঠিক করেছিলাম, আমিই তোমাকে ঘরের বার করে ছাড়ব।

আত্রেয়ীও হাসে—বিনা দোষে কেন এত ধমকাচ্ছেন বীণাদি? আমি কি এখনও আপনার কিণ্ডারগার্টেনের মেয়েটি?

বীণাদি—একশো'বার। কী ভেবেছিস তুই, দমবন্ধ করে আত্মহত্যা করবি? আর,আমি তাই চুপ করে দেখব? তা হবে না।

—কিন্তু কী হবে তা হলে?

—সে কথাই বলতে এসেছি প্রদোষদাকে; ও প্রদোষদা? কোথায় আপনি? আমি বীণা।

দুই ক্রাচের উপর ভর দিয়ে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন প্রদোষ সরকার। খোঁড়া মানুষ প্রদোষ সরকারও যেন ছুটতে চাইছেন। দুই চোখে অদ্ভুত এক খুশির বিস্ময় উথলে উঠেছে। ফটকের বাইরে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে বীণা হাসছে; আত্রেয়ীও হাসছে; তিন বছর পরে সত্যিই যে সূর্য উঠেছে বলে মনে হচ্ছে।

বীণাদি বলেন—শুনে খুশি হবেন প্রদোষদা, আমার বিকাশ জামালপুরের কারখানায় চাকরি পেয়েছে। আর তো আমি আপনাদের সরিয়াডিতে পড়ে থাকতে পারি না, আমাকেও যেতে হচ্ছে। ছেলের কাছেই থাকতে হবে।

প্রদোষবাবু—কী সৌভাগ্য, বেঁচে থাক আপনার বিকাশ। বিকাশের আরও উন্নতি হোক।

বীণাদি—গুপ্তবাবু এসেছেন; আমি এখনি গিয়ে তাঁকে বলতে চাই, এবার আত্রেয়ীই অন্নদা কিণ্ডারগার্টেনের দিদি হবে। মাইনে কুড়ি টাকা; আমি যা পাচ্ছিলাম আত্রেয়ীকেও তাই দিতে হবে।

প্রদোষবাবু—বলুন, বলুন। আর আপনার ছাত্রীকেও একটু বুঝিয়ে বলুন।

আত্রেয়ী হাসে—আর বোঝাতে হবে না; কিন্তু আমার বিদ্যে তো সীতার বনবাস পর্যন্ত; আমি পারব?

বীণাদি—আমার বিদ্যে যে সাত ভাই চম্পা জাগোরে পর্যন্ত! আমি পারলুম কী করে? অন্নদা কিণ্ডারগার্টেনের জন্য এর চেয়ে বেশি লাগে না।

আত্রেয়ী—বেশ তো, এখন কী করতে হবে, বলুন? যেতে হবে?

বীণাদি—না; আজ তোমার নামে গুপ্তবাবুর চিঠি আসবে; কাল থেকেই কাজ শুরু করবে। গরমকালে সকালবেলায়, শীতকালে দুপুরে; রোজ তিন ঘণ্টা। চলি।.. তোর হাতে এটা কী?

বীণাদি হাঁটতে শুরু করেন।—বাঃ, আবার ফুলটুল ছুঁতে শুরু করেছিস তা হলে। খুব ভাল; রোজ ফুল তুলবি।

আত্রেয়ীও বীণাদির সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে কয়েক পা এগিয়ে যায়।—শ্রীলেখা কটেজ তো আপনার বাড়ি যেতেই পথে পড়বে।

—হ্যাঁ।

—আপনি যদি কষ্ট করে সে-বাড়ির মেয়েটিকে...

—কে? মঞ্জু?

—হ্যাঁ। আপনি চেনেন?

—খুব চিনি। আলাপ হয়েছে। নিখিলের বোন মঞ্জু। নিখিলের বউদি প্রীতি। নিখিলের দাদা অখিলবাবু। চা বাগান আছে, চা-বাগানের শেয়ার আছে। বেশ সুখী মানুষ ওরা। দুঃখের মধ্যে, শুধু বেচারা অখিলবাবুর স্বাস্থ্যটা। সরিয়াডির হাওয়াতে বাত সারবে বলে মনে হয় না।

আত্রেয়ী—মঞ্জু ফুল চেয়েছিল। বলেছিল, আসবে। কিন্তু এল না। তাই বলছিলাম...।

বীণাদি—আমাকে আর অত সৌজন্য করে বলতে হবে না। দে তোর ফুল, আমিই মঞ্জুর হাতে পৌঁছে দেব। তোকে ভাবতে হবে না।

চলে গেলেন বীণাদি। রাস্তার কিছুদূরে এগিয়ে যেয়েই মুখ ফিরিয়ে বলেন—মেয়েটাকে একটু ধমকে-টমকে দেব নাকি? কথা দিয়ে কথা রাখে না। এ কেমন অদ্ভুত মেয়ে?

আত্রেয়ী হাসে—না না, ওসব করবেন না। সবাই আপনার কিণ্ডারগার্টেনের ছাত্রী নয়।

বীণাদি—আমি কিন্তু চেঞ্জার মেয়েগুলোকেও ছেড়ে কথা বলি না। তোরাই যত লাই দিস।

গুপ্তবাবুর চিঠি এল সন্ধ্যাবেলা। আত্রেয়ীর জীবনে বাইরের কাজের এই মন-হাসানো পালা শুরু হল পরের দিন, ঠিক সকাল আটটায়। আত্রেয়ীদি অন্নদা কিণ্ডারগার্টেনের নতুন টিচারদিদি হয়েছেন একথা এরই মধ্যে শুনে ফেলেছে সন্তুটা। বই-এর ব্যাগ পিঠের উপর ঝুলিয়ে আর ঠিক সময় বুঝেই সন্তুটা এসে এবাড়ির ফটকের কাছে দাঁড়িয়েছে; চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছে—আত্রেয়ীদি; এসো।

আত্রেয়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে ছোট্ট সন্তু। পিঠের ওপর বইয়ের বোঝাটা খুব ছোট নয়; বেশ একটু কুঁজো হয়ে, নতুন জুতোর শব্দ মচ্‌মচ্‌ করে বাজিয়ে সন্তু যেন রুট মার্চের সোলজারের ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে। পকেট থেকে চট করে একটা মাউথ অরগ্যান বের করে মুখের কাছে তুলে ধরে আর তালে তালে গৎ বাজাতে থাকে সন্তু—আযা লেযা রাজা মামা। খাযা সোযা রেগা গামা!

আত্রেয়ীর মুখের হাসিটা অদ্ভুত হয়ে ছটফটিয়ে ওঠে।—আঃ কী করছ সন্তু?

বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে কাকিমাও হাসতে থাকেন।

রজনীধাম পার হয়ে বড় রাস্তার উপরে উঠে চলতে গিয়েই চমকে ওঠে আত্রেয়ী। পিছন থেকে একটা গাড়ির হর্ন খুব জোরে বেজে উঠেছে। রাস্তার এক পাশে সরে যায় আত্রেয়ী আর সন্তু। গাড়িটা কিন্তু আর স্পিড নেয় না; বেশ আস্তে আস্তে চলতে থাকে। গাড়ি চালাচ্ছেন যিনি, তিনি এক হাতে স্টিয়ারিংয়ের চাকা ধরে রেখে, আর একজোড়া অপলক চোখ তুলে আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

সন্তু ফিসফিস করে।—ফণী মিত্র, ক্যালকাটা।

জোরে স্পিড নিয়ে আর কাঁকরের গুঁড়ো উড়িয়ে ছুটে চলে গেল হুডখোলা গাড়িটা।

পরিপাটি প্লাস ফোর, খাঁটি সাহেবি সাজের একটি মানুষ বয়স চল্লিশের বেশি নয় বোধ হয়, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন, আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকালেন আর পাইপ ধরালেন।

সন্তু ফিসফিস করে।—জগৎ ব্যানার্জি, মিডনাপোর!

সন্তু না বলে দিলেও আত্রেয়ীর বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই, এরা, যাদের অপলক চোখের দৃষ্টি আত্রেয়ীকে একটা অদ্ভুত আবির্ভাব বলে মনে করছে, তারা সরিয়াডির কেউ নয়। এরকমের আরও অনেক বিস্ময়ের চাহনিকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে হল। যাচ্ছিলেন দু'জন তরুণী,

তাঁদেরই মধ্যে একজন চোখ টান করে আর আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেই ফেললেন—ইনি আবার কে?

লালপেড়ে ঘিয়ে রঙের শাড়ি; খোঁপাটা ঢিলে করে বাঁধা, গলায় শুধু সোনার একটা সরু সুত্‌লি চেন তার সঙ্গে জোড়ামুক্তোর একটা লকেট। পায়ে একজোড়া ফুলকারি চটি। এই তো সাজ। তবু আত্রেয়ীকে একটা রূপের বিদ্যুৎ বলে ওদের মনে হয়েছে, তা না হলে ওদের চোখের চাহনিতে আর মুখের ভাষায় বিস্ময়ের চমক ঝলসে উঠবে কেন?

অন্নদা কিণ্ডারগার্টেন। চারটি ছোট বেঞ্চিতে ত্রিশটা বাচ্চা ছেলেমেয়ের বসতে অসুবিধে আছে; কিন্তু ঘরের সামনে খোলা জমিটার উপর ছুটোছুটি করতে কোনও অসুবিধে নেই। যেমন চিনুর বয়সের মেয়ে আর সন্তুর বয়সের ছেলে আছে; তেমনই ওদের চেয়ে অনেক ছোটও কয়েকজন আছে। সন্তুর ব্যাগের ভিতর যেমন সেলেট, বই, লাট্টু, মার্বেলগুলির ডিবে আর কাঠের বাঘ; তেমনই বুলুর হাতে একেবারে কিছুই না, একটা সেলেটও না।

তিন ঘণ্টার আগেই কিন্ডারগার্টেনের কলরবের ক্লাস বন্ধ করে দিতে হল; নইলে বুলু ঘুমিয়ে পড়বে।

বাড়ি ফেরবার পথে সন্তু আর আত্রেয়ীর সঙ্গে নেই। সন্তু তার লাট্টু নিয়ে ব্যস্ত। কখনও অনেক পিছনে পড়ে থাকে, কখনও আবার ছুটে ছুটে এগিয়ে যায়।

বেলা হয়েছে। মাইকা কুঠির এগারোটার ঘণ্টা এখনও অবিশ্যি বাজেনি, কিন্তু সরিয়াডির রোদ বেশ তেতে উঠেছে।

কত নতুন মুখ। এ বছর হাওয়াবদলের লোক খুব বেশি এসেছে বলে মনে হচ্ছে। অনেক বেড়িয়ে এইবার ওরাও বাড়ি ফিরছে; চেষ্টা করে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা বাড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে এক-একটি ক্লান্ত আনন্দ।

আত্রেয়ীও তিন ঘণ্টার পর বাড়ি ফিরছে; আত্রেয়ীর সামান্য ক্লান্ত চেহারাটা তবু যেন একটা অটুট ফুল্লতা। আত্রেয়ীকে দেখে কয়েকটি যুবক বিস্ময়ের দৃষ্টিও তাই ক্লান্তি ভুলে গিয়ে চমকে ওঠে। শালবনের সবুজের দিকে, আর তিরছি নদীর জলের স্রোতের দিকে তাকাবার সময় ওদের চোখের ক্ষুধা আর তৃষ্ণাও বোধ হয় ঠিক এইরকম চমকে ওঠে। শুনতেও পায় আত্রেয়ী, একেবারে কাছে এসে পড়েছে যে কলরবের দল, তারই মধ্যে একটা কথা শব্দ করে হেসে উঠলো—সরিয়াডির মায়াহরিণী।

৬

একটি মাসও সময় লাগেনি, সরিয়াডির যত হাওয়া-বদলের অস্থায়ীরা যেটুকু জেনেছেন তাতেই বুঝে ফেলেছেন যে, এখানে স্থায়ীদের একটি বাড়িতে এক অসাধারণী আছেন, যাঁর সঙ্গে স্বামীর কোনও সম্পর্ক নেই। প্রদোষ সরকার নামে একজন স্থায়ী বাসিন্দা আছেন; গরিব মানুষ, তার উপর একটি পা নেই। মেয়ে আত্রেয়ী কিন্তু একুশ বছর বয়সের একটি অদ্ভুত সুন্দর চেহারা নিয়ে বারো বছর বয়সের খুকিটির মত হেসে খেলে ছুটোছুটি করেন, যদিও উনি কিণ্ডারগার্টেনের টিচারদিদি। জেলে আছে এই আত্রেয়ীর স্বামী; দেখাসাক্ষাৎ করেনও না। খোঁপাটাকে সব-সময় একটু উসকো খুসকো করে রাখেন, আর খুব সরু করে আঁকা গুঁড়ো সিঁদুরের একটা সিরসিরে দাগও সিঁথিতে থাকে; বাস, ওই পর্যন্ত।

সাবধান হয়েছে সরিয়াডির দিবাকর, আর বলাই নরেন ও পরেশ। দিবাকরের সন্দেহ, ওরা একটু বাড়াবাড়ি করবে বলে মনে হচ্ছে। আত্রেয়ী শেষে ভয় পেয়ে আর রাগ করে রাস্তায় বের হওয়াই বন্ধ করে দেয় বোধ হয়।

অস্থায়ী পাগলের ঘুষি খেয়ে কপালে কালশিরে পড়েছে যার, সেই নরেন ওই কালশিরের জন্যে একটুও দুঃখিত নয়। পাগলের ঘুসির আঘাত নরেনের মনে লাগেনি। কিন্তু ফণী মিত্রের

গাড়ির হর্ন যার শব্দ শুনে চমকে উঠে রাস্তার এক পাশে সরে গিয়েছে আত্রেয়ী, সেই হর্ন যেন সরিয়াডিকে অপমানিত করবার একটা দুঃসাহসের উল্লাস। দৃশ্যটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজেরই চোখে দেখতে পেয়েছিল নরেন।

নরেন বলে—আত্রেয়ীদি একবার বললেই তো পারেন। তারপর দেখে নেব, ফণী মিত্রের গাড়ির হর্ন, কেমন করে বাজে?

দিবাকর বলে—আত্রেয়ী অবিশ্যি ওদের ফষ্টিনষ্টিকে গ্রাহ্য করে না। একবার তাকিয়েও দেখে না। নিজের মনেই হাসতে হাসতে চলে যায়।

বলাই বলে—তাই ভাল; আত্রেয়ী ওদের ঘেন্না করে হেসে হেসেই উড়িয়ে দিক। ওরা ওতেই সব চেয়ে বেশি জব্দ হবে।

দিবাকর—তা তো হবে; কিন্তু ওদের আর একটু শক্ত শিক্ষা পাওয়া উচিত ছিল।

পরেশ—গোষ্ঠকাকা কী বললেন?

দিবাকর হেসে ফেলে। —গোষ্ঠকাকা বললেন, না, গোলমাল করবার কোনও দরকার নেই। আত্রেয়ী তো কণিকা ভরদ্বাজ নয়, টলমল স্বভাবের মেয়েও নয়।

অস্থায়ীরা সে খবর রাখে না; কিন্তু স্থায়ীদের কে না জানে যে, আত্রেয়ী একটি অটলতা। আত্রেয়ীর একুশ বছর বয়সের জীবনের সব ইতিহাস জানেন যাঁরা, যেমন চিনুর পিসিমা আর সন্তুর মা; তাঁরাও বলবেন, আত্রেয়ী একটি অটলতা।

খোঁড়া মানুষ প্রদোষ সরকার এক পায়ে হাঁটতে গিয়েও টলেন না। ষাট বছর বয়সের মানুষটির হাতের পেশিতে পুরনো জিমনাস্টিকের দান, সেই শক্ত-পোক্ত বাঁধুনি এখনও এমন কিছু নেতিয়ে পড়েনি। তাঁরই তো মেয়ে আত্রেয়ী। মেয়েটার ভাগ্যটাই হঠাৎ পড়ে গিয়ে একটু খোঁড়া হয়েছে, এই মাত্র। কিন্তু সেজন্যে আত্রেয়ীর প্রাণটাও টলে মলে যেখানে সেখানে যার-তার কাছে পড়ে যাবে, তেমন প্রাণই তৈরি করেনি আত্রেয়ী। আত্রেয়ীর কথা সরিয়াডির স্থায়ীদের জীবনের গল্পের আসরেও যেন একটা অটল গর্বের কথা।

কিন্তু একটি মাস পার হয়ে গেলেও দেখা যায়, হাওয়া-বদলের আনন্দের কয়েকটা গাড়ি প্রদোষ সরকারের বাড়ির সামনের ছোট রাস্তাতে বড় বেশি ছুটোছুটি করে। অন্নদা কিণ্ডারগার্টেনে সামনের রাস্তাতেও দু তিনটে জটলা মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে আর অনেক হাসাহাসি করে।

একটি গাড়ি একদিন সন্ধ্যায় প্রদোষ সরকারের বাড়ির সামনেই হঠাৎ থেমে যায়। গাড়ি থেকে নামেন যিনি, খাকি জিনের ব্রিচেস পরা আর হাতে রাইফেল, অল্পবয়সের এক শৌখিন শিকারি ভদ্রলোকের মূর্তি, তিনি চাকর রামুয়ার দিকে হাত নেড়ে ইশারা করেন—এক গেলাস জল।

ঘরের ভিতরে বসেই শুনতে পায় আর দেখতে পায় আত্রেয়ী, জল খেয়ে নিয়েই ভদ্রলোক কেমন যেন জড়ানো স্বরে রামুয়াকে বলেন—বাহবা বাহবা! সরিয়াডির জল! কোথায় লাগে হুইস্কি!

বিড়াল ছানা নিজের লেজের সঙ্গে খেলা করছে দেখতে পেয়ে চিনু যেমন চেঁচিয়ে হেসে উঠে, আত্রেয়ীর মুখেও তেমনই একটা হাসি চেঁচিয়ে উঠতে চায়। ভিতরের ঘরে গিয়ে কাকিমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলে আত্রেয়ী—এবার সরিয়াডিতে কত অদ্ভুত রকমের মানুষ এসেছে, কাকিমা।

আরও অদ্ভুত ব্যাপার; একদিন সকালবেলা অত বড় হাওয়াইয়ের নাগসাহেব নিজেই প্রদোষ সরকারের এই এত ছোট বাড়িতে হাজির হলেন। বারান্দার চেয়ারে বসা প্রদোষ সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ স্পষ্ট ভাষায় কয়েকটি কথা বললেন।—আমি শুনেছি, আপনি এখানকার খুব পুরনো লোক; আপনার অবস্থা ভাল নয়। আমার বাড়িতে রান্নার কাজের জন্য একটি মেয়ে চাই। কুড়ি টাকা মাইনে পাবে। কিন্তু চুরি-টুরির অভ্যেস যেন না থাকে।

প্রদোষবাবু ডাকেন—রামুয়া।

রামুয়া বলে—হ্যাঁ, রান্নার লোক পাওয়া যেতে পারে। লছমন ঠাকুর কাজ খুঁজছে।

—নো। নো লছমন ঠাকুর। গম্ভীর স্বরে রামুয়াকে ধমক দিলেন নাগসাহেব।

অপ্রসন্ন ভাবে প্রদোষ সরকারের কাটা পায়ের দিকে যেন সামান্য একটা ভ্রুক্ষেপ করেই চলে গেলেন নাগসাহেব।

মিডনাপোরের জগৎ ব্যানার্জি একদিন সকালে রজনীধামের কাছে রাস্তার উপরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। আত্রেয়ীকে দেখতে পেয়েই মাথার টুপি ছুঁয়ে সুপ্রভাত জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে বলেও ফেললেন—আপনার বাবার সঙ্গে একটু আলাপ করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কখন...।

আত্রেয়ী বলে—বাবা সব সময়েই বাড়িতে থাকেন। যখন ইচ্ছে হয় গেলেই দেখা পাবেন।

এগিয়ে যায় আত্রেয়ী। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হয়। সাইকেল থেকে নামছেন দিবাকরদা।

দিবাকরের চোখের ভঙ্গিটা বেশ শক্ত, আর বেশ শক্ত স্বরে যেন দাঁত চিবিয়ে কথা বলে দিবাকর—কী রে আত্রেয়ী? কেমন আছিস?

আত্রেয়ী হাসে—খুব ভাল আছি দিবাকরদা। বউদি কেমন আছেন?

—হঠাৎ দেখা হল বলে বউদির কথা জিজ্ঞেস করছিস, কেমন? গিয়ে দেখে এলি না তো একটি দিনও।

—যাব, নিশ্চয় যাব।

—আজকাল আর রাত জেগে সেলাই টেলাই করে না তোর বউদি। চোখে ভালই দেখতে পাচ্ছে। সে কথা থাক, আমি জানতে চাই, ওই সাহেবটিকে তুই চিনিস নাকি?

—না।

—লোকটা কী বললে তোকে?

—বাবার সঙ্গে আলাপ করতে চান?

—আচ্ছা! ঠিক আছে! যা, তুই তোর কিণ্ডারগার্টেন করগে যা। আমি চলি।

বিড়বিড় করে যেন একটা রাগ চাপতে চেষ্টা করেই সাইকেলে উঠে পড়ে দিবাকর।

গোষ্ঠবাবু বললেন—একটু ওয়াচ কর, বাস, আর বেশি কিছু করতে হবে না।

হাবুলবাবু বলেন—সামান্য কারণে গোলমাল বাধিও না, দিবাকর। অসহ্য হলে আত্রেয়ী নিজেই বলবে; তখন না হয়...।

পরেশ বলে—ওসব মতলবকে আত্রেয়ীদি নিজেই লাথি মেরে সরিয়ে দিতে জানেন।

সেকথা সবাই জানে, দিবাকর জানে। সেকথা সরিয়াডির প্রাণের একটি কঠিন ও অনাহত বিশ্বাস। তবু, দিবাকর মনে করে, আত্রেয়ীর মত মেয়ের সঙ্গে ওরকম ছোটলোকের মত ব্যবহার করা ওদের পক্ষে একটুও উচিত হচ্ছে না। একদিন, অন্তত একটিবার, অন্তত একজনকে একটু টিপুনি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেই ভালো হত; তাতে অন্যগুলোও সাবধান হয়ে যেত।

হাবুলবাবু বলেন—যা ভাল মনে কর, তাই করো। তবে তোমরাও বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলো না।

খেলার মাঠের উপর একদিন বিকেলের রোদে পাখা নরম করে নিয়ে মহাদেও পাঁড়ের পায়রার ঝাঁক যখন অলস ফূর্তির মত শুধু উসখুস করছে, তখন প্রদোষ সরকারের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে বেশ ব্যস্তভাবে চা খায় দিবাকর। —তোর বউদি অনেক করে বলেছে, একবার দেখা করে আসিস। গেলে লাউয়ের পায়েসও খেতে পাবি।

চা খেয়ে নিয়ে চলেই যাচ্ছিল দিবাকর, কিন্তু হঠাৎ শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হয়; হাওয়া বদলের একটি মানুষ বেশ প্রসন্নভাবে আত্রেয়ীদের বাড়ির ফটকের তিনকাঠের বেড়াটাকে এক ঠেলায় সরিয়ে দিয়ে, এই দিকেই আসছেন। না, আর চুপ করে থাকবার কোনও মানে হয় না। আত্রেয়ী বলুক আর না-ই বলুক, এই লোকটিকে একটু টিপুনি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সরিয়াডি তোমাদের ফূর্তির রেস্টুরেন্ট নয়।

বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ালেন আগন্তুক ভদ্রলোক। দিবাকরের দিকে একটা ভ্রুক্ষেপও করলেন না। সোজা আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বললেন আর হাসলেন—চিনতে পারছেন তো?

আত্রেয়ীর চোখ দুটোও যেন হঠাৎ বিস্ময়ে চমকে গিয়ে জ্বলজ্বল করে।—ও, আপনি? চিনেছি বইকি। বসুন।

হাত বাড়িয়ে চেয়ারের হাতলটাকে ছুঁয়ে আস্তে একটা টান দেয় আত্রেয়ী।

আগন্তুক বলে—মঞ্জুর বেশ একটা অসুখ গেল।

আত্রেয়ী বলে—তাই বলুন, আমি তো ভেবেই পাইনি, আসব বলেও মঞ্জুদি কেন আসতে পারলেন না।

—আসবার উপায় ছিল না মঞ্জুর। সেই ভোরেই তিনবার বমি করে শুয়ে রইল।

—আপনি তো একবার এসে খবরটা দিতে পারতেন।

—আমি? হ্যাঁ, আমি অবিশ্যি চেষ্টা করলে একবার আসতে পারতাম। যাই হোক, আপনার ফুল তো ঠিক সময়েই পেয়ে গেছি।

ভদ্রলোকের মুখের ঝকঝকে হাসির সঙ্গে তাঁর চশমার কাচও যেন ঝকঝক করে হাসতে থাকে।

আত্রেয়ী—মঞ্জুদির অসুখ শিগগির সেরে যাবে নিশ্চয়?

—হ্যাঁ, এখন সারবার দিকেই চলছে, কিন্তু ভয়ানক রেস্টলেস স্বভাবের মেয়ে তো। আপনাকে দেখবার জন্যে ছটফট করছে। কিন্তু আপনি কি যেতে পারবেন?

আত্রেয়ী—পারব বইকি। মঞ্জুদিকে বলবেন, আমি একদিন...।

—যদি কোনও অসুবিধে না থাকে, তবে এখনই চলুন না? আমার সঙ্গেই চলুন।

এইবার দিবাকরের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক আরও স্নিগ্ধ স্বরে কথা বলেন -আমি নিখিল সেন। দাদার অসুখ, তাই তাকে নিয়ে এখানে এসেছি। অন্তত দু'মাস থাকার ইচ্ছে। বউদি আর আমার বোন মঞ্জুর ইচ্ছে এখানে সারা বছরটাই থাকে, এই ক'দিনের মধ্যেই সরিয়াড়িকে ওদের এত ভাল লেগে গিয়েছে। আপনি বোধ হয়...।

আত্রেয়ী—ইনি দিবাকরদা।...আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনি আসছি।

ঘরের ভিতরে গিয়ে কাকিমাকে জিজ্ঞেস করে আত্রেয়ী—যাব?

কাকিমা—যা তা হলে; মেয়েটি যখন এত করে ডাকছে।

ঘরের বাইরে এসে নিখিলের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ী একটু ব্যস্তভাবেই বলে—চলুন।

নিখিল সেনের সঙ্গে হেঁটে যেতে যেতেই লতা থেকে পট পট করে কিছু ফুল তুলে নেয় আত্রেয়ী। তার পর আর দেরি হয় না। শ্রীলেখা কটেজের নিখিল সেন আর আত্রেয়ী যখন ফটক পার হয়ে রাস্তার অনেক দূরে চলে যায়, তখন একহাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে আর খুব আস্তে অস্তে হেঁটে হেঁটে দিবাকরও প্রদোষ সরকারের এই বাড়ির ফটক পার হয়ে চলে যায়।

৭

আত্রেয়ী বলে—আমারও এই কদিন ধরে প্রায় রোজই মঞ্জুদির কথা মনে পড়েছে।

নিখিল হাসে—সেটা তো বেশ বুঝতেই পারছি। তা না হলে কোথাকার কে মঞ্জু আপনাকে দেখবার জন্যে ছটফট করছে, শোনা মাত্র আপনিও তাকে দেখবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠবেন কেন?

আত্রেয়ী—মঞ্জুদি নিশ্চয় অনেক লেখাপড়া করেছেন?

নিখিল—তিনবার বি-এ ফেল করেছে; কিন্তু সেজন্যে ওর মনে কোনও আক্ষেপ বা লজ্জা-টজ্জা আছে বলে মনে হয় না।

আত্রেয়ী—ভালই তো।

নিখিল—তা একরকম ভালই।

রজনীধাম পার হয়ে বড় রাস্তায় উঠতেই আত্রেয়ী কুণ্ঠিতভাবে হাসে আর আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে।—আপনি একটু আস্তে হাঁটুন।

নিখিল—ও, হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমি খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছি; তাই না? কিন্তু আপনিও যেন একটু বেশি আস্তে হাঁটছেন।

আত্রেয়ী—হ্যাঁ, আমি ভুল করে...।

নিখিল—কী?

কুণ্ঠার হাসিকে জোর করে চাপতে চেষ্টা করে আত্রেয়ী, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। হাসিটা যেন ভাঙা ঢেউয়ের জলের শব্দের মত কলকল করে গড়িয়ে যেতে চায়।—তাড়াতাড়িতে ভুল করে ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়ে বের হয়ে পড়েছি।

নিখিলও চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।—বেশ করেছেন। এখন তা হলে খুব আস্তে আস্তেই হাঁটা যাক।

ঘোষ হাউসের দালানের ছায়া পার হয়ে, মায়া ভিলার রেলিংয়ের পাশ কাটিয়ে চলে যাবার পর নিখিল এইবার হাঁপ ছাড়ে আর হেসেও ফেলে—দেখছি, আস্তে আস্তে হাঁটাও কম সাংঘাতিক ব্যাপার নয়।

এইবার একটা ছোট মাঠ ডিঙিয়ে গেলেই হয়; তারপর শ্রীলেখা কটেজকে খুব কাছেই দেখতে পাওয়া যাবে।

আত্রেয়ী বলে—আমাদের চাকর রামুয়া ভুলেই গেছে কোথায় ওর দেশ।

নিখিল—আমাদের দশাও প্রায় তাই; শুধু শুনেছি দেশ হল পাবনা; কখনও চোখে দেখিনি। এখন আমরা কলকাতারই মানুষ।

না আর হাঁটতে হবে না। শ্রীলেখা কটেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে, এক হাতে একটা রুমাল দুলিয়ে, আর সেই সঙ্গে নিজেরও সারা শরীরটাকে দুলিয়ে হাসছে আর ডাকছে মঞ্জু—ওয়েলকাম আত্রেয়ী। ফার্স্ট লেডি অব সরিয়াডি; আসুন, আসন গ্রহণ করুন।

আত্রেয়ীকে হাত ধরে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল মঞ্জু।—ডাক্তার এখনও বাড়ির বাইরে যেতে অনুমতি দিচ্ছে না। তাই, বাধ্য হয়েই তোমাকে ডাকতে হল। তোমাকে না দেখে দেখে সত্যিই আমি হাঁপিয়ে উঠেছি, আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী—আপনি সেদিন...।

মঞ্জু—চুপ।

আত্রেয়ী—তুমি সেদিন সত্যিই এলে না দেখে বেশ ভাবনা হয়েছিল।

—কীসের ভাবনা?

—মনে হয়েছিল, চলেই গেল নাকি মঞ্জু।

—না, চলে যাইনি। দু'মাস পরেও যাব কিনা সন্দেহ।

আত্রেয়ীর চোখ আরও খুশি হয়ে হেসে ওঠে।—খুব ভাল হয় তা হলে। অন্ততঃ ছ'টা মাস থাকো। চিরকালই থেকে যাও না কেন?

শোনা যায়, পাশের ঘরে কে একজন ডাকছেন—প্রীতি, প্রীতি, কই তুমি? মেয়েটিকে একবার আমার কাছে নিয়ে এসো। আমিও একটু দেখি।

মঞ্জু বলে—বড়দা তোমাকে দেখতে চাইছেন।

প্রীতি বউদি এসে আত্রেয়ীকে ডাকেন—তুমি এক মিনিটের জন্য একটু ওঘরে চলো আত্রেয়ী; উনি তোমাকে দেখতে চাইছেন। বাতের রুগী, নিজে উঠে আসতে পারেন না।

দু'পায়ে উলের মোজা; চেয়ারের উপর বসে আছেন মঞ্জুর বড়দা অখিলবাবু। পা দুটো

সামনের একটা টুলের উপর তুলে রেখেছেন। আত্রেয়ী সামনে এসে দাঁড়াতেই অখিল বলেন—পা অচল হয়ে গেলে মানুষের যে কী কষ্ট; সেটা আমি মর্মে মর্মে বুঝতে পারি। হ্যাঁ, তোমার কথা বাণীদিদির কাছ থেকে সবই শুনেছি। হেসে খেলে খুশি হয়ে থাকো; কী আর করবে বল; আত্রেয়ীকে চা খাওয়াও, প্রীতি।

প্রীতি বউদি চা তৈরি করতে চলে যান। আত্রেয়ীকে নিয়ে মঞ্জুও চলে যায়। ঘরের ভিতরে গোলমাথা ছোট একটা টেবিল; সেই টেবিলের রেশমি ঢাকনার দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ীর চোখ দুটো কিছুক্ষণ অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে।—এ নিশ্চয় তোমার হাতের কাজ, মঞ্জু?

মঞ্জু—হ্যাঁ। কিন্তু এর মধ্যে এত আশ্চর্য হয়ে দেখবার কী আছে?

আত্রেয়ী—ঝালরটা কী করে এত চমৎকার হল, কী করেই বা লাগালে, বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে চাও?

—নিশ্চয়।

—এখনই?

—হ্যাঁ।

বুঝে নিতে পাঁচ মিনিটেরও বেশি সময় লাগে না আত্রেয়ীর। ঝালরটা জোড়া দেওয়া কোনও ব্যাপার নয়; কাপড়টারই বর্ডারের দশটা করে ঘরের সুতো তুলে নিয়ে একটা করে নট।

মঞ্জুর গলার মাফলারের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ী আবার চোখ বড় করে। মঞ্জু হাসে—বুঝতে পারছ, প্যাটার্নটা?

আত্রেয়ী—না, একটু গোলমেলে ঠেকছে।

মঞ্জু—আজ থাক; কাল বুঝিয়ে দেব।

আত্রেয়ী—এ ছাড়া আরও কিছু যদি...।

মঞ্জু—আছে আছে, অনেক আছে। আমার গান আছে; যেদিন খুশি সেদিনই শুনতে পাবে। এক টিন চকোলেট আছে, যখন ইচ্ছে তখনই খেতে পাবে। চারটে অ্যালবাম আছে, যখন মনে হবে তখনই দেখতে পাবে। এত ঘুষ কবুল করছি; সত্যি রোজ একবার এসো কিন্তু, আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী হাসে—আসব বইকি; কিন্তু এত শেখা দেখা শোনা আর এক টিন চকোলেট খাওয়া কি ছ'মাসেও ফুরোবে?

মঞ্জু—না ফুরোলে আরও ছ'মাস থাকব। না হয়, ছ'মাস পরে আবার আসব।

প্রীতি বউদি চা নিয়ে ঘরে ঢোকেন। মঞ্জু বলে—বিপদে পড়েছি আমি। বউদি তো বাইরে বের হতেই চান না আর...।

প্রীতি বউদি—তুমিই বল আত্রেয়ী, পঙ্গু মানুষকে ঘরে ফেলে রেখে আমি কি করে বাইরে ধেই ধেই করে বেড়াই?

মঞ্জু—ইনি বেড়াবেন না; আর মেজদা যদিও বা কখনও বেড়াতে বের হন, তবে আমাকে সঙ্গে নেবেন না।

আত্রেয়ী—কেন?

মঞ্জু—আমার অপরাধ, আমি বেশি কথা বলি।

প্রীতি বউদি—আমি তো কতবার বলেছি, কারও সঙ্গে যাবার দরকার নেই, তুমি একা নিজেই রোজ একটু বেড়িয়ে এলেই পার।

মঞ্জু—আমিও তো তোমাকে কতবার বলেছি বউদি, সেটা সম্ভবই নয়। আমি কারও সঙ্গে কথা না বলে বলে বেড়াতেই পারি না। বুঝলে আত্রেয়ী, এই হল আমার বিপদ। কিন্তু তোমাকে পেয়ে মনে হচ্ছে বিপদ কেটে গেল। রোজ একবার তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ধানোয়ার রোড ধরে...।

আত্রেয়ী—বেশ তো, আমারও অসুবিধের কী আছে? সকালবেলার দিকে অবিশ্যি...।

মঞ্জু—জানি, সকালবেলা তোমার কিণ্ডারগার্টেন আছে। কিন্তু দুপুর বিকেল আর সন্ধ্যা তো আছে। তা ছাড়া ভোর আছে, গোধূলি আছে, কোকিলডাকা রাত আছে। বেড়ালেই তো হল। চার প্যাকেট চকোলেট সঙ্গে নিয়ে...।

প্রীতি বউদি—এই তো! তুমি এত কথা বলেই তো মানুষকে ভয় পাইয়ে দাও।

আত্রেয়ী—আমি একটুও ভয় পাইনি বউদি। আপনি মঞ্জুকে বকবেন না। ...আজ এখন আসি তবে, বউদি। আসি মঞ্জু।

গল্প করতে করতেই চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে আত্রেয়ীর; মঞ্জুর সঙ্গে অনেক চেনা-শোনাও হয়ে গেল। আজকের মত এখন এখানেই একটি খুশির হাসি রেখে দিয়ে আর একটি খুশির হাসি মুখে নিয়ে চলে যেতে চায় আত্রেয়ী। প্রীতি বউদিও বলেন—আচ্ছা, এস তবে।

কিন্তু আরও একটু দেরি করতে হল। মঞ্জুর সঙ্গে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে এসেই দেখতে পায় আত্রেয়ী, মঞ্জুর মেজদা নিখিলবাবু দু'হাতে তিন চারটে কাগজের ঠোঙা আর প্যাকেট হাতে নিয়ে ব্যস্তভাবে হেঁটে আসছেন। এরই মধ্যে কোথায় গিয়েছিলেন নিখিলবাবু? বাজারে? কিসের জন্যে?

আত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে নিখিল বলে—এ কি, আপনি এরই মধ্যে চলে যাচ্ছেন যে!

মঞ্জু—এ সব কী নিয়ে এলে মেজদা?

নিখিল—কিছু ফল আর খাবার।

মঞ্জু—কেন?

নিখিল—কেন মানে কী? বুঝিয়ে বলতে হবে? তোর কমনসেন্সে কী বলে?

মঞ্জু—কিন্তু আমাদের একটু বলে যেতে হয়। আমরা জানব কী করে যে, তুমি খাবার আনতে বের হয়েছ? আমরা আত্রেয়ীকে চা জেলি আর ডালমুট খাইয়ে দিয়েছি।

নিখিল—তবে কি এসব জিনিস ফেলা যাবে?

গোলমাল শুনে ঘরের ভিতর থেকে প্রীতি বউদি বের হয়ে আসেন।—ফেলা যাবে কেন, থাকবে; কেউ না কেউ খাবেই।

নিখিল—ঠিক আছে; খেও তোমরা। কিন্তু সেটাও একরকম ফেলে দেওয়াই হল।

মঞ্জু এইবার আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে।—আত্রেয়ী, বিপদ থেকে বাঁচাও। একটু বসো; কিছু খেয়ে যাও।

আত্রেয়ীকে আরও পনেরো মিনিট বসতে হল। নতুন করে খাবারও খেতে হল। আর মন-প্রাণ খোলা এক অদ্ভুত মেজাজের মানুষের একটা অদ্ভুত কথাও কানে শুনতে হল। পাশের ঘর থেকে নিখিলবাবু চেঁচিয়ে বলছেন।—তালশাঁসটা ভাল করে ধুয়ে নিও, বউদি।

এ ঘরে প্রীতি বউদি ফিসফিস করেন।—এমন তালশাঁস আমি জীবনে দেখিনি। যেমন শক্ত, তেমনই নোংরা আর তেমনই...। খাবে নাকি আত্রেয়ী?

না, আর দেরি হয় না। দেরি হবার আর কোনও কারণ নেই। শ্রীলেখা কটেজের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে মঞ্জু; মায়া ভিলার রেলিংয়ের লতাবীথির কাছ ঘেঁষে ঘেঁষে চলে যাচ্ছে আত্রেয়ী। তারপর আর দেখা যায় না; বাঁ দিকের রাস্তাটাতে হঠাৎ ঘুরে গিয়েছে আত্রেয়ী।

রাস্তা ঘুরতে গিয়েই আত্রেয়ীর এই এক মনে পথ চলার ব্যস্ততা হঠাৎ একটা শব্দের আঘাত পেয়ে চমকে ওঠে। সরিয়াডির নীরবতার বুকের ভিতর থেকে হো হো করে অদ্ভুত স্বরের একটা হল্লা ছুটে বের হয়েছে।

তাই তো! এ পাড়াতে এসে এ আবার কী কাণ্ড করছে সন্তুটা? একদল বাচ্চা ছেলেমেয়ে, সবার আগে সন্তু। রাস্তার পাশের নালাটার দিকে ঢেলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটছে আর চেঁচাচ্ছে সন্তু—মার মার মার।

সন্তুর ওই কচি চোখে-মুখে কী কঠিন আক্রোশ।—কী করছ সন্তু? ডাক দেয় আত্রেয়ী।

—চোর, চোর, পালিয়ে যাচ্ছে, সরে পড়তে চেষ্টা করছে। বলতে বলতে আর ঢেলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটতে থাকে সন্তু; আত্রেয়ীর কথার শব্দ সন্তুর কানে পৌঁছেছে বলে মনে হয় না।

সেই মুহূর্তে, সন্তুর আক্রোশের হেতুটাকে হঠাৎ চোখে দেখতে পেয়েই হেসে ওঠে আত্রেয়ী। এই ব্যাপার? এর জন্যে সন্তুর এত রাগ? নালার জল থেকে ছোট্ট একটা পুঁটি মাছকে তুলে নিয়ে একটা ঢোঁড়া সাপ ছটফটিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সন্তু ওকে পালাতে দেবে না।

সন্তুকে আর মানা করে লাভ নেই। ডাকলেও ক্ষান্ত হবে না সন্তু। ঢোঁড়াটাকে তাড়া করে সন্তু আর বাচ্চাদের দল ছুটেই চলেছে।

সন্ধ্যে হতে এখনও বেশ দেরি আছে। ছেঁড়া চটির জন্যে তাড়াতাড়ি হাঁটা যায় না। দরকারও নেই। নয়াপাড়ার রাস্তা ধরে একটু ঘুরে গেলেও চলতে পারে।

পটলবাবুর বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই আত্রেয়ীর খুশি চোখের দৃষ্টিটা আবার চমকে ওঠে। কী হল পটলকাকার?

মস্ত বড় একটা লাঠি হাতে করে বাড়ির বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, আর গেটের কাছে ছুটে এসে মেহেদির বেড়াটার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইলেন পটলবাবু। আদুড় গা, গামছা-পরা পটলবাবুর হাতের লাঠিটা যেন কারও মাথায় বাড়ি দেবার জন্য ছটফট করছে।

আত্রেয়ীকে দেখতে পেয়েই কথা বলেন পটলবাবু।—কেমন আছিস আত্রেয়ী?

আত্রেয়ী—ভাল।

পটলবাবু—কিন্তু...।

মেহেদির বেড়ার পাতার ফাঁকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে পটলবাবুর চোখের রাগ তেমনই কটমট করে কাকে যেন খুঁজতে থাকে।—যখন-তখন খক্‌খক্ খক্‌খক্। এ শালা তক্ষক কাশছে না হাসছে, কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু আমি এটাকে না মেরে...।

লাঠিটাকে বাগিয়ে ধরে আবার এক লাফে মেহেদির বেড়ার ওদিকে চলে গেলেন পটলবাবু।

হেসে ফেলার ভয়ে শাড়ির আঁচলের একটা কোণ মুখের কাছে তুলে ধরে আত্রেয়ী মুখের হাসিটা কোনওমতে চাপা পড়লেও চোখের হাসিটা উথলে উঠতে থাকে।

আত্রেয়ী—চলি পটলকাকা, কাকিমা এখন বোধ হয়...।

পটলবাবু—কাকিমার এখন ছেলে হবে। পরে একদিন আসিস। হোই হোই হোই। তক্ষক মারবার জন্যে মেহেদির বেড়ার উপর লাঠি তুলে দৌড়াতে থাকেন পটলবাবু।

বাড়ির কাছে এসেই আস্তে একটা ক্লান্তির হাঁপ ছাড়ে আত্রেয়ী, কিন্তু চোখের আর মুখের হাসিতে একটুও ক্লান্তি নেই। দেখতে পায় আত্রেয়ী কাকিমা বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আছেন।

কাকিমা বলেন—এত দেরি হল যে!

আত্রেয়ী—দেরি? দেরি কোথায় দেখলে। যা ভেবেছিলাম কাকিমা, মঞ্জুরা সবাই সত্যিই খুব ভাল।

৮

কত গান তো হল গাওয়া। শ্রীলেখা কটেজে প্রায় রোজই আসে আত্রেয়ী; মঞ্জুও গান শোনাতে ভুলে যায় না। আর আত্রেয়ীও গান শুনে এমন মুগ্ধ হয়ে যায় যে, চোখের পাতা যেন ঘুম-ঘুম আবেশে ভারি হয়ে আসে।

মঞ্জু হাসে—না, আর নয়। ঘরের ভিতরে ঠুঁটো হয়ে বসে আর গাইতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু বুঝতে পারছি না, আর কতকাল রইব বসে।

আত্রেয়ী—ডাক্তারকে বলেছ?

হ্যাঁ, অনেকবার ডাক্তারকে বলেছে মঞ্জু—আর মিছে কত পথ চাওয়াবেন ডাক্তারবাবু, আমার পায়ে যে মরচে ধরে গেল। বাইরে বের হব কবে?

মঞ্জুর ছটফটে ভাষার কথা শুনে হেসে ফেলেছেন বুড়োমানুষ মল্লিক ডাক্তার। —আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরো মা।

মনের অনেক জোর খাটিয়ে ধৈর্য ধরে রাখতে চেষ্টা করছে মঞ্জু। কিন্তু আত্রেয়ীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে এই ধৈর্যের ভাষাটা যেন হতাশ হয়ে যায়।—কবে যে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বের হব? কবে যে তিরছি নদীর ধারে একটি পাথরের ওপরে দুজনে বসে থাকব?

ওঘরে বড়দা বসে থাকেন; বারান্দায় মেজদা ঘুরে বেড়ান, আর প্রীতি বৌদি তো যখন-তখন এঘরে আসছেন, আত্রেয়ীর সঙ্গে নিরিবিলি দুটো কথা বলতে অনেক অসুবিধে আছে।

একবার মঞ্জুকে অনুমতি দিয়ে ফেলুন ডাক্তার মল্লিক; তারপর আত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে একদিন বের হতে হবে। ধানোয়ার রোড ধরে হেঁটে যতদূর খুশি এগিয়ে যেতে হবে। রোদ যদি বেশি কড়া হয়, তবে একটি শালের ছায়াতে বসতে হবে। জায়গাটি বেশ নিরিবিলি হবে, কাছে কেউ থাকবে না। শুধু দু' একটা তিতির উড়বে ফুরফুর করে, আর ঘাসের বীজের দানা খুঁটে খুঁটে খাবে। তখন আর আত্রেয়ীকে না বলে থাকতে পারবে না মঞ্জু; আমার এই ছটফটে খুশির শরীরের এক জায়গায় একটি চমৎকার টিউমার আছে, আত্রেয়ী, কিন্তু সে এখনও জানে না; সে বেচারা আশা করে আছে যে, একদিন আমি তার কাছে যাব। কিন্তু তা তো সম্ভব নয় আত্রেয়ী। তার সঙ্গে আমার বিয়ে হলেও তাকে ঠকতে হবে। তার কোনও লাভ হবে না।

হ্যাঁ, অপারেশন হতে পারে। ডাক্তার বলেছেন, একদিন তাই করতেও হবে। কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করে শুনতে পেয়েছি আত্রেয়ী, সেই অপারেশন আমার টিউমার তুলতে গিয়ে আমার প্রাণটাকেই শেষ করে দিতে পারে। কাজেই, এখন বুঝতে পারছ তো আত্রেয়ী, আমার এদিক-ওদিক কোনওদিকই নেই।

তা একরকমের মন্দ নয় আত্রেয়ী। এখন টিউমারটাই আমার ভরসা। যতদিন এটা আছে, ততদিন সে বেচারাকে মাঝে মাঝে দেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

হঠাৎ একদিন, যেদিন আত্রেয়ী ঠিক দুপুরবেলা শ্রীলেখা কটেজে এসে আর সামান্য কিছুক্ষণ মঞ্জুর সঙ্গে গল্প করেই চলে গেল, সেদিন মঞ্জুর মেজদা নিখিলও বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে মঞ্জুর কাছে একটা আক্ষেপের কথা বলেছে—তোর ডাক্তার শুধু তোকে নয়, এই মহিলাকেও বেশ জব্দ করে রেখেছে।

মঞ্জু—আত্রেয়ীর কথা বলছ?

নিখিল—হ্যাঁ।

মঞ্জু—আত্রেয়ীর জব্দ হবার কী হল?

নিখিল—হল না? মহিলা তোর সঙ্গে বেড়াবার ইচ্ছে নিয়ে রোজই আসছেন, অথচ তোকে এখনও বাইরে বের হবার অনুমতি দিচ্ছেন না ডাক্তার। মহিলাকেও ফিরে যেতে হচ্ছে। কিন্তু এই মহিলারও তো এখন একটু হেসে-খেলে বেড়ানো দরকার ছিল।

ঠিকই বলেছে নিখিল। বীণাদির কাছ থেকে আত্রেয়ীর জীবনের দুঃখের কাহিনী শুনতে পাওয়া গিয়েছে; তাতে তো এই কথাই মনে হবে যে, শুধু একটা করুণ রিক্ততা হয়ে ঘরের কোণে পড়ে না থেকে, বাইরের আলো-বাতাসের সঙ্গে একটু মেলা-মেশা করা উচিত আত্রেয়ীর।

মনে মনে ঠিক করেই রেখেছে মঞ্জু, এইবার আত্রেয়ীকে বেশ একটু মিনতি করে আর বুঝিয়ে বলতে হবে—তুমিও আমার মত একটু ধৈর্য ধরে রাখো, আত্রেয়ী।

আজ রবিবার। সকাল বেলার চায়ের পালা শেষ হবার পর প্রীতি বউদি এখন বড়দার কাছে বসে গল্প করছেন। আজ আত্রেয়ীর কিণ্ডারগার্টেন নেই। সময় হয়ে এল, আর কিছুক্ষণ পরে আত্রেয়ী আসবে।

ঘরের ভিতরে বসেই বাইরের বারান্দায় একটা হর্ষের শব্দ শুনে চমকে ওঠে মঞ্জু, ঠিকই, আত্রেয়ী এসেছে। মেজদার সঙ্গে কথা বলছে আত্রেয়ী।—আপনি কোথাও বের হচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে।

নিখিল বলছে—জিজ্ঞেস করি; আপনার কি বেড়াতে টেড়াতে একটুও ইচ্ছে করে না।

আত্রেয়ী—খুব ইচ্ছে করে।

নিখিল—তলে চলুন, আমিই আপনাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

আত্রেয়ী—কোথায় যাবেন?

নিখিল—তারও কি কোনও ঠিক আছে? যেদিকে চোখ যায় সেদিকে যাব।

আত্রেয়ী হাসে—আপনি কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি হাঁটেন।

নিখিল—খুব আস্তে আস্তে হাঁটব।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে মঞ্জু—কোথায় চললে, মেজদা?

নিখিল—ঠিক নেই। ধানোয়ার রোড হতে পারে, তিরছি নদীও হতে পারে, শালবনও হতে পারে।

মঞ্জু—আত্রেয়ীকে সঙ্গে টানছ কেন?

নিখিল—ইচ্ছে হল। হ্যাঁ, উনি যদি হাঁটতে ভয় পান, তবে অন্য কথা।

মঞ্জু হাসে—আত্রেয়ী কী বলে?

আত্রেয়ী—হাঁটতে ভয় পাই না। কিন্তু...।

মঞ্জু—কী?

আত্রেয়ীর চোখের দৃষ্টিটা যেন কাঁচুমাচু হয়ে অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে।—আমার কেমন যেন লাগছে।

মঞ্জু হেসে ফেলে—তার মানে?

আত্রেয়ী—লজ্জা করছে।

হেসে ফেলে নিখিল—এমন লজ্জার কোনও মানে হয় না। তা ছাড়া, আমার সঙ্গে লজ্জা করবার আরও মানে হয় না।

নিখিলের গলার স্বরে এক অসাধারণ শান্ত ও বলিষ্ঠের করুণাকোমল মনটাই হেসে ফেলেছে। মানুষ চিনতে পারে, তাই নিখিলের অনুরোধের মনটাকে চিনতে পারছে না আত্রেয়ী। ছোট শহর সরিয়াডির মনই বোধ হয় যত ছোট ছোট ভয়ে ভরা মন; তা না হলে বুঝতে পারত আত্রেয়ী; নিখিলের জীবনের কোনও ইচ্ছার জন্যে নয়, আত্রেয়ীরই দুঃখের জীবনের জন্য একটা সমবেদনার ব্যাকুলতা আত্রেয়ীকে বেড়াতে যেতে ডাকছে।

বলেই ফেলে নিখিল—আমি আমার কোনও সুবিধের জন্য নয়; আপনারই...।

আত্রেয়ী—বুঝেছি; আপনি আর কিছু বলবেন না। চলুন। আসি মঞ্জু।

মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে গিয়ে আত্রেয়ীর এই মিথ্যে লজ্জা কুণ্ঠিত চোখের হাসিটাও এইবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মঞ্জু বলে—এসো।

নিখিলের সঙ্গে আত্রেয়ী, শ্রীলেখা কটেজের গেট পার হয়ে আর মাঠের পথ ধরে দু'জনে চলে যাচ্ছে; বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর স্তব্ধ দুটো চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকে মঞ্জু। সেদিনও তো এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিখিল আর আত্রেয়ীকে একসঙ্গে হেঁটে এই বাড়ির গেটে ঢুকতে দেখেছিল

; কিন্তু সেদিন মঞ্জুর চোখে এরকমের স্তব্ধতা ছিল না। মঞ্জুর চোখ হেসে হেসে নেচে উঠেছিল।

প্রীতি বউদি ডাক দিয়ে বলেন—ওরা দুজনে সত্যিই কি বেড়াতে বের হল, মঞ্জু?

—হ্যাঁ, বউদি।

অখিলবাবু বলেন—কে? কে? কারা দুজন বেড়াতে গেল?

প্রীতি বউদি—তোমার ভাই আর আত্রেয়ী।

অখিলবাবু—কেন? এর মানে কী?

প্রীতি বউদি—মানে আবার কী হবে?

অখিলবাবু—এসব অভ্যেস তো নিখিলের নেই। ও যে একা বেড়াতে আর একা থাকতেই ভালবাসে।

প্রীতি বউদি—সে জন্যেই তো বলছি, কোনও মানে হয় না।

মঞ্জু এসে বলে—মেজদা বোধ হয় রাগ করেই এই কাণ্ডটা করল?

প্রীতি বউদি—কীসের রাগ? কার ওপর রাগ?

মঞ্জু—আমার ওপর। ডাক্তার আমাকে বাইরে যেতে দিচ্ছে না বলে আমিও আত্রেয়ীকে সব সময় এখানে আটকে রাখছি।

প্রীতি বউদি—কিন্তু সেজন্যে আত্রেয়ী তো কিছু মনে করেনি।

মঞ্জু—না; আত্রেয়ী মনে করেনি।

প্রীতি বউদি—তবে? তবু বেড়াতে যাবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠল কেন আত্রেয়ী?

অখিলবাবু—ঠিকই বলেছ, কোনও মানে হয় না।

প্রীতি বউদি—নিখিলকে জানি, ওর ব্যস্ত হওয়া আর না হওয়া দুই-ই সমান।

কিন্তু আত্রেয়ীর এত ব্যস্ত না হলেই ভাল ছিল।

চুপ করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবেন প্রীতি বউদি—মেয়েটার জন্যে একটু মায়া হয় বলেই বলছি। তুমি শোন মঞ্জু, ডাক্তার বলুক আর না বলুক, তুমিই আত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে কাছাকাছি একটু ঘুরে-ফিরে আসবে।

মঞ্জু—আমিও তাই ভাবছি।

ঘরের ভিতরে একটি চেয়ারে চুপ করে বসে থাকে মঞ্জু। চোখে পড়ে উলের প্যাকেট আর এক জোড়া কাঁটা গোলমাথা ছোট টেবিলের উপরে পড়ে আছে। কথা ছিল, উলের ব্লাউজের গলার একটা নতুন ডিজাইনের ঘরগুলো আজ ভাল করে বুঝে নেবে আত্রেয়ী।

এখানে বসেই দেখতে পাওয়া যায়, নিখিলের ঘরের টেবিলে একগাদা কাগজপত্র এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত লেখালেখি করে শেয়ারের যত পাওনা ডিভিডেন্ডের হিসাব করেছে নিখিল। কথা ছিল, এজেন্ট অফিসের নামে তাগিদের যত রিমাইন্ডার ডাকে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু ভুল হবে না মেজদার। ঠিক সময়েই চিঠিগুলিকে ডাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে। মেজদা ভুল করে না। মেজদার ভুল হয় না। কিন্তু আত্রেয়ী কি...।

—আমার ভয়ানক বিচ্ছিরি লাগছে, বউদি। থার্মোমিটারটা দাও, টেম্পারেচার হয়েছে মনে হচ্ছে।

মঞ্জুর এই ব্যস্ততার ডাকের মধ্যে যেন একটা করুণ বিষাদের গুঞ্জন আছে।

প্রীতি বউদি থার্মোমিটার দিয়ে গেলেন। থার্মোমিটার কিন্তু বুঝিয়ে দেয়, কিছুই হয়নি।

বেশ তো, কিছুই হয়নি, হতে পারে না, হবেও না। তবু বেচারা আত্রেয়ীকে একটু বুঝিয়ে দিলেই বোধহয় ভাল হয়।

৯

ধুলো উড়িয়ে পর পর তিনটে মোটর লরি ছুটে আসছে। রাস্তার এক পাশে সরে দাঁড়ায় নিখিল আর আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী বলে—বুঝতে পারলেন, মোটর লরিগুলো কী জিনিস বয়ে নিয়ে যাচ্ছে?

নিখিল—না।

আত্রেয়ী—ওদিকে কয়েকটা অভ্রের খাদ আছে। ওর মধ্যে একটা খাদ গোষ্ঠকাকার; আমি অনেকদিন আগে একবার খাদ দেখতে গিয়েছিলাম।

নিখিল—খাদের ভেতরে নেমেছিলেন?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ। খাদের কাজ দেখতে একটু ভয় ভয় করে ঠিকই, কিন্তু এক-একটা আওয়াজের পর যখন ফাটা পাথর ঝুপ করে পড়ে যায়, আর অভ্রের টিক্‌রি ঝিকঝিক করে ওঠে, তখন, সত্যিই হাততালি দিয়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করে।

নিখিল—আপনিও তা হলে হাততালি দিয়ে হেসেছিলেন?

আত্রেয়ী—নিশ্চয়। শুধু আমি কেন? জয়া মাসিমা, বীণাদি, নয়াপাড়ার জেঠিমা, সবাই।

সড়কের পাশের ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে নিখিল বলে—ক্ষেতের জলে কিলবিল করছে, এগুলো কোনও ছোটজাতের মাছ বোধ হয়।

আত্রেয়ী—ব্যাঙাচি নয় তো?

নিখিল হাসে—না; ব্যাঙাচি আমি চিনি।

আত্রেয়ী—ক'দিন আগে নয়াপাড়ার নালাতে কোথায় পুঁটি মাছ চলে এসেছিল।

নিখিল—গত বর্ষার সময় আমাদের চা বাগানের নালাতে প্রকাণ্ড একটা বান মাছ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। কুলিরা ওটাকে অজগর মনে করে ধরতেই সাহস করেনি। শেষে গুলি করে মারা হল।

আত্রেয়ী—আপনি শিকার করেন?

নিখিল—না; কেন জানি না, ওটা আমার একটুও পছন্দ হয় না।

আত্রেয়ী—আমারও। জয়ন্তকাকা মস্তবড় একটা বাঘ মেরেছিলেন। চকচকে গা, লম্বা ডোরা, বাঘটা দেখতে সত্যিই খুব...।

নিখিল হাসে—খুব সুন্দর?

আত্রেয়ী—সত্যিই খুব সুন্দর ছিল। দেখলে আপনিও তাই বলতেন।

নিখিল—তারপর কী হল? মরা বাঘ দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন?

আত্রেয়ী—না; কিন্তু জয়ন্তকাকাকে দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছিলাম।

—কী বলেছিলেন?

—যা বলা উচিত, তাই বলেছিলাম। জঙ্গলের বাঘ জঙ্গলে ছিল, তাকে মারবার কী দরকার ছিল?

নিখিল—কথাটা ভালই বলেছিলেন।

একটা বুড়ো বট গাছ, অনেক জটার ঝুরি ঝুলে রয়েছে। পাকা বটফল রাস্তার উপর ছড়িয়ে রয়েছে। আত্রেয়ী বলে—সন্ধ্যে হলেই এই বট গাছটা বাদুড়ে ভরে যায়।

নিখিল—তা'ও দেখেছেন।

আত্রেয়ী—দেখব না? কতবার বিকেলবেলা এদিকে বেড়াতে এসেছি। ফিরতে সন্ধ্যে হয়েছে; তখন দেখেছি, কালো কালো বাদুড় উড়ে আসছে অর ঝুপ ঝুপ করে গাছের মাথার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে।

একটু চুপ করে থেকেই হেসে ফেলে আত্রেয়ী—আমাদের রামুয়া একটা বাদুড়।

নিখিল—তার মানে?

আত্রেয়ী—রামুয়া পাকা বটফল খায়।
নিখিল—আমি তা হলে কুমীর।
আত্রেয়ী—তার মানে?
নিখিল—আমি মাছ খাই, কুমীরেও মাছ খায়।
আত্রেয়ী—কুমীর কিন্তু মাছ রান্না করে খায় না।
মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা করে আত্রেয়ী। নিখিল বলে—হেসেই ফেলুন না কেন?
আত্রেয়ী—এদিকে আর কতদূর যাবেন?
নিখিল—বলুন তবে, কোন দিকে গেলে ভাল হয়।
আত্রেয়ী—কোনওদিকে নয়, এখানেই দাঁড়ালে অনেক কিছু দেখতে পাবেন।
আত্রেয়ী হাত তুলে দেখিয়ে দিতে থাকে—ওই দেখুন, পরেশনাথকে কত কাছে মনে হচ্ছে। কিন্তু সত্যিই তো কাছে নয়। এখান থেকে একুশ মাইল।
নিখিল—জঙ্গলের মধ্যে ওটা একটা গির্জা বলে মনে হচ্ছে?
আত্রেয়ী—হ্যাঁ; ওখানে এক বুড়ো ফাদার থাকেন; আমরা বড়দিনের সময় কতবার ওখানে গিয়েছি। ফাদার খুব খুশি হয়ে আমাদের প্রত্যেককে একটা করে কমলালেবু দিতেন।
নিখিল—কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে?
আত্রেয়ী—বলুন তো, কিসের শব্দ?
নিখিল—বুঝতে পারছি না।
আত্রেয়ী—ওই যে দূরে, মাঠের উপর গরু চরছে দেখছেন, ওখান থেকেই এই শব্দ বাতাসে ভেসে আসছে। গরুর গলার কাঠের ঘণ্টার শব্দ।
নিখিল হাসে—তাই বলুন; আমি ভাবলাম, কোথাও যেন একগাদা ডুগডুগি একসঙ্গে গড়াগড়ি দিচ্ছে।
লাঠি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে এসে একটা বুড়ো ভিখিরী নিখিল আর আত্রেয়ীর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।
আত্রেয়ী বলে—কেমন আছ জিতু?
ভিখিরী বুড়ো হাত তুলে কথা বলে—জিন্দা হ্যায়, দিদি।
নিখিলের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ী বলে—ওঃ, কতদিন পরে জিতু বুড়োকে দেখলাম।
নিখিল—কতদিন পরে?
আত্রেয়ী—অন্তত তিন বছর হবে।
নিখিল—বুড়ো বোধ হয় আপনার কাছে কিছু চাইছে।
চমকে ওঠে আত্রেয়ী, হ্যাঁ, ঠিকই তো; জিতু বুড়ো আত্রেয়ীর মুখের দিকে কিরকম যেন অদ্ভুত একটা খুশির চোখ তুলে তাকিয়ে আছে।
আত্রেয়ী—কী জিতু?
জিতু বুড়ো বলে—হামার বকসিস দিদি।
চুপ করে, একেবারে নিথর হয়ে আনমনার মত দূরের গির্জাটার দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী। এত হাসিখুশি চোখ দুটোও হঠাৎ যেন চুপসে গিয়েছে। কিংবা পায়ে হঠাৎ কাঁটা ফুটেছে; নয়ত বেড়িয়ে ফেরার সব ব্যস্ততা হঠাৎ হোঁচট খেয়েছে। সত্যিই যে, একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে আত্রেয়ী।
—কী হল? জিজ্ঞেস করে নিখিল।
আত্রেয়ী বলে—আমার কাছে এখন পয়সা-টয়সা নেই।

—আমার কাছে আছে। পকেট থেকে একটা সিকি বের করে ভিখিরী জিতু বুড়োর হাতে ফেলে দেয় নিখিল। চলে যায় জিতু বুড়ো।

কিন্তু আত্রেয়ীর মাথাটা যেন একটা হঠাৎ ক্লান্তির ভারে অলস হয়ে পড়েছে। কিংবা, সড়কের কাঁকরের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ীর চোখ দুটো কি যেন খুঁজতে চাইছে। আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে কোন সৌভাগ্যের চিহ্ন দেখতে পেল আর এত খুশি হয়ে হাত পেতে বকশিস চাইল বোকা জিতু বুড়ো?

নিখিল বলে—দেখছেন, একটা ভালুকওয়ালা আসছে?

ঝুঁকে পড়া মাথাটা না তুলেই আত্রেয়ী বলে—না।

নিখিল—এই তো; তাকিয়ে দেখুন একবার।

ধুলোয় ঢাকা পা; নিশ্চয় অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছে ভালুকওয়ালা। ভালুকটার গায়ের রোঁয়াও ধুলোতে ছেয়ে গিয়েছে। হাত তুলে নিখিলকে সেলাম জানায় ভালুকওয়ালা। —বোলিয়ে হুজুর!

ভালুকওয়ালার হাতে একটা সিকি ফেলে দিয়ে নিখিল বলে—নাচ দেখাও।

ভালুকওয়ালা তার মাথার টুপিটাকে ভালুকটার মাথার উপরে রেখে দিয়ে লাঠি নাচাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ভালুকটাও দু'পায়ে ভর দিয়ে আর টান হয়ে দাঁড়ায়। একটা থাবাকে সেলামের ভঙ্গিতে তুলে ধরে নাচতে থাকে ধুলোমাখা ভালুকটা।

হেসে হেসে চেঁচিয়ে ওঠে নিখিল—কী করছেন আপনি? এদিকে দেখুন।

মুখ তুলে আর নাচের ভালুকের চেহারাটাকে দেখতে পেয়ে হেসে ফেলে আত্রেয়ী। —বেচারার ক্ষিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে।

নিখিল—কী আর করবে বলুন? চাকরি যখন, তখন ক্ষিদের পেট নিয়েও নাচতে হয়। এই জন্যেই তো আমি চাকরি করি না।

আত্রেয়ী—বাড়ি ফিরতে হবে কিনা।

নিখিল—এখনই ফিরবেন?

আত্রেয়ী—এখন ফেরাই যাক।

নিখিল—আপনি কি মনে করছেন, খুব বেশি বেড়ানো হয়েছে?

আত্রেয়ী—না।

নিখিল—তবে?

আত্রেয়ী—মঞ্জুর সঙ্গে একটা কাজ ছিল। মঞ্জু হয়ত ভাবছে, আমি সব ভুলেই গিয়েছি।

নিখিল—তা হলে বলুন, মঞ্জুকে বেশ একটু ভয় করতেও শুরু করেছেন।

আত্রেয়ী—কেন ভয় করব না? দোষ করলে ভয় করতেই হয়।

নিখিল—কী দোষ করলেন?

আত্রেয়ী—কথা ছিল, আজ মঞ্জুর কাছ থেকে উলের একটা প্যাটার্ন শিখব। কাজের কথা ভুলে গিয়ে হুট করে বেড়াতে চলে এলাম।

নিখিল—দোষটা আসলে আমারই।

আত্রেয়ী—আপনার দোষ হবে কেন?

নিখিল—আমিই যে আপনাকে বেড়াতে যাবার জন্য হুট করে একটা তাড়া দিয়ে ফেললাম।

আত্রেয়ী—বেশ করেছেন।

নিখিল—তা হলে আপনিও বেশ করেছেন।

ফেরবার পথে নতুন করে দেখবার কিছু নেই। শুধু গাঁয়ের ডাকঘরের দৌড়াহা তার কাঁধের বল্লমে ডাকের ব্যাগ ঝুলিয়ে আস্তে আস্তে দৌড়ে যাচ্ছে; বল্লমের ঘুঙুর বাজছে ঝুমঝুম করে।

আত্রেয়ী বলে—আমার শুনতে সব চেয়ে ভাল লাগে দূরের ট্রেনের শব্দ; তারপর এই ডাকের দৌড়াহার ঘুঙুরের শব্দ।

নিখিল—তিরছি নদীর ঝর্নার শব্দ শুনতে ভাল লাগে না?

আত্রেয়ী—না; আগে ভাল লাগত, এখন একটুও ভাল লাগে না।

নিখিল—এখন মানে কখন? কবে থেকে ভাল লাগছে না।

আত্রেয়ী—ঠিক মনে নেই, তবে প্রায় তিন বছর হবে।

নিখিল—ঝর্নার কাছে গিয়েছিলেন নাকি?

আত্রেয়ী—না; মাঝে মাঝে, অনেক রাতে যখন জেগে বসে গল্পের বই পড়েছি, তখন হঠাৎ শুনতে হয়েছে। সত্যিই শুনতে ভয় করে, যেন একটা রাগের শব্দ গরগর করছে আর গড়িয়ে যাচ্ছে।

নিখিল—বর্ষাকালের জংলি নদীতে ও-রকম শব্দ হয়েই থাকে। কিন্তু শীতকালে শুনুন, ওই নদীর ঝর্নার শব্দকেই একটা মিষ্টি গানের শব্দ বলে মনে হবে।

আত্রেয়ী—শীত আসতে এখনও অনেক দেরি আছে।

নিখিল—বেশি দেরি নেই; বড় জোর আর এক মাস। তখন একটা কাজ করবেন; সপ্তাহে অন্তত দুটো দিন আপনি বিকেলের দিকে...।

আত্রেয়ী—একা আসতে পারবই না; অসম্ভব।

নিখিল—একা আসবেন কেন? মঞ্জু সঙ্গে থাকবে। মঞ্জু তো আর কলকাতা ফিরে যাচ্ছে না।

আত্রেয়ী—আপনি যাচ্ছেন বুঝি?

নিখিল—যাবার কথা। তবে এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি, এ মাসেই যাব, না, আরও একটা মাস পরে যাব।

আত্রেয়ী—মঞ্জুও হঠাৎ আপনার মত যাব-যাব করে উঠবে না তো?

নিখিল—করলই বা? মঞ্জু রইল কি চলে গেল, তাই নিয়ে আপনার ভেবেচিন্তে করবার কী আছে? আপনি রোজ, অন্তত আরও দুটো বছর খুশি হয়ে নিজের কাজ নিয়ে থাকবেন আর বেড়াবেন। একাই বেড়াবেন। নয়ত, আপনার কিন্ডারগার্টেনের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বের হবেন।

আনমনার মত পথ চলছে আত্রেয়ী। সড়কের কিনারায় ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটছে। দেখতেও পাচ্ছে না যে, হাঁটু পর্যন্ত শাড়িটা চোরকাঁটায় ভরে গিয়েছে।

নিখিল হাসে—এত তাড়াতাড়ি হাঁটছেন কেন?

আত্রেয়ী—কী বললেন?

নিখিল—এমন কিছু দেরি হয়নি, খুব বেশি হাঁটাও হয়নি; তবু আপনার বেশ ক্ষিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে।

আত্রেয়ী হাসে—আপনিও যে কাকিমার মত কথা বলছেন।

নিখিল—তার মানে?

আত্রেয়ী—কাকিমার ওই এক অভ্যেস যখন-তখন মনে করছেন, আমার বুঝি ক্ষিদে পেয়েছে। দুটো মুড়ি খা, একটু সর খা, এক টুকরো পেঁপে খা, আত্রেয়ী। কাকিমা আমার মুখে সব সময় শুধু ক্ষিদেই দেখতে পান।

নিখিল—আপনি নিশ্চয় খাওয়া নিয়ে সব সময় গণ্ডগোল করেন, তা না হলে কাকিমা..।

আত্রেয়ী—কী বললেন? আপনি কোত্থেকে কী শুনলেন?

নিখিল—শুনেছি সামান্য, কিন্তু বুঝেছি অনেকখানি। বীণাদি বলেছেন, আপনি নাকি খেতেই চান না। কাকিমা আপনাকে সাধাসাধি করে হয়রান হয়ে যান।

আত্রেয়ী—বীণাদির কাণ্ড! গল্প করবার আর কিছু না পেলে আমার খাওয়া নিয়ে গল্প করতে হবে? বাঃ!

নিখিল—গল্পটা তো মিথ্যে নয়।

উত্তর দেয় না আত্রেয়ী।

নিখিল—এ রকম করবেন না। আর তো মাত্র দুটো বছর; খুশি হয়ে দিন কাটিয়ে দিন। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত করুন, স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর রাখুন।

সামনেই কাছারি পাড়া। একটা মুন্সেফ কোর্ট, দুটো সরকারি ডাকবাংলা, একটা ফরেস্ট আপিস আর এক সাব ডেপুটির খাজনা-মুকুব দপ্তরের তাঁবু। রবিবারের কাছারিপাড়া একেবারে নিস্তব্ধ। শুধু ফুরফুর করে উড়ছে কাছারিপাড়ার যত সেগুন গাছের হাওয়া।

আত্রেয়ীর কপালটা ঘামে ভিজে গিয়েছে। ঢিলে খোঁপাটা আরও একটু ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়েছে। কপালের সঙ্গে সেঁটে গিয়েছে। রুমাল তুলে কপাল মোছে আত্রেয়ী।

নিখিল—বাড়ির কাছে এসে পড়েছি মনে হচ্ছে?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ এবার বাঁদিকের এই রাস্তা ধরে চলুন।

মহাদেও পাঁড়ের পোষা পায়রার ঝাঁক উড়ে চলেছে। আত্রেয়ী বলে—ওরা এখন কোথায় যাচ্ছে, বলুন তো?

নিখিল—জানি না।

আত্রেয়ী—ওরা যাচ্ছে বাজারের মগনলালের দোকানবাড়িতে।

নিখিল—কেন?

আত্রেয়ী—রোজ এই সময় ওদের ছোলা খাওয়ায় মগনলাল। ওরা ঠিক বুঝে ফেলতে পারে, খাওয়ার সময় হয়েছে।

নিখিল—তা হলেই বুঝে দেখুন।

আত্রেয়ী—কী?

নিখিল—পায়রাগুলোও ওদের খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম যেটুকু বুঝতে পারে, আপনি সেটুকুও বুঝতে পারেন না।

আত্রেয়ী—বুঝব না কেন? সবই বুঝতে পারি। কিন্তু ভাল লাগে না।

নিখিল—ভাল না লাগলে চলবে কেন? ভাল লাগাতেই হবে।

এইবার দেখতে পাওয়া যায়, শ্রীলেখা কটেজের জানালার পর্দা ফুরফুরে হাওয়াতে ফুলে ফুলে কাঁপছে। কিন্তু আত্রেয়ীর আনমনা চোখে এখনও বোধ হয় শ্রীলেখা কটেজের ছায়া পড়েনি। আত্রেয়ীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই নিখিল বলে—ওই দেখুন, কে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে!

—কে?

—ওই যে, কটেজের গেটের কাছে।

একটি অদ্ভুত মূর্তি বটে। দেখলে হাসি পায়। সাদা-পাকা বড়-বড় বাবরী চুল, তার উপর একটি হ্যাট; মালকোঁচা দিয়ে আঁটসাট করে পরা ধুতি। হাতে একটি ছাতা; সে ছাতার কাপড় নেই। হাতে একগাদা কাগজপত্র।

চমকে ওঠে আর পিছু হটে গিয়ে সরে দাঁড়ায় আত্রেয়ী—ওরে বাবা। পাগলা দুর্গাচরণ!

নিখিল এগিয়ে যেতেই পাগলা দুর্গাচরণ ব্যস্তভাবে আর খুব গম্ভীর হয়ে নিখিলের হাতের কাছে একটা কাগজ তুলে দেয়—হ্যান্ডনোটটা রাখুন, আর টাকাটা দিয়ে ফেলুন।

দুর্গাচরণের হ্যান্ডনোটের দিকে তাকিয়ে নিখিল বলে—এক লাখ টাকা?

—হ্যাঁ সুদ চার্জ করব না; কোনও ভয় নেই।

নিখিল—আপাতত চার আনা নিন।

দুর্গাচরণ—দিন।

দুর্গাচরণের হাতে একটা সিকি ফেলে দিয়ে নিখিল আবার বিনীত স্বরে আবেদন করে।—বাকিটা যদি দিতে না পারি, তবে...।

দুর্গাচরণ—ধর্মভয় থাকলে দেবেন; না থাকে দেবেন না।

নিখিল—মামলা-টামলা করবেন না তো?

দুর্গাচরণ—না, ওসব আমি পছন্দ করি না।

চলে গেল গম্ভীর পাগল দুর্গাচরণ।

হাসি চাপতে গিয়ে আত্রেয়ীর হাতের রুমালটা পড়ে যায়। রুমালটাকে তুলে নিয়েই, আর মুখর হাসির একটা সোর জাগিয়ে শ্রীলেখা কটেজের বারান্দার দিকে যেন ছুটে চলে যায় আত্রেয়ী।

বারান্দায় উঠে নিখিলও খুশির স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।—এইবার তোর বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে দেখ মঞ্জু হাসিয়ে দিতে পেরেছি কিনা।

মঞ্জুর ঘরের ভিতরে ঢুকেই হাঁপ ছাড়ে আত্রেয়ী—এমন কিছু দেরি হয়নি, মঞ্জু। কই, উলের সেই...।

মঞ্জু বেশ গম্ভীর। তাই হঠাৎ কথা থামিয়ে দিয়ে মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী।

মঞ্জু হাসতে চেষ্টা করে।—এমন কিছু দেরি হয়নি মানে পুরো তিন ঘণ্টা হয়েছে।

আত্রেয়ী—সত্যি মঞ্জু, আমি বুঝতেই পারিনি।

মঞ্জু—শোনো আত্রেয়ী।

যেমন মঞ্জুর গলার স্বরে তেমনই মঞ্জুর মুখের হাসিতে যেন শক্ত একটা মায়া খুব সাবধানে কথা বলতে চাইছে।

আত্রেয়ী কিন্তু মঞ্জুর একটা হাত টেনে নিয়ে মঞ্জুর আঙুলের আংটিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেরই মনের একটা অকারণ খুশির খেলা খেলতে থাকে।

শোনা যায়, এঘর থেকে নিখিল বলছে—আমি পোস্ট অফিসে চললাম, ফিরে এসেই কিন্তু চা খাব।

চলে গেল নিখিল। মঞ্জু বলে—আমাদের এই মেজদা একটি অদ্ভুত মানুষ। কী রকম অদ্ভুত জান? এখনই যদি মেজদাকে জিজ্ঞেস করি, আত্রেয়ীকে চেন? সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করবে, আত্রেয়ী? কে সে?

হেসে ফেলে আত্রেয়ী—আশ্চর্য।

মঞ্জু—হ্যাঁ আশ্চর্য, কিন্তু হেসো না আত্রেয়ী। মেজদার মত লেখাপড়া জানা মানুষ খুব কমই আছে। পড়ার জন্য ইউরোপে দু'বছর আর আমেরিকাতেও এক বছর কাটিয়েছে। আমি তিনবার বি-এ ফল করেছি বলে আমাকে ঘেন্না করে মেজদা। আমার কথা ছেড়েই দাও, রত্না মজুমদারের মত মেয়ে, যে-মেয়ে সোনার মেডেল নিয়ে এম-এ পাস করেছে, আর দেখতে তোমার চেয়েও সুন্দর, সে মেয়েকেও কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হয়নি আমার মেজদা এই নিখিল সেন।

আত্রেয়ী—রাজি হলে নিশ্চয় খুব ভাল হত, মঞ্জু।

মঞ্জু—শোনো। মেজদা সাধারণ মানুষ হলে রাজি হত ঠিকই; কিন্তু তা নয়। তাই বলে কি কারও সঙ্গে অভদ্রতা করে মেজদা? তাও নয়। এখনও রত্নার সঙ্গে দেখা হলে মেজদা হাত তুলে নমস্কার জানাতে ভুলে যায় না।

আত্রেয়ী—রত্না কি নিখিলবাবুর চেয়ে বয়সে ছোট নয়?

মঞ্জু—ছোট, কিন্তু সে কথা হচ্ছে না। যা বলছি, মন দিয়ে শোনো। মেজদা মানুষটা অকারণে মানুষের উপকার করে। মানুষকে খুব মায়া করতেও ভালবাসে। তুমি জান না; এখানে এই সরিয়াডিতেই সেদিন একটি লোককে মেয়ের বিয়ের জন্য একশো টাকা দিয়েছে মেজদা; কিন্তু

মেয়ের বাপ লোকটা আবার একদিন যখন মেজদাকে নমস্কার জানাবার জন্যে দেখা করতে এল, তখন মেজদা লোকটাকে চিনতেই পারল না।

আত্রেয়ী—পরে চিনতে পেরেছিলেন নিশ্চয়?

মঞ্জু—জানি না। কিন্তু সব চেয়ে খারাপ ব্যাপার কী হয় জান? অনেকেই আমাদের মেজদার দয়া মায়া আর ভদ্রতাকে ঠিক চিনতে পারে না। মনে করে ফেলে, মেজদার বোধ হয় কোনও ইচ্ছে আছে। এই ভুল করে শেষকালে কিন্তু নিজেরাই ঠকে।

আত্রেয়ী—ঠকাই উচিত।

মঞ্জু—মেজদার তো কোনও ক্ষতি হয় না; ওদের নিজেদেরই ক্ষতি হয়।

আত্রেয়ী—হবেই তো।

মঞ্জু—সেই জন্যেই বলছি! তুমি...।

আত্রেয়ীর চোখের তারার জ্বলজ্বলে হাসিতে হঠাৎ যেন ধোঁয়া লেগেছে, হাসিটা আবছা হয়ে গিয়েছে।—আমাকে কিছু বলছ? মঞ্জু?

মঞ্জু—হ্যাঁ। প্রীতিবৌদি বলছেন যে, ডাক্তার বলুক আর নাই বলুক, এবার থেকে আমরা দুজনে বেড়াতে বের হব। তুমি যদি কষ্ট করে...।

মঞ্জুর হাতটাকে শক্ত করে ধরে আত্রেয়ী। মুখটাও একেবারে ফুল্ল খুশির ফুলটির মত মিষ্টি হাসিতে ভরে যায়।—তাই বল। এই কথা! এর জন্যে এত গম্ভীরতা? তোমার কি ধারণা যে তোমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে আমার পা ব্যথা করবে? ছিঃ!

সরিয়াডির নয়াপাড়ার সড়কের সেই যে দুটো ল্যাম্পপোস্ট ভোরের ঝড়ের আঘাত পেয়ে কাত হয়ে গিয়েছিল, সে দুটো এখনও কাত হয়েই আছে। সন্দেহ হয়, আরও একটু ঝুঁকে পড়েছে। মনে হতে পারে, বেচারা সরিয়াডি যেন তার হেঁট মাথা আর সোজা করে তুলতে পারছে না।

দিবাকর সাইকেল চালিয়ে তার কাঠের গোলাতে যায় আর বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু বেশ বুঝতে পারা যায়, দিবাকরের মাথাটাও যেন ঝুঁকে রয়েছে। মাথা তুলে আর চোখ তুলে কিছুই দেখতে চায় না দিবাকর।

বলাই বলে—আমি বিশ্বাসই করতে পারি না জয়ন্তদা, আত্রেয়ীর মত মেয়ে কখনও...।

জয়ন্তবাবু—আত্রেয়ীর দোষ নয়। দোষ হল ওদের, ওই চা বাগানওয়ালা বড়লোকের পরিবারটি, যাঁরা দু'দিনের জন্যে এখানে এসে এক গরিবের মেয়ের সঙ্গে মেলামেশার বাড়াবাড়ি করছেন।

বলাই—আমিও তো তাই বলছি।

পরেশ বলে—শ্রীলেখা কটেজের ওই ভদ্রলোককে দেখলে আমার গা জ্বালা করে। ভদ্রলোক যেন আত্রেয়ীদিকেও একটি বান্ধবী মেয়ে মনে করছেন। হো হো, হি হি, কত রকমের কত হাসি।

দাবার ছক সামনে পাতা; কিন্তু ঘুঁটি চালতে গিয়ে আনমনা হয়ে যান হাবুলবাবু। তারপরেই বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—না; খুবই অপমানের একটা ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।

গোষ্ঠবাবু—শুনছি, আজকাল শুধু মেয়েটিরই সঙ্গে বেড়াতে বের হয় আত্রেয়ী।

হাবুলবাবু—এরকম হলে তবু একটা মানে হয়। কিন্তু এই ছোকরা ভদ্রলোক কি সত্যিই ভদ্র হয়ে থাকতে পারবে?

গোষ্ঠবাবু—ওরা যাবে কবে?

হাবুলবাবু—কে জানে?

গোষ্ঠবাবু—প্রদোষদার জামাইয়ের মেয়াদের আর কতদিন বাকি আছে?

হাবুলবাবু—তা'ও ঠিক জানি না, দিবাকর বলছিল, বোধ হয় দেড় বছরেরও কিছু বেশি।

গোষ্ঠবাবু—আত্রেয়ীকে যদি...।

হাবুলবাবু—না না; আত্রেয়ীকে কিছু বলবার কোনও মানে হয় না। আত্রেয়ীর কোনও দোষ নেই। আপনাদের যদি সাহস থাকে, তবে শ্রীলেখা কটেজের লোকগুলোকে স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করুন না কেন, কবে চলে যাবে?

গোষ্ঠবাবু—তার পর? যদি বলে, এখন যাব না?

হাবুলবাবু—তবে যাইয়ে দিতে হবে। দিবাকর বলছিল, আর দেরি না করাই উচিত।

চিনুর পিসিমা রোজই অকারণে রাগ করে চেঁচামেচি করছেন—এ এক জ্বালা হল। এই দেখলাম বাতাসার ঠোঙাটা এখানেই আছে, এই দেখছি নেই। ওরে ও চিনু, কোথায় সরালি ঠোঙাটাকে?

চিনু বলে—তুমিই তো সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তোমার ঘরের কুলুঙ্গিতে রাখলে।

—একবার দৌড়ে গিয়ে দেখে আয় তো মা, তোদের আত্রেয়ীদি আজও আবার বেড়াতে বের হল নাকি?

গোষ্ঠবাবুর স্ত্রীর কাছে যখন তখন আক্ষেপ করেন সন্তুর মা।—জানি না, আপনি কী মনে করেন বুলুর মা, আমি কিন্তু মনে করি, আত্রেয়ী মেয়েটার দোষ নয়।

বুলুর মা—একটুও না। হাওয়া বদলের মানুষগুলো ছল করে চমৎকার হাসতে পারে, ঢং করে চমৎকার মায়া দেখাতে পারে, সেই জন্যেই তো ভয় হয়।

সন্তুর মা—জঞ্জালগুলো যাবে কবে?

বুলুর মা—বলাই বলছিল, ভয় করবার তেমন কিছু নেই।

—কেন?

—ওই, শুধু একটা দুটো দিন কটেজের চশমাপরা ছেলেটার সঙ্গে একটু বেড়াতে বের হয়েছিল আত্রেয়ী। তারপর আর নয়। আজকাল শুধু মেয়েটার সঙ্গে বেড়াতে বের হয়।

—তা মেয়েটার সঙ্গে একশোবার বেড়াতে বের হোক; দুঃখের প্রাণ কদিনের জন্যে একটা সাথীর সঙ্গে গল্প করে আর হেসে-খেলে নিক না কেন, কোনও দোষ নেই।

—তবু, বাইরের এই লোকগুলো যত তাড়াতাড়ি চলে যায়, ততই ভাল।

—বীণা মাস্টারনি বলছিল, ওরা নাকি লোক ভাল।

—লোক ভাল হলেই কী? তাতে আত্রেয়ীর কী আসে যায়? আত্রেয়ীর যা ভাল হবার তা তো হয়েই গিয়েছে। স্বামীর কাছে নিয়মমত চিঠি লেখে তো আত্রেয়ী?

—লেখে।

—তবেই বুঝে দেখ, আত্রেয়ীর মনে কোনও খাদ নেই। আমি তাই নরেন ছোঁড়াকে সেদিন খুব ধমকে দিয়েছি।

—কেন?

—নরেন বলছিল, আত্রেয়ীদিকে আজকাল নাকি একটি চেঞ্জার মেয়ের মত দেখায়।

—দেখাতে পারে। ওই পর্যন্ত। আত্রেয়ীকে তো চিনি, সে মেয়ে কারও ছলনায় টলবার মেয়ে নয়।

—নরেন অবিশ্যি বললে যে, আত্রেয়ীর ওপর কোনও রাগ-টাগ ওদের নেই; ওরা রেগেছে শ্রীলেখা কটেজের লোকটার উপরে।

সারাদিন পেট্রল পাম্পের চাকরি করে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে আসেন সামন্তবাবু। কিন্তু চায়ে চুমুক দিয়েই চেঁচিয়ে ওঠেন—এ কি চা? না চিরতার জল?

নীহারের মা; সামন্তবাবুর স্ত্রী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেন—কী হল?

সামন্তবাবু—চিনি খুবই কম হয়েছে। কিন্তু আমি তো আত্রেয়ীর তেমন কিছু দোষ দেখি না। শ্রীলেখা কটেজের সেই ছোকরা ভদ্রলোকটারই যত মায়াবিপনা...।

নীহারের মা এইবার বিরক্ত হয়ে মুখ খোলেন।—কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই তো করবার মুরোদ হল না। যেমন দিবাকর, তেমনি তুমি। শুধু আড়ালে যত গজর গজর।

সামন্তবাবুর গলার স্বর করুণ হয়ে যায়।—কী করা যায়; বলতে পার?

মাধব আর বিমল গাঁয়ের ঝিল থেকে মাছ ধরে বাড়ি ফিরবার পথে, সরিয়াডির থানার আউটপোস্টের কাছে, ঠিক যেখানে সড়কের শেষ ল্যাম্প সন্ধ্যা থেকেই নিবু-নিবু হয়ে জ্বলে, সেখানে দাঁড়িয়ে হাওয়াবদলের তিন জন মানুষের হাসি-গল্পের হররা শুনতে পেয়েছে।

নেশাজড়ানো স্বরে কথা বলছেন ব্রিচেসপরা সেই শৌখিন শিকারি ভদ্রলোক। —শ্রীলেখা কটেজের নিখিল সেনের পায়ের ধুলো জোগাড় করে দিতে পারেন মশাই?

—কেন? কেন? এক সঙ্গে প্রশ্ন করেই ফণী মিত্র আর জগৎ ব্যানার্জি মুখ টিপে হাসতে থাকেন।

ব্রিচেস বলেন—নাঃ, বলতে পারব না। বলতে গেলে বুক ফেটে যাবে। আমি কালই চলে যাব।

ফণী মিত্র—থানা অফিসার নাকি আপনাকে ওয়ার্নিং দিয়েছেন?

—দিয়েছে মশাই, দিয়েছে।

হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে মাধব আর বিমলের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন সেই নেশাজড়ানো ব্রিচেস।—এই যে, এই এরা, এদেরই থানা অফিসার।

মাধবও মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে, আর গলার স্বর একেবারে চেপে দিয়ে কথা বলে—চল বিমল; কিছু বলিস না।

বিমল বলে—কিন্তু এইসব উপদ্রব যাবে কবে?

একটা মাস, দুটো মাস, তিনটি মাসও পার হতে চলল; সরিয়াডির প্রাণে একটা অস্বস্তির ব্যথা এইভাবে শুধু ফিসফিস করছে। জোরে চেঁচিয়ে উঠতে পারছে না। অপমানটা গায়ে বিঁধছে, কিন্তু হেঁট মাথা উঁচু করে তুলে ধরতে পারছে না। মিউনিসিপ্যাল-কমিটির কী যেন হয়েছে; বোধহয় ফাণ্ডে কুলোচ্ছে না কিংবা হাত-পা অলস হয়ে গিয়েছে। কাত হয়ে হেলে পড়া ল্যাম্পপোস্ট দুটোকে আর সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া আজও সম্ভব হল না।

দিবাকর মাঝে মাঝে গর্জন করে বটে; হাবুলবাবুও বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুটি করেন; কিন্তু কটেজের মানুষগুলিকে টলিয়ে নড়িয়ে সরিয়ে দেবার সাহস আছে কি? নেই বোধ হয়।

আগন্তুক অস্থায়ীর ব্যবহারে প্রায়ই আঘাত পায় ছোট্ট সরিয়াডির স্থায়ী প্রাণগুলি, কিন্তু এরকম আঘাত কোনওদিনও পেতে হয়নি। এ রকম ভয়ও কোনও দিন পেতে হয়নি। বাইরের থেকে দু'দিনের ফুর্তির একটা হাসি এসে প্রদোষ সরকারের মেয়ের জীবনের একটা চিরকালের চিহ্নকে হাসিয়ে পাগল করে আর এলোমেলো করে দিয়ে চলে যাবে? সরিয়াডির স্থায়িতাসুখী গর্বটাই বোধ হয় ভয় পেয়েছে।

প্রদোষ সরকারের বাড়ির কাঁটালতার ঝোপের ফড়িংও উসখুশ করে। এক পা নিয়ে বারান্দার চেয়ারে চুপ করে একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন প্রদোষ সরকার, কিন্তু উঠতে গেলেই যেন টলে ওঠেন। হাতের জোর কি কমে গেল?

শ্বাসকষ্টের মানুষ হৈমবতী, আত্রেয়ীর মা, তিনি পুজোর ঘরের দরজার গায়ে তাঁর রোগের শরীরের সব অসহায়তা এলিয়ে দিয়ে শুধু দেখতে থাকেন—আত্রেয়ী বেড়াতে বের হয়ে গেল। বলেও গেল না, ঠিক কখন ফিরবে।

কাকিমা কতবার বলেছেন—রোজই শুধু শ্রীলেখা কটেজে কেন রে আত্রেয়ী? মাঝে-মাঝে দিবাকরের বউয়ের সঙ্গে একটু দেখাটেখা করে আসতে তো হয়।

আত্রেয়ী হাসে—সে তো যাবই; শান্তি বউদি তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না। শান্তি বউদি এখানকার দু'দিনের মানুষ নয়।

কাকিমা—দু'দিনের মানুষদের সঙ্গে শুধু দুটো দিন ভদ্রতা করলেই তো হল।

আত্রেয়ী—আমিও তো তাই করছি। মঞ্জুরা আর মাত্র তিন মাস আছে।

আত্রেয়ী চলে যাবার পর মণিদিদা তাঁর জপের মালা থামিয়ে কথা বলেন—তোমরা আত্রেয়ীকে বেশি বাজে কথা-টথা বলো না সুহাস। ওর দোষ নেই।

কাকিমা—আমি আত্রেয়ীর দোষ ধরছি না। ওর মন, ওর বয়স তো একটু হেসে খেলে থাকতে চাইবেই। কিন্তু একটু সাবধান থাকা উচিত।

প্রদোষবাবু হাসেন—তোমরা সেরকম মেয়ে পাওনি, সুহাস। মিছিমিছি কোনও ভয়-সন্দেহ করো না।

কিন্তু কাঁটালতার ফড়িং বোধ হয় ভয় পেয়েছে বলেই উসখুস করে ভয় তাড়াতে চেষ্টা করছে। প্রদোষ সরকার জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন—আমার পা থাকলে আমি নিজেই আত্রেয়ীকে রোজ বেড়াতে নিয়ে যেতাম।

অনেকক্ষণ পরে কথা বলেন আত্রেয়ীর মা—হেমন্তর চিঠির উত্তর দিয়েছে আত্রেয়ী? আজ না চিঠি লেখবার কথা ছিল?

আত্রেয়ীর ঘরের টেবিলটার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন কাকিমা—হ্যাঁ, লিখেছে বলে মনে হচ্ছে।

টেবিলটার কাছে এগিয়ে যান কাকিমা। হ্যাঁ, চিঠিটাকে অর্ধেক লিখেই চলে গিয়েছে আত্রেয়ী।

"আমার একটা অনুরোধের কথা রাখবে কি? মন খারাপ করো না। সব সময় হেসেখেলে থাকবে। আমিও তো জেলেই আছি। তবু হেসে খেলে বেড়িয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। স্বাস্থ্যের দিকেও একটু নজর রেখো। আর একটা কথা...সব মনে আছে, কিছুই ভুলে যাইনি। তুমি যখন..."

কাকিমা নিজের মনে বিড়বিড় করেন—ভাল কথাই তো লিখেছিস; সবই তো ঠিক আছে।

চমকে ওঠেন কাকিমা। বাইরের বারান্দাতে কে যেন হঠাৎ এসে আর চেঁচিয়ে উঠেছে—হে হে হে। কেমন আছেন প্রদোষবাবু? খবর ভাল?

মোষের শিঙের লাঠিটাকে হাতে দুলিয়ে কথা বলছেন চন্দ্রবাবু।

প্রদোষবাবু—আসুন চন্দরদা, অনেকদিন পরে এলেন।

চন্দ্রবাবু—আসি বা না আসি, সব সময় ভাবতে চেষ্টা করি, আপনারা সবাই ভাল আছেন। ভাল থাকলেই হল।

প্রদোষবাবু হাসেন—আপনার মত ভাল থাকতে আমরা কী করে পারব বলুন? নানারকম ভাবনা-চিন্তা তো আছেই, তার ওপর...।

চন্দ্রবাবু—এতদিনে সত্যি কথাটা তা হলে স্বীকার করলেন? খুব সত্যি কথা প্রদোষবাবু আমি সবচেয়ে ভাল আছি। যেই হোক, সরিয়াডির যত চেঞ্জার আর নো-চেঞ্জার, সবার চেয়ে আমি চালাক।

প্রদোষবাবু—বুঝলাম না, চন্দরদা। আপনি চালাক হবেন কেন? আপনি তো জ্ঞানী মানুষ।

—হে হে হে; চেঁচিয়ে হাসতে থাকেন চন্দ্রবাবু। —কিন্তু আমার জ্ঞানকে যে কেউই পছন্দ করে না।

—কে পছন্দ করে না?

—দিবাকর, গোষ্ঠ, হাবুল, হয়ত আপনিও। ...আচ্ছা, চলি এখন প্রদোষবাবু। আসল কথাটা কী জানেন? কিছুই না। কিচ্ছু নেই। কিছুই থাকে না। সবই তিরছি নদীকা পানি।

প্রদোষবাবুর পিঠে একবার হাত বুলিয়ে নিয়েই ব্যস্তভাবে চলে গেলেন চন্দ্রবাবু।

—হেম? শুনছ? একবার এদিকে এসো। ডাকতে গিয়ে প্রদোষ সরকারের চোখ ভিজে যায়। আত্রেয়ীর মা ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন—কী হল?

প্রদোষবাবু—সবই যদি তিরছি নদীর পানি হয়, তবে বেঁচে থাকব কী করে?

কাকিমা ছুটে আসেন—বড়দা কেন যে এত ভয় করছেন, বুঝছি না। এই তো চিঠি, হেমন্তকে আজই লিখেছে আত্রেয়ী। পড়ে দেখুন।

চিঠিটাকে পড়ে নিয়েই হেসে ফেলেন প্রদোষ সরকার। —বলেছি না, ভয় করবার মত কিছুই হয়নি, হচ্ছেও না। কিন্তু ওরা যাবে কবে?

১০

না, এখনও তিরছি নদীর ঝর্ণা দেখতে যাবার অনুমতি পায়নি মঞ্জু। কিন্তু তর সয়নি মঞ্জুর; একদিন শালবনের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ীর কানের কাছে গল্পটাকে বলেই দিয়েছে।

মল্লিক ডাক্তার বলেছেন; বেশি দূরে নয়, বেশিক্ষণও নয়, বাড়ির কাছাকাছি সামান্য একটু বেড়িয়ে আসাই ভাল।

মঞ্জু কিন্তু মল্লিক ডাক্তারের উপদেশ একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে রাজি নয়। —না আত্রেয়ী, এত তুকুপুকু করবার কোনও মানে হয় না। একদিন তো অপারেশনের টেবিলে শুয়ে পড়তে হবে, আর উঠতেও হবে না বোধহয়। তার আগে যা পারি আর যতটা পারি বেড়িয়ে নেওয়াই ভাল।

আত্রেয়ী—এরকম করে কথা বললে আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে কোনওদিন বেড়াতে বের হব না।

মঞ্জু হাসে—সত্যি কথা বলছি; রাগ করছ কেন?

আত্রেয়ী—একেবারে মিথ্যে কথা। আমি বলছি, তোমার অসুখ সেরে যাবে।

মঞ্জু—কেমন করে বুঝলে?

আত্রেয়ী—আমার মন বলছে।

আত্রেয়ীর হাত ধরে মঞ্জু যেন করুণ মিনতির সুরে কথা বলে—তাই বলো আত্রেয়ী; বার বার বলো। সে বেচারাকে আমি যে সত্যি ঠকাতে চাই না। ওর জন্যেই আমার এত বাঁচতে ইচ্ছে করে।

আত্রেয়ীর চোখ ভিজে যায়।—আমাকে আবার একথা বলতে হবে নাকি? আমি তো তোমার জন্যে মহাদেও পাঁড়ের মন্দিরে পুজো পাঠিয়েছি।

কাছারিপাড়া পার হলেই লাল মাটির যে ডাঙাটা তিরছি নদীর খাত পর্যন্ত গড়িয়ে চলে গিয়েছে, সেই ডাঙায় বড় বড় কালো পাথরের পিঠ যেন বসবার আসনের মত এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে। আমলকির কয়েকটা ঝোপও আছে। এক জায়গায় বুনো খেজুর গাছের একটা ভিড়ও আছে। তা ছাড়া কয়েকটা শিরীষও আছে।

কখনও কালো পাথরের পিঠের উপর, কখনও বা শিরীষের ছায়ার কাছে ঘাসের উপর বসে থাকতে ভাল লাগে। মঞ্জুর মুখের হাসিটাও নতুন শিরীষ ফুলের মত লালচে হয়ে যায়; মঞ্জুর জীবনের গল্প ফুরোতে চায় না।

কিন্তু আত্রেয়ীর জীবনে কি কোনও শিরীষ ফুলের গল্প নেই? লাজুক রঙিন গল্প? কিন্তু জানতে চেষ্টা করেনি, জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছে মঞ্জু।

বুঝেছে মঞ্জু, সরিয়াডিির মেয়ে আত্রেয়ী মঞ্জুর পাশে বসে আর মঞ্জুরই স্বপ্নের গল্প শুনে ধন্য হয়ে গিয়েছে।

আত্রেয়ীর সেই বোকা দুঃসাহসের কোনও চিহ্ন আর নেই। প্রীতি বউদিও একটু নিশ্চিন্ত হয়েছেন। আত্রেয়ী এসে নিজেই তাগিদ দিয়ে মঞ্জুকে ব্যস্ত করে তোলে আর মঞ্জুর সঙ্গে বেড়াতে চলে যায়।

হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে রেলপার্সেল হয়ে প্রকাণ্ড একটা কাঠের বাক্স এসেছে। গল্পের বইয়ে ভরা একটা বাক্স। আত্রেয়ীও শুনতে পেয়েছে, চেঁচিয়ে কথা বলছেন নিখিলবাবু—জানিস তো মঞ্জু, কার জন্যে এত গল্পের বই আনানো হল?

মঞ্জু হাসে—তা একটু জানতে পেরেছি বই কি।

একটা একটা করে গল্পের বই বাড়িতে নিয়ে যায় আত্রেয়ী। পড়া শেষ হলেই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায়।

বই পড়বার জন্যে আত্রেয়ীর এই ব্যস্ততাও দেখা যায়। তাই মঞ্জু একদিন হঠাৎ আত্রেয়ীকে বলেই দেয়। —তুমি বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারনি আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী—কী?

মঞ্জু—মেজদা এত গল্পের বই কার জন্যে আনিয়েছেন, বলতে পার?

আত্রেয়ী—আমার জন্যেই তো মনে হচ্ছে।

হেসে ফেলে মঞ্জু—ভুল, খুব ভুল ধারণা করেছ আত্রেয়ী। তোমাদের সরিয়াডিতে যে ছোট একটা লাইব্রেরি আছে সেই লাইব্রেরিকে দান করবার জন্যে এত গল্পের বই আনিয়েছে মেজদা।

আত্রেয়ীও হাসে—আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি মঞ্জু। তাই লোভীর মত তোমাদের বই চেয়ে নিয়ে...।

মঞ্জু—না না; তুমি ঠিকই করেছ। মেজদা বলেছেন, তোমার পড়া হয়ে গেলেই সব বই লাইব্রেরিতে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সেজন্য আবার মনে করে বসো না যে...।

আত্রেয়ী—কী বললে?

মঞ্জু—আসল কথা হল, মেজদা লাইব্রেরিটাকেই সাহায্য করতে চান।

আত্রেয়ী—তাতেও আমাকেই সাহায্য করা হল। যখন ইচ্ছে তখন লাইব্রেরি থেকে বই আনব আর পড়ব।

মঞ্জু—হ্যাঁ, সে রকম একটা সুবিধা পাবে, ঠিকই।

একদিন শ্রীলেখা কটেজের গেটের কাছে পৌঁছেই যখন গেটের পাশের জবা গাছটার একটা ডাল ধরে কুঁড়িগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী, তখন কঠিন ফিলসফির একটা শক্ত-পোক্ত প্রকাণ্ড বই হাতে নিয়ে আর ঘরের জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে হেসে ওঠে নিখিল—ছুঁয়ে দিন: একটু ভাল করে ছুঁয়ে দিন।

আত্রেয়ী—কী বলছেন?

নিখিল— ওই সিড়িঙ্গে জবার কুঁড়িগুলোকে আপনি একটু ভাল করে ছুঁয়ে দিন।

আত্রেয়ী—কেন?

নিখিল—তা হলে কুঁড়িগুলো এখনই ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।

আত্রেয়ী—এতদিন তা হলে কী করে কুঁড়ি ফুটেছিল? আমি তো ছুঁইনি।

নিখিল—ফুটেছিল নাকি?

আত্রেয়ী—ফোটেনি?

নিখিল—মঞ্জুকে জিজ্ঞেস করুন।

বইয়ের লেখার দিকে চোখের সব দৃষ্টি ঢেলে দিয়ে আর একেবারে নীরব হয়ে আবার বই পড়তে থাকে নিখিল।

ঘরে ঢুকেই দেখতে পায় আত্রেয়ী, মঞ্জু হাসছে। —মেজদার কথার মানে কিছু বুঝতে পারলে, আত্রেয়ী?

আত্রেয়ী—না।

মঞ্জু—তোমাকে ঠাট্টা করলেন মেজদা।

আত্রেয়ী—কিসের ঠাট্টা?

মঞ্জু—এই জবাটার শুধু কুঁড়ি ধরে আর ঝরে পড়ে যায়; ফুল ফোটে না। তাই মেজদা বোম্বাইয়ের নার্সারি থেকে খুব দামি সার আনিয়েছে। তিনদিন হল সার দেওয়াও হয়েছে। এইবার দেখবে, কী চমৎকার ফুল ফুটবে।

আত্রেয়ী—ভালই হবে। কিন্তু সেজন্য আমাকে...।

মঞ্জু—বুঝলে না? তুমি হয়ত মনে করবে যে, সত্যিই তুমি ছুঁয়েছিলে বলে কুঁড়ি ফুটেছে। তাই মেজদা ঠাট্টা করে তোমাকে একটু সাবধান করে দিলেন।

আত্রেয়ী—আমি কিন্তু সত্যিই এরকমের একটা কাণ্ড করেছিলাম একদিন। আমাদের লেবু গাছের গোড়াতে আমি যেদিন জল দিলাম, ঠিক তার পরের দিনেই গাছে ফুল ধরেছিল।

মঞ্জু—সেটা তোমাদের সরিয়াডির লেবু গাছ? কলকাতা থেকে আনানো জবা গাছ নয়।

প্রীতি বউদি হেসে ফেলেন—বসো আত্রেয়ী। একটু চা খেয়ে নাও। মঞ্জুর সঙ্গে মিছে আর তর্ক করো না।

মঞ্জু বলে—পুরো তিনটি মাস ধরে প্রায় রোজই তো মেজদাকে দেখলে; কিন্তু দেখলে তো, কেমন অদ্ভুত মানুষ? হয়ত, কালই দেখবে, ওই এত আদুরে জবাটাকে উপড়ে ফেলে দিয়ে হেসে ফেলবে। জিজ্ঞেস করলে বলবে, নাঃ, এটা একেবারে বাজে জবা রে মঞ্জু।

আত্রেয়ী—তুমি কিন্তু একটা ভুল হিসেব দিলে। এখানে তোমাদের এখনও পুরো তিন মাস হয়নি।

মঞ্জু—না হোক; এবার চলে যাবার কথাই ভাবতে হচ্ছে।

আত্রেয়ী—এত শিগগির চলে যাবে?

মঞ্জু—কপালে থাকলে আবার নিশ্চয় আসব।

পরের দিনই আত্রেয়ীর একটা কাণ্ড দেখে হাসতে থাকে মঞ্জু, প্রীতি বউদিও হাসেন। ওঘর থেকে অখিলবাবুও বলেন—কী হল তোদের মঞ্জু? এত হাসিহাসি কিসের?

আত্রেয়ী এসেছে; আত্রেয়ীর সঙ্গে ওদের চাকর রামুয়া এসেছে। তোয়ালে দিয়ে ঢাকা দুটো মস্ত বড় থালার উপর চারটে করে বাটি, চার রকমের খাবারে ঠাসা। মোট আট রকমের খাবার। রসবড়া আছে, ক্ষীরের পায়েস আছে; আবার ছোলার ডালের নোনতা হালুয়াও আছে।

মঞ্জু বলে—আত্রেয়ী আমাদের লাস্ট সাপার খাইয়ে দিচ্ছে বড়দা!

অখিলবাবু—আমাকেও একটু দিস।

আত্রেয়ী—মনে করো না মঞ্জু, সবই কাকিমা করেছেন। আমিও নিজে হাত লাগিয়ে অনেক কিছু করেছি। এই চমচম আমারই তৈরি।

নিখিলের গলার স্বর শোনা যায়—আমাকে এক কাপ চা দাও, বউদি।

আত্রেয়ী মঞ্জুর কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে কথা বলে—নিখিলবাবুকে চায়ের সঙ্গে এই খাবারও কিছু দিয়ে দাও।

চমকে ওঠে মঞ্জু। মঞ্জুর চোখের এতক্ষণের স্নিগ্ধদৃষ্টিটা বেশ একটু রুক্ষ হয়ে কাঁপতে থাকে। আত্রেয়ীর চোখেমুখে এমন আশার হাসির মানে কী? এতদিন পরে, আবার হঠাৎ ভুল করে কী ভেবে ফেলেছে আত্রেয়ী?

মঞ্জু বলে—মেজদা এসময় চায়ের সঙ্গে কিছু খায় না। কিছু দিলেও খাবে না। তুমি সেজন্যে ব্যস্ত হয়ো না, আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী—একবার বলেই দেখো না?

মঞ্জু এইবার যেন ওর চোখের ছোট্ট একটা ভ্রূকুটি লুকিয়ে ফেলতে চায়; তাই নিখিলের ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে আর বেশ একটু চড়া স্বরে ডাক দেয়—মেজদা, চায়ের সঙ্গে এখন আর কিছু খাবে নাকি?

নিখিল উত্তর দেয়। —হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো চা চাইলাম। তোর বন্ধু কি-সব খাবারটাবার এনেছে শুনলাম, তা থেকে আমাকেও কিছু খেতে দে। শুধু বড়দাকেই দিচ্ছিস কেন?

মঞ্জু নীরব হয়ে যায়। এইবার প্রীতি বউদি এগিয়ে এসে আত্রেয়ীর মুখের দিকে বেশ শক্ত ভঙ্গির একটি দৃষ্টি তুলে, অথচ খুব মৃদু স্বরে কথা বলেন। —একটা ভদ্রতা দেখালেন আমাদের নিখিল সেন। খাবার খেতে একটুও ইচ্ছে নেই, কিন্তু তুমি হয়ত মনে করবে যে, একজন বড়লোক মানুষ তোমার মত মানুষের জিনিস তুচ্ছ করলেন, সেইজন্যে; এ ছাড়া আর কোনও কারণ নেই।

আত্রেয়ী—আমি জানি বউদি।

প্রীতি বৌদি—কী জান?

আত্রেয়ী—নিখিলবাবু খুব মহৎ মানুষ।

মঞ্জু—কথাটা তো বললে, কিন্তু মানেটা বুঝে নিয়ে বলেছ তো?

আত্রেয়ী—বুঝেছি বইকি। নিখিলবাবু কখনও ছোট হয়ে যেতে পারেন না।

মঞ্জু—নিখিল সেনকে ছোট করে দেবার সাধ্যিও কারও নেই।

আত্রেয়ী—খুব সত্যি কথা।

প্রীতি বউদির চোখের রুক্ষ দৃষ্টিটা স্নিগ্ধ হয়ে যায়। মঞ্জুর নীরব মুখের গম্ভীরতাও মুছে যায়। সরিয়াডির মেয়ের মুখ থেকে এই উপলব্ধির ঘোষণাটি শোনবার জন্যেই তো প্রীতি বউদি আর মঞ্জুর মন অশান্ত হয়ে উঠেছিল। যে কথাটা আত্রেয়ীকে বুঝিয়ে দেবার জন্য এত চিন্তা আর চেষ্টা হয়েছে, সেটা বুঝে নিতে পেরেছে আত্রেয়ী। সরিয়াডির মেয়ের বুদ্ধি-শুদ্ধি মতিগতি আর দুঃসাহসের উপর প্রীতি বউদি আর মঞ্জুর মায়ার শাসন সফল হয়েছে।

মল্লিক ডাক্তার একদিন খুশি হয়েই বললেন—হ্যাঁ, এবার একটু দূরে দূরে বেড়িয়ে আসতে পারো মঞ্জু মা। কিন্তু দৌড়াদৌড়ি করো না।

আত্রেয়ী আসতেই মঞ্জুর প্রাণের খুশিটা মুখর হয়ে ওঠে। —ঠিক করেছি আত্রেয়ী, যাবার আগে তোমাকে রাঙিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

আত্রেয়ী—বুঝলাম না।

মঞ্জু—আজ নয়, কাল বিকেলে দুজনে তিরছি নদীর ঝর্ণা দেখে আসি চল। ডাক্তারের কোনও মানা আর নেই।

আত্রেয়ী—বেশ তো।

মঞ্জু হাসে—কিন্তু মুখটি এত শুকনো করে কথা বলছ কেন আত্রেয়ী?

আত্রেয়ী—কী বললে?

মঞ্জু—সুন্দর মুখটিকে একটু রাঙা করে নিয়ে কথা বলো।

আত্রেয়ী—আপনি বলুন তো বউদি, আপনাদের চলে যাবার কথা শুনে মুখ রাঙা করি কী করে?

প্রীতি বউদিও হেসে সায় দেন—ঠিক কথা।

আত্রেয়ীর সুন্দর শুকনো মুখের মধ্যে কালো চোখের তারা দুটো যেন ভিজে গিয়ে চিকচিক করে। মঞ্জু বলে—ছি আত্রেয়ী, এরকম করছ কেন? আমরা আবার ছ'মাস পরে আসছি।

আত্রেয়ী—এত সৌভাগ্য আশা করি না।

মঞ্জু—বিশ্বাস করো। বড়দার তাই ইচ্ছে। সরিয়াডির জলবাতাসে বড়দা খুব উপকার পেয়েছেন।

ব্যস্তভাবে ঘরে ঢোকে নিখিল—ট্রেসপাস করলাম, কিছু মনে করিস না মঞ্জু। আমি এঁকেই একটা কথা বলতে এসেছি।

মঞ্জু—আত্রেয়ীকে?

নিখিল—হ্যাঁ।

মঞ্জু—বলো।

আত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে কথা বলে নিখিল—চলুন, কোথায় আপনাদের তিরছি নদীর ঝর্না; আপনাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি। যাবেন?

আত্রেয়ী—চলুন।

চমকে ওঠে মঞ্জু আর দেখতেও পায়, আত্রেয়ীর এতক্ষণের শুকনো মুখে হঠাৎ হাসির আভা লেগে কেমন রাঙা হয়ে উঠেছে।

মঞ্জু বলে—সত্যিই যাবে নাকি আত্রেয়ী?

আত্রেয়ী—যাই; নিখিলবাবু যখন বলছেন, তখন একটু ঘুরেই আসি।

চলে গেল নিখিল আর আত্রেয়ী।

গেট পার হতে গিয়েই হাসতে থাকে নিখিল—এই দেখুন, আপনি ছুঁয়ে দিয়েছিলেন বলেই জবাটার কত ফুল ফুটেছে।

আত্রেয়ী হাসে—জানি, বোম্বাই থেকে দামি সার আনানো হয়েছে।

নিখিল আর আত্রেয়ীর মুখের হাসির শব্দ গেট পার হয়ে চলে গেল। প্রীতি ডাক দিয়ে বলেন—ওরা দুজনে বেড়াতে বের হল বুঝি মঞ্জু?

মঞ্জু—হ্যাঁ।

প্রীতি বউদি—কেন?

মঞ্জু—জানি না।

১১

কাছারিপাড়ার সড়কের সেগুনের ছায়া ধরে এগিয়ে চলেছে নিখিল আর আত্রেয়ী। সড়কের পাশে মিউনিসিপ্যাল অফিসের রেকর্ড ঘরের ঘুলঘুলিটা যেন সরিয়াডির চোখ, কটমট করে তাকিয়ে দেখছে। ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে বাইরে উঁকি দিতে গিয়ে হেড ক্লার্ক হাবুলবাবুর চোখ যেন একটা যন্ত্রণা চাপতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে জ্বলছে।

লালমাটির ডাঙাটার শিরীষের ছায়াও পার হয়ে চলে গেল নিখিল আর আত্রেয়ী। আজ সরিয়াডির মেয়ে আত্রেয়ীই যেন গাইড হয়েছে; সরিয়াডির অচেনা একটি বাইরের মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। যেতে যেতে নিখিলকেই মাঝে মাঝে সাবধান করে দেয় আত্রেয়ী—আঃ, নুড়িগুলোর ওপর দিয়ে হাঁটছেন কেন? ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটুন।

দেখতে পায়নি আত্রেয়ী, ওদিকের সড়কের উপরে ছোট নালার কালভার্টের কাছে, তিনটি সাইকেলের হ্যান্ডেল শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সরিয়াডির তিনটে আক্রোশ দম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। পরেশ, বিমল আর মাধব, তিনজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে একদিকের মাঠের বুকে এই অদ্ভুত খুশির দুটি মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে।

আত্রেয়ী—আমলকি খাবেন?

নিখিল—কোথায় আমলকি?

আত্রেয়ী হাসে—আচ্ছা, আপনি এখানেই চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকুন।

কয়েক পা এগিয়ে যেয়ে মস্ত বড় একটা কালো পাথরের একেবারে মাথার উপর উঠে

দাঁড়ায় আত্রেয়ী। পাথরটার গা ঘেঁষে আমলকির ঝোপ। ঝোপের মাথার উপর থেকে পট্ পট্ করে আমলকি ছিঁড়ে নিয়ে নিখিলের দিকে ছুঁড়তে থাকে আত্রেয়ী—ধরুন।

নিখিল হাসে—নেমে আসুন, আর দরকার নেই।

আঁকাবাঁকা জংলি নদী তিরছির খাত, বালুর উপর দিয়ে ঝিরঝিরে রোগা জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে শেওলামাথা সেঁতসেঁতে বালু। আত্রেয়ী বলে—আঃ, ওভাবে যেখানে-সেখানে পা ফেলবেন না। চোরাবালি থাকতে পারে।

একটা বেঁটে বুনো খেজুরের গাছ। গাছের তলায় একটা উইঢিবি আর আর কয়েকটা গর্ত। সিগারেট ধরাবার জন্য খেজুর গাছের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে নিখিল।

আত্রেয়ী বলে—সরে আসুন, সরে আসুন।

নিখিল—কেন?

আত্রেয়ী হাসে—ওই দেখুন, দুটো চোখ কী আশ্চর্য হয়ে আপনাকে দেখছে।

একটা গর্তের ভিতর থেকে ছোট্ট একটা শজারুর বাচ্চা ঘাড়ের কচি কচি কাঁটা ফাঁপিয়ে আর চকচকে দুটো রাগের চোখ তুলে তাকিয়ে আছে।

আত্রেয়ী বলে—রামুয়া এখন থাকলে দেখতেন কি কাণ্ড হত?

নিখিল—কী হত?

আত্রেয়ী—শজারুটার চোখে কট্ করে এক মুঠো ধুলো ছিটিয়ে দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে শজারুর মাথাটা চেপে ধরত।

নিখিল—আমিও চেষ্টা করব না কি?

আত্রেয়ী—থাক, আপনার আর এত সাহস করে দরকার নেই। ...শুনতে পাচ্ছেন এখন? ঝর্নার শব্দ?

নিখিল—হ্যাঁ, খুব কাছেই তো মনে হচ্ছে।

আত্রেয়ী—না, এমন কিছু কাছে নয়। এখনও প্রায় আধ ঘণ্টা হাঁটতে হবে।

যেতে যেতেই বুনো কুলের একটা ঝোপ থেকে একটা পাকা কুল তুলে নিয়ে আর মুখে ফেলে দিয়ে হাসতে থাকে আত্রেয়ী—আপনি কিন্তু খাবেন না; আপনার ভাল লাগবে না। মিষ্টি হলেও এ কুল বেশ কষা।

বেশ জোর একটা হোঁচট খেয়েছে আত্রেয়ী, বুঝতে পারেনি আত্রেয়ী, ঘাসের ভিতরে এত বড় একটা ছুঁচলো পাথরের টুকরো লুকিয়ে থাকতে পারে। হঠাৎ ঠোকর লেগে আত্রেয়ীর এক পায়ের চটি দূরে ছিটকে পড়েছে। ঢিলে খোঁপাটাও একেবারে আলগা হয়ে এলিয়ে পড়েছে। পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে আত্রেয়ী—এ কী হল? আত্রেয়ীর পায়ের দুটো আঙুল রক্তে ভরে, গিয়েছে।

চমকে ওঠে নিখিল। পকেট থেকে রুমাল বের করে নিয়েই ব্যস্তভাবে আত্রেয়ীর কাছে এগিয়ে আসে—শেষে একটা কাণ্ড করেই ছাড়লেন।

হাত তুলে, নিখিলের এই চমকে ওঠা ব্যস্ততাকে যেন শান্ত হতে অনুরোধ করে আত্রেয়ী। —থামুন, আপনি একটুও ব্যস্ত হবেন না।

শালের হাওয়া ফুরফুর করছে। দূরের জঙ্গলের ঘুঘু ডেকেই চলেছে। খোলামেলা একটা বিরাট নিরিবিলির মধ্যে নিখিল সেন হঠাৎ যেন একেবারে একলা হয়ে গিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

নিখিল সেনের এই স্তব্ধতা হয়ত একটা চকিত মুগ্ধতা। চোখের কত কাছে একটা অদ্ভুত ছবি। খোঁপাটা পিঠের উপর এলিয়ে পড়েছে; কপালের ঘাম; ভুরু দুটো যেন একটু কুঁচকে আছে; আর ঠোঁটের উপর একটা মিষ্টি হাসির নিবিড়তা থমকে রয়েছে। ঘাসের উপর উবু হয়ে বসে আর একটি হাঁটুর উপর চিবুক পেতে রেখে রুমালের ফালি দিয়ে পায়ের পাতার জখমের

আঙুল দুটোকে বাঁধছে আত্রেয়ী। সিঁথিতে গুঁড়ো সিঁদুরের সরু দাগটা আর দু'হাতের সোনার রুলির পাশে দুটো শাঁখা। প্রদোষ সরকারের মেয়ে আত্রেয়ী। অদ্ভুত এক স্টাইলের সাজে সেজে নিয়ে বেড়াতে বের হয়েছে।

নিখিল সেনের এই স্তব্ধতার মুখে কিন্তু অদ্ভুত একটি কৌতুকের হাসিও নীরব হয়ে কাঁপছে। কেমন চট করে আর কত শক্ত ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে নিখিলকে থামিয়ে দিয়েছে সরিয়াডির এই মেয়ে আত্রেয়ী। যদি এখন বিধাতা মশাই নিজেই এসে আর মায়া করে আত্রেয়ীর পায়ের ক্ষতের কাছে হাত এগিয়ে দেন, তবু আত্রেয়ী বোধ হয় এইভাবে হাত তুলে থামিয়ে দেবে—আপনি এতো ব্যস্ত হবেন না।

ভাল; প্রদোষ সরকারের মেয়ের এই ভয় লজ্জা আর সতর্কতার মধ্যে যেমন বোকা একটা অবিশ্বাস, তেমনই একটা বোকা স্পর্ধাও আছে। তবু দেখতে মন্দ লাগে না।

একটা সত্য কথা এখনই বলে দিতে পারে নিখিল; কিন্তু সেটা বেশ একটু রূঢ় অহংকারের কথা হবে বলেই স্পষ্ট করে বলে দিতে ইচ্ছে করে না। স্কুলে পড়বার সময়ই ফার্স্ট এড শিখেছিল নিখিল; আর ফ্রান্সের একটি বছরের মধ্যে দুটি মাস রেড ক্রসের অ্যাম্বুলেন্সের ভলান্টিয়ারও হয়েছিল। আহতের জন্য মায়া করে রুমাল হাতে নিয়ে কাছে ছুটে যাওয়া নিখিলের জীবনের একটা অভ্যেস মাত্র। এ ছাড়া সরিয়াডির মেয়ের পায়ের জখম ব্যান্ডেজ করে দেবার জন্য কোনও গরজ নিখিল সেনের মত মানুষের প্রাণে থাকতেই পারে না।

আত্রেয়ী বলে—চলুন এবার।

তিরছি নদীর কিনারা ধরে আরও অনেকেই হেঁটে চলেছে। বুঝতে পারা যায় ওরা এক-একটি পিকনিকের দল।

আত্রেয়ী বলে—মল্লিক ডাক্তারই সব গোলমাল করে দিলেন। তা না হলে এতদিনের মধ্যে অন্তত একটি দিন মঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে এসে আপনারা এখানে পিকনিক করে যেতে পারতেন। কত খুশি হত মঞ্জু।

নিখিল—এবার আর হল না।

আত্রেয়ী—আবার কখনও কি আপনারা আসবেন?

নিখিল—আমার তো আপত্তি নেই। কিন্তু ওরা সত্যিই আবার আসতে চাইবে কিনা সন্দেহ।

আত্রেয়ী—তা হলে আপনি একাই আসবেন। অসুবিধের কী আছে? শ্রীলেখা কটেজ তো আপনারই কাকার বাড়ি। অন্য কাউকে ভাড়া দিতে মানা করে দেবেন।

নিখিল হাসে—আপনি কি মনে করেন, চাকরি করি না বলেই আমার কোনও কাজটাজ নেই?

আত্রেয়ী—তা মনে করব কেন? নিশ্চয়ই আপনার অনেক কাজ আছে। কিন্তু কাজের চাপ থেকে মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে চলে আসবেন। এই যে, দেখুন চেয়ে, ঝর্নার জল নীচের পাথরের উপর আছাড় খেয়ে পড়ছে আর গড়িয়ে যাচ্ছে।

নিখিল—বাঃ, আগে ধারণা করতে পারিনি, এমন বিরাট আর বিশাল একটা ঝর্না দেখতে হবে।

আত্রেয়ী—ঠাট্টা করছেন? কিন্তু খুব ভুল ঠাট্টা। একবার শ্রাবণ মাসে এসে দেখবেন, এই জিরজিরে রোগা ঝর্নার চেহারা সত্যি বিরাট হয়ে ওঠে কিনা? দেখলে ভয় পেতে হবে।

নিখিল—চেষ্টা করব তা হলে; দেখি কোনও শ্রাবণ মাসে আসতে পারি কিনা।

দশ-বারো হাত উঁচু খাড়াই পাথরের মাথার উপর থেকে নীচের পাথরের উপর রোগা তিরছি নদীর একটা লিকলিকে ধারা ঝরে পড়ছে। এপারের ব্যাঙ লাফ দিয়ে ওপারে চলে যাচ্ছে। জলের বুদ্বুদের ছোট ছোট ফোসকা ভেসে উঠেই ফেটে যাচ্ছে। শালবনের হাওয়া রোগা ঝর্নার জলের ঝরঝর শব্দটাকে হঠাৎ এক-একটা ঝাপটা দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে সবে পড়ছে।

আত্রেয়ী—জলের ওপারে যাবেন?

নিখিল—চলুন।

রোগা জলের ধারাটা দু' হাতের বেশি চওড়া নয়। এক লাফে পার হয়ে গিয়েই ভিজে বালুর উপর দাঁড়িয়ে আত্রেয়ীর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় নিখিল—চলে আসুন।

নিখিলের আগ বাড়ানো হাতের ইচ্ছাটাকে চোখে বোধ হয় দেখতেই পেল না আত্রেয়ী। পায়ের চটি দুটোকে খুলে আর হাতে তুলে নিয়ে আর একেবারে খুশি হরিণীর মত ত্বরিত-চটুল ভঙ্গিতে একটি লাফ দিয়ে জলের ধারাটাকে ডিঙিয়ে পার হয়ে যায় আত্রেয়ী।

নিখিলের মুখে খুশির হাসিটা যেন একটু ঠান্ডা লাগা কাঁপুনির মত সিরসির করে ওঠে। —আপনি বোধ হয় স্কুলের স্পোর্টে...।

আত্রেয়ী—স্কুলে নয়, স্কুলে আমি পড়িনি। কিন্তু দিবাকরদা মাঝে মাঝে স্পোর্ট করাতেন; তাতে আমিই...

নিখিল—লং জাম্পে ফার্স্ট হয়েছিলেন?

আত্রেয়ী কলকল করে হেসে ওঠে—নিশ্চয়।

এইবার, তিরছি নদীর জলের ধারার এপারে ধানক্ষেতের আল ধরে ধরে কিছুদূর হাঁটলেই ধানোয়ার রোডের উপরে ছোট একটা আমগাছের ছায়ার কাছে পৌঁছতে পারা যায়।

নিখিল বলে—রোদটা বেশ কড়া।

আত্রেয়ী—এদিকে তো গাছটাছ নেই; কোথায় দাঁড়াবেন?

নিখিল—না, দাঁড়াতে চাই না।

কিন্তু ধানোয়ার রোডের উপরে এসে উঠতেই হাঁপ ছাড়ে নিখিল আর হাঁটার ব্যস্ততাও মৃদু হয়ে যায়। —বাঃ বেশ চমৎকার ছায়া।

ছোট গাছ, ছায়াটাও ছোট, এমন ছায়ার মধ্যে জায়গাই বা কতটুকু?

আত্রেয়ী—আপনি এখানে একটু জিরিয়ে নিন।

নিখিল—আপনি কী করবেন? চলে যাবেন?

আত্রেয়ী হাসে—না; আমি এখন তিলকের মার সঙ্গে একটু গল্প করব।

নিখিল—কে তিলকের মা?

আত্রেয়ী—ওই যে, রাস্তার পাশে ঝুড়ি নিয়ে বসে রয়েছে। ঝুড়িতে বরবটি।

নিখিল—বুড়ি যে রোদের মধ্যে বসে আছে।

আত্রেয়ী—তাতে কী হয়েছে?

এগিয়ে যায় আত্রেয়ী। তিলকের মার সঙ্গে কথা বলে আর বরবটির দর করে। আমের ছায়ায় একাই দাঁড়িয়ে আর সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে নিখিল—বরবটি কিনবেন নাকি?

আত্রেয়ী—না।

নিখিল—তবে চলুন। হ্যাঁ, একটা কথা বলি। আপনি কিন্তু বেশ অবুঝ মানুষ।

আত্রেয়ী—কেন?

নিখিল—কি কাণ্ডই না করলেন। হোঁচট খেলেন, আর রোদে মুখ শুকিয়ে গেছে, তবু একটু ছায়াতে দাঁড়াতেও ভুলে গেলেন।

আত্রেয়ী—ওতে কী আসে যায়?

নিখিল—না; খুব আসে যায়। আপনি একটু বুঝে দেখুন।

আত্রেয়ী হাসে—বুঝলাম না।

নিখিল—আজ যদি হেমন্তবাবু আপনাকে এসব কাণ্ড করতে দেখতেন, তবে...।

চমকে উঠে আর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রাস্তার পাশের ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী।

নিখিল—তবে তিনি আপনাকে নিশ্চয় বুঝিয়ে দিতে পারতেন।

সিগারেটের টুকরোটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই নিখিল আবার বলে—হেমন্তবাবু কি দুঃখিত হতেন না? আর আপনাকে ধমক দিয়ে দু-একটা কথা না বলেও ছাড়তেন?

ঢিলে খোঁপাটাকে একটু শক্ত করে এঁটে দিয়ে আত্রেয়ী যেন একটা নিরেট নীরবতা হয়ে হাঁটতে থাকে।

নিখিল বলে—আপনাকে একটু বুঝিয়ে বলবার মত এখন কেউ নেই বলেই আমি গায়ে-পড়ে আপনাকে এসব কথা বলছি। কিছু মনে করবেন না। আপনি আপনার নিজের দিকে একটু লক্ষ্য আর যত্ন রাখবেন, আপনি এখন শুধু আপনারই নিজের কেউ নন, আপনি আর একজনের অনেক আশার মানুষ।

আত্রেয়ীর মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নেয় নিখিল। দেখে খুশি হয়, আত্রেয়ীর নীরবতার মুখটা যেন একটা স্নিগ্ধ আলোর আভায় ভরে গিয়েছে।

নিখিল বলে—আমি তো বাইরের মানুষ, দুদিন পরেই চলে যাব। শুধু মুখের ভদ্রতা করে দু'একটা কথা বলা ছাড়া আপনার আর কোনও উপকার তো করতে পারবো না।

ডাঙার জংলি শিরীষের রঙিন মাথা দুলছে, এখান থেকেই স্পষ্ট দেখা যায়। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে নিখিল বলে—একটা অনধিকার চর্চা বটে; কিন্তু বিশ্বাস করুন, ফিলসফি আর সায়েন্সের বই পড়ি আর চায়ের শেয়ারে যত পাওনা ডিভিডেন্ডের হিসাবই করি, হঠাৎ আমার মত মানুষের শক্ত মনও যেন ছটফট করে ওঠে, হেমন্তবাবু আর কত দেরি করবেন?

সরিয়াডির থানার আউটপোস্ট; বারান্দার দেয়ালে গা এলিয়ে দিয়ে একটা রাতজাগা পাহারার চৌকিদার অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

নিখিল বলে—সত্যি যদি কখনও সুযোগ পাই, তবে একদিন নিশ্চয় আসব। অন্তত আপনাদের দুজনকে দেখবার জন্যে একবার আসব। তখন কিন্তু...।

হাসতে থাকে নিখিল। আত্রেয়ীও হেসে ফেলে—বলুন না, কী হবে তখন?

নিখিল—কী আর হবে? আপনি হয়ত অনেক কষ্টে চিনতে পারবেন আর বলবেন, হ্যাঁ, এই লোকটা একদিন গায়ে পড়ে অনেক বাজে কথা বলেছিল।

আত্রেয়ী—একটুও বাজে কথা নয়। কিন্তু আপনি কি সত্যিই আসবেন?

নিখিল—আসব।

আত্রেয়ী হাসে—এটা কিন্তু বাজে কথা।

নিখিল—এতটা মিথ্যেবাদী মনে করবেন না।

আত্রেয়ী—মঞ্জুর বিয়ে হয়ে গেলে যেন একটা খবর পাই।

নিখিল—মঞ্জুর বিয়ে? হ্যাঁ, হতে পারে। কিন্তু সে-কথা আপনাকে জানাতে হলে আমার কিছু লেখবার দরকার হবে না মঞ্জু নিজেই আপনাকে দশ পাতা চিঠি লিখবে।

আত্রেয়ী—আরও একটা খবর, যেটা আপনি...

নিখিল চেঁচিয়ে হেসে উঠে—হ্যাঁ, সেরকম কিছু যদি হয়, তবে তার খবর মঞ্জুর চিঠিতে জানতে পারবেন।

কাছারিপাড়ার সড়কের সেগুন গাছের ছায়া পার হয়ে অমিয় ভবনের কাছে এসে পৌছতেই থমকে দাঁড়ায় আত্রেয়ী। অমিয় ভবনে ভাড়াটে নেই। খালি বাড়িটাকে চুনকাম করা হচ্ছে। আত্রেয়ী বলে—আমি এখন আর আপনাদের কটেজে যাব না নিখিলবাবু। সোজা বাড়িতেই ফিরে যাব।

নিখিল—আসুন।

অমিয় ভবনের একটা জানালা হঠাৎ কড়মড় করে বেজে উঠেই বন্ধ হয়ে গেল। হয়ত কেয়ারটেকার হাজরাবাবু নিজেই জানালাটাকে এক ঠেলা দিয়ে আচমকা বন্ধ করে দিয়েছেন।

—মার মার মার! ভয়ানক চিৎকার করে কথা বলছে দূরের একটা হল্লার আক্রোশ।

মোটর মিস্তিরি পটলবাবু তখন তাঁর বাগানের একটা টিনের শেডের ভিতরে বসে গৌরীনাথের ট্যাক্সির কারবুরেটার মাত্র একটু খুলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে হল্লার শব্দটা ছুটে এসে তাঁর কাজের মনটাকে বিশ্রীভাবে চমকে দিল।

আদুড় গা আর কালিঝুলিমাখা, একটি গামছা পরা পটলবাবু সেই মুহূর্তে লাঠি হাতে নিয়ে দৌড় দিলেন।

পটলবাবুর বাড়ি থেকে সামান্য একটু দূরে নয়াপাড়ার সড়ক যেখানে রেলের লেবেল ক্রসিংয়ের কাছে এসে শেষ হয়েছে, সেখানে ছোট একটা ভিড় দাঁড়িয়ে আছে, চিৎকার করছে।

শুধু চুপ করে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের একটা দল; তার মধ্যে সন্তু আর চিনুও আছে।

সন্তুর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন সামন্তবাবু—যা যা যা, তোরা চলে যা এখান থেকে। তোদের আর এখানে দাঁড়িয়ে বেশি মায়া দেখাতে হবে না।

পটলবাবুর দিকে তাকিয়ে হাজরাবাবু বলেন—লাঠির দরকার নেই; অনাদি এখনি এক গুলিতে ওটাকে সাবড়ে দিতে পারবে।

সামনেই একটা শুকনো অড়হরের ক্ষেত; তারই উপর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দৌড়ে চলে যাচ্ছে রুগ্‌ণ হেনরি। এক হাতে বন্দুকটাকে শক্ত করে ধরে অনাদিও এক একটা লাফ দিয়ে হেনরিকে ধাওয়া করে চলেছে। গায়ে পোকাপড়া হাড়সার চেহারার ওই কুকুর হেনরি দিন দুই হল পাগলা হয়ে গিয়েছে। ডাক পিয়নের পা কামড়ে দিয়েছে, শ্রীপদবাবুর গরুটাকেও কামড়েছে, আর মল্লিক ডাক্তারকে তিনবার তাড়া করেছে।

সরিয়াডির বুকের ভিতরে এই ক'মাস ধরে গুমরে গুমরে কাঁপছিল যে ভিতু আক্রোশ, যেন সেই আক্রোশই এইবার একটা হিংস্র হল্লা হয়ে ফেটে পড়ছে। ফেটে পড়ল অনাদির বন্দুকের গুলির শব্দ। চেঁচিয়ে উঠলেন সামন্তবাবু—ঠিক হ্যায়; চলে এসো অনাদি।

হাওয়ানগর সরিয়াডির এতদিনের নরম আত্মাটা এইবার সত্যিই যেন শক্ত পাথরের ঢেলা হয়ে সব উপদ্রব তাড়িয়ে দেবার জন্য তৈরি হয়েছে।

আর দু'দিন পরেই ফণী মিত্রের গাড়িটা বাক্স বেডিং সঙ্গে নিয়ে সোজা জি টি রোডের দিকে যেন আতঙ্কিতের মত ছুটে চলে গেল। অন্ধকারে কে যেন একটা ইট ছুঁড়ে ফণী মিত্রের গাড়ির হেড লাইট চুরমার করে দিয়েছে।

একদিন, ঠিক সকাল আটটার সময়, রজনীধামের কাছে সড়কের মোড়ের উপর জগৎ ব্যানার্জি যখন পাইপ ধরাবার জন্যে একটু দাঁড়িয়েছেন, তখন তাঁর দু'পাশে হঠাৎ দুটো সাইকেল ছুটে এসেই থেমে যায়। সাইকেল থেকে যারা দুজন নামে, তারা কোনও কথা বলে না। শুধু জগৎ ব্যানার্জির দুপাশে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর একটি দিনও দেরি করলেন না জগৎ ব্যানার্জি, সন্ধ্যার ফার্স্ট প্যাসেঞ্জারেই সরিয়াডি ছেড়ে চলে গেলেন।

একদিন হাওয়াইয়ের ফটকের সামনে দিবাকরকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই ভ্রূকুটি করলেন নাগ সাহেব। —কে তুমি? কি মতলব?

দিবাকরও ভ্রূকুটি করে তাকায়। —একটা মেয়েছেলে যোগাড় করে দিতে পারেন, রান্নার কাজ করবে? মাইনে কুড়ি টাকা।

নাগসাহেবের চোখ দপ করে জ্বলে ওঠে। —কী বললে? এর মানে কী?

দিবাকরেরও চোখ জ্বলে—বুঝে দেখুন।

নাগসাহেবের গালের মাংস কাঁপতে থাকে। —না, বুঝে দেখবার কিছু নেই।

দিবাকরের চোয়াল শক্ত হয়ে থর থর করে। —আছে।

নাগসাহেবের কটমটে রাগের চোখ দুটো সাদা হয়ে যায়। বিড়বিড় করে কথা বলেন। —তুমি চলে যাও।

দিবাকর দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলে—আপনি চলে যান।

নাগসাহেবের সারা শরীরে যেন সরিয়াডির শীতের সব কাঁপুনি ভর করছে; কাঁপতে থাকে নাগসাহেবের গলার স্বর। —অলরাইট। তাই হবে।

নাগসাহেবের এত চমৎকার বাড়ি, যার নাম হাওয়াই, তার ফটকের থামের গায়ে হাতে লেখা হরফে বেশ বড় একটা পোস্টার দেখা যায়—ফর সেল।

পরের দিন সন্ধ্যা হয়ে যাবার পরেও হাওয়াইয়ের কোনও আলো আর ঝলমল করে জেগে উঠল না। কেউ জানতেও পারেনি, ঠিক কখন চলে গেলেন নাগসাহেব। বোধ হয় শেষ রাতের আবছা অন্ধকারের মধ্যে নাগসাহেবের গাড়িটা গা-ঢাকা দিয়ে, হেড লাইট না জ্বালিয়ে, কোনও শব্দ না করে, খুব স্লো স্পিডে, যেন পা টিপে টিপে সরে পড়েছে।

—কী হল? কী ব্যাপার? কদিন ধরে রোজই সন্ধ্যায় হই হই করে পথে বের হয়ে আর হাঁক দিয়ে বেড়াতে শুরু করেছেন চন্দ্রবাবু। ঠিক সন্ধ্যা হলেই কোথা থেকে সাংঘাতিক একটা ধুলোর ঘূর্ণি এসে নয়াপাড়ার সড়ক ধরে ছুটে চলে যায়। সরিয়াডির শীতের সন্ধ্যার ঝিমানো বাতাস বুঝি হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ধুলো ওড়াতে শুরু করেছে; আশ্চর্য না হয়ে পারবেন কেন চন্দ্রবাবু। —ওহে সামন্ত, এত ধুলো কেন? ধুলোতে আবার এত গরম কিসের?

ধুলোর ঘূর্ণি থেকে গরম কাঁকরের কুচি শ্রীলেখা কটেজের জানালার কাচে আর আলো-জ্বলা বারান্দার উপর ছিটকে এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বারান্দার উপর উঠে শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন হাবুলবাবু আর গোষ্ঠবাবু। —বাড়িতে কে আছেন?

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে নিখিল। —বসুন।

চেয়ারে বসেই হাবুলবাবু বলেন। —আপনারা যাবেন কবে?

নিখিল—কেন জিজ্ঞেস করছেন, বলুন তো?

গোষ্ঠবাবু—এর মধ্যে কোনও কেন নেই মশাই; জানতে চাই, কবে আপনারা যাচ্ছেন?

নিখিল—বলছি; আপনারা কষ্ট করে একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আসছি।

কটেজের চাকর ছোট একটা টেবিল ঘরের ভিতর থেকে তুলে নিয়ে এসে বারান্দায় রেখে গেল; আর দুহাতে দু'পেয়ালা চা নিয়ে বের হয়ে এল নিখিল সেন। মঞ্জুও এল; দু'ডিস খাবার টেবিলের উপর রেখে দিয়ে মঞ্জু আবার ঘরের ভিতরে চলে গেল। যাবার সময় গোষ্ঠবাবুর দিকে হাত তুলে দুটো নমস্কারও জানিয়ে গেল মঞ্জু।

হাবুলবাবু বলেন—এসব আবার কেন?

গোষ্ঠবাবু—আমরা যে কথা জানতে এসেছি; শুধু সেই কথাটা জেনে নিয়েই চলে যাব।

নিখিল—বেশ তো, চা খান। আর, যা বলবার আছে, সবই বলুন।

দরজার পর্দা সরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন প্রীতি বউদি; তাঁর পাশে মঞ্জু। প্রীতি বউদির চোখে শঙ্কা। মঞ্জুর চোখে আতঙ্ক।

প্রীতি বউদি বলেন—আপনারা আগে চা খেয়ে নিন। তারপর গল্প করুন। আমি এই নিখিলের বউদি।

মঞ্জু—বড়দা ভেতরের ঘরে বসে আছেন। পায়ে বাতের ব্যথা; তা না হলে নিজেই এসে আপনাদের চা খেতে বলতেন।

হাবুলবাবু—না, সেটা কোনও প্রশ্ন নয়; কোনও দরকার নেই।

গোষ্ঠবাবু—শুধু একটা কাজের কথা বলতে এসেছি।

মঞ্জু—বলুন; কিন্তু তার আগে চা খেয়ে নিন।

হাবুলবাবু—তা খাচ্ছি; কিন্তু কথাটা হল...।

গোষ্ঠবাবু—কথাটা শুধু এই নিখিলবাবুকেই বলতে চাই।

প্রীতি বউদি আর মঞ্জু ঘরের ভিতরে যেতে যেতেই নিখিল বলে—কথাটা শুধু যদি আমাকেই বলতে চান, তবে এখানে না বলে...।

হাবুলবাবু—হ্যাঁ, চলুন, বাইরে গিয়ে রাস্তাতেই কথা বলি।

নিখিল—কিন্তু চা আর খাবার খেয়ে নিন।

চা খেলেন, কিন্তু খাবার খেলেন না গোষ্ঠবাবু। আর রাস্তাতে এসেই নিখিলের চোখের সামনে দুজনে আরও শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন।

হাবুলবাবু—আপনি কি জানেন না, আমাদের প্রদোষদার মেয়ে, আত্রেয়ীর অনেক দিন আগেই বিয়ে হয়েছে।

নিখিল—জানি বইকি। বোধ হয়, প্রায় সাড়ে তিন বছর হল...।

গোষ্ঠবাবু—এই হিসেবটা তো ঠিকই রেখেছেন, দেখছি। কিন্তু আত্রেয়ীর সঙ্গে আপনার ব্যবহারটা কেন এত বেহিসেবী হয়ে উঠল?

নিখিল—বুঝেছি, আপনারা কী বলতে চাইছেন।

হাবুলবাবু—এখন আপনার কী বলবার আছে বলুন।

হেসে ফেলে নিখিল—আমার কিছু বলবার নেই।

গোষ্ঠবাবু—তবে কে বলবে?

নিখিল—প্রদোষবাবুর মেয়ে আত্রেয়ীই বলবে। তাকে জিজ্ঞাসা করুন।

হাবুলবাবুর গলার স্বর ক্ষুব্ধ হয়ে ঘড়-ঘড় করে—কী জিজ্ঞেস করব আত্রেয়ীকে?

নিখিল—আমি কোনও বেহিসেবী ব্যবহার করছি কিনা; আমি বেহিসেবী ব্যবহার করবার মত একটা লোক কিনা; আত্রেয়ীকে জিজ্ঞেস করলে সবই জানতে পারবেন।

গোষ্ঠবাবু—তা না-হয় আত্রেয়ীকে জিজ্ঞাসা করা যাবে; কিন্তু আপনি যাচ্ছেন কবে?

নিখিল হাসে—ঠিক কবে যাব বলতে পারি না। তবে এমাসেই চলে যাবার কথা আছে।

হাবুলবাবু—ভাল কথা।

নিখিল—খুব সম্ভব, আবার আসব।

গোষ্ঠবাবু—কেন?

নিখিল—ইচ্ছে।

হাবুলবাবু—ফল খুব খারাপ হবে।

নিখিল—হলে হবে।

গোষ্ঠবাবু—আত্রেয়ীর স্বামী এখন কোথায় আছে, জানেন নিশ্চয়?

নিখিল—জানি।

হাবুলবাবু—সে যে একদিন এসেও পড়বে, সেটা কি ভুলে গেছেন?

নিখিল—আমি চাই তিনি শিগগির এসে পড়ুন।

গোষ্ঠবাবু—তখন কী হবে?

নিখিল হাসে—তখন আমি অন্তত আপনাদের চেয়ে বেশি সুখী হব।

হাবুলবাবু—তার মানে?

নিখিলবাবু—তার মানে, প্রদোষবাবুর মেয়ের জীবনের জন্য আপনাদের মত স্থায়ীদের মনে যত মায়া আছে, আমার মত একজন অস্থায়ীর মনে বোধ হয় তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম মায়া নেই।

গোষ্ঠবাবুর গলার স্বরের কড়া মেজাজ হঠাৎ যেন নরম হয়ে যায়। ...আপনি একটা ভাল কথা, বেশ চমৎকার কথাই বলেছেন, কিন্তু?

হাবুলবাবু বেশ জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন—এরকম হলে তো ভালই হয়, কিন্তু...।

নিখিলেরও মুখের ভাষা সব রুক্ষতা হারিয়ে গিয়ে একেবারে স্নিগ্ধ হয়ে যায়। —কোনও কিন্তু নেই। আমি বাইরের মানুষ, আপনাদের প্রদোষদার মেয়ের দুঃখের জীবনকে খুশি করে রাখবার জন্যে আমি আর কতটুকুই বা কি করতে পারি? সেটা আপনাদের কাজ, আপনারাই করবেন। আমি দু'দিনের জন্যে এখানে এসে দু'দিনের চেনা এক মহিলাকে শুধু মুখের ভাষায় একটু ভদ্রতা দেখিয়ে চলে যেতে পারি, এই মাত্র।

গোষ্ঠবাবু হঠাৎ একেবারে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে ফেলেন—সেটা আপনার মহত্ত্ব।

হাবুলবাবু—বাণীদির কাছ থেকে আপনাদের কত প্রশংসার কথা শুনেছি। মনেও হয়েছে, আপনারা কি কখনও কারও ক্ষতি করতে পারেন? কখনই না।

নিখিল হাসে—কারও ক্ষতি করব, সে রকম সাংঘাতিক সাহস অন্তত এখনও পর্যন্ত...।

গোষ্ঠবাবু—না না, ওরকম জঘন্য সাহস আর যেই করুক না কেন, আপনার পক্ষে সেটা সম্ভবই নয়।

হাবুলবাবু—আপনার দাদা সরিয়াড়ির জল-বাতাসে কিছু উপকার পেয়েছেন নিশ্চয়?

নিখিল—দাদা তো বলছেন পেয়েছেন।

গোষ্ঠবাবু—আপনি?

নিখিল হাসে—আমার শরীরটা তো সরিয়াড়ির জল-বাতাসের কাছে নতুন করে কোনও স্বাস্থ্য আশা করে না।

হাবুলবাবু—দরকারও হয় না। আপনার তো এমনিতেই সুন্দর স্বাস্থ্য।

নিখিল—তবে আমিও একটি উপকার পেয়েছি। বেশ মন লাগিয়ে পড়াশুনো করতে পেরেছি।

গোষ্ঠবাবু—শুনে খুবই খুশি হলাম নিখিলবাবু। একটা দুঃখের কথা কী জানেন? এখানে হাওয়া বদল করতে যাঁরা আসেন, তাঁদের অনেকেই সব সময় শুধু ফূর্তির কথা ভাবেন। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কলকাতার অধরবাবুর মত; বর্ধমানের শৈলেশবাবুর মত...।

হাবুলবাবু—আর মেদিনীপুরের সরোজবাবুর মত...।

গোষ্ঠবাবু—হ্যাঁ, অত্যন্ত সদাশয় মানুষও এসেছেন। কী চমৎকার হৃদয়; আর কত সুন্দর ব্যবহার। শৈলেশবাবু চলে যাবার সময় আমার হাত ধরে কেঁদে ফেলেছিলেন।

হাবুলবাবুর চোখের দৃষ্টিটা প্রসন্ন হয়ে হাসতে থাকে। —আপনারা আরও কটা দিন এখানে থেকে গেলেও পারেন। আচ্ছা, আমরা এখন তবে চলি।

১৩

গম্ভীর পাগল দুর্গাচরণের একটা অদ্ভুত অভ্যাস আছে। পথে যেতে চেনা-অচেনা কোনও মহিলার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হলেই এক লাফে পথের এক পাশে সরে যায়। মুখ ফিরিয়ে আর মাথা হেঁট করে কুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। সে সময় দুর্গাচরণের গম্ভীর মুখটা বিচিত্র এক লজ্জার হাসিতে ভরে যায়।

—আর একটু বেশি মেজাজ খারাপ করলে বড়ই লজ্জার ব্যাপার হয়ে যেত, গোষ্ঠদা। বলতে গিয়ে বেশ একটু লজ্জিতভাবে হেসে ফেলেন হাবুলবাবু; আর মাথা হেঁট করে দাবার ছকের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

গোষ্ঠবাবুও লজ্জিতভাবে হাসেন—ছিঃ, ভুল ধারণা করে কী বিশ্রী একটা কাণ্ড বাধাতে চেয়েছিলেন।

হাবুলবাবু—আসল অসুবিধেটা কী জানেন? খুব বেশি ভাল লোক হলে তাঁকে চিনতে সকলেই ভুল করে।

গোষ্ঠবাবু—তা বটে; কিন্তু ছোটলোক দেখে দেখে আমাদের চোখের অভ্যেসও খারাপ হয়ে গিয়েছে; তাই ভদ্রলোক চিনতে পারি না।

দিবাকরও লজ্জা পেয়েছে। এই লজ্জার মধ্যে যেন একটা বিস্ময়ের চমক আছে; শ্রীলেখা কটেজের নিখিলকে সত্যিই যে ভদ্রতার একটা বিস্ময় বলে মনে হয়। আত্রেয়ীর স্বামী তাড়াতাড়ি চলে আসুক, এমন প্রার্থনা যার মনের মধ্যে রয়েছে তাকেই আত্রেয়ীর জীবনের একটা ক্ষতির মতলব বলে সন্দেহ করা হয়েছে। ঠিকই বলেছেন গোষ্ঠদা, মানুষ একটু বেশি মহৎ হয়ে গেলে লোকে তাকে চিনতে খুবই ভুল করে।

এক আনাতে চার জোড়া পাকা তাল দিয়ে চলে গিয়েছে এক দেহাতি বুড়ি। চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন চিনুর পিসিমা—ওরে ও চিনু, দেখ তো মা, বুড়িটা চলে গেল নাকি? ভুল করে দুজোড়া বেশি দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

পিসিমার হাসিটা যেমন একটা হঠাৎ খুশির তেমনই একটা হঠাৎ লজ্জার হাসিও বটে। যা ধারণা করা হয়েছিল, তা নয়। তার চেয়ে বেশি দিয়ে ফেলেছে বুড়িটা। ঠকাবে বলে মিথ্যে সন্দেহ করা হয়েছিল বুড়িটাকে, আর অনেক দরাদরিও করা হয়েছিল। ছি।

চিনু বলে—চলে গিয়েছে বুড়ি।

পিসিমা—তবে একবার একটু দৌড়ে গিয়ে দেখে আয় তো মা, প্রদোষ জ্যাঠা কী করছেন? ঘুমিয়ে আছেন, না হেসে-হেসে গল্প করছেন?

চিনু—দেখেছি।

পিসিমা—কী দেখেছিস?

চিনু—প্রদোষ জ্যাঠা গান গাইছেন।

লজ্জা পেয়েছে আর নিশ্চিন্ত হয়েছে ছোট শহর সরিয়াডি। মনে মনে একটা পরাভবও খুশি হয়ে স্বীকার করে নিয়েছে। হাওয়াবদলের জন্য বাইরে থেকে শুধু দুদিনের ফুর্তিগুলি আর স্বার্থগুলি আসে না; দুদিনের একটা মহত্ত্বও আসে।

লজ্জা পেয়ে সরিয়াডির প্রাণটাও এবার থেকে বেশ সামলে থাকতে চেষ্টা করছে। নিখিলের সঙ্গে পথে দেখা হলেই নমস্কার জানায় দিবাকর—ভাল আছেন?

দেখতে পাওয়া যায়, হাওয়া বদলের জন্য সরিয়াডিতে এসে কদিন থেকে দুজন আগন্তুকের মূর্তি নয়াপাড়ার সড়ক ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়ায়। নিতান্ত অল্পবয়সের এক স্বামী ও তার স্ত্রী; প্রায় কচি বয়সের একটি মেয়ে। একেবারে শুকনো সাদাটে ও জিরজিরে শরীরের মেয়েটিকে দেখেই চিনে নিতে পারা যায়, ওটা এক টি.বি. রোগীনীর করুণ মূর্তি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বেড়াতে বের হয়ে মাঝে-মাঝে সরিয়াডির যত স্থায়ীদেরই বাড়ির গেটের কাছে চুপ করে কিন্তু যেন বেশ ভয়ে-ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

না, আর ভুল করেন না হাবুলবাবু। হাবুলবাবুর এতদিনের কড়া মেজাজের চোখ দুটো যেন একটু করুণ হয়ে যাবার জন্যেই ছটফট করে। গেটের কাছে এগিয়ে যান হাবুলবাবু। —কেমন বোধ করছ এখানকার জলবাতাস? ভাল?

ছেলেটি হাসে—হ্যাঁ ভাল তো বটেই; তার চেয়ে ভাল আপনাদের আশীর্বাদ।

হাবুলবাবু—অ্যাঁ? চমকে ওঠেন হাবুলবাবু।

ছেলেটি বলে—আপনাদের আশীর্বাদ থাকলেই কুন্তলার রোগ ভাল হয়ে যাবে।

কুন্তলার বড়-বড় চোখ দুটো চকচক করে। সরু শীর্ণ গলাটা একবার কেঁপে ওঠে; তারপরেই মাথা হেঁট করে হাসতে থাকে কুন্তলা।

অদ্ভুত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন হাবুলবাবু—নিশ্চয়, নিশ্চয় কুন্তলা সেরে উঠবে, তুমি ভাবছ কেন?

বাড়ির ভিতর থেকে হাবুলবাবুর স্ত্রী বের হয়ে আসেন। কাছের বাড়ি থেকে গোষ্ঠবাবু ও তাঁর স্ত্রী বের হয়ে আসেন। সবাই এক সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে কথা বলেন—ভাল হবে বইকি। একটুও ভেবো না।

—শুধু একটু সাবধানে থেকো।

—ডাক্তারের কথা শুনে চলবে।

—কোনও ওষুধ দরকার হলেই বলো, গয়া থেকে আনিয়ে দেবে দিবাকর।

শ্রীলেখা কটেজের সামনের মাঠের উপর দৌড়ে দৌড়ে ঘুড়ি ওড়ায় সন্তু। কটেজের মাথার উপরের আকাশে সন্তুর ঘুড়িটা ডগমগ হয়ে দুলছে। চেঁচিয়ে ডাক দেয় সন্তু—একবার এসে দেখে যাও, মঞ্জুদি, আমার ঘুড়ি তোমাদের বাড়ির ধোঁয়ার ওপরে উঠে গেছে।

কে জানে কবে আর কেমন করে, মঞ্জুর সঙ্গে ভাব করে ফেলেছে সন্তু। কিন্তু সন্তুর এমন উৎফুল্ল স্বরের ডাক শুনেও ঘরের বাইরে বের হয়ে আসে না মঞ্জু। মঞ্জু বড় গম্ভীর। ছোট্ট সন্তুর ডাক তো, নয়, ওটা যেন সরিয়াডির একটা ভয়ানক গর্বের ডাক।

মঞ্জুর আর ঝর্না দেখতে যাওয়া হয়নি। যেতে চায়ও না মঞ্জু। আত্রেয়ী অবশ্য রোজই আসে আর ঝর্না বেড়াতে যাবার জন্যে তাগিদও দেয়।

আত্রেয়ীর যত হাসির কথার সঙ্গে অনেক চেষ্টা করে একটু হেসে নেয় মঞ্জু; কিন্তু আত্রেয়ী, চলে গেলেই গম্ভীর হয়ে যায়।

যেন একটা ভয়ের ছায়া দেখতে পেয়ে সর্বক্ষণ ভিতু হয়ে রয়েছে মঞ্জুর মন। প্রীতি বউদির কাছে এসে ফিসফিস করে কথা বলে মঞ্জু—আর এখানে দেরি করো না বউদি; যত তাড়াতাড়ি পার সরে পড়ো।

প্রীতি বউদির চোখ-মুখে একটা গম্ভীর ভয়ের ছায়া সব সময় ছমছম করছে। সরিয়াডির মেয়ে আত্রেয়ীর মুখের মিষ্টি হাসিটাকে দেখতে একটুও আর ভাল লাগে না। এ বাড়ির সব সতর্কতার যেন মাথা হেঁট করিয়ে দিয়ে আত্রেয়ীর মুখে একটা বিশ্রী জয়ের আনন্দ হাসছে।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভয় করে নিখিলের উচ্ছল খুশির মুখর হাসিটাকে।

প্রীতি বউদির মনের গভীরে আজ যেন একটা অবুঝ ভয় বেশ যন্ত্রণা দিয়ে কথা বলছে—ফিলসফি আর সায়েন্সের বইয়ের মধ্যে ডুবে আছেন বলেই কি নিখিল যেন সব ইচ্ছের ধরা ছোঁয়ার একেবারে বাইরে চলে গিয়েছেন? কিংবা, মঞ্জুর এই মেজদাটি কি সত্যিই একটি লোহা?

—না মঞ্জু, আমার একটুও ভাল লাগছে না। সব লোহা অশোকের থামের লোহার মত নয় যে তার গায়ে মরচে ধরবে না।

মঞ্জু—ওই ভদ্রলোক দুজন বাড়ি চড়াও হয়ে কিরকম বিশ্রী ভাষায় ভয় দেখিয়ে কথা বললেন, শুনলে তো?

প্রীতি বউদি—শুনেছি বলেই তো বুঝেছি। কে জানে ওদের কী কথা বলে এত বুঝিয়ে দিল আর খুশি করে দিল তোমার তার্কিক মেজদা।

মঞ্জু—থাকগে, ওসব কথা ছেড়ে দাও। এখন তাড়াতাড়ি চলে যাবার ব্যবস্থা করো।

প্রীতি বউদি—তোমার বড়দা বলছেন, এই রবিবারেই দিন ভাল আছে।

ঘরে ঢুকল নিখিল। —তোমরা কি যাবার দিন-টিন ঠিক করে ফেলেছ বউদি?

প্রীতি বউদি—হ্যাঁ, এক রকম ঠিক হয়েই আছে।

নিখিল—কবে?

প্রীতি বউদি—এই রবিবারে।

নিখিল—আরও একটা মাস থেকে যাও না।

প্রীতি বউদি—না।

নিখিল—আমি কিন্তু আরও কিছুদিন থাকব।

প্রীতি বউদি—কেন?

নিখিল—এখানে থাকতে ভালই লাগছে।

প্রীতি বউদি—বুঝতে পারছি না, এখানে তোমার এত ভাল লাগবার মত কী বস্তু থাকতে পারে?

নিখিল—সব চেয়ে ভাল বস্তুটি আছে।

চমকে ওঠেন প্রীতি বউদি—কী?

নিখিল—একেবারে একা হয়ে পড়ে থাকবার সুযোগ; নিরিবিলি এই কটেজের এই ঘরটি।

প্রীতি বউদি—নিরিবিলি ঘর তো চা-বাগানেও আছে। না, তোমার এখানে থাকবার কোনও দরকার নেই।

নিখিল—আমার কোনও দরকার নেই বলেই তো থাকতে চাইছি।

প্রীতি বউদি—এখানে নানারকম ভয়ের ব্যাপার আছে।

নিখিলের চোখে যেন ধীর-স্থির একটা বিদ্যুৎ জ্বলছে—আমি কাউকে ভয় করি না বউদি। তোমাদের বাজে ভয়কে, সরিয়াডির মিথ্যে ভয়কে, এমন কী নিজেকেও আমি ভয় করি না।

বোধ হয় আর কোনও কথা বলতে চান না প্রীতি বউদি। যেন অদ্ভুত একটা হেঁয়ালির মুখরতা শুনছেন, কিছুই বোঝা যায় না; বলবারও কিছু নেই। তাই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

নিখিল বলে—সরিয়াডির মত সামান্য একটা জায়গাতে আমার কোনও আশা আর ইচ্ছে থাকতেই পারে না, বউদি।

প্রীতি বউদির মুখের গম্ভীরতা তবু একটুও মুছে যায় না; বোধ হয় নিখিলের এইসব কথা বিশ্বাস করবারও কোনও ইচ্ছে তাঁর আর নেই।

হেসে হেসে সিগারেট ধরায় নিখিল। হ্যাঁ, চার আনার পেঁপে আট আনায় কিনে একটু ঠকে যেতে পারি। কিংবা, আমার সিগারেটের এই আট টাকা দামের পলকা আইভরি কেস ভুল করে হারিয়ে ফেলতে পারি। কিন্তু সেটা কী খুব বেশি ক্ষতির ব্যাপার হবে বউদি?...ও গম্ভীর বউদি? ও নীরব বউদি?

বলতে বলতে নিখিলের গলার স্বর হঠাৎ যেন একটা চতুর হাসির তুফান হয়ে ফেটে পড়ে। বউদি তবু নীরব; আর মঞ্জুও নীরব।

নিখিল বলে—কথাটা হল, আমি এখনই রওনা হচ্ছি।

চমকে ওঠেন প্রীতি বউদি, চোখ ফিরিয়ে নিখিলের মুখের দিকে তাকান।

নিখিল—হ্যাঁ, আর পঁচিশ মিনিট পরেই ট্রেন। কাজেই তোমাদের সঙ্গে এখন আর বাজে তর্ক করবার সময় নেই।

দেখতে পেলেন প্রীতি বউদি, সত্যিই তো, বারান্দার চেয়ারের উপর নিখিলের ছোট টুরিস্ট ব্যাগটি কোথাও যাবার জন্যেই তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে; ব্যাগের উপরে নিখিলের একটা আলোয়ানও চার ভাঁজ হয়ে পড়ে আছে।

নিখিল—আমি যাচ্ছি। কলকাতায় পৌঁছেই সরকার মশাই আর বেয়ারা বিনয়কে পাঠিয়ে দেব। ওরা বড় টুরারটাকে নিয়ে সোজা বাই রোড চলে আসবে। দাদার পক্ষে এখন ট্রেনে যাওয়া ঠিক হবে না।

প্রীতি বউদির মুখে গম্ভীরতার এক ছিটে মেঘও আর নেই। শান্ত ও প্রসন্ন প্রীতি বউদির চোখ-মুখ যেন একটা লজ্জিত খুশির হাসিতে ভরে গিয়েছে। মঞ্জুও নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলে—মিছিমিছি ভয় দেখিয়ে এ রকম থিয়েটার করবার কী দরকার ছিল, মেজদা? তুমি সত্যিই একটা যাচ্ছেতাই অদ্ভুত মানুষ।

নিখিল—বাজে কথা ভাবলে এই রকমই জব্দ হতে হয়। ...আচ্ছা, আমি এখন চলি, আর দেরি করব না। চা-টা এখন দরকার নেই।

আলোয়ান কাঁধে ফেলে আর ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়েই ব্যস্তভাবে আরও একটা কথা চেঁচিয়ে বলে দিয়ে চলে যায় নিখিল—কলকাতা থেকে আমি সোজা চা-বাগানে চলে যাব বড়দা।

গেটের কাছে এগিয়ে যেয়ে আবার একটু থেমে নিয়ে কথা বলে নিখিল। —বাজে গল্পের যত বই সবই লাইব্রেরিতে দান করে দিও; আর আমার সব বই ভাল করে গুছিয়ে দুটো বড় বাক্সে ভরে নিও, বউদি।

নিখিল চলে যাবার পর বারান্দায় পায়চারি করে মঞ্জু আর প্রীতি বউদি দুজনেই অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে হাসতে থাকেন।

প্রীতি বউদি বলেন—নিখিলের মনটা সত্যিই মহৎ, কোনও সন্দেহ নেই। সেই জন্যেই তো দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম।

আত্রেয়ী আসছে; গেট পার হয়ে জবা গাছটার কাছে দাঁড়িয়েছে আর ওদিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে।

—ওয়েলকাম আত্রেয়ী। ডাকতে গিয়ে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে মঞ্জু।

প্রীতি বউদিও হাসে—কী ব্যাপার আত্রেয়ী? তোমাকে খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে।

আত্রেয়ী—ব্যস্ত না হয়ে উপায় কী? মঞ্জু যে সাংঘাতিক কথাটি বলে রেখেছে।

প্রীতি বউদি—কী কথা?

আত্রেয়ী—আপনারা এ মাসেই চলে যাবেন।

মঞ্জু হাসে—এ মাসে নয়, আত্রেয়ী; এই সপ্তাহে; এই রবিবারেই যাচ্ছি।

—বেশ করছ। আত্রেয়ীর চোখ-মুখ করুণ হয়ে গিয়ে যেন একটা অভিমানের আপত্তি চাপা দিতে চেষ্টা করে।

মঞ্জু—মেজদা তো চলেই গিয়েছেন।

আত্রেয়ী হাসতে চেষ্টা করে—মিথ্যে কথা।

মঞ্জু—তোমার তাই মনে হতে পারে, কিন্তু...।

আত্রেয়ী—ওই তো, বাগানে একটা বেতের মোড়ার ওপর নিখিলবাবুর বই পড়ে রয়েছে।

মঞ্জু অদ্ভুতভাবে হাসে—তাই নাকি? বইটাকে বাগানে ফেলে রেখে চলে গিয়েছে মেজদা? তাই বল। কিন্তু ওটা তো মেজদার চিরকেলে অভ্যেস; তোমাকে আগেও বলেছি। বিশ্বাস করনি বোধ হয়?

প্রীতি বউদি চোখ বড় করে হাসেন। —মনে হচ্ছে, এইবার বিশ্বাস করতে পেরেছে আত্রেয়ী?

আত্রেয়ী—তা হলে সত্যিই আপনারা চললেন, বউদি? বলতে বলতে আত্রেয়ীর গলার স্বর ছলছল করে ওঠে।

প্রীতি বউদি—হ্যাঁ, ঠিক করেছি খুব ভোরেই রওনা হয়ে যাব। তোমার বাবাকে আমাদের নমস্কার জানিয়ে দিও।

রুমাল দিয়ে চোখ দুটোকে চেপে রেখে কিছুক্ষণ নিথর হয়ে বসে থাকে আত্রেয়ী। তারপরই উঠে দাঁড়ায়?—চলি বউদি, চলি মঞ্জু।

একবার অখিলবাবুর ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় আত্রেয়ী।

অখিলবাবুর চোখ দুটো একবার কেঁপে ওঠে। তবু হেসে হেসে কথা বলেন অখিলবাবু। —হ্যাঁ, এবার আমাদের যেতেই হচ্ছে।

প্রীতি বউদি আত্রেয়ীর পিঠে হাত বুলিয়ে হাসতে থাকেন—ছিঃ, এতে দুঃখ করবার কী আছে?

আত্রেয়ীর একটা হাত ধরে মঞ্জুও হাসে। —তোমার কথা কী আমি কখনও ভুলতে পারব? কখ্খনও না।

১৪

চন্দ্রবাবুর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভিতরে উঁকি দিয়েছে চিনু আর সন্তু; সেই সঙ্গে বাচ্চা ছেলে-মেয়ের একটা দল।

চিনু বলে—এ কী দাদু? তুমি উনুন ধরাচ্ছ কেন? মধু কোথায়?

চন্দ্রবাবু—মধু নেই রে দিদি।

সন্তু—কোথায় গেল মধু?

চন্দ্রবাবু হাসলেন—মধু জানে।

চিনু—এ কী? তোমার বাক্সটা ভাঙা কেন দাদু? বিছানায় চাদর নেই কেন? আলনাতে জামা-কাপড় কিচ্ছু নেই কেন?

চন্দ্রবাবু উনুনের ধোঁয়াটে মুখের উপরে জোর জোরে পাখার বাতাস দিয়ে হাসতে থাকেন। —সবই মধু জানে।

সন্তু—মধু আর আসবে না?

চন্দ্রবাবু—চলে গেলে কেউ কী আবার ফিরে আসে?

চিনু—মধুটা তবে নিশ্চয় তোমার সব জিনিস চুরি করে পালিয়েছে।

চন্দ্রবাবু—এ আর এমন কি চুরি হল রে দিদি? আরও কত বড়-বড় জিনিস চুরি হয়ে গিয়েছে।

সন্তু—মা বলেছিল, তুমি খুব ভাল লোক; তুমি স্বর্গে যাবে।

চন্দ্রবাবু—স্বর্গেই তো আছি।

সন্তু হাসে—এটা স্বর্গ? এই বিচ্ছিরি ঘর; ধোঁয়া উনুন আর কাঁচা পেপে, হারমোনিয়াম নেই, ফটো নেই, ট্রাইসাইকেল নেই, তোমার তো কিছুই নেই দাদু।

চন্দ্রবাবু—একেই বলে স্বর্গসুখ। বড় হলে বুঝবি।

চিনু—আলুর বড়া খাবে, দাদু? এনে দেব? মা এখন আলুর বড়া ভাজছে।

চন্দ্রবাবু—আর কত খাব?

চিনু—কবে খেলে?

চন্দ্রবাবু—অনেকদিন আগে।

চিনু—কে ভেজে দিলে?

চন্দ্রবাবু—আমার বউ।

চিনু—ধেৎ।

চন্দ্রবাবু—বিশ্বেস কর; আমি তো লঙ্কার ঝাল একেবারেই সহ্য করতে পারি না। তাই শুধু আদাবাটা দিয়ে চমৎকার বড়া ভেজে দিত সেই বউটা।

সন্তু—ছেলেটার নামটা মনে পড়ছে দাদু?

চমকে ওঠেন চন্দ্রবাবু; উনুনের ধোঁয়ার সব জ্বালা যেন তাঁর চিকচিকে হাসির চোখ দুটোর উপর ছড়িয়ে পড়েছে। —কার নাম? কার ছেলে?

সন্তু—সেই যে বলেছিলে; দাঁত নেই, এইটুকু একটা ছেলে।

উনুনটা জ্বলতে শুরু করেছে, এইবার এক হাতে একটা কাঁচা পেঁপে ঝুড়ি থেকে তুলে নিয়ে আর এক হাতে বঁটিটাকে কাছে টেনে আনেন চন্দ্রবাবু। —নাঃ একেবারেই মনে পড়ে না। নামই ছিল না। তবে আর মনে পড়বে কোন ছাই।

চিনু—আমি কিন্তু সব নাম মনে করতে পারি। রাধুদির ছেলের নাম হরতন, সঞ্জু কাকার ছেলের নাম বিশু, মটর মাসিমার ছেলের নাম বিজয়।

মাথা দোলাতে থাকেন চন্দ্রবাবু—বাঃ, আমাদের চিনুরানী কত নাম ধরে রেখেছে, দেখ।

সন্তু—তুমি কেন পার না?

চন্দ্রবাবু—আমি চাই না। আমি কিছুই ধরতে টরতে চাই না।

চিনু—তুমি বোকা।

চন্দ্রবাবু—তবে শুনবি? একটা কথা বলব?

চিনু—বলো।

চন্দ্রবাবু—এই সরিয়াডিতে একা আমিই চালাক, আর সব বোকা।

সন্তু—আমাদের টিচারদি আত্রেয়ীদিও বোকা?

চন্দ্রবাবু—ওটা তো সব চেয়ে বোকা।

চিনু হাসে—আত্রেয়ীদিকে বলে দেব কিন্তু।

চন্দ্রবাবু হাসেন—দিস বলে। মিথ্যে কথা তো বলছি না। নিজের চোখে দেখেছি।

চিনু—কী দেখেছ?

চন্দ্রবাবু—একটা চিঠিকে কত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল তোমাদের আত্রেয়ীদি। ধেৎ, কোনও মানে হয়?

চিনুরা আর সন্তুরা চলে যায়। কাঁচা পেঁপের তরকারি আর ভাত তৈরি হতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় গুনগুন করে গানও করেন চন্দ্রবাবু। আর খাওয়া শেষ হতেই ব্যস্ত হয়ে মোষের শিঙের লাঠিটি হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ান। যেন ফাঁকা ঘরের সব শূন্যতার তাড়া খেয়ে বাইরে ছিটকে পড়েছে সত্তর বছর বয়সের একটা একলা প্রাণ।

এইবার আকাশের দিকে তাকিয়ে কোনও নতুন বিস্ময়ের ছুতো খুঁজতে থাকেন চন্দ্রবাবু। মনে হচ্ছে, পুবের আকাশের এক কোণে সামান্য এক টুকরো মেঘ বেশ কালো হয়ে উঠেছে। বেশ তো! কিন্তু সেজন্য রোদের তেজ এত কমে যাবে কেন? সরিয়াডির যত বাড়ির খাপরার চালাগুলির উপর এত ছায়া-ছায়া মায়া-মায়া ভাব কেন?

চন্দ্রবাবু—কী হে দিবাকর? আজ তো তোমার ছুটি? সড়কে দাঁড়িয়েই দিবাকরের বাড়ির জানালার দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন চন্দ্রবাবু।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জানালার কাছে এসে উত্তর দেয় দিবাকর।

চন্দ্রবাবু—একটু মেঘ করেছে বটে; কিন্তু সেজন্য চারিদিকে এত কালো-কালো ভাব কেন? রোদে তেজ নেই কেন? এরকম তো কখনও দেখিনি। কী ব্যাপার?

দিবাকর—বৃষ্টি হতে পারে; আপনি একটা ছাতা নিয়ে বের হলে ভাল করতেন, চন্দরকাকা।

কিন্তু দিবাকরের কথা শেষ হতে না হতেই চলে গিয়েছেন চন্দ্রবাবু। দিবাকরও তার কাঠের গোলার দিকে একবার ঘুরে আসবার জন্য সাইকেল নিয়ে বের হয়ে পড়ে।

—কী রে আত্রেয়ী? এত রোগা হয়ে গেলি কেন? আত্রেয়ীর সঙ্গে পথে দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করে দিবাকর। আত্রেয়ী হাসতে চেষ্টা করে। —রোগা হওয়াই তো ভাল। ভাত কম খাব বেঁচেও থাকব। শান্তি বউদি কেমন আছেন?

দিবাকর—তিনি তো মনের সুখে মুটিয়েই চলেছেন।

গোষ্ঠবাবু হাবুলবাবু আর দিবাকর; সবারই চোখে পড়েছে, কিছুদিন ধরে বেশ গম্ভীর আর বেশ উদাস হয়ে গিয়েছে আত্রেয়ী। মাথা হেঁট করে, শুধু একবার কিন্ডারগার্টেন করতে যায় আর বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু এরকমটি হতে দিলে তো চলবে না।

বাড়ি এসেই দিবাকর ঘরের ভিতরে একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ একটু মায়া করে আর নরম স্বরে কথা বলে। —সেই জন্যেই বলছি। অন্তত তোমার একটু চেষ্টা করা উচিত ছিল।

শান্তি বলে—তুমি ভুলে গেছ বোধ হয়, আমি নিজেই তোমাকে...।

দিবাকরের গলার স্বরে হঠাৎ আবার সরিয়াডির রোদের তেজটা যেন তপ্ত হয়ে দেখা দেয়। —হ্যাঁ, মাত্র একটা দিনই আমাকে বলেছিলে; আর আমিও তোমার কথামত আত্রেয়ীকে ডেকেছিলাম। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি, হতেও পারে না। তোমরা সড়কে নেমেই ব্যস্তভাবে চলতে থাকলে বেকুব বলেই বাইরের লোকের কাছে আমাদের কথা শুনতে হয়।

শান্তি—কে আবার কথা শোনালে?

দিবাকর—শ্রীলেখা কটেজে এতদিন যারা ছিল, তারাই গোষ্ঠদাকে আর হাবুলদাকে বেশ ভাল করে শুনিয়ে দিয়েছে।

শান্তি—বুঝলাম না।

দিবাকর—সেই ভদ্রলোক, নিখিলবাবু, বেশ ঠাট্টা করে বলেই দিয়েছে যে, আত্রেয়ীর মত একটা দুঃখের জীবনের মেয়েকে একটু খুশি করে ভুলিয়ে রাখা এখানকারই লোকের কর্তব্য ছিল। কথাটা তো মিথ্যে বলেনি?

শান্তি—ঠিকই বলেছে।

দিবাকর—কিন্তু তোমরা কি কোনও চেষ্টা করেছ? বরং বাইরের দুই মহিলা এসে মেয়েটাকে কটা দিন খুশি করে রেখেছিল। তবু কি তোমাদের একটুও লজ্জা হল?

শান্তি—চিনুর পিসিমা আর সন্তুর মা তো অনেকবার আত্রেয়ীর কাছে গিয়েছেন।

দিবাকর—এটা পিসিমা মাসিমার কাজ নয়। তোমার কাজ। তুমি চেষ্টা করলে কাজ হত।

শান্তি এইবার মুখ টিপে হাসে—বুঝেছি; আচ্ছা তাই হবে।

হেসে ফেলে দিবাকর। কড়া মেজাজের দিবাকরের মুখে সত্যিই একটা স্নিগ্ধ ছায়া-ছায়া হাসি। —তবে এতক্ষণ না বোঝার ভান করছিলে কেন?

গোষ্ঠবাবু বাড়িতে বেশ একটু গণ্ডগোল করেছেন। এটাও একটা মায়ার গণ্ডগোল। —তোমরা মিথ্যেই মেয়ে মানুষ হয়েছিলে। তোমরা নিজেরা একটু গরজ করে মেয়েটাকে কাছে ডাকবে, দুটো ভাল কথা বলবে, তবে তো? বাইরের লোকের সঙ্গে শুধু লাঠালাঠি করেই কি একটা মেয়ের মন কেড়ে আনাতে পারা যায়?

হাবুলবাবু ভাত খেতে বসে তিনবার হাত থামিয়ে রেখে বিড় বিড় করছেন—আমরা থাকতে খোঁড়া মানুষ প্রদোষদার একটা অপমান হয়ে গেলে সেটা আমাদের সবারই অপমান। সেটা আমরা বুঝি। কিন্তু তোমরা মেয়েমানুষ হয়েও এটুকু বোঝ না যে, আত্রেয়ীর কোনও অপমান হলেও সেটা তোমাদের মেয়ে জাতটারই অপমান হয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের কোনও চেষ্টাই নেই, শুধু মুখেই যত মায়া।

শ্রীলেখা কটেজ এখন শূন্য। কয়েকটা ভাল লোক এসেছিল, আর ভালয় ভালয় চলে গিয়েছে। তাই বাইরের হাতছানিটা প্রদোষ সরকারের মেয়ের জীবনে কোনও অভিশাপ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আত্রেয়ীর ভাগ্যটাকে তো আগলে রাখতেই হবে; যতদিন না ওর স্বামী জেল থেকে খালাস পেয়ে চলে আসে। সরিয়াডির মায়ার এই ব্যস্ততা একটা সজাগ সাবধানতাও বটে।

একদিন প্রদোষ সরকারের বাড়ির গেটের তিনকাঠের বেড়ার শব্দটা মচকে উঠতেই একটা কাঠবিড়ালি তিড়িং করে লাফ দিয়ে কাঁটালতার ঝোপের গা বেয়ে উপরে উঠে যায় আর তাকিয়ে দেখতে থাকে। হাসতে হাসতে সরিয়াডির শান্তি বউদি এসে বারান্দায় উঠে পড়ে। পা টিপে টিপে আত্রেয়ীর ঘরে ঢুকেই আত্রেয়ীর আনমনা মূর্তিটার পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পরেই দু'হাত বাড়িয়ে আত্রেয়ীর চোখ চেপে ধরে।

আত্রেয়ী ছটফট করে হাসতে থাকে। —বুঝতে পারছি কে আপনি, তবু বলতে সাহস পাচ্ছি না।

শান্তি বলে—শ্রীলেখা কটেজের বউদি নয়। সরিয়াডির পেত্নী বউদি।

শান্তি বউদির হাত দুটোকে দু'হাতে শক্ত করে ধরে রেখেই আত্রেয়ী বলে—আত্রেয়ী সাড়ে তিন বছর আগে মরে পেত্নী হয়ে গেছে। আপনি কাকে খুঁজছেন?

শান্তি—এরকম করে কথা শুনিয়ো না আত্রেয়ী; আমারই দোষ; আমিই সাড়ে তিন বছর হল মরে পড়ে ছিলাম।

আত্রেয়ী—কেন? কী হয়েছিল তোমার?

শান্তি—তোমার দাদা কিছু বলেনি?

আত্রেয়ী—কই? দিবাকরদা কিছু বলেছেন বলে তো মনে পড়ছে না।

শান্তি—একেবারে অন্ধ হয়ে যেতে বসেছিলাম, আত্রেয়ী। পুরো তিনটে বছর ধরে, চোখে সবই ঝাপসা দেখতাম।

আত্রেয়ী—এখন ভাল দেখতে পাচ্ছ?

শান্তি—নিশ্চয়? খুব বেশি ভাল দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এক এক সময় মনে হয়, ঝাপসা দেখাই ভাল ছিল।

আত্রেয়ী—কেন?

শান্তি—তোমার দাদাটির অর্ধেক গোঁফ যে পেকে গিয়েছে, এ কুদৃশ্য তা হলে আর দেখতে পেতে হত না। ছিঃ, তিন বছরের মধ্যেই মানুষের চেহারা এত পেকে যায়। পাকবে না-ই বা কেন? সব সময় মেজাজ এত তাতিয়ে রাখলে এমনটি হবেই। রক্ষে করবে কে?

আত্রেয়ী হাসে—তুমি।

শান্তি—তা সত্যি কথা বললে বলতেই হয়, যথাসাধ্য চেষ্টা করেই যাচ্ছি। কোনও আপত্তি করি না।

আত্রেয়ী—কী যে বলছ। তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝবার সাধ্যি নেই।

শান্তি—থাকগে; এসব বাসি ফুলের গল্প এখন থাকুক। এখন একটু...

আত্রেয়ী—চুপ করো বউদি। তোমার কথা শুনলে সত্যিই ভয় করে।

শান্তি—কিন্তু আমি এখন তোমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইছি না।

আত্রেয়ী—তবে?

শান্তি—দেখতে চাইছি।

আত্রেয়ী—কী?

শান্তি—তোমার বরের চিঠি?

আত্রেয়ী—না। আত্রেয়ীর গম্ভীর মুখের উপর একটা যন্ত্রণাক্ত ভ্রূকুটি আস্তে আস্তে ফুটে উঠতে থাকে।

শান্তি মিনতি করে—দাও, অন্তত একটি চিঠি দেখতে দাও।

আত্রেয়ী—না বউদি, মাপ করো।

শান্তি—মাপ করবার সাধ্যি নেই আমার।

আত্রেয়ী—আমারও চিঠি দেখাবার সাধ্যি নেই।

শান্তি—তাতো বটেই।

আত্রেয়ীর হাতের বইটাকে হঠাৎ একটা ছোঁ মেরে লুফে নিয়েই হাসতে থাকে শান্তি। আত্রেয়ী একেবারে স্তব্ধ হয়ে, আর দুটো অপলক চোখ তুলে শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে। —কী আশ্চর্য।

শান্তি—আশ্চর্যের কিছু নেই। শ্রীলেখা কটেজের বউদির মতো এম.এ-বি.এ পাশ না করলেও এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধিসুদ্ধি আমার আছে।

বই খুলে বইয়ের ভিতর থেকে একটা চিঠি বের করে শান্তি। আত্রেয়ী বলে—ও চিঠিটা না পড়লেই ভাল করবে বউদি। না না, পড়ো না বলছি। পড়লে তোমারও একটুও ভাল লাগবে না।

আত্রেয়ীর গলার স্বরের সঙ্গে যেন একটা ক্ষীণ আর্তনাদের শিহরও শান্তিকে বাধা দিতে চাইছে। কিন্তু শান্তি ততক্ষণে চিঠিটাকে পড়ে ফেলেছে। খুব ছোট চিঠি। "গত মাসে তোমার একটিও চিঠি পাইনি। তার আগের মাসে তবু একটা চিঠি পেয়েছিলাম। আশা করি, ভালই আছ।"

চিঠি পড়ে নিয়েই শান্তির চোখ দুটো যেন শুকনো হয়ে ছটফট করতে থাকে। ঘরের এদিকে-ওদিকে ঘুরে; আর মাঝে মাঝে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে, আনমনার মত বাইরের দিকে তাকিয়ে কী-যেন ভাবতে থাকে। তারপরেই একেবারে খুশির হাসিটি হয়ে ছুটে এসে আত্রেয়ীর গায়ের উপর পড়ে। —ওগো বোকা মেয়ে, এ চিঠি কী বইয়ের মধ্যে ফেলে রাখতে আছে?

আত্রেয়ী—কী বললে?

শান্তি—এ চিঠি বুকের ভেতরে লুকিয়ে রাখতে হয়।

চট করে এক হাতে আত্রেয়ীর জামার গলাটা ফাঁক করে, আর এক হাতে চিঠিটাকে টুপ করে সেই ফাঁকের ভিতরে ফেলে দেয় আর দুলে দুলে হাসতে থাকে শান্তি।

কাকিমার ডাক শোনা যায়---তুমি একবার এদিকে এসো, শান্তি।

—এখনই আসছি, কাকিমা। তখনি ব্যস্তভাবে পাশের ঘরে কাকিমার কাছে এসে দাঁড়ায় শান্তি।

কাকিমা—তুমি যখন এসেছ, তখন আর চিন্তা করি না।

আত্রেয়ীর মা—তুমি এবার মেয়েটার ভার নাও শান্তি। আমরা যে সবাই অচল; কিছুই করতে পারি না, শুধু ভয় পেয়ে পেয়ে আধমরা হয়ে পড়ে থাকি।

মনিদিদা জপের মালা থামিয়ে রেখে কথা বলেন—আর তো মাত্র দেড় বছর। তোমরা এসে মেয়েটার সঙ্গে এরকম একটু হাসাহাসি করলে দেড়টা বছর যে দেড়টা মাসের মত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে।

শান্তি বউদি—সেই জন্যেই তো এসেছি। কিচ্ছু ভাববেন না। আমি এখন আত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যাব।

আবার ব্যস্তভাবে আত্রেয়ীর ঘরের ভিতরে ঢুকে হেসে ওঠে শান্তি। —চলো, বেড়িয়ে আসি। পাঁচ মিনিট সময় দিলাম, সেজে-টেজে নাও।

আত্রেয়ী—কোনও দরকার নেই।

শান্তি—খুব দরকার আছে।

আয়নার টেবিলের উপর থেকে পাউডারের ডিবেটা হাতে তুলে নেয় শান্তি; চটপট হাত চালিয়ে আত্রেয়ীর মুখে কপালে গলায় আর ঘাড়ে পাউডার ছিটিয়ে দিতে থাকে। বিরক্ত হয়ে আর দুই ভুরু কুঁচকে দিয়ে শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী।

কিন্তু শান্তির ব্যস্ততা সেজন্য একটুও ভয় পায় না একটুও বিচলিত হয় না। আত্রেয়ীর একটা ভুরু আস্তে একটা চিমটি দিয়ে ধরে শান্তি বিহ্বল হয়ে হাসে। —ভুরু তো নয়; যেন প্রজাপতির ডানা। বুঝবেন ঠেলা হেমন্তবাবু।

হঠাৎ হাত তুলে আর বেশ বড় করে তেল-সিঁদুরের একটা দাগ আত্রেয়ীর সিঁথিতে এঁকে দেয় শান্তি।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আত্রেয়ী। শান্তি বউদির হাত দুটো যেন এক জাদুকরীর হাতের মত খেলা করে করে মায়ার ঝাঁপি খুলে ধরছে। রঙিন শোলার পাখিকে কথা বলাচ্ছে। জলকে আলতা করে দিচ্ছে, আর মাটিকে সোনা।

—চলো; সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, আর দেরি করলে দেখতেই পাবে না। ব্যস্তভাবে আত্রেয়ীর হাত ধরে টানতে থাকে শান্তি।

—কোথায় যাচ্ছ? দেখবারই বা কী আছে?

—কিছু শোননি?

—না।

—ছোট ঝিলের জলে একটা ডিঙি ভাসিয়েছেন শ্রীপদবাবু। জাল পেলে সব মাছ ছেঁকে তুলছেন। আজ দুপুর থেকেই এই কাণ্ড শুরু হয়েছে।

হেসে ফেলে আত্রেয়ী। —চলো; কিন্তু তোমার রকম দেখে মনে হচ্ছে; তুমিও জাল পেলে কিছু ছেঁকে তুলতে চাইছ।

—না আত্রেয়ী; বিশ্বাস করো। আমার কোনও মতলব নেই।

ছোট ঝিলের চারিদিকে লোকের ভিড়; সন্ধ্যে হলেও হালকা হয়নি। কিন্তু সন্ধ্যে হলেও দেখতে কোনও অসুবিধে নেই; কারণ বেশ বড় একটা চাঁদ উঠেছে। স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ঝিলের ধারে এক জায়গায় ঘাসের উপর ধড়ফড় করছে বড় বড় কাতলা চিতল আর শোল। চাঁদের আলোতে চিকচিক করে জ্বলছে ধড়ফড়ে মাছের গা।

গোষ্ঠবাবু চেঁচিয়ে হাঁক দিলেন—এটাই বোধ হয় সবচেয়ে বড় ক্যাচ : কী বলেন শ্রীপদবাবু?

ঝিলের জলের ডিঙির উপর দাঁড়িয়ে জবাব হাঁকেন শ্রীপদবাবু। —আশা হচ্ছে, এবারের ক্যাচ আরও ভাল হবে।

দিবাকর বলে—এখনও কিন্তু একটাও কালবোশ ওঠেনি।

মাছের নামে যাদের জিভের জল গড়িয়ে পড়ে, তাদেরই আনন্দের এক-একটা গর্জন শোনা যাচ্ছে। মাথার কাপড় টেনে নিয়ে আর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শান্তি। —চলো আত্রেয়ী; এখানে সুবিধে হবে না। আমি কি জানতাম ছাই, ওরাও সবাই এখানে এসে জুটেছে?

আত্রেয়ী হাসে—এর চেয়ে ভাল, ধানোয়ার রোড ধরে একটু বেড়িয়ে আসি চলো।

ধানোয়ার রোডের আমাদের গাছে নতুন বোল ধরেছে। কাছেই নালার কালভার্টের কাছে সড়কের কিনারায় ঘাসের উপর কারা যেন বসে আছে।

শান্তি বলে—দূর ছাই, এখানে এসেও একটু নিরিবিলি হয়ে বসবার উপায় নেই; কারা আগেই এসে জুটেছে। চলো, ফিরে যাই।

—আসুন আত্রেয়ীদি; আসুন বউদি; ফিরে যাচ্ছেন কেন?

নরেন, পরেশ, মাধব আর বিমল একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকতে থাকে।

শান্তি হাসে—তাই বল! তোমরা এখানে? আচ্ছা, তোমরা এখন একটু দয়া করে সরে পড়ো।

পরেশ—যাচ্ছিই তো। আপনারা এখন একটু দয়া করে বসুন এখানে।

বিমল—কিন্তু একটু আস্তে কথা বলবেন বউদি, কেউ যেন শুনতে না পায়।

মাধব—কিছু মনে করবেন না আত্রেয়ীদি; গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলবার নিয়ম-কানুন এখনও শিখিনি।

আত্রেয়ী হাসে—যেও একবার দিবাকরদার কাছে; ভাল করে শিখিয়ে দেবেন।

চলে গেল বিমল মাধব নরেশ আর পরেশ।

নালার জলে চার পাঁচটা পানকৌড়ি তখনও হাবুডুবু দিয়ে খেলা করছে। দু'পাশের সাদা কাশের বন চাঁদের আলোতে আরও সাদা হয়ে হাসছে আর দুলছে। শান্তি বলে—এটা তো ফাল্গুন মাস।

আত্রেয়ী—হ্যাঁ।

শান্তি—তোমার তো আষাঢ়।

আত্রেয়ী—অ্যাঁ?

শান্তি—অ্যাঁ আবার কী? যেন কিছু মনে নেই। কিছুই বুঝতে পারছেন না।

আত্রেয়ী—বুঝেছি; হ্যাঁ, মনে আছে।

শান্তি মুখ টিপে হাসে—আষাঢ় মাস যখন, তখন নিশ্চয় খুব ভিজেছিলে। তাই না?

আত্রেয়ী—কী বললে?

শান্তি—আমি তো জানতে চাইছি; তুমিই বলো।

আত্রেয়ী—কী বলব?

শান্তি—হেমন্তবাবু প্রথম কী কথাটি বললেন?

আত্রেয়ী হাসে—এটা কী হচ্ছে?

শান্তি—কী?

আত্রেয়ী—এটা জাল ফেলা হচ্ছে না? খুব যে বড় গলা করে বলেছিল, কোনও মতলব নেই।

শান্তি—বলো ভাই, না শুনলে আজ আমার পেটের সিঙাড়া হজম হবে না।

আত্রেয়ী—আজ বুঝি খুব সিঙাড়া খেয়েছ?

শান্তি—খুব নয়; একটি। আমার তো চোখের জন্য ওসব কড়া ভাজা জিনিস খাওয়াই মানা।

আত্রেয়ী—তবে খেলে কেন?

শান্তি—ইচ্ছে করে তো খাইনি।

আত্রেয়ী—তার মানে?

শান্তি—জোর করে খাইয়ে দিলে আমি আর কী করতে পারি? ওরকম একটা হট্টা-কট্টা নির্লজ্জ পুরুষ মানুষের গায়ের জোরের সঙ্গে আমি পেরে উঠব কী করে?

আত্রেয়ী—বাঃ, কী কথাই বললেন। দিবাকরদা নির্লজ্জ? আর যিনি চোয়াল নেড়ে সেই সিঙাড়া খেলেন, তিনি হলেন লজ্জাবতী লতাটি?

শান্তি—যাকগে, বাজে কথার চালাকি ছেড়ে দাও। যা জিজ্ঞেস করেছি, এখন সে কথার সোজা জবাব দাও।

আত্রেয়ী—কী কথা?

শান্তি—হেমন্তবাবু প্রথমে কী কথা বললেন?

আত্রেয়ী বোধ হয় একটা ধূর্ত হাসি লুকোবার জন্য মুখ ফিরিয়ে নালার জলের পানকৌড়ির দিকে তাকিয়ে কথা বলে—কোনও কথাই হয়নি।

শান্তি—হতেই পারে না। মিথ্যে কথা।

আত্রেয়ী—আমি দিব্যি করে বলতে পারি, সত্যি কথা।

শান্তি—তবে? এর মানে কী? প্রথমে তুমিই কথা বলেছিলে?

আত্রেয়ী—আমি বলব কী করে? আমার তো তখন মুখ বন্ধ।

শান্তি—কে তোমার মুখ বন্ধ করে দিল?

আত্রেয়ী—যার দরকার ছিল, সে-ই।

শান্তি—তার মানে...।

আত্রেয়ীর মুখের ধূর্ত হাসিটা হঠাৎ যেন একটা ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে—আর মানে বুঝতে হবে না। চুপ করে থাকো।

চমকে ওঠে শান্তি। আত্রেয়ীর একটা হাত শক্ত করে ধরে আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। —এইবার বুঝলাম; উঃ, কী বোকা আমি।

দেখলেন শান্তি বউদি; আত্রেয়ীর চোখের তারা দুটো যেন দুটো নিবিড় খুশির পানকৌড়ি; চাঁদের আলো গায়ে মেখে স্বপ্নের জলে হাবুডুবু খেলছে।

শান্তি বলে—তারপর কী হল?

আত্রেয়ী—তারপর যা হয়েছে আমি চোখে দেখতে পাইনি।

শান্তি—চোখ বন্ধ করে ছিলে বুঝি?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ।

—বেশ একটু ভয়-ভয় করছিল?

—একটু।

—ভয় ভাঙল কখন?

—তখনই।

—কেন?

—সে নিজেই হাত বুলিয়ে সব ভয়ের দাগ মুছে দিল।

—তুমি কী করলে?

—কিছুই না।

—ইচ্ছে হয়নি?

—হয়েছিল। কিন্তু সেদিন সাহস হয়নি।

—কবে সাহস হল?

—রাধাপুরে এসে। কিন্তু সব সাহস হঠাৎ মিথ্যে হয়ে গেল।

—কেন?

—হঠাৎ পুলিস এল : তাই সেও চলে গেল। একটা কথা বলবারও সুবিধে পেলাম না। ঘরে লোকও ছিল।

আত্রেয়ীর মাথাটা অলস হয়ে হাঁটুর উপর ঝুঁকে পড়তে চাইছে। শান্তি তখুনি যেন একটা আহ্লাদের ঝড় হয়ে আর হেসে গড়িয়ে আত্রেয়ীর গায়ের উপর ভেঙে পড়ে। —ধন্যি তুমি? কোনও মেয়ে তিনদিনের মধ্যেই বরের সঙ্গে এমন জমাট কাণ্ড করতে পেরেছে বলে আমি কখনও শুনিনি।

কাশের বন দুলছে, সেই দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে থাকে শান্তি; তারপরেই গলার স্বর একেবারে মৃদু করে দিয়ে আর ফিসফিস করে হেসে কথা বলে—হেমন্তবাবু যেদিন আসবেন সেদিনই, প্রথম দেখা হওয়া মাত্র, বুঝলে তো আত্রেয়ী?

—কী?

—দেনা শোধ করে দিও।

আত্রেয়ী হাসে—তোমাকে সাক্ষি রেখে, কেমন?

শান্তি—নিশ্চয়; আমি উঁকি দেবই।

—সেই আশাতেই থাকো।

—আছিই তো। আর তো মাত্র দেড় বছর।

—দেড়টা বছর বেঁচে থাকতে পারব তো, বউদি?

—কী ছাই বলছ? এরকম কথা শুনলে সত্যিই আমার পিত্তি জ্বলে যায়।

—চলো এবার। আমের বোলের কড়া গন্ধে গায়ে বোধ হয় চিনি জমে গেল।

—ভালই হল। কালই হেমন্তবাবুকে বেশ স্পষ্ট করে কথাটা চিঠিতে জানিয়ে দাও।

—কী?

—অনেক চিনি জমেছে।

আত্রেয়ীর পিঠে মিষ্টি করে একটা চিমটি কেটেই উঠে দাঁড়ায় শান্তি। আত্রেয়ীর হাত ধরে আর নীরব হয়ে হাঁটতে থাকে।

টাউন আউট পোস্টের কাছে পলাশের মাথাটা হাওয়াতে দুলছে; জমাদারের পোষা ময়নাটা ডাকতে শুরু করেছে; সঙ্গে সঙ্গে শান্তির মুখেও একটা নতুন হাসির শব্দ ডেকে ওঠে। —কী সুন্দর চিঠি।

আত্রেয়ী হাসে। —কোন চিঠি? আজ যেটা পড়লে?

—হ্যাঁ।

—ও চিঠিতে সুন্দর কী দেখলে?

—হেমন্তবাবুর মনটাকেই দেখলাম। তোমার চিঠি না পেয়েও কেমন শান্ত মনটি নিয়ে চিঠি লিখেছে। কিছু না জেনেও অনেক কিছু বুঝতে পারি আত্রেয়ী। তোমার স্বামীর মত খাঁটি ভালবাসার মানুষ খুব কমই হয়।

—কেমন করে বুঝলে?

—বললাম তো, সব কিছু না জেনেও এটুকু বুঝতে পারছি। তোমার হাতের লেখা একটা চিঠিকেই যে মানুষ এত ভালবাসে, সে যে তোমাকে কত ভালবাসে, সেটা...।

—কথা বাড়িও না বউদি; তোমার পায়ে পড়ি।

এইবার চোখ দুটো বেশ টান করে, আর আজকের সব মতলবের পিপাসা ব্যাকুল করে দিয়ে আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকায় শান্তি। হ্যাঁ, আত্রেয়ীর চোখের তারাতে চাঁদের আলো ভিজে গিয়ে চিকচিক করছে।

সরিয়াডির শান্তি বউদির একটা মানত সফল হয়েছে এতক্ষণে; শান্তি বউদির চোখের আর মুখের হাসিও যেন অদ্ভুত এক তৃপ্তির স্বাদ পেয়ে নিবিড় হয়ে ওঠে।

শান্তি বলে—তুমি একটু বড় করে চিঠি লিখলে ভদ্রলোক কী খুশিই না হবেন। ...যাই হোক, বেশি রাত জেগে চিঠি লেখালেখি করো না আত্রেয়ী।

ছোট ঝিলের কিনারাতে ভিড় এখনও কমেনি। চেঁচিয়ে কথা বলছে দিবাকর। —একটা বড় কালবোশ, আর একটা ছোট শোল আমি নিয়ে চললাম শ্রীপদদা।

চমকে ওঠে শান্তি। —শুনলে তো আত্রেয়ী। আমার দফারফা করবার জন্যে তোমার দাদাটি কেমন ব্যস্ত হয়েছেন?

আত্রেয়ী হাসে—কেন? কী হল?

শান্তি—রাত ন'টার সময় একগাদা জীবজন্তু নিয়ে গিয়ে রান্না করতে বললে যে মানুষকে কী হয়রানি করা হয়, সেটা এই ভদ্রলোক একটুও বোঝে না। বোঝবার মন নেই। সবাই কি হেমন্তবাবু?

নয়াপাড়ার সড়ক ধরে এগিয়ে চলে যায় শান্তি, আর কালীবাড়ি রোড ধরে আত্রেয়ী।

১৫

ঠিক সকালবেলা, সরিয়াডির গা-ঘেঁষা রেল লাইনের উপর থমকে থাকা যত কুয়াশার চাপ ছিঁড়ে দিয়ে গয়ার পিতৃপক্ষের একটা স্পেশাল ট্রেন হু-হু করে ছুটে চলে গেল। কী ভয়ানক শব্দ। একটা হাহাকার যেন ঝড় হয়ে আর হুইসিল বাজিয়ে ছোট শহর সরিয়াডির মাটি কাঁপিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

চকের বাজারে তখনও ভিড় জমেনি, কোনও হল্লাও জাগেনি। চকের সেই নীরবতার বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে একটা গম্ভীর শব্দ হাঁসফাঁস করতে আর দুলতে দুলতে চলে যায়—রাম নাম সৎ হ্যায়।

সেই মুহূর্তে বৈকুণ্ঠ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের উনুনের কাছ থেকে একটা লাফ দিয়ে বের হয়ে এসে চেঁচিয়ে ওঠে শচীন কারিগর। —ধরো ধরো, শক্ত করে ধরো, চেপে ধরে রাখো।

মহামায়া টেলারিংয়ের বিকাশ সবার আগে ছুটে গিয়ে ধরেছিল; এবার শচীনও এসে চেপে ধরে।

হঠাৎ রাম নাম সৎ হ্যায় শুনেই ভয় পেয়ে চমকে উঠেছে লোচনবাবুর এক্কার ঘোড়া। ঘোড়াটা রাস্তার পাশের নালা টপ্‌কে ছুটে যাবার জন্য একটা লাফ দিতেই এক্কাটা টাল খেয়ে কাত হয়ে পড়েছে। এক্কার গদির উপরে বসে আর্তনাদ করেছেন লোচনবাবুর স্ত্রী। ঘোমটায় মুখ ঢাকা, আর কোলে দুটো বাচ্চা ছেলে। গাড়োয়ান, থুরথুরে বুড়ো বাবুরাম এক্কা থেকে পড়েই গিয়েছে।

ঘোড়াটা দুই পা তুলে আর চমকে চমকে গা-ঝাড়া দিচ্ছে। কিন্তু পালিয়ে যাবার সাধ্যি নেই। শচীন আর বিকাশ, দুজনেই শক্ত করে ধরে রেখেছে। শচীনের হাতে ঘোড়ার লাগামটা; আর বিকাশের শক্ত মুঠোর ভিতরে ঘোড়ার ঘাড়ের চুলের একটা ঝুঁটি।

বুড়ো বাবুরাম উঠে দাঁড়ায়। ভীরু ঘোড়াটার গলায় হাত বোলায়। লোচনবাবুর স্ত্রীর আর্তনাদ শান্ত হয়ে যায়। কোলের বাচ্চা দুটো হাসতে থাকে। বাবুরামের হাঁকের শব্দ শুনে আবার সুন্দর টাপ্‌রি চালে চলতে থাকে এক্কার ঘোড়া। —টাপ্‌ টাপ্‌, টাপ্‌ টাপ্‌, তড়াপ্‌!

সন্দেহ হতে পারে; সরিয়াডির আত্মাটা বুঝি খুব সজাগ হয়ে এইবার সব দিকে পাহারা রেখেছে। প্রায় রোজই এক-একটা কাণ্ড। ধরে রাখো, ছেড়ে দিও না, আটকে ধরো, ফেলে দিও না—এক-একটা ব্যস্ততার কাণ্ড।

একদিন রাত দশটারও পরে; যখন নয়াপাড়ার সড়কে ঝিঁঝিঁ ডাকছে আর জোনাকি জ্বলছে কালীবাড়ি রোডের যত খেজুর গাছের মাথায়, তখন গোষ্ঠবাবু হাবুলবাবু আর দিবাকর; বলাই নরেন আর পরেশ; সেই সঙ্গে থানা অফিসার আর দু'জন কনস্টেবল ছুটোছুটি করে ছোট শহর সরিয়াডির আনাচ-কানাচ তন্ন-তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে থাকে—কোথায় গেল চিনু?

দেখা গেল, কাছারিপাড়ার কাছাকাছি ছোট একটা বাংলোবাড়ি, নাম ইন্দুনিলয়, তারই বারান্দার উপর একা দাঁড়িয়ে আর ফুঁপিয়ে কাঁদছে চিনু।

ঘরে কেউ নেই, শুধু তিন মাস বয়েসের একটা ঘুমন্ত মানুষ সে বাড়ির ঘরের ভিতরে একটা চৌকিতে একটা তোয়ালের উপর পড়ে আছে।

চিনু বলে—সরিৎ কাকা আর জয়া কাকিমা সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে বের হয়েছে, এখনও ফিরে আসেনি। আমাকে বলে গেল, তুমি এখানে থাকো, আমরা এখনি আসছি।

হাবুলবাবু—তুই এখানে কেন এসেছিলি?

চিনু কাঁদতে থাকে। —আমি রোজই একবার আসি।

—কেন?

—ওকে দেখতে। ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে দেখিয়ে দেয় চিনু। বুঝতেও আর অসুবিধে নেই, বাচ্চাটাকে এখানে একা রেখে বাড়ি যেতে পারেনি চিনু; এটাই হল চিনুর বিপদ।

কিন্তু কে এই সরিৎ আর কে এই জয়া? পরেশ বলে—মাস চার-পাঁচ হবে, ওরা এখানে চেঞ্জে এসেছিল। বাড়ি থেকে বড় একটা বের হত না।

থানা অফিসার হাসেন। —আর তো বোঝবার কিছুই নেই গোষ্ঠবাবু।

গোষ্ঠবাবু—না।

হাবুলবাবু—মনে হয় ওরা ছ'টা পঞ্চাশের ট্রেনেই সরে পড়েছে।

থানা অফিসার—বোধ হয়। কিন্তু এখন কী করা যায়? বাচ্চাটাকে কি থানাতে নিয়ে গিয়ে আমার ফাইলের ওপর ফেলে রেখে দেব?

হাবুলবাবু—না না, তা হতে পারে না, অসম্ভব। ফেলে দেওয়া যায় না।

থানা অফিসার হাসেন—আমি ঠাট্টা করছি হাবুলবাবু। কিন্তু আপনারা পাঁচজনে মিলে একটা পরামর্শ দিন, রাখা যায় কী করে?

চিনুকে বাড়ি নিয়ে গেল নরেন। বাচ্চাটাকে আগলে দাঁড়িয়ে রইলেন হাবুলবাবু ও গোষ্ঠবাবু। দিবাকর, বলাই আর পরেশ লণ্ঠন হাতে নিয়ে বের হয়ে গেল। ফিরে এল যখন, তখন রাত দুটো।

বৈকুণ্ঠ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কারিগর শচীন আর শচীনের বউও সঙ্গে এসেছে। শচীনের ছেলে-পুলে নেই; তাই শচীনের কোনও আপত্তি নেই। আর শচীনের বউকে দেখেই বোঝা গেল, বউটার হাত দুটো যেন ছটফট করছে।

সোজা তরতর করে হেঁটে আর ঘরের ভিতরে ঢুকেই ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে দু'হাতে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে ধরেই বুকের উপর তুলে নিল শচীনের বউ; আবার মিটমিট করে হাসতেও থাকে বউটা।

বীরমানিকবাবু; নেপালি ভদ্রলোক, যিনি দশ বছর ধরে এই সরিয়াড়ির একটি স্থায়ী মানুষ হয়ে ঘিয়ের কারবার করছেন, তাঁরই স্ত্রী নয়াপড়ার সড়ক ছাড়িয়ে ছুটতে ছুটতে ছোট ঝিলের কাছে এসে পড়লেন। পাড়ার মানুষ তখন ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে তাঁকে নয়াপাড়ারই এদিক-ওদিকে খোঁজাখুঁজি করছে।

স্ত্রীর হাত থেকে আফিমের গুলিটা জোর করে কেড়ে নিতে পেরেছেন বীরমানিকবাবু; কিন্তু ধরে রাখতে পারেননি। মরণবাসনার নারী তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিয়েই ছুটে বের হয়ে গিয়েছে। বীরমানিকবাবু শুধু পথে দাঁড়িয়ে আর্তস্বরে ডাক দিয়েছেন—ধরো ধরো ধরো; চলে গেল।

অত দূরে ছোট ঝিলের কাছে পাগল দুর্গাচরণের কাছে নিশ্চয় বীরমানিকবাবুর এই আর্তস্বরের কোনও শব্দ পৌঁছয়নি। কিন্তু, তবু ভুল হয়নি দুর্গাচরণের। বীরমানিকবাবুর স্ত্রীকে ঝিলের জলের দিকে ছুটে যেতে দেখেই একটা লাফ দিয়ে পথের মাঝখানে শক্ত হয়ে দাঁড়াল দুর্গাচরণ।

—হট্ যাও রে পাপী। দুর্গাচরণের দিকে তাকিয়ে আর চেঁচিয়ে ধিক্কার হানেন বীরমানিকবাবুর স্ত্রী। কিন্তু দুই হাত মেলে দিয়ে আর পথ আটক করে দুর্গাচরণ যেন ভয়ানক কঠিন বাধার পাথরটি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

পাড়ার মানুষ ছুটে এসে যখন বীরমানিকবাবুর স্ত্রীকে ঘিরে ধরে, তখন এক লাফে রাস্তার এক পাশে সরে যায় আর অধোবদন হয়ে লজ্জিতভাবে হাসতে থাকে দুর্গাচরণ।

তিন মাসেরও বেশি হবে সিগারেট খাওয়া ছেড়েই দিয়েছিলেন সামন্তবাবু। কিন্তু হঠাৎ একদিন নস্যি ধরলেন আর চন্দ্রবাবুকে হো হো করে হাসতে দেখে একটা কৈফিয়তও দিলেন—কী আর করি বলুন? কিছু একটা না ধরে তো থাকতে পারা যায় না, চন্দরদা।

চন্দ্রবাবু—কিন্তু আমি তো বেশ থাকতে পারছি। আমার কিছুই ধরবার দরকার হয় না। কিছুদিন কাঁচা পেঁপে ধরেছিলাম, তা'ও এখন ছেড়ে দিয়েছি।

সামন্তবাবু—আপনার কথাই আলাদা।

চন্দ্রবাবু উৎফুল্ল হয়ে হাসেন—স্বীকার করছ তা হলে?

কিন্তু মোষের শিঙের লাঠি দুলিয়ে চন্দ্রবাবু আজ এই সরিয়াড়ির যাকে যতই বোঝাতে চেষ্টা করুন না কেন, কেউ কিছু বুঝবে বলে মনে হয় না। তা না হলে, সেদিন ঠিক মাঝদুপুরে, যখন নিঝুম হয়ে আছে নয়াপাড়ার সড়ক, তখন গোষ্ঠবাবুর স্ত্রীর ঘুমটা ধড়ফড় করে ভেঙে যাবে কেন?

গেটের মালতীলতার কাছে দাঁড়িয়ে কে যেন ডাকছে—মাসিমা? মাসিমা? একবার দয়া করে আসবেন। আমি কেদার।

কে কেদার? দেখতে পেলেন গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী; সেই ছেলেটি আর সেই মেয়েটি। শুকনো শীর্ণ আর সাদাটে মুখ, সেই কুন্তলা বেশ মুখভার করে আর তফাত করে দাঁড়িয়ে আছে।

গেটের কাছে এগিয়ে গেলেন গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী। —আমাকে ডাকছিলে?

কেদার—হ্যাঁ মাসিমা। আচ্ছা, আপনি ওর দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে বলুন তো, এই ক'দিনে ওর চেহারা অনেক ভাল হয়ে গেছে কী না। আমার কথা বিশ্বাসই করতে চায় না।

গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী বলেন—হ্যাঁ, কুন্তলাকে এখন তো বেশ ভাল দেখছি। গাল দুটি তো বেশ সুন্দর লালচে হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

কুন্তলা হাসে—কিন্তু আমি তো বাঁচব না, মাসিমা। আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন।

কেদার—আমাকে দিনরাত এই সব বাজে কথা বলছে, আর, আরও বিশ্রী কথা বলছে। বলছে তুমি আবার বিয়ে করো।

গোষ্ঠবাবুর স্ত্রীর মুখের হাসিটা করুণ হয়ে কাঁপতে থাকে। —ছি এসব কথা বলা তোমার একটুও উচিত নয়, কুন্তলা।

কেদার—বেড়াতে বের হয়েও আমাকে ওর হাতটা একটু ধরতে দেবে না। আমাকে শাসিয়ে ধমকে দেয়, ওকে ছুঁয়ে ফেললে আমারও নাকি রোগ হবে। আপনি বলুন মাসিমা, এ সন্দেহের কী কোনও মানে হয়?

গোষ্ঠবাবুর স্ত্রীর গলার স্বর কাঁপে; চোখ দুটো সেঁতসেঁত করে। —এরকম করো না কুন্তলা; তোমার স্বামী ছেলেমানুষ, তুমিও ছেলেমানুষ; বেড়াবার সময় দুটিতে মাঝে মাঝে একটু হাত ধরাধরি করে বেড়াবে। খুব ভাল হবে।

চলে গেল কেদার আর কুন্তলা। সরিয়াডির শালবনের নতুন হাওয়াও যেন ওদের সঙ্গে সঙ্গে ফুরফুর করে উড়ে চলেছে, তবু একটুও ধুলো উড়ছে না।

শান্তিও প্রায় এইরকমই হাতে হাত ধরিয়ে দেবার মত একটা কাণ্ড এই তিন মাসের মধ্যে অন্ততঃ তিনবার করছে।

—হেমন্তবাবু চিঠিতে কী লিখলেন, আর তুমি সে চিঠির জবাব কী লিখলে, আমি দুই চিঠিকে পাশাপাশি রেখে আগে পড়ে নেব, আত্রেয়ী; তারপর চিঠি ডাকে দেবে।

আপত্তি করেনি আত্রেয়ী। দুই চিঠিকে শান্তির হাতে তুলে দিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে কাঁটালতার ঘেরানের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়েছে।

"তোমার চিঠি পড়ে আমি ভুলে যাই যে আমি জেলে আছি। মনে হয়, তুমি আমার চোখের সামনে বসে কথা বলছ।

সেই দিনটির কথা কী কখনও ভুলতে পারি? হ্যাঁ, মনে আছে বইকি, চলে যাবার আগে তোমার দেওয়া জল খেয়েছিলাম। সে জল কিন্তু আমিই চেয়েছিলাম, তুমি ইচ্ছে করে দাওনি। সেজন্য তোমাকে কিন্তু এতটুকুও দোষ দিচ্ছি না। তুমি আমারই জন্যে অনেক কষ্ট সহ্য করেছ; আরও কিছুদিন সহ্য করো।"

"বিশ্বাস করো, তুমি চলে যাবার সময় আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। তুমিই বুঝতে পারনি। বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে যেতে। মামার চিঠিতে জানলাম, জেলের হাসপাতাল তোমার জন্যে দুধ ববাদ্দ করেছে। তবু, আমি এখানে কিন্তু দুধ ছোঁবও না। এই জন্যে তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। আমাদের শান্তি বউদি সব সময় তোমার কথা জিজ্ঞেস করেন। শান্তি বউদি বলেছেন, তুমি নাকি আমাকে আর আমিও নাকি তোমাকে খুব ভালবাসি। সত্যি তো? ঠিক তো? পরের চিঠিতে জবাব চাই।"

চিঠি দুটোকে বই চাপা দিয়ে আত্রেয়ীর টেবিলে রেখে দিয়ে আর কৃতার্থতার আনন্দে যেন ডগমগ হয়ে শান্তিও বাইরে গিয়ে আত্রেয়ীর কাছে দাঁড়ায় আর গল্প করে। —একটা কথা লিখতে ভুলে গেলে কেন?

আত্রেয়ী—কী কথা?

শান্তি—তোমার গায়ে এখন যে খুব চিনি জমেছে, সেটা জানিয়ে দিলে হেমন্তবাবু একটু খুশি হতেন না কি?

আত্রেয়ী—বেশ তো, পরের চিঠিতে লিখব।

শান্তি—আজ সন্ধ্যাবেলা তৈরি হয়ে থেকো, স্টেশনে বেড়াতে যাব।

আত্রেয়ী—আজ হঠাৎ স্টেশনে কেন?

শান্তি—কিছু শোননি?

আত্রেয়ী—না।

শান্তি—আজ সন্ধ্যাবেলা পঞ্চম জর্জের ছেলের স্পেশ্যাল পাস করবে।

শান্তির ক্লান্তি নেই। শান্তি যেন ছোট সারিয়াডির ঘরোয়া মায়ার দূত হয়ে প্রায় রোজই আসে হাসে আর চলে যায়। বাইরের মায়া, সে মায়া যতই ভালমানুষ হোক, তার হাতছানির টান থেকে সরিয়াডির মেয়ের প্রাণটাকে আগলে রাখার দায় নিয়ে এই তিন মাসের মধ্যেই শান্তি যা করতে পেরেছে, তাই নিয়ে শান্তির মনের গর্বেরও অন্ত নেই বোধ হয়। যেন তিরছি নদীর একটা ভুল স্রোতের মুখ ঘুরিয়ে দিতে পেরেছে শান্তি। তাই দিবাকরকে যখন তখন এমন কথাও বলতে পেরেছে—এবার গিয়ে একদিন জিজ্ঞেস করো আত্রেয়ীকে, কী রে, তোর সেই শ্রীলেখা কটেজের বউদিকে, না এই শান্তি বউদিকে বেশি ভাল লাগে?

চিনুর পিসিমা আর সন্তুর মা'ও চুপ করে নেই। তাঁরাও দু'জনে মাঝে মাঝে একেবারে আত্রেয়ীর ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়েন, আর আত্রেয়ীকে চোখের সামনে বসিয়ে রেখে গল্প করেন। আত্রেয়ীর জন্য মটর ডালের বড়ি নিয়ে আসেন সন্তুর মা; আর চিনুর পিসিমা নিয়ে আসেন তাঁর পুজোর ঘরের প্রসাদী ফল—পেয়ারা, শশা আর আখের টুকরো।

কাকিমাও সামনে থাকেন, তাই চিনুর পিসিমার গল্প করতে সুবিধা হয়। —তুমি তো দেখনি সুহাস, আমি দেখেছি, আত্রেয়ীর শ্বশুরবাড়ির দীঘিটার এপারে দাঁড়ালে ওপারের মানুষের মুখ চেনা যায় না। একটা সাগর বলে মনে হয়। রাধাপুরেই তো আমার বেণুমাসির বাড়ি। বিয়ের আগে কতবার বেণুমাসির বাড়িতে গিয়েছি আর কত কাঁঠাল খেয়েছি, সবই মনে আছে।

সন্তুর মা—আত্রেয়ীরা তো একাই সাত-আনি।

চিনুর পিসিমা—হ্যাঁ গো; ন' আনিদের এগারোটা শরিক। যেমন হাভাতে, তেমনই কুচুটে। বেণুমাসির কাছে শুনেছি, সাত-আনিদের দুর্গোৎসবে হাজার কাঙালকে অন্নবস্ত্র দান করা হয়। এমন ঘরের ছেলেই তো হেমন্ত।

একদিন, সেদিন ঠিক মাঝ দুপুরে আত্রেয়ীদের বাড়ির মাঝের ঘরে মাদুরের উপর বসে যখন গল্প করছিলেন চিনুর পিসিমা আর সন্তুর মা, সেদিন একে একে আরও কয়েকজন এসে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন—গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী, হাবুলবাবুর স্ত্রী, সামন্তবাবুর মা, হাজরাবাবুর দিদি আর শ্রীপদবাবুর ছোট শালী। আত্রেয়ীর মা তাঁর শ্বাসকষ্টের সব বাধা ভুলে গিয়ে সবার সঙ্গে গল্প করেন। —আত্রেয়ী তো শুধু নামেই আমার মেয়ে। তোমরাই হলে ওর আসল মা।

বাইরে ঝুরু ঝুরু শব্দ করে বৃষ্টি পড়ছে। কাকিমা হঠাৎ এসে আর দু'চোখে যেন দুটি অদ্ভুত বিহ্বলতা নিয়ে, মৃদু স্বরে ফিসফিস করেন। —দেখবেন তো আসুন।

আত্রেয়ীর ঘরের দরজার একটা কপাট আস্তে একটু ঠেলে দিলেন কাকিমা। সেই ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন সবাই, খাটের উপর শুয়ে আর নিবিড় ঘুমের ঘোরে একেবারে নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে আত্রেয়ী; জানালা দিয়ে ঝুরু ঝুরু বৃষ্টির ছিটে আত্রেয়ীর মুখের উপর এসে ছড়িয়ে পড়ছে। আত্রেয়ীর হাতে একটা খোলা চিঠি। ঘুমের ঘোরে নেতিয়ে পড়া হাতটা চিঠিটাকে কী শক্ত করে ধরে রেখেছে।

গলার স্বর আরও মৃদু করে নিয়ে কথা বলেন কাকিমা। —হেমন্তের এই চিঠিটা আজই এল।

পাটনাতে গিয়ে এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছে, আর একটা চাকরির চেষ্টাও করেছে বলাই। মাত্র একটা মাস পাটনাতে থাকতে হয়েছে। তারপর সরিয়াডিতে ফিরে আসতে হল। মা চিঠি লিখেছিলেন; সুমন্তর কাছে শুনলাম তোমাদের পাটনার মেসে মাষকলাইয়ের ডাল খেতে দেয়। এ কী সর্বনেশে কথা। এখন আর তোমার মেসে থেকে কাজ নেই। পত্রপাঠ বাড়ি চলে এসো।

ভোরের ট্রেনে রামবাগ রোড স্টেশনে নেমেই সরিয়াডির নিমের বাগানে কাকের ডাক শুনতে পেয়েছে বলাই। সরিয়াডির ভোরের বাতাসের ছোঁয়া লেগে বলাইয়ের মুখে একটা ভৈরবী ঠুংরিও গুনগুন করে উঠেছে।

কিন্তু কাছারিপাড়ার সড়ক ছাড়িয়ে সামান্য একটু এগিয়ে যেতেই বলাইয়ের মুখে গানের গুনগুন যেন চমকে উঠেই স্তব্ধ হয়ে গেল। শ্রীলেখা কটেজের একটা ঘরের সব জানালা এত ভোরেই একেবারে খোলা-মেলা হয়ে সরিয়াডির শালবনের হাওয়া খেতে শুরু করেছে। কটেজের বারান্দার উপরে একটা বেতের চেয়ার। চেয়ারের কাছে একটা বেতের টেবিল; তার উপর মোটা-মোটা চেহারার কয়েকটা বই। বইয়ের উপর একটা চশমাও পড়ে আছে।

তবে কি সেই ভদ্রলোক, যার নাম নিখিল সেন, তিনিই আবার এসেছেন?

সেদিন সন্ধ্যায় নরেনের সাইকেল শ্রীলেখা কটেজের সামনের রাস্তা দিয়ে তিনবার ছুটে গেল। প্রায় মাঝ রাত যখন, তখন মাধবও খুব আস্তে আস্তে সাইকেল চালিয়ে এই রাস্তাতেই একবার ঘুরে গেল। দেখে গেল মাধব, কটেজের বাইরের ঘরের ভিতরে একটা আলো জেগে রয়েছে।

পরের দিন সকালবেলায় শ্রীলেখা কটেজের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে পথের উপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নরেন। না আর এগিয়ে যাবার কোনও দরকার নেই। দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, নিখিল সেনের আলোকিত মূর্তিটা কটেজের গেটের সামনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

নরেন ফিরে এসেই খবর দেয়। —হ্যাঁ দিবাকরদা, নিখিলবাবু আবার এসেছেন।

পরেশ—একাই এসেছেন।

মাধব—সেই মহিলা দুজনের কাউকেই দেখলাম না।

ট্যাক্স-আপিসের বারান্দার ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে আর বেশ চাপাস্বরে হাবুলবাবুর সঙ্গে কথা বলেন গোষ্ঠবাবু। —মাত্র ছ'মাস পরেই আবার ভদ্রলোক চলে এলেন; বুঝছি না এত তাড়াতাড়ি আবার হাওয়া বদলের কী দরকার ছিল? ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য তো একটুও খারাপ নয়।

হাবুলবাবু—অথচ যাঁর আসা দরকার ছিল, যাঁর বাতের দোষ অনেকটা কমে গিয়েছিল, সেই ভদ্রলোকই এলেন না।

গোষ্ঠবাবু—তবে একটা কথা। মানুষটা তো ভাল।

হাবুলবাবু—তা তো বটেই। তবু এ একটা অস্বস্তির ব্যাপার হল গোষ্ঠদা।

আলো দেখে অস্বস্তি বোধ করতে হচ্ছে; সরিয়াডির মনের সেই অবুঝ অন্ধকার বুঝি এখনও ভীরু হয়েই আছে। আপত্তি করবার কিছুই নেই; নিখিল সেনের নিন্দে করবার কিছুই নেই; সন্দেহটা তো কবেই মিথ্যে হয়ে গিয়ে উল্টে সরিয়াডিকে লজ্জা পাইয়ে দিয়েছে। তবু অস্বস্তি।

পটলবাবুর পেয়ারা বাগানে ফল ধরেছে। কাশীর জাত পেয়ারার চারা আনিয়ে আর অনেক যত্ন করে এই পেয়ারাবাগান তৈরি করেছেন পটলবাবু। আর, এই প্রথম ফল ধরেছে। তিনটে পেয়ারার ওজন এক সেরের বেশি। পটলবাবুর এই পেয়ারা বাগানের পাঁচিলের পাশে জটাধারী এক সাধু এসে ঠাঁই নিয়েছেন। পটলবাবু সকলকেই বলেছেন, এই সাধু একজন খাঁটি মহাপুরুষ। কিন্তু পটলবাবু সব সময় বাগানের দিকে চোখ রেখে একচালার নীচে একটি চৌকির উপর বসে থাকেন। চোখের চাহনিটা চমৎকার শান্ত কিন্তু বুকের ভিতরে বোধ হয় নিদারুণ অস্বস্তি।

শান্তিও শুনতে পেয়েছে। কিন্তু শান্তির চোখে কোনও ভাবনা চমকে উঠে না, কোনও স্তব্ধতাও থমথম করে না, নিঃশ্বাসেও কোনও অস্বস্তি ছটফট করে না; কিছ্ছু না। বরং দিবাকরের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছে শান্তি।

দিবাকর—হাসবার কী হল?

শান্তি—কেন হাসব না?

দিবাকর—আমি তো বেশ অস্বস্তি বোধ করছি।

শান্তি—কেন?

দিবাকর—শত হোক, এটা একটা চিন্তার কথা নয় কি?

ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি দিবাকরের চোখের দিকে এগিয়ে দিয়ে শান্তি আবার হেসে ফেলে—কলাটি। তোমাদের নিখিল সেনকে শুধু বই মাথায় তুলে নিয়েই চলে যেতে হবে।

নিখিল সেন নামে একটা অস্তিত্ব শ্রীলেখা কটেজের ঘরের ভিতরে রাতজাগা আলোর কাছে বসে থাকে—সকালবেলা গেটের সামনের রাস্তায় পায়চারি করে বেড়ায়; ঘটনাটা এর চেয়ে বড় কোনও ব্যাপার হয়ে উঠবে, এমন কোনও লক্ষণও দেখা যায় না। বলাই, মাধব আর নরেন দেখেছে, নিখিল সেন নিজেরই একটা খেয়ালের সুবিধার জন্য নিজের পছন্দমত খুব ছোট একটা জগৎ তৈরি করে নিয়েছেন। তারই মধ্যে থাকেন ভদ্রলোক।

পর পর প্রায় তিনটি মাস পার হয়ে গিয়েছে। বৈশাখী ঝড়ে ধানোয়ার রোডের আমগাছের মাথা থেকে কত কাঁচা আম ধানক্ষেতের উপর ছিটকে পড়ে ছড়িয়ে গড়িয়ে গেল। কিন্তু সে খবর জানবার জন্যে নিখিল সেনের চোখে মুখে কোনও চেষ্টার চঞ্চলতা জাগে বলে মনে হয় না। ভদ্রলোক শ্রীলেখা কটেজের ওই সামনের রাস্তা ছেড়ে একটি পা'ও এগিয়ে যেতে চান না। সরিয়াডির আম কুড়োবার জন্য হাওয়া-বদলের আর সব মানুষগুলির যত চেষ্টা ব্যস্ততা আর ব্যাকুলতা সকাল বিকাল সব সময় হই-হই করছে কিন্তু নিখিল সেন শান্ত। সে ভদ্রলোকের মনে সরিয়াডির উপর হুটোপুটি করে কিছুই কুড়িয়ে নেবার জন্য কোনও ফূর্তির তাড়া নেই। হাঁটাহাঁটি আর ছুটোছুটি করে সরিয়াডির রাস্তায় ধুলো ওড়াবার কোনও ইচ্ছেও নেই বোধ হয়। এক-এক সময় সত্যিই মনে হয় দিবাকরের, ভদ্রলোক সরিয়াডির ধুলোর ছোঁয়া এড়িয়ে থাকবার জন্যে সকাল-সন্ধ্যা, আর দিন-রাত ঘরের ভিতরে আর বাড়ির কাছাকাছি থাকেন। এত টাকা-পয়সা আর এত বিদ্যে, এরকম মানুষের মনে একটু অহংকার তো থাকতেই পারে। সরিয়াডির প্রদোষ সরকারের মেয়েকে এক মুঠো ধুলো বলে মনে করাও এরকম মানুষের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। কে জানে, এমনও তো হতে পারে যে, আত্রেয়ীর চেয়ে দেখতে অনেক সুন্দর কোনও মেয়ে কলকাতার কোনও মস্ত শিক্ষিত মস্ত বড়লোকের বাড়ির একটি ঘরে বসে নিখিল সেনের কাছে এখন চিঠি লিখছে। হতে পারে; আত্রেয়ীকে একটা উপদ্রব বলে মনে করেন, তাই ভয় পেয়ে বেশ সাবধান হয়ে গিয়েছেন নিখিল সেন।

যেমন দিবাকরের, তেমনই গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবুর মনের অস্বস্তিও ঠিক এইভাবে একটা বুঝ মেনে নিয়ে এই তিন মাসের মধ্যেই অনেক শান্ত হয়ে এসেছে। নরেনের সন্দেহের সাইকেলও আর শ্রীলেখা কটেজের সামনের রাস্তা দিয়ে বার বার যাওয়া-আসা করে না।

বলাই বলে—ভদ্রলোক সত্যিই স্কলার মানুষ।

নরেন—আমারও তাই মনে হয়, বলাইদা। কতবার দেখলাম, বই পড়তে পড়তেই কটেজের সামনের রাস্তাতে ঘুরছেন ভদ্রলোক।

অস্বস্তিটা সত্যিই জব্দ হয়ে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। দাবা খেলার আসরে গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবু মাঝে মাঝে ধ্যান ভঙ্গ করে কত কথা নিয়ে কত তর্কই না করেন; কিন্তু নিখিল সেনের নামে কোনও কথাই মুখর হয়ে ওঠে না। আগেকার ওসব কথা নিতান্তই একটা বাজে সন্দেহের কথা।

অনেকদিন পরে একদিন, দিবাকর যেন অস্বস্তির শেষটুকুও একেবারে শেষ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্য একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠে। —আচ্ছা শান্তি, আত্রেয়ী কি জানে না যে, নিখিলবাবু এখানে আছে?

শান্তি—কী করে বলব? আমি কোনওদিন জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু তোমার মনে হঠাৎ একথা জাগলো কেন?

দিবাকর—এমনি; হঠাৎ মনে হল, তাই জিজ্ঞেস করলাম।

শান্তি—কী মন রে বাবা! ছিঃ।

দিবাকর ভ্রূকুটি করে তাকায়—তুমি কিসের জন্যে এত দাপট দেখিয়ে কথা বলছ?

শান্তি—তুমিও বা মেয়েটাকে কী মনে করেছ?

দিবাকর—কী মনে করেছি?

শান্তি—তোমার ধারণা, আত্রেয়ীও যেন একটা কণিকা ভরদ্বাজ। —কথা নেই বার্তা নেই, ফস্ করে একটা বাইরের অচেনা-অজানা লোকের সঙ্গে রঙ মাখামাখি করে ফেলবে।

হেসে ফেলে দিবাকর। —আঁতে ঘা লেগেছে মনে হচ্ছে।

শান্তি—হ্যাঁ, আমি তো একটা কণিকা ভরদ্বাজ, ঠিকই।

দিবাকর—আমি কি তাই বললাম?

শান্তি—বললেই তো। কিন্তু সত্যিই যদি কণিকা ভরদ্বাজ হতাম, তবে আর একথা বলতেই পারতে না। তখন কত নভেলি ভাষায় ডাক দিয়ে দিয়ে আর ভজনা করে কথা বলতে; সবই জানি।

দিবাকর—কী জান?

শান্তি—পুরুষমানুষ একরকমই ইয়ে হয়।

দিবাকর—ইয়ে মানে তো গবেট। তাই না?

হেসে ফেলে শান্তি—তা জানি না। যাই হোক; আমার কথা হল...।

চুপ করে কী যেন ভাবতে থাকে শান্তি। তার পরেই, যেন একেবারে জয়িনীর মত ভঙ্গিতে ঘাড় দুলিয়ে হেসে ওঠে। —আচ্ছা, ঠিক আছে।

দিবাকর—কী?

শান্তি—তোমরা যে কত ইয়ে, সেটা শিগগিরই জানতে পারবে।

দিবাকর—কে জানাবে?

শান্তি—আমি, আমি, আবার কে?

শান্তির কাছে এগিয়ে যেতে থাকে দিবাকর। —কে তুমি?

—সাবধান। হাসতে হাসতে সরে যায় শান্তি। আবার ব্যস্ত হয়ে ঘরের কাজ খুঁজতে থাকে। তিনটে ল্যাম্পের চিমনির সব কালি মুছে দিয়ে তখুনি আবার পিতলের ফুলদানিটাকে তেঁতুল জলে চুবিয়ে মাজতে থাকে। ঘরের কোনও জিনিসে একটুও ময়লা সহ্য করতে পারে না শান্তি। সব পরিষ্কার হয়ে আর তকতক ঝকঝক করে হাসবে, তবে তো? তা না হলে, সোনাও আবর্জনা।

মাজা-ঘষা হয়ে পিতলের ফুলদানিটা ঝকঝক করে হাসছে। আত্রেয়ীর মুখটাকেই হঠাৎ মনে পড়ে যায়। মনে পড়বেই বা না কেন? আজকাল আত্রেয়ীর মুখে যে সব সময়ই সুন্দর শান্ত ও পরিষ্কার একটি ঝকঝকে হাসি ফুটে থাকে।

কিন্ডারগার্টেনের সামনের ছোট জমির ঘাসের উপর কানামাছি খেলছে বাচ্চারা। চিনু আর সন্তু কাচপোকা ধরবার জন্য বুনো তুলসীর একটা ঝোপের আশে-পাশে পা টিপে টিপে ঘুরছে। আত্রেয়ী একটা ছড়ার বই হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

হাওয়াবদলের তিনজন মহিলা, যাঁরা এই মাসেই এসেছেন, তাঁরা চোখ বড় করে আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে সামনের সড়ক ধরে চলে যান। কোনও সন্দেহ নেই, শুধু আত্রেয়ীর সুন্দর মুখটাকে নয়; মুখের এই ঝকঝকে হাসিটাকেও বেশ একটু বিস্ময় বলে ওঁদের চোখে ঠেকছে। শুনতে পায় আত্রেয়ী, চাপা গলায় কি-কথা বলে বলে আর হাসাহাসি করে ওঁরা চলে যাচ্ছেন। —ইনিই বোধ হয় সেই সুন্দরী, যার নামে এত গল্প...।

হঠাৎ চিনু আর সন্তু ছুটে এসে আত্রেয়ীর কাছে একটা অভিযোগের কথা চিৎকার করে শোনাতে থাকে।

—জান আত্রেয়ীদি; চন্দরদাদু তোমার নামে কী বলেছে?

আত্রেয়ী—কে?

চিনু—ওই যে? দেখছ না? চিনতে পারছ না? চন্দরদাদু চলে যাচ্ছেন।

দেখতে পায় আত্রেয়ী; মোষের শিঙের লাঠিটি হাতে দুলিয়ে অমিয় ভবনের পাশের ছোট রাস্তার কাঁকরের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যাচ্ছেন চন্দর জেঠামশাই।

সন্তু বলে—দাদু বলেছে; তুমি সবচেয়ে বোকা।

আত্রেয়ী—কাকে বলেছে? আমাকে?

চিনু—হ্যাঁ।

আত্রেয়ী হাসে—কেন? আমি কী দোষ করেছি?

চিনু—তুমি একটা চিঠিকে আঁকড়ে ধরে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিলে, একদিন দেখতে পেয়েছেন দাদু।

সন্তু—দাদু বলেছে, ধেৎ, কোনও মানে হয় না।

—খুব মানে হয়। সন্তুর গাল টিপে দেয় আত্রেয়ী। আত্রেয়ীর মুখ আরও ঝকঝক করে হেসে ওঠে।

চিনু—একদিন দাদুকে একথা বলে দিও, আত্রেয়ীদি।

আত্রেয়ী—না চিনু, গুরুজনকে মুখের ওপর একথা বলতে নেই। আমি বলব না। তোমরাও বলবে না।

সন্তু—কী মানে হয় আত্রেয়ীদি? বলো না?

আবার সন্তুর গাল টিপে দেয় আত্রেয়ী—ভাল লাগে।

সন্তু আর চিনুও আবার কাচপোকা ধরতে ছুটে চলে যায়।

ভুলে যায়নি শান্তি, দিবাকরকে জব্দ করবার জন্যে যে কথাটি একদিন বেশ ভাল করে চেঁচিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সে কথাটা এখনও ভাল করে জানা হয়নি। শান্তিকে এখন শুধু ভাবতে হয়, কী করে, কী কথা বলে আর কেমন করে জানা যায়? শ্রীলেখা কটেজের ঘরে আজকাল আলো জ্বলে, আত্রেয়ীর কাছে শুধু এই কথাটা বললেই তো অনেক কথা বলা হয়ে গেল। তারপর দেখা যাক, কী বলে আত্রেয়ী।

কিন্তু ছি, আর এভাবে একটা চোরা প্রশ্ন দিয়ে আত্রেয়ীকে যাচাই করবার কোনও দরকার হয় না। আর জানারই বা কী বাকি আছে? দেখতেই তো পাওয়া গেল, এই তিন মাসের মধ্যে কোনওদিনও আত্রেয়ীকে শ্রীলেখা কটেজের নাম করে একটা সামান্য কথাও বলতে শোনা গেল না।

হ্যাঁ, একদিন শ্রীলেখা কটেজের সামনের রাস্তা দিয়ে আত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গেলেই তো হয়। তা হলে সেই ভদ্রলোককে আত্রেয়ী নিজের চোখেই দেখতে পাবে। তারপর আত্রেয়ীকে আর কোনও কথা জিজ্ঞেস করে জানবার দরকার হবে না।

কল্পনাতে সবই ঠিক করে রাখে শান্তি। কিন্তু আত্রেয়ীর বাড়িতে এসে গল্প করতে গিয়ে সবই ভুলে যায়। এরকম একটা চেষ্টাকেও যেন বিশ্রী একটা নোংরা মনের চেষ্টা বলে মনে হয়।

বেড়াতে যেতে হলে বরং ওই শ্রীলেখা কটেজের রাস্তায় না যাওয়াই ভাল। পৃথিবীতে এত মেয়ে থাকতে শুধু বেচারা আত্রেয়ীকে নিয়ে এরকম একটা অগ্নিপরীক্ষা খেলা করবার কোনও মানে হয় না।

প্রয়োগবাবুর বাড়িতে আজ সন্ধ্যায় রামলীলার গান হবে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছেন প্রয়োগবাবু। প্রয়োগবাবুর স্ত্রী নিজেও একবার একে একে সব বাড়ির মেয়েদের সেধে গিয়েছেন; বলেও গিয়েছেন, মেয়েদের বসবার জন্যে ভিন্ন করে খুব ভাল ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিকেল হয়েছে। আত্রেয়ীদের বাড়ির মাঝের ঘরে বসে কাকিমার সঙ্গে গল্প করে শান্তি। তাড়াতাড়ি সেজে নিক আত্রেয়ী; এখনই বের হয়ে, ছোট ঝিলের চারদিকে একটু ঘুরে তারপর রামলীলার গান কিছুক্ষণ শুনে এলেই চলবে।

হঠাৎ কাকিমার মুখের একটা কথা শুনেই শান্তির মুখের হাসিটা যেন হঠাৎ আলোর ঝলকের মতে উথলে ওঠে। যেন শান্তিরই জীবনের একটা বিশ্বাসের স্পর্ধা হাততালি দিয়ে হেসে ডঠেছে।

কাকিমা বলেন—হ্যাঁ আত্রেয়ী তো জানেই। রামুয়া কবেই বলে দিয়েছে,
ছোটবাবু আবার এসেছে; দিদি, বহুদিদি আর বড় বাবু আসেনি।

শান্তি যেন এখানেই বসে দিবাকরকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে আর মনে মনে বলতেই শুরু করে দিয়েছে—এবার শুনলে তো? কে না কে, নিখিল সেন নামে কে একজন শ্রীলেখা কটেজে এসে তিন মাস ধরে বসে আছেন, কিন্তু সেজন্য আত্রেয়ীর যে কোনও মাথাব্যথা নেই, তার প্রমাণ পেলে তো? লজ্জা হচ্ছে তো?

গেটের তিনকাঠের বেড়াটাকে কে যেন বেশ জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। মট্‌মট্‌ করে শব্দটাও যেন কাউকে পথ ছেড়ে দিল।

প্রদোষবাবু এখন ঘরের ভিতরে বসে আছেন; বাইরের বারান্দায় কেউ নেই। কিন্তু একটা আগন্তুক পায়ের শব্দ মচ্‌মচ্‌ করে বারান্দার উপর আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়ায়।

কাকিমা বলেন—দিবাকর বোধ হয়।

শান্তি বলে—সে তো পরেশনাথ গিয়েছে; সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরবে।

কাকিমা—তবে কে এল?

যে এসেছে তার কোনও ডাক শোনা যায় না। সেই ডাকহীন আগমন তবে কী বারান্দার চেয়ারে চুপ করে বসে পড়েছে?

কিন্তু আত্রেয়ী এ কী করছে? সাজ সারা হয়নি আত্রেয়ীর; শাড়ির আঁচলটাকে এখনও হাতে ধরেই রেখেছে; গলার পাউডারের মোটা ছোপটাকে এখনও মিহি করে মিলিয়ে দেয়নি। পাশের ঘর থেকে হঠাৎ বের হয়ে এসে, মাঝের ঘরের কাকিমা আর শান্তির মুখের দিকে না তাকিয়ে, একটি কথাও না বলে, যেন একটা স্রোতের টানের ফুলের মত ভেসে বের হয়ে গেল।

—কেমন আছেন? বাইরের সেই আবির্ভাবের কাছে গিয়ে যেন উচ্ছল একটা অভ্যর্থনা হয়ে হাসতে থাকে আত্রেয়ী।

আগন্তুকের গলার গম্ভীর স্বরে কিন্তু বেশ স্পষ্ট একটা অভিযোগের গুঞ্জন শোনা যায়। —আগে জিজ্ঞেস করুন, কবে এসেছি। তারপর প্রশ্ন, কেমন আছি বা না আছি।

আত্রেয়ী—আমি তো জানিই, আপনি এখন এখানে আছেন।

—কতদিন হল আছি, সেটা জানেন কি?

—তিন মাস বোধ হয়।

—তবে তো জানেনই দেখছি। কিন্তু তারপর? একটুও তো খোঁজ নিলেন না। মঞ্জু না থাকলেই কি আমি একেবারে সাইফার?

—মঞ্জু কেমন আছে?

—খুব ভাল আছে আপনার মঞ্জু; একটা অপারেশন হয়েছিল। তারপর থেকে স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাল হয়ে চলেছে।

—প্রীতি বউদি?

—সব ভাল আছে। বড়দাও ভাল আছেন। আমিও ভাল আছি।

—আমিও ভালই আছি।

—ভাল কথা। আমি তবে মিথ্যেই একটা সন্দেহ করেছিলাম।

—কিসের সন্দেহ?

—মনে হয়েছিল, হয় আপনি জানেন না যে আমি এসেছি; নয় আপনার অসুখ-টসুখ করেছে।

—দুটোই মিথ্যে সন্দেহ।

—এখন আরও একটা সন্দেহ করছি; এটা নিশ্চয়ই মিথ্যে সন্দেহ হতে পারে না।

—কী?

—বেড়াতে বের হচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

—তবে আর একা-একা কেন বেড়াবেন? আমার সঙ্গেই চলুন।

—কিন্তু...।

—কিন্তু করবার কী আছে? আমি এই তিন মাসের মধ্যে একদিনও বেড়াতে বের হইনি। আজ এই প্রথম, একটু বেড়াবার ইচ্ছে নিয়েই বের হয়েছি। কিন্তু আপনি থাকতে একা-একা বেড়াতে যাব কেন? তাই কটেজ থেকে বের হয়ে সোজা আপনার এখানেই চলে এলাম।

—চা খাবেন?

—চা বাগানের লোককে চা না খাওয়ালেও চলে।

—আচ্ছা; একটু বসুন তা হলে।

—না, এখন চা খাব না কিন্তু।

—বুঝেছি। আমি শুধু কাকিমাকে একটা কথা বলে আসছি।

কাকিমা আর শান্তি; দুজনেই একেবারে নিথর হয়ে বসে আছেন। আত্রেয়ী ঘরে ঢুকেই শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকেন। —মঞ্জুর মেজদা, নিখিলবাবু এসেছেন। কিন্তু কী ঝঞ্ঝাটে ফেললেন, দেখছ তো বউদি?

কাকিমা—কিসের ঝঞ্ঝাট?

আত্রেয়ী—বেড়াতে যেতে বলছেন। এদিকে শান্তি বউদির সঙ্গে...।

কাকিমা—শান্তির সঙ্গেই বেড়াতে যাবি। ও ভদ্রলোকের কথায় কী এসে যায়?

আত্রেয়ী—তুমি কী বলছ, বউদি?

শান্তির স্তব্ধ চোখ দুটো শুধু একবার কেঁপে ওঠে। —আমি কিছুই বলছি না। তোমার ইচ্ছে।

আত্রেয়ী—তা হলে একবার ঘুরেই আসি, বউদি।

কাকিমা চমকে ওঠেন—সত্যিই যাবি?

আত্রেয়ী হাসে—হ্যাঁ; খুব শিগগির ফিরে আসব। খুব দূরে কোথাও যাব না।

খোলা গেটের তিনকাঠের বেড়াটা আবার যখন মট্‌মট্‌ শব্দ করে বেজে উঠে গেট বন্ধ করে দেয়, তখন প্রদোষ সরকারের বাড়ির খাপরার চালাটাও যেন মট্‌মট্‌ করে বেজে ওঠে। একটা বিড়াল চালার উপর দিয়ে দৌড়ে গিয়েছে এই মাত্র; কিন্তু তাতেই কী ভয়ানক মট্‌মট্‌ শব্দ। যেন সব অটলতার হাড়গোড় ভেঙে গেল।

খাট থেকে নামতে গিয়ে প্রদোষ সরকারের পা টলে যায়। একটা ক্রাচ হাতের মুঠো থেকে ফসকে গিয়ে মেঝের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে। ভয়ানক বিশ্রী আর্তনাদের মত একটা শব্দও করেছে এই ক্রাচটা, যেন কেউ মুখ থুবড়ে পড়েছে।

শান্তি বলে—আমি যাই, কাকিমা।

১৭

কাছাড়িপাড়ার শেষ সেগুন গাছের কাছে একটা সেকেলে পুরনো মন্দিরের ধড় টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ভাঙা-ভাঙা ইঁট-পাথর ছড়িয়ে রেখেছে। তারই পাশে একজন একেলে সাধুর সমাধি, চারদিকে শ্বেত করবীর ঘেরান। ঘেরানের এক জায়গায় ছোট একটা ফাঁকা; সেই ফাঁক দিয়ে গরু ঢুকে সমাধির চারপাশের ঘাসের গোছা পট্‌পট্‌ করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

সামনেই রেল লাইন। লাইনটার দু'পাশের মাটির উপর দিয়ে পায়ে চলা পথের একটা দাগও লাইনটার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। লাইনের পাশের মাটির এই হাঁটুরে দাগ ধরে ধরে টানেল পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসা যায়। এমন বেশি কিছু সময় লাগবে না; বিকেলের শেষ আলো ফুরিয়েও যাবে না।

শ্বেত করবীর ঘেরান দেওয়া এই সমাধিটা যেন খোলমেলা নিরিবিলির মধ্যেই বেশ নিবিড় একটি ছোট্ট নিরিবিলি। সমাধির কাছে বসবার জন্য শান বাঁধানো একটি চাতালও আছে। সে চাতালের উপরে বসলে শুধু আকাশের মুখ ছাড়া বাইরের আর কারও মুখ দেখা যায় না। বিকেলের গয়া-গোমো প্যাসেঞ্জার যখন ছুটে চলে যাবে, তখন মনে হবে, অন্য কোনও একটা পৃথিবীর কোলাহল ছুটে চলে গেল।

চলতে চলচে শ্বেত করবীর এই ঘেরানের কাছেই এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে নিখিল সেন, সেই সঙ্গে আত্রেয়ী।

নিখিল বলে—আপনি বোধ হয় মনে করেছিলেন যে, আমিও এই তিন মাস ধরে একবারে সমাধিস্থ হয়ে লুকিয়ে আছি।

আত্রেয়ী—তা মনে করব কেন? আমি তো জানিই, আপনি বই পড়েন; বই পড়তে খুব ভালবাসেন।

নিখিল—ঠিক কথা; খুব বই পড়ে নিয়েছি। কিন্তু মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত কাণ্ডও করেছি।

আত্রেয়ী—কী?

নিখিল—আপনার সঙ্গে কথা বলে ফেলেছি।

আত্রেয়ী—রামুয়া ঘুমের মধ্যে কথা বলে।

নিখিল—না, আপনাদের রামুয়ার মত ঘুমের মধ্যে নয়; জাগার মধ্যেই আমি কথা বলে ফেলেছি।

আত্রেয়ী হাসে—আমিও একদিন হঠাৎ শান্তি বউদিকে একটা কথা বলে ফেলেই বুঝতে পারলাম, ঘরে কেউ নেই।

নিখিল—একদিন কটেজের গেটের শব্দ হতেই মনে হল, আপনি এসেছেন। অমনি হঠাৎ বলে ফেললাম, আসুন।

আত্রেয়ী—আমি কিন্তু শান্তি বউদিকে ঠিক উল্টো কথাটি বলেছিলাম, এখন যাও বউদি।

নিখিল—এই তিনটে মাস বই নিয়েই কাটিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে বেশ বিশ্রী একটা অস্বস্তিতেও ভুগতে হয়েছে। অনেকবার শুধু রাতজাগাই সার হয়েছে, বইয়ের এক পাতাও পড়ে উঠতে পারিনি।

আত্রেয়ী—বাবাকেও দেখেছি; এক-একদিন রাত্রিবেলা ফটোর অ্যালবাম হাতে নিয়ে

দেখতে বসেন আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। মা তখন ধমক-ধামক করেন, তারপর বাবা অ্যালবাম রেখে দিয়ে শুয়ে পড়েন।

নিখিল—কিসের ফোটোর অ্যালবাম?

আত্রেয়ী—বাবার জিমন্যাস্টিক আর কসরতের যত পুরনো ফটোর অ্যালবাম। মাটিতে শুয়ে দুপা দিয়ে মস্ত একটা পিপেকে তুলে ধরেছেন বাবা; পিপের উপর আবার চার জন মানুষও দাঁড়িয়ে আছে।

নিখিল—একটা সত্যি কথা বলছি; কিছু মনে করবেন না। আপনার ওপর একদিন সত্যিই খুব রাগ হয়েছিল।

আত্রেয়ী হাসে। —শান্তি বউদিকেও দেখেছি; আমার উপর হঠাৎ এক-একদিন, একেবারে মিছিমিছি রাগ করে বসে থাকেন।

নিখিল—আমি কিন্তু মিছিমিছি রাগ করিনি। আপনি কি মনে করেন যে, আপনাকে বিরক্ত করবার কোনও ইচ্ছে আমার আছে?

আত্রেয়ী—ছিঃ এ কথা বলছেন কেন? আমি ওসব কিছুই ভাবি না।

নিখিল—তবে আসেননি কেন?

আত্রেয়ী—আমি বুঝতে পারিনি।

নিখিল—কী বোঝেননি?

আত্রেয়ী—বুঝতে পারিনি যে, আমার আসবার কোনও দরকার আছে।

নিখিল—দরকার আছে। কিন্তু আমার দরকার নয়; আপনারই দরকার।

আত্রেয়ী—আরও গল্পের বই এনেছেন?

নিখিল—না।

নিখিলের কথাটা যেন অদ্ভুত একটা গম্ভীরতার ধ্বনি হয়ে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েই আবার সামলে নিয়েছে। হাত বাড়িয়ে শ্বেতকরবীর একটা পাতা পট্ করে ছিঁড়ে নিয়ে নিখিল সেন বোধ হয় একটা ছটফটে অস্বস্তিকে মুক্ত করে দেয়। —আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি। গল্পের বই না পড়ে আমার সঙ্গে গল্প করতে কী আপনার খারাপ লাগে?

আত্রেয়ী—না।

গঙ্গা ফড়িংটা বুনো লতার একটা কচি পাতাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। দেখতে পেয়ে আত্রেয়ীর চোখ দুটো শিউরে কাঁপতে শুরু করেছে। তাই বোধ হয় আত্রেয়ীর গলার স্বরটাও বেশ শিউরে উঠেছে।

শ্বেত করবীর ঘেরানের যে ফাঁক দিয়ে ভিতরে গরু ঢুকেছে, সেই ফাঁক দিয়ে নিখিলও হাসতে হাসতে ভিতরে ঢুকে পড়ে। —বাঃ জায়গাটা তো বেশ চমৎকার, বসে গল্প করবার মত জায়গাটা বটে। ঘেরানের বাইরে যেখানে দাঁড়িয়েছিল আত্রেয়ী, চুপ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে গঙ্গা ফড়িংয়ের ফূর্তির কীর্তিটাকেই দেখতে থাকে।

নিখিল ডাকে—কই? আপনি কোথায়? ভেতরে আসবেন না?

নিবিড় নিরিবিলির অন্তঃপুর থেকে নিখিলের গলার স্বরের আহ্বানও একটা নিবিড়তার ডাক হয়ে বেজে উঠেছে। এখানে বসে একঘণ্টার মধ্যেই দেশ-বিদেশের কত সমাধির আর কত ভাঙা মন্দিরের মজার মজার গল্প শুনিয়ে দিতে পারে নিখিল; সে গল্প শুনে আত্রেয়ীর চোখের বিস্ময়ও কত নিবিড় হয়ে উঠতে পারে।

আত্রেয়ী হেসে ফেলে—আপনি চলে আসুন; ওখানে সাপটাপ থাকতে পারে।

ফিরে আসে নিখিল। কিন্তু নিখিলের পায়ে যেন কাঁটা বিঁধেছে। আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিখিল সেনের বিরক্ত চোখ দুটো হঠাৎ কঠিন ঠাট্টার বড়-বড় চোখ হয়ে অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে। —আমি ভেতরে ঢোকবার পরেই জায়গাটা সাপে ভরে গেল; কেমন?

আত্রেয়ী—কোন দিকে যাবেন?

নিখিল হাসে—চলুন, যেদিকে আপনার দু'চোখ যায়।

আত্রেয়ী—লাইন ধরে একটু এগিয়ে যেয়ে আর তাড়াতাড়ি ফিরে এলেই তো হয়।

নিখিল—চলুন।

আত্রেয়ী—ছত্রের মেলার সময় লাইনের এখানে গরুর ট্রেন এসে থেকে থাকে।

নিখিল—গরুর ট্রেন মানে!

আত্রেয়ী—ট্রেনে শুধু গরু থাকে; ছত্রের মেলাতে বিক্রি হবার জন্যে কত গরু নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু প্রয়োগবাবুর একটা গরু ট্রেনে উঠেই একটা কাণ্ড করেছিল।

নিখিল—কী?

আত্রেয়ী—ট্রেনের ওয়াগনে উঠতে গিয়ে গরুটা মুখ ফিরিয়ে যেই প্রয়োগবাবুর ছোট ছেলেটাকে দেখতে পেল, অমনি একটা লাফ দিয়ে ফিরে চলে এল।

নিখিল—গরুর কাণ্ড।

আত্রেয়ী—কিন্তু কেমন অদ্ভুত কাণ্ড বলুন তো।

নিখিল—হ্যাঁ, দেখতে একটু অদ্ভুত লাগে ঠিকই।

কিন্তু লাইনের কাছে এখন যেতে হলে প্রথমেই বেশ উঁচু একটা কন্টকাক্ত বাধাকে টপকাতে হবে। তিন ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া রেলের জমির নিশানা হয়ে টানেল পর্যন্ত গিয়েছে। নিখিলের কাছে তিন ফুট উঁচু ওই কাঁটাতারের বেড়া কোনও বাধাই নয়। এক লাফে পার হয়ে গিয়ে হাসতে থাকে নিখিল। আত্রেয়ী চমকে উঠে হাসতে থাকে—ওরে বাবা!

কাঁটাতারের ওপাশে দাঁড়িয়ে আর আত্রেয়ীর দিকে দু'হাত টান করে দিয়ে হাসতে থাকে নিখিল—কোনও ভাবনা নেই, চলে আসুন।

কিন্তু আত্রেয়ী যেন একটা স্তব্ধ শক্ত ও বধির পাথরের মূর্তি। শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, নিখিলের কথার কোনও শব্দ কানে পৌঁছেছে বলে মনে হয় না।

নিখিল—কোনও সন্দেহ করবেন না; আমার হাতে যথেষ্ট জোর আছে; আপনাকে অনায়াসে তুলে নিতে পারব।

আত্রেয়ী হাসতে চেষ্টা করে—কী যে বলছেন, আমি কিছু বুঝছি না।

নিখিল—কেউ নেই এখানে, কেউ দেখছে না, আপনার লজ্জা করবার কিছু নেই।

নিখিল সেনের চোখ দুটোকে বোধ হয় ভাল করে তাকিয়ে দেখছে না আত্রেয়ী। তা না হলে, বুঝতে পারত আত্রেয়ী, কী অদ্ভুত তীব্র হয়ে জ্বলছে নিখিল সেনের আহত অহংকারের চোখ। নিখিল সেনের হাত দুটোর এই আগ্রহ যে একটা খেলনা পুতুলকে কোলে তুলে নিয়ে কাঁটাতারের বাধা পার করে দেবার জন্য একটা কৌতুকের আগ্রহ মাত্র। সরিয়াডির মেয়ের গা ছুঁয়ে দেবার জন্য নিখিল সেনের মত মানুষের মনে যে কোনও ইচ্ছেই থাকতে পারে না; সেটা বোধ হয় এখনও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারেনি আত্রেয়ী।

নিখিল বলে—আপনি কিন্তু খুব ভুল করছেন।

এক পা পিছু সরে গিয়ে, হাতের রুমালটাকে ঠোঁটের উপর চেপে রেখে, আব দুলে দুলে হাসতে থাকে আত্রেয়ী। —কী যে বলছেন আপনি, কোনও মানে হয় না। শেষে কি পড়ে মরে একটা কাণ্ড বাধাব?

নিখিল—হাসবেন না। বিশ্বাস করুন, পড়ে যাবেন না। পড়ে যেতে দেব না। আমার হাত হাওয়া-বদলের যক্ষ্মারোগীর লিকপিকে হাত নয় যে মট্ করে ভেঙে যাবে।

আত্রেয়ীর হাসিটা হঠাৎ যেন একটা পথ দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। —আপনি ওখানেই থাকুন। আমি আসছি।

একটু দূরে, ডিঙিয়ে যাবার সুবিধের জন্য কে যেন কাঁটাতারের বেড়াটাকে এক জায়গায় পিটিয়ে বেশ নিচু করে দিয়েছে। লাফ-ঝাঁপ না করেও অনায়াসে পার হওয়া যায়। এগিয়ে যায় আত্রেয়ী, বেড়া পার হয়ে আবার নিখিলের কাছে এসে দাঁড়ায়।

নিখিলের চোখে-মুখে যেন একটা চাপা ঠাট্টার হাসি জ্বলছে। —আমি ভাবলাম, পড়ে-মরে যাবার ভয়ে সোজা বোধ হয় বাড়ির দিকেই চললেন। এখন দেখছি, তা নয়। এখানেই আবার এলেন।

আত্রেয়ী—সন্ধ্যা হবার আগেই কিন্তু বাড়ি ফিরতে হবে।

—নিশ্চয়। কিন্তু এক-একবার মনে হচ্ছে, এখনি ফিরে গেলে মন্দ কী?

—কেন?

—ভাল লাগছে না।

—এদিকে না এসে ছোট ঝিলের কাছে বেড়াতে গেলে বোধ হয় ভাল লাগত।

—আপনি যদি আমার একটি কথা বিশ্বাস না করেন, তবে আমার কিছু ভাল লাগবে না।

—কী কথা?

—আমাকে ভয় করবার কিছু নেই।

—আপনাকে একটুও ভয় করি না।

—আমি যে এখানে এসে আপনাকে দেখতে চাই, সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে চাই, সে শুধু আপনারই জন্য।

—একথা তো আগেও বলেছেন।

—বিশ্বাস করেছেন?

—নিশ্চয়।

—আমার মত মানুষ এখানে এসে কারও সঙ্গে একটা চিরকালের কাণ্ড বাধাতে পারে না, এটা বিশ্বাস করেন তো?

—কেন করব না? প্রীতি-বৌদির কাছ থেকে তো সবই জানতে পেরেছি।

—দু'দিনের জন্যে এসে ছোটলোকও হয়ে যেতে পারি না; এটাও তো বিশ্বাস করবেন?

—ছিঃ নিখিলবাবু; আপনি মিছিমিছি কেন এত শক্ত-শক্ত কথা বলছেন? এসব কথা আমার তো কোনওদিনই মনে হয়নি।

নিখিল হেসে ফেলে—সবই তো পরিষ্কার বুঝে ফেলেছেন। এবার শুধু বিশ্বাস করুন, আমি দুদিনের ভদ্রতা মাত্র। মাঝে মাঝে এখানে আসব, থাকব, আর বেড়িয়ে গল্প করে চলে যাব। আপনি কি তাতে বিরক্ত হবেন?

আত্রেয়ী—একটুও না।

—ব্যাস, তা হলেই হল। সব চেয়ে খুশি হব সেদিন, যেদিন দেখব হেমন্তবাবুর সঙ্গে আপনি বেড়াতে বের হয়েছেন। সেদিন আমিও আপনাদের সরিয়াডিকে শেষ সেলাম জানিয়ে সরে পড়বো।

—আর আসবেন না?

—সেটা ভবিষ্যৎ জানে; আমি জানি না।

গুমরে উঠেছে দূরের টানেল। ছুটে বের হয়ে এল হাওড়া-দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার। যেন বিকেলের আলোতে সাঁতার দিয়ে ছুটে আসছে ট্রেনটা। কিন্তু সিগন্যাল পায়নি বলেই মন্থর হতে হতে একেবারে থেমেই গেল।

ট্রেনের কামরার জানালা দিয়ে অনেক চোখ উঁকি দিয়ে নিখিল আর আত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে থাকে। নিতান্ত ক্ষণকালের একটি ছবির দিকে কত মুগ্ধ হয়ে ওরা তাকিয়ে আছে। শুধু সিগন্যালের অপেক্ষায় থমকে আছে ট্রেনটা; যে কোনও মুহূর্তে চলে যাবার সঙ্কেত পেলেই চলে যাবে।

নিখিল আর আত্রেয়ীর চোখে এই ট্রেনটাও ক্ষণকালের মায়ার ছবি হয়ে একটা মুগ্ধতা ঘনিয়ে তুলেছে। হাই তুলছে, হাঁপ ছাড়ছে, কাশছে, হো হো করে হেসে উঠছে, আর বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে কত কথাই না বলে নিচ্ছে যাত্রী প্রাণের একটা মিছিল, যেটা আর দু'তিন মিনিট পরেই এখানে আর থাকবে না, কোনওকালেও না, ইহজীবনেও না। তবু তো দেখতে ভালই লাগে, মায়া করে তাকাতেও ইচ্ছে করে। ট্রেনের দিকে তাকিয়ে নিখিল আর আত্রেয়ী খুশি হয়ে হাসে আর হাঁটতে থাকে।

নিখিলের গলার স্বরে এবার যেন বেশ শান্ত একটা করুণতা ফুটে ওঠে। —আমার একটা অসুবিধে কী জানেন? আমাকে অনেকেই ঠিক বুঝতে পারে না। এমন কি, বউদি আর মঞ্জু, যারা আমাকে বেশ ভাল করেই চেনে, তারাও মাঝে মাঝে আমাকে যেন একটুও বুঝতে পারে না।

আত্রেয়ী—না বুঝবার কী আছে?

নিখিল—আমি যে এখানে এসে আপনার মত দুদিনের চেনা এক মেয়েকে ডাকাডাকি করি, এটা যেন আমার একটা খামখেয়ালি বাড়াবাড়ি।

—তাতেই বা কী এসে যায়?

—হ্যাঁ, মিথ্যে কথা বলব না; আপনাকে ডাকবার আর সঙ্গে নিয়ে বেড়াবার একটা ইচ্ছে তো থাকেই; কিন্তু সে ইচ্ছেটা নিশ্চয় একটা দাবি নয়। আপনার যেদিন খুশি সেদিনই বলে দেবেন, না দরকার নেই। আমিও সেদিন সেই মুহূর্তে খুশি হয়ে, হয় চলেই যাব, নয় সরিয়াডির ঝিলে মাছ ধরতে বসে যাব। জীবনেও আর কখনও আপনার কাছে গিয়ে বলব না যে, বেড়াতে চলুন।

আত্রেয়ীর চোখে বেশ রুক্ষ একটা ভ্রূকুটির ছায়া কাঁপতে থাকে। —আপনি কেন যে এত কথা আর এসব কথা তুলছেন, বুঝি না।

নিখিল হাসে—যাক, এতদিনে তবু রাগ করে একটা কথা বললেন।

আত্রেয়ীও হেসে ফেলে—কিন্তু আর কোনওদিন এসব কথা তুলবেন না।

—হেমন্তবাবুর চিঠি পেয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—কেমন আছেন?

—ভাল।

—আর তো...বোধ হয় আর এক বছর...।

—না, তারও কম।

খুব জোরে হুইসিল বাজিয়েছে ট্রেন। ধক্ ধক্ করে ধোঁয়া উগরে দিয়ে চলতে শুরু করেছে ট্রেন। আত্রেয়ী হাসে। —মঞ্জু তো একটিও চিঠি দিল না।

—মঞ্জুই জানে, এমন অভদ্রতা করে মঞ্জুর কী লাভ হল? কিন্তু আপনারই বা তাতে কোন ক্ষতিটা?

আত্রেয়ী এইবার মুখ ঘুরিয়ে হাসে—কিছুই জানতে পারছি না, এই একটা ক্ষতি, আর কিছু নয়।

নিখিল—মঞ্জুর বিয়ে হবে শিগগিরই।

—আরও একটা সুখবর পাওয়া দরকার ছিল।

—সে খবরও হঠাৎ একদিন পেয়ে যেতে পারেন।

—মঞ্জু তো চিঠিই লেখে না; কী করে পাব?

—বেশ তো; আমিই জানিয়ে দেব।

—জানাবার কোনও দরকার নেই; হাওয়াবদলের জন্য দুজনেই সোজা এখানে চলে আসবেন, তা হলেই হবে।

—অসম্ভব নয়। কিন্তু আপনি কি তখনও এখানে থাকবেন?

—তখন না থাকি, একদিন ফিরে এসে সবই শুনতে পাব। ভাগ্যে থাকে তো, দেখতেও পাব। বুঝতে পারেনি আত্রেয়ী, নিখিলের চোখ দুটো তখন অপলক হয়ে আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় আত্রেয়ী; মাথা ঝুঁকিয়ে আর দু-হাত দিয়ে খুঁটে খুঁটে হাঁটুর কাছের শাড়িটার গা থেকে কয়েকটা চোরকাঁটা তুলে ফেলে দেয়।

নিখিল বলে—আপনি কিন্তু অনেক রোগা হয়ে গিয়েছেন।

আত্রেয়ী—কিন্তু খাচ্ছি তো খুব।

—বিশ্বাস করি না।

—আপনিও দেখছি শান্তি বউদির মত আমার সব কথা শুধু অবিশ্বাস করেন। শান্তি বউদি সব সময় আমার মুখ শুকনো দেখছেন। সব সময় ওই এক কথা, খেয়েছ তো আত্রেয়ী? কী খেলে? কখন খেলে?

—বাঃ শুনে মনে হচ্ছে, আপনার শান্তি বউদিও বেশ মায়ার মানুষ।

—সে আর বলতে! কিন্তু...।

—কী?

—ভাবতে একটু কষ্ট হচ্ছে, শান্তি বউদি আজ হয়ত আমার উপর রাগ করেছেন।

—কেন?

—আজ শান্তি বউদির সঙ্গে বেড়াতে বের হবার কথা ছিল। কিন্তু আপনি এসে ডাকলেন বলে আপনারই সঙ্গে চলে এলাম।

—আপনার শান্তি বউদির কিন্তু রাগ করবার কোনও মানে হয় না। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াবার সুযোগ উনি তো চিরকালই পাবেন, কিন্তু আমি তো পাব না। আমি তো ট্রেনের মানুষ; হঠাৎ সিগন্যাল পড়ে যাবে, আর হুইসিল বেজে উঠবে। তারপর আর...।

আত্রেয়ী—কী?

নিখিল হাসে—তারপর কে আর কার কোনও মায়ার কড়ি ধারে।

আত্রেয়ী—আবার আপনি বেশি কথা বলতে শুরু করেছেন।

নিখিল—থাক তবে; কোনও কথাই বলব না।

আত্রেয়ী—তা হবে না। কথা বলতেই হবে। আমাকে ডেকে নিয়ে এলেন কেন?

নিখিল—কী বলব, বলুন।

আত্রেয়ী—রান্না-বান্না করছে কে?

নিখিল—ধীরু খানসামা।

আত্রেয়ী—আজ দুপুরে কী খেলেন?

নিখিল—অনেক কিছু। আতপ চালের ভাত, চারটে আলু সেদ্ধ আর এক চামচ ঘি।

—এ তো সন্ন্যেসীর খাওয়া।

—যখন বেশি পড়াশোনা করি, তখন এর চেয়ে বেশি কিছু খাই না।

—এত পড়াশোনারই বা কী দরকার?

—কোনও দরকার নেই। ওটা একটা অভ্যেস।

—ছাই অভ্যেস। ছেড়ে দিলেই ভাল।

—হতে পারে; কিন্তু এ ছাই অভ্যেস ছাড়তে পারব বলে মনে হয় না।

—আমার কথা শুনে ছাড়বেন না জানি; কিন্তু একদিন একজনের কথা শুনে ছেড়ে দিতেই হবে।

সত্যিই যে আবার রাগ করে কথা বলছে আত্রেয়ী। নিখিল সেনের জীবনের কঠিন ফিলসফি আর কঠোর সায়েন্সের চোখ দুটো যেন হঠাৎ বিস্ময়ে বোকা হয়ে গিয়ে সরিয়াডির এক সামান্য মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আত্রেয়ী বলে—এবার ফিরতে হয়।

শালবনের মাথার উপর ঠাণ্ডা সূর্যের চেহারাটা আবির-মাখা হয়ে ঢলে পড়েছে। নিখিল বলে—হ্যাঁ, এখন ফিরে যাওয়াই ভাল। কিন্তু...।

আত্রেয়ী—কী?

—আপনি কাল একবার আসবেন?

—কোথায়?

—কটেজে।

—না। আপনি আসবেন।

—কোথায়?

—আমাদের বাড়িতে।

১৮

সরিয়াডির ঘন সন্ধ্যাটা হঠাৎ লালচে হয়ে জ্বলে উঠেছে।

সন্ধ্যার ট্রেনে পরেশনাথ থেকে সরিয়াডি ফিরে এসেই দেখতে পেয়েছে দিবাকর, কালীবাড়ি রোডের নিতাইবাবুর বাড়ির ঘরের মাচানে আগুন লেগেছে। উড়ছে আগুনের জটা; গোঁ গোঁ করে শব্দ করে জ্বলছে আগুনের আহ্লাদ। গনগনে গরম ছাই ছিটকে পড়ছে; গাছের বক উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আগুন নেভাতে এসে ভিড়টা শুধু ভীরু হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। নিতাইবাবুর বাড়ির কুয়োটা একেবারে শুকটো খটখটে; এক ফোঁটা জল নেই। কিছুই করা গেল না। মাচানের খড়ের পাহাড় দেখতে দেখতে একটা ছাইগাদা হয়ে গেল।

সেই ভিড়ের ভীরু নীরবতার মধ্যে শুধু চন্দ্রবাবুর গলার স্বর একবার হই হই করে চলে গেল—কী ব্যাপার? কিসের আগুন? হঠাৎ একটা আগুন কোত্থেকে এল হে দিবাকর?

বেচারী শান্তি, সরিয়াডির শান্তি বউদি; দিবাকরের হাতের কাছে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিতে যেয়েই ফুঁপিয়ে ওঠে।

শান্তির একটা সাধের গর্ব হেরে গেল, একটা মায়ার চেষ্টা মিথ্যে হয়ে গেল, শুধু সেই জন্যে নয় বোধ হয়; শান্তির জীবনের একটা আদুরে বিশ্বাস, যেটা মায়ের কোলের ছেলের মত একটা আদুরে মানিক, দেখতে ভাল-মন্দ সত্যি-মিথ্যে যা-ই হোক না কেন, সেটা যে মরে যেতে চলেছে। ভয় না পেয়ে আর ফুঁপিয়ে না কেঁদে পারবে কেন শান্তির মত মেয়ে?

দিবাকর—শুনেছি, এইমাত্র নরেনের কাছ থেকে শুনতে পেলাম।

শান্তি—তবে আর কী? আমার কিছু আর বলবার নেই। তুমি যা ইচ্ছে হয় বলতে পার। দিবাকরের গলার স্বর উদাস হয়ে যায়।

—কী আর বলব? আমারও কিছু বলবার নেই।

পর পর চারবার হল, ঠিক মাঝরাতে হাজরাবাবুর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। বাকি রাতটুকু আর ঘুমোতেই পারেন নি। বার বার সিগারেট খেয়েছেন, তবু যেন গা ছমছম করেছে। সকাল হতেই

সামন্তবাবুর কাছে গিয়ে বলেছেন—কিছুই যে বুঝতে পারছি না, সামন্তদা। রোজ রাত্তিরে একটা কাণ্ড হচ্ছে।

—কী হল?

—বাইরে থেকে কপাটের গা কেউ যেন আঁচড়াচ্ছে বলে মনে হল। টর্চ জ্বেলে আর লাঠি নিয়ে বাইরে গেলাম; কিন্তু কই? কেউ কোথাও নেই। আবার যেই ফিরে এসে একটু শুয়েছি আর চোখ বন্ধ করেছি, অমনি আবার। আবার উঠলাম। কিন্তু কিছুই না, কেউ নেই।

—ছায়ার মত কিছু পালিয়ে যেতে দেখতে পেয়েছেন কি?

—ঠিক দেখতে পাইনি। তবে মনে হল।

—তবে তো চিন্তার কথা।

—এর মধ্যে আর এক চিন্তে বাধিয়ে রেখেছে প্রদোষবাবুর মেয়ে। আমার তো ভাবতে সত্যিই ভয় করছে সামন্তদা।

—হ্যাঁ, আপনি তো তাও টর্চ জ্বেলে আর লাঠি নিয়ে তেড়েমেড়ে বাইরে গিয়ে ছায়াটাকে তাড়ালেন; খোঁড়া মানুষ প্রদোষবাবুর যে সে সাধ্যিটুকুও নেই।

শ্রীপদবাবুর বাড়িতে চুরি হয়ে গিয়েছে। এটাও একটা ভয়ানক রহস্যের চুরি। থানা অফিসার বেশ একটু বিরক্ত হয়ে বলেছেন—ঘরের ভিতর থেকে দরজার খিল কেউ খুলে দিয়েছে, তা না হলে কোনও চোরের পক্ষে এমন চুরি সম্ভব নয়।

শ্রীপদবাবু সে রাতে একাই বাড়িতে ছিলেন। আর কেউ ছিল না। তবে কে খুলে দিল খিল? থানা অফিসারের কথা শুনে শ্রীপদবাবু খুবই ভয় পেয়েছে—তবে কি আমিই হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়ে খিল খুলে দিয়েছিলাম?

সন্ধ্যাবেলা ধানোয়ার রোডের কালভার্টের কাছে ঘাসে ভরা ঢালুটার উপর গা এলিয়ে দিয়ে আর শুয়ে বসে গল্প করতে সাহস করে না নরেন আর বিমল, পরেশ আর মাধব। চিতি সাপটা নিশ্চয় এখানেই ঘাসের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে ঘুরছে; খোলসটা যদিও একটু দূরে ঝোপের গায়ে ঝুলছে।

কালভার্টের উপরে দাঁড়িয়ে গল্প করতে গিয়ে ওরা যেন স্বস্তি না পেয়ে উসখুস করে। ভয় হয়, হয়ত এখনই এই দিকে বেড়াতে চলে আসবে একটা অপমানের ছবি। তখন দূরে সরে যেতেই হবে।

নরেন বলে—আত্রেয়ী কেন যে এরকম একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড করছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

পরেশ—রজনীধামে নতুন যারা এসেছে, তারা কী বলাবলি করছিল, শুনবে?

নরেন—কী?

পরেশ—ইয়া মোটা এক টেকো ভদ্রলোক, হাফ-প্যান্ট পরে আর চুরুট টানে, সেই ভদ্রলোক বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আর হেসে হেসে ওইরকম মোটা আর-এক ভদ্রলোককে বলছেন : জানেন তো মশাই, সরিয়াডিতে শুধু লজ কটেজ আর ভবন নয়, বেড়াবার সুন্দরী সঙ্গিনীও ভাড়া পাওয়া যায়। ট্রাই করবেন নাকি?

নরেন—চিনিয়ে দিস তো লোক দুটোকে।

মাধব—কিন্তু চিনিয়ে দিলেই বা কী হবে?

আলোচনার সব শক্তি যেন এইবার স্তব্ধ হয়ে যায়। কেউ আর কোনও কথা বলে না; বলতে চায়ও না। বলবার মত কিছু খুঁজেও পায় না। যাদের হাত ফণী মিত্রের গাড়ির হেডলাইট চূর্ণ করে দিয়েছে; যাদের শক্ত ছায়া দেখে জগৎ ব্যানার্জি পালিয়ে গিয়েছে, তারা আজ যেন নিজেরাই ভয় পেয়ে ছায়া হয়ে গিয়েছে।

চিনুর পিসিমার চোখ দুটো ছলছল করে। কুলোর বড়ি তুলতে গিয়ে হাতটা বড়ির উপরেই অনড় হয়ে পড়ে থাকে। নিজের মনেই কথা বলেন পিসিমা? —ছি ছি, এ কী হল? এমন কাণ্ড হয়ই বা কেন? মেয়েটার বুদ্ধিসুদ্ধিতে কী এটুকুও বলে না যে, চিরকালের কথাটা ভুলে গিয়ে দু'দিনের তামাসার নাচ নাচতে নেই? ওরে ও চিনু একবার দেখে আয় তো মা, তোদের আত্রেয়ীদি এখন কী করছে।

চিনু বলে—দেখেছি, আত্রেয়ীদি এখন গল্প করছে।

—কার সঙ্গে?

—চিনি না। একজন চশমা পরা চেঞ্জার।

শুধু চিনু কেন, সরিয়াডির কে না দেখেছে আর দেখতে পাচ্ছে? শ্রীলেখা কটেজের ভদ্রলোক প্রায়ই এসে প্রদোষ সরকারের বাড়ির বারান্দায় উঠে শুধু দুটি কথা ধ্বনিত করেন। —আমি নিখিল।

তখুনি বের হয়ে আসে আত্রেয়ী। কোনওদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে, কোনওদিন গেটের কাছে এসে, কখনও বা সামনের রাস্তায় পায়চারি করে। এক-একদিন কাছারিপাড়া ছাড়িয়ে শিরীষ আর খেজুরের ছায়া ছড়ানো ডাঙার চারদিকে দু'জনে বেড়িয়ে আসে। ডাঙার লালমাটির উপর দাঁড়িয়ে ওরা দূরের পরেশনাথের নীলচে চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে। কখনও বা দেখতে থাকে, শালবনের সবুজ একদিনের বৃষ্টির জল কত ঘন হয়ে গিয়েছে।

তবু দিবাকরের মত মানুষের মেজাজও আর ছটফট করে উঠতে পারছে না। দিবাকরের সাইকেলে স্পিড নেই। শান্তির কাছে বসে আর আনমনার মত অন্যদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে দিবাকর। চন্দরকাকা হে হে করে হেসে হেসে যে কথাটা বলেন, সে কথাটা তবে নেহাত মিথ্যে কিছু নয়।

শান্তি—গোষ্ঠদা কী বলছেন?

দিবাকর—গোষ্ঠদা আর হাবুলদা তো কথা বলতেই চান না। ওঁরা বলেন, ওঁদের আর কিছু বলবার নেই।

শান্তি—কিন্তু এত ভয় করলে চলবে কেন?

চমকে ওঠে দিবাকর। —তুমি বলছ একথা?

শান্তি—বলছিই তো।

বেচারা দিবাকর, ছোট্ট একটি স্থায়িতার ঘরে সুখী হয়ে পড়ে আছে যে মানুষটা, কাঠের গোলাদারি করে আর মাঝে মাঝে ছিপ হাতে নিয়ে ছোট ঝিলের জলে মাছ ধরে যার জীবনের দিনগুলি খুশি হয়ে যায়, ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত পড়া সামান্য বিদ্যের মানুষটি, ফিলসফির তন্ত্রমন্ত্রের কোনও ধারই যে ধারে না, সে মানুষেরই চোখে বেশ শক্ত একটা ভ্রূকুটি হঠাৎ পাকিয়ে উঠতে থাকে। যেন একটা হেঁয়ালির কাছে কৈফিয়ত চাইতে চেষ্টা করছে দিবাকর। দিবাকরের অবুঝ আত্মাটাই যেন রাগ চাপতে গিয়ে বিড়বিড় করে। —না, চন্দরকাকা যা-ই বলুন, তিরছি নদীকা পানি হয়ে শুধু বয়ে গেলে আর সবই বইয়ে দিলেই চলে না। বাঁচতে হলে এক জায়গায় ঠেকে থাকতে হয়।

শান্তি—আমি বলি, অন্তত চেষ্টা কবা তো উচিত। তারপর ঠেকে থাকতে পারি বা না পারি, যা হবার হবে। আত্রেয়ী যে একটু চেষ্টাও করে না।

দিবাকর উঠে দাঁড়ায়। —আমি, এখনি আসছি।

দুপুরের রোদে তেতে উঠেছে নয়াপাড়ার সড়কের ধুলো। তারই উপর দিয়ে কী সাংঘাতিক স্পিড নিয়ে ছুটে চলে গেল দিবাকরের সাইকেল।

প্রদোষ সরকারের বাড়ির বারান্দায় উঠেই ডাক দেয় দিবাকর। —কাকিমা। কাকিমা বের হয়ে আসেন—কী খবর দিবাকর?

—আত্রেয়ী কোথায়?

—ঘুমিয়ে আছে।

—আপনি এখুনি আত্রেয়ীকে বলুন, নিখিলবাবুর সঙ্গে যেন আর বেড়াতে না যায়, গল্পটল্পও না করে।

—এখুনি বলব?

—হ্যাঁ, আমি এখানে দাঁড়িয়েই শুনব, আত্রেয়ী কী বলে।

শুনতে পেল দিবাকর, আত্রেয়ী যেন স্বপ্ন দেখে পাগল হয়ে যাওয়া একটা মানুষের মত কথা বলছে। —না, তা হয় না, কাকিমা। নিখিলবাবুর মত মানুষের সঙ্গে আমি অভদ্রতা করতে পারব না। ভদ্রলোক এলে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলবই, বলা উচিত। না বললে, মিছিমিছি ভদ্রলোককে অপমান করা হয়।

কাকিমা আবার বাইরে এসেই দেখতে পান, দিবাকর গেট পার হয়ে গিয়ে রাস্তার উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

যেন অনেক চেষ্টা করে কোনও মতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দিবাকর; একটু জোরে হাওয়া বইলেই ধুলোর উপর পড়ে যাবে দিবাকর আর দিবাকরের সাইকেল।

এগিয়ে আসেন কাকিমা। —শুনলে তো দিবাকর। এখন বলো, আমাদের আর কী করবার সাধ্যি আছে?

দিবাকরের চোখ দুটো লাল হয়ে গিয়েছে।

—শেষ চেষ্টা করবেন?

—কী করব বলো?

—আপনি নিজেই নিখিলবাবুকে একদিন একটু বুঝিয়ে বলুন, নিখিলবাবু যেন আর আত্রেয়ীকে ডাকাডাকি না করেন।

সেদিনই সন্ধ্যায় যখন শ্রীলেখা কটেজের বারান্দায় বসে বই পড়ছে নিখিল সেন, তখন সরিয়াডির একটি করুণ আবেদনের মূর্তি, সরিয়াডির সুহাস কাকিমা চিনুর হাত ধরে সেই বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। আর দিবাকর যেন আবছায়া হয়ে গেটের থামের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

নিখিল একটু বিস্মিত হয়ে তাকায়—কে আপনি?

—আমি আত্রেয়ীর কাকিমা।

—কী আশ্চর্য, আপনি এখানে কী মনে করে?

—আপনাকেই একটা কথা বলতে এসেছি।

—বলুন।

—আমাদের আত্রেয়ী তো একটা মুখ্খু সুখ্খু অবুঝ মেয়ে, কিন্তু...।

—কিন্তু তাতে কী আসে যায়? হাসতে হাসতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নিখিল।

—আপনি তো সবই বোঝেন; আত্রেয়ীর অবস্থার কথা নিশ্চয় সবই জানেন। তাই আপনি যদি এখন...।

—বলুন।

—আপনি যদি আত্রেয়ীর সঙ্গে দেখা-টেখা না করেন, তবে আমরা সবাই একটু নিশ্চিন্ত হই।

—সে কী কথা? আপনাদের কিসের এত দুশ্চিন্তা? আত্রেয়ীর সঙ্গে দেখা-টেখা করে কি আমি ভয়ানক একটা দোষ করে ফেলেছি?

—আপনার কোনও দোষই নেই। আপনার মত মানুষ আমাদের মত ঘরের একটা মেয়ের

সঙ্গে ভদ্রতা করে দুটো কথা বলবে, এটা তো আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আত্রেয়ী যে একটা বোকা মেয়ে, ভুল করে ফেলতে পারে।

—কিন্তু আমার ভুল হতে পারে না; আমি ভুল-টুল করি না।

—খুব সত্যি কথা।

—তবে তো আপনার আর কিছু বলবার নেই।

—আপনি দয়া করুন।

—কী, দয়ার কথা আবার তুলছেন কেন? কোনও মানে হয় না।

নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কাকিমা। চিনু হঠাৎ ছটফট করে কাকীমার হাত ধরে টানতে থাকে।

হেসে ওঠে নিখিল সেন। শান্ত সুন্দর ও স্নিগ্ধ হাসি। —আপনি বরং দয়া করে অনুমতি দিন কাকিমা, কাল আপনাদের মেয়েকে একবার পরেশনাথ বেড়িয়ে নিয়ে আসতে চাই; ট্যাক্সিতে যাব, ট্যাক্সিতেই ফিরব।

ফিরে এলেন কাকিমা। দেখতে পায় দিবাকর, কাকিমার চোখ দুটো জলে ভরে গিয়েছে।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে দিবাকরের চোখ। সরিয়াডির চোখ। কী ভয়ানক আগুন ঠিকরে পড়ছে সেই দুটো চোখ থেকে। সরিয়াডির কাকিমাকে ঠাট্টা করে কাঁদিয়ে দিয়েছে বাইরের একটা ভালমানুষি হামবড়াই, অপমানের জ্বালাটা যেন সরিয়াডির শালজঙ্গলের নেকড়ের মত এইবার হিংস্র হয়ে ছুটে গিয়ে টুঁটি কামড়ে ধরতে চায়। দিবাকরের চোয়াল কাঁপে, দাঁতে দাঁতে শব্দ হয়।

—ঠিক আছে, এখন বাড়ি চলুন কাকিমা।

একদিন, দু'দিন, পরপর সাতদিন সরিয়াডির প্রাণের জ্বালার নেকড়েটা শুধু আড়াল থেকে চোখ রেখে দেখতে থাকে হ্যাঁ, ট্যাক্সি করে পরেশনাথ থেকে ফিরে এল নিখিল আর আত্রেয়ী। একদিন ছোট ঝিলের জলের একটা শালুক তুলে নিয়ে আত্রেয়ীর দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে নিখিল; শিউরে হেসে উঠেছে আর একটা লাফ দিয়ে সরে গিয়েছে আত্রেয়ী। নিখিল বলে—কেন, কী হল? লুফে ধরতে পারলেন না? আত্রেয়ী হাসে—ওরে বাবা, ঝিলের জলের শালুকে জোঁক থাকে।

রাত মন্দ হয়নি। নয়াপাড়ার সড়কের মোড়ের টিমটিমে বাতি নিবে গিয়েছে। ঝড়ের বাতাস লেগে গভীর অন্ধকারটাই বুঝি ফোঁস ফোঁস শব্দ করছে। দাঁড়িয়ে আছে পরেশ, মাধব, নরেন আর বিমল।

নরেন বলে—হতে পারে লোকটা সত্যি একটা স্কলার। কিন্তু নিজেকে ছাড়া আর কাউকে যেন মানুষ বলেই মনে করে না।

মাধব—মাঝে মাঝে সরিয়াডিতে আসবেন, আর কোনও সম্পর্ক নেই এক ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে বেড়িয়ে হেসে আর গল্প করে আবার স্বস্থানে প্রস্থান করবেন, এ তো বেশ মজার ফিলসফি। বেড়ে আবদেরে জীবন।

দিবাকর এসে বলে—চল।

শ্রীলেখা কটেজের কোনও ঘরে আলো নেই। বারান্দার উপর শক্ত হয়ে দাঁড়ায় নরেন, মাধব, বিমল আর পরেশ। দরজার কড়া নাড়ে দিবাকর। দরজা খুলে বের হয়ে আসে কটেজের মালী—সাহেব নেই। আজ বিকেলের ট্রেনে কলকাতা চলে গিয়েছেন।

১৯

বিকেল হলে কাঁটালতার লাল ফুলের উপর মৌমাছি গড়ায় আর আত্রেয়ী শুধু গেটের সামনের রাস্তাটুকুর উপর একাই আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়ায়। কিন্তু মনটা একা নয়, সে মন একটা অপেক্ষার হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে; আজ হয়ত নিখিলবাবু আর একটু পরেই এসে পড়বেন।

রামুয়া একদিন হঠাৎ বলে দিল বলেই বুঝতে পারল আত্রেয়ী, নিখিলবাবু এখন সরিয়াডিতে নেই। কটেজের ছোটবাবু তো দশ রোজ হল কলকত্তা চলিয়ে গিয়েছে।

বিকেলের আলো ফুরিয়ে যাবার আগেই, বাড়ির সামনের রাস্তাটুকুর উপর আত্রেয়ীর এই একা ঘুরে বেড়াবার সামান্য চঞ্চলতাও একেবারে মৃদু হয়ে যায়। ফিরে গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে, উলের গোছা আর কাঁটা হাতে নিয়ে জানালার কাছে বসে পড়ে।

কাকিমা যখন ঘরের ভিতরে টেবিলের ল্যাম্পটাকে জ্বেলে দিয়ে চলে গেলেন, তখন বাইরের সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ কালো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারও অনেক পরে, রাত দশটার নীরবতার বাতাসে যখন স্টেশনের লোকো শেডের ভিতর থেকে হাতুড়ি পেটানোর শব্দটাকে বেশ স্পষ্ট করে শোনা যায়, তখন হঠাৎ চমকে ওঠে আত্রেয়ী। উলের গোছা আর কাঁটা তাকের উপর রেখে দিয়েই টেবিলের বইটাকে তুলে ধরে, নাড়া দেয়, খুলে দেখে। টেবিলের সবুজ কাপড়ের ঢাকাটার একটা কোণ তুলে ধরে আর দেখতে থাকে। বিছানার কাছে এগিয়ে যেয়ে বালিশের নীচে আর তোষকের তলায় হাত চালিয়ে খুঁজতে থাকে। আয়নার পিছনে দেয়ালের গায়ে যে খোপের ভিতরে আত্রেয়ী ওর চুল বাঁধবার পুরনো ফিতেগুলিকে একটা কুণ্ডলি করে রেখে দেয়, সেই খোপের ভিতরে চিঠিটাকে পাওয়া গেল।

দু'মাস আগে হেমন্তের এই চিঠিটা এসেছিল। এ চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। কিন্তু হেমন্তের আর একটিও চিঠি কি এই দু'মাসের মধ্যে আসেনি?

ব্যস্ত হয়ে আবার খুঁজতে থাকে আত্রেয়ী। আলমারির মাথাটার উপরে, সেলাই কলের খোপটার ভিতরে; কোথাও কোনও চিঠি নেই। কুলুঙ্গিতে মস্ত একটা শঙ্খ আছে, কাকিমা তাঁর হরিনাম লেখা কাগজের টুকরো এই শঙ্খের ভিতরে জমা করে রাখেন। না, এই শঙ্খের ভিতরেও হেমন্তের কোন চিঠিকে ভুল করে কেউ রেখে দেয়নি।

দু'মাস আগের এই চিঠিটার অনেক কথার মধ্যে হেমন্তের একটা নতুন কথাও আছে—ক'দিন ধরে শরীর ভাল যাচ্ছে না। ওষুধ খেয়েছি।

রাগ হয় কাকিমার উপর। কাকিমা একবার মনে করিয়েও দিতে পারেনি যে, চিঠিটার জবাব দিতে হবে। জবাব দেওয়া হল কিনা, সেটুকুও খোঁজ নিয়ে জানতে চেষ্টা করেনি কাকিমা। অথচ দিনের মধ্যে অন্তত তিন বার আত্রেয়ীকে জিজ্ঞেস করেছে কাকিমা, ঘুম ভাল হয়েছে কিনা?

কাকিমা ঘরে ঢুকতেই আত্রেয়ীর এই রাগের মনটাই যেন ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। —বেশ হল, তোমার ইচ্ছেই সত্য হল।

—কী হল?

—দু'মাস ধরে বেশ ভাল করে ঘুমিয়েছি, কিন্তু চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি।

—আমি কেমন করে জানব যে, চিঠির জবাব দিসনি?

—তুমি কেমন করে জানতে পার যে আমার ঘুম হয়নি? ছি।

—কাকে ছি করছিস? বুঝে দেখ।

—আমাকে করছি। শুনে খুশি হলে তো?

কোনও কথা না বলে চলে গেলেন কাকিমা। আত্রেয়ীর মনটা এবার যেন হেমন্তেরই উপর রাগ করে ছটফট করতে থাকে। —আমি না হয় ভুলে গেছি, কিন্তু তুমিই বা এত হিসেব করে চিঠি লিখবে কেন? আগে তো চিঠির জবাব না পেয়েও তিনটি চিঠি লিখে ফেলতে; এখন

এমন কী কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলে যে, দু'মাসের মধ্যে আর একটাও চিঠি লিখতে ভুলে গেলে?

চিঠি লেখে আত্রেয়ী। —জানি, আমার চিঠির এত দেরি দেখে তুমি বেশ কথা শুনিয়ে জবাব দেবে। তাই দিও; আমি কিছু মনে করব না। কিন্তু অসুখ কেন হয়েছিল? এখন কেমন আছ?

সরিয়াডির আকাশে কোনও মেঘ নেই, যদিও আষাঢ় প্রায় ফুরিয়ে এল। শালবনের হাওয়া রোজই সকালবেলার আলোর সঙ্গে জেগে উঠে ফুরফুর করে, আর দূরের পাহাড়তলির গির্জার ঘন্টার শব্দ বেশ স্পষ্ট করে শোনা যায়।

দেখতে পেয়েছে দিবাকর, কিণ্ডারগার্টেনের কলরবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দিয়ে আত্রেয়ী কল্‌কল্‌ করে হাসছে।

একটা মাস পার হয়ে গিয়েছে, শ্রীলেখা কটেজের ঘরের জানালার গায়ে রাতজাগা আলোর কোনও চিহ্ন দেখা যায় না, বারান্দার বেতের টেবিলে মোটা মোটা বইয়ের কোনও স্তূপও নেই। ধানোয়ার রোডে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেয়েছে আর হেসে ফেলেছে নরেন, কালভার্টের কাছে সড়কের ধুলোর চিতি সাপটা গরুর গাড়ির চাকায় থেঁতলে গিয়ে মরে পড়ে আছে।

প্রদোষ সরকার হঠাৎ বেশ একটু চমকে উঠে জিজ্ঞেস করেন—কই সুহাস? হেমন্তের চিঠি তো এল না।

কাকিমা—না।

প্রদোষবাবু—তিন মাসের মধ্যেও একটা চিঠি নেই, এর মানে কী?

—কী করে বলি? কিছু বুঝতে পারছি না।

—শেষ চিঠিতে কী লিখেছিল হেমন্ত?

—শরীর ভাল নয়, ওষুধ খাচ্ছে।

চমকে ওঠেন প্রদোষ সরকার। —তারপর দু'লাইন লিখে জানাবে তো হেমন্ত, যে অসুখ সেরে গিয়েছে?

—জানানো উচিত ছিল।

—হিসেব করে দেখেছ, হেমন্তর মেয়াদের আর ক'মাস বাকি আছে?

—আর তো মাত্র ছ-মাস।

গেটের তিনকাঠের বেড়াটার দিকে দুই চোখ অপলক করে তাকিয়ে থাকেন প্রদোষ সরকার।

হাবুলবাবুর বাড়িতে দাবার আসরের কাছে কাচের চিমনি দিয়ে ঢাকা কেরোসিনের বাতির শিখাটা বড় উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে। হাবুলবাবু দাবার চাল চালতে গিয়ে হেসে ওঠেন—আর ছ'মাস।

গোষ্ঠবাবুও হাসেন—কার? সামন্তদার স্ত্রীর?

হাবুলবাবু—আরে না, দিবাকর বলছিল, প্রদোষদার জামাইয়ের ছাড়া পেতে আর মাত্র ছ'মাস বাকি। সামন্তদার স্ত্রীর ছাড়া পেতে আর মাত্র তিন মাস।

গোষ্ঠবাবু—যাক, এ ছ'মাসের মধ্যে শ্রীলেখা কটেজের উপদ্রবটা আবার দেখা না দেয়, তবেই ভাল।

সেদিন, সরিয়াডির দুপুরবেলার স্তব্ধতা হঠাৎ যেন দুটো রাগী কুকুরের চিৎকার হয়ে প্রদোষ সরকারের ঘুম ভেঙে দিল। সামনের সড়কের গরম ধুলোর উপর দিয়ে কামড়া-কামড়ি করে ছুটোছুটি করছে কে জানে কোথাকার আর কোনও পাড়ার দুটো কুকুর।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন প্রদোষবাবু, তার পর বাইরের বারান্দায় এসে চেয়ারের উপর বসতে গিয়েই একটা ক্র্যাচ হাত ফসকে মেজেতে পড়ে গেল। চেয়ারের কাঁধটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

একটা চিঠি পড়ে আছে চেয়ারের উপরে। কে জানে কখন এসে চিঠিটাকে এখানে রেখে দিয়ে চলে গিয়েছে ডাকপিয়ন হরিরাম।

চিঠি পড়লেন প্রদোষবাবু। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের উপর ধপ্ করে বসে পড়ে ডাক দিলেন—এদিকে একবার এসো, সুহাস। যেন প্রদোষ সরকারের আস্ত পা'টা হঠাৎ মট্ করে ভেঙে গিয়েছে, তাই একটা অসহায়তা চেঁচিয়ে উঠেছে।

জেলের চিঠি। তিনশো তের নম্বরের কয়েদি হেমন্ত চৌধুরীর স্ত্রী আত্রেয়ী চৌধুরীকে জ্ঞাত করা হচ্ছে যে, তার স্বামী সাংঘাতিক অসুখে পীড়িত। যদি দেখা করবার ইচ্ছে থাকে, তবে অবিলম্বে দেখা করে যাওয়া বাঞ্ছনীয়।

চিঠির ভাষা শুনে কাকিমা কাঁপতে থাকেন। প্রদোষ সরকারের কপালটা ঘামে ভরে যায়।

আত্রেয়ীর মা আর মণিদিদা যখন খবরটা শুনতে পেলেন, তখন বিকেল হয়ে এসেছে। পুজোর ঘরের কপাটে মাথা ঠেকিয়ে পড়ে রইলেন আত্রেয়ীর মা; আর মণিদিদা তাঁর জপের মালা কপালে ঠেকিয়ে দিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে বসে রইলেন।

আত্রেয়ী এখনও ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক, এ খবর শুনিয়ে দেবার জন্য আত্রেয়ীকে এখন ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলবে, এমন হাত কোনও জহ্লাদেরও থাকতে পারে না।

বাইরের কাকের তাড়া খেয়ে কাঠবিড়ালিটা জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে ঘুমন্ত আত্রেয়ীর গায়ের উপর পরে গেল বলেই আত্রেয়ীর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ-মুখ ধুয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে আত্রেয়ী। তারপরেই চমকে ওঠে। —তোমার হাতে ওটা কী, বাবা?

—জেলরের চিঠি।

কপালটা পিছল, কিন্তু চোখ দুটো যেন শুকনো ছাই-ছাই; প্রদোষ সরকার এই চিঠির ভাষাটা আত্রেয়ীকে শুনিয়ে দিতেও আর দেরি করেন না।

নিথর হয়ে আর একেবারে নীরব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেই সরে যায় আত্রেয়ী। ঘরের ভিতরে গিয়ে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে।

চিনুর পিসিমা এলেন সন্ধ্যাবেলা। জেলরের চিঠির ভাষা তিনিও শুনলেন। দেখেও গেলেন, দু'হাতে মুখ ঢেকে বিছানার উপর শুয়ে পড়ে আছে আত্রেয়ী।

প্রদোষ সরকারের বাড়ির বারান্দার সিঁড়ি ধরে নামতে গিয়ে চিনুর পিসিমা হঠাৎ মাথা ঘুরে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন; কিন্তু সামলে নিলেন আর আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ি চলে গেলেন।

শুনতে পেল শান্তি। শান্তির হাত থেকে সন্ধ্যার প্রথম জ্বালানো বাতিটার কাচের ডুম থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে মেঝের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেল আর চুরমার হয়ে গেল। মাথায় হাত দিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শান্তি।

শুনতে পেলেন জয়ন্তবাবুর স্ত্রী। ডালের কাঁটা হাতে ধরে নিথর হয়ে শুধু উনুনের আগুনটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ডালপোড়া গন্ধে সারা বাড়ির বাতাস ভরে গেল। শুনতে পেয়েছেন সন্তুর মা। শ্বাস ছাড়তে গিয়ে বুক কেঁপেছে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ভাঙা গলায় ডাক দিয়েছেন।

—সন্ধ্যাবেলা আর বাঁশি বাজাসনি সন্তু। কী বিচ্ছিরি তোর বাঁশির শব্দ।

সন্তু বলে—বাঁশিতে জল ঢুকেছে, মা।

আজই কানপুর থেকে সন্তুর বাবার চিঠি এসেছে। কী আশ্চর্য, যে মানুষ চিঠিতে আত্রেয়ীর নামে কোনও কথা কোনওদিনও লেখেনি, সে মানুষ তার এই চিঠিতে একটা অদ্ভুত কথা লিখে বসে আছে; আশা করি আত্রেয়ীর স্বামী এতদিনে মুক্তি পেয়েছে।

প্রদোষ সরকারের বাড়ির বারান্দাতে বাতি নেই। সড়কের বাতির একটা ঘোলাটে আভা বারান্দার অন্ধকারের গায়ের উপর পড়ে আর মর-মর হয়ে কাঁপছে। কিন্তু প্রদোষ সরকার যেন এরই মধ্যে তাঁর অচল জীবনের সমাধি পেয়ে গিয়েছেন। হাত কাঁপে না, চোখ ছটফট করে না, নিঃশ্বাসের সঙ্গে কোনও ব্যথা উসখুস করে না।

গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবু এলেন; প্রদোষবাবুর উদাস চোখ দুটোর একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

গোষ্ঠবাবু—বেশি মন খারাপ করবেন না, প্রদোষদা।

হাবুলবাবু—এমন কিছু চিন্তা করবার ব্যাপার নয়। মানুষের জীবনে অসুখ বিসুখ তো থাকবেই।

চলে গেলেন গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবু। দিবাকর এসে ডাক দেয়। —কাকিমা একবার বাইরে আসবেন?

কাকিমা বাইরে আসেন—বলো।

দিবাকর—কী ঠিক করলেন?

কাকিমা—কিছুই না।

দিবাকর—আত্রেয়ী কী বলে? দেখতে যেতে চায়?

কাকিমা—জানি না।

দিবাকর—কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি জেনে নেওয়া ভাল। যেতে হলে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াই উচিত।

প্রদোষবাবু বলেন—আর একটা চিঠি এসেছে, বিকেলের ডাকে।

কাকিমা—কার চিঠি?

প্রদোষবাবু—বীরনগর থেকে লিখেছে আত্রেয়ীর মামা কান্তি। হেমন্তর অবস্থা সুবিধের নয়। আত্রেয়ীকে এখন আর হেমন্তের সঙ্গে দেখা করিয়ে লাভ নেই। এখন দেখার কোনও মানে হয় না। কপালে যা আছে, তাই হবে।

কেউ বুঝতে পারেনি, কখন ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে সবার পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী বলে—মামার চিঠিটা দাও।

প্রদোষবাবু বললেন—নাও।

চিঠি হাতে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যায় আত্রেয়ী। দিবাকরও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বারান্দা থেকে নেমে পড়ে আর চলে যায়। তাকিয়ে দেখবার মত কিংবা শোনবার মত এখানে আর কিছুই নেই।

কত রাত হল কে জানে? আত্রেয়ীকে কয়েকবার খেতে সেধেছেন কাকিমা, কিন্তু কোনও কথা বলেনি, খায়ওনি আত্রেয়ী। তবে কে আর খাবে?

ঘুমোবেই বা কে? কার চোখেই বা ঘুম আসবে? কাকিমা সারা রাত জেগে বসে শুধু শুনতে থাকেন; ঘরেতে টেবিলের আলোর কাছে মাথাটাকে পেতে দিয়ে একটা টুলের উপর বসে আছে আত্রেয়ী। থেকে থেকে ছটফট করছে। মাঝে মাঝে মাথা দুলিয়ে কপালটাকে টেবিলের উপর আস্তে আস্তে ঘসছে।

শেষ রাতে, যখন টেবিলের ল্যাম্পের কাচ ধোঁয়ার কালিতে কালো হয়ে গিয়েছে, তখন পাশের ঘর থেকে উঠে আসেন কাকিমা।

টেবিলের উপরে মাথা রেখে, ঘুমিয়ে পড়েছে আত্রেয়ী। কিন্তু একটা চিঠিও লিখে রেখেছে। "এ রকম দেখার কথা তো ছিল না। কথা ছিল তুমি এসে দেখা দেবে। তোমার পায়ে পড়ি, কথা রাখো তুমি। শিগগির সেরে ওঠো আর চলে এসো। এই চিঠি পেয়েই জবাব দেবে। তোমাকে দেখতে যাব কি যাব না, তুমি নিজে লিখে জানাবে।"

কাকিমা ডাকেন—আত্রেয়ী, এবার শুয়ে পড় তো মা; নইলে তোর বাবা তো ঘুমোতে পারছেন না।

উঠে গিয়ে বিছানার উপর এলিয়ে পড়ে আত্রেয়ী।

২০

শালবনের মাথা ছুঁয়ে সরিয়াডির ভোরের আলো যখন সবে মাত্র জেগেছে, তখন জেগে ওঠে আত্রেয়ী। ঘরে বসে থাকে না, বাইরের বারান্দাতে এসেও দাঁড়িয়ে থাকে না, এগিয়ে যেয়ে গেটের তিনকাঠের বেড়াটার কাছে একবার দাঁড়ায়; তার পরেই কাঁটালতার ঘেরানের আশেপাশে শিশিরে ভেজা ঘাসের উপর ঘুরে বেড়ায়।

সরিয়াডির প্রাণটাও বোধ হয় ভাল করে ঘুমোতে না পেরে রাত জেগেছে আর ছটফট করেছে, আর, ভোরের আলো দেখা দিতেই সবার আগে আত্রেয়ীকেই দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তা না হলে, আজ এত ভোরে প্রদোষ সরকারের বাড়ির সামনের এই সরু সড়ক দিয়ে এত লোকের আনাগোনা শুরু হয়ে যাবে কেন?

চলে গেল নরেনের সাইকেল। সামন্তবাবু আর হাজরাবাবু একসঙ্গে হেঁটে হেঁটে চলে গেলেন। জয়ন্তবাবু গেটের কাছে একবার থমকে দাঁড়ালেন; আত্রেয়ীর সঙ্গে একটা কথাও বলে নিলেন। —আজ বেশ ঠান্ডা আছে আত্রেয়ী, খালি পায়ে ভেজা ঘাসের ওপর ওভাবে বেড়িও না।

শ্রীপদবাবুও যেতে যেতে একবার থেমে নিলেন—প্রদোষদা এখনও ওঠেননি বোধ হয়?

আত্রেয়ী বলে—না।

শ্রীপদবাবু—বাবাকে বলো, আমি এসেছিলাম।

বিমল আর মাধব এসেই একটা হাঁক ছাড়ে। —আত্রেয়ীদি কী করছেন?

আত্রেয়ী—কিছুই না। তোমরা এত সকালে কী করতে বের হয়েছ?

মাধব—কিছ্ছু না।

বিমল—আমরা দু'জন রাত জেগে শুধু তাস খেলেছি; ঘুমোতে পারিনি।

আত্রেয়ী হাসে—তাসের পরীক্ষা আছে বোধ হয়?

মাধব—পরীক্ষা কথাটা মুখে আনবেন না আত্রেয়ীদি; শুনলে বুক ঢিপ ঢিপ করে।

এত সকালে রামুয়া আবার বাড়ির কোনও কাজের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছে?

রামুয়ার হাতের জিনিসটা চোখে পড়তেই এগিয়ে আসে আত্রেয়ী। —চিঠিটা একবার দেখি।

হেমন্তের কাছে লেখা চিঠি ডাকে ফেলবার জন্য ব্যস্তভাবে চলে যাচ্ছে রামুয়া। নিশ্চয় আত্রেয়ীর লেখা দুটো চিঠি এই খামের ভিতরে আছে। খামের উপর কাকিমা নিজেই ঠিকানা লিখে দিয়েছেন।

—আঃ, এ কী করেছ রামুয়া? হাতটা ভাল করে মুছে নাও।

আঁচল বুলিয়ে খামটাকে একটু মুখে দেয় আত্রেয়ী। স্যাঁতসেঁতে খামের উপরে লেখা নামটা সত্যিই যে বেশ চুপসে গিয়েছে।

—নাও, মাঝ রাস্তায় গল্প করতে বসে আবার দেরি করে ফেলো না রামুয়া। সকাল ন'টার ডাকেই যেন চিঠি চলে যায়।

আত্রেয়ী নিজেই গেটের তিনকাঠের বেড়াটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়; চলে যায় রামুয়া।

সরিয়াডির প্রদোষ সরকারের মেয়ে আত্রেয়ী কী তবে বেশ শান্তটি হয়ে ওর অপেক্ষার শেষকৃত্য সেরে দিচ্ছে? এই চিঠিকেই কী শেষ চিঠি বলে মনে করেছে আত্রেয়ী? কিংবা পাঁচ বছর আগের পাওয়া একটি স্পর্শকে যত্ন করে প্রাপকের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিল?

চিনুর পিসিমা তো আগেই দেখে গিয়েছেন, আত্রেয়ী কত শান্তটি হয়ে আঘাত সহ্য করতে পারে। শুধু দু'হাতে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ে ছিল আত্রেয়ী, কেঁদে ভাসায়নি, মেঝেতে মাথা কুটে চিৎকারও করেনি। সন্তুর মা'ও এই সকালে এসে দেখে গেলেন, জানালার কাছে চুপ করে বসে উল বুনছে আত্রেয়ী।

কাকিমার কানের কাছে একটা কথা বেশ খুশির স্বরেই বলে চলে গেলেন সন্তুর মা। —এই ভাল। কান্নাকাটি করে আর লাভ কী?

হাবুলবাবু বললেন—এটা একরকম ভালই বলতে হবে, গোষ্ঠদা। আত্রেয়ীটা একটুও মুসড়ে পড়েনি।

গোষ্ঠবাবু—হ্যাঁ ভালই; এখন শেষ খবরটা ভাল হয়, তবেই সব চেয়ে ভাল হয়।

হাবুলবাবু—আমার কিন্তু ভরসা করতে সাহস হচ্ছে না, গোষ্ঠদা। আত্রেয়ীর স্বামী ছাড়া পাওয়ার আগেই চরম ছাড়া পেয়ে যাবে না তো?

গোষ্ঠদা—থাক, এ কথা আর এখুনি তুলছেন কেন? দেখা যাক কী হয়? আত্রেয়ী যে শান্ত হয়ে গিয়েছে, এটাই একটা ভাল লক্ষণ।

আত্রেয়ী শান্ত হয়ে গিয়েছে, দেখতে পেয়ে সরিয়াডির প্রাণটাও শান্ত হয়ে গিয়েছে। সকলেই বলছেন, এই ভাল।

দিবাকর শুধু একটু গম্ভীর হয়ে বলে—শুনেছ শান্তি।

—কী?

—বিমল বলে গেল, আত্রেয়ী হেসে হেসে কথা বলেছে।

চমকে ওঠে শান্তি। কিন্তু তার পরেই আনমনার মত তাকিয়ে কথা বলে—হাসতে পারলে তো ভালই।

দিবাকর—আমিও তো বলছি, ভালই। কিন্তু...।

শান্তি—কী?

দিবাকর—আত্রেয়ী আর একটু কান্নাকাটি করলেই ভাল হত না কী?

শান্তি—ছি, ওকথা বলতে নেই।

দিবাকর—না না, আমি বলতে চাই, একটু ভাল দেখাত, এই মাত্র। মনের জোর থাকলে হাসবে না কেন?

মনের জোর বইকি, তা না হলে অন্যদিনের মত আজও সকালে ঠিক সময়মত আর নিয়মমত কিণ্ডারগার্টেন করে আসতে পারত না আত্রেয়ী। সামন্তবাবুর মা পথে যেতে আত্রেয়ীকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়েছেন। ঠিক সেই আত্রেয়ীই তো চলে যাচ্ছে। সেই ঢিলে খোঁপাটি, গলায় সেই সোনার সুতলি চেনের সঙ্গে জোড়া মুক্তোর লকেটটি। সিঁথিতে সেই গুঁড়ো সিঁদুরের সরু দাগ; ঘিয়ে রঙের সিল্কের শাড়ির সেই লাল রঙা আঁচল। মেয়েটার মুখ দেখে কারও বুঝতে সাধ্যি হবে না যে, ওর ভাগ্যটাকে কাঁদিয়ে দেবার মত একটা খবর কাল বিকালেই এসেছে।

সামন্তবাবুর মা'র এই খুশির চোখের চাহনির সঙ্গে একটা করুণ বিস্ময়ের ছায়াও ছমছম করে। যেন ক্ষণমায়ার চোখ তুলে আত্রেয়ীর এই ঘিয়ে রঙের শাড়ির লাল-রঙা আঁচলটিকে তিনি শেষবারের মত দেখে নিচ্ছেন। কে জানে আর কতদিন? মেয়েটাকে এই মূর্তিতে আর কি কখনও দেখতে পাওয়া যাবে?

পটলবাবুর বাগানের একটা গাছের গোড়াতে এই সকালবেলাতেই কুড়ুলের কোপ পড়ছে আর গাছটা থরথর করে কাঁপছে। পটলবাবু শক্ত করে গামছা পরে নিয়ে আর নিজেই কুড়ুল ধরে গাছটাকে কাটতে শুরু করেছেন। পটলবাবুর নিঃশ্বাসের সঙ্গে যেন একটা ব্যস্ত আক্রোশ হুম হুম শব্দ করে গাছটাকে কাটছে।

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে মেহেদির বেড়ার মাথার উপর দিয়ে উঁকি দেয় বলাই। —এ কি? গাছটাকে কেটে ফেলেছেন কেন পটলদা?

পটলবাবু—কেটে ফেলাই ভাল নয় কি? এটার কি আর কোনও সার বস্তু আছে?

বেলগাছটা শুকিয়ে জীর্ণ হয়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু নেড়ে গাছের মাথায় এখনও কিছু সবুজ পাতা নড়বড় করছে। বলাই বলে—আরও ক'টা দিন অপেক্ষা করলেই পারতেন। মনে হচ্ছে, অন্ততঃ আর দু-একটা সিজ্‌ন কিছু ফল ধরত।

পটলবাবু—তার কি কোনও ঠিক আছে রে ভাই? মগডালেও পিঁপড়ে ধরে গিয়েছে, এটার আর ক'দিন?

গাছের গোড়ায় আবার পটলবাবুর হাতের কুড়ুল ঝুপঝাপ শব্দ করে আছড়ে পড়তে থাকে।

মহাদেও পাঁড়ের পায়রার ঝাঁকও একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে আছে। কালীবাড়ি রোডের পাশের যে মাঠের উপর পায়রার ঝাঁক আজ সাত-আট বছর ধরে রোজই তিনবেলা আসে বসে আর হুটোপুটি করে, সে মাঠের উপরে একটা ডানা-ভাঙা চিলকে এই সকালে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখেই ওরা একসঙ্গে পাখা ঝাপ্‌টে উড়ে পালিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আর কি এল? পর পর দশটা দিন পার হয়ে গেল, তবুও না। সরিয়াডির আত্মাটা যেন আর অপেক্ষা করে কিছু বুঝতে চায় না, কিংবা একটু বুঝে দেখবার জন্যে অপেক্ষা করতে চায় না।

আত্রেয়ীও দেখতে পায়, গেটের সামনের রাস্তার উপর দিয়ে ডাকপিয়ন হরিরাম চলে গেল। এ বাড়ির কাঁটালতার ফুলের দিকে, বারান্দার দিকে, কিংবা গেটের তিনকাঠের বেড়াটার দিকে একবার চোখ তুলে তাকায়ও না হরিরাম। আত্রেয়ীর জীবনের আশার বার্তাও যেন মহাদেও পাঁড়ের পায়রার মত হঠাৎ পাখা ঝাপ্‌টে উধাও হয়ে গিয়েছে।

কাকিমার চোখও দিনরাত সব সময়েই একটা দুঃস্বপ্নের ছবির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পনেরো দিন পার হয়ে গেল, তবু আলিপুরের জেল থেকে কোনও চিঠি এল না কেন? জেলরই বা আর কোনও খবর দেয় না কেন?

পুরো একটি মাস পার হয়ে যাবার পর কাকিমার ভাবনার সব ক্লান্তি দুঃসহ যন্ত্রণার কামড় খেয়ে একদিন ছটফট করতে থাকে। প্রদোষবাবুর কাছে এসে নিঃশ্বাসের শব্দটাকে জোর করে চেপে দিয়ে ফিসফিস করেন কাকিমা। —কোনও খবরই তো এল না।

প্রদোষবাবু বলেন—এখনও কি তোমাদের মনে খবর জানবার ইচ্ছে আছে? খবরটাকে বুঝে নিতে কি কোনও অসুবিধে আছে?

চোখ মুছে নিয়ে আর ভয়ে ভয়ে আত্রেয়ীর ঘরের ভিতরে উঁকি দিতে গিয়েই আয়নাটাকে দেখতে পেলেন কাকিমা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে আত্রেয়ী, আর, আয়নায় আত্রেয়ীর চোখ দুটো কাকিমার উঁকি-দেওয়া মুখটার দিকে তাকিয়ে হাসছে। —কী খবর কাকিমা?

সরে গেলেন কাকিমা। হাসি তো নয়, মেয়েটার চোখে যেন একটা ঠাট্টার আগুন জ্বলছে।

হাবুলবাবু একদিন বলেই ফেললেন—এখনও যখন কোনও খবর এল না, তখন কী খবর যে একদিন আসবে, সেটা কি বুঝতে পারছেন না গোষ্ঠদা?

গোষ্ঠবাবু—খুব বুঝেছি।

হাবুলবাবু—কিন্তু মেয়েটার জীবনটা এ কী রকমের একটা অভিশাপ হয়ে গেল; দুর্ভাগ্যের যেন কোনও রকম নেই।

গোষ্ঠবাবু—আত্রেয়ীও বোধ হয় বুঝেই ফেলেছে যে, আর কোনও আশার খবর আশা করে লাভ নেই।

হাবুলবাবু—হ্যাঁ, দিবাকর বলছিল, আত্রেয়ী আর চিঠি লেখালেখি করে না।

গোষ্ঠবাবুর চোখ দুটো কাঁপতে থাকে।

—কিন্তু খোঁড়া মানুষ প্রদোষদার মত আত্রেয়ীর ভাগ্যটাও কী চিরকাল অচল হয়ে পড়ে

থাকবে? মাত্র তেইশ বছর বয়স মেয়েটার, ভাবতে গেলে আমার কেমন যেন লাগে। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

হাবুলবাবু হঠাৎ চমকে উঠে বলেন—একটু আস্তে কথা বলুন তো গোষ্ঠদা। একটু শুনতে দিন, ঘরের ভিতরে ওঁরা যেন কী একটা কথা বলাবলি করছেন।

ঘরের ভিতরে কথা বলছেন গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী আর সন্তুর মা। গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী বলছেন—হ্যাঁ সন্তুর মা; সত্যিই একদিন বিশ্রী একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম, আমার হাতে শাঁখা নেই। তখন তো ছাই মনেই হয়নি যে, দুঃস্বপ্নটা বেচারী আত্রেয়ী মেয়েটারই অদৃষ্টের কথা বলছে।

সন্তুর মা—আজকাল তো বিধবারও বিয়ে হয়।

চমকে ওঠেন গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী—অ্যাঁ। তা তো হয়। ...এখনি উঠছেন কেন?

সন্তুর মা—যাই এখন; অনেক কাজ ফেলে এসেছি।

২১

কথাটা হয়ত সন্তুর মা'র মুখ ফসকে বের হয়ে পড়েছে—আজকাল বিধবারও বিয়ে হয়। কিন্তু হাবুলবাবুর কান যেন একটা দৈববাণীর আশ্বাসের ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন, তাই ওভাবে চমকে উঠেছেন।

সরিয়ডির শালবনের হাওয়াটাও যেন এই কথাটাকে লুফে নিয়ে উড়ে বেড়াতে থাকে।

সামন্তবাবু আর হাজরাবাবু দুজনেই নয়াপাড়ার সড়কের মোড়ে তাঁদের ইঁটের গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন আর গল্প করেন। সন্তুর আর চিনুর সঙ্গে গল্প করে করে কিন্ডারগার্টেন থেকে ফিরছে আত্রেয়ী।

—বাবা কেমন আছেন আত্রেয়ী? সামন্তবাবু জিজ্ঞেস করেন।

বেশ হাসিমুখেই উত্তর দেয় আত্রেয়ী—ভাল আছেন।

আত্রেয়ী চলে যেতেই সামন্তবাবু বলেন—আজকাল বিধবারও বিয়ে হয়?

হাজরাবাবু—তা হয়।

দিবাকরও বাড়ি ফিরে এসে ঝপাং করে সাইকেলটা বারান্দার রেলিংয়ের গায়ে ফেলে দিয়ে কথা বলে—শুনেছ, শান্তি?

—কী?

—সবাই বলছে, আজকাল বিধবারও বিয়ে হয়।

চমকে ওঠে শান্তি—তা হয়। কিন্তু...

দিবাকর—কী?

শান্তি—না, কিছু না।

শ্রীলেখা কটেজের সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে গিয়ে গল্প করে নরেন আর বিমল। নরেন বলে—এমন কী পটলকাকাও বলছেন, আজকাল বিধবার বিয়ে হয়।

শ্রীলেখা কটেজের বন্ধ জানালার দিকে তাকিয়ে বিমল কী যেন ভাবতে থাকে। তারপর নিজের মনেই গুনগুন করে কথা বলে—এ ভদ্রলোক আর আসবে বলে মনে হয় না।

অদ্ভুত স্বরের অদ্ভুত একটা কথা। বিমলের মুখ থেকে যেন একটা ভাবনার গুঞ্জন ফস্‌কে পড়েছে।

নরেন বলে—একটা কাজ করা যাক বিমল; কটেজের মালীকে জিজ্ঞাসা করি, সাহেব আবার কবে আসছেন?

শ্রীলেখা কটেজের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আর ডাক দিয়ে মালীকে জিজ্ঞেস করে নরেন। মালী বলে—না; কবে আসবে তার কোনও ঠিক নেই।

বিমল—একদিন তো আসবেন?

মালী বলে—কেমন করে বলি? হামি কুছ নেহি জানে।

কে জানে কেমন করে বিমলের মুখ থেকে ফস্‌কে পড়া ভাবনার গুঞ্জনও সরিয়াড়ির বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। একেবারে স্পষ্ট করে বলেই ফেলে— ভদ্রলোক এখন একবার এলেই তো পারেন।

সন্ধ্যার দাবা খেলার আসরে নতুন পেট্রল ল্যাম্পের জ্বলন্ত ম্যান্টেজের তেজ বাড়িয়ে দিয়ে গোষ্ঠবাবুও বলেন—আমার আশা আছে, নিখিল আবার আসবেই।

হাবুলবাবু—না হয় এলই; কিন্তু তার পর?

গোষ্ঠবাবু—তার পর আত্রেয়ীর সঙ্গে তো দেখাশোনা হবেই।

হাবুলবাবু—কিন্তু আত্রেয়ীর জন্যে কি নিখিলের মনে সেরকম কোনও ইচ্ছে-টিচ্ছে আছে?

গোষ্ঠবাবু—আশা করছি আছে।

হাবুলবাবু—থাকলেই ভাল।

চিনুর পিসিমা প্রায় আসছেন আর দেখে যাচ্ছেন, আত্রেয়ী আর একটুও উতলা নয়। বিকেল বেলাতেও দেখেছেন, আত্রেয়ী ঘুমিয়ে আছে, বুকের উপর একটা গল্পের বই পড়ে আছে।

মাঝের ঘরে বসে কাকিমার সঙ্গে কথা বলেন চিনুর পিসিমা। —একটা কথা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করছি সুহাস; কটেজের সেই ছেলেটির খবর কী?

চমকে ওঠেন কাকিমা। সে তো কবেই চলে গিয়েছে।

—তা জানি; কিন্তু আবার কি আসবে?

—জানি না। চিনুর পিসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে কাকিমারও চোখ দুটো যেন একটা নতুন খবরের বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে কাঁপতে থাকে।

চলে যাবার সময় বাইরের বারান্দার সিঁড়িতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন চিনুর পিসিমা, আর, কাকিমাকে চমকে দিয়ে আবার একটা কথা বলেন—আজকাল তো বিধবার বিয়ে হয়, সুহাস।

দেখতে পেলেন চিনুর পিসিমা, কে জানে কখন জেগে উঠে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আত্রেয়ী। মেয়েটা তো কবে কথাটা শুনেই ফেলেছে। চিনুর পিসিমা ব্যস্তভাবে বলে—আমি চললুম, সুহাস।

জানালারই কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আত্রেয়ী। কিন্তু আয়েত্রীর চোখের দৃষ্টিটাও অদ্ভুত। সরিয়াড়ির বিকেলের আকাশের আলোটা আত্রেয়ীর চোখের তারা দুটো কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। কাকিমা যে কাছে এসে বারবার ঘুর-ঘুর করে চলে গেলেন, কিছুই যেন দেখতে পেল না আত্রেয়ী। দূরের ট্রেনের একটা শব্দ শোনা যায়, কিন্তু শব্দটা যেন আত্রেয়ীর এই জাগা মনের চেতনার উপর দিয়ে একটা কথা বলে বলে চলে যাচ্ছে—আজকাল বিধবারও বিয়ে হয়। বুকের ভিতরের সব নিঃশ্বাসও যে অলস অবশ হয়ে একটা মূর্ছার কোলে ঢলে পড়তে চাইছে।

বোম্বাই মেল রোজই অনেক লেট হয়ে শেষ রাতের দিকে আসে আর চলে যায়। ঘুমন্ত সরিয়াড়ির চোখ রোজ ভোরে জেগে উঠেই হাওয়া বদলের কোনও না কোনও নতুন মানুষের মুখ দেখতে পায়। গোষ্ঠবাবু একদিন অপেক্ষা করেন। —সবই নতুন, কোনও চেনা-মুখ আর আসছেই না দেখছি।

সেদিনই সন্ধ্যা হবার আগে দেখতে পেল নরেন, শ্রীলেখা কটেজের জানালা খোলা; খোলা জানালা দিয়ে বাইরের জবাকুঞ্জের গায়ে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। সরিয়াড়ির সন্ধ্যার সব অন্ধকারও যেন হাজার জোনাকি হয়ে আর আলো চমকে দিয়ে তখনি দেখে নিল, নিখিল সেন এসেছে। শুনতে পেল দিবাকর, শুনলেন গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবু। শুনলেন সন্তুর মা। সরিয়াড়ির একটা কামনার অপেক্ষা সাঙ্গ হল। এখন আত্রেয়ী শুধু শুনতে পেলে হয়।

: বা শুনতে দেরি হবে কেন? রামুয়াই বলে দেয়, কটেজের ছোটবাবু এসেছেন।

কিন্তু নিখিল যে শুধু রাতজাগা আলোর কাছে বসে বই পড়ে। সকাল দুপুর আর বিকেল, কোনও সময়েও কটেজের বাইরে সরিয়াডির কোনও আলো-ছায়ার দিকে উঁকি দিতেও চেষ্টা করে না। আত্রেয়ীকে ডাকাডাকি করে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য সেই শখের ভদ্রতাও যে আর ব্যস্ত হয়ে ওঠে না। কী ব্যাপার গোষ্ঠদা? হাবুলবাবু বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়েই প্রশ্ন করেন। কিন্তু আত্রেয়ীই বা ভুল করছে কেন? নিখিলের সঙ্গে আত্রেয়ীর দেখা হওয়া আজ যে আত্রেয়ীর জীবনেরই গরজ হয়ে দেখা দিয়েছে। চুপ করে ঘরে বসে থাকলে চলবে কেন আত্রেয়ীর?

শালবনের মাথার উপর ঠিক সন্ধ্যাবেলাতেই ঘন মেঘের টুকরোটা ফেটে গিয়ে ছন্নছাড়া হয়ে যেতেই একটা এক-ফালি চাঁদের আলো সারা সরিয়াডির বুকে ছড়িয়ে পড়ে একটা ঘোলাটে মায়া মাখিয়ে দিল।

কোথায় যেন যাচ্ছে আত্রেয়ী, গেট পার হয়ে রাস্তার উপর এসে দাঁড়িয়েছে। কাকিমা ব্যস্তভাবে ছুটে আসেন—এই ভর সন্ধ্যেয় ঘরের বাইরে কোথায় চললি এখন?

আত্রেয়ী—বেড়াতে?

কাকিমা—কোথায়?

আত্রেয়ী—কটেজে?

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কাকিমা। কে যেন দু'হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে কাকিমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। যাবি না বলবার সাহস নেই। যাওয়া ভাল নয় বলবার শক্তি নেই।

রজনীধামের গেট পার হয়ে নয়াপাড়ার সড়ক ধরে হেঁটে চলেছে আত্রেয়ী। শুধু সন্তুটা ওর মাউথ অরগ্যানের রাজা-মামা গত বাজিয়ে কিছুদূর আত্রেয়ীর সঙ্গে সঙ্গে এসেছে, তারপরেই শ্রীপদবাবুর খরগোসটা দেখতে পেয়ে ছুটে চলে গিয়েছে।

জানালার কাছ থেকে হঠাৎ সরে এসে গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী ফিসফিস করেন। —দেখো দেখো, আত্রেয়ী কোথায় যেন যাচ্ছে।

গোষ্ঠবাবুও গলার স্বর চেপে কথা বলেন—যাক, ছেড়ে দাও, ভালই হবে।

গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী—কিন্তু যাচ্ছে কোথায়?

—এমন কিছু অচেনা কারও কাছে যাচ্ছে না।

—যাক তবে। গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী যেন একটা হাঁপ ছেড়ে কথা বলেন। —ভালয় ভালয় একটা গতি হয়ে যাক।

দেখতে পায়নি শান্তি, কখন বাড়ি ফিরে এসেছে দিবাকর, আর এভাবে একেবারে ক্লান্ত হয়ে বাইরের ঘরে চুপ করে বসে আছে। দিবাকরের সাইকেলও আজ আর বারান্দার রেলিংয়ের গায়ে ঝপাং করে পড়ে কোনও শব্দ করেনি। দিবাকরের সাইকেলের চাকাতে এত ধুলোও কোনওদিন দেখেনি শান্তি।

শান্তি—কখন এলে?

দিবাকর—এখনি। আত্রেয়ীকে দেখলাম।

—কোথায়?

—শ্রীলেখা কটেজের দিকে চলে যাচ্ছে। তাই ও রাস্তায় আর না এগিয়ে অনেক ঘুরে ছোট সড়ক ধরেই পালিয়ে এলাম। ধুলোর ঠেলায় সাইকেল কি আর চলতে চায়?

দিবাকরের এই চেহারা যেন সরিয়াডির সব গর্বের নিদারুণ এক পরাভবের ধুলোমাখা চেহারা। শান্তির চোখেও যে একটা কাঁকরের কুচি খর্‌খর্‌ করে বিঁধছে, তাই ভাল করে তাকাতে পারছে না।

দিবাকর—ব্যাপারটা কী রকম হল, শান্তি?

শান্তি—বড় তাড়াতাড়ি হল।

দিবাকর—দেরি হলেই বা কী লাভ হত?

শান্তি হাসতে চেষ্টা করে। —একটু ভাল দেখাত।

হ্যাঁ, খুবই তাড়াতাড়ি করে হেঁটেছে আত্রেয়ী; কটেজের গেটের কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়ায় আর হাঁপাতে থাকে। কটেজের গেটের পাশে জবার কুঞ্জটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে নিখিল। আত্রেয়ীকে দেখতে পেয়েই ডাক দেয়। —আসুন।

নিখিলের এই ডাক কোনও চমকিত বিস্ময়ের ডাক নয়; যদিও আজ এই সন্ধ্যায় এভাবে শ্রীলেখা কটেজের এই নিভৃতে একা নিখিলের কাছে সরিয়াডির মেয়ে আত্রেয়ীর আবির্ভাব নিশ্চয়ই একটু বিস্মিত হবার মত ঘটনা। নিখিলের অনেক আমন্ত্রণ পেয়েও যে মেয়ে এই কটেজে একা নিখিলের কাছে কোনওদিন আসেনি, সে মেয়েই তো আজ নিজে ইচ্ছে করে আর জ্যোৎস্নামাখা হয়ে নিখিল সেনের চোখের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

নিখিলের চোখের কত কাছে এসে দাঁড়িয়ে আত্রেয়ী, সেটাও নিখিলের পক্ষে একটা নতুন বিস্ময়ের ঘটনা। এভাবে, এমন সুন্দর একটি অকুণ্ঠা হয়ে কোনও দিনও তো নিখিলের চোখের কাছে দাঁড়ায়নি সরিয়াডির মেয়ে এই আত্রেয়ী।

নিখিল বলে—সরিয়াডিতে আসবার কোনও কথা ছিল না। যাচ্ছিলাম আগ্রা; ট্রেনের কামরার জানালা দিয়ে আপনাদের সরিয়াডির শেষ রাতের চেহারাটা চোখে পড়তেই ঠিক করে ফেললাম, নেমে পড়ব।

আত্রেয়ী—কবে এসেছেন?

নিখিল—সাতদিন হবে বোধ হয়?

আত্রেয়ী—কিন্তু একদিন তো গেলেন না?

—কোথায়? আপনাদের বাড়ি?

—হ্যাঁ।

—একদিন যেতাম ঠিকই। কবে আর আপনার খোঁজখবর না নিয়ে চলে গিয়েছি।

—আপনার দেরি দেখে আমি নিজেই এলাম।

নিখিল হাসে। —এসেছেন বই কি। আমি জানতাম, একদিন আসবেনই। বলুন, কেমন আছেন?

আত্রেয়ী—যেমন দেখছেন।

নিখিল—দেখছি তো, আরও সুন্দর হয়েছেন।

চমকে ওঠে না, সরে যায় না, মাথা হেঁট করে না, চোখ ফিরিয়েও নেয় না আত্রেয়ী। নিখিল সেনের এই প্রশস্তির ধ্বনির কাছে যেন একটি সুস্থির মুগ্ধতার ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে আত্রেয়ী।

নিখিল বলে—চলুন, বারান্দায় গিয়ে বসি।

নিখিলের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে, যেন নিখিলের ইচ্ছারই এক শান্ত সহচরী হয়ে বারান্দার উপবে এসে দাঁড়ায় আত্রেয়ী।

নিখিল বলে—বসুন।

বেতের চেয়ারটার উপরে বসে পড়ে আত্রেয়ী।

নিখিল বলে—কাল অনেক রাতে তিরছি নদীর ঝর্নার শব্দটা শুনে পেয়েছিলাম। তখনই আপনার কথা মনে পড়ে গেল। ...আচ্ছা, চলুন তো, বাগানের মাঝখানে রেঙ্গুন লতার পিরামিডের কাছে গিয়ে দাঁড়াই।

তখনি উঠে দাঁড়ায় আত্রেয়ী। নিখিলের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে বাগানের যত মরশুমি ফুলের কেয়ারির কিনারা ধরে এগিয়ে যেতে থাকে। নিখিলের নিঃশ্বাসেব বাতাসও যেন কোথাও স্বস্তি পাচ্ছে না; যেন আত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে নতুন একটা গ্রহলোকের নিভৃতে গিয়ে দাঁড়াতে আর গল্প করতে চাইছে নিখিল।

রেঙ্গুন লতার পিরামিড, ফুলের মঞ্জরি ঝুলে ঝুলে দুলছে। সে মঞ্জরির দিকে তাকিয়ে থাকলেও কি বুঝতে পারছে না আত্রেয়ী, নিখিল সেনের পাশে কত কাছাকাছি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? ঢিলে খোঁপাটা যে একটু হলেই নিখিলের কাঁধ ছুঁয়ে ফেলতে পারে; সামান্য হাওয়া লাগলে যে আত্রেয়ীর শাড়ির আঁচল ফুরফুর করে নিখিলের চোখে-মুখে লুটিয়ে পড়তে পারে।

নিখিল বলে—বেশ জায়গা।

নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী। কী যেন বলতে চায় আত্রেয়ী। নিখিল বলে—কিছু বলছেন?

আত্রেয়ী—আপনি বলুন।

—আমি আবার আসব।

—দু'দিনের জন্য?

—হ্যাঁ।

—আসবেন আর চলে যাবেন?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কোনও খবর পাচ্ছি না।

—কার খবর? হেমন্তবাবুর?

—হ্যাঁ। কঠিন অসুখের একটা খবর এল, তার পর আর কোনও খবরই নেই।

—এ তো সত্যিই একটা অদ্ভুত কথা বলছেন; এর মানে কী?

—বুঝতে পারছি না।

—আমিও বুঝতে পারছি না। কিন্তু সত্যিই এমন যদি হয়...।

কথাটা হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে কি-যেন ভেবে নেয় নিখিল। তারপর যেন সত্যিই একটা নতুন গ্রহলোকের জীবনের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে দেয়—চিন্তা করবেন না। আপনাকে একেবারে একা হয়ে পড়ে থাকতে হবে না। আমি মাঝে মাঝে আসব।

আত্রেয়ী—আমি এখন যাই।

নিখিল—আসুন। কিন্তু কাল আর আসবেন না। আমি কাল সকালের ট্রেনেই আগ্রা চলে যাব।

আত্রেয়ী—আবার কবে আসবেন?

নিখিল—মনে হচ্ছে মাস পাঁচ-ছয় পরে একবার আসতে পারব।

২২

আজ সকাল থেকে চন্দ্রবাবুর হাঁকডাক বেশ মাত্রাছাড়া রকমের একটা আহ্লাদের চিৎকার হয়ে সরিয়াডির সড়কে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছে। —কী ব্যাপার? এর মানে কী?

মোষের শিঙের লাঠিটাও বড় বেশি দুলছে। এটাও যেন একটা ঠাট্টার লগুড়। অদ্ভুত এক মেজাজ নিয়ে হেঁটে চলেছেন চন্দ্রবাবু। রাস্তার পাশের ডাস্টবিনের গায়ে বেশ জোরে একটা লাঠির খোঁচা হেনে দিয়েই এগিয়ে যান; মাথা হেঁট করে হেলে পড়ে আছে যে ল্যাম্পপোস্ট, তারও গায়ে লাঠিটাকে একবার ঠুকে দিয়ে আবার চলতে শুরু করেন। —কী ব্যাপার হে দিবাকর? এত কড়া রোদ্দুরের মধ্যে হঠাৎ দু ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে গেল কেন?

উত্তর দেয় না দিবাকর। চুপ করে বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আর মাথা ঝুঁকিয়ে একমনে সাইকেলটার ধুলো মুছতে থাকে।

আজ বোধহয় সব বাড়ির গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আর হাঁক দিয়ে সকলকেই উত্যক্ত করবেন চন্দ্রবাবু। ভাল সুযোগ পেয়েছেন চন্দ্রবাবু। আজ রবিবার, সকলেই বাড়ি আছে।

চন্দ্রবাবুর গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েই খোলা জানলার একটা পাট আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিলেন গোষ্ঠবাবু। হাবুলবাবু গেটের কাছ থেকে সরে গিয়ে একেবারে বাড়ির পিছনে বেগুন ক্ষেতের কাছে ঘুরঘুর করতে থাকেন। চন্দ্রবাবুর এই হাঁকডাকের শব্দটা শুনতে একটুও ভাল লাগে না। সহ্য করতেও ইচ্ছে করে না।

—কী ব্যাপার জয়ন্ত? কাছারিপাড়ার নতুন কুঁয়োর জলে কেরোসিনের গন্ধ কেন?

চন্দ্রবাবুর কথার জবাব না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন জয়ন্তবাবু। আজ সামান্য একটা কথা বলতে গিয়ে কত বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে হাসছেন চন্দ্রবাবু।

রজনীধামের কাছে সড়কের উপরে সামন্তবাবুকে যেন পথরোধ করে থামিয়ে রাখলেন চন্দ্রবাবু। —তোমাদের এত লজ্জা কিসের, সামন্তবাবু?

সামন্তবাবু মিটমিট করে তাকিয়ে কথা বলেন—কিসের লজ্জাটা দেখলেন?

—এই যে, আমাকে দেখেই পাশের রাস্তায় সরে পড়বার চেষ্টা করছিলে।

—না না, সরে পড়বার চেষ্টা করব কেন? বলতে বলতে চন্দ্রবাবুর পাশ কাটিয়ে ব্যস্তভাবে সরে পড়েন সামন্তবাবু।

কে জানে কোথা থেকে আর কেমন করে কী-কথা শুনেছেন চন্দ্রবাবু, যে জন্যে আজ সরিয়ড়ির মানুষগুলিকে এভাবে ঠাট্টা করে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যেন তিরছি নদীর পানি এইবার সরিয়াডির যত স্থায়িতার বড়াই ভাসিয়ে দেবার চমৎকার সুযোগ পেয়ে হাসছে। —ওরে, ও বলাই, একবার এদিকে এসে একটা কথা শুনে যা।

বাড়ির বারান্দার সিঁড়ির থেকে নেমে আসে বলাই; রাস্তায় এসে চন্দ্রবাবুর চোখের সামনে একেবারে শান্ত-নীরব একটি মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

চন্দ্রবাবু হে হে করে হাসতে থাকেন—তোরা নাকি সবাই নো-চেঞ্জার?

বলাই—জানি না।

চন্দ্রবাবু—বল না? বলতে লজ্জা করছিস কেন?

বলাই—আঃ, আপনি মিছিমিছি কেন কথা বাড়াচ্ছেন, চন্দ্রকাকা?

চন্দ্রবাবু—রাগ করলেও নিশ্চয় মনে মনে স্বীকার করছিস যে, এই চন্দরবুড়োই সব চেয়ে চালাক।

বলাই—কিসের চালাক আপনি?

চন্দ্রবাবু—আমি থিয়েটার দেখি, তোরা থিয়েটার করিস। বুঝলি?

চন্দ্রবাবুর চোখ দুটো কি সত্যিই দেখতে পেয়েছে যে, এই সাতদিন ধরে সরিয়াডির আত্মাটা ভিখিরীর মত হিসেব করছে?

চিনু শুধু বলেছিল—আত্রেয়ীদির গতি হতে পারে, দাদু।

—কী বললি?

—পিসিমা বলছিলেন, কটেজের নিখিলবাবুর সঙ্গে আত্রেয়ীর কথা হয়েছে।

চমকে উঠে, চোখ বড় করে আর চেঁচিয়ে হেসে উঠেছিলেন চন্দ্রবাবু—অ্যাঁ। তা হলে? তোদের আত্রেয়ীদির হাতের সেই চিঠিটা কোথায় উড়ে গেল চলে গেল রে চিনু?

প্রদোষ সরকারের বাড়ির সামনের পথে এসেই চোখ ঘুরিয়ে একবার দেখে নিলেন, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আত্রেয়ী। কিন্তু রাস্তার উপর হাজরাবাবুকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন চন্দ্রবাবু। —আর ধরাধরি করো না, ধরতে চেষ্টা করো না হাজরা। আর লজ্জা বাড়িও না। তোমাদের প্রদোষদার মেয়েকে একটু বুঝিয়ে দাও, সব খালি করে দিয়ে হালকা হয়ে যাওয়াই ভাল; আমি যেমনটি ভাল আছি।

রোদে ঘেমে উঠেছেন চন্দ্রবাবু। কিন্তু কোনও হুঁস নেই। ক্লান্তিও নেই। কোন সকালে বের হয়েছেন, কিন্তু কিছু খেয়ে বের হয়েছেন কিনা সন্দেহ। আগে তবু গুড় চিবিয়ে আর জল খেয়ে

বের হতেন। কিন্তু সে অভ্যাসটাও বোধ হয় ধরে রাখেননি। ঘরে চুরি হয়ে যাবার পর থেকে ঘরটাকে আরও শূন্য করে দিয়েছেন। ঘরের দরজাও খোলা রেখেই বের হয়ে পড়েন। একেবারে খালি হয়ে যাওয়া আর একলা পড়ে থাকা জীবনের গর্বটাকে আজ যেন রোদের তাপে আরও তাতিয়ে নিয়ে হনহন করে চলে যান চন্দ্রবাবু।

কিন্তু বাড়ির কাছে এসেই রাস্তার একটা নিমের ছায়াতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন চন্দ্রবাবু। চমকে উঠেছে চন্দ্রবাবুর চোখ। কে ওরা?

চন্দ্রবাবুর দরজা-খোলা বাড়ির বারান্দাটাতে টিনের একটা তোরঙ্গ, তার উপর কাপড়ের একটা পুঁটলি। সাদা থান-পরা এক নারীর মূর্তি দরজার কাছে মেজের উপর চুপ করে বসে আছে; মাথার কাপড় টেনে নামিয়ে দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছে। আর, লাল শালুর জামা পরানো একটা শিশু হামা দিয়ে মেঝের এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করে যেন খুশি বিড়াল-ছানার মত খেলছে।

এগিয়ে এসে বারান্দায় উঠলেন চন্দ্রবাবু। বাচ্চাটা চন্দ্রবাবুর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলতেই দেখতে পেলেন চন্দ্রবাবু, বাচ্চাটার দাঁত নেই।

—এটা কে রে? দাঁত নেই কেন রে? কোত্থেকে এল রে এটা? একটা ভয়াতুর চিৎকার চন্দ্রবাবুর বুকের ভিতর থেকে ফেটে বের হতে গিয়ে যেন তাঁর শুকনো শরীরের সব পাঁজর গুঁড়ো করে দিয়েছে।

হাজরাবাবু এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন বলেই সবার আগে তিনিই চন্দ্রবাবুর এই চিৎকারের শব্দ শুনতে পেলেন; সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন—কী হয়েছে চন্দরদা?

কাঁপছেন চন্দ্রবাবু। —দেখো তো ভাই হাজরা, এরা কারা এখানে বসে আছে।

বিধবা তরুণী খুব মৃদুস্বরে আর ফুঁপিয়ে কি-যেন বলছে। হাজরাবাবু কাছে এগিয়ে এসে, মাথা ঝুঁকিয়ে আর কান পেতে শুনতে চেষ্টা করেন।

চমকে চেঁচিয়ে ওঠেন হাজরাবাবু। —চন্দরদা। আপনার ছেলের বউ আর নাতি। কলকাতা থেকে এসেছে।

চন্দ্রবাবুর হাতের মোষের শিঙের লাঠিটা হাত থেকে আলগা হয়ে পড়ে যায়। দু'চোখ বন্ধ করে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন চন্দ্রবাবু। বুকটা শুধু অদ্ভুতভাবে ধুঁকতে থাকে।

বিধবা তরুণী উঠে এসে চন্দ্রবাবুর ধুলোমাখা পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে। সেই সঙ্গে যেন একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসের শব্দ আস্তে আস্তে কথা বলে—তিন মাস হল আপনার ছেলে চলে গিয়েছে। এখন আপনি যদি ঠাঁই না দেন তবে আপনিই বলে দিন, কোথায় যাব?

যে ছেলের নামটা মনে পড়ে না; যে ছেলে চল্লিশ বছর আগের একটা গল্পের ছেলে মাত্র। তারই বিধবা বউ আর ছেলে চন্দ্রবাবুর জীবনের খালি ঘরের ভিতরে উঁকি দিয়েছে। চল্লিশ বছর পরে আবার ড্রপসিন উঠল; কিন্তু এ কী চমৎকার হেঁয়ালির থিয়েটার। দাঁত নেই সেই বাচ্চাটা হামা দিয়ে ঘুরছে আর হাসছে।

বাচ্চাটা তরতর করে হামা দিয়ে এগিয়ে আসে আর চন্দ্রবাবুর হাঁটু-ধরে উঠে দাঁড়ায়।

হাজরাবাবু ডাকেন—চন্দরদা।

চন্দ্রবাবু—বলো।

হাজরাবাবু—নাতি যে কোলে উঠতে চাইছে।

কেঁদে ফেললেন চন্দ্রবাবু। বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন—এটার নাম কি গো বউমা?

—ভুলু।

—তোমার নামটা কী?

—পারুল।

—ঘরের ভেতরে যাও।

তোরঙ্গ আর পুঁটলিটাকে হাতে তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যায় চন্দ্রবাবুর পুত্রবধূ পারুল।

চন্দ্রবাবু—একটা কথা ছিল, হাজরা।

হাজরাবাবু—বলুন।

বাচ্চাটা চন্দ্রবাবুর কোল থেকে নেমে পড়বার জন্যে উসখুস করছে। বাচ্চাটাকে তাই বেশ একটু শক্ত করে আঁকড়ে ধরেন চন্দ্রবাবু। —আত্রেয়ীকে একটা কথা বলে দিও; পাগলা জ্যাঠামশাইয়ের বাজে কথার কোনও মানে হয় না। যেন কিছু মনে না করে?

একে একে অনেকেই আসছেন। চন্দ্রবাবুর খালি ঘরের দরজার কাছে একটা বিস্ময়ের আবির্ভাবের খবর এরই মধ্যে অনেকেই শুনতে পেয়ে গেছে নিশ্চয়। ছুটে এসেছে চিনু; তারপরেই এলেন চিনুর পিসিমা। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সন্তুর মা'ও ব্যস্তভাবে আসছেন, আগে আগে সন্তু। সবারই মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রবাবু অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকেন। যেন চন্দ্রবাবুর জীবনের যত শূন্যতার বড়াই এভাবে জব্দ হয়ে বেশ খুশির হাসিই হাসছে।

হাজরাবাবু হেসে ফেললেন—আমি এখন যাই, চন্দরদা।

দুপুর থেকে বিকেল, তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত সরিয়াডিও যেন হাসতে থাকে। বড় জব্দ হয়ে গিয়েছেন চন্দ্রবাবু। ভালই হল। চন্দরদা আর হাঁকডাক করে সরিয়াডির যত ঘর-সংসারকে ঠাট্টা করে বেড়াতে পারবেন না। গোষ্ঠবাবু হাসেন—এবার আর বোধ হয় মোষের শিঙের লাঠি দুলিয়ে রোজ ভোরে বেড়াতে বের হবেন না চন্দরদা।

হাবুলবাবু হাসেন—কী করবেন তা হলে? ঘরে বসে ঘুমপাড়ানি গান গাইবেন?

দিবাকর হাসে—নাতির দুধের জন্যে ঘটি হাতে নিয়ে বের হবেন।

আত্রেয়ীও শুনতে পেয়ে হেসে ফেলছে—জ্যাঠামশাইকে আপনি তখুনি বলে দিলে ভাল করতেন, হাজরাকাকা। আমি একটুও রাগ করিনি।

রাত্রি আটটা কুড়ির এক্সপ্রেসে বলাইয়ের এক সন্ন্যাসী মামাকে তুলে দিয়ে বাড়ি ফেরবার পথে হাসতে থাকে বলাই আর নরেন।

বলাই—মামা তো সন্ন্যাসী, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও আশ্রমে টিকতে পারলেন না।

নরেন—তা হলে কি এখন হিমালয়ের গুহা-টুহাতে...।

বলাই—আরে ধেৎ, সন্ন্যাসী মামা এখন গয়াতে লক্ষ্মী মাসিমার বাড়িতে চললেন।

নরেন—তারপর?

বলাই—তারপর নাকি পুরীতে গিয়ে বীরেন কাকার বাড়িতে কিছুদিন থাকবেন। তারপর কলকাতাতে পুঁটিদির বাড়িতে।

বলাই আর নরেন একসঙ্গে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক চেপে সাইকেলের স্পিড থামিয়ে দেয়। দু'জনেরই চোখে পড়েছে, চকের বাজারে জানকীলালের মুদিখানার বেঞ্চের উপর চুপ করে বসে আছেন চন্দ্রবাবু।

নরেন মুখ টিপে হাসে আর ডাক দেয়—এখানে কী করছেন চন্দরকাকা?

চন্দ্রবাবু—জানকীলালের এখানে কাঁচামুগ নেই।

বলাই হাসে—ভবানীর দোকানে পাবেন।

চলে গেল বলাই আর নরেন। দু'জনেরই সাইকেলের ঘন্টির শব্দ টুং-টাং করে খুশির হাসি বাজিয়ে কালীবাড়ি রোডের অন্ধকারও পার হয়ে যায়। কিন্তু প্রদোষ সরকারের বাড়ির কাছে এসেই দু'জনেই একসঙ্গে চমকে ওঠে। সাইকেলের ঘন্টি হাত দিয়ে চেপে ধরে শব্দের ঝংকারকে একেবারে বোবা করে দেয়। ব্রেক দাবিয়ে সাইকেল থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে বলাই

আর নরেন, দুটি শঙ্কিত মূর্তি। নরেনের গলার স্বর কেঁপে ওঠে। —আত্রেয়ীদি কাঁদছে কেন?

প্রদোষ সরকারের সব বাড়ির ঘরেই আলো শুধু একটি ঘরের বন্ধ জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ যেন গলে গলে ঝরে পড়ছে।

বলাই বলে—এ তো বেশ সাংঘাতিক কান্না বলে মনে হচ্ছে। ভয়ানক খবরটা এসে গেছে বোধহয়।

নরেন বলে—দিবাকরদাকে এখুনি খবর দিই বলাইদা।

শুধু দিবাকর নয়, অনেকেই, প্রায় সকলেই শুনতে পেল, আত্রেয়ী কাঁদছে। পাঁচ বছর আগে একবার, আর এই একবার; আত্রেয়ীর কান্নার শব্দ সরিয়াড়ির বাতাসে দু'বার ছড়িয়ে পড়লো। সেবার ছিল হেমন্তর কয়েদের খবর, আর এবার হল হেমন্তর চরম ছাড়া পাওয়ার খবর।

দিবাকরের বাড়ির গেটের কাছে রাস্তার উপর ছোট একটা ভিড়। হাবুলবাবু বলেন—চলুন, একবার একটু দেখা দিয়ে চলে আসি, গোষ্ঠদা।

জয়ন্তবাবু বলেন—আপনারা যান, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

দিবাকর বলেন—আমার যেতে ইচ্ছে করছে না, শান্তি। এখন আর আমার যাওয়ার কোনও মানে হয় না। এখন তুমি একবার...।

চোখ মুছে নিয়েই চেঁচিয়ে ওঠে শান্তি। —না। অসম্ভব। আমি পারব না, আমি পারি না। কারও শাঁখা ভাঙবার নিয়ম আমি জানি না।

মুখ ফিরিয়ে, মাথা হেঁট করে আর একবারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে শান্তি।

কে জানে কার উপর রাগ করে দিবাকরও চেঁচিয়ে ওঠে। —না, আমিও যাব না।

ঘরের বাইরে গিয়ে বারান্দার উপরে শুধু ছটফট করে ঘুরে বেড়ায় দিবাকর। বিনাদোষে মার খেয়ে একটা ভাগ্য লুটিয়ে পরে কাঁদছে, এ দৃশ্য দেখে দিবাকরের অবুঝ আত্মাটা শুধু নিজের রাগের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলবে। দেখে দরকার কী?

কিন্তু এ কী? আধ ঘণ্টাও তো পার হয়নি; দিবাকরের বাড়ির গেট খুলে ছায়ার মত এত চেহারা, যেন চোরের মত চুপি চুপি কোনও শব্দ না করে এগিয়ে আসছে কেন? আবার এখানে এসে ভিড় করবার কী দরকার?

এসেছেন গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবু। তাঁদের পিছনে জয়ন্তবাবু। হাজরাবাবুও হাজির হলেন। বলাই আর নরেনও এসে পড়ে।

সত্যিই যে চোরের মত চাপা-গলায় ফিস-ফিস করে কথা বলেন গোষ্ঠবাবু। আবার ঢোঁক গিলে যেন একটা লজ্জার অস্বস্তি গিলে ফেলতে চাইছেন। —এবার শান্তিকে সঙ্গে নিয়ে তুমিই একবার যাও, দিবাকর।

দিবাকর কেন?

হাবুলবাবু মিনমিন করে কথা বলেন—কথাটা হল... তার মানে... কোনও খবর-টবর নয়, আত্রেয়ীর স্বামী হেমন্ত নিজেই এসেছে।

সামন্তবাবু—বেশ ছেলে হেমন্ত, কত শান্ত বাইরের ঘরে একা বসে আছে আর হাসছে। কিন্তু আত্রেয়ী এ কী কাণ্ড শুরু করেছে। আত্রেয়ীর এত কান্নাকাটি করা যে খুবই বিশ্রী একটা অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে, নয় কি?

গোষ্ঠবাবু—কথাটা হল, আত্রেয়ী এরকম কান্নাকাটি করলে ওর স্বামী কিছুটা মনে করে ফেলতে পারে তো!

জয়ন্তবাবু—বউমাকে সঙ্গে নিয়ে তুমি একবার যাও, দিবাকর। এখন তোমরা ছাড়া...।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে শান্তি। যেন একটা উতলা উৎসাহের মূর্তি। মাথার কাপড় টানতেও ভুলে গিয়েছে শান্তি। এতক্ষণে যেন কাজের মত একটা কাজের ডাক শুনতে

পেয়ে সরিয়াডির শান্তি বউদির প্রাণের আবার একটা দুর্বার মতলবের জোর হঠাৎ ঝড়ের হাওয়ার মত জেগে উঠেছে।

দিবাকরের দিকে তাকিয়ে শান্তি বলে—তুমি বাড়িতে থাকো। আমিই যাচ্ছি।

দেখে খুশি হয় শান্তি, প্রদোষ সরকারের এই বাড়ির সব ঘরের আলো আজ একটু উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। দরজা খোলা, জানালা খোলা। বাইরের বাতাসের ব্যাকুলতাও তাই অবাধে ঘরের ভিতরে ঢুকেছে। যত অচলতার ভার শুকনো পাতার স্তূপের মত সে বাতাসের একটা আবেগের আঘাত পেয়ে নড়ে সরে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এরই মধ্যে অনেক কাজ করে ফেলেছেন কাকিমা। হেমন্তবাবুর খাওয়া হয়ে গিয়েছে, আত্রেয়ীর ঘরটা বেশ গোছানো ও পরিচ্ছন্ন। আত্রেয়ীর ঘরের বড় খাটে নতুন করে একটা বড় বিছানাও পাতা হয়ে গিয়েছে। সেই বিছানার উপর চুপ করে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন এক ভদ্রলোক।

ভদ্রলোকের কপালের একপাশে একটা পুরনো আঘাতের দাগ। কিন্তু কপাল জুড়ে একটা টানা মসৃণতা, কোথাও একটু খাঁজভাঁজ নেই। ঘন কালো চোখের পাতাগুলিও বেশ ভারি ভারি। কঠিন অসুখে ভোগা শরীরটাকেও তো বেশ শক্ত-পোক্ত বলে মনে হয় কিন্তু মুখের ছাঁদের মধ্যে যেন একটা ছেলেমানুষি দুরন্তপনা লুকিয়ে আছে।

ঘরের দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে হেমন্তর মুখটাকে যেন একটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নেয় শান্তি। আর বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, দাঙ্গা-ফৌজদারির হল্লার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই মানুষেরই ওই শান্ত কালো চোখ থেকে আগুন ছুটে বের হয় কেমন করে? রাধাপুরের সাংঘাতিক সাত আনির এ কেমন অসাংঘাতিক চেহারা! ওই চোখ দেখে আত্রেয়ীর তো ভয় পাওয়ার মত কিছুই নেই।

কিন্তু আত্রেয়ীর কান্নার শব্দ এখনও থামেনি। মনে হচ্ছে, কান্নাটা এখন ভিতরের বারান্দার এক কোণে বসে গুনগুন করছে।

এগিয়ে যেয়ে, আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে, আর আত্রেয়ীর একটা হাত শক্ত করে ধরে নিয়েই বুঝতে পারে শান্তি, এই কান্নার সঙ্গে লড়াই করা যেমন-তেমন ব্যাপার নয়।

শখের কান্না, কিংবা রাগের কান্না হলে এখনই থামিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু আত্রেয়ী যেন ওর বুকের ভিতরে একটা সাধের খেলাঘরের দিকে তাকিয়ে কাঁদছে। মাঝে মাঝে দীপ জ্বেলে হেসে ওঠে সেই ক্ষণকালের খেলাঘর; তারই দরজা বন্ধ করে দেবার জন্য চিরকালের অনুমতি নিয়ে একজন দাবির মানুষ এসে গিয়েছে।

শান্তি বলে—এরকম একটা ঘটা করে কাঁদবার কী মানে হয়, আত্রেয়ী?

চমকে ওঠে আত্রেয়ী; শান্তি বউদির মুখের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ীর ভেজা চোখ দুটোও আশ্চর্য হয়ে যায়। শান্তি বউদির চোখে এমন ভ্রূকুটি কোনওদিন দেখেনি আত্রেয়ী; এ ধরনের তীব্র শ্লেষের আঘাত দিয়ে কোনওদিনও কথা বলেনি শান্তি বউদি।

আত্রেয়ীর কান্নার চাপা-গুঞ্জন বন্ধ হয়ে যায়। শান্তি বলে—কাঁদতে হলে এরকম একটা শোকের সোর না তুলেও চুপ করে কাঁদতে পারতে। কান্নাটাকে হেমন্তবাবুর কানে শুনিয়ে দেবার দরকার ছিল না।

আত্রেয়ী—তুমি মিথ্যে আমাকে সন্দেহ করবে না, বউদি।

শান্তি—না করে উপায় কী? হেমন্তবাবু আসাতে তুমি যে খুশি হওনি, সে কথাটাই তুমি তোমার এই বিশ্রী কান্না কেঁদে হেমন্তবাবুকে জানিয়ে দিলে।

আত্রেয়ীর চোখ দুটো হঠাৎ যেন একটা জ্বালার ছোঁয়া লেগে শুকনো হয়ে যায়।

—খুশি হবার সাধ্যি আমার নেই।

শান্তি—তা হলে আর বলছ কেন, আমি মিথ্যা সন্দেহ করছি?

আত্রেয়ী—বেশ তো আর বলব না।

শান্তি—আমিও তোমাকে বলব না যে, খুশি হও।

আবার আশ্চর্য হয়ে শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী—তবে তুমি আর কী বলতে চাও?

—আমি বলছি, তুমি যা নিয়ে খুশি হয়ে আছ, তাই নিয়ে খুশি হয়ে থাকো। হেমন্তবাবুর সঙ্গে অন্তত একটু ভদ্রতা করো।

—কী করতে হবে?

—হেমন্তবাবুর কাছে গিয়ে কথা বলো।

—অসম্ভব।

—কী বললে?

—যদি বলি তবে কাল সকালে বলব।

—এখন বলতে কী অসুবিধে আছে?

—আমি ও ঘরে যেতে পারব না।

—কেন?

—ভয় করে।

—চিঠি দিতে তো ভয় করেনি।

—চিঠি এখনও আমি দিতে পারি।

—এ ভদ্রলোক তোমার কাছে তা হলে শুধু চিঠির মানুষ? আর কিছু নয়?

উত্তর দেয় না আত্রেয়ী। যেন ইচ্ছা করে বধির হয়ে গিয়ে শান্তি বউদির এই কঠিন প্রশ্নের রূঢ় বিদ্রূপটাকে তুচ্ছ করতে আর অবিচল অনিচ্ছার একটি পাথর হয়ে থাকতে চায় আত্রেয়ী।

শান্তি—বেশ তো চিঠির মানুষের সঙ্গেই না হয় মিথ্যে করে দু-একটা কথা বললে।

আত্রেয়ী—ও ঘরে যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না।

শান্তি—না হয় মিথ্যে করেই একবার গেলে।

আত্রেয়ী—থিয়েটার করতে বলছ?

শান্তি—হ্যাঁ। সবাই তো থিয়েটার করে; তুমিও কিছু কম করনি। তবে আজও এখন একটু থিয়েটারই না হয় করলে।

আত্রেয়ীর হাত ধরে টান দেয় শান্তি—ওঠো আত্রেয়ী। শুধু একটু মুখের ভদ্রতা রক্ষা করতে হবে, এই মাত্র। সবই তো বুঝি, তবু বলছি, একবার যাও। দু-একটা ভদ্রতার কথা হেসে হেসে বলতে হবে। এটুকুও করতে পারবে না কেন? নিশ্চয় পারবে।

উঠে দাঁড়ায় আত্রেয়ী। শান্তির গলার স্বর আরও নিবিড় হয়ে আরও একটা সান্ত্বনা দিয়ে আত্রেয়ীকে আরও নির্ভয় করে দেয়।

—বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করা হবে না; তোমার যখনই ইচ্ছে হয় চলে আসতে পারবে।

হেমন্তর ঘরের দরজার একটা কপাট ফাঁক করে আত্রেয়ীর কুণ্ঠিত মূর্তিটাকে ভিতরে ঠেলে দিয়েই কপাট ভেজিয়ে দেয় শান্তি।

শান্তির দু'চোখে এইবার অদ্ভুত একটা হাসি বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে চমকে ওঠে। এটাও নিশ্চয় একটা সফল মতলবের হাসি। কিন্তু একটা কঠোর ঠাট্টার হাসিও বটে। বেশ তো, এখন শুধু এই রাতটুকু একটা মিথ্যেরই ঘরে বন্দিনী হয়ে পড়ে থাকুক আত্রেয়ী।

শান্তি বলে—বেশ রাত হয়েছে, কাকিমা, আমি এবার যাই। রামুয়াকে ডেকে দিন, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসুক।

খবরের কাগজটাকে বিছানার উপরে রেখে দিয়ে আত্রেয়ীর দিকে তাকায় হেমন্ত।

দরজার ভেজানো কপাটের কাছে দেয়ালটাকে এক হাতে ছুঁয়ে আর মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আত্রেয়ী।

হেমন্তর চোখ দুটো যেন পাঁচ বছরের যত উপোসী আশার চোখ; একটা নতুন বিস্ময়ে ভরে গিয়ে দেখছে আর শান্ত হয়ে হাসছে, সেই বাসর-ঘরের বাতিটাই বুঝি।

আবার নতুন করে জ্বলে উঠেছে। সেদিনও তো ঠিক এরকমই লাজুক রঙিন ছবি মুখ ফিরিয়ে ঠিক এইরকমই একটি ভীরু ভীরু ভঙ্গি নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল।

কিছুই তো বদলে গিয়েছে বলে মনে হয় না। আত্রেয়ীর হাতের আঙুলে সেই আংটিটাই তো আছে; সোনার চৌখুপির মধ্যে একটা লালমণি। হ্যাঁ, সেই ঢিলে খোঁপাটা বেশি ভারি আর সেই ভুরু দুটো বেশি কালো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা তো বদলে যাওয়া নয়। সেই ছবিরই রং আরও নিবিড় হয়েছে, ভরে গিয়েছে। গলার খাঁজটা আরও গভীর হয়ে গিয়েছে। হয়ে যাবেই তো; পাঁচটা বছর তো কম নয়।

হেমন্ত ডাকে—এসো।

কিন্তু এগিয়ে যায় না, চোখ তুলে তাকায়ও না আত্রেয়ী। দরজার পাশের দেয়ালের গায়ে হাত রেখে আর মাথা ঝুঁকিয়ে অনড় পাথরের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

হেমন্ত হাসে—একবার তাকিয়ে দেখো, আমি সত্যিই তোমার চেনামানুষ, না অন্য কেউ?

চোখ না তুলেই কথা বলে আত্রেয়ী। —আপনি এতদিন কোনও খবর দেননি কেন? হেমন্তর চোখের শান্ত হাসির সব আশার উপর কে যেন ছাই ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু জবাব দিতে একটুও দেরি করে না হেমন্ত।—আপনি এতদিন খবর নেননি কেন?

চমকে ওঠে আত্রেয়ী। কোনও মেঘের ছায়ার ভাষা নয়; বেশ একটা কড়া রোদের ঝাঁজ কথা বলছে। চোখ তুলে হেমন্তের মুখের দিকে তাকায়। আত্রেয়ীরও চোখ দুটো শুকনো রুক্ষ চাপা ভ্রুকুটির চোখ।

চোখে পড়েছে আত্রেয়ীর; ভদ্রলোকের কপালের পাশের সেই পুরনো আঘাতের দাগটা; ওটা নাকি ডাকাতের লাঠির দাগ। মনে হচ্ছে, সাত-আনির দুর্দান্ত মেজাজ নিয়ে শিউরে উঠেছে দাগটা।

আত্রেয়ী—আমার যতটা সাধ্য খবর দিয়েছি।

হেমন্ত—আমিও আমার যতটা সাধ্যি খবর নিয়েছি।

আত্রেয়ী—আমার আর কিছু বলবার নেই।

হেমন্ত—আমারও আর কিছু বলবার থাকতে পারে না।

আত্রেয়ী—আপনি এত বিরক্ত হয়ে কথা বলছেন কেন?

হেমন্ত—আপনিই বা এত বিরক্ত হয়ে জবাব দিচ্ছেন কেন?

আত্রেয়ী—আমি এখনই যাই।

হেমন্ত—হ্যাঁ, আমিও যাচ্ছি।

আত্রেয়ীর চোখের চাহনির সব রুক্ষতা আরও রূঢ় হয়ে কেঁপে ওঠে—কোথায় যাবেন?

হেমন্ত হাসে—আপনার পিছু পিছু যাব না। সোজা স্টেশনেই যাব।

আত্রেয়ী—তা হলে কাকিমাকে ডেকে দিই; কাকিমাকে বলে যান।

হেমন্ত—কোনও দরকার নেই। আপনাকে বলে যাচ্ছি, এই যথেষ্ট।

বিছানা থেকে নেমে পড়ে হেমন্ত। টেবিল থেকে হাত-ঘড়িটা তুলে নিয়ে হাতে পরতে থাকে। আলনা থেকে কামিজটাকে তুলে নিয়ে কাঁধের উপর রাখে।

একেবারে নতুন কোনও দৃশ্য নয়। আত্রেয়ীর চোখ দুটো এবার বেশ অপলক হয়ে যেন পাঁচ বছর আগেরই একটা ঘটনার ছবি দেখতে থাকে। ঠিক এভাবেই কাঁধের উপর একটা কামিজ

ফেলে দিয়ে আর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল একটি মানুষ। এই বিছানাটারই মত মিথ্যে হয়ে গিয়ে একটা ফুলশয্যা তখন সে-ঘরের ভিতরেও পড়ে ছিল।

আত্রেয়ী বলে—এটা কিন্তু একটুও ভাল দেখাচ্ছে না।

হেমন্ত—খারাপই বা কি দেখাচ্ছে, তা তো বুঝতে পারছি না।

—খুব খারাপ দেখাচ্ছে।

—হতে পারে।

জুতো পায়ে দিয়ে ফেলেছে হেমন্ত। এইবার বাইরের বারান্দায় যাবার দরজাটার দিকে এগিয়ে যায়।

আত্রেয়ী—বাক্সটা পড়ে রইল।

হেমন্ত—পড়ে থাকুক; ওটা এবাড়ির চাকরের বকসিস।

—যাবেন না।

—হুকুম করবেন না।

এগিয়ে যেয়ে আর হাত তুলে বন্ধ দরজাটাকে চেপে ধরে আত্রেয়ী—হুকুম করছি না। একটু বুঝতে বলছি।

হেমন্ত—কী বুঝবার আর বাকি আছে?

আত্রেয়ী—আমি তোমাকে চলে যেতে বলিনি।

হেমন্ত—তা বলনি; কিন্তু তুমিই বা চলে যেতে চাইলে কেন?

—ভয় করছিল।

—কিসের ভয়?

—তুমি বুঝবে না।

—তুমি বুঝেছ তো?

—না; বুঝতে পারলে তোমাকে বলেই দিতাম।

—বুঝে কাজ নেই, বলেও কাজ নেই।

—কিন্তু এখনও তো আমার কথাটার জবাব দিতে পারলে না।

—কী কথা?

—চিঠি দিলে না কেন? আমার চিঠি কি পাওনি?

—পেয়েছি।

—তবে? উত্তর দাওনি কেন?

—ইচ্ছে করেই দিইনি।

—এমন ইচ্ছের মানে কী?

—আমার অসুখের খবর পেয়েও আমাকে একটা চিঠি দিতে যার দু'মাস সময় লাগে, তাকে আরও চিঠি দিয়ে বিরক্ত করবার কোনও মানে হয় না।

—কিন্তু এসেই তো বেশ বিরক্ত করতে পারছ?

—তুমি বিরক্ত হচ্ছ; আমি তোমাকে বিরক্ত করিনি।

—যেখানে একটা চিঠি দেবারও ইচ্ছে হল না, সেখানে নিজেই হঠাৎ চলে এলে কেন?

—হ্যাঁ, ইচ্ছে ছিল হঠাৎ এসেই দেখে নেব, জেনে আর বুঝে নেব; দু' মাসের মধ্যেও একটি চিঠি দেওয়া কেন তোমার সাধ্যি হয়নি।

—কী দেখলে, কী জানলে, কী বুঝলে?

—আমাকে চিঠি দেবার ইচ্ছে ছিল না বলেই চিঠি দেওয়া তোমার সাধ্যি হয়নি।

—একটা মিথ্যে সন্দেহ।

—হতে পারে। কিন্তু তুমি তো বলে দিলেই পার কেন চিঠি দিতে পারনি?

—জানি না।

—আরও দু' একটা চিঠি দিয়ে জানতে চেষ্টা করলে না কেন যে, লোকটা বেঁচে আছে না মরে গিয়েছে?

—মনে হয়নি।

—এ কেমন মন?

—তুমি বুঝবে না।

আত্রেয়ীর মাথাটা কেঁপে উঠেছে, রুক্ষ চোখের চাহনিটা এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। বেশ হাঁপাচ্ছেও আত্রেয়ী। এমন কঠোর একটা জিজ্ঞাসা কোনওদিন এসে আত্রেয়ীর আত্মাটারই কাছে কৈফিয়ত তলব করে বসবে, এটা যে কল্পনাও করতে পারেনি সরিয়াডির মেয়ে এই আত্রেয়ী। তাই প্রস্তুতও ছিল না; তাই জবাব দিতে গিয়ে সব নিঃশ্বাসের শক্তি যেন শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

হেসে ওঠে হেমন্ত।—না, আর বলবার কিছু নেই। এরকম চমৎকার কথা বলে মুখ বন্ধ করে দিলে আর কিই-বা বলা যায়?

আত্রেয়ী—আরও কিছু বলবার থাকে তো, বলে নিতে পারো।

হেমন্ত—তা হলে বলো; আমি আসতেই তুমি এত কাঁদলে কেন?

গম্ভীর মুখের প্রশ্ন নয়, বেশ শান্ত-শীতল হাসিমুখের প্রশ্ন। কিন্তু আত্রেয়ী যেন একটা নিরুত্তর স্তব্ধতা। কথা বলতেই পারছে না। আত্রেয়ীর প্রাণটা বোধ হয় একটা অন্ধকার হাতড়ে তন্ন তন্ন করে এমন একটা কথা খুঁজছে, যে কথা বলে দিলে বেশ স্পষ্ট করে বলা হয়েই যায় যে, ভুল করেছি কিন্তু ভুল করবার কোনও ইচ্ছে ছিল না।

হেমন্ত—তোমার যা ইচ্ছে হয় বলে দাও, আমি কিছুই মনে করব না।

আত্রেয়ী—কান্না এসে গেল। ইচ্ছে করে আর চেষ্টা করে তো কাঁদিনি।

হেমন্ত—বাস, এর পর আর কোনও কথা থাকতেই পারে না। হেমন্তর কথাগুলি যেন খুশির স্বরে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে থাকে।

একটু আশ্চর্য হলেও আত্রেয়ীর শ্রান্ত মনের এক কোণে ছোট্ট একটা সন্দেহ সির-সির করে। রাধাপুরের সাত-আনির মেজাজ এতক্ষণে যেন বিদ্রোহী মহলের এক প্রজার জেরা শেষ করে সেই খুশিতে হেসে উঠেছে। এ ছাড়া এমন হাসির আর কোনও মানে নেই। মায়ার মানুষের হাসি ওভাবে গুম্‌রে ওঠে না।

চোখ তুলে হেমন্তর মুখের দিকে তাকায় আত্রেয়ী। দুটো অপলক কৌতূহলের শক্ত ঠাণ্ডা চোখ। যেন চরম জানা জেনে নিতে চায় আত্রেয়ী, কোথায় গেল পাঁচ বছরের আগের চেনা সেই মানুষটির চোখ আর মুখ?

আত্রেয়ী—ঠাট্টা করলে বোধ হয়?

হেমন্ত—না।

আত্রেয়ী—আমাকে শুধু তুচ্ছ করতেই এসেছ?

হেমন্ত—না।

আত্রেয়ী—ঘেন্না করতে, অপমান করতে?

হেমন্ত—না। বুকে জড়িয়ে ধরতে।

বাঃ, এ তো বেশ অদ্ভুত কথা। বলা নেই, কওয়া নেই, কোনও জানান না দিয়ে রাধাপুরের দীঘির কিনারার মাঠে সেই উৎসবের আতসবাজির শব্দটা হঠাৎ বেজে উঠেছে; নীল-লাল রঙিন আলোর চমক জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে লুটিয়ে পড়তে চাইছে।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে কথা বলে হেমন্ত,—শুধু সামান্য একটা কথা বলে ফেললাম, তোমার ভয় করবার কিছু নেই। কিছু মনেও করো না।

আত্রেয়ী—কী বললে? বুঝতে পারছি না। ভাল করে শুনতে পাইনি।

হেমন্ত—অনেক রাত হয়েছে; তুমি এবার ভেতরে যাও।

আত্রেয়ী—তুমি?

হেমন্ত—আমি এখন যাব না; কাল সকালেই যাব।

দুঃসহ এক পরাজয়ের জ্বালা আত্রেয়ীর গলার স্বর যেন পুড়িয়ে দিয়ে জ্বলতে থাকে।—তোমার কিসের এত রাগ? কী পাপ করেছি আমি?

হেমন্ত—তুমি যত খুশি পাপতাপ করো, আমার রাগ করবার কোনও গরজ নেই। কিন্তু...

আত্রেয়ী—কী?

হেমন্ত হঠাৎ উদাস আনমনার মত যেন একটা শূন্যতার দিকে তাকিয়ে কথা বলে—আমি তোমাকে এসো বলে কাছে ডাকলাম, আর তুমি দূরে দাঁড়িয়ে রইলে?

এই সামান্য একটা কারণে এত বেশি রাগ। হেমন্তর গলার স্বরে সত্যিই যে একটা ব্যথাভীরু ছেলেমানুষের অভিমান কথা বলছে। হেমন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখতে থাকে আত্রেয়ী, আর নিঃশ্বাসের মধ্যেও কেমন-যেন একটা স্বস্তি-ছাড়া যন্ত্রণা ছটফট করতে থাকে। চিনতে এত দেরি হল কেন?

কাঁধের কামিজটাকে আলনার উপর ফেলে দিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ে হেমন্ত। তার পর, খোলা জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের একগাদা তারার ঝিকিমিকির দিকে তাকিয়ে আবার আনমনার মত কথা বলে—আমি তো আশা করেছিলাম, আমাকে দেখা মাত্র তুমি...।

আত্রেয়ী—কী?

হেমন্ত—আশা করেছিলাম, তুমি ছুটে এসে আমার কাছে দাঁড়াবে আর হাসবে।

কে জানে কেমন আর কিসের জোরে এমন আশাকে স্বপ্নের গভীরে পুষে রেখেছিল হেমন্ত? জানতে ইচ্ছা করে আত্রেয়ীর; কিন্তু সব কৌতূহল যেন কাঁটায় ভরা একটা লজ্জার ভয় হয়ে আত্রেয়ীর মুখ চেপে ধরে রেখেছে। মুখ ফিরিয়ে টেবিলের আলোটার দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী।

কিন্তু হেমন্ত যেন পাঁচ বছর ধরে বুকের ভিতরে জমা করে রাখা যত না-বলা কথা এক নিঃশ্বাসে বলে দিয়ে হালকা হতে চাইছে।—জেলের কোনও কষ্টকেই কষ্ট বলে আমার মনে হত না। মোটা লাল চালের ভাত আর বুড়ো মুলোর ঘ্যাঁট; মোটা কাপড়ের জাঙিয়া আর খসখসে কম্বল; ওসব গ্রাহ্যই করিনি। কিন্তু তোমার চিঠি সময় মত না পেলে দিনরাত্রি সব সময় ভয়ানক কষ্ট হত।

আত্রেয়ীর চোখ-মুখ হঠাৎ শিউরে ওঠে, সেই সঙ্গে মুখের প্রশ্নটাও।—কেন? কী সন্দেহ করেছিলে তুমি?

হেমন্ত—চিঠির দেরি হলেই সন্দেহ হত, তুমি বুঝি মরে গিয়েছ। তার ওপর, মাঝে মাঝে স্বপ্নও দেখে ফেলতাম, তুমি নেই। জেগে উঠেই কী মনে হত জান?

—কী?

—মনে হত, মেয়াদটা যাবজ্জীবন কালাপানি হয়ে গেলেই ভাল হত।

—আমিও একবার সন্দেহ করেছিলাম, তুমি বুঝি আর নেই। কিন্তু আমি তবু কাঁদিনি। বলতে বলতে মাথা হেঁট করে ফেলে, আর কেঁদে ফেলে আত্রেয়ী।

হেমন্ত বলে—অসুখের সময় আমিও মনে মনে বলতাম, যদি আমার কিছু হয়েও যায়, তবু আত্রেয়ী যেন না কাঁদে।

হেমন্তের চেয়ারের কাছে এগিয়ে এসে চেয়ারের কাঁধের উপর হাত রাখে আত্রেয়ী—ক্ষমা করো। কিছু মনে করো না। আমার খুবই ভুল হয়েছিল।

—ভুল? তুমি আবার কী ভুল করবে? কিসের ভুল?

এবার আর চেয়ারের কাঁধের উপরে নয়, পাঁচ বছর আগের চেনা আর পাঁচ বছর ধরে অদেখা মানুষটারই কাঁধের উপর হাত রাখে আত্রেয়ী। —মনের ভুল।

আত্রেয়ীর হাত ধরে হেসে ফেলে হেমন্ত। —প্রাণের ভুল নয়ত?

আত্রেয়ী—না।

হেমন্ত—তা হলে এবার আমার দিকে ভাল করে তাকাও।

আত্রেয়ী হাসে—তাকিয়েছি।

হেমন্ত—চিনতে পেরেছ?

আত্রেয়ী—নিশ্চয়। ওই তো সেই কালো চোখ।

হেমন্ত—আমি তো অনেক আগেই দেখতে পেয়েছি—।

ছটফট করে ওঠে আত্রেয়ী। —থামো বলছি। ছাড়ো বলছি।

ভিতরের দিকের দরজার ভেজানো কপাটের দিকে মুখ তুলে শঙ্কিতের মত তাকিয়ে বিড়বিড় করে আত্রেয়ী।—শান্তি বউদিকে বিশ্বাস নেই।

হেমন্ত—তার মানে?

আত্রেয়ী মুখে হাত দিয়ে আর চমকে চমকে হাসে।—শান্তি বউদি প্রতিজ্ঞা করেছে, উঁকি দিয়ে দেখবেই।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হেমন্ত বলে—রাত দুটো। এখন তোমার শান্তি বউদি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন।

আত্রেয়ী যে হেমন্তের একেবারে বুকের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে; তাই হেমন্তর মুখটাকে ভাল করে দেখতে গিয়ে চোখ দুটোকে ভাল করে তুলে ধরে তাকাতে হয়। এত ব্যাকুলভাবে তাকাতে গিয়ে মাথাটাকে পিছনে হেলিয়ে দিতে হয়। তাই ঢিলে খোঁপাটা হেলে পড়ে ভেঙেই যায়। আর মুখটাও ভাসতে থাকে।

ঘরে আলো জ্বলছে; টেবিলের আয়নাটারও উপর কোনও ঢাকা নেই। হেমন্ত আর আত্রেয়ী দু'জনে এখন এই আয়নার দিকে তাকালেই দেখতে পেত, পাঁচ বছরের দুটো অপেক্ষার পিপাসা দুজনের মুখ কত রঙিন করে দিয়ে কত রকমের ছোঁয়ার স্বাদ আর তৃপ্তি নিয়ে কত লুটোপুটি করতে পারে।

হাঁপাচ্ছে আত্রেয়ী; চোখ বুজে আছে, কিন্তু চোখের কোণে জল।

হেমন্ত—এ কী?

আত্রেয়ী—জিজ্ঞেস করছ কেন? মুছে দিলেই তো পার।

হাত দিয়ে আত্রেয়ীর চোখ মুছে দিয়েই হেমন্ত বলে—নাঃ, তুমি যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছ না যে, আমি তোমার কাছে এসে গিয়েছি।

আত্রেয়ী—বিশ্বাস করতে পেরেছি বলেই তো বলতে পারছি। শুধু আজ নয়, যত দিন বেঁচে থাকব, ততদিন এই কথা বলব।

হেমন্ত হাসে—আমার বুঝি ওই এক কাজ; তোমার চোখ মুছতে হবে।

আত্রেয়ী হেসে ফেলে—হ্যাঁ, চিরকাল তোমাকে জ্বালাব। পাঁচটা বছর ফাঁকি দিয়েছ, কিন্তু আর নয়, সাবধান।

হেমন্ত—এসো, জানালাটার কাছে দাঁড়াই। একটু ভোরের বাতাস গায়ে লাগাই।

চমকে ওঠে আত্রেয়ী—ভোর?

হেমন্ত—হ্যাঁ মশাই, ভোর হয়ে এসেছে। আত্রেয়ীর চোখের কাছে ঘড়িটাকে তুলে ধরে হেমন্ত।

সরিয়াডির শালবনের হাওয়ার সঙ্গে তিরছি নদীর ঝর্নার শব্দও ভেসে আসছে। খোলা জানালার কাছে হেমন্তের পাশে দাঁড়িয়ে রাধাপুরের গল্প শুনতে থাকে আত্রেয়ী। মেয়াদ দু'মাস

মাপ হয়েছিল, তাই ছাড়া পেয়ে এতদিন রাধাপুরেই ছিল হেমন্ত। দীঘির দক্ষিণে নারিকেল বাগানের পাশে নতুন একটা দোলমঞ্চ তৈরি হচ্ছে। খুড়িমা আত্রেয়ীকে দেখবার জন্যে ছটফট করছেন। যেন এক মাসের বেশি দেরি না করে হেমন্ত। ন-আনির খগেনকাকা একদিন নেমন্তন্ন করে পিঠে-পায়েস খাইয়েছেন আর আত্রেয়ীর জন্যে একটা ঢাকাই শাড়িও আশীর্বাদী পাঠিয়েছেন। কিন্তু খালপারের পাটজমির মালিকানা দাবি করে একটা মামলাও এরই মধ্যে দায়ের করে দিয়েছেন। হাসতে থাকে হেমন্ত।

আত্রেয়ী—মাত্র এক মাস নয়, আরও কিছুদিন এখানে থাকো। তার পর তো তোমার কাছেই সারাজীবন আছি।

হেমন্ত হাসে—মাঝে মাঝে একটু...।

আত্রেয়ী—না, কখ্খনও না। আমি আর একা থাকতেই পারব না।

হেমন্তের একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আত্রেয়ী। ডাউন বোম্বাই মেল আজ ঠিক সময়েই হুইসিল বাজিয়ে চলে গেল। শালবনের মাথা ছুঁয়ে আকাশের একটা আভাও জেগে উঠছে।

হেমন্ত ডাকে —আত্রেয়ী?

আত্রেয়ী—কী?

হেমন্ত—রাস্তা দিয়ে লোক চলতে শুরু করেছে।

—সে কি? চমকে ওঠে আত্রেয়ী, তার পরেই হেসে ফেলে।—তা হলে এখন তুমি কিছুক্ষণ একা বসে থাকো; নয়ত শুয়ে পড়তেও পারো। আমি তোমার চা নিয়ে আসছি।

২৪

ছোট শহর সরিয়াডির গরিব মিউনিসিপালিটির ফান্ডের কিছু জোর বেড়েছে নিশ্চয়। দু' বছর আগের এক ভোরের একটা হঠাৎ-ঝড়ের আঘাতে মাথা হেঁট করে হেলে পড়েছিল যে দুটো ল্যাম্পপোস্ট, তারা এখন সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নয়াপাড়ার সড়কের উপরে নতুন মেটালও ঢালা হয়েছে।

কে জানে কোন দিকে বেড়িয়ে আসবার জন্যে নয়াপাড়ার নতুন মেটাল-ঢালা সড়ক ধরে হেঁটে চলেছে হেমন্ত আর আত্রেয়ী।

খোলা জানালার একপাশে সরে গিয়ে আর হাত তুলে আত্রেয়ীকে কি-যেন ইশারা করে শান্তি। হাসছে শান্তি; কিন্তু সেই সঙ্গে যেন একটা মিথ্যে ভ্রুকুটি তুলে আত্রেয়ীকে একটু শাসিয়ে দিতেও চাইছে। নিজেরই মাথার কাপড়টাকে টেনে দিয়ে আত্রেয়ীকে বুঝিয়ে দেয় শান্তি—মাথায় কাপড় দাও।

সড়কেরই উপরে হেমন্তের পাশে দাঁড়িয়ে একেবারে মুক্তকণ্ঠে কথা বলে আত্রেয়ী—এটা রাধাপুর নয়; বউদি। এটা সরিয়াডি।

হেমন্ত—অ্যাঁ? কী হল?

আত্রেয়ী—শান্তি বউদি চিমটি কাটছে।

হেমন্ত—কোথায় শান্তি বউদি?

আত্রেয়ী—ওই যে, জানালার কাছে..না আর নেই, পালিয়েছে।

বিকেলে বেড়াতে বের হয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সরিয়াডির সন্ধ্যা যেন ঘন হয়ে যায়, তবু দেখতে পায় আত্রেয়ী আর হেমন্ত, দূরের পাহাড়ের মাথায় তখনও মরা বিকেলের শেষ আলোর ছোঁয়াটা লেগে আছে। আজকাল সরিয়াডির রাতগুলি যেন কুয়াশামাখা স্বপ্নালুতা আর দিনগুলি ঝকঝকে উজ্জ্বলতার ছবি। শেষ রাতে কাছারিপাড়ার সেগুন গাছের গা জড়িয়ে যেটুকু কুয়াশা থাকে, সেটুকুও ভোর হতে হতেই গলে গিয়ে ঘাসের শিশির হয়ে যায়।

এ বছরে সরিয়াডির মঙ্গলবারের বাজারের এত বড় ময়দানেও নতুন ফুলকপির ঠাঁই আর ধরে না, বাজার ছাড়িয়ে নতুন ফুলকপির লাইন নয়াপাড়ার সড়কের দু'পাশ ধরে প্রায় রজনীধামের কাছাকাছি চলে যায়। হাওয়ানগর সরিয়াডির হাওয়াও বড় শান্ত। ধুলোর ঘূর্ণি নেই, আচমকা ঝড়ের হুল্লোড়ও নেই। মেঘও নেই। পিকনিকের মানুষ তিরছি নদীর পাশে খোলামেলা ডাঙার এদিকে-সেদিকে আসর জমিয়ে হাসে আর গল্প করে। রান্নার ডেকচি আনতে ভুলে গেলেও চিন্তা করে না; টিনের ক্যানেসতারাতে খিচুড়ি চড়িয়ে দিয়ে ওরা গান গায়।

সরিয়াডির যত আলো ছায়া আর শব্দের জীবনেও আর কোনও উদ্বেগ নেই। দিবাকরের কাঠের গোলাতে করাতের শব্দ সেই পুরনো ছন্দেই বাজতে থাকে। শ্রীপদবাবু ছিপ হাতে নিয়ে ছোট ঝিলের কিনারায় একেবারে সুস্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন। ফাত্‌নার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে চোখ ঢুলু-ঢুলু করে তবু সুস্থির। কাছারিপাড়াতে রেকর্ডঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়েন হাবুলবাবু। চিনুর পিসিমার কাঁচা বড়ি একবেলার রোদে শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। সরিয়াডির জীবনে কোনও সমস্যাই নেই।

কিন্তু চন্দ্রবাবুর চোখ দুটো এখনও আশ্চর্য হবার অভ্যেস ছেড়ে দিতে পারেনি। তাই মাঝে মাঝে পথে বের হয়ে পড়েন আর ব্যস্তভাবে হাঁকডাক করেন।—কী ব্যাপার গোষ্ঠবাবু? কদিন হল ঠিক নৈঋত দিক থেকে একটা ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে কেন?

আত্রেয়ী শুধু মাঝে হেমন্তকে একটা কথা বলতে গিয়ে একটু বেশি ছটফট করে ওঠে।—তুমিও যে চেঞ্জারদের মতো অস্থিরতা শুরু করে দিলে। এত যাব-যাব করছ কেন?

হেমন্ত বলে—এক মাসের জায়গায় পাঁচ মাস হয়ে গেল। সরিয়াডির কোনও বাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়ার আর বাকিও নেই। লোকে যে এবার ঘরজামাই বলে সন্দেহ করতে শুরু করে দেবে?

আত্রেয়ী—করুক।

হেমন্ত—খুড়িমা কী ভাবতে পারেন, সেটা বুঝে দেখেছ?

আত্রেয়ী—কী ভাবতে পারেন?

হেমন্ত—নিশ্চয়ই ভাবতে পারেন, হেমন্ত এখন আর সে হেমন্ত নেই।

আত্রেয়ী—না, খুড়িমা এমন একটা বাজে কথা ভাবতেই পারেন না। মা'র কাছে চিঠিতে খুড়িমা তোমাকে আরও কিছুদিন থেকে আর শরীর আরও ভাল করে সারিয়ে নিতে বলেছেন।

হেমন্ত—তোমার মতে, শরীর আরও ভাল করে সারতে কতদিন লাগবে? আরও এক বছর?

আত্রেয়ী হাসে—না; ধরো এই আর একটা মাস।

হেমন্ত—বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে, আত্রেয়ী। আমার অনেক কাজও তো আছে।

আত্রেয়ীর গলার স্বরে যেন একটা কোমল অনুরোধের ভাষা গলে পড়ে।—না, আর তোমাকে দেরি করিয়ে দেব না; শুধু আর একটা মাস।

হেমন্ত—আর একটা মাসই বা কেন?

আত্রেয়ী—সন্তুর পৈতেটা হয়ে যাক।

একদিন শান্তি, সরিয়াডির বিখ্যাত শান্তি বউদি নিজেই এসে আত্রেয়ীর কানের কাছে খুব আস্তে একটা কথা বলে দিয়ে চলে গেল—ধানোয়ার রোডের আমগাছে বোল ধরেছে, আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী—তাতে কী হয়েছে?

শান্তি—এবার একদিন ধানোয়ার রোডে বেড়াতে যাও আর গায়ে চিনি জমিয়ে হেমন্তবাবুর পাশে কিছুক্ষণ বসো। তবে তো বুঝতে পারবেন ভদ্রলোক, সরিয়াডির কেমন জিনিসটিকে তিনি পেয়েছেন।

আত্রেয়ী—এতদিন পরে কি-আর এমন নতুন কথাটি বলছ, বউদি। সেটা তো ভদ্রলোক কবেই বুঝে ফেলেছেন।

শান্তি—বেশ ভাল কবে বুঝেছেন তো?

আত্রেয়ী—হুঁ।

সন্ধে হতেই সরিয়াডির শালবনের মাথায় এক-ফালি চাঁদ আলো ছড়ায়। ধানোয়ার রোডের আমের বোলের গন্ধ নিয়ে বাতাসও থমথম করে। একবার বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে করে বইকি। আজ তো আত্রেয়ীর জীবনের কোথাও একছিটেও শূন্যতা কোনও ফাঁকি ধরে রাখেনি।

নালার কালভার্টের কাছে, সড়কের পাশে ঢালুটার ঘাসের উপর বসে হেমন্তের সঙ্গে গল্প করে আত্রেয়ী। নালার জলের পানকৌড়ির গল্প, শান্তি বউদির যত মতলবের গল্প; কিন্ডারগার্টেনের গল্প, চন্দর জ্যাঠামশাইয়ের যত হাঁকডাকের গল্প। আত্রেয়ীর পাঁচ বছরের একা জীবনটা একেবারে একলা হয়ে পড়ে থাকতে পারেনি, অনেক গল্পের সঙ্গে মেলামেশা করে আর হেসে-খেলে পার করে দিয়েছে।

সড়কের মানুষের চোখ চেষ্টা করলেও কিছু দেখতে পারবে না, কারণ ফালি-চাঁদের আলোটা খুবই ফিকে, তাই এক হাত দিয়ে আত্রেয়ীর গলা জড়িয়ে ধরে গল্প শুনতে হেমন্তরও কোনও অসুবিধে নেই।

আত্রেয়ী বলে—শুধু তিনটি বছর, কিছুই ভাল লাগত না। তোমার ওপর রাগ করে নয়, নিজেরই ভাগ্যটার ওপর রাগ করে একেবারে ঘরে বন্ধ হয়ে দিন-রাত পার করে দিয়েছি। তার পর হঠাৎ একদিন...!

হেমন্ত—বলো।

আত্রেয়ী—শ্রীলেখা কটেজ নামে সুন্দর একটা বাড়ি আছে, কালীবাড়ি রোডের শেষে ছোট রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাওয়া যায়; তুমি দেখেছ?

হেমন্ত—না।

আত্রেয়ী—ওই কটেজে এসেছিলেন কলকাতার প্রীতি বউদি আর মঞ্জু আমারই সমানবয়সী একটি মেয়ে, আর মঞ্জুর বড়দা অখিলবাবু। ওরা সবাই খুব ভাল লোক। হ্যাঁ, কিন্তু সবচেয়ে ভাল নিখিলবাবু।

হেমন্ত—কে নিখিলবাবু?

আত্রেয়ী—মঞ্জুর মেজদা।

হেমন্ত—বুঝলাম। কিন্তু নিখিলবাবু সবচেয়ে ভাল হলেন কেন?

আত্রেয়ী—যদি আবার কখনও আসেন আর তোমার সঙ্গে আলাপ হয়, তবে তুমিও বুঝতে পারবে, এরকম মহৎ মানুষ খুব কমই হয়।

হেমন্ত—তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ। নিজেই এসে কতবার আমাকে ডেকেছেন আর বেড়াতে নিয়ে গেছেন।

হেমন্ত হাসে—এই জন্যেই মহৎ? আমিও তো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াচ্ছি; কিন্তু আমি কি একটা মহৎ লোক?

আত্রেয়ী হেসে ফেলে—তুমি মহৎ হবে কেন?

হেমন্ত—কী বললে?

আত্রেয়ী—তুমি একরকমের মানুষ; নিখিলবাবু ভিন্নরকমের মানুষ। একেবারে আশ্চর্য মানুষ।

হেমন্তর একটা হাত, যে হাতটা আত্রেয়ীর গলা জড়িয়ে ধরে রয়েছে, সেই হাতেরই উপর একটা জোনাকি বসে দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। হাত নামিয়ে নিয়ে সিগারেট ধরায় হেমন্ত।

আত্রেয়ী—ভদ্রলোক খুব বিদ্বান মানুষ। দিন-রাত সব সময় গাদা-গাদা বই নিয়ে বসে থাকেন। ভুলেও কারও সঙ্গে অভদ্রতা করতে পারেন না। দুদিনের চেনা মানুষকে কত মায়া করে কথা বলতে পারেন।

আত্রেয়ীর বুকের ভিতর থেকে যেন একটা আনমনা আবেগের ঢেউ শ্রদ্ধাময় প্রশান্তির কলরোল হয়ে উথলে পড়ছে। হেমন্ত বলে—সত্যি, এরকম মানুষ হয় না।

আত্রেয়ী—সেকথাই তো বলছি। ভদ্রলোকের মনে কোনও হিসেব নেই, কারও কাছ থেকে কিছুই আশা করেন না, কিন্তু উপকার করেন।

হেমন্ত উঠে দাঁড়ায়—সত্যি, খুব মহৎ লোক। চলো এবার, বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।

ঠিকই, আকাশের কোণে সেই একফালি চাঁদ এখন আর নেই। নালার জলের পানকৌড়িকেও আর দেখা যায় না।

বাড়ি ফিরে যাবার পথেও আত্রেয়ীর নানা গল্পের মুখরতা তেমনই উচ্ছল হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে।—মঞ্জুর বোধ হয় বিয়ে হয়ে গেছে এতদিনে; এইবার নিখিলবাবুর বিয়েটা হয়ে গেলে বেশ ভাল হয়।...কিন্তু তুমি আবার সিগারেট ধরাচ্ছ কেন?

হেমন্ত—না, ভাবছি; একটু চিন্তে করতে হচ্ছে।

—কিসের চিন্তে?

—নুটু লিখেছে, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট গগন মুস্তফি মামলাতে বাদি পক্ষের সাক্ষি হবে বলেছে।

—তার মানে?

—তার মানে, আমার বিরুদ্ধে সাক্ষি দেবে।

—তাতে তোমার ক্ষতি হবে?

—শেষ পর্যন্ত ক্ষতি হয়ত হবে না, কিন্তু অনেক অসুবিধে হবে, বেশ ভুগিয়ে ছাড়বে।

—কিছ্ছু হবে না; মামলাতে শেষ পর্যন্ত তুমিই জিতে যাবে।

হেসে ফেলে হেমন্ত।—ঠিক কথা তো?

আত্রেয়ী—খাঁটি কথা; একদিন দেখতেই পাবে, আমার কথাটা ফলে গেল কিনা।

হেমন্ত—দেখা যাক।

আত্রেয়ীর কথাটা ফলে গেলে তো ভালই হয়। কিন্তু ফলবে কি? ভাইপো নুটুর লেখা শেষ চিঠিটা হাতে নিয়ে যখন বাইরের ঘরের চেয়ারে বসে, আর ল্যাম্পের আলোর তেজও একেবারে কমিয়ে দিয়ে, চুপ করে ভাবতে থাকে হেমন্ত, তখন হেমন্তের অমন টানা-মসৃণ কপালেও যেন একটা ভাঁজের রেখা ফুটে ওঠে। মামলা লড়তে আর ইচ্ছে করে না; সব ইচ্ছারই জোর যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হেঁয়ালির মত কেমন-যেন একটা খট্‌কা এসে, শুধু হেমন্তের মনটাকে নয়, হাতটাকেও ভীরু করে দিতে চাইছে।

যেন নিজেরই উপর বিরক্ত হয়ে ল্যাম্পের আলোর তেজ দপ্‌ করে বাড়িয়ে দেয় হেমন্ত। মামলার কথা ভাবতে গিয়ে এসব আবার কোন বাজে কথার দিকে চলে যাচ্ছে মনটা?

বুঝতে পারেনি হেমন্ত, আত্রেয়ী কখন এসে চেয়ারের পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। পিছন থেকেই দু'হাত দিয়ে হেমন্তের গলা জড়িয়ে ধরে আর ধমক দিয়ে হাসতে থাকে আত্রেয়ী—আমি কিন্তু তোমার নুটু ভাইপোর সব চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেব, তুমি যদি ওরকম চিন্তে-টিন্তে করতে থাক।

আত্রেয়ী যখন ওর গভীর ঘুমের মধ্যেও হেমন্তের অলস হাতটাকে নিজেই টেনে নিয়ে নিজের গলায় জড়িয়ে ধরে, তখন হেমন্তের ফাঁকা-ঘুমের উসখুসে অস্বস্তিটাও লজ্জা পেয়ে চমকে ওঠে। আত্রেয়ীর তো কোনও ভুল হচ্ছে না; তবে হেমন্তর হাতটা কেন, নিজেই ব্যস্ত হয়ে আত্রেয়ীর গলা জড়িয়ে ধরতে পারছে না?

সরিয়াডির এই পাঁচ মাসের প্রতিদিনের জীবন হেমন্তের কাছে সত্যিই যে অদ্ভুত এক বিস্ময়ের আর অদ্ভুত এক পরিতৃপ্তির জীবন। সেই বিস্ময় আত্রেয়ী, সেই বিস্ময়ের পরিতৃপ্তিও আত্রেয়ী। শুধু দু'হাত দিয়ে তো নয়, আত্রেয়ী যে সর্বক্ষণের ভাবনা দিয়ে হেমন্তকে জড়িয়ে ধরে আপন করে নিয়েছে।

কতবার শুনতে পেয়েছে হেমন্ত, ভিতরের ঘরে কাকিমার সঙ্গে যেন একটা তর্ক বাধিয়ে কথা বলছে আত্রেয়ী। —আমি বলছি, কাকিমা, এ সময়ে একগাদা মিষ্টি খাবার ওকে দিও না; খেতে পারবে না; এখন ওর ক্ষিদেই নেই।

কাকিমা—তুই কী করে জানলি যে...।

আত্রেয়ী—আমি জানি, আমি বুঝতে পারি; এখন ওর ক্ষিদে নেই।

হেমন্তর জুতো পালিশের জন্য মুচি ডাকতে বাজারে যাবে চাকর রামুয়া। কিন্তু যেতে পারে না। আত্রেয়ীই বাধা দিয়ে রামুয়াকে জিজ্ঞেস করেছে—কে বলেছে মুচি ডাকতে?

—জামাইবাবু।

—যেতে হবে না; কোনও দরকার নেই।

আত্রেয়ী নিজেই হেমন্তর তিন জোড়া জুতো পরিষ্কার করেছে আর পালিশ করেছে। কতবার চোখে পড়েছে হেমন্তর, উঠোনের মাঝখানে বসে আর গামলার জলে সাবান ফেনিয়ে নিয়ে হেমন্তর একগাদা ময়লা রুমাল আর গেঞ্জি কাচতে বসেছে আত্রেয়ী; গুনগুন করে গান গাইছে আত্রেয়ী।

হেমন্তর চোখের যত ঘুম আর তন্দ্রাও যেন আত্রেয়ীর জীবনের একটা মায়ার খেলাপাতি হয়ে উঠেছে। হেমন্তর ভোরবেলার ঘুম ভাঙাতে হলে হেমন্তর কপালে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেয় আত্রেয়ী। অসময়ের ঘুম ভাঙাতে হলে হেমন্তর হাতের একটা আঙুল মট্ করে ফুটিয়ে দিয়েই পালিয়ে যায় আর হাসতে থাকে।

আত্রেয়ীর প্রাণে ভুল নেই; কোনও সন্দেহ নেই। হঠাৎ মাথাখারাপ হয়ে একটা পাগল হয়ে গেলেও বোধ হয় সন্দেহ করতে পারবে না হেমন্ত, আত্রেয়ীর প্রাণটা কিপটেমি করে হেমন্তকে কোনও দান না-দেওয়া করে রেখে দিয়েছে, কিংবা দেবে না বলেই ইচ্ছে করে লুকিয়ে রেখেছে।

তবু, কী আশ্চর্য, এই ধানোয়ার রোডের আশেপাশে, কত নিরালার পথে পথে, সন্ধ্যার ছায়া আবছায়া আর ফিকে জ্যোৎস্নার মধ্যে আত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে আরও কতবার বেড়িয়ে ফিরে এল হেমন্ত, কিন্তু একটি বারও আত্রেয়ীর কাঁধে হাত রাখতে পারেনি। লজ্জা পেয়েছে হেমন্ত, নিজেরই উপর রাগ করেছে। বুঝতে চেষ্টা করেছে, মনটা এমন ছোট হয়ে গেল কেন?

শুধু একদিন; সেদিন সরিয়াডির স্তব্ধ দুপুরবেলার বাতাসে দূরের শালবনের ঘুঘুর স্বর হঠাৎ ভেসে যেতেই হেমন্তর কান দুটো যেন চমকে ওঠে। আত্রেয়ীরই হাসিমুখের একটা সামান্য কথাকে কেউ যেন হেমন্তর কানের কাছে চেঁচিয়ে বলে দিয়ে চলে গিয়েছে। তুমি মহৎ হবে কেন?

কিন্তু রাগ করবার তো কোনও মানে হয় না। কানে জ্বালা ধরলে চলবে কেন? কথাটা তো নেহাত মিথ্যে কিছু নয়। পাঁচ বছরের জেলখাটা কয়েদি, গাদা গাদা বই পড়তে জানে না। লোকের চোখে চমৎকার দেখাবে, হেমন্তর জীবনটা তো এমন কোনও বিস্ময় দেখাতে পারে না, পারবেও না।

আত্রেয়ীর জীবনকেও চমকে দেবার মত কোনও মহত্ত্বের কাণ্ড করে দেখাতে পেরেছে কি হেমন্ত? কিছুই না। আত্রেয়ীকে শুধু একটা পাওনা বলে ধরে নিয়েছে আর পেয়ে গিয়েছে। জয় করতে পেরেছে বলে মনে করবার কিছুই নেই; একটা গর্বের তৃপ্তি নিয়ে আত্রেয়ীর গলা জড়িয়ে ধরতে পারবে কেন হাতটা?

হেসে ফেলে হেমন্ত; এ তো অদ্ভুত বিপদ। চেষ্টা করে একটা মহৎ কাণ্ড দেখাতে পারা যায়ই বা কী করে? আত্রেয়ীর কি তবে একদিন ঝিলের জলে ডুবে যাওয়া দরকার? আর, একটা মহৎ কাণ্ড দেখাবার সুযোগ পেয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্রেয়ীকে টেনে তুলবে হেমন্ত?

ঘরে ঢুকেই আত্রেয়ী বলে—এ কি? নিজের মনেই এত হাসছ কেন?

হেমন্ত—হাসবার কথা।

আত্রেয়ী—কী?

হেমন্ত—ভাবছিলাম, তুমি ঝিলের জলে ডুবে গিয়েছ আর আমি একেবারে বীরের মত মরিয়া হয়ে একটা লাফ দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমাকে টেনে তুলেছি।

আত্রেয়ী—যত বিদ্ঘুটে চিন্তে।

হেমন্ত—কী বললে?

আত্রেয়ী—কোনওদিনও জলে ডুবব না; তোমার বীরত্ব দেখিয়ে আমাকে তোলার দরকারও হবে না; আর...।

হেমন্ত—আর কী?

আত্রেয়ী—আর, তোমার এরকম দর্প করে হাসবার সুবিধেও হবে না।

হেমন্ত হাসে—ভাল কথা।

কিন্তু হাসিটা যেন অদ্ভুত একটা আক্ষেপের মনমরা হাসি। আত্রেয়ীর চোখে আশ্চর্য-মানুষ হবার সুযোগ এ জীবনে আর হবে না। মনের গভীরে কোথায় যেন একটা অতৃপ্তির ছায়া মুখ লুকিয়ে থেকে গেল।

হেমন্তর কাছে এগিয়ে আসে আত্রেয়ী। হেমন্তর হাতটাকে তুলে নিয়ে গলা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু হেমন্তর হাতটা যেন নিতান্ত অলস উদাস একটা হাত। বেশ রাগের স্বরে ধমক দিয়ে ছটফটিয়ে ওঠে আত্রেয়ী—আঃ, কী হল? তোমার হাতটার যেন একটুও বুদ্ধিসুদ্ধি নেই।

হেমন্ত বলে—না; ভাবছি, খুড়িমাকে আর মিথ্যে কথা বলে বুঝিয়ে রাখা উচিত হচ্ছে না। আর দেরি করা ঠিক নয়। এবার কাকিমাকে একবার বলে নিয়ে যাবার জন্যেই তৈরি হও আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী—কাকিমা বলেছে, এই অমাবস্যাটা পার হয়ে যাক।

২৫

—ওই দেখো বিমল; অন্ধকারে সাপের মাথার মণি জ্বলছে।

বেশ রাত হয়েছে, কালীবাড়ি রোডের কাছে এসে সন্তুদের ঘুড়ি ওড়াবার মাঠের ওপাশে শ্রীলেখা কটেজের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলে ফেলেছে নরেন। সত্যিই, বেশ কুচকুচে কালো অন্ধকার, তার মধ্যে শুধু শ্রীলেখা কটেজের বাইরের ঘরের খোলা জানালাটা যেন জ্বলজ্বল করছে।

নরেন হাসে, বিমলও হাসে।—জ্বলুক, যত খুশি জ্বলুক।

সে রাতেই খবর পেয়ে গেল দিবাকর, শ্রীলেখা কটেজের ঘরে আলো জ্বলছে।

দিবাকর হেসে ফেলে—জ্বলুক।

শুনতে পেলেন গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবু, শ্রীলেখা কটেজের ঘরে আলো জ্বলছে। শুনেই হেসে ফেললেন।—জ্বলুক।

কবে এসেছে নিখিল সেন, তা কেউ জানে না। কবে চলে যাবে নিখিল সেন, তাও আজ আর কারও জানবার দরকার নেই। সরিয়াডির প্রাণ এখন শুধু জানতে পেরে খুশি হয়েছে যে, সন্তুর পৈতে হয়ে যাবার পর অমাবস্যা পার হয়ে গেলেই হেমন্ত আর আত্রেয়ী চলে যাবে। খোঁড়া মানুষ প্রদোষদার চোখের মত সরিয়াডির সব মানুষের চোখ বোধ হয় সেদিন স্টেশনের দিকে তাকিয়ে ছলছল করবে, কিন্তু চরম খুশির হাসিও হাসবে।

সাপের মাথার মণি নাই বা জ্বলুক, আর সরিয়াডির কেউ নাই বা জানুক কিন্তু শ্রীলেখা কটেজের বাইরের ঘরে নিখিল সেন এতক্ষণে জানতে পেরেছে, মাথাটা জ্বলছে। কেন জ্বলছে তাও বুঝতে পেরেছে।

বাঙালি ফিলসফারের লেখার উপর নিখিল সেনের শ্রদ্ধা কোনওদিনও ছিল না, আজও

নেই। তবু নেহাত অনিচ্ছা নিয়েই, বিদ্যা-জরদ্গব এক বাঙালি ফিলসফারের লেখা এই বইটা এতক্ষণ ধরে পড়েছে নিখিল সেন। কত ভয় দেখিয়ে, কত যুক্তির কচকচি করে মানুষের নকল জীবনের যত লক্ষণ ধরিয়ে দিয়েছেন পণ্ডিতমশাই। নকল জীবনেরই অহংকার নাকি সবচেয়ে বড় গলা করে বলতে পারে ভুল করি না, লোভ করি না, আর কোনও ইচ্ছেরও ধার ধারি না।

বইটাকে এক ঠেলা দিয়ে টেবিলের এক পাশে সরিয়ে দেয় নিখিল। ঘরের বাইরে এসে বারান্দার উপর ছটফট করে ঘুরে বেড়ায়।

আজই বিকেলবেলা আত্রেয়ীদের বাড়ির চাকর এসেছিল আর মালীর সঙ্গে কথা বলছিল। তার পর ধীরু খানসামার কাছে মালী যে কথাটা খুব আস্তে আস্তে বলেছে, সে কথার শব্দটা নিখিলের কানে যেন একটা চিৎকার হয়ে বেজে উঠেছে। —লেংড়াবাবুকা দামাদ আগিয়া।

ধীরু খানসামা—সেই দিদিমনির বর?

মালী—আরে হাঁ, হাঁ।

বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই সরিয়াডির যে কোনও শব্দের মধ্যে এই চিৎকারটাকেই শুনেছে নিখিল। সরিয়াডির এই কুচকুচে কালো রাতের ঝিঁঝির ডাকও যেন চিৎকার করে শুনিয়ে দিচ্ছে—আত্রেয়ীর স্বামী হেমন্ত এসেছে।

আর বুঝতে অসুবিধের কী আছে, পর-পর এই দশ দিনের মধ্যে একটি দিনও কেন আসেনি আত্রেয়ী, আর, আজও কেন এল না? এই দশ দিনের মধ্যে যদিই বা কোনও খবর না পেয়ে থাকে আত্রেয়ী, আজ তো পেয়েছে। চাকর রামুয়া কি খবরটা না জানিয়ে রেখেছে? তবু কই? সন্ধ্যা পার হয়ে গেল; এল না তো আত্রেয়ী!

পাঁচ বছর ধরে অদেখা স্বামীর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে; আত্রেয়ীর কাছে এটা যদি মস্ত বড় একটা সৌভাগ্যের ঘটনা বলে মনে হয়েই থাকে, তবে বেশ তো, সেই সৌভাগ্যের বার্তাটা খুশি হয়ে এখানেও একবার এসে জানিয়ে গেলে কি দোষ হত? না হয় স্বামী ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়েই আসত। সরিয়াডির মেয়ের মনে কি সামান্য ভদ্রতারও একটু বোধ নেই?

কৃতজ্ঞতা নামে কোনও বস্তুও কি আত্রেয়ীর প্রাণের মধ্যে নেই? স্মৃতি নামে কোনও পদার্থ নেই? সব ভুলে গেল?

ভিতরের একটা ঘরে ঘড়ির অ্যালার্ম বাজতে শুরু করেছে। এখন তা হলে রাত একটা; এখনই তবে জেগে উঠবে খানসামা ধীরু, আর পট ভর্তি করে গরম কফি বাইরের ঘরের একটা ছোট টেবিলের উপরে রেখে দিয়েই চলে যাবে।

কিন্তু তার পর মাথার জ্বালাটা কমবে কি? মন লাগিয়ে বই পড়তে পারা যাবে?

কফি খায় নিখিল, আর বুঝতেও পারে, মাথার জ্বালাটা নেই। কিন্তু বই পড়তে আর ইচ্ছেই করে না। এই বারান্দায় চুপ করে বেতের চেয়ারে বসে শুধু রাত জাগতে ইচ্ছে করে।

খোলা জানালা দিয়ে আলোর আভা বাইরে ছড়িয়ে পড়তে গিয়ে ঠিক গেটের কাছের জবাটারই কাছে একটা বাধা পেয়ে থমকে গিয়েছে আর ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে। বুঝতে অসুবিধে নেই, একটা কুয়াশার স্তবক শব্দহীন প্রলেপ হয়ে গেট আর গেটের কাছের জবাকুঞ্জকে ঢেকে ফেলেছে।

আর রাত জাগতে ইচ্ছে করে না। নিখিল সেনের মনটা যেন লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলেছে। আত্রেয়ীর উপর মিছিমিছি এত রাগ করা সত্যিই যে একটা লজ্জা। সরিয়াডির এই সামান্য কুয়াশাকে একেবারে প্রলয়ের বাষ্প বলে সন্দেহ করবার কোনও মানে হয় না।

শেষ রাতের তিনটে ঘণ্টা বেশ ভাল করেই ঘুমোতে পারে নিখিল সেন। আর, খুব ভোরে জেগে উঠেই টেবিলের উপরে স্তূপ করে সাজিয়ে রাখা নতুন বইয়ের দিকে খুশি হয়ে তাকাতে, এগিয়ে যেতে, আর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলতে পারে নিখিল। বেশ মন দিয়ে বইও পড়তে পারে; যতক্ষণ না ধীরু খানসামা এসে চা দিয়ে যায়।

বিকেল ফুরিয়ে গিয়ে যখন সন্ধ্যাটাও শেষ হয়ে যায়; তখন বুঝতে পারে নিখিল, আরও একটা সারাদিনের অপেক্ষার মন এইবার বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আজও এল না আত্রেয়ী।

ইচ্ছে হয় বইকি; বিকেলের দিকে বের হয়ে ধানোয়ার রোড ধরে এগিয়ে গেলে দেখতেই পাওয়া যাবে, হাওয়া-বদলের কত মানুষের খুশির চঞ্চলতা ছুটোছুটি করে আমলকির ঝোপের গায়ে খাব্‌লা দিয়ে দিয়ে আমলকি ছিঁড়ছে। ছোট ছেলেগুলি খরগোস দেখবার আশায় গর্তের মুখে ঢিল ছুঁড়ছে। কিন্তু সরিয়াডিতে এসে এভাবে একা-একা বেড়াতে যাওয়া নিখিল সেনের মত মানুষের জীবনের যে দুঃসহ একটা অপমান।

কিন্তু আত্রেয়ী নিশ্চয় বেড়াতে বের হয়েছে; আত্রেয়ীর সঙ্গে ওর স্বামী ভদ্রলোকও নিশ্চয় আছেন। সরিয়াডির পাহাড়ি ময়নার মত মিষ্টিস্বরে কতই না খুশির ডাক ডেকে যেন একটি ফিরে-পাওয়া হারানিধির সঙ্গে গল্প করে করে চলে যাচ্ছে আত্রেয়ী।

না, হতেই পারে না। অসম্ভব। কটেজের বাগানের এদিকে-ওদিকে সামান্য একটু ঘুরে বেড়াতে গিয়েই কি-যেন দেখতে পেয়েছে নিখিল; সঙ্গে সঙ্গে নিখিলের মনের সন্দেহটা আবার নিজের ভুলের লজ্জায় হেসে ফেলেছে।

ওই তো, বাগানের মাঝখানে রেঙ্গুনলতার পিরামিডের বুকে ফুলের মঞ্জরি দুলছে! ওখানে রেঙ্গুনলতার যত পাতার গায়ে সরিয়াডির মেয়ে আত্রেয়ীর সেই নিঃশ্বাসের ছোঁয়াটা যে এখনও লেগে আছে। নিজেই ইচ্ছে করে একা-একা এসে, একটি অবাধ আত্মসমর্পণের ছবিটি হয়ে নিখিলের কত কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল আত্রেয়ী। নিখিল সেনের সভ্য-ভব্য আত্মাটা সেদিনও ভদ্রতা ভুলে যেতে পারেনি; তাই আত্রেয়ীর হাত ধরতে পারেনি। এ সত্য কি ভুলে যেতে পারে আত্রেয়ী? কখনই না। ভুলে যাবার সাধ্যই হবে না।

কি-এমন ব্যাপার হয়েছে যে, ভুলে যাবে আত্রেয়ী? সূর্যদেখা চোখ তারার দিকে তাকিয়ে কি নতুন কোনও উজ্জ্বলতা দেখতে পায় আর আশ্চর্য হতে পারে? হেমন্ত চৌধুরীর মত পাঁচ বছরের জেলখাটা একটা মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ীর চোখ কতটুকুই তৃপ্তি পেতে পারে? হতে পারে, পাঁচ বছর আগে হেমন্ত চৌধুরীর সঙ্গে আত্রেয়ীর বিয়ে নামে একটা শাঁখ-বাজানো ব্যাপার হয়েছিল।

আত্রেয়ীর জন্য দুঃখ হয়। আত্রেয়ী এখন একটা নকল প্রাণ তৈরি করে নিয়ে, অনিচ্ছার সব জ্বালা বুকের ভিতরে লুকিয়ে রেখে একটা নতুন দুর্ভাগ্যের সঙ্গে কথা বলছে আর চেষ্টা করে হাসছে। এ যে আত্রেয়ীর একটা দুঃসহ শূন্যতার জীবন।

কিন্তু বুঝতে এত দেরি হচ্ছে কেন আত্রেয়ীর, এই শূন্যতাকে মিথ্যে করে দিতে পারে যে, সে এখন এখানেই আছে? একবার এখানে এসে দাঁড়ালেই তো বুঝতে পারত আত্রেয়ী, নিখিল সেনের মন আজ আত্রেয়ীর ভীরু প্রাণটাকে কত নির্ভয় করে দিতে পারে।

খুব সাবধান আছে নিখিল সেনের মন, আত্রেয়ীকে বুঝতে আর বিচার করতে গিয়ে যুক্তিছাড়া কোনও ধারণা যেন নিখিলের সবচেয়ে সুন্দর বিশ্বাসের উপর মিথ্যে একটা আঘাত হেনে নিখিলের জীবনের স্বস্তি নষ্ট না করে দেয়। শেষ রাতের ঘুমের স্বপ্নটাও তাই যুক্তি হারিয়ে এলোমেলো হয়ে যেতে পারে না। শুধু স্বপ্নে নয়, জেগে উঠেও নিখিল সেনের মনটা সেই বিশ্বাসেরই গুঞ্জন শুনতে পায়। না; আর যা-ই করুক আত্রেয়ী, আত্রেয়ীর নিঃশ্বাসের বাতাসে কোনও ধুলো লাগেনি। সরিয়াডির মেয়ের ওই নরম রঙিন চেহারা আজ কোনও বাজে লোকের লোভের দাবি মেনে নিতে পারে না; পারেওনি। আত্রেয়ীর কাছে হেমন্ত একটা ছায়ামাত্র; কায়া নয়।

বিকাল হয়েছে, চা খাওয়াও হয়ে গিয়েছে; এবার বাইরে একটু বেড়িয়ে আসবার জন্যেই তৈরি হয়েছে নিখিল। আট টাকা দামের আইভরি কেসের ভিতরে আটটা সিগারেট ভরে নেয়; কিন্তু তখনি চমকে ওঠে। গেটের কাছে কিসের শব্দ? আত্রেয়ী?

না, আত্রেয়ী নয়। মল্লিক ডাক্তারের এক্কাগাড়ি থেমেছে। সড়কের কাঁকরের উপর পা ঘষছে এক্কার ঘোড়া।

—তুমি কবে এসেছ নিখিল? নিখিলকে দেখতে পেয়েই হেসে হেসে জিজ্ঞেস করেন মল্লিক ডাক্তার।

—দিন পনেরো হল। আপনি কেমন আছেন?

—ডাক্তার মানুষের যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থায় আছি।

নিখিলও হাসে—তার মানে?

মল্লিক ডাক্তার—নিজের শরীরের লোকটাকে বুঝতে পারছি না, ধরতেও পারছি না। যাই হোক, মঞ্জু মা'র খবর কী?

—মঞ্জুর বিয়ে হয়েছে।

—থ্যাঙ্ক গড। খুব ভাল খবর। এখানেও এইমাত্র আর একটি ভাল খবরের পেসেন্টকে দেখে আসছি। এবার মঞ্জুকে জানিয়ে দিতে পার যে, তার প্রাণের বন্ধু আত্রেয়ীরও খবর ভাল।

নিখিল—হ্যাঁ শুনেছি, আত্রেয়ীর স্বামী জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছে।

মল্লিক ডাক্তার যেন ব্যাকুল হয়ে হাসেন—না না, শুধু তাই নয়। আত্রেয়ী এখন অন্তঃসত্ত্বা; ক্যারিং ফুল ফোর মান্থস। দেখে সুখী হলাম, কোনও কমপ্লেন নেই।

সড়কের কাঁকর ছিটকে দিয়ে মল্লিক ডাক্তারের এক্কাটা চলে যাচ্ছে। আর ছোট্ট একটা আগুনের সাপ যেন নিখিলের বুকের ভিতরে ঢুকে ছোট ছোট জ্বালার কুচি ছিটকে দিয়ে ছুটোছুটি করছে।

প্রদোষ সরকারের এই মেয়েটি তা হলে একটি মায়াঠগিনী। নিখিল সেনকে ঠকাতে পেরেই খুশি। লালচে ঠোঁট একটা চমৎকার মধুবিষের মিষ্টি মেখে নিয়ে নিখিলের গল্পের সঙ্গে হেসেছে। কাছে কাছে থেকে আর ধরা না দিয়ে দিয়ে নিখিলের চোখে মুখে বুকে শুধু মুঠো মুঠো পিপাসা ছুঁড়ে দিয়েছে।

দাম বাড়াবার কায়দা জানে সরিয়াডির মেয়ে এই আত্রেয়ী। এ মেয়েকে প্যারিসের রাতের সোসাইটির ক্লাবের ঘরে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়; একটুও ঘাবড়ে যাবে না ওর ফাঁকা হাসির ঠাট ঠমক আর ঝংকার, লতিয়ে লতিয়ে গা দোলাবার ভঙ্গি, আর মিথ্যে আশ্চর্যের ছায়া দিয়ে চোখের কালো নিবিড় করা চাহনি; সবারই মাথা ঘুরিয়ে ছেড়ে দেবে।

কিন্তু মানুষের বুকে তৃষ্ণা মাতিয়ে দিতে এত কায়দাকুশল হয়েও ওর কী লাভটা হল? কী পেল আত্রেয়ী? শেষে তো হেমন্ত নামে একটা সামান্য মানুষের বুকের কাছে বেহায়া হয়ে শুয়ে পড়তে হল।

আত্রেয়ীকে চিনতেই ভুল হয়েছে। সেই বোকা-বোকা লাজুক চেহারা দেখে সন্দেহই করতে পারেনি নিখিল, ওটা সরিয়াডির একটা সস্তা জংলি লতার চেহারা। ঘিয়ে রঙের সিল্কের শাড়ি দিয়ে জড়ানো ওই শরীর কারও হাতের ভদ্রতার ছোঁয়া বোঝে না, পছন্দও করে না। থাবা পছন্দ করে। জোর করে চেপে ধরা দাবির কাছে ছিঁড়ে গিয়ে খুশি হয়।

স্নান সেরে নিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নেয় নিখিল। আর, বোধ হয় সরিয়াডির এই দুপুরের স্তব্ধতারই সঙ্গে মিশে থাকবার জন্যে ঘুমোতে চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুমোবার সাধ্যি নেই। নিখিলের শরীরের সব স্নায়ু আর শিরা জড়িয়ে ধরে একটা নিঃশ্বাস আক্ষেপ করে এইবার কি-যেন বলতে চাইছে। তিরছি নদীর খাতের কাছে, বুনো খেজুরের ছায়ার পাশে সেই নিরালায় অমন চুপটি করে বসে পায়ের আঙুলের জখম বাঁধার সুযোগ আত্রেয়ীকে দেওয়া হল কেন? জোর করে কোলে বসিয়ে নিয়ে আত্রেয়ীর পায়ের আঙুলের রক্তমাখা জখমটাকে হাত দিয়ে চেপে ধরতে পারেনি কেন নিখিল?

রেলের জমির সীমানার সেই কাঁটাতারের বেড়াটা আত্রেয়ীকে পার করিয়ে দিতে কী অসুবিধে ছিল? ছল-ভীরুতার সেই সাংঘাতিক নারীকে দু হাত দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে

আর বুকের উপর তুলে নিয়ে বেড়াটার ওপারে নামিয়ে দিলেই তো ভাল হত। খুশি হত, ধন্য হয়ে যেত সরিয়াডির মেয়ে।

কিন্তু আত্রেয়ী তো ভুল করেনি। ভুল করেছে নিখিলেরই একটা মূর্খ ধৈর্য। আত্রেয়ীর প্রাণটা সেদিন যে তৃপ্তি পেতে চেয়েছিল তা পায়নি। দিতে ভুলে গিয়েছে নিখিল। জ্যোৎস্নামাখা একটি উপহার হয়ে নিখিলের কাছে নিজেই এসেছিল, আর বাগানের নিরালাতে রেঙ্গুনলতার কাছে দাঁড়িয়ে নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে সবই দিতে চেয়েছিল আত্রেয়ী। নিতে ভুলে গিয়েছে নিখিল।

আত্রেয়ীর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। আত্রেয়ীকে একবার বলে দেওয়াই উচিত, ভুল হয়ে গিয়েছে, কিছু মনে করো না। কিন্তু আর ভুল হবে না। আমি শুধু দু'দিনের পথিক হয়ে তোমার কাছে এসে দাঁড়ালেও তোমার আশার জীবনে আমার চেয়ে বড় আর কেউ ছিল না, এখনও নেই।

আর দেরি করে না নিখিল। দেরি করবার সাধ্যিও বোধ হয় আর নেই। সরিয়াডির মেয়ের অভিমান শান্ত করে দেবার জন্য নিখিলের এই নিঃশ্বাসটা যে ভয়ানক ছটফট করছে, কিছুতেই শান্ত হতে চাইছে না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। প্রদোষ সরকারের বাড়ির কাঁটালতার উপর বসে এখনও শালিক ডাকছে।

রাধাপুর থেকে রেল-পার্সেল হয়ে লিচুর তিনটে ঝুড়ি স্টেশনে এসে পড়ে আছে। সেই পার্সেল ছাড়িয়ে আনতে স্টেশনে গিয়েছে হেমন্ত। ফিরে এসেই আত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে দিবাকরের বাড়িতে চা খেতে যাবে হেমন্ত। ঢিলে খোঁপাতে সাদা গন্ধরাজ গুঁজে দিয়ে আর সাজ সেরে তৈরি হয়েই আছে আত্রেয়ী।

প্রদোষ সরকারের বাড়ির বারান্দাতে আবার সেই দুটি কথার ধ্বনি বেজে ওঠে। —আমি নিখিল।

চমকে ওঠেন কাকিমা। প্রদোষ সরকারের চোখের তারা আর নড়ে না। শালিকটাও ডাক বন্ধ করে দেয়।

আত্রেয়ী কিন্তু ব্যস্ত খুশির একটি মূর্তি হয়ে ছুটে গিয়ে বাইরের বারান্দায় দাঁড়ায় আর হেসে ওঠে।—আপনি এসেছেন?

নিখিল হাসে—এসেছি বৈইকি। কিন্তু এসে কি কোনও অপরাধ করলাম?

আত্রেয়ী—একটুও না। আপনার এরকম কথার কোনও মানেই হয় না।

নিখিল—কথাই তো ছিল, আমি মাঝে মাঝে আসব; আর দেখাও হবে।

আত্রেয়ী—নিশ্চয় আসবেন, দেখাও হবে বইকি। মঞ্জুর খবর কী? বিয়ে হয়ে গিয়েছে?

নিখিল—হ্যাঁ। কিন্তু আরও একটা কথা বলবার ছিল।

আত্রেয়ী—বলুন।

নিখিল—এখানে নয়; কটেজে চলুন।

নীরব হয়ে নিখিলের মুখের দিকে যেন অদ্ভুত বিস্ময়ের একটা তন্দ্রা নিয়ে আত্রেয়ীর কালো চোখের তারা দুটো শিথিল হয়ে তাকিয়ে থাকে।

নিখিল ডাকে—চলুন।

নিখিলের চোখের দৃষ্টিটাও যেন অপলক হয়ে বলতে চাইছে—যেতেই হবে।

আত্রেয়ী বলে—চলুন।

কাকিমা আর দরজার আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। বাইরে এসেই আত্রেয়ীকে বেশ রূঢ় স্বরে ধমক দিয়ে কথা বলেন।—কী হচ্ছে? কোথায় যাচ্ছিস?

আত্রেয়ী—এখনি আসছি।

কাকিমা—হেমন্ত জিজ্ঞেস করলে কী বলব?

আত্রেয়ী—বলবে, আমি এখনি আসছি।

চলে গেল আত্রেয়ী আর কটেজের নিখিল সেন। কাকিমার চোখ দুটো যেন পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কসাইয়ের গরুও এমন করে খুশি হয়ে নাচতে নাচতে পিলখানার দিকে ছুটে যায় না; কিন্তু আত্রেয়ী যাচ্ছে।

জপের মালা থামিয়ে ঘরের ভিতর থেকে মণিদিদা বলেন—ও আপদ আবার কোথা থেকে এল, সুহাস? আত্রেয়ীকেও কি মরণ ভুলে পেয়েছে? কোন লজ্জায়, কোন সাহসে আজ বাইরের লোকটার সঙ্গে চলে গেল?

কাকিমা আর কথা বলেন না। কোনও কথা বলবার শক্তিই নেই। পুজোর ঘরের মেঝের উপর শুয়ে পড়ে থাকেন। আত্রেয়ীর মা, শ্বাসকষ্টের সেই মানুষটা তো আগেই একটা মূর্চ্ছা নিয়ে সেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছেন।

শালিক আর ডাকেনি। কে জানে কতক্ষণ ধরে একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছে শালিকটা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে গেল। প্রদোষ সরকারের বাড়ির কোনও ঘরে আলো নেই।

চোখে দেখতে পান না মণিদিদা, তাই দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েই কথা বলেন।—ছি ছি, এ কী হল? দিবাকরকে ডেকে ওই সর্বনেশে কটেজে এখনি একবার যেতে বলো, সুহাস। মেয়েটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুক। হেমন্ত এসে জানতে পেলে যে আগুন জ্বলে উঠবে।

কার সঙ্গে এসব কথা বলছেন অন্ধ মণিমাসী? চমকে উঠলেন কাকিমা। আতঙ্কিতের মত পুজোর ঘর থেকে বের হয়ে বাইরের বারান্দায় নিজের চোখেই দেখতে পেলেন, গেটের তিন-কাঠের বেড়াটাকে একটা লাথি মেরে সরিয়ে দিল হেমন্ত।

আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে নিল। তার পর হাতের ছাতাটাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে হেমন্তর মূর্তিটা হনহন করে হেঁটে চলে গেল। ছাতাটাকে সত্যিই যে একটা খুনখারাপি হাতিয়ার বলে মনে হয়।

—রামুয়া, ও রামু, শিগগির একবার যাও, দিবাকরকে একটা খবর দাও; বলো গিয়ে আমি ডাকছি। একটুও দেরি না করে এখুনি যেন চলে আসে।

কিন্তু বাড়িতে রামুয়া নেই। কাকিমা শুধু উদ্‌ভ্রান্তের মত ডাকাডাকি করে হাঁপাতে থাকেন।

খুব মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে। বিদ্যুতের ঝিলিক ছুটছে। বেশ ঠাণ্ডা বাতাসের একটা ঝড়ও যেন শনশনিয়ে জেগে উঠেছে।

সামনের রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে যারা জোর পা চালিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে তাদের কারও মুখ চিনতে পারা যাচ্ছে না। কাকিমা তবু গলাভাঙা স্বরে একটা আর্তনাদ তুলে ডাকতে থাকেন। —ও বলাই। ও পরেশ। কে যাচ্ছ তুমি? একবার শুনে যাও।

কিন্তু ওরা কেউ বলাই নয়; পরেশও নয়। যারা যাচ্ছে, তারা কাকিমার এই ক্ষীণ আর্তনাদ শুনতে পায় না। নয়ত, বুঝতেই পারে না। আজ সরিয়াডির বাতাসের এই ঝড় যেন ইচ্ছে করেই কাকিমার আর্তস্বরের সব আবেদন উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মিথ্যে করে দিচ্ছে। যেন কেউ শুনতে না পারে; যেন কেউ ছুটে না আসে। আত্রেয়ী আজ ওরই একলা প্রাণের সম্বল নিয়ে যা ইচ্ছে হয় তাই করুক।

কিন্তু কাকিমা যে একটা দুঃস্বপ্নের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন। রাধাপুরের সাত-আনির হাত যে শানানো রাম-দা তুলে ধরতে একটুও কাঁপে না। জীবনের ঝঞ্ঝাট শুধু এক কোপে শেষ করে দিতেই জানে; আর কোনও নিয়ম জানে না। আজ হেমন্তর কাছে আত্রেয়ীর এই ভুলের ক্ষমা নেই। সরিয়াডির আকাট মুখ্খু মেয়ে যে এখনি একটা রক্তমাখা লাশ হয়ে পড়ে যাবে।

রাস্তার অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা সাইকেল ছুটে চলে যাচ্ছে। কাকিমা চেঁচিয়ে ডাক দেন—ও নরেন! ও নরেন!

কিন্তু ওটা নরেনের সাইকেল নয়।

দিবাকরের বাড়িতে ছুটে যাবার জন্য চেষ্টা করতে গিয়েও .প্তে পারলেন না; দুই পায়ের দুই হাঁটুর হাড়ের গিঁটগুলি যেন খুলে আলগা হয়ে গিয়েছে। মেজের উপর ধপ্ করে বসে পড়লেন, আর, একটা প্রাণহীন অস্তিত্বের মত একেবারে নিথর হয়ে গেলেন কাকিমা।

২৬

শ্রীলেখা কটেজের বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। টেবিলের একদিকে নিখিল, আর মুখোমুখি অন্যদিকে আত্রেয়ী। আত্রেয়ীর খোঁপার গন্ধরাজের দিকে তাকিয়ে কথা বলে নিখিল।—ওটা কি টাটকা গন্ধরাজ?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ, এই তো, সন্ধে হবার একটু আগে তুলেছি।

নিখিল হাসে—দেখে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু সত্যিই তো নয়।

আত্রেয়ী—কী বললেন?

নিখিল—মল্লিক ডাক্তার নিজেই একটা খবর শুনিয়ে দিয়েছেন, তাই জানতে পেরেছি।

মাথা হেঁট করে আত্রেয়ী। চোখ দুটো শিউরে ওঠে। আর, মুখের হাসিটা যেন লজ্জারক্ত একটা আলো হয়ে ছলকে ওঠে।

নিখিল—আমি বোধ হয় কালই চলে যাব। কাজেই আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

আত্রেয়ী—আমরাও বোধ হয় আর দু'তিন দিন পরেই চলে যাব।

নিখিল—তা হলে বুঝুন, আজ আমাদের দু'জনের এই দেখাই শেষ দেখা।

আত্রেয়ী—তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু আবার হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে যেতে পারে।

নিখিল হাসে—হয়ত হতে পারে। কিন্তু আমাকে দেখবার জন্যে আপনার মনে আর কি কোনও ইচ্ছে কিংবা আশা থাকবে?

আত্রেয়ী—থাকবে বইকি।

নিখিল—আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না; ভাবতে আপনার একটু কষ্টও হচ্ছে বোধ হয়।

আত্রেয়ী—হ্যাঁ।

নিখিল—আমাকে কি কখনও ভুলে যেতে পারবেন?

আত্রেয়ী—না।

নিখিল—এই যে আমি, আপনার দু'দিনের চেনা একটা মানুষ হয়েও বার বার এসে শুধু দু'দিনের আনন্দের জন্য আপনাকে সঙ্গে নিয়ে এত বেড়ালাম, সে সব কথা মনে থাকবে তো?

আত্রেয়ী—থাকবে।

নিখিল—সবই ভাল লেগেছিল?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ।

নিখিল—আমাকে কখনও ভাল লেগেছিল?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ।

নিখিল—এখনও কি ভাল লাগে?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ।

নিখিল—এত স্পষ্ট করে আগে কোনওদিন বলেননি কেন?

আত্রেয়ী—বলবার দরকার কী? আপনি তো বুঝতে পারেন।

নিখিল—কিন্তু আপনি কি বুঝতে পারতেন না?

আত্রেয়ী—কী?

নিখিল—আপনাকেও আমার খুব ভাল লাগে।

আত্রেয়ী—বুঝতাম।

নিখিল—এখনও তো ভাল লাগছে।

চমকে উঠেছে আত্রেয়ী। কিন্তু মাথা হেঁট করে নয়; চোখ তুলে সোজা নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়—ভালই তো।

নিখিল সেনের বুকের মরুপিপাসা এইবার জলভরা মেঘের ডাক শুনতে পেয়েছে। মেয়ের মুখের ভাষায় আর গলার স্বরে কোনও ভীরুতা কুণ্ঠা কৃপণতা নেই। কথাটা ীর প্রাণের গোপনের একটি সঙ্কেতের ধ্বনি হয়ে বেজে উঠেছে।

আর দেরি করতে ইচ্ছে করে না। দেরি করে লাভই বা কী? আত্রেয়ীর খোঁপার ওই গন্ধরাজ হাতের এক টানে ফেলে দিয়ে রেঙ্গুনলতার একটা মঞ্জরি পরিয়ে দিলেই তো হয়। তার পর সরিয়াডির মেয়ের ওই লালচে ঠোঁট দুটো ফুলে-ফুলে কাঁপবে আর নিবিড় এক ইচ্ছার ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।

নিখিল—আর একটা কথা জানতে চাই।

আত্রেয়ী—বলুন।

নিখিল—হেমন্তবাবু কি আপনার কাছে একটা আশ্চর্য মানুষ?

আত্রেয়ী হাসতে চেষ্টা করে; কিন্তু হাসিটা যেন একটা ব্যথার বাধা পেয়ে ঠোঁটের ফাঁকে আটকে থাকে। কথা বলতে পারে না।

নিখিল—বলুন না? চেপে রেখে লাভ কী?

আত্রেয়ী—উনি আশ্চর্য মানুষ হবেন কেন?

নিখিল—তবে।

আত্রেয়ী—মানুষ যেমন হয় তেমনই একজন মানুষ।

নিখিল হাসে—নিশ্চয় আমার চেয়ে অনেক-অনেক উঁচুদরের মানুষ।

আত্রেয়ী—ঠাট্টা করছেন কেন? আমি কি সে কথা বলছি? আপনার সঙ্গে কি কারও তুলনা হয়?

নিখিল—তবে?

নিখিলের চোখের দৃষ্টিটা বড় তীব্র, যেন আত্রেয়ীর হৃৎপিণ্ডের দিকে তাকিয়ে দেখছে আর কি জানতে চাইছে নিখিল।

আত্রেয়ীর চোখের তারা ছটফট করে।—বলেছিই তো, আপনার মত মহৎ মানুষ আমি কখনও দেখিনি। বার বার জিজ্ঞেস করেন কেন?

নিখিল—আর হেমন্তবাবু?

আত্রেয়ী—তার কথা ছেড়ে দিন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নিখিল। এগিয়ে যায়। আত্রেয়ীর কাছে দাঁড়ায়। আত্রেয়ীর চেয়ারের কাঁধের উপর হাত রাখে। একেবারে নীরব হয়ে, শুধু উষ্ণ নিঃশ্বাসের একটা বাতাস ছড়িয়ে দিয়ে সরিয়াডির মেয়ের মাথার ঢিলে খোঁপার দিকে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ হাত তুলে দেয়ালের গায়ে আলোর সুইচটাকে চেপে ধরে নিখিল সেন। খুট্ করে একটি শব্দ বেজে ওঠে। শ্রীলেখা কটেজের বাইরের ঘর অন্ধকারে ভরে যায়।

কিন্তু নিতান্ত ব্যর্থ অন্ধকার। একটা অধঃপতিত দুঃসাহসের অন্ধতা মাত্র। সরিয়াডির মেয়ে আত্রেয়ী সেই মুহূর্তে নিজেই যেন চকিত বিদ্যুতের মত একটা জ্বালা হয়ে ঘরের অন্ধকার ঝলসে দিয়েছে। আত্রেয়ী নিজেরই হাতে সুইচ টিপে ঘরের আলো তখুনি জ্বেলে দিয়েছে।

সুইচের উপরে একটা হাত শক্ত করে চেপে রেখে আর জ্বলন্ত দু'টো চোখ তুলে নিখিলের মুখের দিকে তাকায়।

আত্রেয়ী—মহত্ত্ব দেখাচ্ছেন?

কিন্তু নিখিল সেনের দুই চোখের তারা একেবারে নিশ্চল হয়ে গিয়ে, ভয়ানক অর্থহীন ও মূর্খ একটা জংলি বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে থাকে; জ্বলছে সরিয়াডির এই মায়ানাগিনীর চোখ।

হাত কাঁপে নিখিলের; তবু সিগারেট ধরায়। আর, দুই চোখ যেন একটা কুটিল শ্লেষে পিছল হয়ে গিয়ে চিকচিক করে কাঁপতে থাকে।—খুব যে থিয়েটার দেখাচ্ছেন।

আত্রেয়ী—বেশ করছি।

নিখিল—থিয়েটার দেখাবেন আপনার ভদ্রলোকের কাছে, আমার কাছে নয়।

আত্রেয়ী—সে জন্য আপনার উপদেশের কোনও দরকার নেই।

নিখিল—সেদিন চোখে মুখে চাঁদের আলো মেখে একা-একা নিখিল সেনের চোখের কাছে একেবারে একটি নৈবেদ্য হয়ে কেন এসেছিলেন?

আত্রেয়ী—ইচ্ছে হয়েছিল।

নিখিল—সেদিন নিখিল সেন যদি হাত চেপে ধরত, কী করতেন আপনি?

আত্রেয়ী—কিছুই বলতাম না।

নিখিল—তবে?

আত্রেয়ী—চেপে ধরলেন না কেন? তা হলে তো বুঝতেই পারা যেত...।

—কী বুঝতেন?

—বুঝতাম, মহৎ না হলেও আপনি একটা মানুষ।

—আজ কী বুঝলেন? আমি একটা অমানুষ?

—একটা ভয়ানক নকল মানুষ।

—আপনি তা হলে কী?

উত্তর দেয় না আত্রেয়ী। বাইরে যাবার দরজাটার দিকে তাকায়। নিখিল সেনের গলার স্বরে ছোট্ট একটা গর্জন শিউরে ওঠে।—যাবেন না।

আত্রেয়ীর চোখে একটা ভ্রুকুটি শিউরে ওঠে।—ছিঃ, কোথায় নেমেছেন আপনি।

নিখিল—আমাকে এভাবে অকারণে অপমান করে গেলে আমিও কিন্তু আপনার সারাজীবনের আশা-আহ্লাদ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেব।

আত্রেয়ী—কিছুই করতে পারবেন না।

নিখিল—সরিয়াডির মেয়ে যে একেবারে সাহসের দেবীর মত কথা বলছেন।

আত্রেয়ী—সাহস আছে বলেই বলতে পারছি।

নিখিল—সাহস করে হেমন্তবাবুর কাছে বলে দিতে পেরেছেন কি, কেন সেদিন একা-একা এই কটেজে এসে নিখিল সেনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন?

আত্রেয়ী—বলবার দরকার হয় না।

নিখিল—আমি যদি বলে দিই, তবে কী হবে? দাঙ্গাবাজ জমিদার যে রামদা'র এক কোপে এরকম একটি খাঁটি পতিব্রতা পত্নীর গলা কেটে দু'টুকরো করে দেবে।

আত্রেয়ী—ভালই হবে।

নিখিল—কী বললেন?

নিখিল সেনের এই ক্ষিপ্র মুখরতার সঙ্গে আর তর্ক করতে চায় না আত্রেয়ী। কোনও কথা না বলে খোলা দরজার দিকে ছুটে চলে যায়।

কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হয়। বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে আছে হেমন্ত।

খুব জোরে বৃষ্টি ঝরিয়ে গরগর করছে সরিয়াডির মেঘ। দম্‌কা বাতাসে বৃষ্টির জলের গুঁড়ো ছুটে এসে এই খোলা দরজার কাছে ছিটকে পড়েছে। কিন্তু ঝুঁকে পড়েছে আত্রেয়ীর মাথাটা।

আত্রেয়ী বোধ হয় আর নড়তে পারবে না। ভয় নয় লজ্জাও নয়, চিরকালের মত মুছে যাবার

আগে শুধু একটু ধৈর্য। লুকোবার ঢাকবার আর কিছুই নেই। আর চেষ্টা করবারও কিছু নেই। এখন শুধু যদি হেমন্তের ঘৃণার আক্রোশটা চরম পুরস্কার হয়ে ছুটে এসে আর ক্ষমাহীন হাতে আত্রেয়ীর গলা টিপে ধরে আত্রেয়ীকে চরম ছুটি দিয়ে দেয়, তা হলেই মুক্তি পাওয়া হয়ে গেল। চুপ করে, শান্ত হয়ে, যেন মাথা পেতে দাঁড়িয়ে থাকে আত্রেয়ী।

—চলে এসো আত্রেয়ী। হেমন্ত ডাকে।

মুখ তুলে হেমন্তর দিকে তাকায় আত্রেয়ী। হাসছে হেমন্ত, হাত তুলে ডাকছে হেমন্ত। আত্রেয়ীকে মরণ ঝিলের জল থেকে তুলে নেবার জন্য একটি আশ্চর্য মানুষের হাত ছটফট করছে। হাসিটাও যে বেশ দর্প করেই হাসছে।

এগিয়ে যায় আত্রেয়ী। আত্রেয়ীর একটা হাত ধরে বারান্দা থেকে নেমে যায় হেমন্ত। ছাতাটা খুলে ধরে।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে নিখিল সেন চেঁচিয়ে ওঠে।—আপনার কাছে একটা কথা বলবার ছিল, মশাই।

হেমন্ত মুখ ফিরিয়ে তাকায়।—আমার কাছে?

নিখিল—হ্যাঁ।

হেমন্ত—না; কিছ্ছু না, আপনার কিছুই বলবার নেই।

হেসে ফেলে আত্রেয়ী। এক হাতে ছাতা, আর এক হাতে আত্রেয়ীর গলা জড়িয়ে হেমন্তও হাসতে থাকে—স্টেশনে গিয়ে মিথ্যে হয়রান হলাম। লিচুর ঝুড়ি আজও এসে পৌঁছয়নি।

শ্রীলেখা কটেজের গেট পার হয়ে কাঁকরের রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে নয়াপাড়ার সড়কের ল্যাম্পপোস্টের কাছে আসতেই চমকে হেসে ওঠে আত্রেয়ী— এবার হাতটা একটু নামাও।

হাত নামায় হেমন্ত, কারণ রাস্তার ওদিক থেকে আর একটি ছাতা একেবারে সামনেই এসে পড়েছে।

চেঁচিয়ে উঠলেন চন্দ্রবাবু—কে? আত্রেয়ী নাকি?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ জ্যাঠামশাই।

চন্দ্রবাবু—তোমার সঙ্গে উনি কে? জামাইবাবাজি নাকি?

আত্রেয়ী মুখ টিপে হাসে—হ্যাঁ; আপনার কোলে ওটি কে?

চন্দ্রবাবু—আমার নাতি। মল্লিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম, পায়ে ফোঁড়া হয়েছে।

আত্রেয়ী—কিন্তু নাতি যে ঘুমিয়ে পড়েছে, একটু শক্ত করে ধরুন।

চন্দ্রবাবু—শক্ত করেই তো ধরে আছি।

জোর বৃষ্টির সঙ্গে ঝুরঝুর করে শিলা ঝরছে আর ছাতার উপর আছাড় খেয়ে সাদা খইয়ের মত ছিটকে পড়ছে।

চেঁচিয়ে ডাকতে থাকেন চন্দ্রবাবু—কী ব্যাপার। কী আশ্চর্য। ওহে, ও দিবাকর? আজ হঠাৎ এত শিলাবৃষ্টি কেন?

বর্ণালী

আর মাত্র একটি বাড়ি আছে, সে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হয়ে গেলে এই রাস্তায় নিমন্ত্রণ করবার মত আর কোনও বাড়ি থাকে না। বাকি আছে শুধু নগেন বাবুর বাড়ি।

একটা ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে হাতের একটা কাগজের উপর চোখ বোলায় অশেষ। কাগজটা হল এই রাস্তার সেই সব ভদ্রালোকদের নাম আর বাড়ির ঠিকানার একটা তালিকা, যাঁদের নিমন্ত্রণ করতে চান ত্রিদিববাবু। আগামীকাল রাত্রি আট ঘটিকায় ত্রিদিববাবুর মেয়ের বিয়ে। এপাড়া আর ওপাড়ার অনেক বাড়িতে ত্রিদিববাবুর নিমন্ত্রণের অনুরোধ নিয়ে অনেক লোক আজ বিকাল থেকে ছোটাছুটি করছে। ত্রিদিববাবুর স্ত্রী নিজেও একটা গাড়ি নিয়ে বের হয়েছেন। কাছাকাছি পাড়ার বিশেষ বিশেষ চেনা শোনার সম্পর্ক আর সমাদরের বাড়িতে তিনি নিজে গিয়ে মেয়েদের নিমন্ত্রণ করে আসবেন।

কলকাতা শহরের আরও কত জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। ত্রিদিবাবুর আত্মীয়-কুটুম্ব আছে, অতি ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব আছেন। তা ছাড়া অফিসের ভদ্রলোকেরাও আছেন। নিমন্ত্রণ করার পালা তিনদিন আগেই শুরু হয়েছে।

দূরের নিমন্ত্রণগুলি একটু আগে আগে সেরে রাখা হয়েছে। কাছের নিমন্ত্রণগুলি আজ সেরে ফেললেই চলবে। কিন্তু কাছের নিমন্ত্রণের সংখ্যাও তো কম নয়। কম করেও আড়াইশো বাড়ি হবে। খুব ঘটা করে আর খুব খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন ত্রিদিববাবু।

ঢাকুরিয়ার এই পাড়া, যে পাড়ায় ত্রিদিব সরকারের বাড়ি, সেটা সব চেয়ে পুরনো পাড়া না হলেও চেহারার দিক দিয়ে কম পুরনো নয়। এই পাড়ায় যেমন সারি সারি তিনতলা বাড়ি আছে, তেমনই সারি সারি একতলা বাড়িও আছে, যেগুলির গায়ে পলেস্তারার চিহ্ন নেই। বড় বড় গ্যারেজে যেমন বড় বড় শৌখিন গাড়ি দেখা যায়, তেমনই ছোট ছোট মুড়ি মুড়কির দোকানও দেখা যায়; আর ময়লা চেহারার রিক্সাগুলিও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

নকুলেশ্বরতলা পার হয়ে কালী মিস্তির লেনের বাড়িগুলিতে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছে শম্ভু। কসবার দিকে এগিয়ে যেয়ে বাজারের পাশে ফ্যাক্টরি রোডের বাড়িগুলিতে নিমন্ত্রণ করবার ভার পেয়েছে বিমল আর লক্ষ্মীচরণ। বুদ্ধমন্দিরের দিকে গিয়েছে নারায়ণ। আর এই পুরনো বাগান স্ট্রিটের বাড়িগুলিতে নিমন্ত্রণের দায়িত্ব নিয়েছে অশেষ; যার মেসোমশাই হন ত্রিদিববাবু।

খুব এলোমেলো এই পুরনো বাগান স্ট্রিট। ত্রিদিববাবুর বিরাট বাড়িটা হল এই স্ট্রিটের এক নম্বর, তার পাশেরটা তেত্রিশের ঊনিশ। রাস্তাটার আবার নানা শাখা রাস্তা আছে, গলি আছে। সবই কিন্তু পুরোন বাগান স্ট্রিট।

তবুও বাড়িগুলিকে খুঁজে নিতে বিশেষ কোনও অসুবিধে হয়নি। যদিও অশেষ এপাড়ার মানুষ নয়, এবং এই রাস্তার এত শাখা-প্রশাখার ভিতরে কোনওদিন আসেনি। বাইশ নম্বর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হয়ে যেতেই, বাইশ নম্বর বাড়ির ধীরাজবাবুর কাছ থেকে জেনে নিতে পেরেছে অশেষ, পঁচিশ নম্বরটা কোন দিকে আর কতদূরে হবে।

নামের তালিকার উপর লাল পেন্সিলের দাগ দিয়েছে অশেষ। না, আর কোনও বাড়ি বাকি নেই। শুধু বাকি ওই একটি বাড়ি, নগেনবাবুর বাড়ি, যার নম্বর হল একচল্লিশ।

ঊনচল্লিশ নম্বরের ছেলেটি বলে দিল, আরও অনেক এগিয়ে যেতে হবে। বাঁদিকের ওই সরু রাস্তার ভিতরে ঢুকতে হবে। তারপরে একটা ল্যাম্পপোস্টের কাছেই একচল্লিশ নম্বর নগেনবাবুর বাড়ি। ইনকাম ট্যাক্সের ইনস্পেক্টর নগেনবাবু।

আলিপুরের নিউপার্ক রোড আর ঢাকুরিয়ার এই পুরোনো বাগান স্ট্রিট; কত পার্থক্য। অশেষের মত ছেলে, আলিপুর একটা পরিচ্ছন্ন এলাকায় যার বাড়ি, আর সকাল -সন্ধ্যা নিউ পার্ক রোড দিয়ে যাওয়া আসা করা যার অভ্যাস, তার পক্ষে ঢাকুরিয়ার বিচিত্রজটিল পুরনো বাগান স্ট্রিটের এলোমেলো ধাঁধার মধ্যে ঘুরে বেড়ানো বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার বৈকি। সন্ধ্যা থেকে হাঁটা শুরু হয়েছে, এবং রাত প্রায় নটা হতে চলল; সত্যিই অশেষের নিঃশ্বাসে হাঁপ ধরে এসেছে। ঘুরতে আর ভাল লাগে না। কিন্তু উপায় নেই; মেসোমশাই এর অনুরোধ এড়ানো যায় না। এড়ানো উচিতও নয়! আপন জন বলতে যারা আছে, তারা এসময় এত বড় একটা কাজের ব্যাপারে একটু সাহায্য না করলে কাজের ব্যাপারটা ভালমত চুকে যাবেই বা কী করে!

জোরে হাঁপ ছেড়েই দেখতে পায় অশেষ, হ্যাঁ, একটু দূরে যে বাড়িটার দেয়াল ঘেঁষে একটা ল্যাম্পপোস্ট দাঁড়িয়ে আছে, সেই বাড়িটা নগেনবাবুর বাড়ি হতে পারে।

এগিয়ে যায় অশেষ, এবং এইবার একটা আরামের হাঁপ ছাড়ে । ল্যাম্পপোস্টে মাথা থেকে যে আলো বাড়ির দরজার মাথার উপর পড়েছে, সেই আলোতেই দেখা যায়, দরজার মাথার উপর আর ফ্যাকাশে একটা সংখ্যা, একচল্লিশ নম্বর।

দরজার কড়া নাড়ে অশেষ। খুলে যায় দরজা।

—আঃ, শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেল। আপনাদের এই রাস্তার বাড়ির নম্বরগুলি বড় এলোমেলো।

স্বচ্ছন্দে ঘরের ভিতর ঢুকে, হাতের কাগজের দিকে তাকিয়ে স্বচ্ছন্দে কথা বলে অশেষ। কার সঙ্গে কথা বলছে, সেটা ভাল করে তাকিয়ে যেন বুঝতে চায় না অশেষ। তাড়তাড়ি নিমন্ত্রণটা জানিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারলে হয়। তারপর বিয়ে বাড়ির হট্টগোলের ভিতর ফিরে গিয়ে এক কাপ চা খেতেই হবে। রাত হয়েছে বলে চা খেতে দিতে আপত্তি করবেন মাসিমা। অগত্যা নিজের হাতেই চা তৈরি করে নিতে হবে। সন্ধ্যার পর অন্তত চার-পাঁচ কাপ চা খাওয়া যার অভ্যাস, সে মানুষের প্রাণটা যে এই তিন ঘন্টা হাঁকাহাকির পর চা-এর জন্য আইঢাই করতে শুরু করে দিয়েছে।

কাগজের নামের তালিকায় লেখা আছে, নগেনবাবু, নগেনবাবুর স্ত্রী, আর তাঁদের দুই মেয়ে; বাড়ির এই চারজনের নিমন্ত্রণ ।

—কাল রাত্রি আট ঘটিকায় ত্রিদিববাবুর মেয়ের বিয়েতে আপনাদের নিমন্ত্রণ।

কথাটা এক নিঃশ্বাসে সেরে দিয়েই মুখ তুলে তাকায় অশেষ। এবং, এইবার ভাল করে যাকে দেখতে পায়, তাকেই লক্ষ করে বলে— আপনারা দুই বোন, আপনার বাবা মা, অনুগ্রহ করে অবশ্য কাল সন্ধ্যায় বিয়ে দেখতে যাবেন। তা ছাড়া, মনে রাখবেন, কষ্ট করে সামান্য কিছু খেয়ে আসতেও হবে।

—কার বাড়ি বললেন? একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে যে, তাকেই লক্ষ করে নিমন্ত্রণের ভাষা উচ্চারণ করেছে অশেষ। একটা টেবিল , টেবিলের উপর বই-এর স্তূপ। সেই টেবিল ছুঁয়ে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল অলকা; অপরিচিত এক আগন্তুক ভদ্রলোকের আনমনা কথাগুলি শুনছিল। কিন্তু নিমন্ত্রণের অনুরোধ শুনতে পেয়ে এইবার সেই মেয়েকে একটু চমকে উঠতে হয়েছে। অলকার পিছন থেকে একটি ফ্রক পরা মেয়েও আশ্চর্য হয়ে উঁকি দিয়েছে।

—ত্রিদিববাবুর বাড়ি। উত্তর দেয় অশেষ।

মাথা হেঁট করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবে অলকা। তারপরেই বলে —আপনি একটু বসুন। আমি মাকে ডেকে দিচ্ছি।

চেয়ারের উপরে বসে অশেষ । অলকাও ভিতরে দরজার দিকে দুপা এগিয়ে যেয়ে ডাক দেয় —মা, এখানে এসো একবার।

অলকার মা বেশ একটু ব্যস্ত হয়ে ভিতরের ঘরের দরজার পার হয়ে এই ঘরে ঢোকেন। অলকা বলে—ইনি কী বলছেন শোনো।

অশেষ বলে— ত্রিদিববাবুর মেয়ের বিয়েতে আপনাদের নিমন্ত্রণ। আপনার দুই মেয়ে, আর আপনারা স্বামী-স্ত্রী, চারজনেই দয়া করে যাবেন।

অলকার মা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে বলেন—ত্রিদিববাবুর মেয়ের বিয়ে? ওই যে এক নম্বর যাঁর বাড়ি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তুমি কি ত্রিদিববাবুর কেউ হও?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি হলাম....অর্থাৎ ত্রিদিববাবু হলেন আমার মেসোমশাই।

অশেষের মুখের দিকে তাকিয়ে আনমনার মত কি যেন ভাবেন অলকার মা; তার পরেই অলকাকে বলেন— ওঁকে একবার ডাক।

অলকা আবার ভিতরে কয়েক পা এগিয়ে যেয়ে ডাক দেয় —বাবা, একবার এদিকে এসো।

মোটা চটির শব্দ শোনা যায়। ভিতরের বারন্দার উপর দিয়ে, আর যেন ঘষা খেয়ে খেয়ে চটির শব্দটা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে এই ঘরের ভিতরে ঢোকে।

—কী ব্যাপার ? অশেষের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন অলকার বাবা।

অশেষ হাসে— ত্রিদিববাবুর মেয়ের বিয়ে। কাল সন্ধ্যায় দয়া করে একবার যাবেন। আপনারা স্বামী-স্ত্রী, আর আপনার দুই মেয়ে।

—বেশ! বেশ খুশি হয়ে নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন অলকার বাবা।

—আচ্ছা আসি, নমস্কার। চলে যায় অশেষ।

অলকার মা বলেন—আমার যে ভাবতে একটু আশ্চর্য লাগছে।

অলকার বাবা বলেন—আমার মনে হয় ত্রিদিববাবুকে বুঝতে আমরাই ভুল করেছি। বড়লোক হলেও ভদ্রলোক অহংকারী নন।

অলকার মা বলেন—তা না হয় হল, কিন্তু ত্রিদিববাবু তোমার মত মানুষের নামও জানেন বলে মনে হয় না।

অলকার বাবা—বোধ হয় পাড়াসুদ্ধ সকলকেই নিমন্ত্রণ করতে চান, তাই কারও কাছ থেকে পাড়ার সব বাড়ির লোকের নাম যোগাড় করেছেন।

অলকার মা—ভগবান জানেন।

ত্রিদিববাবু ডাকছেন—অশেষের গলা শুনছি মনে হচ্ছে।

—আজ্ঞে হ্যা। বারন্দায় দাঁড়িয়ে উত্তর দেয় অশেষ।

এত দেরি হলো কেন অশেষ?

—দেরি না হয়ে উপায় কী বলুন? আপনাদের পুরনো বাগান স্ট্রিট যে একটা ধাঁধাঁ। বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হতে হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছে নগেনবাবুর বাড়িটা, একচল্লিশ নম্বরের বাড়ি।

—নগেনবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—নিমন্ত্রণ করে এসেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কার সঙ্গে দেখা হল? নগেনবাবুর স্ত্রী বাড়িতে ছিলেন?

—নগেনবাবুর স্ত্রী ছিলেন। নগেনবাবুও ছিলেন।

—কী বললে? যেন চমকে উঠে প্রশ্ন করেন ত্রিদিববাবু।

অশেষ বলে— আজ্ঞে হ্যাঁ। সাক্ষাৎ নগেনবাবুকেও বলে এসেছি।

—কিছু বুঝতে পারছি না। এখানে একবার এসো অশেষ।

ত্রিদিববাবু বসেছিলেন যে ঘরে, অর্থাৎ সেই প্রকাণ্ড হলঘরের ভেতরে ঢুকেই অশেষ বলে— নগেনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে মেসোমশাই।

ত্রিদিববাবুর চেয়ারের পাশে বসেছিলেন যে ভদ্রলোক, তিনি এইবার হেসে ওঠেন, —কই, আমার সঙ্গে তো তোমার দেখা হয়েনি। আমি তো এই মাত্র বাড়ি থেকে বের হয়ে সোজা এখানে এসেছি।

অপ্রস্তুত হয়ে, এবং যেন হঠাৎ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে অশেষ। তারপর বিব্রতভাবে বিড়বিড় করে —এ কেমন ব্যাপার হল? আমিও যে ঠিক বুঝতে পারছি না।

ত্রিদিববাবু— ঠিক একচল্লিশ নম্বরের বাড়িতে গিয়েছিলে কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

নগেনবাবু ভুরু কুঁচকে নিয়ে সন্দিগ্ধের মত তাকিয়ে প্রশ্ন করেন। —ভুল করে একচল্লিশের এক নম্বরে যাওনি তো?

—আজ্ঞে না। সে রকম ভুল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

নগেনবাবু হাসেন—একচল্লিশের এক নম্বরে কিন্তু এক ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী আর দুই মেয়ে থাকে। ঠিক আমার বাড়ির মতোই, স্বামী স্ত্রী আর দুই মেয়ে।

চমকে ওঠে অশেষ। —আজ্ঞে হ্যাঁ ! তা হলে সত্যিই ভুল হয়েছে।

নগেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে লাজুক ভাবে হাসেন ত্রিদিববাবু। —দেখলেন তো , কত সহজেই মানুষের ভুল হয়ে যায়।

নগেনবাবুও হাসেন—হ্যাঁ, কমেডি অব এরর। যাক্‌গে, শেষ পর্যন্ত জানা গেল, আমার বাড়িতে চারজনের নিমন্ত্রণ হয়েছে। এই যথেষ্ট। আপনি মিছিমিছি একটা ফর্মালিটির জন্য চিন্তিত হবেন না ত্রিদিববাবু।

ত্রিদিববাবু—একচল্লিশের এক নম্বরে যিনি থাকেন, তাঁকে আপনি চেনেন বলে মনে হচ্ছে! ব্যক্তিটি কে, কেমন, অর্থাৎ আমার নিমন্ত্রণ নেবার মত রেস্পেক্টবল্‌ বটে তো ?

—আমাকে একটু অসুবিধায় ফেললেন ত্রিদিববাবু । রেস্পক্টবল্‌ বলতে, অর্থাৎ...।

ত্রিদিববাবু —অর্থাৎ এটা তো একটা সহজ কথা... অর্থাৎ ইনকাম ট্যাক্স দেন, বেশ একটু সঙ্গতিসম্পন্ন, যার মানে....।

হেসে হেসে মাথা নাড়েন নগেনবাবু।—আজ্ঞে না। আপনি যা সন্দেহ করছেন, ঠিক তার বিপরীত।

ত্রিদিববাবু—তার মানে একটা বাজে লোক।

নগেনবাবু—সাধারণ গরিব ভদ্রলোক। ভাড়া বাড়িতে থাকেন। কোন এক হাসপাতালে কম্পাউণ্ডারের কাজ করেন ভদ্রলোক।

—ছিঃ। বিরক্ত হয়ে অশেষের দিকে তাকান ত্রিদিববাবু।

অশেষ বিব্রতভাবে বলে—মেসোমশাই কি সত্যিই বিরক্ত হলেন?

—তা সত্যি কথা বলতে গেলে, এখটু বিরক্ত হয়েছি বৈকি।

অশেষ—কেন?

ত্রিদিববাবু— চারটে ফালতু মানুষ এসে নিমন্ত্রণ খেয়ে চলে যাবে, এটা আমার মোটেই দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। যেখানে এক হাজারের বেশি লোক খাবে, সেখানে দু'দশটা অনিমন্ত্রিত মানুষ এসে ঢুকলে কোর্মা পোলাউ এর কমতি পড়ে যাবে না। প্রশ্ন হল; যেটা আমার প্রেস্টিজের প্রশ্ন।

আশ্চর্য হয় অশেষ —আমার সামান্য একটা ভুল, যেটা একটা হাসাহাসির ব্যাপার মাত্র, তাতেই আপনি যদি এত ভাবিত হয়ে আর প্রেস্টিজের কথা ভেবে...।

ত্রিদিববাবু—তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না অশেষ। আমি যে মানুষকে চিনি না, পছন্দ করি না, খাতির করি না; সে মানুষকে আমি যদি হঠাৎ নিমন্ত্রণ করে বসি, তবে সে নিশ্চয় মনে করবে যে, আমি তাকে খাতির করছি।

অশেষ হেসে ফেলে—তাতে ক্ষতি কী?

ত্রিদিববাবু —তর্ক যদি করতে চাও তবে বলব, অনেক ক্ষতি। আমারই প্রেস্টিজের ক্ষতি, যেসব সম্মানিত ভদ্রলোক আর মহিলারা এখানে আসবেন, তাঁদেরও প্রেস্টিজের ক্ষতি। তা ছাড়া, কম্পাউণ্ডার লোকটারও ক্ষতি। লোকটার মনে মিছিমিছি একটা অহংকার ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।

অশেষের মুখের চেহারা এইবার একটু অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে।—আমি একটু তর্ক করে বুঝতে চাই মেসোমশাই।

ত্রিদিববাবু—তর্ক করবে?

অশেষ —আজ্ঞে হ্যাঁ। সাতান্ন নম্বর বাড়ির সত্যব্রতবাবুকে নিমন্ত্রণ করে এলাম, তাঁকে তো দেখে মনে হল...।

নগেনবাবু বলে ওঠেন—সত্যব্রতবাবু দপ্তরির কাজ করেন।

অশেষ—যাই হোক, দেখে মনে হল ভদ্রলোক বেশ গরিব অবস্থার মানুষ।

ত্রিদিববাবু হেসে ফেললেন—বোঝা যাচ্ছে যে, তুমি সংসারের নিয়ম কানুনের কোনও খোঁজ রাখ না। সত্যব্রতের এক খুড়শ্বশুর আছেন, যে ভদ্রলোক হলেন মিস্টার ম্যাকেঞ্জির সেক্রেটারি চাটুজ্জের ছেলের বন্ধু। চাটুজ্জের ছেলে সত্যব্রতের খুড়শ্বশুরের কথায় ওঠে বসে। চাটুজ্জেও ছেলের কথা শুনে চলেন। আর ম্যাকেঞ্জি তাঁর সেক্রেটারি চাটুজ্জে বলতে অজ্ঞান। সুতরাং ম্যাকেঞ্জির কাছ থেকে যে কোনও কাজ আদায় করতে হলে—এইবার বুঝতে পারছ তো অশেষ, এই সত্যব্রতের সাহায্য নিতে হয়। সত্যব্রতের খুড়শ্বশুর লোকটাও সত্যব্রতকে মানে।

অশেষ— কিন্তু ষোল নম্বর বাড়িতে মাতাল লোকটাকে নিমন্ত্রণ করলেন কেন?

ত্রিদিববাবু চোখ বড় করে তাকান—জগৎবাবুর কথা বলছ?

অশেষ— হ্যাঁ।

ত্রিদিববাবু— উনি হলেন সাপ্লাই ডিরেক্টর মজুমদার সাহেবের বড় শ্যালক। কখন যে জগৎবাবুরর মত লোকের সাহায্য নেবার দরকার হয়ে পড়বে, কোনও ঠিক আছে কি? বেশ ভেবে চিন্তে আর ইচ্ছে করেই জগৎবাবুকে নিমন্ত্রণ করেছি।

অশেষ হেসে ফেলে—সংসারের নিয়ম-কানুন যে এত সুক্ষ্ম, সেটা জানতাম না।

ত্রিদিববাবু—জানতে না বলেই তো ভুল করলে। তোমার মাসিমা এই যে এত দেরি করে দেরি করে ফিরলেন, কেন জান?

অশেষ —না।

ত্রিদিববাবু—বিখ্যাত অভিনেত্রী মোহিনী দেবীকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে এত দেরি হয়েছে।

অশেষ—সে কি! মোহিনী দেবী কি আমাদের কোনও......।

ত্রিদিববাবু—আরে না না, আমাদের কোনও আত্মীয় নয়। যার ইয়েরই কোনও ঠিক নেই, সে আবার ভদ্রলোকের আত্মীয় হয় কী করে?

অশেষ—তাই তো আশ্চর্য হচ্ছি। মোহিনী দেবীকে নিমন্ত্রণ করবার কী দরকার ছিল?

ত্রিদিববাবু— পপুলার ভয়েস নামে কাগজটাকে হাতে রাখা দরকার।

অশেষের চোখ দুটো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে দেখতে পেয়ে ত্রিদিববাবু আবার হেসে ফেলেন। —বুঝতে পারছ না বোধ হয়!

অশেষ —না।

ত্রিদিববাবু—পপুলার ভয়েসের মালিক অনুকূল বোসের স্ত্রী মোহিনী দেবীর অভিনয় খুব পছন্দ করেন। মোহিনী দেবীর অভিনয় দেখে অনুকূল বোসের স্ত্রী এমনই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন যে, রোজ সকালে নিজে মোহিনী দেবীর বাড়িতে গিয়ে ফুল উপহার দিয়ে আসেন। কাজেই...।

অশেষ—ঠিক বুঝতে পারছি না।

ত্রিদিববাবু—মোহিনী দেবীকে দিয়ে বলিয়ে অনুকূল বোসের স্ত্রীকে প্রভাবিত করা যেতে পারে। আর স্ত্রীর কথায় অনুকূল বোস যে প্রভাবিত হয়ে থাকেন, সেটা তোমার মাসিমাও জানেন। সুতরাং, অনুকূল বোসকে হাত করতে হলে মোহিনী দেবীর সাহায্য দরকার। খুবই দুশ্চিন্তায় পড়েছি। আমার ব্যাঙ্ক, আমার যত কনন্ট্রাক্ট আর সাপ্লাই-এর খবর, আর মামলাটার বিবরণ ছেপে পপুলার ভয়েস শেষে একটা অসহনীয় অবস্থা না সৃষ্টি করে ফেলে। সেই জন্যেই মোহিনী দেবীর সাহায্য নিয়ে...।

অশেষ —এইবার বুঝতে পারছি।

ত্রিদিব—তা হলে আর একটু কষ্ট করো অশেষ।

অশেষ—বলুন।

ত্রিদিববাবু —নগেনবাবুর বাড়িতে একবার যাও। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কথা বলে যথারীতি নিমন্ত্রণ করে এসো।

নগেনবাবু আপত্তি করেন—না না; এত ফর্মালিটির দরকার নেই।

ত্রিদিববাবু—না; দরকার আছে। যার যথা প্রাপ্য প্রেস্টিজ, তাকে তা দিতে হয়। না দিতে পারলে সেটা নিজেরই অসম্মান।

নগেনবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে অশেষ—একচল্লিশের এক নম্বরের কোন দিকে আপনার বাড়িটা?

নগেনবাবু—বাঁ দিকে; ফটকের কাছেই গ্যারেজ দেখলেই চিনতে পারবে।

ত্রিদিববাবু বললেন—হ্যাঁ, সেই সঙ্গে ভুলটা শুধরে দিয়ে আসতে ভুলবে না।

অশেষ—তার মানে?

ত্রিদিববাবু—তার মানে সেই কম্পাউণ্ডারের বাড়িতে গিয়ে বলে আসবে যে, ভুল করে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

অশেষ—নিমন্ত্রণ করা হল না, এই কথাই কি ভদ্রলোককে জানিয়ে আসতে বলছেন?

ত্রিদিববাবু—হ্যাঁ।

অশেষ—এটা ভাল দেখায় না মেসোমশাই।

ত্রিদিববাবু—তুমি তর্ক করলে আমি আবার অসুবিধায় পড়ব অশেষ। যে লোকের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, শত্রুতা নেই, মিত্রতাও নেই, মুখের চেনা পর্যন্ত নেই, যার কাছে আমার কোনও দরকারই নেই, তাকে মিছিমিছি কেন নিমন্ত্রণ করব বল? মানুষের কথার আর কাজের একটা উদ্দেশ্য না থাকলে, সেটা যে পাগলামির ব্যাপার হয়ে যায়।

—বেশ তাই বলে আসছি।

ঘর ছেড়ে চলে যায় অশেষ। বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ায়। পুরনো বাগান স্ট্রিটের এক নম্বর বাড়ি আলোয় ঝলমল করছে। বাগানের পাশে রঙিন সামিয়ানা খাটানো হয়ে গিয়েছে। বাড়ির চারটে ঘরে একই সঙ্গে রেডিও বাজছে। কলকাতা, সিংহল, শিলং আর দিল্লি এক সঙ্গে গান গাইছে; চার রকমের ভাষায় চার রকমের সুরের গান। এক নম্বরের বাড়ির উল্লাসের ভাষা যেন বিরাট একটা প্রলাপের সঙ্গীত হয়ে বাজছে।

এক কাপ চা খাবার ভরসা ছেড়ে দেয় অশেষ। সত্যি কথা, মাসিমার কাছে গিয়ে আবদার

করে এই রাত নটায় এক কাপ চা খাবার জন্য মনের ভিতর কোনও আগ্রহের তাগিদও যেন আর অনুভব করে না অশেষ।

ভুল শুধরে আসতে হবে। মেসোমশাই-এর সংসারের নিয়ম-কানুনকে ইচ্ছা করে তুচ্ছ করতে চায়নি অশেষ। তবু ভুল হয়ে গিয়েছে। ঠিকই তো, অশেষ শুধু মাসতুতো বোনের বিয়েতে একটু খেটে দিয়ে সাহায্য করতে এসেছে। মেসেমশাই-এর চিন্তা আর বিবেচনার উপর নিজের কোনও অভিমত খাটাতে আসেনি।

ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে আবার হাঁকডাক করতে হবে, শুধু একটা বিশ্রী ভুলের কথা বলবার জন্য। ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে যাবেন, তারপর হেসে ফেলবেন। সে হাসিটা ঠাট্টার মত অশেষের কানের উপর বাজতে থাকবে। মুখ টিপে হেসে হেসে অশেষকে একটা ভদ্রগোছের অপমান করবার সুযোগ পেয়ে যাবেন কম্পাউণ্ডার ভদ্রলোক।

এক নম্বর বাড়ির ফটক পার হয়ে চলতে চলতে জোরে সিগারেট টানে অশেষ। নিজেরই মনের একটা গ্লানিময় ভীরুতার সঙ্গে যেন লড়তে লড়তে পথ হাঁটে। সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরো দুরে ছুঁড়ে দিয়ে নিজেই আবার মনে মনে যেন জোর করে খুশি হতে চেষ্টা করে। কিসের অপমান? কার অপমান? ভদ্রলোকের ঠাট্টার হাসিতে যদি কারও অপমান ঘটে, সেটা মেসোমশাই ত্রিদিব সরকারের অপমান হবে। অশেষকে চেনে না, অশেষের নামটাও জানে না একচল্লিশের-এক নম্বরের বাড়ির মানুষগুলি।

এখন মনে হয়, মেসোমশাই ত্রিদিব সরকারের এই ধরনের দরকারের কাজে সাহায্য করবার উৎসাহ দেখানোই ভুল হয়েছে। জীবনে কোনওদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরে নিমন্ত্রণ করবার কাজ করেনি অশেষ। নিমন্ত্রণ করবার ভাষাও ভাল করে বলতে জানে না। অথচ ভুল করে, সবচেয়ে সহজ কাজ মনে করে সবচেয়ে কঠিন কাজের ভার নিয়ে এখন প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। এর চেয়ে অনেক সহজ কাজ কতই তো ছিল। সামিয়ানা খাটানো আর আসর সাজাবার ভার নিলেই ঠিক হোত।

তাই তো? এখন মনে পড়েছে, তাই বুঝতে পারা যাচ্ছে, নিমন্ত্রণের অনুরোধ শুনতে পেয়ে কেন আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে ছিল ভদ্রলোকর সেই মেয়ে। একটা ছোট টেবিল, টেবিলের উপর বই-এর স্তূপ। ভদ্রলোকের মেয়ে বোধ হয় ছাত্রী, কিংবা টিচারও হতে পারে পারে। এত গম্ভীর মুখ আর এত সাবধানে যে তাকায় আর কথা বলে, সে কি ছাত্রী হতে পারে?

একটা গম্ভীর মুখও যে দেখতে এত সুন্দর হতে পারে ধারণা ছিল না অশেষের। চোখ দুটো বেশ টানা টানা বলেই তো মনে হয়। কিন্তু মহিলার মুখের ভাবে কেমন যেন একটা অনিচ্ছা; চোখ টান করে তাকাতেই চায় না। ছোট্ট একটা ভ্রূকুটি যেন ছায়ার মত চোখের উপরে শিউরে রয়েছে। চোখের বড় বড় পাতাগুলি কি এতই ভারি যে অশেষের দিকে একবার ভাল করে চোখ খুলে তাকাতেই পারলো না মহিলা।

অশেষের মনের শান্তি আবার যেন একটা আশঙ্কার কামড় খেয়ে চমকে উঠে। বেশ তীব্র একটা অস্বস্তির জ্বালা অনুভব করে অশেষ। এইবার সেই মহিলা কেমনতর চোখ করে তাকাবেন? সেই গম্ভীর আর লাজুক চোখ হঠাৎ ধিক্ করে জ্বলে উঠবে না তো? মানুষ কত অভদ্রতা করতে পারে, তারই প্রমাণ চোখের সামনে দেখতে পেয়ে একটা ঘৃণার বিস্ময় মহিলার চোখের পাতায় শিউরে উঠবে নাকি?

যাক গে। ঘটনাকে বড় বেশি তন্ন তন্ন করে চিন্তা করা হচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে অশেষের কোনও সম্পর্ক নেই। অশেষ শুধু ত্রিদিব সরকারের ইচ্ছার প্রতিনিধি। তাড়াতাড়ি কথাগুলি বলে ভুল শুধরে দিয়ে সরে আসলেই হবে।

ল্যাম্পপোস্টের মাথায় আলো জ্বলছে, এই তো একচল্লিশের এক নম্বর বাড়ি। আর, ওই তো, একটা গ্যারেজ, নিশ্চয় একচল্লিশ নম্বর।

নগেনবাবুর বাড়িতে গিয়ে নগেনবাবু স্ত্রীর কাছে নিমন্ত্রণের অনুরোধ জানাতে হবে। মুখ গম্ভীর করে আর মনে মনে হেসে হেসে নগেনবাবুর বাড়ির ফটকের কাছে এসে হাঁক দেয় অশেষ,—বাড়িতে কে আছেন?

কি ভয়ানক রূঢ় নগেনবাবুর স্ত্রীর মুখের ভাষা। অশেষের বিনীত ভঙ্গি আর মৃদু ভাষার নিমন্ত্রণের অনুরোধ শোনা মাত্র নগেনবাবুর স্ত্রীর চোখ দুটো রুক্ষ হয়ে গেল।

—আমার পায়ে বাতের ব্যাথা। আমার পক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া সম্ভব নয়!

চেয়ারের উপর বসে মোটা শরীর আস্তে আস্তে একবার দুলিয়ে অশেষকে কথাগুলি শুনিয়ে দেন নগেনবাবুর স্ত্রী।

অশেষ--আজ্ঞে, ঠিকই বলেছেন আপনি। শরীর অসুস্থ থাকলে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

—শরীর সুস্থ থাকলেও যেতাম না। কটমট করে তাকান নগেনবাবুর স্ত্রী।

হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে, আর কুণ্ঠিতভাবে বিড়বিড় করে অশেষ —যাই হোক, আপনার দুই মেয়ে নিশ্চয়...।

নগেনবাবুর স্ত্রী...ওরা কেউ এখন এখানে নেই। দুজনেই শিলিগুড়িতে মামার বাড়ি গিয়েছে।

অশেষ টেনে টেনে হাসে...অগত্যা...তা হলে আর কী করবেন বলুন? যারা নেই তারা কী করে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে...।

মাথা কাত করে আর গলার স্বরে যেন একটা উৎকট ক্ষোভের ঝাঁজ ঢেলে দিয়ে নগেনবাবুর স্ত্রী বলে ওঠেন— ওরা থাকলেও যেত না। ওরা ওদের বাবা ভদ্রলোকের মত আহম্মক নয়!

—আজ্ঞে? অশেষের গলার স্বর কেঁপে ওঠে।

নগেনবাবুর স্ত্রী —কম চালাক এই ত্রিদিব সরকার? প্রত্যেক বছর ফাইল হাতে নিয়ে ছুটে ছুটে ওঁর কাছে আসবেন আর ট্যাক্স ফাঁকির সুবিধাটুকু আদায় করে নিয়ে যাবেন, এই হল ত্রিদিব সরকারের কাজ। অথচ আজ পর্যন্ত একটু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেন না ভদ্রলোক । অন্য ইনস্পেক্টর হলে ত্রিদিব সরকারের কাছ থেকে কম করে পাঁচ হাজার টাকা কৃতজ্ঞতা বাবদ আদায় করে নিত।

এর পর নগেনবাবুর স্ত্রীর চোখের সামনে আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার সাহস পায় না অশেষ, দাঁড়িয়ে থাকার আর দরকার আছে বলেও মনে করে না।

অশেষ বলে—আচ্ছা, নমস্কার।

নগেনবাবুর স্ত্রী বলেন—উনি এলে বলব।

অশেষ—নগেনবাবু অবিশ্যি জানেন , আমি আপনাদের এখানে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। ওঁকে আর কিছু বলবার দরকার হবে না।

—তার মানে? আশ্চর্য হয়ে অশেষের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন নগেনবাবুর স্ত্রী।

অশেষ—নগেনবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

নগেনবাবুর স্ত্রী—কোথায় দেখা হল।

অশেষ —ওখানে , ত্রিদিববাবুর বাড়িতে।

নগেনবাবুর স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠলেন—কেন?কেন? ওখানে গিয়ে কেন বসে আছেন ভদ্রলোক?

আর দেরি করে না অশেষ। নগেনবাবুর বাড়ির ফটক পিছনে রেখে ব্যস্তভাবে একটানা হাঁটা দিয়ে একচল্লিশের-এক নম্বরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাঁপ ছাড়ে।

এই বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তে হবে। দরজা খুলে গেলে এখানে দাঁড়িয়ে কম্পাউণ্ডার ভদ্রলোকের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে চলে যেতে হবে, এই মাত্র। —ভুল করে আপনাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে; ত্রিদিব সরকার আপনাদের কাউকে নিমন্ত্রণ করেননি। মাত্র এই কয়েকটি কথা। ব্যস্ তারপরেই অশেষের এই বৃথা হয়রানির অস্বস্তিটা শান্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু ততক্ষণ এই অদ্ভুত অস্বস্তিটা সামলে রাখতে পারলে হয়। ঘেমে ওঠে অশেষের কপালটা। বুকের ভিতরে একটা ভয়-ভয় ছায়াও যেন ছম ছম করে। ময়লা চেহারার দরজা, এই তো একটা বাড়ি। পলেস্তারা নেই। দরজার মাথার উপর, আলকাতরার দাগ দিয়ে ছোট্ট করে লেখা একটা সংখ্যা, একচল্লিশের-এক; সেই দাগটাও ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। এহেন বাড়ির দরজার কড়া নাড়তে গিয়ে অশেষের হাতটা যেন হঠাৎ ভয়ে ও লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে যায়।

কোনও অর্থ হয় না। সামান্য একটা ভুল শুধরে দিয়ে চলে যেতে হবে, তার জন্য এতটা ভীরু হয়ে যাওয়াও যে একটা অদ্ভুত দুর্বলতা । দরজার কড়া নাড়ে অশেষ।

—কে?

যার ভয় করেছিল, তারই সাড়া শুনতে পায় অশেষ। ঘরের ভিতর থেকে প্রশ্ন করে উঠেছে সেই মহিলার কণ্ঠস্বর।

খুলে যায় দরজা। অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে যেন বিড় বিড় করে অশেষ— আপনি কাইগুলি একবার আপনার বাবাকে ডেকে দিন।

ঘরের ভিতরের দিকে এগিয়ে যেয়ে ডাক দেয় অলকা —বাবা।

ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন, অলকার বাবা, আর অশেষকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে ওঠেন—ওকি? তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

অশেষ— সামান্য একটা কথা বলে চলে যাব। সেই জন্যে....।

—তাতে কী হয়েছে? সে জন্য কি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে? ভেতরে এসো।

ঘরের ভিতর ঢুকে চেয়ারের উপরে বসে অশেষ। কম্পাউণ্ডার ভদ্রলোকের মাত্রাছাড়া ভদ্রতার এই উল্লাস যেন অশেষের চোখে মুখে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। রুমাল বের করে চোখ মুখ মুছতে থাকে অশেষ।

মাথায় টাক আছে। ঘাড়ের উপরে থোকা থোকা সাদা চুল। কম্পাউণ্ডার ভদ্রলোকের ভুরু দুটোও সাদা। আদুড় গায়ের উপর একটা তোয়ালে জড়িয়ে নিয়েছেন ভদ্রলোক। চুপ করে বসে দেখতে থাকে অশেষ, মেয়ের দিকে তাকিয়ে ইশারায় কি-যেন বললেন ভদ্রলোক এবং সেই তরুণীও ভিতরের ঘরের দিকে চলে গেল।

এইবার বেশ জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে অশেষ। এইবার ওই গম্ভীর মুখের মহিলা এই ঘরে ফিরে আসবার আগেই কম্পাউন্ডার ভদ্রলোককে আসল কথাটি জানিয়ে দিয়ে সরে পড়তে হবে।

ফ্রকপরা আর বেণীদোলানো মেয়েটি ঘরের দরজার কাছে হঠাৎ এসে দাঁড়ায়, উঁকি দেয়; তারপরেই আবার ছুটে চলে যায়। মেয়েটার চোখে কী চমৎকার একটা খুশি-খুশি হাসি ছটফট করছে। কম্পাউন্ডার ভদ্রলোকের এই ছোট মেয়েটি তাঁর ওই বড় মেয়েটির ঠিক উল্টোটি বলে মনে হয়। একেবারেই গম্ভীর নয়, আর একেবারেই অচঞ্চল নয়। যাই হোক...

অশেষ বলে...আমি যে জন্যে আবার ফিরে এলাম, সেটা হল... ।

কম্পাউণ্ডার ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বলেন— আগে চা খেয়ে নাও তারপর তোমার কথা শুনব।

—চা! আতঙ্কিতের মত তাকায় অশেষ। সত্যিই তো; কম্পাউণ্ডার ভদ্রলোকের বড় মেয়ে চা-এর কাপ হাতে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকেছে। বড় মেয়ের পিছু পিছু সেই বেণীদোলানো মেয়েটিও এসেছে।

ঘাড়ের সাদা চুলের উপর হাত বুলিয়ে ভদ্রলোক বলেন—চা তৈরি হয়েই গিয়েছিল। রাত্রিতেও আমার এক পেয়ালা চা না হলে চলে না। রাত জাগবার দরকারে চা খেয়ে এই অভ্যাসটি পাকা হয়ে গিয়েছে। এখন ভাল করে ঘুমোতে হলেও এক কাপ চা চাই। তা ছাড়া, রাত্রিবেলা আমি এক কাপ চা আর একটা রুটি ছাড়া আর কিছুই খাই না। এই বয়েসে যত কম খাওয়া যায়, শরীর তত ভাল থাকে।

অশেষ হাসে—আপনি প্রায় ঠিক কথাই বলেছেন। এসব তত্ত্ব আমিও কিছু কিছু জানি। আমি ডাক্তার।

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে ওঠেন—ঠিক হয়েছে।

অশেষ—কী?

ভদ্রলোক—ওই ওরা নিজের কানে শুনে বুঝে নিক, আমি ঠিক কথা বলি কিনা। ওরা বিশ্বাসই করতে চায় না যে, এই বয়সে কম খাওয়া মানে সুস্থ থাকা। ওরা মনে করে, আমি ইচ্ছে করে কম খাই।

অশেষ হাসে—তবে কম খাওয়ারও একটা মাত্রা আছে। এক কাপ চা আর একটা রুটির উপর নির্ভর করা যায় না। তাতে ব্লাডপ্রেসার একটু বেশি কমে যাবার আশঙ্কা আছে।

কম্পাউন্ডার ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে মিট মিট করে হাসতে থাকে দুই মেয়ে। কম্পাউন্ডার ভদ্রলোক বলেন—যাকগে; আমি তোমার মেসোমশাই ত্রিদিববাবুকে মনে মনে বরাবর খুব শ্রদ্ধা করি। কেউ কেউ বলে, উনি নাকি খুব অহংকারী মানুষ। ছিঃ, লোকে মানুষকে বুঝতে কত ভুল করে। ত্রিদিববাবু যদি সত্যিই অহংকারী হতেন তবে বিমান চৌধুরীর মত একটা কম্পাউন্ডার মানুষকে সপরিবারে তাঁর মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করতে পারতেন কি?

চুপ করেন বিমান চৌধুরী। এদিক ওদিক তাকান। তারপর বড় মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—ডাক্তারের সামনে আমি তোরও একটা অন্যায় অভ্যাসের কথা বলে দিতে পারি, অলকা।

অলকার গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে। কিন্তু বিমান চৌধুরী যেন অলকার সেই গম্ভীর মুখের নীরব প্রতিবাদ গ্রাহ্য করলেন না। অশেষের কাছে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ করে ফেললেন বিমান চৌধুরী—রাত জেগে এত লেখা-পড়া করা কি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল?

অশেষ হাসে—মোটেই ভাল নয়; কিন্তু রাত জেগে এত লেখাপড়ার করবার কারণটা কী?

বিমানবাবু—অলকা এইবার বি.টি পরীক্ষা দেবার সুযোগ পেয়েছে।

অশেষ—উনি টিচার বোধ হয়।

বিমানবাবু—হ্যাঁ। চার বছর হল একটা মেয়ে-স্কুলে পড়াবার চাকরি করছে।

অশেষ—কোথাকার ইস্কুল?

বিমানবাবু—গড়িয়ার বাণী মন্দির। আচ্ছা, এইবার তিলকার অবাধ্যতার কথাটা বলে দিই? কেমন?

হেসে হেসে ছোট মেয়ের মুখের দিকে তাকান বিমানবাবু।

একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে আর হাত তুলে বিমানবাবুর মুখ চেপে ধরে তিলকা। কিন্তু বিমানবাবু তিলকার সেই কঠোর আপত্তির আক্রমণ সহ্য করে বলেই ফেললেন— চমৎকার নাচতে পারে তিলকা। কিন্তু আমি বলি, —না রে মেয়ে, পেটে দুধ-ঘি ভাল মত না পড়লে অত নাচতে নেই। নাচ যে ভয়ানক শক্ত এক্সারসাইজ, নয় কি ডাক্তার ?

অশেষের গলার স্বর যেন হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে ফিসফিস করে—তা বইকি!

বিমান চৌধুরি—কিন্তু আমার কথা গ্রাহ্য করে না তিলকা। সমস্যা এই যে, যিনি কোনও আপত্তি করেন না, বরং লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েকে উৎসাহ দেন, আর নাচিয়ে মেয়েটাকে রোগা করে দিচ্ছেন, তিনি হলেন..ওই যে।

দরজার দিকে তাকিয়ে যার দিকে যার দিকে ইঙ্গিত করেন বিমানবাবু, তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকেন।

অলকার মা'র সেই নীরব হাসির উপর যেন হঠাৎ রাগ করে উঠলেন বিমান চৌধুরী।—উনিই বা কি কম অবাধ্য? শুধু উপোস করবার ছুতো খুঁজছেন। পাঁজি ঘেঁটে ঘেঁটে এক গাদা উপোসের দিন বের করেছেন। খুব পুণ্যি করছেন; কিন্তু এদিকে হার্টের দশা...।

অশেষ বলে—হার্ট দুর্বল মানুষের বেশি উপোস করা উচিত নয়।

—শুনলে তো। অলকার মার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকেন বুড়ো কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরী। তার পরে মুখ ফিরিয়ে শান্তভাবে অশেষের দিকে তাকান—আর এক কাপ চা হোক।

—না না, আর নয়। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় অশেষ। একচল্লিশের এক নম্বরের এই বিচিত্র মুখরতার মধ্যে যেন নিদারুণ একটা বিদ্রূপ হাসছে। ভয় পেয়েছে ডাক্তার অশেষের বলিষ্ঠ চেহারাটাই।

কিন্তু আর ভয় করলে চলে না; লজ্জা করে চুপ থাকবার উপায় নেই। এবার শুধু বলে দেওয়া আর চলে যাওয়া।

অশেষ বলে—আমি যেকথা বলতে এসে ছিলাম সেটা হল....বড়ই লজ্জাজনক একটা ভুল .....তার মানে.....।

বিমান চৌধুরীর সাদা ভুরু একটা মৃদু সংশয়ের ছোঁয়ায় আস্তে আস্তে একবার কেঁপে ওঠে। চুপ করে তাকিয়ে থাকে অলকা, তিলকা আর বিমান চৌধুরীর স্ত্রী। একচল্লিশের-এক নম্বরের একটা ভয়ানক কৌতূহল যেন অশেষ ডাক্তারের বিনয়- বিব্রত নিষ্ঠুরতার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

অশেষ বলে—আমি ভুল করে আপনাদের নিমন্ত্রণ করে ফেলেছি। ত্রিদিব সরকারের বাড়িতে আপনাদের নিমন্ত্রণ নেই। ভুল, আমার ভুল। আমি আপনাদের বাড়িকে নগেনবাবুর বাড়ি মনে করে...।

—তাই বলো! হো হো করে হেসে ওঠেন বুড়ো কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরী। অলকার মুখে একটা ক্ষীণহাসির রেখা শিউরে ওঠে, খিলখিল করে হেসে ওঠে তিলকা। আর, চোখ বড় করে একটা বিস্ময়ের হাসি হাসতে থাকেন অলকার মা।

গম্ভীর হয়ে গেল না, স্তব্ধ হয়ে গেল না, কোনও তিক্ত ভ্রূকুটি চমকে উঠল না; শুধু একটা বিপুল কৌতুকের আবেগে হেসে উঠল একচল্লিশের-এক। মাথা হেঁট করে, কাঠগড়ার আসামীর মত শুকনো মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অশেষ।

বিমান চৌধুরী বলে—তাতে কী হয়েছে? ঠিক আছে। তোমার লজ্জিত হবার কিছু নেই।

—চলি। বিড় বিড় করে অশেষ।

—হ্যাঁ, এসো। জোরে হাঁপ ছাড়েন বিমান চৌধুরী।

ব্যস্তভাবে, যেন ছটফট করে পা চালিয়ে ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে যায় অশেষ; রাস্তার উপরে নেমে আরও জোরে পা চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছেন ত্রিদিব মেসোমশাই। ভুল শুধরে ফিরে এসেছে অশেষ, আর নগেনবাবুর স্ত্রীর কাছে গিয়ে নিমন্ত্রণের অনুরোধ বার বার জানিয়ে এসেছে।

অশেষও এইবার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়তে চায়। কারণ, রাতের খাওয়ার পাট চুকে গিয়েছে অনেকক্ষণ। রাতও বেশ হয়েছে; যদিও বাড়ির ভিতরে ও আশে-পাশে একটা হই হই ব্যস্ততা তখনও শব্দ করে বাজছে। ডেকরেটারের লোকজন গেট সাজাচ্ছে, ওরা বোধ হয় সারারাত ধরে কাজ করবে। চেঁচামেচি করে হাতুড়ি ঠুকছে , তার বাঁধছে লোকগুলি।

কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বার কথা ভুলে গিয়ে, বিনা কাজের তাড়নায় বারান্দার উপর পায়চারি করে বেড়ায় অশেষ। পুরনো বাগান স্ট্রিটের এক নম্বর, ত্রিদিব সরকারের এই প্রাসাদের মত বাড়ির বারান্দায় মোজেয়িক চকচক করে। কেমন একটু ঘৃণা বোধ করে অশেষ। ত্রিদিব মেসোমশাই নামে এই ভদ্রলোকের বুদ্ধিময় অদ্ভুত প্রেস্টিজের আহ্লাদ যেন চকচক করছে। ছিঃ।

রাত প্রায় বারোটা। পুরনো বাগান স্ট্রিটের সব বাড়ি নীরব হয়ে গিয়েছে। শুধু এই উৎসবের বাড়িটা ছাড়া। বুঝতে পারে অশেষ, ঘুমোবার আশা বৃথা। এই ব্যস্ততার উৎসব যেন একটা ভুয়ো অহংকারের উৎসব। এই বাড়ির আজকের রাতের চেঁচামেচি সহ্য করাই বোধ হয় সম্ভব হয় না।

বারান্দার উপর পায়চারি করতে করতে ওদিকের ঘরের হাসাহাসির কলরবের একটা উৎসবের ছবিকে একবার উঁকি দিয়ে দেখে আসে অশেষ। নমিতার গায়ে এক- এক সেট গয়না চড়িয়ে বার বার বুঝে দেখছেন মাসিমা, কোন সেট নমিতাকে সব চেয়ে ভাল মানায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত ভাবে হি-হি করে মাঝে মাঝে হেসে উঠছে নমিতা। চার বার পরীক্ষা দিয়েও ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেনি নমিতা। পারবে কেমন করে? অশেষ এই বাড়িতে এসে কতবার নিজের চোখে দেখেছে, পরীক্ষা দিনেও সকাল বেলায় জুয়েলারি ক্যাটালগ দেখছে নমিতা।

নমিতার বিয়ের সম্বন্ধের কিছু কিছু তথ্য অশেষও জানে। শৈলেশ্বর ঘোষ নামে যে ভদ্রলোক আগামীকাল এই নমিতাকে বিয়ে করবার জন্য আসবেন, সেই ভদ্রলোক বেশ বড়লোক। বেশ শিক্ষিতও বটে । বেশ বিদ্বান। মাস্টার অব্ ল্; আবার ফিলসফিতেও ডক্টরেট্ পেয়েছেন। এ হেন শৈলেশ্বর ঘোষ কি বিয়ের যোগ্য অন্য পাত্রী পেতে পারতেন না। নমিতার মত মেয়েকে বিয়ে করতে একটুও আপত্তি করলেন না, আশ্চর্য। হ্যাঁ, নমিতা যদি একটা রূপসী মেয়ে হত, তবে না হয় বলা যেত যে, শৈলেশ্বর ঘোষ শেষ পর্যন্ত রূপ দেখে নমিতাকে বিয়ে করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। রূপ তেমন কিছুই নয়, গুণ বলতে তো ওই, সেই নমিতাকে বিয়ে করে ডক্টর শৈলেশ্বর ঘোষের জীবন যে কেমন সুখী হবে— যাক এ সব চিন্তার কোনও অর্থ হয় না।

কিন্তু চিন্তাটা যেন ঘুরে ফিরে বার বার এসে অশেষের মনের ভিতর খচ্‌খচ্ করে। ডক্টর শৈলেশ্বর ঘোষের মত পাত্রের সঙ্গে অলকার মত মেয়েকেই যে সবচেয়ে ভাল মানায়, এতে কি কোনও সন্দেহ আছে? ইচ্ছে করলে শৈলেশ্বর তো অনায়াসে অলকাকে বিয়ে করতে পারতেন।

বারান্দার চকচকে মোজেয়িক মাড়িয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে মনে মনে হেসেও ফেলে অশেষ। অশেষের মনটা যেন পুরনো বাগান স্ট্রিটের এই বিরাট এক নম্বরের উপর রাগ করে নমিতার বিয়ের সম্বন্ধটাকে ভাংচি দেবার চেষ্টা করছে।

সত্যিই এই বিরাট এক নম্বরের উপর রাগ হয়েছে বলেই কি? না, সেই একচল্লিশের-এক নম্বরের উপর মায়া হয়েছে বলে?

ক্লান্তভাবে একটা চেয়ারের উপর বসে বাইরের রাস্তা আর দূরের একটা ল্যাম্পপোস্টের দিকে তাকিয়ে থাকে অশেষ। একটা জঘন্য কাজের গ্লানিময় স্মৃতি বার বার অশেষ ডাক্তারের চোখ দুটোকে জ্বালা দিয়ে বিরক্ত করছে। যেন এই মুহূর্তে একটা প্রায়শ্চিত্ত খুঁজছে অশেষ। নইলে ঘুমোতেই পারা যাবে না।

রাত জেগে পড়াশোনা করে অলকা। তার মানে, বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখনও বাইরের ওই ঘরে...বইয়ের স্তূপ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে টেবিলটা, সেই টেবিলের পাশে চেয়ারের ওপর বসে বই পড়ে অলকা। বি-টি পাশ করবার একটা জেদে বেপরোয়া হয়ে লেখা-পড়া করে।

গম্ভীর মুখও দেখতে এত সুন্দর লাগে?

মুখ টিপে হাসলেও যে অলকাকে অদ্ভুত রকমের সুন্দর দেখায়। কেমন স্বচ্ছন্দে, একটুও কুণ্ঠিত না হয়ে, কত তাড়াতাড়ি এক কাপ চা এনে দিল অলকা!

সেই অলকাকে অপমান করে ফিরে এসেছে অশেষ। বোকার মত, ত্রিদিব মেসোমশাই-এর বাজে কথায় হঠাৎ রাগ করে নিমন্ত্রণ বাতিল করবার জন্যে আবার ওখানে ছুটে যাবার দরকার ছিল না। ঝোঁকের মাথায় এই ভুল হয়ে গেল। কিন্তু এই ভুলও কি শোধরানো যায় না?

ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায় অশেষ, নিজের মনের সঙ্গে কপটতা করতে চায় না। বুঝতে এখন আর একটুও অসুবিধা নেই; কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরীর মেয়ে অলকার কাছে মাপ চেয়ে অলকাকে একটু খুশি করবার জন্য ছটফট করছে অশেষের মন।

মনে মনে সাবধান হতে চেষ্টাও করে অশেষ। অনেক গল্পে আর উপন্যাসে পড়েছে অশেষ, এরকম ব্যাকুলতা আর মাপ চাইবার ইচ্ছাটাই শেষ পর্যন্ত ভালবাসায় দাঁড়িয়ে যায়।

না, অশেষের পক্ষে এতটা নভেলি কাণ্ড করা সম্ভব নয়! কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরীর মেয়ে অলকার সঙ্গে একটা ভালবাসার ব্যাপার ঘটিয়ে তোলবার কোনও ইচ্ছে নেই অশেষের। শুধু অলকার ভুল ভেঙে দেবার ইচ্ছা। অলকা যেন বিশ্বাস করতে পারে যে, পৃথিবীর মানুষ ত্রিদিব সরকারের মত অভদ্র নয়! অকারণে, শুধু ভদ্রতার জন্যই ভদ্রতা করতে পারে, এমন মানুষও আছে।

এখনই, এত রাত্রে একচল্লিশের-এক নম্বরের দরজার কাছে গিয়ে কড়া নাড়লে অভদ্রতা করা হবে ঠিকই; কিন্তু একেবারে স্পষ্ট ভাষায় যদি বলা যায়, আমি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মাপ চাইতে এসেছি, তবে সে অভদ্রতাকে একটুও সন্দেহ করবে না অলকা।

মিথ্যা নয়, সত্যিই বাধ্য হতে হচ্ছে; তা না হলে ঘুমোতেই পারা যাবে না।

আবার সিঁড়ি ধরে নামতে হয়। তরতর করে, যেন একটা মিষ্টি নিশির ডাকের মত আহ্বানের মোহে সিঁড়ি ধরে স্বচ্ছন্দে নেমে যায় অশেষ। এক নম্বর পুরনো বাগান স্ট্রিটের ফটক সাজাবার শব্দ পার হয়ে রাস্তার উপরে দাঁড়ায়। তারপর দূরের নীরব আলো-আঁধারের রহস্যের দিকে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকে।

দরজার কড়া নাড়তে হল না। একচল্লিশের-এক নম্বরের একটা জানালা খোলা, এবং সেই জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখা যায়, টেবিলের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে একমনে লিখে চলেছে অলকা।

বেশ বেপরোয়া মেয়ে তো! এত রাত্রে জানালা খোলা রেখে আর আলো জ্বালিয়ে ঘরের ভিতর বসে থাকলে যে এই মেয়ের সুন্দর মুখটাকে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে যেকোনও লোকে দেখে ফেলতে পারে। সেটা কি অনুমান করতে পারে না অলকা? কিংবা অনুমান করতে পারলেও পরোয়া করে না?

ডাক দিতে গিয়েই চুপ করে যায় অশেষ। ডাকতে কুণ্ঠাবোধ করছে, শুধু এই জন্য নয়! কী বলে ডাকবে, এ ধরণের মেয়েকে কী বলে ডাকা যায়, এটা একটা প্রশ্ন বটে? একটু ভেবে নেবার দরকার হয়; ঠিক কিন্তু এ কারণেও নয়। অলকার গম্ভীর মুখের সেই রূপ, সেই ছাঁদ আর সেই ভঙ্গি কত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নিজের ভাবনা নিয়ে একলা বসে আছে যে মেয়ে এবং কেউ দেখছে না বলে ভেবে নিয়েছে যে মেয়ে, সে মেয়ের মুখে কোনও পোজ থাকে না। সে মুখ যদি হাসে, তবে সে হাসি পরকে দেখাবার হাসি নয়! সে চোখে যদি জল দেখা দেয়, তবে সেই জলভরা চোখ পরকে দেখাবার চোখ হতে পারে না!

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অশেষ, শুধু অলকা নামে এই মেয়ের আপন-রূপ দেখবার লোভে। সত্যিই কি খুব গম্ভীর? এবং সত্যিই কি সব সময় দু'চোখের উপর ছোট একটা ভ্রূকুটি শিউরে থাকে?

না, একটুও গম্ভীর নয় অলকা। এবং চোখে ভ্রূকুটির কোনও চিহ্ন নেই। অলকার মনের ভিতরে যেন আলো জ্বলছে; চোখ মুখ দিয়ে সেই আলো উপচে উঠেছে। পরীক্ষার পড়া পড়তে কিংবা পরীক্ষার লেখা লিখতে কি এমন করে হেসে ঝিকমিক করে কারও চোখ আর মুখ?

রাত বারোটার সময় কোনও নিঃসম্পর্কিতা নারীর ঘরের জানালার কাছে উঁকি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যে নিতান্তই অভদ্রতা, এই বোধ মনের ভিতরে থাকলেও অশেষ-ডাক্তার সেই জানালার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জোর যেন নিজেরই মনের ভিতরে খুঁজে পায় না। ডাক দিলে চমকে উঠবে, আর আশ্চর্য হয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকাবে। এবং অশেষের দিকে শুধু একটু সুন্দর-গম্ভীর মুখ তুলে কথা বলবে। সত্যিই কি, অলকা চৌধুরী তার জীবনের এই হাসিকে কোনও মানুষের জন্য গোপন উপহারের মত লুকিয়ে রেখেছে?

আধ মিনিটের মধ্যে মনের ভিতর কত রকম জল্পনা-কল্পনা আর গবেষণার উৎপাত ঘটে গেল। ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায় অশেষ। জানালার উপর হাত রেখে মৃদু স্বরে ডাক দেয় অশেষ—শুনছেন!

—কে? আতঙ্কিতের মত চমকে উঠে আর মুখ ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকায় অলকা।

—আমি আবার বাধ্য হয়ে আপনাদের একটু বিরক্ত করতে এসেছি। কিন্তু আশা করি বিরক্ত হবেন না!

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অলকা। রুক্ষস্বরে বলে—বেশ বিরক্ত হব।

অশেষ—আমি শুধু সামান্য দু'চারটে কথা বলে চলে যাব।

অলকা—এই রাত বারোটার সময় কারও বাড়িতে গিয়ে সামান্য দু'চারটে কথা বললেও বাড়ির মানুষ বিরক্ত হয়।

অশেষ—তা জানি। আর, আপনার কাছে কড়া কথা শুনব বলে তৈরি হয়েই এসেছি।

অলকা—সত্যি কথা বললেই কড়া কথা বলা হয় না।

অশেষ—আপনি এত কথা বলছেন, কিন্তু না বললে এরই মধ্যে আমার সামান্য কথা শেষ হয়েই যেত। আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারতাম।

জানালার কাছে এগিয়ে এসে অলকা বলে—বলুন।

অশেষ—আমার অনুরোধ, কাল দুপুরে আপনি আর বাড়ির সবাই, অর্থাৎ আপনার বাবা, মা ও তিলকা, আমাদের বাড়িতে একবার অনুগ্রহ করে যাবেন।

অলকা—কেন?

অশেষ—আপনাদের নেমন্তন্ন।

অলকা—কেন?

অশেষ—এমনি; তেমন বিশেষ কোনও কারণ নেই। আমার বোন সুধার জন্মদিনটা অবশ্য এই কিছুদিন হল পার হয়ে গিয়েছে...সুতরাং একটু বাড়িয়ে নিয়ে বলতে পারি, সুধার জন্মদিন উপলক্ষে...।

—দেখুন অশেষবাবু। বলতে গিয়ে অলকার চোখ দুটো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আপনি বোধ হয় নিজেকে খুব চালাক মনে করেন।

অশেষ—চালাক মনে করি ঠিকই; কিন্তু খুব ভাল করে জানি, আজ এই সময়ে এখানে এসে এইসব কথা বলে একটা নির্বোধের মত কাজ করছি।

অলকা বিরক্ত হয়ে এবং যেন একটু ক্লান্ত হয়ে হাঁপ ছাড়ে। —যাক, আপনার সঙ্গে তর্ক করবার একটুও উৎসাহ আমার নেই। শুধু এইটুকু বলে দিতে চাই, আপনি যে কথা বললেন, এই কথা হয় ভয়ানক অহংকারের কথা নয় খুব অশোভন একটা ইচ্ছার কথা।

—অহংকারের কথা! আশ্চর্য হয় অশেষ।

অলকা—হ্যাঁ মশাই; নিজের মনের অহংকারে এতই মজে আছেন যে, একেবারে বিশ্বাস করে বসে আছেন...।

অশেষ—কী?

অলকা—বড়মানুষের বাড়িতে একবার ডাকলেই আমাদের মত মানুষেরা তখনই যাবার জন্য দৌড় দেবে।

অশেষ—ইচ্ছে করে শক্ত কথা বলছেন আপনি, কারণ আপনি আমাকে একটা ভদ্রলোক বলেও বিশ্বাস করতে পারছেন না।

যেন হঠাৎ একটু লজ্জিত হয়েছে অলকা। রুক্ষ স্বর একটু নরম হয়ে যায়। অলকা বলে—আপনিই বুঝে দেখুন, আপনার কাণ্ড দেখে যে কোনও মানুষের পক্ষে একটু বেশি আশ্চর্য হওয়া স্বাভাবিক কিনা?

অশেষ—আমি আপনার সব অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েই বলছি, আশ্চর্য হবেন না। আমাদের বাড়িতে আপনাদের মত অনেকেই আসেন। নতুন পরিচয় হয়েছে, এমন কত ভদ্রলোক ও মহিলা আসেন। সুধার নতুন নতুন বান্ধবী হরদম আসছে। আমরাও কত বাড়িতে যাচ্ছি; নিমন্ত্রণ খেয়ে আসছি। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কী আছে বলুন? আপনাদের সঙ্গে না হয় এই কয়েক ঘন্টা আগে আলাপ হয়েছে, এই মাত্র। কিন্তু তাতেই বা কী?

অলকা—কিন্তু নিমন্ত্রণ করছেন কেন?

অশেষ—বুঝতেই পারছেন, আমারই ভুলে আজ আপনাদের যে অপমানটা হয়ে গেল...।

অলকা—অপমান? কিসের অপমান?

অশেষ—এই যে ত্রিদিব মেসোমশাই-এর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করবার ব্যাপারে আমি এসে যে কাণ্ডটা করলাম। একবার নিমন্ত্রণ করে সেই নিমন্ত্রণ আবার প্রত্যাহার করবার জন্য ছুটে আসে মানুষ, ছিঃ।

অলকা—কিন্তু আমরা তো একটুও অপমানিত হয়েছি বলে মনে করছি না। ত্রিদিব সরকারের বাড়িতে নিমন্ত্রণ না হলে আমরা ছোট হয়ে যাব এমন অদ্ভুত বিশ্বাস আমাদের নেই। কিন্তু আপনিই দেখছি এরকম অদ্ভুত বিশ্বাস রাখেন।

অশেষ—আমি আপনাকে আমার বক্তব্য ঠিক বোঝাতে পারছি না।

অলকা—থাক, এসব কথা। আপনার বক্তব্য বুঝতে পারলেই বা কী হবে?

অশেষ—আমাদের বাড়িতে যাবেন।

অলকা হেসে ফেলে—আপনি অদ্ভুত কাণ্ড করছেন অশেষবাবু।

অশেষ—কিন্তু আমার যে খুবই খারাপ লেগেছে।

অলকা—কী?

অশেষ—এই যে...অদ্ভুত ব্যবহার আপনাদের সঙ্গে আজ করতে হল?

অলকার চোখের ছোট ভ্রূকুটি যেন একটা নতুন বিস্ময়ে টান হয়ে ওঠে। অলকা বলে—আপনার খুব খারাপ লাগছে?

অশেষ —হ্যাঁ।

অলকা—তবে নিমন্ত্রণ ভাঙতে আবার এসেছিলেন কেন?

অশেষ— আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু আমি তো নিমিত্ত মাত্র; ত্রিদিব মেসোমশাই-এর মেয়ের বিয়ে। তিনি জানেন, কাকে নিমন্ত্রণ করা দরকার আছে বা নেই। আমি তো যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি। এক্ষেত্রে আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার অধিকারই বা কতটুকু?

অলকা হাসে—তাই বলুন। আপনার মন খারাপ হয়েছে বলে...।

অশেষ—সত্যি কথা। এখন আপনারা যদি কাল আমাদের আলিপুরের বাড়িতে গিয়ে দয়া করে খুড়িমা ও সুধার সঙ্গে একটু গল্প করে , সামান্য কিছু খেয়ে...।

অলকা হাসে—তার চেয়ে আরও ভাল ব্যবস্থা তো হতে পারে।

অশেষ —বলুন কী ব্যবস্থা?

অলকা—সবচেয়ে ভাল, আপনিই যদি কাল দুপুরে আমাদের এখানে এসে সামান্য কিছু খেয়ে....।

অশেষ—বেশ তো।

অলকা—বেশ; আপনার নিমন্ত্রণ রইল।

অশেষ—তা হলে বলুন, আজকের ওই ব্যাপারের জন্য আমার সম্পর্কে কোনও খারাপ ধারণা আপনার ...আপনাদের মনে থাকবে না।

অলকা—না।

—আচ্ছা, এখন তবে আসি। চলে যাবার জন্য রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায় অশেষ। ল্যাম্পপোস্টের মাথার আলো সোজা এসে অশেষের মুখের উপর পড়েছে। হাতটাকে আলোর দিকে তুলে ঘড়ি দেখে অশেষ।

অলকা চৌধুরীর গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হয়; আর চোখের ছোট ভ্রূকুটি একবার শিউরে ওঠে। ত্রিদিব সরকারের আত্মীয় হয়, এই ভদ্রলোকের কথা আচরণ হাসি বিস্ময় অনুনয় আর যুক্তি সবই অদ্ভুত। শুধু অদ্ভুত নয় মুখটা।

কিন্তু ওই সরল মুখটা কি সত্যিই একটা সরল মনের ছবি? মনের ভিতরে কি অদ্ভুত কোনও সংকল্প নেই?

যেভাবে কথা বললেন, অকাতরে যে ধরনের ভর্ৎসনা সহ্য করলেন, এবং যে সব কথা বললেন, তাতে তো এই সন্দেহ করতে হয় যে ভদ্রলোকের মাথায় ছিট আছে। মুখ দেখে অবশ্য মনে হয় না যে ভদ্রলোক একজন পাগল গোছের কিংবা খামখেয়ালি লোক। ...কিন্তু এটাও তো মিথ্যা নয় যে, অনেক সময় মুখ দেখে পাগল আর সেয়ানা চেনা যায় না। পাগলের মুখ জ্ঞানীর মত, আর মতলবের মানুষের মন নিতান্ত সরল হয়ে থাকে। এই ভদ্রলোক কি সেই রকম একজন সরল মানুষ? কোনও উদ্দেশ্য নেই?

অলকা চৌধুরীও জানে, ওর গম্ভীর মুখ দেখে অনেকে ভুল করে এই ধারণা করে যে, ওর মন বুঝি ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু অলকা নিজেই জানে যে, কত চতুর সতর্ক আর কত ধূর্ত এই অলকা চৌধুরীর মন। মানুষ চিনতে জানে অলকা। একটি কথায় মানুষের মনটাকে বাজিয়ে ভিতরের ইচ্ছার রকমটা বুঝে ফেলতে পারে অলকা। সেই জন্যেই তো অলকার জীবন ঠকেনি।

অশেষ ডাক্তারের মনের ভিতর যদি কোনও ইচ্ছা থাকে, তবে সেই ইচ্ছাকে এখনি ধরে ফেলতে পারা যায়। সেটুকু বুদ্ধি আছে অলকার এবং লোভও হয় অলকার, অদ্ভুত একটা কৌতুকের মত লোভ; সেই বুদ্ধির কৌশলে অশেষ ডাক্তারের ইচ্ছাটাকে এই মুহূর্তে ধরে ফেলতে।

—অশেষবাবু। ডাক দেয় অলকা।

—বলুন। মুখ ফিরিয়ে তাকায় অশেষ।

—আপনি তো কাল দুপুরে আসছেন।

—নিশ্চয়।

—আমি দুপুরে বাড়িতে থাকব না।

—বিশেষ কোনও কাজ আছে?

—না, বিশেষ কোনও কাজ নেই। এমনি একটু এদিক-ওদিক ঘুরতে বের হব।

—বেশ তো। আপনি যেখানেই থাকুন না, আমি ঠিক যথাসময়ে এসে আমার খাওয়া খেয়ে চলে যাব।

অলকার প্রশ্নের সব সূক্ষ্ম চতুরতা যেন একটা ধাক্কা খেয়ে অলকার মনটাকে চমকে দেয়। সত্যিই তো, অশেষ ডাক্তারের মন একটা সরল মন। খেয়ালি হলেও সরল খেয়াল। বিমান চৌধুরীর এই বাড়িতে এসে অনায়াসে নিমন্ত্রণ খেয়ে চলে যেতে পারবেন ভদ্রলোক; বিমান চৌধুরীর বড় মেয়ের সঙ্গে একটা কথা বলবার জন্য কোনও ইচ্ছার তাগিদা নেই। বলবার সুযোগ না পেলেও অসুখী হবেন না ভদ্রলোক।

এহেন এক ভদ্রলোককে মিথ্যে সন্দেহ করবার লজ্জায় অলকা নিজের উপর রাগ করে; বড় বেশি অভদ্রতা করা হয়েছে। অলকা বলে—অনেক রাত হয়েছে অশেষবাবু।

ব্যস্ত হয়ে অশেষ বলে—হ্যাঁ, এই যে যাচ্ছি।

একচল্লিশের-এক নম্বরের এই বাড়িতে যথা সময়ে অর্থাৎ দুপুরে নিমন্ত্রণ খেতে এসে যাকে দেখতে পাবে না বলে জানা ছিল অশেষের, এসে দেখতে পায় যে, সে-ই শুধু আছে, আর কেউ নেই।

অশেষ—একি ব্যাপার? যাঁকে দেখতে পাব বলে আশা করিনি, তিনিই আছেন দেখছি। আর যাঁদের সঙ্গে অনেক গল্প করব বলে মনে মনে তৈরি হয়েছিলাম, তাঁরাই নেই!

অলকা হাসে—হ্যাঁ, আমি জানতাম না যে, আজ দুপুরে হাওড়ায় আমার বড় মামার বাড়িতে সবারই যাবার কথা ছিল । এটাও একটা নিমন্ত্রণের ব্যাপার। না যেয়ে উপায় ছিল না, তাই সকলকে যেতে হল। শুধু আমি বাধ্য হয়ে থেকে গেলাম।

অশেষ—ভুল করে নেমতন্ন করার শাস্তি।

অলকা—শাস্তি কেন হবে? বাবা আর মা দুজনেই দুঃখ করে বলে গিয়েছেন যে, আপনি যেন কিছু না মনে করেন।

অশেষ—আমি দুঃখ করব কেন? আবার আসবার একটা ছুতো পেয়ে গেলাম।

অলকা—আসতে হলে ছুতোর কোনও দরকার হয় কি?

অশেষ—হয় বৈকি! আপনি কাল আমাকে যেরকম ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন...।

অলকা—হ্যাঁ, একটু অন্যায় হয়ে গিয়েছে অশেষবাবু। কী করব বলুন, একজন ভদ্রলোক, যার সঙ্গে মাত্র একঘণ্টা আগে আলাপ হয়েছে, সেই ভদ্রলোক যদি রাত বারোটার সময় জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়, তবে....?

অশেষ—তবে পুলিশ ডাকা উচিত।

অলকা—আপনিই বলুন, একটু সন্দেহ হয় না কি?

অশেষ—হওয়া উচিত। কিন্তু এই যে এসে এখন নেমন্তন্ন খাচ্ছি, এটা আমার কোনও সন্দেহজনক ব্যবহার নয় তো?

অলকা হেসে ফেলে—মানুষ চিনতে পারি।

অশেষ—অমানুষ চিনতে পারেন কি?

অলকা—হ্যাঁ?

অশেষ—বুঝলাম; আমাকে দেখে প্রথমে অমানুষ মনে হয়েছিল, পরে মানুষ মনে হয়েছে।

অলকা—আপনিই বা আমাকে কী মনে করেছেন, কে জানে?

অশেষ—একটু আশ্চর্য মনে হয়েছে।

অলকা—প্রশংসা করে বলছেন, না নিন্দে করে?

অশেষ—প্রশংসা করে বলছি। আমার ভাবতে আশ্চর্য লাগছে; আপনি কেন রাগের মাথায় আমাকে নেমতন্ন করে বসলেন।

অলকা—না। যখন বুঝলাম যে, সত্যিই আপনি একটা সামান্য ব্যাপারের জন্য খুবই দুঃখিত হয়ে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন, তখন...।

অশেষ—এই মাত্র?

অলকা—শুধু এই মাত্র নয়, দেখলাম আপনি নিতান্ত সরল মনের মানুষ।

অশেষ—তার মানে?

অলকা—তার মানে, বুঝলাম যে আপনার কাছ থেকে কোনও ভুল কথা শোনবার ভয় নেই।

অশেষ—কিসের ভুল কথা অলকা চৌধুরী?

অলকা—আপনার মত মানুষের পক্ষে আমার মত মানুষকে যেকথা বলা উচিত নয়।

অশেষ—বুঝেছি। কিন্তু এসব কথা আপনার মনেই বা এল কেন?

অলকা—আপনি যদি ভরসা দেন যে, আমাকে নির্লজ্জ বলে মনে করবেন না, তবে বলতে পারি।

অশেষ— নিশ্চয় মনে করবো না। বলুন।

অলকা— আমার বিয়ে।

অশেষ—কবে?

এলকা—এখনও দিন ঠিক নেই। তবে খুব শিগগিরই।

অশেষ— এইবার আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

অলকা—হ্যাঁ, অনায়াসে।

অশেষ—এই বিয়ে নিশ্চয় ভালবাসার পর বিয়ে?

অলকা চৌধুরীর এতক্ষণের মুখরতার আবেগ হঠাৎ এই সরল প্রশ্নের স্পর্শে লজ্জিত হয় যেন। মাথা হেঁট করে মুখের একটা নিবিড় রক্তিমতার শিহরণ লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে অলকা। তার পরেই মাথা নেড়ে স্বীকার করে। —হ্যাঁ।

অশেষ—দুজনের অনেকদিনের পরিচয় নিশ্চয়।

অলকা—হ্যাঁ। প্রায় পাঁচ বছরের পরিচয়।

অশেষ—ভদ্রলোক নিশ্চয় খুব শিক্ষিত মানুষ।

অলকা—শিক্ষিত তো বটেই, বিদ্বানও বলতে পারেন। আর...।

অশেষ—বলুন।

অলকা—আর আশ্চর্য রকমের উদারও বলতে পারেন।

অশেষ—কেন?

অলকা—তা না হলে এত টাকা-পয়সার মানুষ হয়ে আমার মত এরকম একটা আশি টাকার মাস্টারনি মানুষকে কি কেউ আপন করতে চায়?

অশেষ—ঠিকই বলেছেন আপনি। কিন্তু আপনি কি তাঁর এই উদারতার জন্যই—।

অলকা—না অশেষবাবু; আমি গরিব হলেও আমার যথেষ্ট অহংকার আছে; যে অহংকার সেই ভদ্রলোকের টাকার অহংকারের চেয়ে কম শক্ত আর কম জেদী নয়। তাঁর টাকা থাক বা না থাক, আমি গ্রাহ্যই করি না। কিন্তু একটা সত্য গ্রাহ্য করতে হয়; টাকার মানুষ হয়েও যে মানুষ গরীবের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, সে-মানুষ মহৎ মনের মানুষ।

অশেষ—নিশ্চয়। সেই জন্যে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি শুধু এই প্রমাণ পেয়েই...।

অলকা—এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে?

অশেষ—কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যে বিয়েটা হয়ে গেল না কেন?

অলকা—সেটাও ভদ্রলোকের একটা শুভেচ্ছার জন্য। তাঁর ইচ্ছা...।

মাথা হেঁট করে লজ্জিতভাবে কথা বলে অলকা—তাঁর ইচ্ছা আমিও বিদুষী হয়ে উঠি। আগে তাঁর দাবি ছিল, আমি এম-এ পাশ করব একটা ডক্টরেটও নেব, তারপর বিয়ে হবে। কিন্তু ....।

অশেষ—কী?

অলকা— এখন তিনি আমারই ইচ্ছার সম্মান রাখতে চেয়েছেন। আমি বলেছি, বিয়ের পরেও তো আমার পড়াশুনা চলতে পারে।

অশেষ হাসে—তাই তো উচিত। বিদ্বান স্বামীর স্ত্রীর পক্ষে পড়াশোনা করবার সুবিধা কত। গুরু যিনি পতিও তিনি, আপনার মত মেয়ের পক্ষে এই রকমই জীবন হওয়া উচিত।

খাওয়া শেষ হবার পর সিগারেট ধরিয়ে যখন ভিতর বারান্দা থেকে বাইরের ঘরে এসে দাঁড়ায় অশেষ তখন বুঝতে পারে অশেষ, নিমন্ত্রণ খাইয়ে এই একচল্লিশের-এক নম্বর যেন প্রচণ্ড একটা ঠাট্টা করলো।

এখন কল্পনা করতে পারে অশেষ, বিমান চৌধুরীর মেয়ে গভীর রাতে আলোর কাছে মুখ ভাসিয়ে রেখে যে হাসি হাসছিল, সে হাসি এক বিদ্বান ভদ্রলোকের জীবনের জন্য উৎসর্গ করা হয়ে গিয়েছে। তখন ঠিকই সন্দেহ হয়েছিল। এবং সেই সন্দেহের পর আর এখানে আসবার জন্য একটা মূর্খ খেয়ালের তাড়না স্বীকার করা উচিত ছিল না।

কী অদ্ভুত উৎসাহ নিয়ে, কত মুখরতা করে, আর কত সহজে বিমান চৌধুরীর এই সরল-গম্ভীর মেয়ে তার জীবনের ভালবাসার ইতিহাস কত স্পষ্ট করে, এবং কত গর্ব করে বলে দিল। অলকার এই মুখরতা যেন অশেষের উপর একগাদা তুচ্ছতার ধূলিবর্ষণ। তা না হলে, একটু সংকোচ বোধ করত অলকা; একটু ভয় পেত, এবং বুঝতে পারত যে, একদিনের পরিচিত এক ভদ্রলোকের কাছে নিজের জীবনের ভালবাসার একটা গর্বময় বর্ণনা করা কোনও মেয়ের পক্ষে উচিত নয়।

তবে একটা উপকার করেছে অলকা। যথাসময়ে অশেষকে সাবধান করে দিয়েছে। কোনও ছুতো করে এখানে আসলে যেন একটি বিষয়ে সাবধান থাকে অশেষ। অপরের ভালবাসার নারীকে কোনও অদ্ভুত কথা, কোনও ভুল কথা বলবার চেষ্টা না করে। জেনে ভালই হল, ভাগ্য ভাল যে অলকা একটু বেশিরকমের নির্লজ্জ আর মুখর হতে পেরেছে। তাই এখন নিশ্চিন্ত হতে পারছে অশেষ, অলকা চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হবার অধিকার তার নেই।

সব চেয়ে ভাল হল, অলকার কাছে অপমানিত হবার আশংকা থেকে বেঁচে গেল অশেষ। সত্যিই যে অলকা চৌধুরী দেখতে ভাল, এবং ওইরকম সুন্দর মুখ দেখবার জন্য মানুষের চোখ হঠাৎ ভুলে ব্যস্ত হয়ে উঠতেও পারে। সে ভুল অশেষও করে ফেলত কিনা কে জানে? আর, এইরকম একটি ঘরের নিভৃতে, যেখানে অলকা ছাড়া আর কেউ নেই, সেখানে অলকার মুখের দিকে আর বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে হঠাৎ একটা ভুল কথা মুখ থেকে বের হয়ে যেত বোধ হয়।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তৈরি হয় অশেষ, আর বৃথা দেরি না করে চলে যাওয়াই ভাল। মানে মানে সরে পড়বার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে। এইবার যাবার আগে অলকাকে শুধু একটা ধন্যবাদ জানানো ছাড়া আর কোনও কথা বলবার নেই। হ্যাঁ... যখন এত কথাই জিজ্ঞাসা করা হল, তখন আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে আপত্তি কী! এবং এটা যে একটা জিজ্ঞাসাও বটে।

অলকা ঘরে ঢুকতেই অশেষ জিজ্ঞাসা করে। —অনেক কিছু জানলাম, কিন্তু ভদ্রলোকের নামটা তো জানলাম না।

অলকা—জানতে পারবেন একদিন।

অশেষ—কিন্তু আমাকে জানাতে আপত্তি কিসের। আমার মত একজন সামান্য পরিচিতের কাছে যখন এতগুলি কথা বললেন, তখন কেন..।

টেবিলের উপর থেকে মোটা একটা বই তুলে নিয়ে অশেষের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে সোজা অশেষের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে অলকা— এটা তাঁরই বই, তাঁর নাম পাবেন এর ভিতরে।

অশেষের হাত কেঁপে ওঠে। যেন হঠাৎ ঘৃণায় জ্বালায় কেঁপে উঠেছে হাতটা। অলকার এই মুখ একটা বেহায়া মুখ। এই হাসি নির্লজ্জ হাসি। অত্যন্ত চটুল ফাজিল অর লঘু স্বভাবের এই অলকা, যার চেহারা দেখেই বোঝা যায়, বয়স তিরিশের বেশি ছাড়া কম নয়। ঠাট্টা-সম্পর্কের কোনও পুরুষ আত্মীয়ের কাছেও কোন বয়স্কা মেয়ে জীবনের ভালবাসার কীর্তি এমন করে দেখায় না। মুখ এত গম্ভীর অথচ স্বভাব এত চটুল হতে পারে, এটা বিমান চৌধুরীর এই মেয়েকে এই অবস্থায় না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না।

অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে অশেষের এই কিছুক্ষণ আগের ধারণাগুলিও যেন ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়তে থাকে। মুখে বড় বড় গরিবি অহংকারের কথা, কিন্তু মনটা আসলে একটা বড়লোকের বউ হবার জন্য লোভের স্বপ্ন দেখছে। এই লোভটাকেই পাঁচ বছরের একটা অবিকার খাঁটি প্রেমের ব্যাপার বলে মনে করে নিজেকে একটা আদর্শ প্রেমিকা বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছে অলকা।

বইটা খুলে বই-এর প্রথম পাতায় লেখা নামটার দিকে তাকায় অশেষ। সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে। বইটা বন্ধ করে দিয়ে অলকার মুখের দিকে তাকায়; আর্তনাদের মত শব্দ করে শিউরে ওঠে অশেষের গলার স্বর—ডক্টর শৈলেশ্বর ঘোষ!

অলকা—হ্যাঁ, চেনেন নাকি!

অশেষ—চিনি না, নাম শুনেছি।

অলকা—আর একটা কথা আপনি শুনলে আমাকেও একটু প্রশংসা করবেন।

অশেষ—কী?

অলকা—আমার মত অল্পশিক্ষিতা মেয়েও তাঁর থিসিস লেখার কাজে অনেক সাহায্য করতে পেরেছে।

অশেষ—কী সাহায্য করেছেন আপনি?

অলকা—তিনি যে বিষয়ে বলেছেন, সেই বিষয়ে যত ভাল ভাল বই ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে আমি নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়েছি।

অশেষ—আর কী সাহায্য করেছেন?

অলকা— কত বই থেকে কত চ্যাপটার নিজের হাতে কপি করে দিলাম। দিস্তা দিস্তা কাগজ সারা রাত ধরে লিখে ভরে ফেলেছি।

অশেষ—আর কী?

অলকা— প্রেসে গিয়েছি, তাগিদ দিয়ে তাঁর লেখার প্রুফ তাড়াতাড়ি আদায় করে নিয়ে এসেছি।

অশেষ—আর কী?

অলকা মাথা হেঁট করে মুখের একটা বিচিত্র লজ্জা লুকোতে চেষ্টা করে—আর কিছু না। আপনি খুব বেশি জিজ্ঞাসা করে ফেলেছেন।

অশেষ—বলুন, জানতে চাই। আমার কাছে আপনার লজ্জা কিসের? অশেষের কথাগুলি যেন একটা চাপা গর্জনের মত ফুটতে থাকে। আর চোখ দুটোও অদ্ভুত ভাবে জ্বলতে থাকে।

অলকা আশ্চর্য হয়—আপনি বোধ হয় খুব বেশি রকম একটা কিছু সন্দেহ করেছেন।

অশেষ—হ্যাঁ।

অলকা—আপনার সন্দেহ ঠিক নয়!

অশেষ—তার মানে?

অলকা গম্ভীর হয়ে বলে—তার মানেও মুখ খুলে বলব, এতবড় বেহায়া আমাকে মনে করবেন না।

কথা শেষ করতেই অলকার চোখের কোণদুটো ছলছল করে ওঠে। অলকা বলে—চিরজীবন যার সঙ্গে থাকতে হবে, তার সেই অনুরোধ যদি রাখতে পারতাম, তবে এমন কিছু ভুল বোধ হয় হত না। কিন্তু কে জানে কেন, বড় ভয় হল। শৈলেশ্বরের অনুরোধের কথা শুনে বুক কেঁপে উঠল। পালিয়ে এলাম। তারপর আর যাইনি। যেতে লজ্জা লাগে। শৈলেশ্বর কত দুঃখ পেল বুঝতে পেরেছি। তাই বার বার চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছি বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলা হোক। শিগগির বিয়েটা হয়ে যাক।

অশেষ— কী বলে শৈলেশ্বর ? কী উত্তর দিয়েছে?

অলকা—আশ্চর্য, কোনও উত্তরই দেয়নি।

অশেষ— দেখা করে কথাটা বলেছিলেন?

অলকা— না বড় ভয় আর বড় লজ্জা করে অশেষবাবু; কিন্তু আমার তো মনে হয়. আমি কোনও ভুল করিনি।

অশেষ—আচ্ছা চলি। হ্যাঁ সত্যি করে বলুন তো, আমার কাছে এসব কথা এত সহজে আপনি কেন বললেন? কেমন করে বলতে পারলেন? এসব কথা কোনও মেয়ে যে তার বাপ-মার কাছে, তার মেয়ে বন্ধুর কাছেও বলে না।

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে অলকা। আস্তে আস্তে ঠোঁট কাঁপিয়ে বিড় বিড় করে। একটা কথা আপনাকে বলিনি অশেষবাবু, শৈলেশ্বর বলেছে—আমার নাকি হিস্টিরিয়া আছে।

অশেষ—হিস্টিরিয়ার ঝোঁকে এসব কথা আর কার কাছে বলেছেন?

অলকা—বিশ্বাস করুন, কারুর কাছে বলিনি। এই প্রথম আজ আপনার কাছে বলে ফেললাম। কেন বললাম, তাও বুঝতে পারছি না।

অশেষ—আপনি বোধ হয় নিজেকে খুব চালাক, খুব সাহসী আর খুব সাবধানী বলে মনে করেন।

অলকা—হ্যাঁ শৈলেশ্বর বলে, এটাও নাকি আমার একটা হিস্টিরিয়া।

অশেষ—কখনও ভেবে দেখেছেন কি, শৈলেশ্বর ঘোষের সঙ্গে আপনার যে ভালবাসা হল, সেটাও একটা হিস্টিরিয়া কিনা?

অলকার চোখ দুটো যেন একটা অদ্ভুত আতঙ্কে জ্বলতে থাকে। —না। এমন সন্দেহের কোনও অর্থ হয় না। আপনি আমার মনে বৃথা সন্দেহ এনে দেবার চেষ্টা করছেন। আপনি মনে করেছেন যে...।

অশেষ—কী?

অলকা—আমার ভালবাসা ভুয়ো?

অশেষ—না, তা মনে করব কেন?

অলকা—যাক, খুব বেঁচে গেলেন আপনি।

অশেষ—কেন?

অলকা—যদি ভুয়ো বলতেন, তবে আপনাকেই সন্দেহ করতাম।

অশেষ—যাক; আমি চলি এবার।

—অশেষবাবু। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে যেন বাধা দেয় অলকা।

অশেষ—বলুন।

অলকা—আমি আজ আরও একটা কাণ্ড করেছি; বোধ হয় হিস্টিরিয়ার ঝোঁকে আপনাকে কতগুলি মিথ্যে কথা বলেছি।

অশেষ —কি মিথ্যে কথা ?

অলকা—বাবা, মা আর তিলকা, ওরা কেউ হাওড়াতে মামার বাড়িতে আজ যেতে চায়নি, আমিই জোর করে ওদের পাঠিয়ে দিয়েছি।

অশেষ—কিসের জন্য?

অলকা—এখন মনে হচ্ছে; বোধ হয় আপনার সঙ্গে একলা বসে গল্প করবার জন্য।

অশেষ—হ্যাঁ, খুব ভুল করেছেন।

অলকা—ভুল করি আর যাই করি... আমার একটা উপকার করতে হবে অশেষবাবু।

অশেষ—যদি সাধ্যি থাকে, করব।

অলকা—শৈলেশ্বরের কাছে একবার আপনাকে যেতে হবে।

অশেষ—কেন?

অলকা—একবার জিজ্ঞাসা করবেন, আর দেরি করছে কেন? এই মাসেই তো আমাদের বিয়ে হয়ে যেতে পারে।

অশেষ—যদি এ মাসেই না হয় তবে...তবে ক্ষতি কী? পাঁচ বছর যখন অপেক্ষা করতে পেরেছেন, তখন...।

অলকা—না আর অপেক্ষা করতে পারছি না। অপেক্ষা করবার ইচ্ছে নেই, শক্তিও বোধ হয় আর নেই। আপনি তো বিশ্বাস করতে পারবেন না, শৈলেশ্বরও ধারণা করতে পারে না যে, আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ওর কথা ভাবি। সমস্তক্ষণ ভাবি অশেষবাবু। আমি আনমনা হতে চেষ্টা করলেও আমার মন শৈলেশ্বরকে ছাড়তে চায় না। তাই আপনাকে বলছি একটা উপায় বের করুন।

অশেষ ভ্রূকুটি করে তাকায়। —আপনি নিজে গিয়ে শৈলেশ্বরের কাছে একথা জিজ্ঞাসা করতে পারছেন না কেন?

অলকা—বলেছি, অনেকবার বলেছি; কিন্তু উনি যেটা বলেছেন, সেটা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। শৈলেশ্বর বলেছেন, এখনই বিয়ে হওয়া উচিত নয়।

অশেষ— এই যে কিছুক্ষণ আগে বললেন, খুব শিগগিরি আপনাদের বিয়ে।

অলকা—বলেছিলাম বোধ হয়।

অশেষ—শৈলেশ্বর যদি শেষ পর্যন্ত সত্যিই আপনাকে বিয়ে না করে, তবে?

অলকা—তবে শৈলেশ্বর নিজেই ঠকবে।

অশেষ —কেন?

অলকা—আমার মৃত্যু হবে। নিজের চেষ্টায় চুপচাপ মরে যাব।

অশেষ—তাতে শৈলেশ্বরের কী ক্ষতি হবে?

অলকা—আমার মত আর কে ভালবাসবে শৈলেশ্বরকে ? কার সাধ্যি আছে?

অশেষ—শৈলশ্বরকে আপনি খুব বেশি ভালবাসেন?

অলকা—হ্যাঁ অশেষবাবু। জানি না কেন? কত ভোগাচ্ছে, কষ্ট দিচ্ছে, বার বার হতাশ করে দিচ্ছে, তবু।

আবার ফুঁপিয়ে ওঠে অলকা। —কী ইচ্ছে করে জানেন? ইচ্ছে করে শৈলেশ্বর আর কাউকে ভালবাসুক, বিয়ে করুক। তারপর ওর জন্য আর ভাবনা করবার কিছু থাকবে না। ও সুখী হয়েছে, আমি শুধু এটুকু জেনেই নিশ্চিত হয়ে অনায়াসে মরে যেতে পারব, বিশ্বাস করুন অশেষবাবু।

অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করে এইবার নিজেরই মনের ভিতরের একটা বিচিত্র ঝড়ের শব্দ যেন শুনতে থাকে অশেষ। অদ্ভুত একটা মায়াময় বেদনার আবেগ যেন ঝড় হয়ে শব্দ করছে। জীবনের সব আশা কী-ভয়ানক এক ছলনার কাছে সঁপে দিয়েছে কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরীর মেয়ে অলকা। মানুষ যে নিশির ডাক শুনেও এত ভুল করে না। শৈলেশ্বর ঘোষ কোনও মুহূর্তেও অলকা নামে এই নারীকে জীবনের সঙ্গিনী হবার জন্য আহ্বান করেনি। শুধু নিজের স্বার্থে আর দরকারে দাসীর মত খাটিয়েছে। একটা প্রচণ্ড লোভের ইচ্ছাকেও সফল করতে চেষ্টা করেছে।

কিন্তু শৈলেশ্বরের এই সব নির্মমতাকেই মমতার চরম বলে বিশ্বাস করে ফেলেছে অলকার মত একজন শিক্ষিতা মেয়ে, বয়স যার ত্রিশের কম নয়।

এখনও এই সামান্য সন্দেহ করবার মত বুদ্ধির উদয় হল না অলকার মনে, শৈলেশ্বর যে কোনওদিনও সত্যি অলকাকে ভালবাসতে চায়নি; আজও জানে না অলকা, আর কয়েক ঘন্টা পরে, অলকার মনের সকল আবেগ আশা মোহ আর ভালবাসার আস্পদ সেই শৈলেশ্বর ওই ত্রিদিব সরকারের জামাই হবার জন্য এই পাড়াতেই একটা বিরাট বাড়ির ভিতরে হাজার মানুষের চোখের সামনে অনায়াসে একটা উৎসবের আসরে আসীন হবে।

শৈলেশ্বর হল শৈলেশ্বর। শৈলেশ্বরের মত প্রকৃতির মানুষ বর্বর কি অবর্বর সে প্রশ্ন নিয়ে বিচার করবার আর মনের ভিতরে একটা তর্ক বাধাবার ইচ্ছাও নেই অশেষের। অশেষের মনের ভিতরে যে ঝড়ের শব্দ বাজছে, তার মধ্যে একটি করুণ শব্দ সবচেয়ে বেশি করুণ বলে মনে হয়। একটা আক্ষেপ। বিমান চৌধুরীর মেয়ে অলকা চৌধুরীর চেয়ে বেশি মূর্খ মেয়ে পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ। একটা মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে অলকার আত্মাটাই মূর্খ হয়ে গিয়েছে। এত মূর্খ যে, এখন নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার ইচ্ছার জোর পাচ্ছে না।

অশেষের বুকের ভিতর একটা রাগের জ্বালা হঠাৎ ছটফট করে ওঠ, এমন মূর্খ মেয়ের মরে যাওয়াই উচিত।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অশেষের নিঃশ্বাসের বাতাস যেন অদ্ভুত এক সমবেদনার ছোঁয়ায় কেমন হয়ে যায়। —মূর্খ বলেই মরবে কেন! মূর্খ বলেই তো ওকে বাঁচানো উচিত। কিন্তু বাঁচাবেটা বা কে? আর কি করেই বা বাঁচানো যায়?

মাথা হেঁট করে, যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন একটা মুখ নিয়ে, আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকে অশেষ। দরজাটা পার হয়ে পথের উপর নেমে পড়তেই অলকার ডাক শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

অলকা—কোনও কথা না বলে ও ভাবে চলে যাচ্ছেন কেন অশেষবাবু?

অশেষের চোখ দপ্ দপ্ করছে। —কিভাবে চলে যাচ্ছি?

অলকাও আস্তে আস্তে এগিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ায়।—

—আপনি বোধ হয়...

—অশেষ—কী?

অলকা—আমাকে সত্যিই হিস্টিরিয়া রোগী বলে মনে করছেন!

অশেষ—তা মনে করতে হচ্ছে বইকি!

অলকা—তার মানে আপনি আর এ বাড়িতে আসবেন না?

অশেষ—না।

অলকা—কেন?

অশেষ—আমি যখন আপনার কোনও উপকার করতে পারব না তখন.....।

অলকা—শৈলেশ্বরের কাছে গিয়ে আমার হয়ে দুটো কথা বলবেন, এটা কি একটা খুব কঠিন কাজ?

অশেষ বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুটি করে। —খুব কঠিন কাজ।

অলকা—কেন?

অশেষ কিছুক্ষণ অপলকভাবে অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর যেন একটা লোভী সমবেদনার ব্যাকুলতা জোর করে চাপা দিয়ে আস্তে অনুরোধের সুরে বলে—আপনার চোখ বড় বেশি লাল হয়ে উঠেছে। আমার অনুরোধ, এখন চুপচাপ শুয়ে পড়ুন। অন্ততঃ ঘণ্টা তিন চার ঘুমিয়ে থাকুন।

আর কোনও কথা না বলে, পুরনো বাগান স্ট্রিটের দুপুরের রোদের সঙ্গে মনের জ্বালা মিশিয়ে দিয়ে হন্‌হন্‌ করে হাঁটতে থাকে অশেষ।

শুভ উৎসবের সন্ধ্যা। নিমন্ত্রণের ভিড়ে গম্‌গম্‌ করে পুরনো বাগান স্ট্রিটের এক নম্বর।

হলঘরের বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের আসরের কাছে এসে সৌজন্য ও আপ্যায়ন পর্ব পালন করতে থাকেন ত্রিদিব সরকার।

টি ম্যাকফার্সন লিমিটেডের যিনি বড়বাবু , অর্থাৎ ক্ষমতার দিক দিয়ে সর্বেসর্বা, যাঁর কাছে থেকে আজকাল বিরাট একটা অনুগ্রহ আশা করছেন ত্রিদিববাবু; সেই মুখার্জিবাবুর কাছে এসে দাঁড়িয়ে ত্রিদিববাবু বলেন—আপনাকে আমি স্যার নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াব!

এই মুখার্জিবাবু অনুগ্রহ করে একটি সই ছাড়লে ত্রিদিব সরকারের টেন্ডার জয়ী হয়ে যাবে, এবং একটা সাপ্লাই-র যে আশি হাজার টাকার কন্ট্রাক্ট পেয়ে যাবেন, তা থেকে কম করেও লাভ থাকবে বিশ হাজার টাকা।

মুখার্জিবাবু বলেন—আমি একটা বাতাসাও মুখে দেব না ত্রিদিববাবু। আমি বাড়ির বাইরে হাওয়া ছাড়া আর কিছু খাই না।

ত্রিদিববাবু হাত জোড় করেন— আমার কথা ভেবে একটু দয়া করুন স্যার।

মুখার্জিবাবু—না মশাই, আপনার ওপর বিশেষ দয়া করতে গিয়ে আমি নিজেকে প্রাণে মারতে পারবো না। বাঙালি বাড়ির নিমন্ত্রণের খাবারের গন্ধ নাকে গেলেও আমার অসুখ করে।

ত্রিদিববাবু—তা হলে আর কী বলব বলুন?

মাথার উপরে বিদ্যুতের পাখা ঘুরছে, ত্রিদিববাবু তবু একটা হাতপাখা হাতে দিয়ে মুখার্জিবাবুর কাছে এগিয়ে যান। আপত্তি করেন মুখার্জিবাবু। —আহা করেন কি মশাই? তা ছাড়া, আমি এখনি উঠব।

ত্রিদিববাবু—আরও কিছুক্ষণ থেকে যান স্যার।

মুখার্জিবাবু—না। আমি যাঁর আসবার অপেক্ষায় এতক্ষণ বসে ছিলাম, তিনি আর আসবেন বলে মনে হচ্ছে না।

ত্রিদিববাবু—কে? কে স্যার? কার অপেক্ষা করছেন আপনি?

মুখার্জিবাবু—বিমান চৌধুরী।

ত্রিদিববাবু—এ নামের কোনও ভদ্রমোহদয় এখানে আসবেন বলে তো মনে হচ্ছে না।

মুখার্জিবাবু— সে কি? ....ও এইবার বুঝলাম; বিমান চৌধুরীর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়নি নিশ্চয়!

ত্রিদিববাবু—কোথায় থাকেন তিনি?

মুখার্জিবাবু—এই তো, আপনাদের পুরনো বাগান স্ট্রিটের কোনও বাড়িতে থাকেন। নম্বরটা আমার মনে পড়ছে না।

—অশেষ, এদিকে এসো। চেঁচিয়ে ডাক দেন ত্রিদিববাবু। এবং অশেষ কাছে এসে দাঁড়াতেই প্রশ্ন করেন—এ কী রকমের ব্যাপার হল? এই পাড়াতে এমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকতে আমার এখানে তাঁর নিমন্ত্রণ হল না, এ কি রকমের ব্যাপার? বিমানবাবুর নিমন্ত্রণ হয়নি কেন?

অশেষ—কোন বিমানবাবু? কম্পাউন্ডার?

মুখার্জিবাবু বলে ওঠন—হ্যাঁ কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরী। আমি ওকে বলি, দেবতুল্য চৌধুরী। আমি জীবনে মাত্র একবার আমার চেয়ে বয়সে ছোট একটি ব্যক্তিকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছি, তিনি হলেন এই বিমান চৌধুরী। অনেক বছর আগে, বোম্বাই থেকে ট্রেনে কলকাতায় ফিরছি, হাওড়াতে নেমে একটা ট্যাক্সিতে ওঠবার পর দেখি, আমার ক্যাশব্যাগটাই নেই। কোম্পানির এক লক্ষ এগারো হাজার টাকার নোট সেই ব্যাগে ছিল। ট্যাক্সির ভিতরে আমি প্রায়

জ্ঞান হারিয়ে বসেছিলাম। আর বাড়ি ফিরে সারারাত পাগলের মত বিড়বিড় করেছিলাম। সকাল হতেই এক অচেনা ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন, আর সেই ক্যাশব্যাগটি দিলেন। আমি পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিতে গিয়েই বুঝলাম, এরকম মানুষ এখনও পৃথিবীতে আছে।

অশেষ—উনি পুরস্কার নেননি নিশ্চয়।

মুখার্জিবাবু—না।

অশেষ—উনিই নিশ্চয় কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরী?

মুখার্জিবাবু—হ্যাঁ, সেকথাই তো বলছি। একশো চার ডিগ্রি জ্বর গায়ে নিয়ে দুমাইল রাস্তা ধুঁকতে ধুঁকতে পার হয়ে এসে একটা কম্পাউন্ডার মানুষ এক লক্ষ এগারো হাজার টাকা আমাকে দিয়ে চলে গেল, তাঁকে কি সত্যই কম্পাউন্ডার বলে মনে হয় বলুন? আমি প্রণাম করেছিলাম তাঁকে। এখনও মাঝে মাঝে এসে প্রণাম করে যাই। এরকম একজন দেবতুল্য মানুষ পাড়ায় থাকতে আপনি তার খবর রাখেন না, নিমন্ত্রণ করেন না ত্রিদিববাবু? অদ্ভুত।

বুকে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন ত্রিদিব সরকার।—নিমন্ত্রণ করা হয়েছে স্যার। বিশ্বাস করুন। আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি যে, আপনি আমার শ্রদ্ধেয় কম্পাউন্ডারবাবুর কথা বলছেন।... এই তো অশেষ নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এসেছে।

ভ্রূকুটি করে অশেষ—না।

ত্রিদিববাবু অশেষের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করেন—কেন? তবে কি তুমি সত্যই ভুল করে...।

কোনও কথা না বলে, ত্রিদিব সরকারের এই প্রচণ্ড কপটতাকে বোধ হয় আর সহ্য করতে না পেরে সেই মুহূর্তে সরে যায় অশেষ। মুখার্জিবাবুর দিকে তাকিয়ে ত্রিদিববাবু বলেন—দেখলেন তো স্যার, এই সব ছেলে ছোকরাদের ভুল? কী সাংঘাতিক ভুল।

মুখার্জিবাবু—যেতে দিন ওসব কথা। আমি নিজেই যাচ্ছি। বিমানবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করেই বাড়ি যাব।

ত্রিদিববাবু—একটু বসুন স্যার। আমি যাচ্ছি । আমি বিমানবাবুকে ডেকে আনছি। অশেষ যে ভুল করেছে, সে ভুলের জন্য আমি বিমানবাবুর কাছে মাপ চেয়ে, তাঁর হাত ধরে তাঁকে এখানে নিয়ে এসে তবে খুশি হতে পারব।

মুখার্জিবাবু—থাক মশাই, আপনি ব্যস্ত হবেন না। শুধু বিমানবাবুর সঙ্গে নয়, ওঁর স্ত্রী আর মেয়ে দুটির সঙ্গেও আমার দেখা করবার দরকার আছে।

ত্রিদিববাবু—ওঁরা সকলেই আসবেন স্যার। আমি ওঁদের সবাইকে এখনি গাড়ি করে নিয়ে আসছি। আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে, বিয়ে দেখিয়ে, তারপর নিজের হাতে পরিবেশন করে খাইয়ে তবে আমি ওঁদের ছেড়ে দেব।

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ত্রিদিব সরকার। সত্যই এক মহাভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য ত্রিদিব সরকারের চতুর অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

মুখার্জিবাবু বলেন—এ বছরের নতুন কনস্ট্রাকশনের জন্য ইট সাপ্লাই এর টেণ্ডার দাখিল করেছে যে প্রকাশ গাঙ্গুলি, সে ভদ্রলোকও বিমানবাবুকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করেন। প্রকাশ গাঙ্গুলির ছোট ছেলেটির পিঠের একটা ফোঁড়া অপারেশন হয়েছিল। ছেলেটা ঘুমোতে পারত না। প্রকাশ গাঙ্গুলি বলেন, মশাই কী অদ্ভুত মানুষ কম্পাউণ্ডার বিমান চৌধুরী। সারা রাত জেগে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বসে থাকতেন, আর ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করতেন। যে কাজ ছেলের মার দ্বারা সম্ভব হয়নি, সে কাজ সম্ভব করেছিলেন কম্পাউণ্ডার বিমান চৌধুরী। অথচ একটা পয়সাও দাবি করেননি।

চেঁচিয়ে ওঠেন ত্রিদিব সরকার —আমি চললাম স্যার। শ্রদ্ধেয় বিমানবাবুকে এখনি নিয়ে আসছি।

বর এসেছেন। ত্রিদিব সরকারের মেয়ের বিয়ের লগ্ন আসন্ন। বর শৈলেশ্বর ঘোষও আসনের উপর আসীন হয়েছেন। সাজানো গেটের মাথার উপর নহবত। আর গেটের ভিতর দিয়ে অজস্র নিমন্ত্রিতের আনাগোনা। পুরনো বাগান স্ট্রিটের দুপাশে মোটরগাড়ির লম্বা লাইন।

ফটকের কাছে পায়চারি করে অশেষ। সবই শুনতে পেয়েছে অশেষ, ত্রিদিব সরকারের চক্রান্তের আর চতুরতার দুঃসাহস দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে। বিমান চৌধুরীকে সপরিবারে ডেকে আনবার জন্য গাড়ি নিয়ে ছুটে গিয়েছেন ত্রিদিব সরকার। বিশ হাজার টাকা লাভের টেণ্ডার মাঠে মারা যাবে; সে কন্ট্রাক্ট নির্ঘাত বাগিয়ে ফেলবে ওই প্রকাশ গাঙ্গুলি, যদি আজ কম্পাউণ্ডার বিমান চৌধুরীর মন জয় করতে না পারেন ত্রিদিব সরকার।

বিশ্বাস করে অশেষ, এই ত্রিদিব সরকার সব পারে। বিমান চৌধুরীর পা জড়িয়ে ধরতেও একটু দেরি করবে না। এবং বিমান চৌধুরীর মত নরম মানুষের মন জয় করে তাঁকে সপরিবারে এই উৎসবের বাড়িতে নিয়ে আসতে ত্রিদিব সরকারের একটুও ভুগতে হবে না।

আসুক ওরা সবাই। বিমানবাবু আসুন, অলকার মা আসুন ও তিলকা আসুক। কিন্তু অলকা? অলকা এসে কী দেখবে এখানে? দেখবে যে তারই পাঁচ বছরের ভালবাসার মানুষ শৈলেশ্বর ঘোষের সঙ্গে ত্রিদিব সরকারের মেয়ের বিয়ের উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে।

আসছে এক মূর্খ নারী। শিক্ষিত হয়েও মানুষ চিনতে যে একেবারে অক্ষম। অদ্ভুত রকম নরম মনের নারী এই অলকা। এখানে এসে দেখবে যে, শৈলেশ্বর ঘোষ অলকাকে একটা আর্বজনার মত তুচ্ছ করে দূরে ছুঁড়ে দিয়েছে।

এই অলকাকে কি আজ অপমান থেকে বাঁচানো যায় না? শাস্তি থেকে রক্ষা করা যায় না? শৈলেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে যে নিষ্ঠুর বঞ্চনার সত্য আজ মর্মে মর্মে বুঝে ফেলবে অলকা, সেই বঞ্চনার জ্বালা সহ্য করতে পারবে কি?

ভয় পায় অশেষ। অলকার কথার মধ্যে অনেক ভুল, অনেক লঘুতা, অনেক নির্লজ্জতা দেখেছে অশেষ। কিন্তু অবিশ্বাস করতে পারে না অশেষ, একটি বিষয়ে অলকা ভয়ানক কঠোর। শৈলেশ্বরকে মনে মনে ভালবাসার দেবতা করে আজও উপাসনা করছে অলকা।

কম্পাউণ্ডার বিমান চৌধুরীর মেয়ে অলকা চৌধুরীর একটা উপকার করতে চায় অশেষ। কিন্তু উপায় কই?

উপায় নেই। যা হবার হোক। আসুক অলকা। নিজের চোখে নিজের মূর্খতা, মোহ আর ভুলের পরিণাম দেখে যাক। বুঝে নিক, পাঁচ বছরের মধ্যে যে শৈলেশ্বরকে এক উদার প্রেমের দেবতা বলে মনে করে আসছে অলকা, সে শৈলেশ্বর কেমন প্রেমিক আর কেমন উদার?

ক্ষোভে, দুঃখে ও লজ্জায় আত্মহত্যা করবে অলকা? করতে পারে, আশ্চর্য; কিন্তু না করতেও পারে। তারপর একদিন, অনেক দিন পরে এই অলকার ঘরের জানলার কাছে, অনেক রাতে একটি ক্ষণে চুপ করে যদি দাঁড়িয়ে থাকে অশেষ, তবে কি অলকাও চুপ করে থাকবে? ছুটে এসে অশেষেরই বুকের উপর মাথা রেখে কেঁদে উঠবে না কি?

সেদিন অনায়াসে সান্ত্বনা দিয়ে অলকা চৌধুরীর মাথাটা দুহাতে জড়িয়ে ধরতে পারবে অশেষ। এবং অলকাও সান্ত্বনা পেয়ে শান্ত হয়ে যাবে।

না, এমন কল্পনাকে নিতান্ত ভীরু মনের কল্পনা বলে মনে হয়। একটা মানুষকে পিপাসায় মর মর হয়ে যাবার সুযোগ দিয়ে; তারপর তার হাতের কাছে ঠাণ্ডা জলের পাত্র এগিয়ে দেওয়া! সে অবস্থায়, একটা মর-মর মানুষ তো লুব্ধ হয়ে সে উপহার গ্রহণ করে ফেলবেই। এমন উপহারের কি কোনও গৌরব আছে? এই জয় অলকা চৌধুরীর হৃদয় জয় করা নয়। হৃদয়হীন দুঃখের সুযোগ নিয়ে একটা মানুষের আগ্রহ জয় করা। শূন্য ও রিক্ত মনের অলকাকে নয়, যদি আজকের এই পূর্ণ-গর্বের অলকাকে জয় করা যেত, তবে যে সত্যিই অলকার জীবনটা সব

অশান্তির আঘাত থেকে বেঁচে যেত। শৈলেশ্বরকে দেখে তুচ্ছ করে হেসে উঠত অলকা।

চমকে ওঠে অশেষ। ত্রিদিব সরকারের গাড়ি ফটকে এসে থেমেছে। গাড়ি থেকে নামছেন ত্রিদিববাবু। শ্রদ্ধায় ও বিনয়ে অবনত হয়ে ত্রিদিব সরকার সাগ্রহে বিমানবাবুর একটি হাত ধরে রয়েছেন।

গাড়ি থেকে নামলেন অলকার মা এবং তিলকা। আর দেখতে পেয়ে অশেষের বুকের ভিতরে একটা চাপা আর্তনাদ গুমরে ওঠে। অলকাও এসেছে। একটা মূর্খ মেয়ে, এমন সুন্দর গম্ভীর মুখ নিয়ে একটা বধ্যভূমির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। জানে না অলকা, ওর শৈলেশ্বর এতক্ষণে বোধ হয় বাসর ঘরের ভিতরে ত্রিদিব সরকারের মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে...

আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে অশেষ, আগে আগে চলে গেলেন ত্রিদিব সরকার ও বিমানবাবু, তারপর অলকার মা ও তিলকা। তারপর সবার পিছনে অলকা।

কী সুন্দর সেজেছে অলকা! কে বলবে ওর জীবন একটা ভয়ানক দুঃখ আর অপমানকর পরিণামের অপেক্ষায় আছে! কে বলবে, এই মেয়ে এত বোকাও হতে পারে? জ্বলজ্বল করছে অলকার চোখের তারা দুটো। যেন কল্পনায় নিজেরই জীবনের একটা উৎসবের ছবি দেখছে অলকা।

—অলকা!

অলকার কাছে এগিয়ে এসে মৃদুস্বরে ডাক দেয় অশেষ।

চমকে উঠে আর মুখ ফিরিয়ে হেসে ওঠে অলকা। —তাই বলি! এখানে আবার অলকা বলে কে ডাকে!

অলকার কথাগুলি যেন একটা হাসি-হাসি অভিযোগ। মনে মনে লজ্জা পেয়ে একটু অপ্রস্তুত হয় অশেষ। অলকা বলে ডাকবার অধিকার নেই যেখানে, সেখানে নিতান্ত মনের ভুলে এবং অসাবধান ভাবনার ভুলে নাম ধরে ডেকে ফেলছে অশেষ। তাই বোধ হয় একটু আশ্চর্য হয়ে চমকে উঠেছে অলকা।

অশেষ বলে—আমি আপনারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

খিলখিল করে হেসে ওঠে অলকা! —আপনারই? একবার অলকা, একবার আপনি!

অশেষ হাসে —বেশ তো, তোমারই অপেক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

অলকা—কেন?

অশেষ—তোমাকে দেখবার জন্য।

অলকা—ঠাট্টা করছেন?

অশেষ—না।

অলকা—ঠাট্টা নয় তো কী? আপনি সব জেনে শুনেও ওকথা যদি আমাকে বলেন, তবে ঠাট্টা করা হয় না কি?

অশেষ—সব জেনে শুনেই বলেছি। কারণ, বিশ্বাস করি যে সত্যি কথা বললে তুমি রাগ করবে না।

অলকা—সত্যি কথা বললে সত্যিই রাগ করব না।

অশেষ—তবে এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। চলো, একটু ঘুরে আসি।

চমকে ওঠে অলকা। —আপনার সঙ্গে আমার একটু ঘুরে আসবার কোনও অর্থ হয় না! আমার লাভ নেই, আপনারও লাভ নেই। তবু আপনি একথা বলছেন?

অশেষ—আমার লাভ আছে।

অলকা—কিসের লাভ?

অশেষ—আমার গল্প তোমাকে শোনাইনি। শুধু তোমারই গল্প শুনলাম।

অলকা—গল্প শোনার এই কি সময়?

অশেষ—তা ছাড়া আর কখন সময় হবে বল?

অলকা—আপনার গল্প আমাকে শুনিয়ে আপনারই বা লাভ কী?

অশেষ—তুমিই বা কেন বলেছিলে? কোন লাভের আশায়?

অলকা—আমার গল্পের মধ্যে যে অনেক দুঃখ আছে, তাই বলে ফেলেছি। কিন্তু আপনার গল্পে কোনও দুঃখ থাকবেই বা কেন?

অশেষ—আছে।

অশেষের মুখের দিকে তাকিয়ে আরও আশ্চর্য হয়ে যায় অলকা। সত্যিই যে একটা বেদনার্ত মুখ। অশেষবাবুও কি কারও অপেক্ষায় রয়েছেন, এবং সেই অপেক্ষা সহ্য করতে পারছেন না?

অলকা বলে— আপনি আমাকে সত্যিই একটু বিপদে ফেললেন।

অশেষ—আমি তোমাকে বিপদে ফেলতে পারি কি?

অলকা—না, সেকথা বলছি না। কিন্তু আপনার দুঃখের কথা শুনেই বা আমার কী লাভ হবে? শুধু দুঃখিত হব। কোন উপকার তো করতে পারব না...যাই হোক ...কোথায় যাবেন?

অশেষ হাসে—এখানেই, এই রাস্তাতে, এই চেঁচামেচি ও অলোর ধাঁধা থেকে সামান্য একটু দূরে। তোমার ভয় করবার কিছুই নেই।

অলকা—আপনাকে ভয় করি না।

পুরনো বাগান স্ট্রিটের রাত্রির আলোছায়ার কাছে কাছে ঘুরে বেড়িয়ে গল্প করতে থাকে অশেষ আর অলকা।

অশেষ বলে— আমার দুঃখ এই যে আমি যাকে ভালবাসি সে আজও বুঝতে পারে না এবং বিশ্বাস করতে পারবে না যে, অকারণে একটা মানুষ কাউকে ভালবাসতে পারে!

অলকা— তার বোঝা উচিত।

অশেষ—তা হলে তো সমস্যাই ছিল না। তার বোঝবার সাধ্যি নেই; কারণ সে অন্য একজনকে ভালবেসে বসে আছে।

অলকা—আপনার জন্য দুঃখ হয়।

অশেষ হেসে বলে—সত্যিই কি দুঃখ হয় ?

অলকা—নিশ্চয়।

অশেষ—আমি কিন্তু কোনও দাবি করি না যে, সে আমাকে ভালবাসুক।

অলকা—কেন?

অশেষ—দাবি করলে তাকে দুঃখ দেওয়া হবে।

চমকে উঠে অলকা বলে—আপনি যে এত মহৎ আমি জানতাম না, বরং আপনাকে দেখে প্রথমে, সত্যি কথা কেমন যেন লাগছিল।

অশেষ—সন্দেহ হয়েছিল?

অলকা—হ্যাঁ।

অশেষ—কিসের সন্দেহ?

অলকা—আপনি ভুল করে আমার ওপর একটা মায়ায় পড়ে যাবেন।

অশেষ—মায়ায় কি পড়িনি?

অলকা—সে কথা সত্যি। তা না হলে, আমার এত অভদ্রতা কেন সেদিন... আজ আবার এখানে .. .যাক সে কথা।

অশেষ—কিন্তু, তোমার কি খারাপ লাগছে না?

অলকা—কেন?

অশেষ—তোমার ওপর আমার মায়া পড়েছে, একথা শুনতে তোমার খারাপ লাগাই উচিত।

অলকা—না।

অশেষ—কেন?

অলকা—মাপ করবেন, সত্যি কথা বলা উচিত নয়।

অশেষ—কেন?

অলকা হাসে—বললে আপনার অহংকার বেড়ে যাবে।

অশেষ—তার মানে?

অলকা—এই প্রথম দেখলাম, আমার জীবনের দুর্ভাবনার কথা শুনে একজন অজানা ও অচেনা মানুষ দুঃখ বোধ করছে আর মায়ায় পড়ে গিয়েছে। কিন্তু তার মায়ার মধ্যে ভয় করবার কিছু নেই।

অশেষ—বুঝলাম না।

অলকা—আমি বিশ্বাস করি আপনি আমাকে এমন কোনও কথা বলতে পারেন না, বলবেন না, যে কথা বললে আমাকে অপমান করা হয়।

অশেষ—কিছুই বুঝলাম না।

অলকা হেসে ফেলে—শৈলেশ্বরের আশা নষ্ট হয়, আপনি এমন কোনও দাবি আমার কাছে করবেন না জানি।

অশেষ—এবার বুঝলাম।

অলকার চোখ ছলছল করে ওঠে। —সত্যি কথা অশেষবাবু, শৈলেশ্বর যদি আমাকে ভুলেও যায়, তবু আমার মন ভুল করবে না। আমি তাকে ভুলতে পারব না।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় অলকা। অলকার ছলছলে চোখ দুটোও যেন হঠাৎ লজ্জা পেয়েছে, একটু ভয়ও পেয়েছে যেন। —চলুন এবার ফিরে যাই।

অশেষ—কোথায়?

অলকা—বিয়েবাড়িতে ।

অশেষ—না গেলে কি নয়?

অলকার ছলছলে চোখ দুটো এইবার যেন হেসে ওঠে আর শুকনো খট্‌খটে হয়ে অশেষের মুখের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকাতে চেষ্টা করে।— কী বললেন?

অশেষ—আমার অনুরোধ, বিয়েবাড়িতে তোমার গিয়ে আর কাজ নেই। বরং...

অলকা—বলুন।

অশেষ—বরং যদি মনে না করো, তবে চলো একটু দূরে বেরিয়ে আসি।

অলকার ভ্রূকুটি ধীরে ধীরে কঠোর হয়ে উঠতে থাকে। সন্দেহ করবার মত মানুষ নয় বলে যাকে মনে হয়েছিল, যার মায়ার মধ্যে ভয় করবার মত কিছু নেই বলে মনে হয়েছিল, সেই মানুষটা কি রকম অদ্ভুতভাবে অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অশেষের মুখটাকে নিদারুণ চক্রান্তের মত দেখাচ্ছে। বড়লোক মানুষ, বিলেত-ফেরত ডাক্তার, আলিপুরে বাড়ি, এই লোকটা বিমান চৌধুরীর মেয়েকে যেন রাত্রিবেলার অমোদের সঙ্গিনী বলে মনে করেছেন। কত সহজে বলতে একটুও লজ্জা হল না, লোকটা মুখ খুলে একেবারে নির্ভয়ে ওর বুকের ভিতরের বিদ্‌ঘুটে ইচ্ছাটার কথা বলেই ফেলেছে।

অনেক বই পড়ার অভ্যাস আছে যে মেয়ের, বিমান চৌধুরীর সেই মেয়ে অলকা চৌধুরীও একটা মনস্তত্ত্বের বই পড়তে পড়তে একদিন একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। হিস্টিরিয়া নামে মনের রোগটার অদ্ভুত একটা চিকিৎসা আছে। সম্মোহিনী চিকিৎসা। ডাক্তার রোগীকে হিপ্নোটিক আবেশে অভিভুত করে তার মনের গোপন কথাগুলি জেনে নেয়।

কিন্তু অশেষ ডাক্তারের মুখের ভাব দেখে মনে হয় না যে , সেরকম কোনও উপকারের ইচ্ছা নিয়ে ভদ্রলোক কথাটা বলে ফেলেছেন। কথাটাই বা কি কুৎসিত? শুনে মাথাটা যে জ্বলতে শুরু করেছে।

কিন্তু কে জানে, হয়ত সত্যিই কোনও উপকারের ইচ্ছা থেকে এরকম একটা বেহায়া ইচ্ছার কথা বলে ফেলছেন ভদ্রলোক। কথা বলতে গিয়ে বিড়বিড় করে অলকা—আপনার ইচ্ছাটা কী? আমার কোনও উপকার করবেন?

অশেষ—হ্যাঁ...তা আমাকে বিশ্বাস করে সত্যিই যদি এখন একটু দূরে বেড়িয়ে আসো, আর বিয়ে-বাড়ির নিমন্ত্রণটা বাদ দাও তবে তোমার উপকারই হবে।

অলকা— আমাকে সত্যিই একটা হিস্টিরিয়ার রোগী বলে মনে করেছেন বোধ হয়?

হেসে ফেলে অশেষ। — এখন সন্দেহ হচ্ছে, আমাকেই হিস্টিরিয়ায় ধরেছে।

অলকা—তার মানে?

অশেষ— তা না হলে, তুমি সন্দেহ করবে, আশ্চর্য হবে, আর সন্দেহও করবে না কেন? কথাটা বলে ফেলবার সাহস পেলাম কী করে?

অলকার রুক্ষস্বরে উত্তর দেয়। —সত্যিই বড় বেশি সাহস করে ফেলেছেন ...যাক গে, সেজন্য কোনও দুঃখ নেই...এখন চলুন বিয়ে বাড়িতে গিয়ে....

অশেষ—আমার অনুরোধ....।

অলকা—কী?

অশেষ—চলো, একবার আমাদের বাড়িতে ঘুরে আসবে।

অলকা—আপনার বাড়ি বোধ হয় খুব বড় বাড়ি?

অশেষ—নেহাত ছোট নয়।

অলকা—খুব সুন্দর বাড়ি নিশ্চয়?

অশেষ—তা বলা যায়।

অলকা—অনেক দামি দামি আসবাবে সাজানো নিশ্চয়।

অশেষ— তা বটে।

অলকা—তাই ধারণা করেছেন যে বিমান চৌধুরীর মেয়ে আপনার বাড়ি দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে।

অশেষ—একেবারেই না, অলকা চৌধুরীকে এত সাধারণ মেয়ে বলে আমি মনে করি না।

চমকে ওঠে অলকা চৌধুরীর নিঃশ্বাস । অশেষ ডাক্তারের কথার সুরের মধ্যে যেন একটা ভদ্রমনের একটা সম্ভ্রমের দাবি মিষ্টি সুরে বেজে উঠেছে। অলকা চৌধরীকে সাধারণ মেয়ে বলে মনে করে না, অলকা চৌধুরীর এতক্ষণের সন্দেহটাকেই লজ্জা দিয়ে কুণ্ঠিত করে দিচ্ছে অশেষ।

উত্তর দিতে গিয়ে এইবার অলকার নিঃশ্বাসের বাতাস যেন হাঁসফাঁস করে। —আপনি আমাকে বড় অসুবিধেয় ফেলেছেন অশেষবাবু।

অশেষ—কেন?

অলকা— একদিনের আলাপের পর কোনও মেয়ে যদি কোনও ভদ্রলোকের সঙ্গে দূরে বেড়াতে চলে যায়, তবে...।

অশেষ—তবে কী?

অলকা—তবে ভদ্রলোকই বা সেই মেয়ের সম্বন্ধে কী ধারণা করবেন আর সেই মেয়েই বা নিজের সম্বন্ধে কী ধারণা করবে?

হেসে ফেলে অশেষ। —যদি সত্যিই বিশ্বাস কর যে, ভদ্রলোক কোনও খারাপ ধারণাই করবেন না, আর সেই মেয়েকে এমন কোনও কথা বলবেন না যাতে তার অপমান হতে পারে, তবে...।

অলকা হেসে ফেলে—তবে তো কোনও কথাই নেই। কিন্তু... তবু... মিছিমিছি বেড়াতে যাবার, আপনার বাড়িতে হোক কিংবা যেখানেই হোক, কোনও মানে হয় না।

অশেষ—মানে আছে। এখন বুঝতে না পার, পরে বুঝতে পারবে।

অলকা আশ্চর্য হয়ে তাকায়—মনে হচ্ছে, আমাকে সত্যিই কোনও নতুন খবর দিতে চান আপনি।

অশেষ—হ্যাঁ।

অলকা—শৈলেশ্বরের খবর?

অশেষ—হ্যাঁ।

অলকার গলার স্বর কেঁপে ওঠে। —কোনও খারাপ খবর নয় তো অশেষবাবু?

অশেষ—অ্যাঁ...না...খারাপ কেন হবে?

অলকা—শৈলেশ্বরের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে নিশ্চয়।

অশেষ—না।

অলকা—তবে।

অশেষ—তবে একটা খবর জানতে পেরেছি।

অলকা—তবে বলেই ফেলুন না।

অশেষ হাসে —না, এখানে বলব না। তুমি যদি আমার কথা না রাখো তবে বলবই না।

অলকা বলে—চলুন তবে।

হ্যাঁ খুবই বড় বাড়ি; আর সুখের বাড়িও বটে। কত দামি দামি শৌখিন আসবাবে সাজানো বাড়ি। আলিপুরের রাত্রিবেলার আলোছায়া বেশ সুন্দর। অশেষ ডাক্তারের বাড়ির যে ঘরের সোফার উপর বসেছে অলকা চৌধুরী সেই ঘরের ভেতরে চকচকে পিতলের টবের মধ্যে শখের ক্যাক্টাস আর অর্কিডগুলিও চমৎকার।

কিন্তু বাড়িটা এত নীরব কেন? আধ ঘন্টার বেশি সময় পার হয়ে গিয়েছে, তবু এই বাড়ির বাতাসে মানুষের ভাষায় একটা ক্ষীণ কলরব, কিংবা কোনও হাসির উচ্ছ্বাসও শুনতে পায়নি অলকা। বাড়িতে সত্যিই কি কেউ নেই? ভদ্রলোকই বা কোথায় গেলেন? এত অ্যাপায়ন করে ঘরের ভিতরে নিয়ে এসে এই সোফার উপর অলকাকে বসিয়ে রেখে কোথায় সরে পড়লেন? এ কেমন ভদ্রতা?

ভদ্রলোক যে বলেছিলেন, তাঁর একটি বোন আছে। সেই বোনটিই বা কোথায়? কী যেন তার নাম? সুধা না সুমনা, এই রকম একটা নাম বলেছিলেন অশেষবাবু। আশ্চর্য,বাড়ির অন্য কোনও মহিলাও তো আসে না। সত্যিই এ বাড়িটা মহিলাবর্জিত কোনও বাড়ি নয় তো?

এই নীরবতা সহ্য হয় না। প্রথমে ঢুকতেই যে বাড়িকে বড় শান্ত বলে মনে হয়েছিল, এখন কেমন যেন সন্দেহ নয়, সেই শান্ততা একটা ছলনা, মনে হয় যেন একটা চক্রান্ত নীরব হয়ে রয়েছে।

চমকে ওঠে অলকা। চোখের চাহনি ভীরু হয়ে যায়, নিঃশ্বাসও এলোমেলো হয়ে বুকের ভিতরে যেন ফিসফিস করে—ভুল, ভয়ানক ভুল করে ফেলেছে চালাক-বোকা মেয়ে। অশেষ ডাক্তারের ইচ্ছা আর উদ্দেশ্যের কতটুকু খবর তুমি জান? অশেষ ডাক্তারকেই বা কতটুকু চেন? একজন অজানা-অচেনা ভদ্রলোকের মুখের কয়েকটি সহানুভূতির কথা শুনেই তাকে বিশ্বাস করে, তার সঙ্গে একেবারে এক ট্যাক্সিতে চড়ে এই রাত্রিবেলায় ঢাকুরিয়ার সেই পুরনো বাগান স্ট্রিটের আলো-আঁধার থেকে এতদূরে আলিপুরে একটা বাগানবাড়িতে...।

হ্যাঁ, সন্দেহ হয়, এই বাড়ি এক শৌখিন বড়লোকের বাগানবাড়ি। ভদ্রলোকের মেয়ের সর্বনাশ করে সুখী হয়, সেইরকম এক ভয়ানক শৌখিনের রাত্রিবেলার বিলাসের স্বর্গ।

ছটফট করে উঠে দাঁড়ায় অলকা। দরজার পরদা সরিয়ে বাইরের বাগানটার দিকে তাকায়। বারান্দায় চারটে বড় বড় আলোও যেন চোখ ঝলসানো চারটে বড় বড় চক্রান্তের ধাঁধাঁ। বুঝতে পারা যায় না সিঁড়িটা কোন দিকে।

এখনি ছুটে চলে যেতে পারা যায়। কিন্তু তারপর ? ফটকটা কি বন্ধ করে রাখেনি অশেষ ডাক্তারের মত চতুর ডাকাত? এ ধরনের ভয়ানক মানুষের ও ধরনের ভুল হয় না। আটঘাট বেঁধে মানুষের সর্বনাশ করবার কায়দা ওদের অভ্যস্ত। এই তো কদিন হল, খবরের কাগজে এইরকমের একটা সর্বনাশের ব্যাপার নিয়ে একটা মামলার বিবরণ পড়েছে অলকা, ঠিক এই ধরনের কাণ্ড। এক ডাক্তার ভদ্রলোক এক বিবাহিতা মহিলাকে উপকারের প্রতিশ্রুতি, সহানুভূতি আর অতি ভদ্র-ব্যবহার দিয়ে মুগ্ধ করে নিয়ে তারপর একদিন নেমন্তন্নের নাম করে এইরকম করে বাগানবাড়িতে নিয়ে এসে...।

ছি-ছি , অলকা চৌধুরীর মত এত চালাক মেয়ে... যে মেয়ে তার জীবনের একমাত্র ভালবাসার মানুষ শৈলেশ্বরের সেই ইচ্ছার কথা শুনে চমকে উঠেছিল, ভয় পেয়েছিল, অস্বস্তি বোধ করেছিল, আর সরে গিয়েছিল, সেই মেয়ের প্রাণটা যে ভুল করে একটা মানুষখেকো বাঘের গ্রাসের কাছে এসে পড়েছে। অভিশাপ, নিতান্ত অভিশাপ।

অলকার চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। মনে হয়, শৈলেশ্বরের সেদিনের দীর্ঘশ্বাসের ব্যথাটা অলকার জীবনের অভিশাপ হয়ে আজ প্রতিশোধ নিতে চলেছে। ভালবাসার মানুষ শৈলেশ্বরও যে অলকার হাত ধরতে পারেনি, ধরতে দেয়নি অলকা, সেই অলকার হাত চেপে ধরবার জন্য একটা বর্বরের মতলব এখন বোধ হয় অন্য কোনও ঘরে ...কে জানে হয়ত ছাই-ভস্ম খেয়ে প্রচণ্ড মাতাল হয়ে গিয়েছে লোকটা।

অলকা চৌধুরীর চোখের করুণ চাহনিও যেন মাঝে হিংস্র হয়ে চিকচিকিয়ে ওঠে। অশেষ ডাক্তার নামে লোকটার কুমতলবের সব চেষ্টা কি আঁচড়ে কামড়ে আর খিমচে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া যায় না? এরকম অসহায় অবস্থায় এ ছাড়া একটা মেয়ের পক্ষে আর কী করবারই বা সাধ্যি আছে?

কিন্তু বর্বরটা কি এতই বোকা? অলকা চৌধুরীর আঁচড় কামড়কে ভয় পাবে, এরকম পশুই সে নয়। লোকটার হাতে ছুরি কিংবা পিস্তল থাকবে বোধ হয়। উপায়? তবে কী উপায় হবে?

অলকার চোখ দুটো অসহায় হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে। লোকটার মতলবের খপ্পর থেকে রক্ষা পাবার সহজ উপায় নেই।

কাঁদলেও কোন ফল হবে না। ভয় দেখালেও না। ছুরিবাজ একটা গুণ্ডার সঙ্গে হাতাহাতি করে বাধা দেওয়াও যে যায় না। হ্যাঁ, মরে যাওয়া যায়। রাজি না হলে লোকটা ছুরি মারবে, কিংবা গলা টিপে শ্বাস বন্ধ করে দিয়ে অলকার মূর্খ বিশ্বাসের পরিণাম পূর্ণ করে দেবে। অলকার লাস বাক্সোতে করে গঙ্গার জলে ফেলে দেবে, তার বেশি তো আর কিছু হবে না।

কিন্তু এমন মরণ বড় ঘৃণ্য মরণ। মিছামিছি, একটা বাজে লোকের অনুরোধে ভুলে বিপদ ডেকে নিয়ে এসে শেষে আত্মহত্যা করা। ছিঃছিঃ, এ-কী হল।

কোনও ঘরে কি টেলিফোন নেই? যদি থাকে তবে তো এখনি একবার শৈলেশ্বরকে এই বিপদের খবর জানিয়ে দেওয়া যায়। শৈলেশ্বর যদি গিরিডি বেড়াতে গিয়ে থাকে, তবে সোজা লালবাজারের পুলিশকে জানিয়ে দিতে পারা যায়।

এই তো পাশেই একটা ঘর, ঘরের ভিতরটা স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু টেলিফোনের চিহ্ন নেই। থাকবেই না তো! লোকটা তো আর কাঁচা ক্রিমিন্যাল নয়। এসব জঘন্য অপরাধ যাদের জীবনের মিশন, তারা ভাল করেই জানে যে...।

না আর দেরি করা উচিত নয়। ফটক বন্ধ আছে বলে মনে করে, এইরকম একটা অসহায় অবস্থা কল্পনায় বিশ্বাস করে নিয়ে একাকী এখানে দাঁড়িয়ে থাকবার কোনও অর্থ হয় না। এতক্ষণে

চলে যাওয়া উচিত ছিল। ফটক যদি বন্ধ থাকে, থাকুক, অলকা ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আর চিৎকার করে বাইরে মানুষকে ডাক দিয়ে ...।

বাগানের শেষ প্রান্তের দিকে লক্ষ করে একটা দৌড় দিয়ে এগিয়ে যায় অলকা চৌধুরী, হ্যাঁ, এই তো নীচে নেমে যাবার সিঁড়িটা এখানে।

কিন্তু ও কী! কিসের শব্দ ? যেন মানুষের ভাষায় একদল কলরব এই সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে আসছে।

দেখতেও পায় অলকা, চার পাঁচ জনেরও বেশি হবে, হেসে হেসে কথা বলতে বলতে কতগুলি সুশ্রী মূর্তি উপরে উঠছে। চার পাঁচ জন মহিলা বলে মনে হয়।

রুমাল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে অলকা যেন নতুন একটা প্রহেলিকার দিকে তাকিয়ে থাকে। আরও দেখতে পায়, অশেষ ডাক্তারও হেসে হেসে সবার পেছনে থেকে কী যেন বলতে বলতে উপরে উঠছেন।

আগন্তুক ভিড় উপরে উঠে অলকা চৌধুরীর অপ্রস্তুত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে, পিছন থেকে আরও জোরে হেসে হেসে চেঁচিয়ে ওঠে অশেষ—আমি ঠিক সন্দেহ করেছিলাম কিনা এখন স্বচক্ষে প্রমাণ দেখতে পেলেন তো মিনুদি?

মিনুদি—তাই তো দেখছি। অলকার কাছে এগিয়ে এসে মিনুদি আস্তে আস্তে হাসেন—তুমি সত্যি একটু ভয় পেয়েছো বোধ হয়?

অলকা বলে—আজ্ঞে।

মোটা-সোটা চেহারা, মাথায় চুল সাদা-কালো, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া মিনুদি বলেন—হ্যাঁ, একটু ভয় পাওয়াই তো উচিত। অশেষের খেয়ালের তো কোনও মাথামুণ্ডু নেই।

অশেষ—আপনি আরও একটু কষ্ট করুন মিনুদি।

মিনুদি—কী?

অশেষ—আপনি নিজের হাতের চা তৈরি করুন। আর...।

রমা, নমিতা আর বীণা একসঙ্গে প্রশ্ন করে। —আমরা কী করি বলুন তো অশেষদা?

অশেষ—রমা খাবার তৈরি করো। বীণা সেতার বাজাও , আর নমিতা গল্প করে করে অলকা চৌধুরীকে আশ্চর্য করে দাও।

—বহুত আচ্ছা। রমা নমিতা আর বীণা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে!

অলকা চৌধুরীর অপ্রস্তুত চোখের চাহনিটা যেন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছে। কে এরা? অশেষ ডাক্তারের এমন সুন্দর একটি দিদি, আর এতগুলি সুন্দর বোন এতক্ষণ কোথায় ছিল? কিন্তু ... অশেষ ডাক্তার যেন বলেছিল, ওর একটি মাত্র বোন।

অলকা চৌধুরীর বিস্ময়ের নীরব প্রশ্নগুলি যেন শুনতে পেয়েছে অশেষ। অশেষ বলে—এতক্ষণ ধরে বোধ হয় আমার অভদ্রতার ব্যাপার দেখে তুমি খুবই আশ্চর্য হয়েছ?

অলকা—কিসের অভদ্রতা?

অশেষ—এই যে তোমাকে এখানে বসিয়ে রেখে এতক্ষণ পরে আসছি।

অলকা হাসতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। হাসবার সাহসটা যেন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। বার বার এতক্ষণের পঙ্কিল সন্দেহের কথাগুলি শুধু মনে পড়ে। এবং মনে পড়তেই লজ্জা পেয়ে যেন মুষড়ে যাচ্ছে অলকার কথা বলবার ভঙ্গিটাই।

অশেষ বলে—আমার দোষ নয়, এদের দোষ। এই যাচ্ছি এই যাচ্ছি করে এতক্ষণে উঠলেন। নমিতার তো মুখ মুছতে বিশ মিনিট সময় লেগেছে।

মিনুদি অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন—কী করব বল? খিচুড়ি চাপিয়েছিলাম, আধসেদ্ধ করে নামিয়ে রেখে আসতে তো পারি না!

অশেষ এইবার অলকার বিস্ময়ের আর একটা নীরব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয়। —ইনি হলেন আমাদের মিনুদি। পাড়ার দিদি, কিন্তু আপন দিদির চেয়ে কম কিসে তা জানি না! আর.....।

রমা, নমিতা ও বীণার দিকে তাকায় অশেষ—আর এরা হল, আমার পাড়াতুতো বোন। এরাও আমার আপন বোনের চেয়ে যে কোন হিসাবে কম...।

রমা বলে—এই হিসাবে কম যে, সুধার জন্যে ঝাল বাদাম আনতে কোনও দিন আপনি ভুলে যান না; আর আমাদের জন্যে ভুলেও কোনও দিন....।

অশেষ—সুধা এখন এখানে থাকলে এর জবাব দিত।

বীণা—সুধা ফিরবে কখন?

অশেষ—আজ কি আর ফেরে? বিয়ে শেষ হতে হতে রাত এগারোটার কম হবে না। তারপর হেন-তেন আর কত মাতামাতি আছে। ওসব শেষ হতে হতে বোধ হয় রাত্রি শেষ হয়ে যাবে। কাজেই...।

নমিতা—আর বড় মাসিমা?

অশেষ—উনিও তো ভয়ানক ব্যস্ত। বিয়ে বাড়ির মিষ্টির চার্জ নিয়েছেন খুড়িমা। উনি বোধ হয় কাল বিকেলে ফিরবেন। মেয়ে বিদায়ের সময় পেট ভরে কেঁদে নেবার সুখটা ছেড়ে আসতে পারবেন কেন?

অলকা বলে—বড় মাসিমা কে?

অশেষ—আমারই বড় খুড়িমা। আমার বয়স যখন সাত বছর, তখন আমার মা মারা যান। আর, ঠিক সেই সময় বড় খুড়িমার পাঁচ বছরের ছেলেটি মারা যায়। তার পর থেকে আমিই বড় খুড়িমার ছেলে।

অলকা—আপনার বাবা?

অশেষ—আমার বয়স তিন বছর, তখন তিনি মারা যান। তবু এখনও আমার মনের ভেতরে একটা ঝাপসা ছবি দেখতে পাই। লাল ভেলভেটের টুপি মাথায় দিয়ে ছোট্ট একটা ছেলে একটা পনির পিঠের উপর বসে কার যেন গলা জড়িয়ে ধরে আছে। তার চোখে চশমা আছে।

মাথা হেঁট করে কী যেন ভাবতে থাকে অলকা। মিনুদি আবার হেসে ওঠেন—তুমি কিছু মনে করো না... কী যেন তোমার নাম?

অলকা—অলকা।

মিনুদি—কিছু মনে করো না অলকা।

অলকা—একথা কেন বলছেন? মনে করবার কী আছে?

মিনুদি—এই যে অশেষের কাণ্ড। তোমাকে নেমন্তন্ন করে বসে আছে, অথচ এদিকে কোনও ব্যবস্থা নেই।

অলকা—উনি বুঝি এই কথা আপনাদের বলেছেন?

অশেষ—হ্যাঁ, মিথ্যে কথা আর বলব না, আমি ঠিক এই কথাটাই মিনুদিকে বলেছি। ...কিন্তু ...তুমিই বলো না, একেবারে মিথ্যে কথা বলেছি কি?

হেসে ফেলে অলকা—না।

মিনুদি—হাসবারই কথা। অশেষের এইরকম এক একটা কাণ্ড করা অভ্যাস!

অলকার চোখের চাহনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। —তার মানে? এরকম আরও কাণ্ড বুঝি অনেকবার...।

মিনুদি —হ্যাঁ, এইতো গত মাঘ মাসে হঠাৎ বিকেল বেলা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে এক বুড়ো ভদ্রলোক আর তাঁর মেয়েকে নিয়ে এসে...।

অলকা—কোথায়?

মিনুদি—এখানে। বিকেল বেলা মেয়েটাকে নিয়ে এল। তার পরেই গাড়ি করে বেরিয়ে গেল। আর সন্ধ্যা হতেই এক পুরুত আর একরাশ দানসামগ্রী নিয়ে এল। তার পরেই আবার বের হয়ে গিয়ে এক ঘন্টার মধ্যে এক দল বরযাত্রী নিয়ে এল অশেষ। বিয়ে হয়ে গেল।

অলকা—ঠিক বুঝলাম না।

মিনুদি—ভদ্রলোক মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য কলকাতায় এসে এক বড়লোক কুটুমবাড়িতে ঠাঁই নিয়েছিলেন। আশা ছিল বড়লোক কুটুম মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু সে তো দূরের কথা, এক মাস পরে ঘর থেকে সেই মেয়ে আর মেয়ের বাপকে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর অশেষের সঙ্গে ওদের দেখা। শেয়ালদা স্টেশনে বসে মেয়ের বাপ কাঁদছিল।

এতক্ষণে বুঝতে পারে অলকা; অশেষ ডাক্তারের খেয়ালটা হল মহত্ত্ব দেখাবার খেয়াল। অলকা চৌধুরীর মনের ভিতরে একটা লজ্জার বেদনা মোচড় দিয়ে ওঠে। কোনও ভুল নেই, বিমান চৌধুরীর মেয়ে অলকা চৌধুরীকেও ঠিক এই ধরনের উপকার করবার জন্য অশেষ ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। শৈলেশ্বরের কথা শোনাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অলকাকে এখানে নিয়ে এসেছে। অলকাও শৈলেশ্বরের খবর শোনবার পিপাসায় ব্যাকুল হয়ে অশেষ ডাক্তারের সঙ্গে এখানে এসেছে। জীবনের ভালবাসার সমস্যায় অশেষের কাছ থেকে একটা সাহায্য নেবে অলকা। সাহায্য করবে অশেষ। অশেষের খেয়ালের গর্ব ও গৌরব তৃপ্ত হবে।

অশেষ ডাক্তার বলেছেন, শৈলেশ্বরের ভাল খবর শোনাবেন। কিন্তু এখানে আসামাত্র সে খবর না শুনিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে মহিলাকে ডেকে নিয়ে এসে এরকম একটা কপট নিমন্ত্রণের হুল্লোড় করবার কী দরকার ছিল?

শুধু উপকার। নিঃস্বার্থ মহত্ত্ব। বাঃ, খুব উঁচুদরের অহংকারের মানুষ বলে মনে হয়। এবং, এই অহংকারের সান্নিধ্য থেকে এই মুহূর্তে ছুটে চলে যেতেও ইচ্ছে হয়।

মিনুদি চা তৈরি করতে অন্য ঘরে চলে যান। রমা খাবার করবার জন্য আর একদিকে চলে যায়। বীণা সেতার খোঁজবার জন্য সুধার ঘরের ভিতরে ঢোকে। আর, নমিতা সেই সাজানো ঘরের ভিতরে ঢুকে সোফার উপরে বসে ডাকতে থাকে— এ ঘরে চলে আসুন অলকাদি, যদি গল্প শুনতে চান।

শুধু অশেষ আর অলকা, বারান্দার উপরে শুধু দু'জনের ছায়া তবু স্তব্ধ হয়ে থাকে।

অশেষ বলে—নমিতা তোমাকে ডাকছে।

অলকা—শুনেছি। হ্যাঁ একটা কথা...।

অশেষ—বলো।

অলকা—আপনি হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে এঁদের ডেকে আনলেন কেন?

অশেষ—আনলাম এই কারণে যে, অর্থাৎ বাড়িটাকে এমন নির্জন দেখে তুমি হয়ত মনে করবে যে... তার মানে...।

অলকা—কী দরকার ছিল?

অশেষ—কী বললে?

ছোট একটা ভ্রূকুটির কাঁপুনি চাপা দিতে চেষ্টা করে অলকা— আপনি যে কথা বলার জন্যে এখানে আমাকে নিয়ে এসেছেন, সে কথা বলে দিলেই তো ঝঞ্ঝাট মিটে যেত।

অশেষ—বলবই তো। কিন্তু... একটু দেরি করে বলব, শুধু এই জন্যে...।

অলকা—এরকম শখের দেরির কোনও মানেও হয় না!

অশেষ—তোমার কি সত্যিই খুব খারাপ লাগছে?

অলকা—লাগছে বই কি!

অশেষ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকায়। কিন্তু অলকা চৌধুরীর ছায়াটা আবার বিব্রত ভাবে চমকে ওঠে। আবার ডাক দিয়েছে নমিতা—গল্প শুনে যান অলকাদি।

অশেষ বিব্রতভাবে যেন কৈফিয়তের সুরে বলে —ব্যাপারটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। তুমি একটু বুঝে দেখো। আমি তোমার খুব বেশি পরিচিত নয় বলেই...।

অলকা—কী?

অশেষ—তুমি আমার বাড়িতে এসেছ, অথচ বাড়িতে বড় খুড়িমা নেই, সুধাও নেই। সুতরাং তুমি যাতে কোনও অস্বস্তি বোধ না করে কয়েকটা ঘন্টা এখানে থাকতে পারো, সেইজন্যেই মিনুদি আর ওদের ডেকে এনেছি।

হেসে ফেলে অলকা—আরও স্পষ্ট করে সত্যি কথাটা সোজা বলে ফেলুন না।

অশেষ—সত্যি কথা কি বলছি না?

অলকা—না। আপনার অস্বস্তি হত বলেই আপনি বাইরে থেকে মহিলাদের ডেকে নিয়ে এসেছেন। আমার সামনে একা বসে থাকতে আপনার মনে নিশ্চয় ভয় আছে। আপনি মস্ত বড় ...অতি মহৎ... বেশ বড় অহংকারের মানুষ। আপনি বোধ হয় সন্দেহ করেন যে, অলকা চৌধুরীর মত মেয়ে আপনার মত মানুষের কাছে একটা নির্জন বাড়িতে কিছুক্ষণ বসে থাকলেই আপনার কাছে একেবারে ...ছিঃ।

বারান্দা ছেড়ে ঘরের ভিতর ঢুকে সোফায় গিয়ে নমিতার পাশে বসে আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে অলকা।

নমিতা বলে—এ বাড়িতে একবার বেশ কিছুদিন ধরে একটা ভৌতিক কাণ্ড হয়েছিল। ভৌতিক কাণ্ড সাধারণত রাতের বেলা হয় বলে শুনেছিলাম, কিন্তু এ বাড়িতে যেটা হয়েছিল সেটা সব সময়ের কাণ্ড। সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা, রাত, নিঝুমরাত, শেষরাত... সব সময়।

রুমাল দিয়ে কপাল মুছে নমিতার মুখের দিকে একবার তাকায় অলকা, এবং তারপরেই যেন আনমনা হয়ে যায়।

নমিতা—একটা করুণ কান্নার স্বর। অদ্ভুত রকমের করুণ। শুনলে মায়াও লাগে, আবার বেশ ভয় ভয় করে। দোতলার যে কোনও ঘরের ভিতর বসলেই একটা করুণ কান্নার স্বর শোনা যেত। স্বরটা যেন ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, কাছে আসছে, আবার দূরে সরে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে যেন ডুকরে উঠছে, উতলা হচ্ছে। অশেষদার এক সায়েনটিস্ট বন্ধু একদিন একটা টেপ রেকর্ডার নিয়ে এসে সেই কান্নার স্বর রেকর্ড করে নিয়ে চলে গেলেন রিসার্চের জন্য। কত লোক এল, আর সেই কান্নার স্বর শুনে আশ্চর্য হয়ে চলে গেল। তারপর একদিন...আশ্চর্য! একদিন সন্ধ্যাবেলা অশেষদা...।

অলকার চোখ দুটো যেন হঠাৎ আতঙ্কে শিউরে ওঠে, —কী হল আপনাদের অশেষদার?

নমিতা—সন্ধ্যাবেলা ছাদে উঠেই চেঁচিয়ে উঠলেন অশেষদা, ইউরেকা, ইউরেকা। আমরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলাম; এসে দেখলাম, অশেষদা ছাদের উপর একটা মোটা বাঁশের খুঁটোর দিকে তাকিয়ে হাসছেন। কাপড় মেলবার জন্য দড়ি বাঁধা ছিল সেই খুঁটোতে।

অলকা—তা তো হল, কিন্তু এর জন্য ইউরেকা কেন?

নমিতা চেঁচিয়ে হেসে ওঠে। —সেই মোটা খুঁটোর বাঁশটা দুতিন জায়গায় ফাটা-ফাটা হয়ে গিয়েছিল। কাজেই বাঁশ হয়েছিল বাঁশি। একটু হাওয়া দিলে ফাটা বাঁশের ভিতর দিয়ে সেই হাওয়া কান্নার স্বর হয়ে কঁকিয়ে উঠত।

অলকা হাসে—বেশ গল্প।

নমিতা—আঃ, এখনই সব হাসি হেসে ফেলবেন না, গল্পের শেষ এখনও হয়নি আরও আছে।

অলকা—বলুন।

নমিতা—বাঁশের কাণ্ড তো এদিকে ধরা পড়ে গেল, কিন্তু ওদিকে, তার মানে অশেষদার সেই সায়েনটিস্ট বন্ধুর একটা গবেষণার তত্ত্ব মস্ত বড় প্রবন্ধ আকারে একটা পত্রিকায় বের হয়ে

গেল। সায়েনটিস্ট লিখেছিলেন, ব্যাপারটা পৃথিবীর নিকটস্থ কোনও গ্রহ থেকে পৃথিবীতে সাংকেতিক শব্দ পাঠাবার চেষ্টা বলে মনে হয়। সেই গ্রহে মানুষ আছে।

হাসির উচ্ছ্বাস থামাতে চেষ্টা করে অলকা বলে— সায়েনটিস্ট ভদ্রলোক পরে নিশ্চয় খুব লজ্জিত হয়েছিলেন।

নমিতা—তা জানি না, তবে অশেষদাকে সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সায়েনটিস্ট বন্ধু এখন কিসের গবেষণা করছেন? অশেষদা বললেন, বন্ধু ভাল মাইনেতে সরকারের একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কমিটির উপদেষ্টা হয়েছেন। হ্যাঁ....একবার অশেষদার একটা গোপন ব্যাপার হাতে হাতে ধরে ফেলেছিলাম, কিন্তু শেষে হঠাৎ...।

অলকা—কী বললেন?

নমিতা বলে—গোপন প্রেমের ব্যাপার।

অলকার চোখ শিউরে ওঠে। —কী বললেন?

—একদিন আমি নমি বীণা আর রমা এখানে এসে দেখি, সুধা বাড়িতে নেই। অশেষদা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, তোমরা কিছুক্ষণ এখানে বসো, সুধা এখনি ফিরবে। বলেই কোথায় যেন চলে গেলেন অশেষদা! রমা টেবিলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে উঠল। কী ব্যাপার? দেখি, অশেষদার কাছে লেখা একখানা খামের চিঠি টেবিলের উপর পড়ে আছে, মেয়েলি হাতের লেখা ঠিকানা।

অলকা—বলুন, মেয়েলি হাতের লেখা বলে আপনাদের সন্দেহ হয়েছিল।

নমিতা—সন্দেহ কেন হবে? খামটা খোলাই ছিল। বীণা খামের ভেতর থেকে চিঠিটা বের করে নিয়ে তখুনি পড়তে শুরু করে দিল। কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেল থেকে লেখা এক মহিলার চিঠি, নাম পামেলা ডানকান। বেচারা লিখেছে, প্যারিসের সেই দুবছরের স্মৃতি ভুলে যাবার সাধ্য আমার নেই। তাই ইন্ডিয়াতে এসেছি, শুধু তোমাকে একবার দেখে ফিরে চলে যাব। কাল বিকেলে ঠিক চারটে ত্রিশ মিনিটের সময় ইডেন বাগানের গেটের কাছে যেন তোমাকে দেখতে পাই। আমি তোমার কাছে যাব না, তোমাকে একটুও বিরক্ত করব না। শুধু দূর থেকে একবার দেখে নিয়ে, আমার তপ্ত চোখের জল নির্মম হাতে মুছে নিয়ে চলে যাব।

কপালটাকে একহাতে টিপে ধরে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে অলকা। মাথাটা বোধ হয় হঠাৎ ভার-ভার হয়ে ঝুঁকে পড়েছে।

নমিতা বলে— আমরা তিন জনে বিকেলে তিনটে হতেই ইডেন গার্ডেনের গেট থেকে একটু দূরে গাছের আড়ালে লুকিয়ে আর জটলা করে বসে রইলাম। পামেলা ডানকানের মুখটা দেখবার জন্য সে যে কি-ভয়ানক লোভ মনের ভিতর ছটফট করছিল, আপনি ধারণা করতে পারবেন না অলকাদি। তা ছাড়া অশেষদার মুখটাও দেখবার জন্য...কী বলব... যেমন লোভ হচ্ছিল, তেমনি ভয় হচ্ছিল, আবার মাঝে মাঝে হাসিও পাচ্ছিল। বিলাতের প্রিয়াকে মুখ দেখাবার জন্য অশেষদা গেটের কাছে এসে দাঁড়াবেন। গম্ভীর হয়ে, হয়ত চোখ ছলছল করে এদিক-ওদিক তাকাবেন। অশেষদার জীবনের একটা গোপন রহস্যের ছবি স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া যাবে...উঃ আমাদের আর তর সইছিল না।

অলকা—তারপর কী হল?

নমিতা—আমাদের রাগ হতে শুরু হল। রেগে রেগে শেষে হতাশ হয়ে পড়লাম।

অলকা—কেন?

নমিতা—না পামেলা ডানকান, না অশেষদা, কারও মুখ দেখবার সৌভাগ্য হলো না। হতাশ হয়ে যখন উঠব উঠব করছি, তখন একটা ভিখিরি গোছের ছেলে এসে রমার হাতে একটা চিঠি দিল—বাবু এই চিঠি আপনার হাতে দিতে বললেন।

রমা আশ্চর্য হয়—আমার হাতে ? কোন বাবু? তাঁর নাম কী?

ভিখিরী গোছের ছেলেটা বলে—ওই যে...দেখুন না, ওই যে চটপট ভেগে যাচ্ছেন, ওই বাবু।

দেখলাম, হ্যাঁ অশেষদাই বটে। গার্ডেনের গেট থেকে বেশ কিছু দূরের রাস্তার কিনারা ধরে যেন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চলে যাচ্ছেন অশেষদা। আমি বললাম—চিঠিটা খুলে একবার পড়েই দেখ না রমা।

চিঠি খোলা হল। চিঠির ভিতরে এক টুকরো কাগজে শুধু ছোট্ট দুটি কথা বড় বড় হরফে লেখা—এপ্রিল ফুল।

অলকার চোখের চাহনিও যেন অপ্রস্তুত হয়ে ফ্যালফ্যাল করে। নমিতা হেসে ওঠে। —হ্যাঁ দিনটা পয়লা এপ্রিলই ছিল। কিন্তু আমাদের সেকথা মনেই পড়েনি। তা ছাড়া সন্দেহও করতে পারিনি যে, অশেষদা এত চমৎকার ফন্দি করে আমাদের জব্দ করবার মতলব করেছিলেন।

অলকা বিড়বিড় করে—তা হলে বলুন, পামেলা ডানকান টানকান একেবারে ভুয়ো ব্যাপার।

নমিতা আশ্চর্য হয়ে তাকায় —আপনি তা হলে এতক্ষণ শুনলেন কী?

অলকা লজ্জিত হয়—শুনেছি, সব শুনেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না, পামেলা ডানকানের চিঠিটা কোথা থেকে এল?

নমিতা হেসে লুটিয়ে পড়ল—আপনি কিছুই বুঝতে পারেননি, চিঠিটা অশেষদার নিজের হাতের লেখা ছিল; একদিন আগে চিঠিটা লিখে ডাকে ফেলে দিয়ে এসেছিলেন। ...আমরাও এত বোকা যে অশেষদার হাতের লেখার চেহারা জানা থাকতেও বুঝতে পারিনি যে...।

অলকা হাসে—সন্দেহ ব্যাপারটাই এ-রকমের।

নমিতা—কী?

অলকা—মানুষকে বোকা বানিয়ে ছাড়ে ।একবার মনে সন্দেহ ঢুকলে বুদ্ধিসুদ্ধি এলোমেলো হয়ে যায়।

নমিতা—সত্যি কথা। গত বছর আমরা রাঁচি বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমরা যে বাড়িতে ছিলাম, তার পাশের বাড়িতেই এক ভদ্রলোক থাকতেন। বাড়িতে কোনও মহিলা ছিল না। শুনেছিলাম ও বাড়িতে ওই ভদ্রলোক ছাড়া শুধু একজন চাকর থাকে। ভদ্রলোক আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন।

অলকার চোখে আতঙ্কের ছায়া ছম্‌ছম্‌ করে। কী বললেন।

নমিতা— ভদ্রলোক বলতে গেলে সারা দিনের মধ্যে পনেরো ঘন্টা তাঁর ঘরের জানলার কাছে বসে আমার ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যায় ...মাঝে মাঝে মাঝরাতেও ঘুম থেকে উঠে জানলার কাছে দাঁড়াতে গিয়েই দেখেছি, ভদ্রলোক আমার ঘরের জানলার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। শেষে জানলা আর খোলা রাখতাম না। ....দম বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে জানলাটা খুলে দিতাম, কিন্তু কি আশ্চর্য! দেখতাম, ভদ্রলোক ঠিক সেইভাবে একেবারে অপলক চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

অলকা—লোকটাকে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিলেই পারতেন।

নমিতা—তা'ও চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু চেঁচিয়ে কথা বলতে গিয়েই থমকে যেতাম। বিশ্রী লজ্জা আর রাগ হত। কোথাকার কে একটা বেহায়া অভদ্র লোক, তার চোখের তাকানিকে এত পরোয়া করবারই বা কি আছে? কিন্তু মাঝে মাঝে চোখ পাকিয়ে লোকটাকে শাসিয়ে দিতাম। কি আশ্চর্য, বেহায়া লোকটা হেসে ফেলতো। শেষে একদিন...।

নমিতার মুখটা হঠাৎ যেমন লজ্জিত তেমনই করুণ হয়ে যায়। অলকা ব্যস্ত হয়ে ওঠে।—শেষে একদিন কী হল, বলুন।

নমিতা—মেজদা একদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাশের সেই বাড়ির জানলার কাছে এসে থাকা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন—কী ট্রাজেডি! আমি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম—তার মানে? মেজদা বললেন, ভদ্রলোক অন্ধ। দুটো চোখই পাথরের চোখ।

নমিতার করুণ মুখ আরও করুণ হয়ে ওঠে। —ভেবে দেখুন অলকাদি, একটা মানুষকে মিছিমিছি সন্দেহ করে কত যাচ্ছেতাই কথাই না ভেবেছি।

অলকা—তা আপনারই বা দোষ কী? আপনি জানতেন না বলেই না...।

নমিতা—কিন্তু আমি একটা কথা বেহায়ার মত আপনার কাছে বলে দিতে পারি অলকাদি।

অলকা—বলুন।

নমিতা—আসল ভুল কোথায় জানেন? সন্দেহ করতে ভাল লাগে । ওটা আমাদের একটা অহংকারের ভাব।

নমিতার গল্প-বলা আসরের মনটা শেষের দিকে যেন মুষড়ে পড়েছে, বড় বেশি গম্ভীর হয়ে যায় অলকা। নমিতার গল্পের শেষ কথাটা যেন অলকার বুকের ভিতরে একটা কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছে।

অশেষ ডাক্তারকে সন্দেহ করবার পর এখন যে লজ্জা অনুভব করতে হচ্ছে, সে লজ্জার মধ্যে একটা জ্বালাও যেন আছে, কারণ সন্দেহটা ভয়ানকভাবে অপ্রস্তুত হয়েছে। আর, সেই সঙ্গে অলকার প্রাণটাও অপমানিত হয়েছে।

অপমান বৈকি! দুটো ঘন্টা এই বাড়িতে অলকার চোখের সামনে একা বসে থাকতে চায় না অশেষ, বড় বেশি সাবধান। তাই বাড়ির বাইরে গিয়ে পাড়ার দিদি বোনেদের ডেকে নিয়ে এসেছে।

জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে, এরকম একটা কাণ্ড করলেন কেন আপনি? অশেষ ডাক্তারকে এখনি একবার আড়ালে পেতে ইচ্ছে করে, আর সোজা প্রশ্ন করতেও ইচ্ছা করে, —আমার সম্পর্কে আপনার মনে যখন এত ভয়, তখন আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন? উপকার করতে চান, শৈলেশ্বরের খবর দিতে চান, সেটা তো পুরনো বাগান স্ট্রিটের সেই আলো-ছায়ার কাছেই বলে দিতে পারা যেত। এরকম একটা নাটকীয় কাণ্ড করবার কী দরকার ছিল?

কিন্তু আর যে কোনও কাণ্ডই করুন না কেন অশেষ ডাক্তার নামে এই ভদ্রলোক, এতক্ষণের মধ্যে একবারও এই ঘরের ভিতরে আসেননি। এখন তো নমিতা এখানে আছে; চক্ষুলজ্জার কোনও কারণ নেই। অনায়াসে এখানে এসে ভদ্রতার খাতিরেও দুটো কথা বলতে পারতেন। কিন্তু তাও না। কোথায় সরে পড়েছেন কে জানে?

অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে নমিতা বলে—আপনি কী—যেন ভাবছেন।

অলকা—না, তেমন কিছু না। ভাবছি, অশেষবাবু আবার খেয়ালের ঝোঁকে বাড়ির বাইরে কোথায় চলে গেলেন না তো?

নমিতা হাসে—আশ্চর্য নয়।

বাড়ির বাইরে নয়; নীচের তলায় একটি ঘরে চেয়ারের উপর চুপ করে বসে আছে অশেষ। মাঝে মাঝে যেন একটা অস্বস্তির জন্য ছটফট করে ওঠে, তারপরেই পায়চারি করে বেড়ায়।

এই প্রথম নিজের মনের সঙ্গে যেন একটা জেদাজেদি ঝগড়ার মধ্যে পড়েছে অশেষ। পুরনো বাগান স্ট্রিটের বিমান চৌধুরীর মেয়ের জীবনের সুখ-দুঃখের সমস্যা নিয়ে এত চিন্তা আর এরকম নির্লজ্জ ছোটাছুটির অর্থ কী?

অলকা চৌধুরীকে ভাল লাগে কি? লাগে বইকি! অস্বীকার করার অর্থ হয় না। অলকা চৌধুরীকে বিয়ে করে চিরকালের জীবনসঙ্গিনী করে নিতে ইচ্ছে করে? ইচ্ছে করলে দোষ কী? মনে মনে স্বীকার করে অশেষ, বিমান চৌধুরীর মেয়ের উপর এত বেশি মায়ায় পড়ে যাবার এই

একটি অর্থ হতে পারে, অলকার ওই গম্ভীর সুন্দর মুখটাকে কাছে পাওয়ার জন্য অশেষের প্রাণটা লোভী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সেজন্য এত চিন্তিত হবার কী আছে? এই মুহূর্তে অলকাকে একটি কথা শুনিয়ে দিতে পারে অশেষ, যে কথা শোনবার পর অলকার ভালবাসার মানুষ শৈলেশ্বর অলকার কাছে ঘৃণ্যতম মানুষে পরিণত হয়ে যাবে। শৈলেশ্বরের কপট ভালবাসার ইতিহাস স্মরণ করে নিজের মূর্খতাকে ধিক্কার দেবে। হয়ত চেঁচিয়ে উঠবে, কেঁদে ফেলবে অলকা। শৈলেশ্বরের নিষ্ঠুরতার রকম দেখে অলকার বুকের সব নিঃশ্বাসের গর্ব লুটিয়ে পড়বে। তখন অনায়াসে অলকার হাত ধরে অলকাকে সান্ত্বনা দিতে পারবে অশেষ। আর, অলকা অনায়াসে অশেষের হাত ধরে শান্ত হতে চেষ্টা করবে। তারপর... তারপর অশেষের মুখের দিকে তাকিয়ে অশেষের আশার সংকেত বুঝে ফেলতে একটুও কি দেরি করবে অলকা? খুশি হবে না কি অলকা?

কিন্তু ঘটনাটা কল্পনা করতেই অশেষের মন যেন ছোট হয়ে যায়। এভাবে অলকার ভালবাসা পাওয়াতে কোনও গর্ব নেই, জয়ের আনন্দ নেই, তৃপ্তি নেই। জীবনে শৈলেশ্বরকে পাওয়া গেল না, অতএব অশেষ। নাঃ, অলকার ভালবাসার এরকম একটা কারবারি রূপ দেখবার জন্য অশেষের মনে কোনও লোভ নেই।

শুধু অলকা চৌধুরীর ভালবাসা নয়। ভালবাসার গর্ব জয় না করতে পারলে যে কিছুই ভাল লাগবে না। শৈলেশ্বরের উপেক্ষায় ধুলোমাখা হয়ে অসহায় হয়ে যাবার পর অলকার মন অশেষকে যে ভালবাসা দিয়ে সুখী হতে চাইবে, সে ভালবাসা কিনা সন্দেহ। সে ভালবাসা অলকার নিজের উপর নিজের ভালবাসা। অশেষ নামে এই দু'দিনের পরিচিত মানুষের উপর ভালবাসার ব্যাপার নয়।

নিজের মনের এই অদ্ভুত সাধের ভাষা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে লজ্জিতও হয় অশেষ। বড় বেশি অহংকারের স্বরে কথা বলছে মনটা। কিন্তু তুমিও ভেবে দেখো অলকা....অশেষের মনের ভিতর যেন জটিল একটা তর্কের গুঞ্জন এলোমেলো হয়ে ছোটাছুটি করে...শৈলেশ্বরের অমানুষিক ব্যবহারের খবর শুনে দুঃখিত হয়ে, হতাশ হয়ে আর শূন্য হয়ে যাবার পর. আমার মুখের দিকে পিপাসিতের মত তাকিয়ে থাকা যে তোমারও গর্বের পরাজয়, তোমার অপমান। তোমাকেও কত ছোট মনে হবে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আরও একটা কথা, যেটা নিতান্ত মায়ার কথা। শৈলেশ্বরের সঙ্গে আজ ত্রিদিববাবুর মেয়ের বিয়ের খবরটা এখনই যদি অলকাকে বলে দেওয়া যায়, তবে বেচারা যে আশ্চর্য হয়ে বুকফাটা অপমানের আঘাতে এখনি আছড়ে পড়বে। নিজের ভুলের যন্ত্রণা, আর প্রতারকের নির্মমতার কথা ভেবে মনটাকে পোড়াবে। বেচারাকে এই অভিশাপের জ্বালা সহ্য করবার দুর্ভাগ্যে ফেলবার দরকার কী?

এমন কি হয় না, শৈলেশ্বরের সঙ্গে ত্রিদিব বাবুর মেয়ের বিয়ের খবর শুনে হেসে উঠবে অলকা চৌধুরী? একটুও দুঃখিত বা ব্যথিত হবে না। বরং, সে খবর শুনে অলকা চৌধুরীর চোখে এক অদ্ভুত কৌতুকের আলো ঝিকমিক করে হেসে উঠবে।

অশেষের অদৃষ্টের একটা পরীক্ষা দেখা দিয়েছে মনে হয়। অলকা চৌধুরীর ভালবাসা জয় করতে গিয়ে যদি হার মানতে হয়, তবে সে অপমান চিরকালের ক্ষত হয়ে অশেষের বুকের ভিতর লুকিয়ে থাকবে। জীবনে কোনও নারীর মুখের দিকে তাকাবার সাহস আর হবে কি না সন্দেহ!

অশেষের অনেক রকমের খেয়ালের কাণ্ড দেখেছে মিনুদি, দেখেছে নমিতা, বীণা, আর রমা।

কিন্তু অশেষের আজকের খেয়ালের কাণ্ডটাকে কেমন যেন সন্দেহ করছে ওরা সবাই। মিনুদি আশ্চর্য হয়ে বলেছে—সে কি? এ কেমন অদ্ভুত নেমতন্ন। রমা অন্য দিকে তাকিয়ে কথা

বলতে গিয়ে হঠাৎ মুখ টিপে হেসেও ফেলেছে—আঃ, বেচারা অলকা চৌধুরী যদি এরকম একটা হঠাৎ নেমন্তন্নে আসতে রাজি হয়ে যায়, তবে আমাদের আশ্চর্য হবার কী আছে?

বীণা বলেছিল—মোট কথা, অশেষদা একটা সমস্যায় পড়েছেন, সে সমস্যায় উনি আমাদের সাহায্য চাইছেন।

এরা যা সন্দেহ করেছে, তা যদি পরিণামে সত্যি না হয়, তবে যে এতগুলি মানুষের চোখের কাছেও ছোট হয়ে যাবে অশেষ? এই পাড়ার সব অন্তঃপুরের গল্পের একটা নতুন বিষয় হবে। অশেষের পৌরুষের গৌরবকে করুণা করে আর মিষ্টি কথায় ঠাট্টা করে গল্পগুলি মুখর হয়ে ছোটাছুটি করবে; অশেষ বেচারার তো খুবই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অলকা চৌধুরীই রাজি হল না।

অশেষেরও উচিত হয়নি। সাত-তাড়াতাড়ি একটা অচেনা অজানা মেয়ের জন্যে এরকম ছুটোছুটি করে শুধু যে নিজেকেও লঘু করে ফেলা হয়েছে তা নয়, নিজেকে বিপদে জড়িয়েও ফেলা হয়েছে।

এক কবি আছেন, কী-যেন তাঁর নাম যিনি কবিতায় একটি গল্প লিখে এই তো কিছুদিন আগে এক বেকুবের প্রেমিকতাকে ঠাট্টা করে অনেক হাসি হাসিয়েছেন। সে কবিতা পড়েছে অশেষ। বেশ মনে পড়ে, কবিতা পড়তে পড়তে কতবার অশেষও হেসে ফেলেছিল। দুর্লভ রূপের এক মেয়েকে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছিল একটা লোক। লোকটা জানত না, সেই মেয়ের এক প্রণয়ী আছে এবং কত গভীর দুজনের প্রণয়! সেই মেয়ের চোখের চাহনি আর মুখের হাসিকে আহ্বানের সংকেত মনে করে লোকটা ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে সেই মেয়ের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। মেয়েটি বাঁকা ঠোঁটের শ্লেষ চাপা রেখে আর নকল সোহাগের হাসি হেসে বলেছিল—এই ফুল নয়! অন্য ফুল চাই।

—কোন ফুল?

—রক্তকরবী।

লোকটা সারা শহরের সব বাজারে ঘুরে, ফুলের দোকান ঢুঁড়ে, ঢুঁড়ে, আর শহরের বাইরে এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরেও রক্তকরবী খুঁজে পেল না। কেমন করে পাওয়া যাবে? সে যে অসম্ভব। সে সময় রক্তকরবী ফোটে না। অগত্যা লোকটা হয়রান হয়ে একদিন সেই মেয়ের কাছে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেছিল—কী সর্বনাশ, পৃথিবীতে যে রক্তকরবী আর ফোটে না।

মেয়েটি অট্টহাসি হেসে বলেছিল—তবে যাও; এখানে আর এসো না। তোমার প্রেম প্রেমই নয়।

হ্যাঁ, এইরকম হয়রানির ভূতে বোধ হয় অশেষের প্রাণটাকেও পেয়ে বসেছে। শুধু হয়রানি নয়, বেশ নাকানি-চুবানিও কপালে আছে বোধ হয়। পাঁকাল দীঘির পদ্ম তুলতে গিয়ে কারও কারও যে দশা হয়, সেই দশা। পদ্মের কাছে পৌঁছনো তো যায়ই না, শুধু পাঁক আর যত কিলবিলে জংলা জলজ লতায় পা জড়িয়ে যায়। নিজেকে উদ্ধার করাই তখন সমস্যা হয়ে ওঠে।

না, আর সমস্যার পাঁকের ভিতর এগিয়ে যাবার দরকার নেই। এখনই সাবধান হয়ে যাওয়া ভাল। চা আর খাবার খেয়ে নিক অলকা। মিনুদি আর ওরা—বীণা, নমিতা আর রমা চলে যাক। তারপর একেবারে স্পষ্ট ভাবে আসল খবরটা, শৈলেশ্বরের বিয়ের খবরটা অলকাকে শুনিয়ে দিলেই হবে। তারপর অলকা কাঁদুক বা হাসুক, তা নিয়ে অশেষের আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

সত্যি তো কী দরকার? কে বলেছে, শৈলেশ্বরের নিষ্ঠুরতার খবর জানতে পেরে অলকা দুঃখের আঘাতে একেবারে ভেঙে যাবে, আর অশেষের হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইবে? এটা তো অশেষের লোভী আশার একটা অনুমান মাত্র। এমনও হতে পারে তো, সব খবর শুনেও চেঁচিয়ে হেসে উঠবে অলকা। চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের উগ্র আর উজ্জ্বল হয়ে ঝক্‌ঝক্ করবে। অশেষের সব উদ্বেগ করুণা আর উপকারের চেষ্টার এই দু'দিনের ইতিহাসকে ঠাট্টা করে, আরও

কঠোর একটা হিস্টিরিয়ার আবেশে বলে দেবে অলকা—শুনে সুখী হ'লাম। সুখী হোক শৈলেশ্বর। আমি শৈলেশ্বরকে ভুলতে পারব না। জীবনে পর হয়ে গেলেও সে আমার মনের স্বপ্নে থাকবে।

মনে হয়, এই কথাই বলবে অলকা। বেশ তো, তারপর দেখা যাক, সে মনের জোর নিয়ে কতক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে আর অশেষের মুখের দিকে না তাকিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতে পারে অলকা। অশেষও দুচোখের চাহনির যন্ত্রণা চেপে রেখে আর শান্ত হাসি হেসে বলে দিতে পারবে—তাই হোক, কিন্তু মনে রেখো, তুমি যদিও আমার জীবনে পর হয়ে রইলে, কিন্তু তবুও তুমি আমার মনের স্বপ্নে চিরকাল থাকবে. তোমাকে কখনও ভুলতে পারবো না।

ওঘরের ভিতরে বেশ হাসিভরা চেঁচামেচির সাড়া শোনা যায়। কী হল? বীণার সেতারের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। মিনুদির চা তৈরি করা বোধ হয় গিয়েছে। হ্যাঁ, ঠিক তাই। রমার ডাক শোনা যাচ্ছে—অশেষদা কোথায়? এ ঘরে আসুন।

আর দ্বিধা করে না অশেষ। হাসিমুখে ঘরের ভিতরে ঢুকেই দেখতে পায়, ডিসের উপর রুটি মাখন আর কিসমিস ছড়ানো মোহনভোগ সাজিয়ে নিয়ে অলকার কাছে দাঁড়িয়ে আছে নমিতা। মিনুদি পেয়ালায় চা ঢালছেন। আর, অলকার ঠোঁটে হাসি, চোখে ভয় কপালে ঘাম।

অশেষকে দেখতে পেয়েই ভ্রূকুটি করে তীব্র একটা দৃষ্টি হেনেই মুখ ঘুরিয়ে নেয় অলকা।

কিন্তু তারপর আর দ্বিধা করে না। যেন একটা হাস্যাস্পদ চক্রান্তের চাপে পড়ে, আপত্তি করবার শক্তি হারিয়ে, আর লজ্জার সঙ্গে একটু রাগ মিশিয়ে দিয়ে খাবারে হাত দেয় অলকা। —বুঝতে পেরেছি, আমাকে খেতে বাধ্য করবার জন্য আপনারা তৈরি হয়েছেন।

মিনুদি—ছিঃ বাধ্য করব কেন? তোমাকে দেখে কত খুশি হলাম, তুমিও খুশি হয়ে আমাদের আদরের এই সামান্য উপদ্রব সহ্য করবে, এই তো চাই।

নমিতা বলে—উপদ্রবের আসল দিনগুলি তো এখনও বাকি আছে। তখন দেখবেন, উপদ্রব কাকে বলে?

অলকা—কী বললেন?

রমা নমিতাকে টেনে সরিয়ে দেয় —আঃ এখনি সব বলে ফেলিস না নমি। সুদিন আসুক, তারপর।

সুদিন? অলকার কানের কাছে একটা নির্মম বিস্ময় যেন ঠাট্টা করে বাজছে। সুদিন, কার সুদিন? এই ঘরে আবার অলকা চৌধুরীর জীবনের সুদিন কেন দেখা দেবে? এরকম অসম্ভব কথা কেন ভাবছে এরা? অলকা চৌধুরীর মত মেয়েকে কোনওদিন আবার এই ঘরে ফিরে এসে এরকম একটা উৎসবের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে তেমন সৌভাগ্য...

ছিঃ, ছিঃ মাথাটা কি খারাপ হ'য়ে গেল। অলকা চৌধুরীর মনের গর্ব কি এরই মধ্যে মিথ্যে লোভের বশে ক্ষুদ্র হয়ে একেবারে ...ছিঃ!

মিনুদি অশেষের হাতের কাছে এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিলেন। তারপর নিজেও এক পেয়ালা চা পাঁচ চুমুকে শেষ করে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—বাস, আজ এই পর্যন্ত —চা ছাড়া আর কিছু নয়। মিষ্টি খাব সেদিন, যেদিন মিষ্টি খাবার সত্যিই দরকার হবে।

তারপর আর বেশিক্ষণ নয়। ঘরের মুখর উৎসব নীরব হয়ে গেল। মিনুদি চলে গেলেন। রমা, বীণা আর নমিতাও ব্যস্তভাবে চলে গেল। নীরব ঘরের ভিতরে চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অলকা যেন বিরক্তভাবে একটা ঝংকারের মত স্বরে বলে ওঠে—আমিও যাই।

অশেষ বলে—হ্যাঁ। একটু অপেক্ষা করো। আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে আনি।

নিশ্চয় ঘর ছেড়ে চলে যেত অশেষ, কিন্তু যেতে পারল না অলকারই গলার স্বরের আর একটা উত্তপ্ত বিদ্রূপের জন্য। বাঃ—অদ্ভুত শ্লেষের সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করে অশেষের মুখের দিকে তাকিয়েছে অলকা।

অশেষ—তুমি কি আমার কোনও অন্যায় দেখলে?

অলকা—আপনি দেখালে দেখতে পাব না কেন?

অশেষ—কী অন্যায় দেখলে?

অলকা—থাক্, আপনার সঙ্গে তর্ক করবার কোনও ইচ্ছা আমার নেই।

অশেষ মৃদুভাবে হাসে—আমারও আর এরকমের তর্ক করবার কোন ইচ্ছে নেই অলকা। যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তবে বলো, আমি সত্যি কিছু মনে করব না।

অলকা—আপনার এখানে আসবার পর থেকে যেসব ব্যাপার হল, তার কোনওটাই আমার ভাল লাগেনি।

অশেষ—কী ব্যাপার হল?

অলকা—এই যে ওঁরা মিনুদি আর নমিতারা, ওঁদের কথাবার্তার রকম একটুও ভাল নয়।

অশেষ—কে জানে, ওদের কথাবার্তা তোমার কেন ভাল লাগল না। আমি তো জানি আমাদের পাড়ায় ওদের চেয়ে ভদ্র আর সুন্দর স্বভাবের মানুষ আর নেই।

অলকা—না না, সে কথা বলছি না। ওদের অভদ্র বলব, এত বড় অভদ্র আমি নই। কী চমৎকার মানুষ মিনুদি। কিন্তু...

অশেষ—কী?

অলকা—ওঁরা বোধ হয় আমাকে ভুল বুঝে চলে গেলেন।

অশেষ—কেন ভুল বুঝবেন, তাও তো বুঝতে পারছি না।

অলকা—যাক, যেতে দিন ওসব কথা। আমি শুধু ভাবছিলাম, ওঁরা যেন আপনাকেও ভুল না বুঝে বসেন।

অশেষ—তার মানে?

অলকা—তার মানে, মিছিমিছি আপনার সম্বন্ধে যেন এমন ধারণা না করে বসেন যে, আপনি আমাকে আপনার একটা ইচ্ছের জন্য...।

অশেষ—কী বললে?

অলকা হেসে ফেলে— ওরা তো জানে না, আপনি কেন আর কী কথা বলবার জন্য আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। বেচারাদের দোষ কী, যদি ওরা আপনাকে সন্দেহ করে বসে।

অশেষ হাসে—সেটা তোমার দোষ নয় অলকা। আমি কাল সন্ধ্যা থেকে যেরকমের কাণ্ড করছি, তাতে সন্দেহ করলে দোষ হবে কেন? কে না সন্দেহ করে? বরং আশ্চর্য এই যে, তোমার মত মেয়েও আমাকে বিশ্বাস করে আমার অনুরোধে আমার বাড়িতে এসেছে। এখন ভালয় ভালয়.....।

অলকা—কী?

অশেষ দরজার দিকে তাকায়। অলকা গম্ভীর হয়ে বলে— ট্যাক্সি ডাকতে যাবেন?

অশেষ—হ্যাঁ!

অলকা—যান তা হলে। কিন্তু আমাকে এখানে একা রেখে আপনার বাইরে যাবার দরকার কী? আমিও তো আপনার সঙ্গে যেতে পারি ট্যাক্সির জন্যে।

অশেষ—তাই ভাল।

অশেষ আর অলকা, দুজনে নীরব হয়ে আলোকে উজ্জ্বল ঘরটাকে কিছুক্ষণের জন্য যেন একবারে স্তব্ধ করে দেয়। যেন এই রাত্রির একটা আকুলতার নাটক হঠাৎ রবহারা হয়ে একেবারে রিক্ত শূন্য ও উদাস হয়ে যাচ্ছে। অশেষের জীবনে যেন আর কোনও কথা নেই, অলকার কথা বলবার পালা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। ঘরের নীরবতা যেন একটা বিদ্রূপ। ছিঃ, ছিঃ! উৎসাহের অর্ন্তধান কি এত মূক আর এত শান্ত হতে পারে?

মেঝের দিকে তাকিয়ে ছিল অলকা। আর,অশেষ যেন হঠাৎ বাইরের বাতাসকে সন্দেহ করে দরজার পরদার গায়ে হাত দেয়। আর পরদা সরিয়ে দিয়েই দেখতে পায়, বাইরের বারান্দার এক কোণে যেন হতভম্ব আর আতঙ্কিতের মত দাঁড়িয়ে আছে নমিতা। এই ঘরেরই দরজার পরদার দিকে তাকিয়ে আছে নমিতা। মনে হয়, ঘরের ভিতরে ঢুকতে গিয়েই হঠাৎ একটা লজ্জার ভয়ে চমকে উঠে দূরে পালিয়ে গিয়েছে।

—কী ব্যাপার, নমিতা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

অশেষের ডাক শুনে নমিতার হতভম্বতা যেন সাহস পেয়ে হেসে ওঠে। —আমার স্কার্ফটা আপনার এই ঘরের ভিতর পড়ে আছে।

অশেষ—পড়ে আছে তো নিয়ে যাও।

হন্‌হন্‌ করে হেঁটে এগিয়ে এসে আর ঘরের ভিতর ঢুকে স্কার্ফটা হাতে নিয়েই প্রায় ছুটে চলে যায় নমিতা। ঘরে অলকার মূর্তিটাকে এত স্পষ্ট করে চোখের সামনে দেখতে পেয়েও একবার থমকে দাঁড়ায় না নমিতা। যেন অলকার কাছে মস্ত বড় একটা অপরাধ করে ফেলেছে, ভাবটা সেই রকমের।

না, এখন আর কেউ নেই। চলে গিয়েছে নমিতা। অলকার গলার স্বরে আবার একটা দুঃসহ আক্রোশ উথলে ওঠে। —আপনার জন্যে আমাকে বার বার যাচ্ছেতাই অপমান সহ্য করতে হচ্ছে।

অশেষ—কে অপমান করল?

অলকা—এই যে, আপনার পাড়াতুতো বোন নমিতা।

অশেষ—কী করল নমিতা?

অলকা—আমার সঙ্গে একটা কথাও না বলে, যেন আমি আপনার ঘরে চুরি করতে ঢুকেছি, এরকম একটা ভাব দেখিয়ে ছুটে চলে গেল কেন নমিতা?

অশেষ ভ্রূকুটি করে। —নমিতার সঙ্গে যদি কোনওদিন তোমার দেখা হয়, তবে নমিতাকেই জিজ্ঞাসা করো। আমাকে বলে লাভ কী?

অলকা—আপনাকে বলব না কেন? আপনিই তো আমার এই সব অপমানের মূলে আছেন।

কথাগুলি অশেষের কানে যেন অপমানের কশাঘাতের মত বেজে ওঠে। শান্ত চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে আর বেশ একটু তীব্র হয়ে চমকে ওঠে। বিমান চৌধুরীর মেয়ে নিজেকে অপমানিত বোধ করছে। অপমান এই কারণে যে, নমিতা কী যেন সন্দেহ করেছে। সন্দেহটাকেও অনুমান করা যায়। ঘরের নিভৃতে অশেষ আর অলকার এই সান্নিধ্য, চুপচাপ দুজনের এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা নমিতার চোখে সেই রহস্যের মত মনে হয়েছে, যে রহস্য শুধু দুজন ভালবাসার মানুষকে এভাবে নীরব করিয়ে রাখে। কিন্তু অলকার গর্বের হিস্টিরিয়ারও কত গর্ব। নমিতার সন্দেহটাকে কল্পনা করতেও ঘৃণা বোধ করছে অলকা। তার মানে, অলকার গা-ঘেঁষা অশেষের এই ছায়াটাকেই ঘৃণা করছে অলকা।

অশেষ বলে— আমিও তো বলতে পারি, আমার অপমানের মূলে তুমি আছ?

—কী বললেন? অলকার চোখের চাহনিও তীব্র হয়ে ওঠে।

অশেষ—বলছি, নমিতাই যদি একটা বাজে সন্দেহ করে থাকে, তবে সেজন্য শুধু নমিতা দায়ী নয়; তুমিও।

অলকা—তার মানে?

অলকা—তার মানে তুমি এখানে না থাকলে নমিতার মনে কোনও বাজে সন্দেহ হবার কারণও হত না!

অলকা—আমি এখানে আসতে চাইনি। আপনি নিয়ে এসেছেন।

অশেষ—আমি নিয়ে এসেছি বলেই তুমি আসনি, তুমি নিজের গরজে এসেছ।

অলকা—কিসের গরজে।
অশেষ—নিজের গরজে। শৈলেশ্বরবাবুর খবর জানবার লোভে।
অলকা—সে লোভটা কি দোষের?
অশেষ—একটুও দোষের নয়।
অলকা—তবে আমাকে বাজে কথা শোনাচ্ছেন কেন?
অশেষ—না, আর কোনও কথা শোনাতে চাই না।
অলকা—তবে এইবার ব্যবস্থা করুন। আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে চাই না।
অশেষ—তবে চলো।
অলকা—চলুন।

আলিপুরের অশেষ ডাক্তারের বাড়ির এই ফটকে আলো জ্বলে। ফুটপাতের কিনারায় বকুল গাছের পাতার আড়ালে থোকা থোকা অন্ধকারের গায়ে সে আলোর ছোঁয়া লাগে না। শুধু দেখা যায় বকুলে কুঁড়ি ধরেছে।

অশেষের চাকর ট্যাক্সি ডাকতে চলে গিয়েছে। তাই ফটকের কাছে আবার একটা দুঃসহ নির্জনতা নীরব হয়ে দুজনকে আবার দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করেছে। অশেষের সিগারেটের ধোঁয়াও যেন উদাস হয়ে গিয়েছে। আর অলকা চৌধুরীর শাড়ির আঁচল রাতের মৃদু বাতাসে যেন উল্লাসের পতাকার মত আস্তে আস্তে দুলছে।

কী আশ্চর্য! এত কাণ্ডের পরও অলকা চৌধুরীর মন বোধ হয় বুঝতে পারছে না, কোথায় ভুল করছে তার মন। যে কথা জানবার জন্য বিপুল একটা কৌতূহলের আর আগ্রহের তাড়না নিয়ে অশেষ ডাক্তারের এই বাড়িতে এসেছে অলকা, সেই কথা জানবার দরকার যেন ফুরিয়ে গিয়েছে। তা না হলে এখনও মন খুলে এই অভিযোগ কেন করতে পারছে না অলকা—কই, আপনি তো এখনও আমাকে শৈলেশ্বরের কথাটা শোনালেন না?

আঁচলটা এক হাতে চেপে ধরে কী যেন ভাবতে থাকে অলকা। চোখের চেহারাও আস্তে আস্তে করুণ হয়ে উঠতে থাকে। বোধ হয় নিজের ভুলের কথাটা মনে পড়েছে। নিজের জীবনের স্বার্থের ছবিটা নয় বোধ হয়! অন্য একজনের জীবনের সমস্যার কথাটা মনে পড়েছে। এই ভদ্রলোকের জীবনেও কোনও সমস্যা নেই কি? কোনও দুঃখ কোনও হতাশার বেদনা?

হাসতে চেষ্টা করে অলকা— এতক্ষণ তো ঝগড়া করেই কেটে গেল। বেশ হল; এখনও তো অন্য কথা দু'চারটে বলতে পারেন।

অশেষ আশ্চর্য হয়ে তাকায়—কী কথা বলব, বলো।

অলকা—আমি বলে দেব?

অশেষ হেসে ফেলে—তুমি বলে দিলেই ভাল ; নইলে আবার কোনও বাজে কথা হয়ত আমার মুখে এসে পড়বে।

অলকা—যদি কিছু না মনে করেন তবে একেবারে স্পষ্ট করে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি।

অশেষ—জিজ্ঞেস করো, আমি কিছু মনে করব না।

অলকা— আপনার কি ইচ্ছে করে না যে....।

অশেষ—কী?

অলকার মুখের বেহায়া প্রশ্নটা যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে ক্ষণেকের মত বোবা হয়ে যায়। চোখের পাতা শিউরে ওঠে। বুকের ভিতরের একটা কুণ্ঠার বাতাস যেন এক ঢোঁকে গিলে নিয়ে হাঁপ ছাড়ে অলকা। তার পরেই প্রশ্ন করে—মিনুদিরা এতদিন ধরে কী করছেন তাহলে?

অশেষ—তার মানে?

অলকা—আপনি এভাবে একা পড়ে আছেন দেখতে পেয়েও কি ওঁরা কোনও ব্যবস্থা করতে...।

অশেষ—ওঁরা এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান না।

অলকা—আপনিও কি...

অশেষ—না, আমিও মাথা ঘামাই না।

অলকা—তার মানে?

অশেষ—তার মানে, মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই।

অলকা— বুঝলাম না।

অশেষ—আমার ইচ্ছে থাকলেও তার ইচ্ছা নেই। অগত্যা....

অলকা—কী আশ্চর্য, তার ইচ্ছা হয় না কেন?

হেসে ফেলে অশেষ— সে-ই জানে।

অলকার চোখ উদাস হতে গিয়ে কেমন যেন হয়ে যায়; তার পরেই চিক্‌চিক করতে থাকে।

—সে মেয়ে কত বোকা, তাই ভাবছি।

অশেষ—তুমি মিছে কেন দুঃখ করছ অলকা?

অলকা—দুঃখ হলে কী করব বলুন। আপনিও তো আমার আশার কথা ভেবে দুঃখ পেয়েছেন।

অশেষ—তা পেয়েছি বই কি?

অলকা ছটফট করে ওঠে। —আমিও কি আপনার কোনও উপকার করতে পারি না?

অশেষ আশ্চর্য হয়ে তাকায়—উপকার করবে? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না অলকা।

অলকা—আমি যদি সেই মেয়ের কাছে গিয়ে আপনার হয়ে দুটো কথা বলি, কিংবা, যদি তাকে বুঝিয়ে দিতে পারি যে, আপনাকে তুচ্ছ করা তার উচিত হচ্ছে না, তবে?

সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটাকে রাস্তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আর মাথা হেঁট করে, বোধ হয় চোখের একটা অদ্ভুত করুণ কৌতুকের দৃষ্টিটাকে লুকিয়ে রেখে অশেষ বলে—যদি কোনওদিন দরকার বোধ করি, তবে বলব। আপাতত আমার উপকার করার চেষ্টা করো না—কারণ...

ট্যাক্সি এসে পড়েছে। অশেষের যে কথার সুর দু'কান তৃষিত করে শুনছিল অলকা, সে কথার সবটা আর শুনতে পাওয়া গেল না। অশেষের কথা শেষ হল না। কিন্তু কী ভয়ানক দুর্বোধ্য এই সব কথা।

আর, ট্যাক্সিটা যেন প্রচণ্ড অভদ্রতার দূত! এই তো কিছুক্ষণ আগে চাকরটা ট্যাক্সি ডাকতে গেল; কত তাড়াতাড়ি চলে এল ট্যাক্সিটা।

বেশ হল । এতক্ষণে মনে পড়ে অলকার, শৈলেশ্বরের খবর শোনাবে বলে একটা নিষ্ঠুর অছিলা করে চতুর অহংকারের মানুষ এই অশেষ ডাক্তার অলকা চৌধুরীকে এখানে নিয়ে এসে নিজের মহত্ত্বের, এমন কী নিজের প্রেমিক জীবনের একটা আত্মত্যাগের যতসব বিবরণ জানিয়ে দিল। অলকা চৌধুরীর জীবনের যত গর্ব, বুদ্ধি আর জেদগুলিকে ঠাট্টা করে একেবারে ছোট করে দিয়ে, একটা খেয়ালের খেলার আনন্দে এখন অলকাকে একটা মূল্যহীন লোষ্ট্রখণ্ডের মত গাড়িতে তুলে নিয়ে আবার ঢাকুরিয়ার পুরনো বাগান স্ট্রিটের বুকের উপর ছেড়ে দিয়ে আসবার জন্য তৈরি হয়েছে।

ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে যাবার জন্য তৈরি হয় অলকা। তার আগে অশেষের ছায়াটার দিকে একবার তাকায়। একটা নির্বিকার উপেক্ষার ছায়া। কথা বলতে গিয়ে অলকার গলার স্বর চিৎকারের শব্দের মত বেজে উঠে। —আপনার সঙ্গে কী শৈলেশ্বরের দেখা হয়েছে?

অশেষ—হ্যাঁ।

অলকা—শৈলেশ্বরকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করেছেন?

অশেষ —না।

অলকা—তবে? শৈলেশ্বরের কোন ভাল খবরটা আপনি আমাকে শোনাবেন?

বিব্রত বোধ করে অশেষ। কুণ্ঠিতের মত চাপা স্বরে আস্তে আস্তে বলে—সন্দেহ করো না, আমি খুব একটা মিথ্যে কথা তোমাকে বলিনি। তবে...এর মধ্যে... একটু ফাঁকি অবিশ্যি...।

অলকা—বুঝেছি, শৈলেশ্বরকে আমার কথা বলতে আপনার মনে বোধ হয় একটা বাধা.....।

অশেষ—না।

অলকা—লজ্জা।

অশেষ—না।

অলকা—একটু হিংসে...।

অশেষ—না।

কথাটা চেঁচিয়ে বলে দিয়েই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে অশেষ। অলকা মুখ ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু দেখে ফেলছে অশেষ, অলকার চোখ ভিজে গিয়েছে।

অশেষ—ছিঃ! তুমি আমার কতগুলি ঠাট্টার কথাকেও সত্যি মনে করে যদি...।

অলকা—মিথ্যে কথা বলবেন না। আপনি ঠাট্টা করেননি। আপনি আপনার মনের খাঁটি কথা বলেছেন। অলকা চৌধুরীর মত মেয়ের ভালবাসার কথা মনে করে আপনি পৃথিবীতে কাউকে হিংসে করবেন, এতটা বাজে মানুষ আপনি নন।

অশেষ—যদি বলি হিংসে হয়?

অলকা—বলতে পারেন, কিন্তু সে কথার কোনও মানে হয় না।

অলকার কাছে এগিয়ে এসে চাপাস্বরে, অথচ নিবিড় আবেদনের মত সুরে অশেষ বলে—তুমি যে সব কথা বলছ, তার অর্থ কী হয় বুঝতে পারছ?

অলকা—না।

অশেষ—তার অর্থ, তুমি নিজের ক্ষতি করছ।

অলকা—কী বললেন?

অশেষ—শৈলেশ্বরকে সত্যিই কী ভুলে যেতে চাও?

অলকা— আপনি এরকম বাজে কথা আমাকে বলবেন না।

অশেষ— তা হলে তো কথাই নেই।

—তা হলে আর মিছিমিছি, কে জানে কিসের খেয়ালে ওভাবে চোখ ভিজিয়ে...।

অলকা—আপনাকে যে ভুলে যেতে হবে, একথা ভেবে আপনার মনে কী একটুও...।

অশেষ—আমার মনে যাই হোক, তুমি সেজন্য দুশ্চিন্তা করবে কেন?

অলকা— আপনার কাছ থেকেও জানতে চাই; আপনি দয়া করে স্পষ্ট করে বলুন অশেষবাবু, আমি যদি সত্যই আপনাকে ভুলে যেতে না পারি, তবে আমার কী উপায় হবে?

অশেষ—তুমি দুঃখ পাবে, অথচ আমি তোমার সেই দুঃখের কোনও লাঘব করতে পারব না।

অলকা—তবে বলুন, শৈলেশ্বর ঘোষের স্ত্রীকে আপনি মনে মনে চিরকাল ভালবাসবেন।

অশেষ—একথা কেন জিজ্ঞাসা করছ?

অলকা— আমি আর ভাবতে পারছি না অশেষবাবু। কী ভুল করছি, কোথায় ভুল করছি, কিছুই বুঝতে পারছি না। কোথায় অন্যায় হচ্ছে, তাও ধরতে পারছি না। কিন্তু বুঝতে পারছি, আপনার কাছ থেকে এই আশ্বাস না পেলে জীবনে সুখীও হতে পারব না।

অশেষ— কিসের আশ্বাস?

অলকা—আমাকে আর কত নির্লজ্জ হতে বলছেন? আমাকে কথা দিন, আমাকে

শৈলেশ্বরের স্ত্রী হতে দেখেও আপনি আমাকে ঘেন্না করবেন না; বরং মনে মনে একটু মায়া করবেন।

অশেষ—কিন্তু ভেবে দেখছ কি, মায়া টায়া করলে আমার কী দশা হবে? আমি কী সুখী হতে পারব?

অলকা— সুখী মনে করলেই সুখী হতে পারেন।

অশেষ—কেমন ক'রে নিজেকে সুখী মনে করব?

নীরব হয়ে যায় অলকা। পথের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে অলকা। আঁচল তুলে কপালের ঘাম মোছে। তারপরে, যেন বুকের ভিতরের উতলা নিঃশ্বাসের একটা ঝড় কোনমতে চেপে রেখে বিড়বিড় করে। —আমি আপনাকে ভুলতে পারব না, পরের কাছে গিয়েও না, এই কথা ভেবে।

অশেষ—এ যে ভালবাসার কথা হয়ে গেল।

অলকা—হোক না কেন?

অশেষ—তুমি কী তবে সত্যি.....।

অলকা—না—, আপনার পায়ে পড়ি, ও কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। দু'দিনের পরিচয়ে কেউ কাউকে ভালবেসে ফেলেছে মনে করলেও সেটা ভালবাসা নয়। আমি বললেও ওকথা বিশ্বাস করবেন না।

উত্তর না দিয়ে শুধু অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অশেষ। অশেষের কল্পনা যেন এতক্ষণের প্রতীক্ষার বেদনা থেকে মুক্তি পেয়ে একটা বিস্ময়ের রূপ দেখতে পেয়েছে। এই তো সেই নারী, একজনের প্রেমে প্রায় পাগল হওয়া একটা সত্তা। সেই নারী কত স্পষ্ট ভাষায় অপরের ভালবাসার আশ্বাস চাইছে।

বেশ, তাই হবে। আমি কথা দিলাম অলকা। অশেষও অলকার কাছে এগিয়ে যেয়ে যেন করুণ একটা প্রতিজ্ঞার ঘোষণার মত শান্ত স্বরে কথাগুলো বলে দেয়।

অলকা হাঁপ ছাড়ে।—এবার চলুন অশেষবাবু।

অশেষ—আমারও একটা কথা ছিল।

অলকা—বলুন।

অশেষ—তুমি আমাকে ভুলে যাবে না তো, যদি দেখ যে...

অলকা—কী?

অশেষ—যদি দেখ যে, আমি বিয়ে করেছি।

অলকা—না, ভুলে যাব কেন? কিন্তু আপনি ....আপনি বিয়ে করবেন কাকে?

অশেষ—যে আমাকে এখনও ভালবাসতে পারেনি, অথচ যাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি...।

অলকা—কে সে? যে ভাগ্যবতী হয়েও দুর্ভাগ্যবতী?

অশেষ—একজন কেউ তো বটে। সে যদি সত্যিই ভালবেসে আমার ঘরে আসতে চায়, তবে তাকে নিয়ে আসা তো উচিত।

অলকা — খুব নিয়ে আসবেন। খুব ভাল হবে। জাঁকিয়ে উৎসব করবেন। হাজার লোককে নেমতন্ন করবেন। সাতদিন সানাই বাজাবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আমাকে এ সব প্রশ্ন করবার কোনও মানে হয় না।

ট্যাক্সিটার চেহারাও যেন বদলে যাচ্ছে। কঠোর ঠাট্টার মত, কিন্তু নীরব ও শান্ত। আর দেরি করবারও কিছু নেই। এইবার রওনা হতেই হবে। আর ট্যাক্সির ইঞ্জিনও সেই মুহূর্তে শব্দ করে যেন একটা ঠাট্টার হাসি হেসে ফেলবার চেষ্টা করবে, কিন্তু বুঝতে আর কিছুই বাকি থাকবে না। অশেষের একটা খেয়ালের চক্রান্তকে শেষ পর্যন্ত হয়রান হয়ে কেমন অপমানিত পরিণাম স্বীকার

করে নিতে হল। বিমান চৌধুরীর মেয়ের উপকার করবার সাধ —নিজেই জব্দ হয়ে গেল। চলে যাবে অলকা; আলিপুর থেকে ঢাকুরিয়া পর্যন্ত সারাটা পথ ওই ট্যাক্সিতে অলকার পাশে বসেই এই ঠাট্টার কাঁটা মনে মনে সহ্য করতে হবে--- কেমন জব্দ। এভাবে চক্রান্ত করে কোনও মেয়ের ভালবাসা জয় করা যায় না। তা ছাড়া এই যে তোমার এত ছুটোছুটি আর অলকাকে কাছে পাওয়ার জন্য এত জল্পনা-কল্পনা এসবও তোমার ভালবাসার লক্ষণ নয়।

তার চেয়ে ভাল, এখনই স্পষ্ট করে অলকাকে বলে দাও যে, শৈলেশ্বরের আশা ছেড়ে দাও অলকা, সে এতক্ষণে এক নম্বর পুরনো বাগান স্ট্রিটের ত্রিদিব বাবুর জামাই হয়ে গিয়েছে। তোমার প্রতীক্ষা আর ভালবাসা চুলোয় গিয়েছে। এইবার তুমি শুধু তোমার হিস্টিরিয়া নিয়ে সুখে থাক।

তা ছাড়া নিজেকেও একটা ধমক দিয়ে শাসিয়ে দিতে পারা যায়— ত্রিদিব বাবুর মেয়ের বিয়ের উৎসবের মধ্যে এই মেয়েকে এখনি ছেড়ে দিয়ে চলে এসো, আর নিজেও এই জীবনের মত সাবধান হয়ে যাও। খবরদার, কোনও মানুষের ভালবাসার নারীকে আশা করতে যেও না, সে ভালবাসাতে ভুলে থাকুক বা না থাকুক। তোমার এত মাথাব্যথা কেন? তুমি তোমার ডাক্তারি নিয়ে আর তোমার খেয়াল নিয়ে যেমন ছিলে তেমনি থাক। যদি কোনও মেয়ে সত্যই নিজের থেকে তোমাকে কোনওদিন ভাল চোখে দেখে, তবে তাকে আপন করবার কথাটা ভেবে দেখো। সহজ সরল ও সাদাসিধে মানুষের মত একটা প্রাণ নিয়ে থাক।

অর্থাৎ অলকা তোমাকে ভুলে যাক, তুমিও অলকাকে ভুলে যাও। যদি ভবিষ্যতে কোনদিন দুজনের মুখোমুখি দেখা হয়, তবে শুধু সাধারণ সৌজন্যের কথা বলে দুজনেই খুশি হতে পারবে—কেমন আছেন? খবর ভাল তো!

ট্যাক্সির ড্রাইভার হর্ন বাজাচ্ছে। কর ত্বরা—এখানে কেউ অনন্ত কাল দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য আসেনি। ট্যাক্সিটা এমন ধারণাই বা করবে কেন যে, এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলার মনে এই ফটকের কাছে অনন্ত কাল দাঁড়িয়ে থাকবার কোনও সংকল্প আছে।

কিন্তু অলকার ব্যস্ততাও কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। যেন ভাগ্যের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণের ভয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অলকা। চলে গেলেই বা কী, আর দাঁড়িয়ে থাকলেই বা কী? অশেষ ডাক্তারের সঙ্গে তর্ক করবার, ঝগড়া করবার কিংবা হেসে কেঁদে বাতিক গোছের কাণ্ড করবার পালা এখানেই শেষ। ঢাকুরিয়ার পুরনো বাগান স্ট্রিটের একটা বাড়ির কাছে পৌঁছেই এই খেয়ালের নাটকের সব শেষ হয়ে যাবে, ফাঁকা হয়ে যাবে, শূন্য হয়ে যাবে।

তাই কি? শুধু একটা ফাঁকি, তা হলে বুকের ভিতরের বাতাসটাকে এত ভারি বলে মনে হয় কেন? নিজের উপর রাগ হয় কেন?

এই ভদ্রলোকের উপরেই বা মাঝে মাঝে মনটা ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কেন?

কী আশ্চর্য, কেন কিসের দাবিতে আর কী আশা করে, মনটা এত ছটফট করছে?

ভাবতে গিয়ে চমকে ওঠে অলকা। চমকানিটা একেবারে বুকের ভিতর থেকে ছটফট করে অলকার শরীরটা কাঁপিয়ে দিয়েছে। আর কান দুটোও তেতে উঠেছে। ছিঃ এ কী রকমের ইচ্ছা? ট্যাক্সিটা এখনই চলে গেলে ভাল হয়, যেমন খালি হয়ে এসেছিল তেমনি হয়ে চলে যাক। ছিঃ! এ কেমন সাধ। ট্যাক্সিটা এখনই এত তাড়াতাড়ি না এসে পড়লেই ভাল ছিল, অলকার মনের ভিতরে কী অদ্ভুত লজ্জাহীন ও অভদ্র খেয়াল ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছে?

ট্যাক্সির ড্রাইভারই চেঁচিয়ে কথা বলে--- মনে হচ্ছে, আপনাদের বের হতে বেশ দেরি হবে।

অশেষ বিব্রতভাবে বলে—দেরি? না দেরি কেন হবে? তবে...তার মানে...।

ড্রাইভার --দেরি হবে বলে মনে হচ্ছে স্যার।

উত্তর দেয় না অশেষ। উত্তর দিতে গিয়ে শুধু নীরব হয়ে অলকার মুখের দিকে তাকায়। মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকায় অলকা।

সেই মুহূর্তে স্টার্ট দিয়ে ট্যাক্সিটা হর্ণ বাজিয়ে উধাও হয়ে যায়। চমকে ওঠে অলকা— বাঃ, এ কী কাণ্ড? ট্যাক্সিটা চলে গেল কেন?

উত্তর দেয় না অশেষ। অলকা আবার কথা বলে, কথাগুলি আতঙ্কের বিলাপের মত —এ কী করলেন আপনি, ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলেন কেন?

অশেষ—কী বললে?

অলকা—ট্যাক্সিটা চলে গেল কেন?

অশেষ—তবে... ট্যাক্সি ছেড়ে না দিলেই ভাল হত।

অলকা—এখন কী করবেন তা হলে?

অশেষ— এখন...।

কিছুই যে আর বলবার নেই। এখন আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকবার কী দরকার আছে, সে যে বিধাতাও বলতে পারেন না।

চাকরটাকে আর একবার ডাক দিয়ে বলতে পারা যায়, আর একটা ট্যাক্সি ডেকে আনবার জন্য। কিন্তু...চাকরটাই বা কী ভাববে?

অলকার গলার স্বরে আবার একটা আতঙ্কের ভাব যেন শিউরে ওঠে।—ভেবে চিন্তে যা হয় কিছু একটা করুন, আমার আর একটুও ভাল লাগছে না।

অশেষ—আমি বলি আর সামান্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, তারপর চাকরটাকে আর একটা ট্যাক্সি ডাকবার জন্য বলে দিলেই হবে।

অলকা—বেশ, তাই যদি ভাল মনে করেন, তবে...।

অশেষ—কিন্তু ততক্ষণ, এখানে এরকম অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে, চলো বারান্দায় গিয়ে বসি।

অলকা—কোথায় বারান্দা?

বারান্দার চেহারা চোখে পড়বার কথা নয়, কারণ বারান্দাটা এত কাছে থেকেও যেন গোপন হয়ে আছে। বারান্দায় আলো নেই, কোনও চেয়ার বা কোচ আছে কিনা, তাও দেখা যায় না। বারান্দাটা কোন দিকে তাও যে জানে না অলকা।

অশেষ বলে— এই যে এদিকে, আমার সঙ্গে এসো।

অশেষের সঙ্গে এগিয়ে যাবার জন্য অশেষ অনুরোধ করেছে। চমকে ওঠে অলকা। অনুরোধ নয়; যেন ভবিষ্যতের আহ্বান।

অলকার প্রাণটা হঠাৎ ভীরু হয়ে গিয়ে মুষড়ে পড়ে। সত্যিই যে একটা অজানা অচেনা ও অন্ধকারময় অস্পষ্টতার দিকে এগিয়ে যেতে অলকাকে ডাক দিয়েছে দুদিনের চেনা এই ভদ্রলোক।

অশেষের সঙ্গে সঙ্গে কখন যে এগিয়ে গিয়েছে অলকা তাও বোধ হয় বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারে তখন, যখন অশেষ হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে,— আঃ! একটু সাবধানে হাঁটো, দুপাশে ফুলের বন আছে আর ফুলগুলিতে কাঁটাও আছে।

তবু ফুলের টবে হোঁচট খায় অলকা, আর শাড়িটা দুবার ফুলের কাঁটায় ফেঁসে যায়।

—আঃ! অশেষও যেন বিব্রত হয়ে আক্ষেপ করে ওঠে। তার পরেই অলকার একটা হাত শক্ত করে ধরে ফেলে —আঃ পড়ে যাবে নাকি?

এতক্ষণে দুবার হোঁচট খেয়েও পড়ে যায়নি যে অলকা, এইবার সেই অলকা বোধ হয় সত্যিই পড়ে যাবে। কত শক্ত করে অলকার হাত ধরে রয়েছে অশেষ, তবু শরীরটা থর থর করে কাঁপছে। উঃ বারান্দাটা কোথায় কে জানে, আর কতদূর? এভাবে এরকম ভয়ানক একটা নির্ভরতার উপর ভর রেখে হাঁটতে হবে? কে জানে কোন বিপদের দিকে...ভগবান জানেন।

কিন্তু কেমন এই ভদ্রলোক? একটুও লজ্জা বোধ করছে বলে মনে হয় না। অশেষের হাতটা

একটুও কাঁপছে না। দুদিনের জানা পরিচয়ের একটা মেয়ের হাতটা কত সহজে হাতে ধরে রেখেছে ভদ্রলোক? এমন করে হাত ধরতে জানে যে, সে মানুষের জীবনটা এতদিন এভাবে একা হয়ে পড়ে আছেই বা কেমন করে?

হ্যাঁ, এই যে, বারান্দার সিঁড়িটা পাওয়া গিয়েছে। আর এভাবে হাঁটতে হবে না। অশেষের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁপ ছাড়ে অলকা। ভাগ্যি ভাল খুব সহজে আর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একটা দুঃসহ অস্বস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। অলকা বলে—ব্যস, আপনি আর...।

অশেষ— কী?

বারান্দার অন্ধকারটাকে চোখ বড় করে দেখতে দেখতে চমকে ওঠে অলকা—এ কি? ওদিকে কোথায় গিয়ে কী করছেন আপনি?

অশেষ—দেখছি চেয়ারগুলো আছে কী না!

অলকা— চেয়ার থাকলেই বা কী? এখানে আবার সাত ঘন্টা বসে থাকবার জন্যে এসেছি নাকি?

অশেষ বলে—তুমি এদিকে একটু এগিয়ে এসে এই চেয়ারে বসো।

অলকা— না।

অশেষ—আমি ততক্ষণ একবার...।

অলকা—কী বললেন?

অশেষ—আমি একবার ঘুরে আসি।

অলকা রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে। —আপনি বড় অবুঝের মত কথা বলেন। আপনি ঘুরে আসবার জন্য চলে যাবেন, আর আমি এখানে এই অন্ধকারের মধ্যে একা বসে থাকব, খুব সুন্দর ব্যবস্থা করতে জানেন আপনি।

অশেষও যেন হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে কুণ্ঠিতভাবে বলে— ঠিক আছে, আমি এতটা ভেবে দেখিনি। বাইরে না হয় নাই গেলাম। .....কিন্তু এই সামান্য কথাটা বলতে তুমি কেন এত রাগ করছ... তুমি একটু ভেবে দেখো অলকা, আমি এমন কোনও অন্যায় ব্যবহার তোমার সঙ্গে করিনি যার জন্য তোমার মুখে যা আসছে তাই তুমি আমাকে শুনিয়ে দিচ্ছ।

অন্ধকারের মধ্যে ছায়াশরীরটাও যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। বোধ হয় লজ্জা পেয়েছে অলকা, কিংবা নিজের অভদ্রতার রকম দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। অশেষের অভিযোগের উত্তর দিতে পারে না অলকা।

অশেষও নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; চোখে দেখতে না পেলেও নিজের এই স্তব্ধ শরীরের একটা হঠাৎ শিহরণের অনুভব নিয়ে বুঝতে পারে যে, টবের ফুলগুলি মৃদু বাতাসে দুলতে শুরু করেছে। বাতাসের একটা মৃদুল আবেশ যেন চোখের আর মুখের উপর ঢলে পড়েছে।

সেই সঙ্গে বুকের ভিতরে বাতাসও যে দুরন্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে মনে হয়। ছি ছি! অলকা যে শুনে ফেলতে পারে এই গোপন নিঃশ্বাসের শব্দ। আর সেই মুহূর্তে অলকা যে ভয় পেয়ে, অশেষের বাড়ির বারান্দায় এই অন্ধকারকে একটা চক্রান্ত বলে বুঝতে পেরে ছুটে চলে যাবে।

কিন্তু কে জানে কেন, এই সন্দেহের পীড়নের সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত আশ্বাসের গুঞ্জনও যেন কোথায় বেজে উঠেছে। অলকা চৌধুরী এখন এই বিচিত্র অন্ধকারের নীড়ে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে চায় না। অলকার ভয় ভাঙার বন্ধু হয়ে কেউ একজন কাছেই দাঁড়িয়ে থাকুক, এই তো অলকার দাবি। ভুল করে হোক বা রাগ করে হোক, অলকা চৌধুরী এখন অশেষের নিকট সান্নিধ্য কামনা করে ফেলেছে।

জানে না অশেষ, আর অলকাও নিশ্চয় হিসাব রাখেনি, কতক্ষণ ধরে এইভাবে নীরবতার প্রতীকের মত দুজনে এখানে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু অশেষের নিঃশ্বাসের বাতাস যেন হঠাৎ চমকে লেগে দুলে ওঠে। কী-যেন বলেছে অলকা— অতি মৃদুস্বরে, অদ্ভুত এক নিবিড় আহ্বানের মত

সুরে যেন ভয় আর ভাবনা ভুলে গিয়ে, একেবারে অন্য একটি মানুষ হয়ে, একেবারে ভিন্ন একটি প্রাণ হয়ে গিয়ে একটা ডাক দিয়ে ফেলেছে—কোথায় আপনি?

অশেষ—এই যে আমি, এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তুমিও কি...।

অলকা—কী?

অশেষ—তুমিও কি দাঁড়িয়ে আছ?

অলকা—হ্যাঁ।

অশেষ—কেন? তোমার কাছেই বোধ হয় একটা চেয়ার আছে।

অলকা—হ্যাঁ আছে, তাতে কী?

অশেষ—তুমি বসে পড়ো।

অলকা—না, আপনি এসে বসুন।

অশেষ হাসতে চেষ্টা করে— সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে তুমি আবার এতটা...।

বলতে বলতে এগিয়ে আসে অশেষ। হ্যাঁ এই তো অলকা আর অলকার পাশে এই তো একটা চেয়ার। হাত এগিয়ে দিয়ে চেয়ারের হাতলটা ধরে অশেষ।

কিন্তু অলকার কথার চাপে পড়ে এ কি-রকমের একটা অভদ্রতা করতে তৈরি হয়েছে অশেষ? এই বাড়ি অশেষেরই বাড়ি, অলকা চৌধুরী আজ এই বাড়িতে এক অভ্যাগত আগন্তুকা মাত্র। বয়সে ছেলেমানুষও নয়, মনে প্রাণেও ছেলেমানুষির চিহ্ন নেই। সেই অলকা দাঁড়িয়ে থাকবে, আর তার পাশেই চেয়ারের উপর বসে থাকবে অশেষ? বাঃ, অশেষ ডাক্তারের মাথাটা তো বেশ খারাপ হয়েছে আর কাণ্ডজ্ঞানও ঘুলিয়ে গিয়েছে।

—না, চেয়ারে বসে কাজ নেই। বিড়বিড় করে অশেষ।

অলকা—কী বললেন অশেষবাবু?

অশেষ—বসতে হলে তুমিই বসো।

অলকা—না।

অশেষ —বসো অলকা।

কে জানে হয়ত চেয়ারের হাতলটা ধরবার জন্য আর চেয়ারটাকে অলকার আরও কাছে টেনে আনবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল অশেষ। কিন্তু কী আশ্চর্য, অশেষের হাতটা অলকারই একটা হাত ছুঁয়ে ফেলেছে।

হঠাৎ ভুলে যখন অলকার হাত ছুঁয়েই ফেলেছে অশেষ, তখন হাতটা চট করে সরিয়ে নিলেই তো হয়। কিন্তু হাত সরিয়ে নিতে পারে না অশেষ। বোধ হয় এই ছোঁয়ারই আবেশে বিকল হয়ে গিয়েছে অশেষের হাতটার জোর । হাতটা তৃষ্ণার্ত হয়ে ছটফট করছে মনে হয়।

অলকার হাতের কবজি আর চুড়িগুলির উপর অশেষের হাতের আঙুলগুলি ছোঁয়া দিয়ে অন্ধের মত ঘুরছে, যেন একটা আশা মত্ত হয়ে উঠতে চাইছে। কী যেন খুঁজছে অশেষের হাত।

অলকা চৌধুরী নয়; ঢাকুরিয়ার পুরোন বাগান স্ট্রিটে থাকেন যে কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরী, তাঁর মেয়েও নয়; এ যেন এই অন্ধকারের নীড়ে চঞ্চল হয়ে ওঠা একটা নিঃশ্বাসের ঝড়ের উপর লুটিয়ে পড়বার জন্য প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা এক নারী।

হ্যাঁ, তাই বই কি! অলকার স্তব্ধ শরীর থরথর করে কেঁপে উঠছে। আর সব সর্তকতা, সব ভয় কুণ্ঠা আর কাণ্ডজ্ঞান ভুলিয়ে দিয়ে অলকার হাতটা নিজের থেকেই অশেষের হাতের মুঠোর মধ্যে নিজেকে গুঁজে দেবার জন্য দুলে উঠেছে। পাঁচটি তপ্ত ও কোমল আঙুল দিয়ে গড়া অদ্ভুত এক মাংসল কুসুমের মত অলকার হাত, শক্ত করে নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে অশেষ।

কী আশ্চর্য, এ রকম একটা লজ্জার মাথা খাওয়া কাণ্ড হয়ে গেল. কিন্তু কেউ সত্যিই লজ্জিত হতে পারছে না। লজ্জা দূরে থাকুক, এই অন্ধকারের নীড়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা এক পুরুষ ও

নারীর এই হাতে হাত দিয়ে আর শক্ত করে চেপে রাখা মিলনসন্ধি যেন ধীরে ধীরে দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে।

হাতের মুঠোয় বন্দি করা অলকার হাতটাকে আস্তে আস্তে যেন একটা উদাত্ত পরিণামের দিকে টেনে তুলছে অশেষ। কোনও আপত্তি কোনও বিদ্রোহ নেই অলকা চৌধুরীরও হাতে। যেন সমর্পণের জন্যই অদ্ভুত এক পিপাসার সুখে অলস হয়ে গিয়েছে চুড়ি পরা এই হাত। অলকার হাত তুলে নিয়ে নিজের বুকের উপর চেপে ধরে অশেষ।

বেশ কিছুক্ষণ; অলকার নিঃশ্বাসের বাতাস একেবারে অশেষের মুখের উপর লুটিয়ে পড়েছে। কি অদ্ভুত নীরবতা, যেন না-বলা একটা মৃত্যু স্বীকার করে নিতে চায় অলকা আর অশেষের মনের যত ভাষা। কোনও কথা বলে ফেললে এই মুহূর্তেই সব মধুরতার বিপ্লব উদাস ও অসার হয়ে যাবে।

কিন্তু হঠাৎ একটা আতঙ্কের চমক লেগে অশেষের নিঃশ্বাসের আবেশ ছিন্ন হয়ে যায়। অশেষের হাতের মুঠোয় বন্দি হয়ে অলকার যে হাত অশেষের বুক ছুঁয়ে রয়েছে, বুকের উপর শক্ত করে চেপে রেখেছে অশেষ, সেই হাত যেন সরে যাবার জন্য ছটফট করছে। ঠিকই তো, এইভাবে অনন্তকালের জন্য অশেষের বুকের উপর পড়ে থাকবে বলে কোনও প্রতিজ্ঞা করেনি অলকার এই হাতটা। তাই আপত্তি, তাই বোধ হয় হঠাৎ অপরাধীর লজ্জার মত বারবার কেঁপে উঠেছে অলকার হাত।

না—বাধা দেবার কোনও অধিকার নেই অশেষের। একটা অদ্ভুত সুবিধার অন্ধকারে, অলকা চৌধুরী নামে এক নারী শরীরের স্পর্শ চুরি করে সুখী হবার জন্য যে লোভে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে অশেষ ডাক্তারের অন্তরাত্মা, সেই লোভকে এখনি ধিক্কার দিয়ে সরে যাবে অলকার হাত, যদি ভালয় ভালয় নিজের থেকে সে হাত ছেড়ে দেওয়া না হয়। কিন্তু ছেড়ে দিতে যে ইচ্ছে করে না।

গ্রীষ্মের বাতাস যদি হঠাৎ স্নিগ্ধতার ঝড় হয়ে ওঠে, তবে মনের বিস্ময়ও ঝড় হয়ে উঠবে বই কি!

সেইরকমই এক বিস্ময়ের ঝড়ো বাতাস যেন পাগল হয়ে অশেষের বুকের ভিতর উতলা হয়ে ওঠে। আশা করেনি, কল্পনাও করেনি অশেষ যে, তার এই মুহূর্তে সব শঙ্কিত অনুমানগুলিকে মিথ্যে করে দেবে অলকা নিজেই। অশেষের হাতটাকে যে নিজের বুকের দিকে টেনে নিচ্ছে অলকা।

ভয় পেয়ে অলকার যে হাত ছেড়ে দিয়েছিল অশেষ, অলকার সেই হাত যেন অজস্র আদর ঢেলে দিয়ে অশেষের হাতটাকে মুঠো করে ধরেছে। অশেষকে যেন প্রাণের ছোঁয়া দিয়ে বরণ করতে চায় এক নারী; যার মুখের রক্তিমতা আর চোখের বিহ্বল দৃষ্টি এই অন্ধকারে চোখে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

মৃদু অলস, ও সুস্থির —অশেষের হাতটা। অশেষ ডাক্তারের জীবনের প্রথম লজ্জাহীনতার পাগলামিটা যেন সুস্থির হয়ে একটা নিবিড় স্বপ্নের সুখ খুঁজছে। কিন্তু ভুল বুঝছে অশেষ। সুস্থিরতা নয়, শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে এই অনুভবের আবেশ সহ্য করতে ইচ্ছে করে না। অস্থির হবার জন্যই আরও ভয়ানক একটা ব্যাকুলতা যেন অশেষের অন্তরাত্মাকে দুরন্ত করে তুলতে চাইছে। অলকা চৌধুরীর বুকের ভিতর যেন বিদ্যুতের ঝলক উথলে উঠে অশেষের সে ব্যাকুলতাকে মত্ত করে দিচ্ছে।

অলকার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দুহাতে অলকার গলা জড়িয়ে ধরে অশেষ। অলকা নয়, যেন একটা দুর্বার আগ্রহের উৎসর্গ অশেষের দুহাতের আলিঙ্গনে অবিচল দুঃসাহসের মত সুস্থির হয়ে যায়। অশেষের মূর্খ মনটা, আর অন্ধ চোখ দুটো যেন এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে যে,

অলকা চৌধুরী নামে এক নারীর যে চোখের গম্ভীর চাহনি আর যে ঠোঁটের অদ্ভুত গড়ন এই তো মাত্র গতকালের রাত্রিতে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল সেই চোখ আর ঠোঁট যে আজ তার মুখের কাছেই এই অন্ধকারে ভেসে রয়েছে। লোভ যখন আছে, তখন কুণ্ঠা কেন, লজ্জাই বা কেন?

না, আপত্তি করবে না অলকা। আপত্তি করবার নারী নয়; এই অলকা চৌধুরী যেন চোখ বুজে আর ছোট্ট একটা ঢোঁক গিলে এই অন্ধকারের অভিসন্ধিকে তৃপ্ত করবার জন্যেই তৈরি হয়েছে। নড়ে না, সরে যায় না অলকা। অলকার ঠোঁটের উপর যে অনুভবের ছাপ ভিজিয়ে দিতে চায় অশেষ, সে অনুভবের উপর অলকার মনে আর কোনও ধিক্কার নেই, ভয় নেই, অনিচ্ছা নেই।

কিন্তু হঠাৎ অশেষকে যেন একটা রূঢ় প্রত্যাখ্যানের মত ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় অলকা।—ছিঃ।

চমকে ওঠে অশেষ—কী বললে?

অলকা—কে আসছে বলে মনে হচ্ছে ।

অশেষ—কই কে আসছে?

চেঁচিয়ে ওঠে অলকা—জানি না, কোনও কথা বলবেন না। ...কি বিশ্রী অন্ধকার, আমার একটুও ভাল লাগছে না?

অশেষ—ভাল লাগছে না?

অলকা—কী আশ্চর্য, এ বারান্দাতে কি কখনও আলো জ্বালানো হয় না?

অশেষ—জ্বালানো হয় বই কি!

বলতে বলতে দেয়ালের কাছে এগিয়ে যেয়ে সুইচ দেয় টিপে অশেষ। ঝলক দিয়ে আলো ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মাথা হেঁট করে নেয় অলকা। আর মুখটাকে শক্ত করে চেপে ধরবার জন্য, কিংবা বোধ হয় ঢাকা দেবার জন্য রুমাল তুলতে গিয়ে আবার রুক্ষ ঝংকার দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। —এ কি রকমের চক্রান্ত, আলো থাকতে এতক্ষণ আলো জ্বালেননি।

—তুমি তো আলো জ্বালাবার কথা একবারও বলনি।

অলকা চোখ তুলে অশেষের দিকে কট্‌মট করে তাকায়। —বলতে ভুলে গিয়েছি, তার সুযোগ নিয়ে আপনি কি আমার একটা সর্বনাশ করতে পারেন?

কেঁদে ফেলেছে অলকা। দু'চোখ থেকে ঝরঝর করে ঝরে পড়া জলের ফোঁটাগুলিকে রুমাল ঢাকা দিয়ে লুকোতে গিয়ে রুমালই ভিজে যায়।

—অলকা। বেদনার্ত অপরাধীর মত যেন একটা দুঃসহ অনুতাপের জ্বালা নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে অশেষ । কিন্তু কোনও কথা না বলে শুধু রুমাল দিয়ে চোখ চেপে ফোঁপাতে থাকে অলকা।

অশেষ বলে—না, আর তোমার হাত ধরব না। কিন্তু অনুরোধ করব তুমি মাপ করো।

—ছিঃ! ছোট্ট একটা ধিক্কারের ধ্বনি অলকার গলার স্বর আরও ফুঁপিয়ে দিয়ে ফুটে ওঠে। অশেষের বুকের ভিতর যেন একটা তীক্ষ্ণ অস্ত্রের খোঁচা লেগে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে; আর একটা ক্ষতাক্ত অনুতাপও যেন জ্বলতে শুরু করে। অলকার এই ধিক্কার যেন অসহায় নারীর করুণ বেদনার ধিক্কার। অশেষের ইচ্ছার চক্রান্তটা এত নিষ্ঠুর সেই সত্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এই ধিক্কার, অলকার এই আর্তনাদ—ছিঃ।

—আমাকে তুমি নিশ্চয় খুব ছোট মনের মানুষ বলে মনে করেছ অলকা। ...হতে পারে, তুমি ঠিকই মনে করেছ। কিন্তু আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি অলকা, তোমার মনে এতো আঘাত লাগবে। তা ছাড়া বললেও তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না যে, আমার মনে আর যে কোনও মতলব থাকুক না কেন, এ রকম কোনও মতলব আমার মনে ছিল না। নেহাতই ভুল, বড় ভুল হয়ে গিয়েছে অলকা।

অলকার বুকের ভিতরের কান্না শান্ত হয়েছে কিনা বোঝা যায় না। কিন্তু নিঃশ্বাসের ছোট ছোট শব্দগুলি যেন একটু শান্ত হয়েছে। তেমনই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখে একটু শান্তস্বরে উত্তর দেয়। —আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। আপনাকে ছিঃ করিনি।

তবে কাকে ছিঃ করল অলকা? কল্পনা করতে গিয়ে আরও এলোমেলো হয়ে যায় অশেষের চিন্তার যুক্তিগুলি! তবে কি নিজেকেই ধিক্কার দিয়েছে অলকা? নিজেরই মনটাকে, সেই সঙ্গে নিজেরই গম্ভীর সুন্দর এই মুখটাকে অশুচি মনে করেছে অলকা?

যদি তাই হয়ে থাকে, তবে তো অশেষের মনের ভিতরের ক্ষতটা আরও অনুতপ্ত হয়ে আরও দুঃসহ হয়ে জ্বলতে শুরু করবে। আর, নিজেকে অপমানিত বোধ না করেও পারবে না। যাকেই ধিক্কার দিক না কেন অলকা, এ সত্য প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে, যে অশেষের অন্যায় সহ্য করতে গিয়ে জীবনের একটা ভুল বুঝে ফেলেছে অলকা। সে স্পর্শকে অশুচি বলে মনে হয়েছে। অন্য এক পুরুষের প্রেমের জন্য উৎসর্গ হয়ে আছে যে মেয়ে, সে মেয়ে এমন ভুল করে ফেললে নিজেকে অপরাধিনী বলে না মনে করে পারবেই বা কেন? হ্যাঁ অলকার কঠিন আত্মবিশ্বাসের অহংকার হঠাৎ ভুলে, একটা ক্ষণিক লোভের মায়ায় পড়ে কি করুণ আত্মবিনাশ ডেকে এনেছিল। মাত্র একদিন আগে অদ্ভুতভাবে পরিচয় হয়েছে, এমনই এক ভদ্রলোকের কাছে নিজের চরিত্রটাকে নিতান্ত একটা লোলুপ মেয়েলিপনা বলে ধরিয়ে দিয়েছে।

অথচ, এই অলকা এখনও স্মরণ করতে পারে যে, শৈলেশ্বর নামে সে ভদ্রলোকের এই ধরনেরই একটা কামনার অনুরোধ সহ্য করতে না পেরে আর ভয় পেয়ে প্রাণ মন আর শরীরটাকে সাবধানে বাঁচিয়ে নিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। কি আশ্চর্য, শৈলেশ্বরের কাছেও অলকার যে সাবধানতা হার মানেনি, একদিন আগের পরিচিত এই ভদ্রলোকের কাছে সেই সাবধানতা কেন মিথ্যে হয়ে গেল?

অলকার চোখ দুটো শান্ত হতে হতে যেন একেবারে শুকনো খটখটে হয়ে যায়। আনমনার মত বাইরের বাগানের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অলকার চোখ দুটো যেন অন্য একটা ঘটনার উপর ভ্রূকুটি হেনে দপদপ করছে। ভয়ে ভয়ে আর কুণ্ঠিতভাবে ডাক দেয় অশেষ—তুমি মিছিমিছি...।

অশেষের কথা হয়ত শুনতে পায়নি অলকা। অলকার মন যেন অন্য একটা অপমানের উপর রাগ করে একটা নতুন সত্যের বিস্ময় সহ্য করতে চেষ্টা করছে। শৈলেশ্বর, কিরকম একটা মন-ছাড়া মানুষের মত সে ভদ্রলোকের ব্যবহার। ভালবাসার কথা বলেও শুধু দিনের পর দিন কেমন বেদনাহীনভাবে অলকার জীবনের সবচেয়ে বড় আশার উৎসাহ ও ব্যস্ততাকে শুধু একটা খেলার মত দেখেছে। দিনের পর দিন শুধু একটি আশ্বাসের কথা দিয়ে বিদায় করে দিতে সত্যিই কি কোনও কষ্ট বোধ করেছিল ভদ্রলোক? বোধ করলে কি ...ছিঃ... সেই অনুরোধও কি ও রকম একটা হুকুমের মত ভাষায় কেউ করতে পারে?

যাক যা হবার তা তো হয়েই গেল। শৈলেশ্বর যা-ই হোক, তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও মনে মনে আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না অলকা, এই রাত্রের, এই অদ্ভুত একটা বাড়ির এই নিরালা বারান্দার অন্ধকার অলকার প্রাণে যে ঘটনার দাগ এঁকে দিয়েছে, সে ঘটনা চিরকাল শুধু গোপন করে চলতে হবে, এ ঘটনা অলকার জীবনে কোনওদিন গৌরবের ঘোষণা হয়ে মুখরিত হতে পারে না। অস্বীকার করতে পারে না অলকা, এই ঘটনাকে ঘৃণা করতে যে পারা যাচ্ছে না। সত্যিই যে অশেষ ডাক্তার নামে এই ভদ্রলোক...। ছিঃ! যে মানুষ বিমান চৌধুরীর মেয়েকে একটা অন্ধকারের সুযোগে শুধু বুকে টেনে নিয়ে আমোদ পেতে চায়, সে মানুষ... না, কখনওই না, সে মানুষের মনে অলকার স্বামী হবার কোনও সাধ নেই, থাকতেও পারে না। সে জন্য ভদ্রলোককে দোষ দেবারও কোনও অধিকার নেই অলকার। অশেষ ডাক্তার তো ভুলেও এমন

কোনও কথা বলেনি যে, তোমাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে অলকা, তুমি যদি আমার আপন হয়ে যাও, তবে...।

কিন্তু এই ভদ্রলোকের সম্পর্কে এসব কথা চিন্তা করে, আর এসব অভিযোগ আরোপ করেই বা লাভ কী? অলকার সে অধিকার কোথায়? অশেষও তো অলকাকে আজ এই মুহূর্তে সোজা সহজ ভাষায় এবং বেশ একটু কঠিন স্বরে প্রশ্ন করতে পারে, তুমি এই দুদিন ধরে আমার সঙ্গে কী ব্যবহার করেছ? কী কথা বলেছ? ভুলেও কি এমন একটা কথা বলেছ যে তারপর তোমাকে ভালবাসার কথা আমার মনে হতে পারে? বরং তোমার এমনই নির্লজ্জ দুঃসাহস যে আমাকে একটা পুরুষ বলেও মনে করতে পারনি, তা না হলে তোমার প্রেমের পুরুষকে তোমার জন্যে ডেকে আনার কাজে আমাকে হুকুম করতে তোমার একটু লজ্জা হত। হিস্টিরিয়াতেও কোনও মেয়ের মুখের ভাষা এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে যায় না।

অশেষের মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে কি যেন ভাবতে চেষ্টা করে অলকা। চোখ দুটো হঠাৎ বেদনার্ত হয়ে যেন বুজে যেতে চায়। কিংবা লজ্জা পেয়েছে অলকার চোখ দুটো।

বোধ হয় লজ্জা পেয়েছে, এতদিনের একটা ভুলের হিস্টিরিয়াটা। আর বুকের ভিতরেও যেন সেই লজ্জার একটা কঠোর কলরব শুনতে পায় অলকা। ছিঃ কিসের এত অহংকার অলকা? শৈলেশ্বরের উপর যে এত মোহ ছিল, এত যে সাধ নিয়ে তার কাছে ছুটোছুটি করতে আর তার আদেশের এত যে বাধ্যটি হয়ে কাজ করতে, সে কি বিমান চৌধুরীর মেয়ের অহংকারের প্রমাণ? না, বড়লোকের বউ হবার জন্য লোভী আকাঙক্ষার একটা ব্যাকুলতার প্রমাণ? তুমি নিজেও বুঝতে পারনি যে, শৈলেশ্বর তোমাকে মনে প্রাণে ভালবাসে না। তুমি নিজেও জানতে পারনি যে, শৈলেশ্বরকে তুমি মনে প্রাণে ভালবাসতে পারনি। যদি তাই হত, তবে শৈলেশ্বরের সেই অনুরোধের কথায় তোমার ভয় পেতে হত না।

অলকা বলে—আপনি যদি কিছু না মনে করেন, তবে একটা কথা বলতে পারি। অশেষ—আমি কিছুই মনে করব না।

অলকা—শৈলেশ্বরের কথা আপনার কাছে বলে আমি নিজে আপনার কাছে এমন একটা লজ্জাহীন কাণ্ড করেছি, যা কোনও মেয়ে মাথা খারাপ না হলে করতে পারে না।

অশেষ—ওসব কথা ভেবে তুমি আবার কেন...।

অলকা—আমাকে মিছে সান্ত্বনা দেবেন না। ভুল বুঝতে দিন, ভুল স্বীকার করতে দিন।

আশ্চর্য হয়ে অলকার মুখের দিকে তাকায় অশেষ। অলকা বলে— নিজেকে যা মনে করেছিলাম, তা যে আমি নই, সেটা বুঝতে পারিনি বলেই...।

অশেষ—মনের ওরকম অবস্থা কারও কারও হয়। সেটা খুব দোষেরও নয়। মনের একটা বিশ্বাস হঠাৎ বিনা দোষে আহত হ'লে...

হেসে ওঠে অলকা—হিস্টিরিয়া হয়, ডাক্তারিতে তাই বলে বোধ হয়।

অশেষও হাসে—ডাক্তারিতে একথাও বলে, হিস্টিরিয়ার কারণটা জানতে পারলে রোগীর রোগও সেরে যায়।

অলকা কুণ্ঠিতভাবে হাসে—আমিও সেরে গিয়েছি বলে মনে হচ্ছে।

অশেষ—ঠাট্টা করছ মনে হচ্ছে।

অলকা—গম্ভীর হয়—একটুও ঠাট্টা করছি না অশেষবাবু। বরং. .

অশেষ—কী?

অলকা মাথা হেঁট করে—আপনার কাছে অনুরোধ।

অশেষ—বলো।

অলকা—আপনি মাপ করুন।

অশেষ বিব্রতভাবে বলে—মাপ করব কেন? তুমি কী দোষ করলে যে, মাপ করতে হবে?

অলকার চোখ থেকে বড় বড় জলের ফোঁটা ঝরে পড়তে থাকে—আমি আপনাকে এমন অনেক কথা বলেছি, যা কখনও কোনও ভদ্রলোক সহ্য করে না।

অশেষ হেসে ওঠে --কিন্তু আমি খুব খুশি হয়ে সহ্য করেছি। তুমি অনায়াসে ধরে নিতে পার যে আমি একটা অভদ্রলোক।

অলকার করুণ মুখটা যেন অশেষের এই মিষ্টি ঠাট্টার ভিতর থেকে একটা মিষ্টি সান্ত্বনার স্বাদ পেয়ে হেসে উঠতে চেষ্টা করে।

জোরে একটা হাঁফ ছাড়ল অলকা, এতক্ষণে অলকার প্রাণটা নির্ভয় হতে পেরেছে। এদিক ওদিকে তাকিয়ে নিয়ে একবার একটু চিন্তিত হয়ে ওঠে অলকা। —কথায় কথায় কতখানি সময় নষ্ট হল ভেবে দেখুন।

অশেষ—তা অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।

অলকা—আর দেরি করবেন না অশেষবাবু। এইবাব আমাদের ফিরে যাবার একটা ব্যবস্থা করুন। নইলে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে।

অশেষ ব্যস্ত হয়ে ওঠে। চেঁচিয়ে ডাক দেয় —রামলাল।

একটা চাকর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। অশেষ বলে—খুব তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এসো।

রামলাল চলে যাবার পর আবার কিছুক্ষণের নীরবতা। কিন্তু সেই নীরবতা ঠিক নিশ্চলতা নয়। বারান্দা থেকে নেমে ফুলের টবের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকে অলকা। অশেষও ঘুরে বেড়ায়, যদিও অলকার পাশে পাশে নয়; কিন্তু নিকটেই।

অলকা বলে—নিশ্চয় আমার মাথায় একটা রোগ হয়েছিল অশেষবাবু। এখন মনে পড়েছে কয়েকটা বছর যেন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। একটা ফুলের দিকেও ভাল করে তাকাইনি। অথচ...।

অশেষ—কী?

অলকা—এই ফুলগুলিকে দেখতে কত ভাল লাগছে। মনেও পড়ছে ছেলেবেলায় আমি ফুল কত ভালবাসতাম।

অশেষ—আমাকে আজকাল বেশ একটু অসুবিধায় পড়তে হয়েছে, আর এই ফুলগুলির জন্যেই ভাবনায় পড়তে হয়েছে।

অলকা—কী বললেন?

অশেষ—আমি নিজের হাতেই এইসব ফুল এতদিন লালন-পালন করে এসেছি, কিন্তু আজকাল নিজের হাতে বলতে গেলে কিছুই করতে পারছি না। চাকরটাও ফাঁকি দেয়, কাজেই ভাবতে হচ্ছে...।

অলকা—কেন নিজের হাতে কিছু করতে পারেন না?

অশেষ—পেটের জন্যে...।

অলকা—তার মানে?

অশেষ—ডাক্তার হয়েও এতদিন নিষ্কর্মা ছিলাম। কোনও রোগীর ডাক আসত না, কোনও টাকা পাইনি।

অলকা—তা হলে আজকাল খুব কাজের মানুষ হয়েছেন।

অশেষ—হ্যাঁ, দুটো হাসপাতালে চাকরি পেয়েছি, তাই কাজের ফাঁকে এমন একটুও সময় পাই না যে ফুলগুলিকে একটু...।

অলকা—কিন্তু বেশ তো এই দুটো দিন শুধু অকাজে—।

অশেষ —কী বললে?

অলকা হাসে —না না। অকাজে বলব কেন? মাসতুতো বোনের বিয়েতে খাটতে হয়েছে। সেটা অকাজ কেন হবে?

অশেষ—গতকাল আর আজ, শুধু এই দুটি দিন ছুটি নিয়েছি। বাস্, আবার কাল থেকে কাজের তাড়াহুড়ো পড়ে যাবে।

অলকা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়।—বাস্, তারপর ঢাকুরিয়ার পুরনো বাগান স্ট্রিটের কোনও গাছের ছায়া মাড়াবার সুযোগও আর হবে না, কেমন?

হঠাৎ যেন জীবনের একটা শাস্তির আদেশ অলকার মৃদু অনুযোগের ভাষায় মধ্যে চিৎকার করে উঠেছে। না, আর সুযোগ হবে না। অলকা চৌধুরী চিরকালের মত অদৃশ্য হয়ে যাবে।

—সময় কত হল? অলকার আচমকা প্রশ্নের শব্দ শুনে অশেষের নীরব ভাবনা যেন চমকে ওঠে। সত্যিই তো, কত সময় হল? তার মানে কত রাত হল? হাতের কব্জির সঙ্গে চেন বাঁধা এমন একটা দামি ঘড়ি থাকতেও এতক্ষণের মধ্যে একবারও সময়টা জানবার চেষ্টা করেনি অশেষ। এক অশেষেরই বা দোষ হবে কেন? অলকাও তো এতক্ষণের মধ্যে কোনও মুহূর্তে জানতে চায়নি, সত্যিই কত রাত হল? অথচ রাত হয়ে যাওয়াটাই যে জীবনের সব চেয়ে বড় ভয়, সব চেয়ে বেশি লজ্জা।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জবাব দেয় অশেষ—রাত ন'টা।

অলকার দুই চোখ ঝিক করে হেসে ওঠে, যেন দুর্বোধ্য একটা বিস্ময়ই ঝিক করে হেসে উঠল। মাত্র রাত ন'টা? কী করে অসম্ভব সম্ভব হল? এতক্ষণ ধরে অলকার প্রাণটা যে এক যুগের অস্থিরতার মত একটা দশায় পড়ে হেসেছে কেঁদেছে আর ছটফট করছে। মনের ভিতরে যে এতক্ষণ ধরে সমুদ্রের ঢেউ এর মত চিন্তার অগুনতি ঢেউ বয়ে গিয়েছে।

এক একটা ভয়কে যে অনন্তকালের ভয় বলে মনে হয়েছে। যত কথা বুকের ভিতরটাকে নীরবে তোলপাড় করছে; সেগুলির ভাষায় বর্ণনা করতে এক বছরের সময়েও কুলোবে কিনা সন্দেহ। সন্ধ্যা ছটার সময় ঢাকুরিয়া থেকে রওনা হবার পর আলিপুরের এই বাড়ির এতগুলি অদ্ভুত ঘটনা ; সময় পার হয়েছে মাত্র তিন ঘন্টা।

অলকার চোখের বিস্ময়েই বা হাসি হয়ে ফুটে ওঠে কেন? হাঁফ ছেড়ে অশেষও যেন একটা স্বস্তির হাসি হাসে । —মাত্র রাত নটা হয়েছে অলকা? খুব বেশি সময় নষ্ট হয়নি।

অলকাও সায় দিয়ে বলে—না, এমন কিছু বেশি রাত নয়!

যেন দুজনের জীবনের ভয় দুটো এখন খুশি হয়ে হাসিমুখে স্বীকার করতে পারছে, না, বেশি সময় নষ্ট হয়নি!

কিন্তু এই খুশির স্বীকৃতির মধ্যে যেন একটা অপরাধের স্বীকৃতিও আছে। এমন কিছু বেশি সময় না হোক, মাত্র তিনটি ঘন্টা তবু এই সামান্য তিনটি ঘন্টার সময় তো নষ্ট হয়েছে।

নিশ্চয় কোনও একটা চেষ্টা কিংবা আশা নষ্ট হয়েছে, নয়ত সময়টা নষ্ট হয়েছে বলে মনে হবে কেন? অলকা গম্ভীর হয়। অশেষও হঠাৎ গম্ভীর হয় বলে—যাকগে এখন অন্তত আরও কিছুক্ষণ যদি...।

অলকা—কী বলছেন?

অশেষ—বলছি, এবার অন্তত আর বাজে কথা বলে সময় নষ্ট না করে শুধু..।

অলকা—হ্যাঁ, পুরনো কথা না তুলে...।

অশেষ হাসে— শুধু যদি মন খুলে চিনেবাদাম ভাজার গল্প করা যায়, তবে সময়টা সার্থক হয়।

অলকা হাসে—সার্থক হয় বইকি!

দুঃসহ পথক্লেশের পর শরীরের সঙ্গে প্রাণও যেমন একটা স্নিগ্ধতার স্নান খোঁজে, তেমনই এই ফুরফুরে হাওয়ার মধ্যে আর আধঘন্টাকে কাছে পাওয়ার এই ইচ্ছাটা যেন সেই রকমের ইচ্ছা। ভুল ভুলে যাওয়া, ক্ষত মুছে ফেলা, সব তর্কাতর্কির উপদ্রব দূরে সরিয়ে দেওয়া। পৃথিবীর কোনও পান্থশালায় হঠাৎ দেখা দুই মানুষের ক্ষণিক বন্ধুত্বের মত শুধু প্রসন্ন মনের বিনিময়। অভিযোগের কথা নয়, আক্ষেপের কথা নয়। হোক না চিনেবাদাম ভাজার গল্প; লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

অলকা বলে— চিনেবাদাম ভাজা আমার দুচক্ষের বিষ। ওটা তিলকার খুব পছন্দ। আমার বরং।

অশেষ—তোমার বোধ হয় বেশ কড়া ঝাল মেশানো ঘুঘনি টুগনি....।

অলকা—না, মোটেই না। বেশি মিষ্টি আমার পছন্দ নয়। আলুকে চিঁড়ের মত কুচো কুচো করে সামান্য একটু ঘিয়ে সাঁতলে নিয়ে নুন আর আদাবাটা দিয়ে খেতে আমার সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে।

অশেষ—আগে বললেই পারতে, তা হলে একটা বাজে মোহনভোগ তৈরির ঝামেলা না করে, রমাকে দিয়ে শুধু চারটে আলু কুচিয়ে...।

অলকা— রমার সাধ্যি কি? ভাবতে যত সহজ, কাজটা করা তত সহজ নয়। প্রত্যেকটা আলু-কুচো সমান সাইজের হবে। তার জন্যে রীতিমত সাধনা দরকার। আমার লেগেছে প্রায় তিন বছরের সাধনা।

চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় অলকা।—এটা কী ব্যাপার?

জায়গাটার উপর বাগানের মালী জল ঢেলে দিয়ে গিয়েছে, ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ তখনও ফিকে হয়ে যায়নি। জায়গাটার উপরে তারের জালের মস্তবড় একটা ঘেরাটোপ।

অশেষ বলে—ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়, রাক্ষুসে সূর্যমুখীর চারা বের হয়েছে। চড়ুইগুলো যখন তখন এসে ঠুকরে ঠুকরে চারা ভেঙে দেয়, তাই জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

অলকা—গল্পটা কি সত্যি?

অশেষ—কোন গল্পটা?

অলকা—এই সূর্যমুখীর গল্প। সূর্য যেমন পুব থেকে পশ্চিমে সরে যায় সূর্যমুখীও তেমনি সূর্যের দিকে তাকিয়ে থেকে পুব থেকে পশ্চিম দিকে মুখ ফেরায়?

—আমিও তো গল্পটা শুনেছিলাম। কিন্তু অন্তত আমার রাক্ষুসে সূর্যমুখীর কথা বলতে পারি, ওরা সূর্যকে খাতির করে না।

অলকা—সূর্যই বা ওদের কোন খাতির করে?

অশেষ—মোটামুটি সমস্যাটা একই দাঁড়াল। কেউ কাউকে খাতির করে কিনা, সেটা ঠিক বোঝা যায় না।

অলকা—আপনি সায়েন্স ভাল জানেন বলে মনে হচ্ছে।

অশেষ—কেন এমনটা মনে হচ্ছে?

অলকা—আপনি ডাক্তার মানুষ।

অশেষ—ডাক্তারিতে এখনও যার একটুও পশার হল না, তার মনুষ্যত্বকে ডাক্তার বলে সন্দেহ করা উচিত হয় কি?

অলকা হাসে—পশার হবেই একদিন।

অশেষ—হয়ত হবে, কিন্তু সেদিন কি কেউ আমাকে ডাক্তার মানুষ বলে মনে করতে পারবে?

অলকা—তার মানে?

অশেষ—সেদিন সত্যিই মানুষ হয়ে থাকা সম্ভব হবে কি?

অলকা—খুব খাঁটি কথা না হলেও একেবারে বাজে কথা বলেননি। বড় ডাক্তার হলেই গলা-কাটা ফি কেন যে আদায় করেন বুঝতে পারি না। আমাদের পাড়াতেই...।

অশেষ—কী?

অলকা—একটা রিক্সাওয়ালা একদিন রাস্তার উপর অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সেই সময় সেখান দিয়ে গাড়ি করে যাচ্ছিলেন ডাক্তার সিদ্ধার্থ চৌধুরী। নাম শুনেছেন নিশ্চয়?

অশেষ—ওরে বাবা! তাঁর নাম কি কারও অজানা?

অলকা—বাবা তাঁকে অনুরোধ করলেন, দয়া করে একবার রিক্সাওয়ালাকে একটু দেখে যান। তিনি গাড়ি থেকে নামলেন, রিক্সাওয়ালাকে দেখলেন, একটা কাগজে ওষুধের নামও লিখে দিলেন। তারপরেই বাবার দিকে হাত এগিয়ে দিয়ে বললেন—জেন্টেলম্যান।

অশেষ—ফি চাইলেন বুঝি?

অলকা—হ্যাঁ, পঁয়তাল্লিশ টাকা। ভাগ্যিস আমার পরীক্ষার ফি আগের দিন জমা দিয়ে ফেলিনি। বাবা তখুনি টাকা দিয়ে ডাক্তার সিদ্ধার্থ চৌধুরীর সেই লম্বা হাতের দাবি মিটিয়ে দিলেন।

অশেষ যেন লজ্জিত হয়। কুণ্ঠিতভাবে বলে—তোমাদের পাড়াতে কোনও গরিব মানুষের যদি কখনও ডাক্তার দরকার হয়, তবে আমাকে একবার টেলিফোনে খবর দিলেই আমি রুগী দেখে আসব।

অলকা—তা হলে সত্যিই ভাল হয় অশেষবাবু।

অশেষ—ফি অবশ্য নেব, কিন্তু পঁয়তাল্লিশ টাকা নয়, পাঁচ টাকা নয়! যে যা দিতে পারবে, তাই নেব।

অলকা—কেউ যদি শুধু শূন্য দিতে চায়, তবে?

অশেষ—দিতে চাইলেই হবে না। দেবার কিছু না থাকলে তবেই শূন্য দিতে পারবে।

অলকা—বেশ তো, অতি উত্তম শর্ত। এখনি গিয়ে বাবাকে খবরটা জানাতে হবে।

অশেষ—বিমানবাবু শুনে খুব খুশি হবেন বোধ হয়?

অলকা—শুধু কি খুশি? আনন্দে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে কী যে কাণ্ড করবেন জানি না। ....তার কারণ কী জানেন?

অশেষ—কী?

অলকা—রাধীর মা নামে এক বুড়ি আমাদের পাড়ার একটা বস্তিতে থাকে। রাধীর নিউমোনিয়া হয়েছিল। রাধীর মা এসে বাবাকে ধরলে, একজন ডাক্তার ডেকে দিন আর ওষুধ যোগাড় করে দিন বাবু। কিন্তু বাবার হাতে সেদিন দশ আনা পয়সাও ছিল না। কোনও ডাক্তারকে তিনি আনতে পারেননি। বিনা ফি-তে কেউ আসতে রাজি হননি।

অশেষ—তারপর?

অলকা—তারপর আর কী? রাধী মারা গেল। আর বুঝতেই পারছেন, বাবার অবস্থা কি দাঁড়াল? পুরো একটা মাস ছোট ছেলের মত ভেউ-ভেউ করে কাঁদলেন।

অশেষ কিছুক্ষণ আনমনার মত গম্ভীর হয়ে থাকে। বিমান চৌধুরী নামে এক বৃদ্ধ কম্পাউন্ডার ভদ্রলোকের এই কান্নার গল্পটা যেন অশেষ ডাক্তারের মনের কোন একটা অহংকারের উপর বিদ্রূপের আঘাতের মত আছড়ে পড়েছে। সেই অহংকারে ভাবটাও ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

অলকা—হঠাৎ চুপ করে গেলেন কেন?

অশেষ—আমার মনে একটা অহংকার ছিল; এখন বুঝতে পারছি...।

অলকা—অহংকার?

অশেষ—হ্যাঁ, অনেক লোক আমাকে প্রশংসা করে, আমি নাকি লোকের উপকার করতে ভালবাসি। অর্থাৎ আমার মত বিনা পয়সায় এত রুগী দেখবার মত উদার মন নাকি কোনও ডাক্তারের নেই।

অলকা হাসে—সত্যি হয়ে থাকলে এমন অহংকারের কোনও দোষ নেই।

অশেষ—বিমানবাবুর এই কান্নার গল্পটা কিন্তু বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, এসব নিতান্ত অসার অহংকার। আমি মানুষের উপকার করতে পেলে খুশি হই, কিন্তু উপকার না করতে পারলে তো আর কেঁদে আকুল হই না।

অলকা একটু আশ্চর্য হয়ে তাকায়—কিন্তু...

অশেষ—কী?

অলকা—আপনি আমার কথাগুলি ভাল করে শুনতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি বেশ শুনতে পাচ্ছি, আপনার কথাগুলিও যে বেশ কাঁদ কাঁদ হয়ে...।

অশেষ লজ্জা পেয়ে হাসতে চেষ্টা করে। —যাক, বাজে কথা বলবার নিয়ম করে নিয়ে আবার এসব কাজের কথা আর মনের কথা নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল।

অলকা—তা ছাড়া আমার কাছে মনের কথা বলে ফেলাও আপনার অহংকারের পক্ষে খুবই অন্যায়। কেমন?

অলকার চোখে যেন একটা অভিমানের ভ্রূভঙ্গি। আশ্চর্য হয় অশেষ। এতক্ষণ পরে আবার যেন একটা অদৃশ্য আক্রোশ আড়াল থেকে দু'জনের কথা বলার আনন্দটাকে উত্তক্ত করবার চেষ্টা করছে। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও সেই আক্রোশের দাবিটাকে যেন এড়িয়ে যেতে পারা যাচ্ছে না। চাপা দিলেও চাপা পড়ছে না। দুজনে যেন আপোষে একটা ফাঁকি স্বীকার করে নেবার প্রতিজ্ঞা করছে, সেই ফাঁকিটাই ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞার সব জোর ভেঙ্গে দিচ্ছে।

অশেষ—আমি মনের কথা বলতে পারি না, তোমার কাছে বলতেও পারিনি। তা ছাড়া, তুমিও জানিয়ে দিয়েছ যে, মনের কথা বলবার কোনও মানে হয় না। সুতরাং...।

অলকা—কিন্তু খুব বুদ্ধি করে আমার মনের সব কথা তো বেশ ভাল করে শুনে নিয়েছেন। আমার উপকার করবার জন্যেও নাকি চেষ্টা করছেন।

অশেষ—না, আমি কথা দিচ্ছি, তোমার উপকার করবার কোন ইচ্ছে আমার নেই।

অলকা—খুব ভাল কথা শোনালেন।

অশেষ—না, ভাল কথা নয়। খুব দুঃখের কথা, কষ্টের কথা, আমার জীবনে একটা অনর্থক শাস্তির কথা।

বলতে বলতে অশেষের চোখের চাহনিটা যেন তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। অলকা অপলক চোখে অশেষের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মৃদুস্বরে বলে—আমার উপর অনর্থক রাগ করতে আপনার কেন এত ভাল লাগে, বুঝতে পারছি না।

অশেষ—তুমি কোনওদিনও বুঝতে পারবে না।

অলকা—বুঝতে পারছি অশেষবাবু।

অশেষ—বিশ্বাস হয় না।

অলকা—বিশ্বাস করুন।

অশেষ—কী বিশ্বাস করব?

অলকা—আমি আপনার একটা ইচ্ছার কাছে রাজি হইনি, তাই আপনার...।

অশেষ—তার মানে?

অলকা—তার মানে, আপনি বিমান চৌধুরীর মেয়েকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরে আপনার একটা অহংকারকে খুশি করে নিয়ে পরমুহূর্তে তাকে চিরকালের মত তাড়িয়ে দিতে চান।

অশেষ ভ্রূকুটি করে—হ্যাঁ, তাই চেয়েছি। বাস, এরপর আর কোনও তর্ক করো না।

অলকা—ঠিক কথা, এমন অপমানের আর ঘৃণার কথা শোনবার পর কে আর তর্ক করতে পারবে বলুন?

অলকার গলার স্বরে কোনও ক্ষোভ নেই, উত্তেজনা নেই। কত শান্ত স্বরে একটা অসহায় আত্মসমর্পণের মত করুণ হয়ে অলকার কথাগুলি গুনগুন করছে।

অশেষ—কিন্তু, তোমার মনে এই সত্যটুকুও স্বীকার করবার সাহস নেই যে, তুমিও প্রায় তাই ইচ্ছে করে ফেলেছিলে।

মাথা হেঁট করে অলকা। যেন বিনা প্রতিবাদে এই ভয়ংকর অভিযোগ স্বীকার করে নিচ্ছে অলকা। অদ্ভুত একটা মারাত্মক ভুলের কাছে লুটিয়ে পড়বার জন্য অলকার এত সাবধানী আত্মাটাই যেন হঠাৎ দুর্বল হয়ে ... না অস্বীকার করে লাভ কী?

অশেষ—যাক তুমি বেঁচে গিয়েছ, আমিও বেঁচে গিয়েছি।

অলকা—যদি বিশ্বাস করতে পারতাম যে, সত্যিই বেঁচে গিয়েছি, তবে না হয়....।

অশেষ—একটা মাস বা দুটো মাস, কিংবা একটা বছর কেটে যাক, তখন বিশ্বাস করতে পারবে।

অলকা—কেন?

অশেষ—তখন আজকের এই লজ্জার কষ্টটুকু কারও মনে আর থাকবে না। তুমি তোমার পড়া নিয়ে থাকবে, আমি আমার ডাক্তারি নিয়ে থাকব। জীবনে তোমার সঙ্গে আমার আর মুখোমুখি দেখা হবারও কোনও সম্ভাবনা নেই। কাজেই...।

অলকা করুণভাবে হাসে—এই যে আপনি এখনই বললেন, আপনাকে একটা খবর দিলেই আপনি আমাদের পাড়াতে রুগী দেখতে যাবেন, তখন দেখা হয়ে যেতেও তো পারে!

অশেষ—হলে হবে। তবে সে দেখার মধ্যে কোনও ভয় আর থাকবে না।

অলকা—থাকবে।

অশেষ—কেন?

আঁচল তুলে মুখটা যেন চাপা দিতে গিয়ে অলকা হঠাৎ বলে ওঠে,—আপনাকে দেখতে ভাল লাগবে, তাই।

স্তব্ধ হয়ে যায় অশেষের গলার স্বরের সব অভিযোগের ছন্নছাড়া চাঞ্চল্য। মনটাও যে সব ক্ষোভ হারিয়ে একটা সুস্থির প্রসন্নতার মধ্যে ডুবে যায়। এ কী বলছে অলকা চৌধুরী?

অলকা—সত্যিই আমাকে একটা হিস্টিরিয়ার রোগিণী বলে মনে করবেন না, অশেষবাবু!

তীব্রভাবে তাকিয়ে অলকার মুখের এই নতুন চেহারাটার রহস্য বুঝতে চেষ্টা করে অশেষ।—কিন্তু তোমার শৈলেশ্বর কি...।

অলকার চোখ দুটো ধিক্ করে জ্বলে ওঠে।—ছিঃ।

অশেষ—তার মানে?

অলকা—ওসব বাজে কথা নিয়ে আপনার আর কোনও মন্তব্য না করাই ভাল।

অশেষ—শৈলেশ্বর তোমার কাছে একটা বাজে কথা? এ কি বলছ অলকা?

অলকা—হ্যাঁ, সে নিজে হয়ত মস্ত বড় বিদ্যার আর মহৎ ইচ্ছার মানুষ; হয়ত আমার উপকার করবার জন্য তার মনে একটা ইচ্ছাও ছিল; যাই হোক না কেন, সেসব একটা অতীতের গল্প মাত্র। আমার কাছে এখন...।

অশেষ—বর্তমানের গল্পটা তা হলে কী?

অলকা—আমাকে জোর করে এতটা নির্লজ্জ হতে বলবেন না।

অশেষ—হ্যাঁ, জোর করতেই হচ্ছে। আমাকে শুনতেই হবে। কে আজ তোমার কাছে...।

অলকা—আমার কাছে আজ এখন যে রয়েছে, সেই, কে আবার?

অশেষ—তাকে তো ভাল করে এখনও চিনতে পারনি।

অলকা—সত্যি কথা, চিনতে পারিনি, তবু...।

অশেষ—তবু তাকে...।

অলকা—হ্যাঁ, ভালবাসতে মন চায়।

অলকার একটা হাতকে যেন লোভী লুণ্ঠকের মত শক্ত করে চেপে ধরে অশেষ—যদি সে তোমাকে ঠকায়?

অলকা—ঠকালে ঠকবে। ঠকাবে মানেই বা কী? ভালবাসবে না, এই তো?

অশেষ—শুধু ভালবাসবে না নয়; বিয়ে করতে যদি রাজি না হয়?

অলকা—আমি তো এত বড় কোনও দাবি করছি না। ও দাবি করব, এত বড় মাথা খারাপ রোগিণী আমি নই।

অশেষ—তবে শুধু কি...।

অলকা—হ্যাঁ, যখন তাকে দেখতে ইচ্ছে করবে, তখন তাকে দেখতে পাব, এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করি না, দাবিও করি না।

বাগানের গাছের মাথাগুলি দুলতে শুরু করছে। মনে হয় একটা ঝোড়ো হাওয়া এসে বাগানে ঢুকেছে। গাছের আর লতাপাতার ছায়ার ভিড়ে অল্প আলোর আভা যেন ছোট ছোট হাসির উচ্ছ্বলতার মত ছটফটিয়ে উঠছে।

অশেষের দুই হাতের ব্যাকুল এক আগ্রহের মধ্যে অলকার শরীরটা বন্দি হয়ে গিয়েছে। কত ছোট্টটি হয়ে গিয়েছে অলকা। ফুলদলের ফুল্ল কোমলতা যেমন কাঠের চাপে পড়ে আর পিষ্ট হয়ে এতটুকু হয়ে যায়। অলকার আর কথা বলবার সাধ্যি নেই; মুখ বন্ধ। অশেষের পিপাসিত মুখটাকে মুখের উপর বরণ করে নিয়ে একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছে অলকা।

প্রথম কথা বলে অশেষ—একটা অনুরোধ আছে।

অলকা—বলো।

অশেষ—যদি আপত্তি না করো, তবে বলতে পারি।

অলকা—কোনও আপত্তি করব না।

অশেষ—চলো, একবার ঘরের ভিতরে যাই।

চমকে ওঠে অলকা। আর, কি আশ্চর্য, দুচোখ থেকে টপ-টপ করে দুটো বড় বড় জলের ফোঁটা ঝরে পড়লেও অলকা বলে—চলো।

অশেষের বুকের ভিতর থেকে যেন অদ্ভুত একটা কান্নার স্বর উথলে উঠতে চায়। —একি বলছ অলকা?

অলকা—ঠিক বলছি।

অশেষ—তোমার ভয় নেই?

অলকা—না, তুমি খুশি হলে আমার কোনও ভয় নেই।

অশেষ—যদি বলি, তোমাকে ভুল করে এরকম একটা পাপ কাজে রাজি হতে দেখলে আমি খুশি হব না।

অলকা—পাপ বল আর পুণ্য বল, আমি তো সব তোমারই উপর ছেড়ে দিয়েছি।

অলকার ভেজা চোখের উপর মুখ ঘষতে থাকে অশেষ—আমাকে তুমি ভয়ানক জব্দ করলে অলকা। আমি এতটা আশা করিনি!

অলকা—তবে কী আশা করেছিলে?

অশেষ—আশা করেছিলাম তুমি নিশ্চয় আর শৈলেশ্বরকে বিয়ে করতে রাজি হবে না, কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে কিনা, সে বিষয়ে...।

অলকার ভেজা চোখ দুটো নতুন বিস্ময়ের আবেশে ছলছল করতে থাকে।—কী বলছ, বুঝতে পারছি না।

অশেষ—বিয়ের কথা বলছি।

অলকা—কে বিয়ে করবে কাকে?

অশেষ—তুমি আমাকে বিয়ে করবে, তা না হলে...

অলকা হাসে—তা না হলে কী হবে? আমাকে বাড়ি পৌঁছে আর দেবে না?

অশেষ—না, তা নয়!

অলকা—তবে কী? এখনই এক ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেবে?

অশেষ—না, তাও নয়!

অলকা—তবে?

অশেষ হাসে—তবে, অগত্যা, আমাকে তোমার চেয়ে অনেক সুন্দর একটি মেয়েকে বিয়ে করতে হবে।

অলকা—ইস্! সাধ্যি কী?

অশেষ—সাধ্যি থাকবে না কেন?

অলকা—আমার চেয়ে সুন্দর হলেও তাকে তোমার ভাল লাগবে না। বিয়ে করতেই পারবে না।

অশেষ—কেন?

অলকা—তোমার কথায় এত সহজে পাপ-টাপ করতে সে রাজি হবে না, কোনও মেয়েই রাজি হবে না। শুধু অলকা চৌধুরী একটা পাগল বলে, একটা হিস্টিরিয়ার রোগী বলে...।

অলকার মাথাটা কেঁপে কেঁপে অশেষের কাঁধের উপর লুটিয়ে পড়ে। অলকার ভেজা চোখের বাষ্পও অশেষের কাঁধ ভিজিয়ে দেয়। অলকার মাথায় হাত বুলিয়ে অশেষ বলে—আমার মত পাগলের পক্ষে।

অলকা—তুমি পাগল হবে কেন?

অশেষ হেসে ফেলে—তাই যদি না হই, তবে তোমার মুখের গালাগালি শুনে অশেষ ডাক্তারের মত ধূর্ত মানুষের প্রাণটাও তোমার প্রেমে পড়ে যাবে কেন?

অলকা—সত্যিই কি তাই হয়েছিল?

অশেষ—তখন বুঝতে পারিনি অলকা, কিন্তু বুঝতে বেশি দেরি হয়নি যে, অলকা চৌধুরীকে যদি ঘরে আনতে পারি, তবে জীবনটাকে বোধ হয় একরকম ভালই লাগবে।

অলকা—একরকম ভাল লাগা কি সত্যিই ভাল লাগা?

অশেষ—ওর বেশি আশা করবার সাহস হয় না!

অলকা—ইচ্ছেও কি হয় না?

অশেষ—হয় বইকি! তোমাকে ভালবাসতে গিয়ে অনেক কিছুই ভালবাসতে ইচ্ছে করবে, জীবনে এমন একটা অবস্থা দেখা দিলে মন্দ কী?

অলকা—তা হলে বলো, শুধু একা অলকা চৌধুরীতেই কুলোবে না, তোমার আরও অনেক কিছু চাই।

অশেষ—নিশ্চয় চাই। বিশেষ করে...।

অলকা—কী?

অশেষ—বলতে খুব ইচ্ছে করছে, না বলাই বোধ হয় ভাল।

অলকা—বলো, আমি কিছু মনে করব না। তা ছাড়া, কোন কথা আর না বলে ছেড়েছ যে...।

অশেষ—না থাক।

অলকা—তার মানে, এখনও আমার ওপর তোমার সন্দেহ আছে।

অশেষ—সন্দেহ নয়, তবে একটা ভয় অবিশ্যি আছে।

অলকা—ভয়!

অশেষ—হ্যাঁ, ভয় ছাড়া আর কী? আমাকে বিয়ে করবার পর সত্যিই যে আমাকে তোমার ভাল লাগবে, তার নিশ্চয়তা কিছু আছে কি?

অলকা ভ্রূকুটি করে—তবে কেন ওসব কথা বললে?

অশেষ—কী কথা?

অলকা—বিয়ের কথা, ভাললাগার কথা, ইচ্ছের কথা।

অশেষ—একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই।

অলকা—বলে ফেলো।

অশেষ—বিয়ের পর তুমি আমাকে ভালবাসতে পারবে না, এমন সম্ভাবনা স্বীকার করে নিয়েই আমি...।

অলকা মুখ ফেরায়—বুঝলাম, তুমি আমার উপকার করবার জন্য মস্ত একটা ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি আছ।

অশেষ—ত্যাগ স্বীকার করবার প্রশ্ন নয়, মানুষের মন সম্পর্কে কোনও মোহ না রাখবার প্রশ্ন।

অলকার গলার স্বর যেন একটু তপ্ত হয়ে ওঠে।—এমন ধারণা তো আমিও করতে পারি। বিয়ের পর তুমি তো আমাকে...।

অশেষ—কী?

অলকা—একটা গলগ্রহ মনে করতে পার। দিনরাত শুধু একটা বাজে চেহারার মেয়েকে চোখে দেখা আর তার কথা শোনা, এমন একঘেয়েমি তোমার মত মানুষের পক্ষে সহ্য না করাই...।

অশেষ হাসে—খুব স্বাভাবিক, এই তো?

অলকা—না, সহ্য না করাই উচিত। তার চেয়ে ভাল, যখন সত্যিই দেখতে ইচ্ছে করবে, তখন শুধু...।

অশেষ—সত্যি কথা অলকা, আমি এমন গর্ব করতে চাই না যে, আমার মনে কোনও গোলমাল কোনওদিন দেখা দেবে না।

অলকা—বেশ তো, সেজন্য এত ভয় করবার কী আছে?

অলকার গলার স্বরে ক্ষোভের সুর যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। যেন একটা আশার, একটা কঠোর প্রতিশ্রুতি জানাবার মত মনের জোর পেতে চাইছে অলকা। ঝাপসা চোখ দুটোর উপর রুমাল বুলিয়ে আস্তে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে। তার পরেই যেন সব ভাবনা আর আশার মোহ মনের ভেতর থেকে এক ঠেলায় সরিয়ে দিয়ে একটা প্রতিজ্ঞা উচ্চারণের মত সুরে বলে ওঠে—আমারও সেজন্যে কোনও ভয় নেই। তুমি হয়ত অলকা চৌধুরীকে তোমার ঘরের জীবনে পেয়েও ভালবাসতে পারবে না। কিন্তু সেজন্যে দুঃখ করব না।

অশেষ—দুঃখ হয়ত করবে না, কিন্তু তবু কি আমাকে ভালবাসতে পারবে?

অলকা—অন্তত চেষ্টা তো করব?

অশেষ—তাতে তোমার লাভ?

অলকা—আমার কোনও লাভ নেই, তবু।

অশেষ করুণভাবে হাসে—আমরা দুজনেই খুব মজার মজার কথা, অদ্ভুত কথা বলছি, যা কেউ বলে না।

অলকা—কী বললে?

অশেষ—দু'জনের কেউ চিরকাল ভালবাসার প্রতিশ্রুতি না দিয়েও বিয়ে করে স্বামী-স্ত্রী হতে চাইছে, এমন ঘটনার খবর আমি তো কখনও শুনিনি।

অলকা—আমি অদ্ভুত বলেই বোধ হয় এরকম অদ্ভুত সব ইচ্ছের কথা, প্রতিজ্ঞার কথা...।

অশেষ—অশেষ ডাক্তারের মত শুকনো মনের মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত কথা...।

অলকা হঠাৎ সন্দিগ্ধভাবে অশেষের মুখের দিকে তাকায় আর আশ্চর্য হয়ে যায়। হ্যাঁ, সন্দেহ করবার দরকার নেই, অশেষের মুখটা হঠাৎ যেন অগাধ তৃপ্তিতে ভরে গিয়েছে। চোখের দৃষ্টিটা মুগ্ধ। অলকা চৌধুরীকে যেন এখনই হাত ধরে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য অশেষের বুকের ভিতরের নিঃশ্বাসগুলি ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

অলকা—তুমি কি এতক্ষণ ধরে এই সব শক্ত-শক্ত বাজে কথা বলে আমাকে পরীক্ষা করে দেখছিলে?

অশেষ—তাই যদি করে থাকি, তবে দোষ কিছু হয়েছে কি?

—ছিঃ। মুখ ফেরায় অলকা।

অশেষ—কী হল?

অলকা—একটা মেয়ের দুর্বল মনকে কাছে পেয়ে এত নিষ্ঠুরতা করতে নেই।

অশেষ—না, আর দরকারও নেই।

অলকা—তার মানে?

অশেষ—আমার যা জানবার ছিল, তার সবই জানা হয়ে গেল।

অলকা—বেশ হল, এইবার তবে চলো।

হ্যাঁ, যেতে হবে, এতক্ষণে আবার একেবারে প্রথম সমস্যাটাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। রামলাল এখনও ট্যাক্সি নিয়ে আসেনি। কিন্তু আর তো দেরি করা উচিত নয়।

অশেষ বলে—আর পাঁচটা মিনিট দেখি। যদি ট্যাক্সি না আসে তবে হেঁটেই রওনা হতে হবে, আর রাস্তায় গিয়ে যেখানে একটা ট্যাক্সি পাওয়া যাবে সেখান থেকে...হ্যাঁ, তাহলে সময় মত পৌঁছে যেতে পারা যাবে।

পাঁচটা মিনিট। আর কথা বলবার কিছু নেই বলে মনে করে চুপ করলেই কি মনটা চুপ হয়? তবু ভাল, দুজনের এই পাঁচ মিনিটের মনের কথা দুজনের কেউ শুনতে পাবে না।

অশেষের মনের ভিতরে যেন একটা নতুন সংসারের কলরব বাজতে শুরু করেছে। ডাকাডাকি করে এই বাড়ির দিন, সন্ধ্যা ও রাতের যত সাধ আর ইচ্ছাকে কী অদ্ভুত ব্যস্ত করে তুলেছে অলকা। কি ভয়ানক খাটতে পারে অলকা। চাকর আসেনি, তবু বাড়ির কোনও ঘরের মেঝেতে আবর্জনার একটা কুটোও পড়ে নেই। অশেষের সকাল বেলায় চায়ে আর বেশি চিনি পড়ে না। ঠাকুরটা আর চা তৈরিই করে না। অলকা তার নিজের হাতের তৈরি চা ছাড়া কোনও চা অশেষকে খেতেই দেয় না। এ কি? অশেষের জ্বর হয়েছে সন্দেহ করে, অশেষের ডাক্তারি অহংকারের সব কথা একেবারে তুচ্ছ করে, অলকাই পরীক্ষা করে দেখছে, অশেষের জ্বর হয়েছে কিনা? অশেষের কপালের উপর গাল পেতে দিয়ে জ্বরের তাপ পরীক্ষা করছে অলকা, বাঃ। এরকম ভুয়ো জ্বর নিয়ে সাতটা দিন এভাবে অলকার ডাক্তারির স্বাদ কপাল ভরে অনুভব করলে মন্দ কি? ... যাঃ, অলকা এত করে বলে দিল, তবুও ভুল হয়ে গেল। বাড়ি ফিরতে রাত হয়েই গেল। বেচারা হয়ত রাগ করে...কি আশ্চর্য, এখনও ঘুমিয়ে পড়েনি অলকা...ওই তো দেখা যাচ্ছে, পুব দিকের ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে গেটের দিকে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু, এই তো অলকা এখন দাঁড়িয়ে আছে, অপলক চোখে একটা ছোট ঝাউ-এর দিকে তাকিয়ে; অশেষ যে তার এত কাছে, এই বোধই যেন নেই। যেন এখানে নয়; এই খোলা হাওয়া আর বাগানের আলো-আঁধারি কুহকের জগতের মধ্যে নয়; অলকা চৌধুরী যেন ছোট একটা ঘরের আলোর মধ্যে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। চিঠি লেখা শেষ হয়েছে। অশেষের মায়ের ফটোটার উপর বেশ ধুলো জমে ছিল, সে ধুলো মুছে ফেলতে হল। ভদ্রলোক বেশ চালাক। খরচের টাকা পয়সার হিসাব রাখার দায় অলকার উপর ফেলে দিয়ে ভদ্রলোক যেন হাঁপ ছেড়েছেন। এখন সব ঝঞ্ঝাট অলকার। রামলালকে এক মাসের ছুটি দেওয়া হবে কিনা, এটাও

অলকাকেই ভাবতে হচ্ছে। তবু...বড় বিশ্রী অভ্যাস অশেষের; দিন রাতের এতখানি সময় যদি শুধু বাইরে বাইরে কাটিয়ে দেয়, তবে একা অলকার পক্ষে কি ঘরের এতসব ঝঞ্ঝাট সামলানো সম্ভব? কিন্তু এই সামান্য কথাটা ওকে বোঝানো যায় না।...তবু...কি আশ্চর্য, শক্ত কথা বললেও মানুষটা হেসে ফেলে আর অলকাকে বুকে জড়াবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয়।...কিন্তু এখনও বুঝতে পারছে না মানুষটা, অলকাও মুখ খুলে এখনও বলেনি, বলতে কী ভয়ানক লজ্জা করে...কিন্তু সেদিন আসতে যে খুব বেশি দেরি নেই...বড় জোর আর সাতটা মাস...ডাক্তার না ছাই, একেবারে অন্ধ। কিন্তু শিগগিরই দেখতে পাবে, তখন হিংসুটের মত তাকাতে হবে, আর লোভীর মত হাত বাড়িয়ে অলকার কোলের উপর থেকে একটা ছেলেকে বুকে নেবার জন্যে...না, বাধা দিতে পারবে না অলকা। নাও, নাও, এ তো তোমারই দয়া। কিন্তু ভুলে যেওনা, আমাকে ভালবেসেছ বলেই ওকে পেয়েছ। একে ভালবাসলে আমাকেও ভালবাসা হয়।

ছোট ঝাউটা যেন গলে গিয়েছে, চোখে আর দেখতেও পাওয়া যাচ্ছে না। অলকার বুকটা থর থর করে কাঁপছে, বুকের ভেতরের এই থরথর অনুভব যে অলকার সারা শরীরটাকে একেবারে অলস করে এখানেই লুটিয়ে দিতে চাইছে। এ কী হল? বুকের ভিতরে যেন একটা বন্ধ কপাটের আগল ভেঙে গেল। ঠোঁট দুটো পিপাসায় শুকিয়ে গিয়ে কাঁপছে। এ কেমন পিপাসা? জীবনে তো কোনওদিন ভুলেও, কোনও স্বপ্নেও, কোনও কল্পনাতেও...তবে কি অলকা চৌধুরীর প্রাণটা এতদিন ধরে শুকনো গাছের ফুলের মত গন্ধ হারিয়ে শুধু একটা মেয়েমানুষের চেহারা ধরে...বুঝতেও পারেনি যে, শৈলেশ্বরের মত একটা রুক্ষ মানুষের মুখের কথাগুলি প্রেম নয়; শৈলেশ্বরকে ভালবেসেছি বলে মনে করা যে একটা মিথ্যা বিশ্বাসের হিস্টিরিয়া, একটুও বুঝতে পারা যায়নি। কই, কোনওদিন তো কোনও কল্পনাতেও দেখতে পাওয়া যায়নি, শৈলেশ্বর দু'হাত বাড়িয়ে অলকার কোলের আদুরে জিনিসটাকে বুকে নেবার জন্য কাছে এগিয়ে আসছে। ছিঃ! এমন কল্পনা যে সম্ভব হয়নি, তাই তো একটা সৌভাগ্য। কিন্তু...

চমকে ওঠে অশেষ। অলকা চৌধুরী যেন ফুঁপিয়ে উঠেছে বলে মনে হল। অশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে কাছে এগিয়ে এসেই অলকার হাত ধরে—আবার কি ভেবে এখানে কাঁদাকাটি শুরু করলে অলকা?

অলকা—কাঁদছি না, তুমি কিছু মনে করো না।

অশেষ—কাঁদছ না তো এ কী করছ?

অলকা—জীবনে এরকম জব্দ হব, কোনও দিন ভাবতেও পারিনি।

অশেষ সান্ত্বনার সুরে বলে—জব্দ?

অলকা—হ্যাঁ, নিজের মনের কাছে জব্দ। আমি সত্যিই শৈলেশ্বরকে ভালবাসিনি, একথা তুমি হয়ত এখনও বিশ্বাস করবে না।

অশেষ—এখন বিশ্বাস করি; কিন্তু তখন করিনি।

অলকা—তার মানে?

অশেষ—তার মানে, দুদিন আগে তুমি শৈলেশ্বরের ভালবাসা পাওয়ার জন্যে যে মরতেও প্রস্তুত ছিলে, সেটা অবিশ্বাস করিনি।

অলকা—ছিঃ, কী বিশ্রী তোমার বিশ্বাস।

অশেষ—মেনে নিলাম, আমার বিশ্বাসটা বিশ্রী, কিন্তু মিথ্যে তো নয়!

অলকা—মিথ্যে।

অশেষ—বেশ তো, আমার বিশ্বাস আর তোমার বিশ্বাস না হয় মিথ্যে; কিন্তু শৈলেশ্বরের বিশ্বাসটা যদি মিথ্যে না হয়?

অলকা যেন আতঙ্কিতের মত আর্তনাদ করে ওঠে।—কী বললে?

অশেষ—শৈলেশ্বর যদি সত্যিই তোমাকে ভালবেসে থাকে? যদি তার মনে সত্যিই এই বিশ্বাস হয়ে থাকে যে, সে তোমাকে ভালবাসে আর তুমি তাকে ভালবাসো।

অলকা—তার ভুল হবে। এমন বিশ্বাস করবার কোনও অধিকার তার নেই।

অশেষ—তার প্রমাণ?

কি ভয়ানক প্রশ্ন? অলকার এই আতঙ্কিত প্রাণটার কোন শক্তি নেই যে, সত্যিই প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে পারে যে, শৈলেশ্বরের মনে এমন বিশ্বাস থাকাটা অন্যায়। কেমন করে এরই মধ্যে ভুলতে পারবে অলকা, শৈলেশ্বরের লেখা যে চিঠিগুলি অলকার টেবিলের দেরাজের ভিতরে এখনও রয়েছে, সেগুলি কতগুলি প্রেমহীন মিথ্যা, ভালবাসার অস্বীকৃতি? শৈলেশ্বরও যে ইচ্ছে করলে এখনও এক গাদা চিঠি তুলে নিয়ে এসে এখনই অলকার চোখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে প্রশ্ন করতে পারে—তোমার লেখা এই সব চিঠি কি মিথ্যা? ভালবাসার স্বীকৃতি না অস্বীকৃতি?

মাথা হেঁট করে ভীরু অপরাধীর মত বিড় বিড় করে অলকা—না, প্রমাণ করবার সাধ্যি নেই।

অশেষ—তবে?

অশেষের এই প্রশ্নটাও কি নিজের? কী বলতে চায় অশেষ? তবে কি অলকা চৌধুরী অশেষের জীবনের কাছে অদৃশ্য হয়ে গেল? পাঁচ মিনিট আগে যে সুরে কথা বলেছে অশেষ, সেই সুর কেমন করে এত সহজে পাল্টে যায়? এই তো, এই কয়েকটি মুহূর্ত আগে, যা ছিল এত সরল ও কোমল একটা আগ্রহ, তাই একটা কঠিন সতর্কতা হয়ে গেল। নিজের মনের সাধ অসাধের খবর রাখে না, একটা হঠাৎ ইচ্ছার খেয়ালকে ভালবাসা বলে মনে করে আর একেবারে চিরপ্রেমের অঙ্গীকার করে ফেলতে পারে, এই ভদ্রলোকও কি সেই রকম এক দোমনা বাতিকের মানুষ?

অলকা করুণভাবে তাকায়—প্রমাণটাকে এত বড় করে দেখছো কেন? দলিলে ভালবাসার কথা লেখা থাকলেই কি বুঝতে হবে যে ভালবাসা ছিল?

অশেষ—হয়ত ছিল না। কিন্তু...।

অলকা—কিন্তু আজ তো আর নেই।

অশেষ—তুমি এ কথা বলতে পার; কারণ তোমার আজ মনে হচ্ছে যে, সত্যিই শৈলেশ্বরকে তুমি ভালবাসতে পারনি। কিন্তু তুমি কেমন করে অবিশ্বাস করবে যে, শৈলেশ্বর আজও তোমাকে ভালবাসে না?

নীরব হয়ে, যেন একটা নিরুত্তর বোবা বেদনার ভারে নিঝুম হয়ে যায় অলকা। উত্তর দেবার কিছু নেই। সত্যিই তো; শৈলেশ্বর যে অলকা চৌধুরীকে ভালবাসে না, এর প্রমাণ নেই! শুধু সন্দেহ করা যেতে পারে; কিন্তু সন্দেহটা তো প্রমাণ নয়! কালই যদি শৈলেশ্বর এসে ডাক দেয়—চলো অলকা, আমি এতদিন তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম। তবে?

অশেষ—অত ভাবতে হচ্ছে কেন অলকা? কিসের ভাবনা?

অলকা ছটফট করে যেন অসহায় প্রাণটাকেই একটা নাড়া দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।—না, কোনও ভাবনা নেই।

অশেষ—তার মানে?

অলকা—শৈলেশ্বরকে বলে দিতে আমার একটুও বাধবে না।

অশেষ—কী?

অলকা—বলে দিতে পারব, ভালবেসে লাভ নেই।

অশেষ—তারপর?

অলকা—শৈলেশ্বর আশ্চর্য হয়ে চলে যাবে।

অশেষ—কিন্তু, তার মনে যে আঘাত দেওয়া হবে তাতে...।

অলকা—তার প্রায়শ্চিত্ত করব।

অশেষ—কী?

অলকা—জীবনে তোমার কাছেও আর মুখ দেখাব না।

অশেষ—কী বললে?

অলকা—তোমার ভালর জন্যই বলছি। আমাকে বিশ্বাস করা তোমার আর উচিত হবে না। তা ছাড়া...।

অশেষ—বলো।

অলকা—তা ছাড়া, বুঝতে পারছি, নিজেকেও বিশ্বাস করা আমার আর উচিত হবে না। অলকা চৌধুরী বেঁচে থাকলে আরও ভয়ানক ভুল করবে, মানুষের জীবনের অনেক ক্ষতি করবে।

অশেষ—তার মানে, মরে যাবে তবু অশেষ ডাক্তারকে বিয়ে করবে না, এই তো?

অলকা—হ্যাঁ, আর আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না। এখানেই সব শেষ। এবার দয়া করে...।

কিন্তু অশেষের প্রাণের কৌতূহল যেন আরও নির্লজ্জ হয়ে অলকার এই কঠোর সংকল্পের মুখটার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।—তার মানে কি এই বুঝব যে, আমাকে তুমি ভালবাসতে পারলে না?

অলকা উদাসভাবে তাকায়—আর এসব প্রশ্ন করো না। কোনও দরকার নেই।

অশেষ—কিন্তু আমার যে দরকার আছে। আমি যে তোমাকে ভালবাসি। অন্য কেউ তোমাকে ভালবাসে কি ভালবাসে না, সেসব প্রশ্নের আমি ধার ধারি না।

অলকার চোখের দৃষ্টিটা যেন আবার নতুন বিস্ময়ের ছোঁয়ায় কেঁপে ওঠে—বুঝতে পারছি না, তুমি কি তবু...।

অশেষ—হ্যাঁ, তবু তোমাকে আমার ঘরে আনতে চাই।

অলকা—আমাকে অস্পৃশ্য মনে হবে না?

অশেষ—না।

অলকা—তুমি খুশি হবে?

অশেষ—হব।

অলকা—আমার ওপর তোমার এত ক্ষমা, এত মায়া কেন?

অশেষ—তোমাকে ভাল লাগে বলে।

অলকা—কেন ভাল লাগে?

অশেষ—তুমি ভালবাসতে জান বলে।

অলকা—কিসে প্রমাণ পেলে?

অশেষ—এই যে, শৈলেশ্বরের উপর তুমি রাগ করতে পারলে না, তাকে ঘেন্না করতে পারলে না।

আবার কিছুক্ষণ নীরব হয়ে যায় অলকা। তারপরেই বিপন্নের মত মুখ করে অশেষের দিকে তাকায়।—এমন কোনও উপায় কি নেই যাতে...।

অশেষ—কী বললে?

অলকা—শৈলেশ্বর সত্যিই যাতে আমার কথা ভুলে যেতে পারে, এমন কোনও ব্যবস্থা কি সম্ভব নয়?

অশেষ হেসে ফেলে—তার মানেটা কী? শৈলেশ্বরকে বলে দিতে হবে যে, অলকা চৌধুরী এখন তার দুদিনের পরিচিত এক ডাক্তারকে ভালবেসে বসে আছে।

অলকা—সে কথা বললেও যে, তাকে কষ্ট দেওয়া হবে। শুনে সে হয়ত আমাকে ঘেন্না করবে কিন্তু একথাও তো তার মনে হবে যে, মানুষ মানুষকে কত ছলনা করতে পারে।

অশেষ—তা হলে আর কোন ব্যবস্থা হতে পারে?

অলকা—শৈলেশ্বরের সঙ্গে যদি কোনও সুন্দরী মেয়ের বিয়ে হয়ে যেত, তবে...।

অশেষ—তা হলে কী হত?

অলকা—তা হলে আমি নিজেকে এত ছোট আর এত ভয়ানক বলে মনে করবার ভয় থেকে কিছুটা মুক্তি পেতাম।

অশেষ—আমার মাসতুতো বোনটি দেখতে বেশ ভালই।

অলকা—কে?

অশেষ—এরই মধ্যে ভুলে গেলে? তোমাদের পাড়ার ত্রিদিব বাবুর মেয়ে...।

অলকা—কিন্তু তার যে আজই বিয়ে হয়ে যাবে।

অশেষ—হয়ে যাবে কেন? এতক্ষণে হয়েই গিয়েছে। ল্যাঠা চুকে গিয়েছে।

অলকা—তবে?

অশেষ—তবে আবার কী? তুমি কি আমাকে দিয়ে শৈলেশ্বরের বিয়ের ঘটকালির কাজে খাটাতে চাও?

অলকা—আমার কথার দোষ ধরো না। আমি হয়ত তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। কিন্তু তুমি বুঝে নিয়ে ব্যবস্থা করো; যেন...।

অশেষ—কী?

অলকা—তোমাকে ভালবাসতে যেন আমি কোন বাধা না পাই। নিজেকে যেন দোষী বলে মনে না হয়।

অশেষ—আমার কাছে এতবড় দাবি কেন?

অলকা—তুমি ছাড়া আমার আর কেই বা...।

অশেষ—তবু তুমি মুখে বলতে পারছ না যে, তুমি আমাকে ভালবাস বলেই এই দাবির অধিকার পেয়েছ।

আস্তে আস্তে হেঁটে অশেষের কাছে এসে দাঁড়ায় অলকা। আস্তে আস্তে মাথাটাকে অশেষের বুকের উপর পেতে দেয়।—আর ভাবতে পারি না, আর কিছু বলতে পারছি না। সব ভয় ভুল পাপ-তাপ নিয়ে তোমার কাছেই চলে এসেছি। ইচ্ছে করলে সরিয়ে দিতে পারো।

ফটকের কাছে গাড়ির হর্ন বাজছে। রামলাল কি তবে ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসেছে?

অশেষ—একটা কথা বলতে চাই।

অলকা—বলো।

অশেষ—বিয়ের কথা কি বিমানবাবুকে বলব?

অলকা—হ্যাঁ।

অশেষ—অপেক্ষা করবার ইচ্ছে নেই!

অলকা—একটুও না।

ট্যাক্সিটা বড় উদ্দাম হয়ে ছুটে চলেছে। শহরের আলো-ছড়ানো রাস্তার ভিড় আর কোলাহল ভেদ করে অশেষ আর অলকার জীবনও যেন এই জগতের কোন পরম বিশ্রামের আশ্রয়ের দিকে ছুটে চলেছে।

অশেষ—এইবার মন খুলে আর একটি কথা বলো, শুনি।

অলকা—শোনবার আর কি কিছু বাকি আছে?

অশেষ—আছে।

অলকা—কী?

অশেষ—এই যে কাল রাত্রিতে ওরকম একটা অসময়ে হঠাৎ তোমাদের বাড়িতে গিয়ে...।

অলকা হাসে—তখন কি ছাই ভাবতে পেরেছিলাম যে, তুমি আমার এরকম সর্বনাশটি করবে?

অশেষ—সে কথা জিজ্ঞেস করছি না। আমাকে সন্দেহ হয়েছিল কি?

অলকা—হয়েছিল বইকি।

অশেষ—রাগও হয়েছিল?

অলকা—কী আশ্চর্য, এখনও বুঝতে পারছি না, কেন হঠাৎ এক অচেনা ভদ্রলোকের উপরে এত রাগ হল।

অশেষ—অথচ পরের দিনই আমার কাছে শৈলেশ্বরের কথা কত সহজে তুমি বলে দিলে।

অলকা—সেটাও বোধ হয় রাগের মাথায়। তোমাকে অপমান করে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে।

অশেষ—মনের এরকম একটা অদ্ভুত রাগের ভাবটাকে সন্দেহ হয়নি?

অলকা—সন্দেহ হয়নি, কিন্তু বিশ্বাস করতেই পারিনি যে, হঠাৎ এক ভদ্রলোককে শুধু চোখে দেখে মুখের কয়েকটা কথা শুনেই তাকে মনে-মনে ভাল লেগে যেতে পারে। আচ্ছা, এইবার তুমি বলো শুনি।

অশেষ—কী?

অলকা—আমাকে দেখে তোমার কী মনে হয়েছিল?

অশেষ—মনে হয়েছিল, বেশ ভাল মানুষ কিন্তু বেশ অহংকারের মানুষ।

অলকা—তাতে তো আমার ওপর রাগ হবারই কথা।

অশেষ—কথা তো তাই, কিন্তু রাগ হয়নি কেন সেটা তখনও বুঝতে পারিনি।

অলকা—আজ বুঝতে পারছ কি?

অশেষ—খুব বুঝেছি, একেবারে হাড়ে হাড়ে।

অলকা—ছিঃ, এরকম করে বলো না।

অশেষ—একটা অচেনা মেয়ের অহংকারের ভঙ্গি দেখে আর ধমক-ধামক শুনে অপমানিত হয়েও যে মানুষ রাগ না করে বরং লোভী হয়ে ওঠে...।

অলকা—এতটা বাড়িয়ে বলো না।

অশেষ—এতটুকুও বাড়িয়ে বলছি না। সত্যি লোভী হয়ে উঠেছিলাম।

অলকা—এ কি সম্ভব?

অশেষ—আমি কবি-টবি নাই, মনীষীও নই। আমার কাছ থেকে এসব প্রশ্নের উত্তর তুমি পাবে না।

অলকা—আশ্চর্য।

অশেষ—যাক, এই আশ্চর্যটুকু স্বীকার করে নিলেই ভাল। কিসে ভালবাসা হয়, কেন হয়; এসব তত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা।

অলকা—একথা কেন বলছ?

অশেষ—এ রোগের কারণ জানা শিবেরও অসাধ্য।

অলকা—থাক, আর এত জানাজানির দরকার নেই।

অশেষ—আমি তো তাই বলছি; এবার থেকে...।

অলকা—কী?

অশেষ—বই-টই পড়ে, বড় বড় বিদ্যার পরীক্ষায় পাশ করে বিদুষী হবার চেষ্টাটা যদি...।

অলকা—না, আর বোধ হয় সম্ভব হবে না।

অশেষ—কেন?

অলকা—ইচ্ছেই হবে না, আর বই-টই কেন? যা পাওয়ার ছিল পেয়েই গেছি।

অশেষ—কিন্তু একটা কাজ নিয়ে থাকতে হবে তো?

অলকা—বুঝেছি।

অশেষ—এখনও বুঝতে পেরেছ কিনা সন্দেহ।

অলকা—আমার একটুও সন্দেহ নেই। তুমিই তো আমার কাজ।

অশেষ—তারপর?

অলকা—তারপর আবার কি? তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে যেদিন মরে যাবার সুযোগ পাব, সেদিন বুঝব যে কাজ ফুরিয়েছে।

অশেষ—শুধু কি আমার মুখের দিকেই তাকাতে চাও?

অলকা—ছিঃ, আমায় কোন বাজে সন্দেহের কথা বলো না লক্ষ্মীটি।

অশেষ—আমার কথাটা আর একটু ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করো।

ট্যাক্সির ড্রাইভারের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে অলকা ফিসফিস করে।—একটু আস্তে বলো।

অলকার কানের দিকে মুখ ফিরিয়ে অশেষ বলে—বেশ তো আস্তেই বলছি, জবাব দাও।

অলকা—জবাব শোনবার সময় পাবে।

অশেষ—এখন কি অসময়?

অলকা—আমাকে কত নির্লজ্জ হতে বলছ, ভেবে দেখো।

অশেষ—বলতেই হবে। আমি না শুনে ছাড়ব না।

অলকা—কেন?

অশেষ—তুমি কি-এমন কম লোভী সেটাও আমি একটু বুঝে নিতে চাই।

অলকা—আমি একটুও কম লোভী নই। তুমি একথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই সেটা বুঝে ফেলবার সৌভাগ্য হয়েছে।

অশেষ—কখন বুঝলে?

অলকা—এই তো কিছুক্ষণ আগে। তোমার বাড়ির সেই অদ্ভুত আলো-আঁধারের চক্রান্ত আর বাগানের হাওয়ায়...যেন অদ্ভুত একটা ঘুমের স্বপ্ন নিয়ে মনটাকে ...।

অশেষ—বলো।

অলকা—মনে হল, তোমার ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। অলকার একটা হাত শক্ত করে ধরে অশেষের প্রাণের সব কৌতূহলও যেন নিঝুম হয়ে যায়।

ভালবাসা কি জীবনের নবজন্ম? তা না হলে হাজারবার দেখা যত পরিচিত ও পুরাতনের রূপগুলিও এত নতুন হয়ে যায় কেন? নিজের চেহারাটাকে দেখতে পাচ্ছে না অশেষ, কিন্তু কল্পনা করতে পারে, তার আজকের এই মুহূর্তের মুখটি বোধ হয় ঠিক সেই মুখ নয়। নতুন হয়ে গিয়েছে, হয়ত বেশ সুন্দরও হয়ে উঠেছে মুখটা। তা না হলে অলকা এভাবে এতক্ষণ ধরে দুই চোখ একেবারে অপলক করে অশেষের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কেন?

কালিদাসের কাব্যের একটা কথা নিয়ে কবি বন্ধুরা অনেকদিন আগে যে তর্কাতর্কি করেছিল তারই অর্থহীন কলরব যেন হঠাৎ একটা অর্থ হয়ে অশেষের কানের কাছে বাজছে। কবিরা বাড়িয়ে বলে; তবু মনে হচ্ছে বোধ হয় সত্য কথাটাকেই বাড়িয়ে বলে। শুধু মুখটি দেখে জন্মান্তরের সুহৃদ বলে মনে হয়, কথাটা মিথ্যে নয় বোধ হয়। অলকার শান্ত মুখটাকে যে জীবনের অনেককালের পরিচিত একটি ভালবাসার মুখ বলে মনে হয়। কে বলবে পরশু দিন এই মেয়ের সঙ্গে কোনও চেনা-শোনা ছিল না? এই মুখটি কোনও দিন চোখের সামনে থাকবে না, ভাবতে গেলেও যে বুকটা ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। অলকা-ছাড়া সে জীবন সহ্য করতে পারা যাবে কি?

গাড়ি ছুটছে, পথের দু'পাশের আলোর সারি যেন ছোট ছোট চাঁদের ঝাঁকের মত অশেষের চোখের উপর একটা অদ্ভুত ঝলমলে বিস্ময়ের আভা লুটিয়ে দিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে। পথের সোরগোল কানে আসছে ঠিকই, কিন্তু সোরগোল বলে মনে হয় না। সত্যিই কি ভালবাসার মানুষ পাশে থাকলে পৃথিবীর সব কর্কশতার রবও মিষ্টি হয়ে যায়?

এঃ, অশেষের মনের এক কোণে একটা পুরনো ধারণাও যে লজ্জা পেয়ে ছটফট করে ওঠে। তার আজকের এই মনটার এইসব অনুভবের কথাগুলিকে কেউ যদি তিনদিন আগে একটা কাগজে লিখে অশেষকে শোনাত, তবে অশেষ যে তুচ্ছতার হাসি হেসে সেসব কথাকে একটা রোমান্টিক জঞ্জাল বলে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিত।

হতে পারে জঞ্জাল, কিন্তু এখন যে সোনা বলে মনে হচ্ছে। বিশ্বাসও করতে হচ্ছে; এটুকু যদি অনুভবে না পাওয়া যেত, তবে জীবনে একটা মস্ত বড় ফাঁকিই থেকে যেত। মন্দ কি? অলকা চৌধুরীকে পুরনো বাগান স্ট্রিটের একটি বাড়ির একটি নারী বলে মনে হয় না। কিন্তু ঠিক যে কী, তাও বুঝতে পারা যায় না। জীবনের বহুদিনের একটা শূন্যতার ফাঁকি মিথ্যে করে দিয়ে অজস্র তৃপ্তিতে ভরে দেবে, এই রকম একটি উপহার যেন কোনও এক অদৃশ্য জগৎ থেকে বের হয়ে অশেষের বুকের কাছে চলে এসেছে।

চমকে ওঠে অশেষ। সত্যিই যে অন্য জগতের একটা স্বর অশেষের কানের কাছে ফিসফিস করে উঠেছে।...কী সুন্দর দেখতে তুমি! কথাটা বলেছে অলকা, কারণ, দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, অলকার ঠোঁট কাঁপছে।

অলকার চোখ দেখেও বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই, দুদিনের পরিচিত এই মানুষটাকে একটা বিস্ময় বলে মনে হয়েছে অলকার। কতকালের পরিচিত, তবু নতুন। বলতে গেলে মানুষটার জীবনের কোনও কিছুই জানে না, তবু মনে হয়, সবই জানা হয়ে গিয়েছে। একটুও লজ্জা করে না, ভয় করে না, সন্দেহ হয় না।

কি যেন বলতে চায় অলকা, কিন্তু বলতে পারছে না। কিন্তু অশেষ কি না শুনেও বুঝে নিতে পারবে না যে অলকা চৌধুরী এখন অনায়াসে এই অশেষ ডাক্তারেরই পা ছুঁয়ে বলে দিতে পারবে, সত্যই যে তুমি একটা মূর্খ মেয়েমানুষকে শিখিয়ে দিলে, কাকে ভালবাসা বলে। তোমার চেয়ে উপকারী আমার আর কেউ নেই। তুমি যদি সরে যাও, তবে দুঃখ হবে ঠিকই; কিন্তু সেই দুঃখ সহ্য করে এই সত্য স্বীকার করব যে, তোমারই জন্যে আমি নিজের প্রাণটাকে চিনতে শিখেছি। তোমার কাছে আমার প্রাণ চিরঋণী হয়ে রইল।

গাড়িটা ডান দিকে মোড় ফিরেই গিয়ে খুব জোরে একটা ঝাঁকুনি খেল, তাই বোধ হয়, কিংবা কে জানে কেন, অশেষ যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে গিয়ে বলে ওঠে—এখনও সময় আছে অলকা।

অলকা—কী বললে?

অশেষ—এখনও সময় আছে; ঢাকুরিয়া পৌঁছে যেতে এখনও বোধ হয় পনেরো মিনিট সময় লাগবে। এরই মধ্যে ভেবে নিতে পারো; ভুল করছ কিনা, উচিত হচ্ছে কি না?

অলকা—ভুল হয় হোক, তবু জানি, অনুচিত কিছু করছি না।

অশেষ—সত্যিই আমাকে বিয়ে করতে তোমার মনে কোনও বাধা নেই?

অলকা—বাধা থাকবে কেন?

অশেষ—তুমি যে সত্যিই আমাকে চেন না অলকা।

অলকা—চিনেছি।

অশেষ—কতটুকু চিনেছ? তুমি কি ধারণা করতে পার যে, খুড়িমা এই বিয়ে একটুও পছন্দ করবেন না?

অলকা—কেন?

অশেষ—তাঁর ইচ্ছে, আমি একটা বড় ঘরের মেয়েকে বিয়ে করি। বড় ঘর বলতে খুড়িমা কী বোঝেন সেটা বোধ হয় তুমি বুঝতে পারবে।

অলকা—বুঝেছি, বড়লোকের মেয়ে।

অশেষ—হ্যাঁ, সুতরাং সমস্যাটা কী দাঁড়াবে একটু ভেবে দেখো।

অলকা—কী আর সমস্যা দাঁড়াবে? কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরীর মেয়েকে দেখে খুড়িমা খুশি হবেন না, হয়ত ঘেন্না করবেন, এই তো?

অশেষ—হ্যাঁ, তার ফলে তোমার মনে যে অশান্তি দেখা দেবে...

অলকার চোখে যেন একটা দুঃসাহসের আনন্দ ঝিলিক দেয়।—অশান্তি দেখা দেবে বলে মনে হয় না।

অশেষ—কেন?

অলকা—খুড়িমা কতদিন ঘেন্না করতে পারবেন? এমনও হতে পারে তো, খুড়িমা একদিন নিজেই অলকা চৌধুরীকে ভালবেসে লজ্জা পেয়ে যাবেন।

অশেষ—এতটা শুধু আশা করা যায়, বিশ্বাস করা যায় না।

অলকা—কিন্তু, তাই বলে তুমি তো আমাকে ঘেন্না করবে না?

অশেষ—আমি তো তাই জানি। কিন্তু এমন তো হতে পারে, আমার কোনও ব্যাপার দেখে তুমি একেবারে চমকে উঠে রাগ করে ঘেন্না করে...।

অলকা—কি ছাই আবোল তাবোল বলছ? এমন কোনও ব্যাপার থাকতে পারে না, যা দেখে আমি একেবারে একটা পাগল হয়ে গিয়ে তোমাকে ছোট মনে করব।

অশেষ—যদি জানতে পার যে, আমি মদ খাই?

অলকা—জানলামই বা; মদ খাওয়া বন্ধ করিয়ে ছাড়ব।

অশেষ—পারবে?

অলকা—বিশ্বাস তো করি; পারব। ...এবার তুমি বলো।

অশেষ—কী?

অলকা হাসে—যদি জানতে পার যে, আমি দিনে রাতে পাঁচবার স্নান করি; ভাত খাওয়ার সঙ্গে চা খাই, আর মাঝরাতেও ঘুম বন্ধ করে সেলাই করি, তবে?

অশেষ—তবে তো হাড়সুদ্ধ জ্বালাবে মনে হচ্ছে।

হাসতে গিয়েও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় অশেষ।—আমি কিন্তু ঠিক হাসাহাসির আর ঠাট্টার কোনও কথা বলছি না অলকা। সত্যি কথা, তোমার জীবনের কতটুকুই বা আমি জানি!

অলকা—সবই একদিন জানতে পারবে।

অশেষ—কিন্তু সে তো পরের কথা। তার আগে...।

অলকা—তার আগে কি জানা যায়? আমার কথা দশ দিন ধরে তোমাকে শোনালেও কি তুমি বুঝতে পারবে, আমার মধ্যে কি আছে আর কি নেই!...তুমিই না এই কিছুক্ষণ আগে বললে যে, জানতে চেষ্টা করা বৃথা।

অশেষ—বলেছিলাম বটে!

অলকা—আর একটা কথা বলতে পারি; যদি রাগ না কর।

অশেষ—বলো, মোটেই রাগ করব না।

অলকা—তুমি কি নিজেকেও চিনতে পেরেছ? না, আমি নিজেকেও চিনি?

অশেষের বুকের ভিতরের অস্থির নিঃশ্বাসটা এইবার হঠাৎ যেন সুস্থির হয়ে যায়।

অলকা বলে—নিজেকে একটুও চিনতে পারিনি। তা না হলে জীবনের এত বড় ভুলকেও ভুল বলে বুঝতে পারিনি কেন? ভুল করে একটা মানুষের তুচ্ছতাকে ভালবাসা বলে যখন বুঝেছিলাম, তখন নিজেকে বড় চালাক বলেও মনে করেছিলাম।

অশেষ—যাক, আর ওসব কথা নয় অলকা।

অলকা—কতদূর এলাম?

অশেষ—লেক এসে পড়েছে বোধ হয়!

অলকা—সর্বনাশ।

অশেষ—কী হল?

অলকা—বড় ভয় করছে। তিলকা যদি জিজ্ঞেস করে, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? কী জবাব দেব?

অশেষ—সত্যি কথাটা বলতে পারবে না?

অলকা—পারব না। ভাবতে বড় ভয় করছে।

অশেষ—কিন্তু...।

অলকা—কী?

অশেষ হেসে ফেলে—কিন্তু তিলকা কি না জিজ্ঞেস করে ছাড়বে?

অলকা—শুধু তিলকা কেন? বাবা আর মা কি না জিজ্ঞেস করে ছাড়বেন?

অশেষ—একটা মিথ্যা কথা বলে দিও।

অলকা—মিথ্যে কথা বলতে পারব না।

অশেষ—কেন? সামান্য একটা মিছে কথা...।

অলকা—না, জীবনে এই প্রথম ভালবাসার স্বাদ পেয়েছি, এই সৌভাগ্য কি চুপ করে লুকিয়ে রাখতে পারি? কিন্তু মিথ্যে কথা দিয়ে চাপা দিতে পারব না। বড় ভয় করবে। এর মধ্যে মিথ্যা কথা বলে একটা অলক্ষুণে কাণ্ড করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

অশেষ হাসে—তা হলে আমারই ওপরে একাজের দায় ছেড়ে দাও।

অলকা—কী কাজ?

অশেষ—এই সব মিছে-টিছে বলবার কাজ।

অলকা—না-না, তুমিই বা কেন আমার লজ্জা বাঁচাবার জন্যে একটা মিথ্যে কথা বলবে? তোমার মনে কি কোনও ভয় নেই?

অশেষ—খুব ভয় আছে। যদি কেউ কিছু সন্দেহ করে, তবে আমাকেই করবে।

অলকা—কেন?

অশেষ—কেউ সহজে বিশ্বাস করবে না যে, শুধু দুদিনের পরিচয়ে তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি; আমি এত বড় একটা ভদ্রলোক।

অলকাও হেসে ফেলে—ভদ্রলোকেরা বুঝি দুদিনের পরিচয়েই ভালবেসে ফেলে?

অশেষ—নিশ্চয়। ভালবাসতে হলে একদিনের পরিচয়েই ভালবাসতে পারা যায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হাজারটি ভাল-মন্দ বিচার করে আর সাবধানে যারা ভালবাসে, তারা সত্যই ভালবাসে বলে আমি মনে করি না।

অলকা—তবে আর তোমার মিছে কথা বলবার দরকার কী? এইসব সত্যি কথাই বলে দিও।

অশেষ—আমি তো বলে দিতে পারব। তারপর...।

অলকা—তারপর আমার আর ভাবনা কিসের? আমাকে শুধু একটু মাথা নেড়ে জানিয়ে দিতে হবে, হ্যাঁ, সবই সত্যি।

অশেষ—কিন্তু...।

অলকা—বাবা আর মা মনে মনে আশ্চর্য হলেও কিছু বলবেন বলে মনে হয় না। তাঁরা তাঁদের মেয়েকে বোকা বলে মনে করবেন না।

অশেষ—এটাই আশ্চর্য। পৃথিবীর সবচেয়ে একটা বোকা মেয়েকে কেমন করে যে তাঁরা এত বুদ্ধিমতী বলে মনে করে...।

অলকা—এর চেয়েও আশ্চর্য, বাবা আর মা দুজনেই তিলকাকে খুব বোকা বলে মনে করেন। কিন্তু আমি তো জানি...

অশেষ—কী?

অলকা—কি ভয়ানক বুদ্ধি আছে তিলকার বোকা-বোকা চোখ দুটোতে। সেদিন কি অদ্ভুতভাবে আমার আর তোমার মুখের দিকে বার বার তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল তিলকা!

অশেষ—কবে?

অলকা—সেই যে, রাত্রিবেলা তুমি যখন আমাদের বাড়িতে চা খেলে।

অশেষ—তবে তো বুঝতে হয় যে, শেষ পর্যন্ত তিলকারই সন্দেহের জয় হল।

অলকা—তাই তো দেখছি। কিন্তু...।

অশেষ—আবার কিন্তু কিসের?

অলকা—তিলকা যদি ভয়ানক কিছু জিজ্ঞেস করে?

অশেষ—কী জিজ্ঞেস করবে?

অলকা—যদি প্রশ্ন করে বসে, কেন ভালবাসা হল?

অশেষ—উত্তর দিও।

অলকা—উত্তর যে জানি না।

অশেষ—তবে তাই বলে দিও।

অলকা—কী বলব?

অশেষ—যা বুঝেছ, যা বিশ্বাস কর; তাই বলে দিও। কেন ভালবাসা হয় কেউ বলতে পারে না, বলা যায় না। কারণ ভালবাসার মধ্যে কোনও কেন নেই, কারণ নেই।

এ কী? গাড়িটা যে আলোর মালা দিয়ে সাজানো একটা ফটকের তীব্র উজ্জ্বল চেহারার পাশ কাটিয়ে হু-হু করে ছুটে আরও দূরের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই তো পুরনো বাগান স্ট্রিট। আর এই ফটকই যে এক নম্বর পুরনো বাগান স্ট্রিটের ত্রিদিববাবুর বাড়ির ফটক। ওখানেই যে থামবার কথা।

ট্যাক্সিটা যেখানে থামে, সেখানে চোখ-ধাঁধানো আলো নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকারও নেই। আলো-আঁধারে মেশামেশি হয়ে আছে, এইরকম একটা জায়গা। যেন একটা অভিসন্ধির ইচ্ছা আলো-আঁধার গায়ে জড়িয়ে চুপ করে রয়েছে।

ট্যাক্সিটা বিদায় নেবার পর, জায়গাটার নীরবতা যেন আরও গভীর একটা চক্রান্তের মত থমথম করে।

মনেও পড়ে অলকার; জায়গাটা অলকার অপরিচিত নয়। এই তো, আজই এই সড়কের এই আলো-আঁধারী কুহকের ভিতর থেকে অলকার জীবনটা যেন কিসের আহ্বানে কত দূরে চলে গিয়েছিল। কী মন নিয়ে যেতে হল, আর কি মন নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে? যে ছিল একজন অপরিচিত ভদ্রলোক মাত্র, সে এখন অলকার পাশে চিরকালের মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কী আশ্চর্য, এই রাত্রির মাত্র আর চারটি ঘণ্টা আগে পথের উপর ঠিক এখানে দাঁড়িয়ে এই অশেষ ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বার বার যার কথা মনে পড়েছিল, তারই কথা আবার মনে পড়ছে। মাত্র চার ঘণ্টা আগে যে ছিল এত সত্য; সে কি সত্যই এত মিথ্যে হয়ে গেল?

মিথ্যে হয়েই গিয়েছে মনে হয়। কিন্তু মনে হলেই কি বুঝতে হবে যে মনটা ঠিক সত্য বুঝতে পারছে? স্বপ্নের ঘোরে স্বপ্নের সব কিছুই যে সত্য বলে মনে হয়। নিশির ডাকের ছলনায় ঘর ছেড়ে যে চলে যায়, তার চোখে রাতের আকাশকে ভোরের আকাশ বলেই মনে হয়। কিন্তু এমন মনে হওয়া যে নিতান্ত একটা মিথ্যা।

অলকা হঠাৎ গম্ভীর স্বরে বলে—এখানে গাড়িটাকে থামালে কেন?
অশেষ—ভুল হয়েছে। বুঝতে পারিনি কখন বিয়ে বাড়ির ফটক পার হয়েছি।
অলকা—বিয়ে বাড়ির ফটক বিয়ে বাড়িতে থাকুক। আমার আর বিয়ে দেখে দরকার নেই। বাড়ি পৌঁছে যেতে পারলেই ভাল ছিল।
অশেষ—তবে চলো, তোমাকে বাড়িতেই পৌঁছে দিয়ে আসি।
অলকা—না।
অশেষ—তবে?
অলকা—আমি একাই বাড়ি চলে যাই। তুমি বরং...
অশেষ—কী?
অলকা—বিয়ে বাড়িতে গিয়ে বাবাকে বলে দাও, আমি বাড়ি ফিরে গিয়েছি।
অশেষ—তা বলে দিতে পারি। কিন্তু কেন?
অলকা—বলতে পারছি না। আমার কিছু ভাল লাগছে না।
অশেষ—মনে হচ্ছে, যা বলতে চাইছ, ঠিক সেটা বলতে পারছ না।
অলকা—তার মানে?
অশেষ—তার মানে, তোমার মনে আবার সেই ভয়ানক সন্দেহ দেখা দিয়েছে!
অলকা—সন্দেহ?
অশেষ—হ্যাঁ, তোমার সন্দেহ হচ্ছে, এই চার ঘণ্টার জীবনটা যেন একটা হঠাৎ খেয়ালের ভুল।
অলকা—আমি এতটা সন্দেহ করিনি, কিন্তু তোমার কথাতে তুমিই বুঝিয়ে দিচ্ছ যে, তোমার মনে এ সন্দেহ বেশ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।
অশেষ চমকে ওঠে—কী বললে?
অলকা—তুমি নিশ্চয়ই সন্দেহ করছ যে, এরকম খেয়ালের কাণ্ডকে ভালবাসা বলে না।
অশেষ—যদি বলি যে, হ্যাঁ, ভালবাসা বলে না, তবে কি তুমি...
অলকা—তবে মাপ করবে, আমাকে ভাবতে হবে।
অশেষ—কী ভাববে?
অলকা—ভুল করেছি কি না? পাপ করলাম কি না, নিজের ক্ষতি কিংবা তোমারও ক্ষতি করলাম কি না?
অশেষ—দয়া করে আমার ক্ষতির কথা ভেব না।
অলকা—ঠাট্টা করছ?
অশেষ—তুমি কী আমাকে শাস্তি দিচ্ছ?
অলকা—শাস্তি?
অশেষ—হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালবাসি জেনেও বার বার পুরনো কথা স্মরণ করে...।
অলকা—তুমি ভুল বলনি।
চেঁচিয়ে ওঠে অশেষ—তার মানে, সব ভুলে যেতে চাও?
অলকা—ভুলতে পারব কিনা জানি না।
অশেষ—কিন্তু আমার আপন হতে পারবে না, এই তো?
হয় হঠাৎ বধির হয়ে গিয়েছে অলকা, অশেষের কথাগুলি শুনতে পাচ্ছে না, নয়, হঠাৎ বোবা হয়ে গিয়েছে, উত্তর দেবার শক্তি নেই। কিংবা একটু দুঃসহ আতঙ্ক, ভুলের ভয় থেকে সাবধান হবার জন্য তৈরি হয়েছে। নয় তো আত্মঘৃণা, অশেষ ডাক্তার নামে এক ভদ্রলোকের ভালবাসার ছোঁয়াটাকে একটা দুর্বল মনের ভয়ানক লোভের ব্যভিচার বলে মনে করে প্রাণটা

শিউরে উঠছে। না না, কখনও না, ভালবাসা কখনও এরকম একটা একরাতের পাগলামি হতে পারে না।

—আমাকে ভাল মনে বিদায় দাও। বলতে গিয়ে অলকার গলার স্বর করুণ আর্তনাদের মত কেঁপে কেঁপে বেজে ওঠে।

অশেষ—বিদায় নেবে?

অলকা—হ্যাঁ।

অশেষ—তারপর?

অলকা—তারপর জানি না।

অশেষ—তুমি কী সুন্দর ফাঁকি দিতে জান অলকা!

অলকা—স্বীকার করছি।

অশেষ—আমাকে ফাঁকি ছাড়া আর কিছু দেবার উপায় নেই, কেমন?

ফুঁপিয়ে ওঠে অলকা—উপায় নেই।

অশেষ—সে সাহসও তোমার নেই।

অলকা—নেই অশেষবাবু।

অশেষ—সেই মমতাও নেই।

অলকা—আছে। আমি যেখানেই থাকি, তুমি কাছে এলে আমাকে এরকমই দেখতে পাবে। তোমাকে পর মনে করব না।

অশেষ—তার মানে, আমাকে চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে শুধু শাস্তি দেবে।

অলকা—শাস্তি?

· অশেষ—হ্যাঁ।

অলকা—শাস্তি কেন? কিসের শাস্তি?

অশেষ—যে শাস্তি এখন এখানেই দিচ্ছ। অন্তত এটুকুও বলতে পারছ না যে আমাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

অলকা—বলতে ভয় করে।

অশেষ—তবে তুমিও একটা শাস্তি স্বীকার করো।

আর্তনাদ করে ওঠে অলকা।—কী শাস্তি? বলো।

অশেষ—আজ তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাবার আগে...।

অলকা—বলো।

অশেষ—আর একবার তোমার হাত ধরব, আর তোমার কপালে...।

—উঃ, তুমি ভয়ানক নির্মম, ভয়ানক চালাক। অলকার বুক ঠেলে একটা যন্ত্রণাক্ত স্বর যেন উথলে উঠতে থাকে।—আমাকে বার বার দাগি করে দিয়ে তোমার লাভ কী অশেষবাবু? তার চেয়ে যে অনেক ভাল ছিল, যদি আমি...।

অশেষ—কী?

অলকা—তোমাকে এভাবে ঠকাবার আগে যদি মরে যেতে পারতাম।

রাস্তার ধারে সুন্দর একটু আলোছায়াময় নিভৃত। শাস্তি স্বীকার করে নেবার জন্যই অসহায়ের মত ছটফট করে একটা হাত এগিয়ে দেয় অলকা।

তারপর কপালের উপর একটা সিক্ত ও তপ্ত স্পর্শের অনুভব সহ্য করতে গিয়ে কাঁপতে থাকে অলকা। পরক্ষণেই কপালের উপর রুমাল চেপে আবার ফুঁপিয়ে ওঠে।—মানুষের এমন ক্ষতিও মানুষ করে?

অশেষ—কী ক্ষতি অলকা? এই সামান্য ক্ষতি রুমাল দিয়ে মুছে ফেললেই তো মিটে যায়?

অলকা—আর মুছে ফেলেই বা কী লাভ?

আস্তে আস্তে মাথা তুলে, অশেষের কানের কাছে যেন ফিস্‌ফিস্ করে অলকা— এই দাগই চিরকালের দাগ হয়ে থাকুক।

অলকার মূর্তিটা যেন একটা অসহায় স্তব্ধতা। আর বুকের ভিতরটা যেন একটা তন্দ্রার ভারে অলস ও শিথিল হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছা-অনিচ্ছার সংগ্রামে আহত একটা মেয়েলি আত্মা যেন মরণজালে ডুবতে গিয়ে হঠাৎ ভেসে উঠেছে আর সুস্থির হয়ে গিয়ে আকাশে চাঁদের উদয় দেখতে পেয়েছে।

অশেষ—সত্যি বলছ?

অলকা—হ্যাঁ। এই দান হারিয়ে ফেলতে আর চাই না, যে যাই মনে করুক।

অশেষ—কিন্তু...।

অলকা—শৈলেশ্বরের কথা বলছ?

অশেষ—হ্যাঁ, তোমার এই পাঁচ বছরের মনের কথা।

অলকা—সবই তো জান; তোমার কাছে কিছুই গোপন করিনি।

অশেষ—কিন্তু শৈলেশ্বর যে তোমাকে ভালবাসে, সেটা ভুলে যাবে কেমন করে?

অলকা—আমি ভুলে যেতে পারি। ভুলেই গেছি বোধ হয়! ভুলে যেতে যদি কষ্ট হয়, তবু সে কষ্ট স্বীকার করব। কারণ, উপায় নেই; তুমি না থাকলে যে আমার সব শূন্য। এইবার বলো, আমার এই দাগি মনের অন্যায়টাকে তুমি ভুলবে কেমন করে?

অশেষ—আমি তোমার আগেই ভুলে গিয়েছি। আমি জানতাম শৈলেশ্বরের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না।

অলকা—কেমন করে?

অশেষ হেসে ফেলে—শৈলেশ্বরের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

সামান্য একটু চমকে ওঠে অলকা। সেই সঙ্গে চোখের একটা ভ্রূকুটিও চমকে ওঠে। —কবে বিয়ে হল?

অশেষ—আজ।

অলকা—কোথায়?

অশেষ—এই ত্রিদিববাবুর বাড়িতে।

অলকা—কার সঙ্গে?

অশেষ—ত্রিদিববাবুর মেয়ের সঙ্গে।

অলকার ভ্রূকুটির মেঘ যেন এইবার একটা বিদ্যুতের মত হাসির ঝিলিক লেগে চূর্ণ হয়ে যায়।

অশেষ—হাসছ কেন অলকা?

অলকা—গল্পে পড়েছি, স্বাতী তারকা রাগ করে চোখের জল ফেলে, কিন্তু সেই জল ঝিনুকের বুকের ভিতরে গিয়ে মুক্তা হয়ে যায়।

অশেষ কী-যেন বলতে যায়; কিন্তু বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে অলকা—এইবার তোমার সঙ্গে একবার বিয়ে বাড়ির ভেতরে যাব। শৈলেশ্বরের চোখের সামনে একবার দাঁড়াব।

অশেষ—কেন?

অলকা—শৈলেশ্বর একবার দেখুক; দেখিয়ে দিতে চাই, তুমি আমার হাত ধরে রয়েছ।

অশেষ—কেন?

অলকা—আমার সৌভাগ্যের অহংকার আজ আর চেপে রাখবার সাধ্যি নেই।

অশেষ হাসে—চলো।

পুরনো বাগান স্ট্রিটের বিরাট এক নম্বর, ত্রিদিব সরকারের এই উৎসবাকুল বাড়িতে এরই মধ্যে দুই জায়গায় দুটো অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। এক জায়গায় একটা ভয়ের কান্না; আর এক জায়গায় একটা হতাশাভীরু অপমান।

বাসরঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বারান্দার এক কোণে আতঙ্কিতের মত কাঁপছে নমিতা, সেই সঙ্গে নমিতার গায়ের গয়নাগুলিও কাঁপছে। আর, নমিতার মা আতঙ্কিতের মত তাকিয়ে জিজ্ঞেস করছেন—আর কী বললে শৈলেশ্বর?

নমিতা—বলেছে, তোমার মত এই রকম একটা কচি বয়স আর তোমার বাবার মত এমন পয়সাওয়ালা একজন গুরুজন যখন পেয়েছি, তখন আমি সুখী হব নিশ্চয়।

আর এক জায়গায়, হলঘরের ভিতরে বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন মুখার্জিবাবু; এবং ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন ত্রিদিব সরকার।

মুখার্জি বলেন—না মশাই, আপনি ভয়ানক মিথ্যেবাদী। আপনার সঙ্গে আমার কোম্পানির পক্ষে আর কোনও সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়। চুলোয় যাক আপনার টেন্ডার।

এক নম্বর পুরনো বাগান স্ট্রিটের বিরাট বাড়িটার উৎসব যেন আতঙ্কে কেঁপে উঠেছে। চারদিকে একটা চাপা সোরগোল, যেন কতগুলি চাপা আর্তনাদের ছুটোছুটি। সোজা হেঁটে একেবারে বাসরঘরের খোলা দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় অলকা আর অশেষ।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে অলকা—কেমন আছেন?

চমকে উঠে, আতঙ্কিত চোরের মত তাকিয়ে থাকে অতি বিদ্বান আর অতি বড়লোক শৈলেশ্বর।

অলকার হাত ধরে আস্তে একটা টান দিয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা করে অশেষ—চলো অলকা।

গল্প

সুনিশ্চিতা

এই ট্রেনটা যাত্রা শুরু করে এখান থেকেই; তারপর গোমো হয়ে আর রামগড় হয়ে একেবারে ডিহরি-অন-শোন চলে যায়।

ধানবাদ রেল জংশনের নতুন প্ল্যাটফর্মের গা ঘেঁষে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনটা। একটা ফার্স্ট ক্লাস, একটা সেকেন্ড ক্লাস আর পাঁচটা থার্ড; সেই সঙ্গে গোটা দশেক গুডস্ ওয়াগন। ছোট্ট এই ট্রেন গোমোতে গিয়ে বড় ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে যায়।

ছোট্ট এই গোমো লিঙ্ক এখনও স্তব্ধ। এঞ্জিনটা এখনও লাগেনি। সকাল আটটা পনেরোতে ছাড়বে, এখন তো মাত্র সাতটা। কিন্তু এরই মধ্যে এসে গিয়েছে বিমলেন্দু। আজকের সকালের আকাশটা যেমন প্রসন্ন আর উজ্জ্বল, বিমলেন্দুর মুখটাও তেমনই; আজকের সূর্যোদয়ের সব আভা যেন বিমলেন্দুর মুখের উপর লুটিয়ে পড়েছে। সাতটা দিন ডিহরি-অন-শোনে কাটিয়ে দিয়ে তারপর কলকাতা চলে যাবে বিমলেন্দু।

শীতের সকাল; তবু কুয়াশার ঘোর তেমন কিছু নেই। প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়েই দেখা যায়, মিনিটে মিনিটে এক-একটা মোটরগাড়ি ছুটে এসে মোটর স্ট্যান্ডের কাছে থামছে। দিল্লি মেল বোধহয় এখনই এসে পড়বে।

বিমলেন্দুর সব জিনিসপত্র কামরাতে তুলে দিয়ে যারা দাঁড়িয়েছিল, বিমলেন্দুর অফিসের দুই বেয়ারা আর কেরানী দত্তবাবু, তারা হয়তো দাঁড়িয়েই থাকত, কিন্তু বিমলেন্দু বলে—আপনারা মিছিমিছি আর দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন দত্তবাবু? আপনারা যান।

আজ এখানে বিমলেন্দুর কাছাকাছি কেউ না থাকলেই ভাল। একলা হয়ে থাকতে চাইছে বিমলেন্দু। আজ আর কিছুক্ষণ পরে, ট্রেনের এই ফার্স্ট ক্লাস কামরার সামনে প্ল্যাটফর্মের উপরে যে সুন্দর একটা উৎসব দেখা দেবে, সে উৎসবের সঙ্গে কেরানী দত্তবাবু আর বেয়ারাদের কোনও সম্পর্ক নেই, কোন কাজও নেই।

থার্ড ক্লাস কামরাগুলি এরই মধ্যে যাত্রীতে ভরে গিয়েছে। সেকেন্ড ক্লাস কামরাতে সস্ত্রীক এক বৃদ্ধ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সাহেব উঠে বসেছেন। আর এই ফার্স্ট ক্লাসে শুধু বিমলেন্দু। কিন্তু ওটা আবার কেমন কামরা? ট্রেনটার শেষ প্রান্তে, গুডস্ ওয়াগনগুলোর শেষে, যেন ঝকঝকে তকতকে একটা সেলুন জোড়া-লেগে রয়েছে। রেলওয়ের কোন ভি. আই. পি. যাচ্ছেন বোধহয়। সেলুনের সামনে প্ল্যাটফর্মের উপর বাক্স বেডিং ও বাস্কেটের একটা ভিড় জমে রয়েছে! আব দুটো বুল-টেরিয়ারও আছে।

কিন্তু বুল-টেরিয়ারের গলার শিকল শক্ত করে ধরে দাঁড়িযে আছে যে চাপরাসীটা, তার সাজ কোন রেলওয়ে কর্তার চাপরাসীর সাজের মত নয়। খাকি চুস্ত-পাজামা আর খাকি-কোট, মাথায় একটা খাকি পাগড়ি; এই লোকটাকেও কোথাও যেন দেখেছে বিমলেন্দু।

মনে পড়েছে। লোকটা হল ডি. কে. রায়ের চাপরাসী। এই তো সাতদিন আগে দেখতে পেয়েছিল বিমলেন্দু, ধানবাদ আদালতের বারান্দায় দাঁড়িয়ে উকিলের সঙ্গে কথা বলছেন ডি. কে. রায়; আর এই চাপরাসীটা কাগজপত্রের মস্ত বড় একটা ফাইল হাতে নিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

বিমলেন্দু তার অফিসের কেরানী দত্তবাবুর কাছেই শুনেছে, ডি. কে. বায়ের বাবা হলেন এদিকের একজন কোল-কিং, কয়লা-রাজা। সুতরাং ডি. কে. রায়কে কোল-প্রিন্স বলতে হয়। দেখতে সুন্দর, বয়স অল্প, আর এরই মধ্যে ব্যবসার কাজে এত দক্ষ; প্রিন্স বললে বাড়িয়ে বলা হয় না।

কিন্তু কোথায় চললেন ডি. কে. রায়? শুনেছিল বিমলেন্দু, লয়াবাদের কাছে ভজুয়া কোলিয়ারি নামে একটা কোলিয়ারির উপর ইনজাংশন জারি করবার জন্য এখানে এসেছিলেন ডি. কে. রায়। ইনজাংশন জারি করা বোধহয় হয়ে গিয়েছে। তাই চলে যাচ্ছেন ডি. কে. রায়, বোধহয় করনপুরার দিকে। ওদিকেও নাকি ডি. কে. রায়ের দুটো খাদ আছে।

হীরাপুরে মাত্র একটা মাস ছিলেন ডি. কে. রায়। হীরাপুরে জীবনের সঙ্গে ডি. কে. রায়ের কোন সম্পর্ক নেই। একটি মাসের মধ্যে কোন সম্পর্ক হতেও পারে না। দেখেছে বিমলেন্দু, খুবই সাধারণ রকমের চেহারার একটা বাংলোতে ভাড়াটে হয়ে শুধু একটা মাস হীরাপুরে কাটিয়েছেন ডি. কে. রায়। নিরিবিলি জায়গাতে একেবারে নীরব একটা বাড়ি। শুধু ঐ উকিলবাবু ছাড়া আর কাউকে কোনদিন ডি. কে. রায়ের নিরিবিলি বাংলোর ফটকে দেখতে পায়নি বিমলেন্দু।

কিন্তু বিমলেন্দুর সঙ্গে হীরাপুরের সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্কটাই আর কিছুক্ষণ পরে এখানে একটা উৎসবের মত রূপ নিয়ে বিমলেন্দুর চোখের সামনে দেখা দেবে। আজ দু'বছর হলো বিমলেন্দু হীরাপুরে আছে। বিমলেন্দুও হীরাপুরে একটি বাংলো ভাড়া নিয়ে দুটো বছর পার করেছে।

রঙিন ফুলে আর লতাপাতায় ঘেরা একটা শৌখিন বাংলো। বিমলেন্দুর কাছে এই দু'বছরের জীবনটা যেন একটা মায়াময় তৃপ্তির জীবন, একটা গৌরবের রেকর্ড, একটা গর্বের ইতিহাস।

ডি. কে. রায়ের বাংলো একটা মাস ধরে হীরাপুরের তুচ্ছতার মধ্যে নিঝুম হয়ে দিন কাটিয়েছে; কিন্তু বিমলেন্দুর বাংলোর সে দুর্ভাগ্য হয়নি। ডি. কে. রায়ের বাংলোতে কোন ফুলই নেই; সুতরাং সেখানে ফুল নেবার আশায় কেউ ছুটে যেতে পারে না। যায়ওনি কেউ। কিন্তু বিমলেন্দুর বাংলোর ফুল নেবার জন্যে এই দু'বছর ধরে যেন একটা কাড়াকাড়ির উৎসব জেগে উঠেছিল।

কলকাতার যে কোম্পানির ইনস্পেকটিং অফিসার হয়ে বিমলেন্দুকে হীরাপুরে আসতে হয়েছে আর দুটো বছর থাকতে হয়েছে, সে কোম্পানির একটা ব্রাঞ্চ অফিস ধানবাদেও আছে। এটাও কয়লার এক কারবারী কোম্পানি। এ কোম্পানিরও তিনটে কোলিয়ারি ঝরিয়ার আশেপাশে আছে। আটশো টাকা মাইনে দেয় কোম্পানি, বাংলো-ভাড়া বাবদ আরও দুশো টাকা। বিমলেন্দুর একা জীবনটাকে শৌখিন করে সাজিয়ে রাখতে পেরেছে বিমলেন্দু।

আপাতত এখানকার কাজের দায় চুকে গিয়েছে। এখন কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। হয়তো এক-আধ বছর পরে কোম্পানির কাজে আবার আসতে হবে। কিন্তু আপাতত হীরাপুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হচ্ছে।

বিমলেন্দুকে বিদায় দেবার জন্য যে উৎসব আর কিছুক্ষণ পরে এই প্ল্যাটফর্মের এখানে রঙিন হাসি হাসবে সেটা কিন্তু বিদায়ের সংকেত হবে না। কোন সন্দেহ নেই, সেটা বিমলেন্দুর আশার জীবনে একটা আহ্বানের সংকেত হয়ে ধরা দেবে।

মনে হয় শুধু ধীরাই আসবে। আর কেউ আসবে না। না এসে থাকতে পারবেই বা কেন ধীরা? এই দু' বছরে ধীরার দুটো জন্মদিনের উৎসবে যার হাত থেকে সবচেয়ে সুন্দর ফুলের তোড়া উপহার পেয়েছে ধীরা, তার হাতে আজ একটি ফুলের তোড়া তুলে দিতে ভুলে যাবে, এমন ভুলো মনের মেয়ে নয় ধীরা। ধীরার চোখ দুটো এই দু' বছরে অন্তত দশবার বিমলেন্দুর মুখের দিকে নিবিড় হয়ে তাকিয়ে বিমলেন্দুর প্রাণটাকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে পেরেছে, কি আশা করছে ধীরা। ধীরাদের বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন খেয়ে চলে আসবার সময় নিজের কানেই শুনতে পেয়েছে বিমলেন্দু, ধীরার বাবা কার কাছে যেন বলছেন—চমৎকার ছেলে। বিমলেন্দুর মত যোগ্য ছেলে আমি আর দেখিনি।

সেই সন্ধ্যাটার কথাও কি ভোলা যায়? বাংলোর বারান্দায় আলো জ্বলছিল, একমনে বই পড়ছিল বিমলেন্দু। হঠাৎ ফটকের একটা পাল্লা যেন মিষ্টি হাসির শব্দ ছড়িয়ে দুলে উঠল। ফটক খুলছে ধীরা। আর কি অদ্ভুত হাসি হাসছে। কী চমৎকার সেজেছে ধীরা!

—আসতে অনুমতি করুন, তা না হলে এগিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছি না। আষাঢ়ে ঝরনার মত উচ্ছল স্বরে কথা বলে হেসে উঠল ধীরা।

—নির্ভয়ে আসুন—

কথাটা না বললেও চলত। কারণ দেখাই যাচ্ছে, ধীরা একেবারে নির্ভয় হয়ে গিয়েছে। একাই এসেছে ধীরা।

বিমলেন্দু বলে—আমি জানতাম, আপনি হঠাৎ একদিন এখানে আসবেন।

ধীরা—কেমন করে জানলেন?

বিমলেন্দু—তা বলবো না। কিন্তু আপনি এবার বলুন।

ধীরা—কি বলব?

বিমলেন্দু—আপনার ইচ্ছে ছিল কিনা, একদিন এখানে একা-একা এসে...।

ধীরার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ নিবিড় হয়ে যায়। ঠোঁটের ফুল্ল হাসিটাও যেন ফুল্ল অভিমানের মত কাঁপতে থাকে।—আমি তো আসবোই, যতদিন না আপনি বারণ করে দেন।

—ছিঃ, আমাকে কি আপনি একটা পাথর বলে ধারণা করেছেন?

—করি না। তাই তো আসতে পারলাম। কিন্তু আর বেশিক্ষণ নয়। যে-কথা বলতে এসেছি, আজ শুধু সেটাই বলে দিয়ে চলে যাব।

—বলুন।

—কাল আমরা সবাই মিলে তোপচাঁচি লেকে বেড়াতে যাচ্ছি। আপনার কি সময় হবে? যেতে পারবেন?

বিমলেন্দু হাসে—যেতে যখন ইচ্ছে করছে, তখন সময় করে নিতেই হবে।

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তোপচাঁচি লেকের আশেপাশে বেড়িয়ে, জলের উপর পরেশনাথ পাহাড়ের গম্ভীর ছায়াটার দিকে তাকিয়ে ধীরা আর বিমলেন্দুর প্রাণ দুটো বিনা রাখীতেই এক হয়ে গিয়ে যেন একরকমের স্বপ্ন দেখেছিল।

ধীরা বলে—তোপচাঁচির লেকের কথা আর ক'দিন মনে করে রাখতে পারবেন?

বিমলেন্দু—চিরকাল।

ধীরা বলে—চলুন এবার, সবাই এখন বোধহয় রওনা হবার জন্য তোড়জোড় করছে।

প্ল্যাটফর্মের উপর আস্তে আস্তে পায়চারি করে বিমলেন্দু; চোখ দুটো কিন্তু মাঝে মাঝে ছটফট করে ওঠে। ধীরা কি একবার না এসে থাকতে পারবে? অন্তত এটুকু জেনে নেবার জন্যেও তো আসবে, আর কতদিন পরে হীরাপুরে ফিরে আসবে বিমলেন্দু? ধীরা যে অপেক্ষায় থাকবে, সে সত্যটা তো চোখ দুটোকে আর একবার নিবিড় করে দিয়ে আর বিমলেন্দুর মুখের দিকে শুধু নীরবে তাকিয়ে থেকেই জানিয়ে দিতে পারে ধীরা।

থার্ড ক্লাসের কামরাগুলির ভেতরে ঠেলাঠেলি আর হুড়োহুড়ি বাড়ছে। চাওয়ালা চেঁচিয়ে হাঁক দিয়ে চলে যাচ্ছে।

এতক্ষণ ধরে শুধু ধীরার কথা ভাবলেও সন্দেহ হয় বিমলেন্দুর, হয়তো অতসীও আসবে।

হয়তো কেন? আসবেই অতসী। অতসী যে ধীরার মত অত সাবধানে আর হেঁয়ালি করে কথা বলে না। যা বলে তা স্পষ্ট করেই বলে দেয়। যা আশা করে তা একেবারে স্পষ্ট করেই আশা করে।

ধীরাদের সঙ্গে তোপচাঁচি লেক থেকে বেড়িয়ে এসে যখন বাংলোতে ফিরে বারান্দার উপর ক্লান্তভাবে বসে আর আলো নিভিয়ে দিয়ে সন্ধ্যা-আকাশের তারা দেখছিল বিমলেন্দু, ঠিক তখন জোরে গলা কেশে আর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিয়েছিলেন এক ভদ্রলোক, অতসীর বাবা সনাতনবাবু—বিমলেন্দুবাবু আছেন?

সনাতনবাবু বলেছিলেন—অতসী নিজেই আসতো। কিন্তু একটু লজ্জা পাচ্ছে বলেই নিজে আর এল না; আমিই এলাম। আপনাকে কাল সন্ধ্যাতে কষ্ট করে আমার ওখানে একবার যেতেই হবে।

—কেন?

—অতসীর মা-র অনুরোধ, আমাদের বাড়ির সবারই অনুরোধ, আপনি অন্তত একটা ঘণ্টা আমার ওখানে বসে অতসীর গান শুনবেন, আর একেবারে খেয়ে-দেয়ে ফিরবেন।

বিমলেন্দু—নববর্ষের সম্মেলনে গান গাইলেন যিনি, তিনিই কি...।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, অতসীই গান গেয়েছিল। তাহলে তো আপনি অতসীকে দেখেছেনও। যাই হোক, ইচ্ছে আছে আপনার পরিচয়টুকু একটু ভাল করে জেনে নেব। আপনার বাবা আছেন নিশ্চয়?

—আজ্ঞে না।

—মা?

—না।

—অভিভাবক বলতে তাহলে...

—গুরুজন বলতে একজন আছেন।

—কে?

—কাকিমা।

—তাহলেই হবে। মোটকথা, শুরুতে প্রস্তাবটা কোন গুরুজনের কাছেই করা নিয়ম। আচ্ছা, আজ তবে আসি বিমলেন্দু।

বুঝতে অসুবিধে নেই। কত স্পষ্ট করে কোন্ ইচ্ছের কথা বলে চলে গেলেন সনাতনবাবু।

কিন্তু কাকিমাকে চিঠি লিখে বিশেষ কোন ফল হবে না। কাকিমা নিজেই একেবারে স্পষ্ট করে বিমলেন্দুকে জানিয়ে দিয়েছেন, নিজেই দেখে-শুনে পছন্দ করে নিয়ে তারপর একটা খবর দিস বিমল। আমাকে দিয়ে আর খোঁজাখুঁজি করাসনি। আমি পারবো না; তাছাড়া আমার বুড়ো চোখের পছন্দের মেয়ে তোর মত ফ্যাশানের ছেলের চোখে ধরবে বলে মনে হয় না।

বিমলেন্দু হেসেছিল—পছন্দ যদি করি, তবে খবর পাবেন বৈকি। ঠিক সময়েই খবর দেব।

গান গাওয়া শেষ করেই অতসী হেসে উঠেছিল—বুঝতে পারছি, আপনার পছন্দ হল না।

চমকে ওঠে বিমলেন্দু—কি বললেন?

অতসী—আমার গানটা বোধহয় আপনার ভাল লাগলো না।

বিমলেন্দু—তাই বলুন।

অতসী হাসে—তাই তো বলেছি। আমাকে ভাল লাগল কি না, এ প্রশ্ন তো করিনি।

একদিনেরও পরিচয় নয়; তবু কোন মেয়ে যে এরকম কথা এত স্পষ্ট করে বলে দিতে পারে, কখনও কল্পনাও করতে পারেনি বিমলেন্দু। কিন্তু...মনে হচ্ছে, অতসী যেন বিমলেন্দুকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, অতসী দেখতে কত সুন্দর। অন্তত ধীরার চেয়ে অনেক সুন্দর। অতসীর স্পষ্ট কথাটা যেন স্পষ্ট একটা ঠাট্টা, বুঝিয়ে দিতে চায় বিমলেন্দুকে, অতসীকে ভাল লাগবে না, এমন সাধ্যি কারও হবে না; বিমলেন্দুরও না।

সাতটা দিনও পার হয়নি, অতসীও সে সন্ধ্যায় সেজেছিল; আর মিষ্টি সৌরভে যেন স্নান করে এসেছিল। আর নিজেদের গাড়িতেই এসেছিল।

একটা ফুলের তোড়া বিমলেন্দুর হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে হেসে ফেলেছিল অতসী। স্বীকার করুন, এরকম চমৎকার ফুলের তোড়া আর কারও কাছ থেকে পাননি। এই প্রথম পেলেন।

বিমলেন্দু—চমৎকার অচমৎকার কোন ফুলের তোড়াই পাইনি। আপনিই প্রথম দিলেন।

অতসী—প্রথম উপহারের মান রাখবেন।

বিমলেন্দু—নিশ্চয়। সেটা আপনার না বললেও চলত।

অতসী যেন ছোট্ট একটা ভ্রূভঙ্গী করে তাকায়।—বলুন তো শুনি, কেমন করে মান রাখবেন?

—কি বললেন?

—বলতে চাইছেন, এর চেয়েও ভাল একটা ফুলের তোড়া আমাকে প্রতিদান দেবেন; এই তো?

অতসীর ভ্রূভঙ্গীটা যেন তীব্র একটা শ্লেষের অভিমানিত ভঙ্গী। বোধহয় বলতে চাইছে অতসী, ওভাবে প্রতিদান সেরে দেওয়া যে একটা নিষ্ঠুরতা। অতসীর আশাকে এত সস্তা একটা ঘুষ দিলে সম্মানিত করা হবে না, অপমানিত করা হবে।

অফিস থেকে বাংলোতে ফেরবার পথে রোজই বিকালে অতসীর সঙ্গে একবার দেখা হয়ে যেত। ঠিক মুখোমুখি দেখা নয়; শুধু চোখের চকিত দেখা। অফিসের গাড়িটা নিজেই চালিয়ে বাংলোতে ফিরত বিমলেন্দু; ড্রাইভার পাশে বসে থাকত। মোদি সাহেবের বাড়ির ফটক পার হয়ে রাস্তার বাঁকে এসে ডান দিকে ঘুরতেই দেখা যেত, রাস্তার দু'পাশের দু'সারির করঞ্জ, পলাশ আর নিমের কোন একটি ছায়ার কাছে যেন আনমনা একটি রঙিন ছবি আস্তে আস্তে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খোঁপাটা চুড়ো করে বাঁধা; পায়ে নীল ভেলভেটের শ্লিপার, শাড়ির আঁচলটা বোধহয় একটু বেশি শিথিল আর বেশি লম্বা; তাই আঁচল দিয়ে কোমরটাকে শক্ত করে এক ফেরতা জড়িয়ে নিয়ে যেন মৃদুলতার একটা ছন্দিত ভঙ্গী হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওরই নাম অতসী। বিমলেন্দুর গাড়ির স্পিড যদিও একটুও মন্থর না হয়ে অতসীর সেই মৃদুল সুন্দরতার মূর্তিটার পাশ কাটিয়ে ছুটে চলে যায়, তবু বিমলেন্দুর চোখের সেই চকিত চাহনির উপর অতসীর চোখের চাহনিও যেন চকিত ছোঁয়ার মত একবার শুধু তাকিয়ে নিয়েই আবার সরে যায়। করঞ্জের মাথার উপর বিকেলের রোদে কাকের ঝাঁক লাফালাফি করছে, একমনে যেন তাই দেখতে থাকে অতসী।

মনে হয়েছিল, ঠিকই, এ শুধু চকিত ঘটনার দেখা। নিতান্ত আকস্মিকের খেলা। এই সময়টা অতসীর বেড়াতে বের হবার সময়, আর বিমলেন্দুর অফিস থেকে বাংলোতে ফেরবার সময়। কাজেই, এ দেখা নিতান্তই দুটি ঘটনার যোগফল। কিন্তু...এখনও সেদিনের স্মৃতি বিমলেন্দুর মনের এক কোণে যেন ঝলমল করছে। সেদিন বাংলোতে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল, সন্ধ্যারও অনেক পরে, রাত ন'টাও পার হয়ে গিয়েছিল, শীতের কুয়াশাতে মোদিসাহেবের এত বড় বাড়িটাও ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। বিমলেন্দুর গাড়িটা রাস্তার বাঁকে এসে একটু মন্থর হয়ে ডাইনে ঘুরতেই যেন আরও মন্থর হয়ে গেল। আর একটু হলে ব্রেক কষে গাড়িটাকে বোধহয় একেবারে স্তব্ধ করেই দিত বিমলেন্দু। নীল ফ্ল্যানেলের ওভারকোট গায়ে আর গলায় একটা পশমী মাফলার জড়ানো অতসী একটা ল্যাম্পপোস্টের কাছে, যেন আজকের কুয়াশার একটা বেদনার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ির গতি আরও মন্থর করে দিয়ে কথা বলে বিমলেন্দু—এ কি! আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন?

কি অদ্ভুত একটা ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে অতসীর চোখে। বিমলেন্দুর পাশে ড্রাইভার বসে আছে; দেখতে পেয়েও অতসী যেন কুয়াশাভরা রাতটাকে একটা নির্জন জগতের রাত বলে মনে করেছে। যেন জোর করে হাসতে চেষ্টা করে অতসী। মনে হয়, অতসীর ঐ অদ্ভুত ভ্রূকুটি যেন একটি অভিমান চাপা দেবার জন্য হাসতে চেষ্টা করছে। অতসী বলে—একজনকে দেখবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

বিমলেন্দু হাসে—দেখা পেলেন?

অতসী—জানি না।

অতসীদের বাড়িটা এখান থেকে দূরে নয়; ঐ তো, যে-বাড়িটার জানালার পর্দার রং লাল হয়ে কুয়াশার মধ্যে ফুটে রয়েছে, সেটাই অতসীদের বাড়ি।

বিমলেন্দু বলে—চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।

অতসী—তবে গাড়ি থেকে নামুন।

—কেন?

—গাড়ি চড়বার গরজ আমার নেই।

—বাড়ি যাবার গরজ তো আছে?

—আছে।

গাড়ি থেকে নামে বিমলেন্দু। ড্রাইভার গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে চলে যায়। কুয়াশায় ভরা রাতটা এখন সত্যিই একটা নির্জনতার জগতের রাত। এখানে বিমলেন্দু আর অতসী ছাড়া আর কেউ নেই।

বিমলেন্দু বলে—আজ অফিসে অনেক কাজ ছিল। যাই হোক, আসবার সময় একটা কথা বারবার মনে হচ্ছিল।

অতসী—কি?

বিমলেন্দু—মনে হচ্ছিল আজ আর আপনাকে দেখতে পাওয়া যাবে না।

—কেন?

—রাত ন'টা হয়ে গেছে; এ সময় তো কেউ বিকেলের হাওয়া খাওয়ার জন্যে বেড়াতে বের হয় না।

—আমি বিকেলের হাওয়ার জন্য বেড়াতে বের হই না। রাতের কুয়াশার জন্যেও না।

—তবে?

—জিজ্ঞেস করবেন না।

অতসীদের বাড়ির গেটের কাছে এসে পড়েছে বিমলেন্দু আর অতসী। এখানেও রাতের অন্ধকার আছে, কুয়াশা আছে; তবু বিমলেন্দু যেন অতসীর চোখ দুটোকে স্পষ্ট দেখতে পায়। বিমলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে অতসীর চোখের তারা দুটো ব্যাকুলতার তারার মত ঝিকঝিক করছে।

বিমলেন্দু বলে—আসি তবে।

অতসী—আসুন।

সেই অতসী কি আজ একবার এখানে এসে দেখা দিয়ে যাবে না? অতসী তো জানে, আজ সকাল আটটায় ট্রেন ছেড়ে যাবে। অতসীদের বাড়িতে গিয়ে সনাতনবাবুর সঙ্গে দেখা করে বিমলেন্দু তার হীরাপুরের জীবন থেকে বিদায় নেবার দুঃখটাকে জানিয়ে এসেছে।—কাল সকাল আটটায় হীরাপুর থেকে শুধু আমিই বিদায় নেব, কিন্তু আমার মনটা এখানেই পড়ে থাকবে।

না, ধীরা না আসুক, অতসী আসবে। ধীরা বোধহয় ভুল করে সবই ভুলে গেল। কিংবা, হয়তো ধীরার কপালের সেই একপেশে ব্যথাটা বেড়েছে, আর কপালে অডিকোলনের পটি লাগিয়ে একেবারে নিঝুম হয়ে ঘরে বসে আছে ধীরা।

যাই হোক, অতসীর তো না আসবার কোন কারণ থাকতে পারে না। হতে পারে অতসীদের গাড়িটা আজ হঠাৎ খারাপ হয়েছে। কিংবা ড্রাইভার আসেনি। কিংবা সনাতনবাবু হয়তো হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কে জানে এমন কোন্ ঘটনার বাধা দেখা দিয়েছে, যে জন্যে এখনও এখানে পৌঁছে যেতে পারলো না অতসী?

হীরাপুরের দু'বছরের জীবনের ঘটনাগুলি যেন একটা একটানা উৎসবের মত ঘটনা। আসবার আগে কোন সুস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি বিমলেন্দু, এখানে এসে এরকম এক-একটি প্রীতির আর আকুলতার লক্ষ্য হয়ে উঠবে বিমলেন্দু। হীরাপুরে এসে বিমলেন্দু যেন তার আত্মাটার গৌরব দু'চোখে দেখবার সুযোগ পেয়েছে। দেখিয়ে দিল ধীরা, দেখিয়ে দিল অতসী, দেখিয়ে দিল...হ্যাঁ, সুমনা কি জানে না যে, আজ হীরাপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছে বিমলেন্দু? জানে বইকি, মাসখানেক আগে যে নিজের হাতে চিঠি লিখে সুমনাকে জানিয়েছে বিমলেন্দু—আর একটি মাস পরে আমার 'স্বর্গ হতে বিদায়' নেবার লগ্নটি দেখা দেবে। আপনি বোধহয় শুনেছেন, এখন আপাতত আমাকে কলকাতার অফিসে ফিরে যেতে হবে।

হীরাপুরের দু' বছরের জীবনে মাঝে মাঝে শুধু একটি যে ঘটনা বিমলেন্দুকে বিরক্ত করেছে, সে-ঘটনার স্মৃতি মনের ভেতরে থাকলেও, সে স্মৃতিটাকে একটুও পছন্দ করে না বিমলেন্দু। তবু হঠাৎ মনে পড়ে যায়, কিন্তু একটুও আশ্চর্য বোধ করে না বিমলেন্দু। নিখিল সরকারের মত স্বার্থের মানুষ আজ এখানে এসে একবার দেখা দিয়ে যাবে, এটা কল্পনা করাই ভুল। লোকটার দরকার ছিল টাকা, বিমলেন্দুকে তাগিদ দিয়ে উত্যক্ত করেছে, সাহায্য পেয়েছে আর চলে গিয়েছে লোকটা। ব্যস্, তার কাজ হয়ে গেছে।

লোকটা নাকি ধানবাদ বাজারের একটা জুতোর দোকানে কেরানীর কাজ করে। লোকটা যেন বছরের বারো মাস বারো রকমের অভাব আর টানাটানির জ্বালায় ভুগছে।

—আপনি বার বার আমার কাছে এভাবে যখন-তখন সাহায্য চাইতে আসবেন না। স্পষ্ট করে একদিন বলেই দিয়েছিল বিমলেন্দু।

বার বার মানে অবশ্য তিন বার। প্রথম এসেছিল নিখিল সরকার, বিমলেন্দুর অফিসের বারান্দার সিঁড়ির উপর সারাবেলা দাঁড়িয়েছিল, আর বিমলেন্দুকে দেখতে পেয়েই আবেদন করেছিল—যদি কিছু না মনে করেন তবে, তবে আপনাকে একটু বিরক্ত করতে চাই।

বিমলেন্দু—বিরক্ত করুন তাহলে।

—আমার মেয়ে এই বছর প্রাইভেট আই-এ দেবে।

—আপনি কি করেন?

—আমি বোম্বে সু স্টোর্সে খাতা লিখি।

—বোম্বেতে?

—আজ্ঞে না, এখানে এই ধানবাদ বাজারে।

—ভাল কথা, আসুন তাহলে, আমি একটুও বিরক্ত হইনি।

—আজ্ঞে, কথাটা হলো, মেয়েটার জন্য কিছু বই কেনা দরকার। গোটা পঞ্চাশ টাকা পেলে...

—তাই বলুন।

পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিল বিমলেন্দু। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, বিমলেন্দুর মনটা খুবই অস্বস্তিতে ভরে গিয়েছিল। নিখিল সরকার নামে এই লোকটা যেন অদৃষ্টের একটা দুর্গতির ছবি দেখিয়ে দিয়ে গেল। দেখতে একটুও ভাল লাগে না। শুনতে খুবই খারাপ লাগে। নিখিলবাবু

যেন জীবনের যত রঙিন হাসি আর কলরবের, যত রঙ আর আলোর, যত ফুল আর ফলের, যত জ্যোৎস্না আর ফুরফুরে হাওয়ার একটা ভয়াল প্রতিবাদ। যেন পৃথিবীর সুখী মানুষের মনের কাছে নিষ্ঠুর একটা ঠাট্টাকে শব্দ করে শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে—আজ তুমি অফিসার হয়ে গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছ, কাল তুমি জুতোর দোকানের কেরানী হয়ে যেতে পার, তখন মেয়ের বইয়ের জন্য পরের কাছে হাত পাততে একটু লজ্জাবোধও করবে না।

মাস তিন-চার পরে আর একবার এসেছিল নিখিল সরকার।—আবার আপনাকে বিরক্ত না করে পারলাম না।

বিমলেন্দু—এবার আমি সত্যিই বিরক্ত হব।

নিখিল সরকার—মেয়েটার পরীক্ষার ফী-এর জন্য আরও ষাটটা টাকা না পেলে যে চলবে না স্যার। অনেক চেষ্টা করেও যোগাড় করতে পারলাম না। এখন আপনি যদি দয়া করে...।

ষাট টাকা নিখিল সরকারের হাতে তুলে দিয়ে বিমলেন্দু বলে—কিন্তু ...একটা কথা শুনুন। আর আমাকে বিরক্ত করবেন না।

কিন্তু আবার একদিন এলেন নিখিল সরকার।—পরীক্ষা দিতে মেয়েটাকে পাটনা যেতে হবে স্যার। কিছু টাকা দরকার। অন্তত চল্লিশটা টাকা পেলে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই।

—না, আর টাকা দিতে পারবো না।

চলেই যাচ্ছিল নিখিল সরকার। বিমলেন্দু বলে—দেখুন। এবারও টাকা দিচ্ছি, কিন্তু একটি শর্তে। আর আপনি কখ্‌খনো টাকা চাইতে আসবেন না।

—যে আজ্ঞে, আর আসবো না।

সেদিন টাকা নিয়ে চলে গেল যে লোকটা, সে লোকটা কি সত্যিই শোনেনি যে বিমলেন্দু আজ চলে যাবে? কালই তো অফিসঘরের কাজের মধ্যে জানালার দিকে একবার চোখ পড়তেই দেখতে পেয়েছিল বিমলেন্দু, নিখিল সরকার নামে সেই লোকটা ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে। ড্রাইভার নিশ্চয় বলে দিয়েছে—না, আজ আর দেখা হবে না; সাহেব খুব ব্যস্ত। কালই কলকাতায় চলে যাচ্ছেন সাহেব।

আজ এখানে এসে কোন স্বার্থের দাবির কথা নিয়ে বিমলেন্দুকে বিরক্ত করে যাবে, নিখিল সরকার নামে সে লোকটার মনে সে-কৃতজ্ঞতাটুকুও নেই। ওদের স্বভাবটা স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। যেমনই বুঝেছে যে বিরক্ত করে আর কোন ফল হবে না, টাকা পাওয়া যাবে না, অমনি সাবধান হয়ে গিয়েছে। আর, সব উপকারের কথা ভুলেও গিয়েছে।

কিন্তু সুমনা ভুলে যাবে কেন? সুমনা যে দেখে ধন্য হয়ে গিয়েছিল, বিমলেন্দু তার সেই উপহার, একজোড়া লাল গোলাপকে ব্যস্তভাবে তুলে নিয়ে নিজের বুকের ওপরে, তার মানে, জামার বুকপকেটের কাছে পিন দিয়ে এঁটে দিয়েই হেসে উঠেছিল। —আমার সকল কাঁটা ধন্য করে...।

সুমনাদের বাড়িতেও অন্তত চারবার চায়ের উৎসবে নিমন্ত্রণ পেয়েছে বিমলেন্দু। চায়ের আসরে এত লোক থাকতে বেছে বেছে বিমলেন্দুর চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সুমনা। এত লোক থাকতে শুধু বিমলেন্দুর সঙ্গেই কথা বলেছিল সুমনা। সুমনার জ্যাঠামশাই শশধরবাবু সেদিন মল্লিকসাহেবকে যে কথাটা বলেছিলেন, সে-কথাটা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল বিমলেন্দু।—কোন সন্দেহ নেই মিস্টার মল্লিক, বিমলেন্দু একটি আইডিয়্যাল ছেলে।

কোন সন্দেহ নেই, সুমনার স্বপ্নেরও আইডিয়্যাল মানুষ বিমলেন্দু। সুমনা নিজের মুখেই একদিন বিমলেন্দুর কাছে কথাটা বলেছে—আপনি যতদিন হীরাপুরে আছেন, আমিও হীরাপুরে ততদিন। আপনি যদি চলে যান...

—কি?

—আমিও তবে চলে যাব।

—কোথায়?

—দার্জিলিং-এ কাকার কাছে।

—কেন?

—কোন্ লজ্জায় এখানে আর পড়ে থাকবো? মানুষের চোখে একটা ঠাট্টার বস্তু হয়ে পড়ে থাকার জন্যে?

—কিন্তু আমি যদি হঠাৎ দার্জিলিং-এ গিয়ে আশ্রয় নিই, তবে?

—বাড়িয়ে বলবেন না। এত সৌভাগ্য আমার হবে না।

তাই তো মনে হয়, আর কেউ না আসুক, অন্তত সুমনা আজ একবার এখানে না এসে পারবে না। শশধরবাবুর সেদিনের কথাটার ঝঙ্কার যে এখনো বুকের ভিতরে শুনতে পাচ্ছে বিমলেন্দু—আইডিয়্যাল ছেলে। সুমনার চোখের নীরব সংকেতও কতবার জানিয়ে দিয়েছে, বিমলেন্দু যে সুমনার আশার জগতে একটা আনন্দের ঝঙ্কার হয়ে গিয়েছে। সুমনার যত প্রিয় উপন্যাস, যত হার্ডি থ্যাকারে আর জর্জ এলিঅট একটি-একটি করে নিজেই বিমলেন্দুর বাংলোতে এসে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে সুমনা। বই ফেরত নেবার জন্য আবার নিজেই এসেছে।

বিমলেন্দু আশ্চর্য হয়ে বলেছে—আপনি একটুও বিরক্ত বোধ করছেন না, এটাই আশ্চর্য।

—কিসের বিরক্ত?

—এই যে, এত খাটছেন, বই দিয়ে যাচ্ছেন, নিয়ে যাচ্ছেন।

—বলুন, আপনি বিরক্তি বোধ করছেন!

—চমৎকার বিরক্তি।

—ঠাট্টা করছেন?

—না।

—চিরকাল বিরক্ত করবো না, দুশ্চিন্তা করবেন না।

—চিরকাল বিরক্ত হতেই যে চাই।

সুমনা বলে—আস্তে কথা বলুন। পল্টু বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। এত ছেলেমানুষ নয় পল্টু যে, আপনার ভাষার মানেটাকে সন্দেহ করতে পারবে না।

—আপনি সন্দেহ করবেন না তো?

—আপনি যদি বলেন, তবে নিশ্চয় সন্দেহ করবো না।

—বলছি, সন্দেহ করবার কিছু নেই।

নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছিল যে-সুমনার আশা, সে-সুমনা আজ আসবে না, এ সন্দেহটাকে সহ্য করতে ইচ্ছে করে না। নিতান্ত অর্থহীন একটা সন্দেহ। আসবে বইকি। এখনও অনেক সময় আছে। ট্রেনের গায়ে এঞ্জিন এখনও লাগেনি। হতে পারে ওরা তিনজনে একসঙ্গেই আসবে—ধীরা, অতসী আর সুমনা।

ট্রেনের ঐ প্রান্তে, সেলুনের দরজার কাছে একটা ব্যস্ততা। ডি. কে. রায়ের জিনিসপত্র কামরায় উঠছে। আর ডি. কে. রায় নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছেন, বুল-টেরিয়ারের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে হাসছেন।

গার্ডের মূর্তি দেখা দিয়েছে, পার্শেল-ভ্যানের কাছে দাঁড়িয়ে কি-যেন দেখছেন গার্ড।

এঞ্জিন লেগেছে। প্ল্যাটফর্মের শোরগোল এবার বেশ একটু উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

আরে! ও কি ব্যাপার? একগাদা মুখর হাসির উৎসব ওখানে, ঠিক ডি. কে. রায়ের সেলুনের কাছে উদ্দাম হয়ে উঠেছে। হাসি, ফুল আর রঙিনতার হিল্লোল। ধীরার হাতে ফুল, অতসীর

হাতে ফুল, সুমনার হাতে ফুল। আর ডি. কে. রায় সেই অভ্যর্থনার উল্লাসের সামনে এক পরম বরেণ্য মূর্তির মত দাঁড়িয়ে হাসছেন। হাসছে হীরাপুরের এক হৃদয়েশ্বরের জয়ন্ত মূর্তি।

বিমলেন্দুর চোখ দুটো অপলক হয়ে শুধু দেখছে; কান দুটো যেন হিমাক্ত হয়েও শুধু শুনছে! তিনটি রঙিন আশার ব্যাকুলতা যেন প্রাণদানের জন্য ডি. কে. রায়ের মুখের সেই প্রসন্ন হাসির কাছে হুড়োহুড়ি করছে। কখন এল ওরা? একে-একে এসেছে, না একসঙ্গে? কিন্তু এলই যদি তবে ওখানে কেন? কিছুই বোধহয় বুঝতে পারছে না বিমলেন্দু। ট্রেনের এদিকে একটি ফার্স্ট ক্লাস কামরা, আর ওদিকে একটি শৌখীন সেলুন। এদিকে এক কোল-কোম্পানির একটি ভৃত্য, আর ওদিকে স্বয়ং একটি কোল-কোম্পানি—মাঝখানে যে বিপুল একটা ব্যবধান, বুঝতে পারছে না কেন বিমলেন্দু? তাই ভাবতে গিয়ে বার বার চমকে উঠছে বিমলেন্দুর হৃৎপিণ্ডটা; প্রশ্নটা একটা বোবা যন্ত্রণায় ছটফট করছে—কেন? কেন ধীরা, অতসী আর সুমনা ওখানে গিয়ে একেবারে পুষ্পিত উৎসর্গের মত লুটিয়ে পড়েছে? কবেই বা ওদের সঙ্গে ডি, কে. রায়ের দেখাসাক্ষাৎ হল? ডি. কে. রায়ের নীরব বাংলোটাকে যে অতি তুচ্ছ একটা শূন্যতার বাংলো বলে মনে হতো। ফুলের একটা টবও যে সেই বাংলোর বারান্দাতে ছিল না। সেই মানুষের কাছে আজ এত ফুল ব্যাকুল হয়ে দুলতে শুরু করলো কেন?

বিমলেন্দুর অবুঝ হৃৎপিণ্ডটা বোধহয় নিঝুম হয়ে গিয়েছে। আর ওদিকে না তাকিয়ে ভয়ানক এক আহত ভয়ানক অলস মানুষের মত আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে নেয় বিমলেন্দু; মাথা হেঁট করে প্ল্যাটফর্মের উপর পড়ে-থাকা একটা রুমালের দিকে তাকিয়ে থাকে। রুমালটাতে কুমকুমের দাগ লেগে রয়েছে। কে জানে কোন্ তরুণীর মন ভুল করে কিংবা হয়তো ইচ্ছে করেই তার কপালের কুমকুমের স্মৃতিটাকে এভাবে ধুলোর ওপর ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছে।

যাক্, ওদিকে আর তাকাবার কোন মানে হয় না। বিমলেন্দু যে-রকমের ভ্রমর, ওরাও সে-রকমের ফুল। ভালই হয়েছে। বিষে বিষক্ষয় হয়ে গেল। চমকে ওঠে বিমলেন্দু। ছোট্ট একটা ছেলের কণ্ঠস্বর। —আমরা এসেছি।

বিমলেন্দু—কে? তুমি কে?

বাবা কাল হাজারীবাগ গিয়েছেন, তাই আমরা এলাম।

—কে তোমার বাবা?

—নিখিলনাথ সরকার।

—অ্যাঁ?

—মা আমাদের পাঠিয়ে দিলেন। বাবা থাকলে নিজেই আসতেন।

—কেন?

—আপনার জন্য খাবার তৈরি করে দিয়েছেন মা।

কিন্তু কই? ছেলেটার হাতে তো কোন খাবারের ঠোঙা-টোঙা নেই। হ্যাঁ, ল্যাম্প-পোস্টটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে যে, তার হাতে সত্যিই ছোট একটা খাবারের হাঁড়ি; বড় একটা রুমাল দিয়ে বাঁধা।

ছেলেটা বলে—আমি আর আমার দিদি এসেছি।

এইবার ছেলেটার দিদিই এগিয়ে আসে, একটা লজ্জাভীরু খুশির মূর্তির মত যেন ভয়ে ভয়ে হাসে আর কথা বলে—আপনি চলে যাচ্ছেন শুনে আপনাকে জানাতে এলাম...।

বিমলেন্দু—কি?

—আমি পাস করেছি। মা বললেন, খবরটা আপনাকে দেওয়া উচিত।

—কেন?

—আপনি সাহায্য করেছিলেন বলেই তো...।

বিমলেন্দুর চোখ দুটো চমকে ওঠে; যেন বুকের ভিতর থেকে একটা বিস্ময় উথলে উঠে দু'চোখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। বিমলেন্দু হাসে—বুঝলাম, আপনারা দু'জন হলেন নিখিলবাবুর মেয়ে আর ছেলে। অর্থাৎ, দিদি আর ভাই; কিন্তু দিদির নামটা কি তার ভাইটির নামটাই বা কি?

—আমি মীরা, ভাই হলো বলাই।

—বেশ; দিন তাহলে, কি খাবার এনেছেন।

মীরার হাত থেকে খাবারের হাঁড়িটা তুলে নিয়ে কামরার ভিতর রেখে আসে বিমলেন্দু। —আচ্ছা, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভাল হলো। নিখিলবাবুকে আমার নমস্কার জানাবেন।

কী অদ্ভুত কাণ্ড! নিখিলবাবুর মেয়ের চোখদুটো যেন হঠাৎ জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়ে অদ্ভুত রকমের হয়ে গিয়েছে। এতক্ষণ বিমলেন্দুর মুখের দিকে তাকাতে যে-মেয়ের চোখ দুটো ভীরু ফুলের কুঁড়ির মত গুটিয়ে একেবারে এইটুকু হয়ে গিয়েছিল, সেই চোখ দুটো যেন নতুন বাতাসের সাড়া পেয়ে ফুটে উঠেছে, টানা-টানা সুন্দর একজোড়া কালো চোখ।

নিখিলবাবুর মেয়ের বয়স কত হবে? ধীরা, অতসী কিংবা সুমনার চেয়ে বড়-জোর এক-দুই বছরের ছোট হবে। এমন কিছু ছোট নয়। তবে তার চোখে এত ভীরুতা কেন? আর হঠাৎ এত বেশি বিস্ময়ই বা কেন?

বিমলেন্দু বলে—আই-এ পাস করলেন। তারপর? এখন বি. এ. পড়বেন নিশ্চয়?

—না।

—কেন?

উত্তর দেয় না মীরা। আজ মীরার এই নিরুত্তর মূর্তিটার দিকে তাকাতে গিয়ে বিমলেন্দুর চোখ দুটো যেন লোভীর মত অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মীরার পায়ে রবারের চটি, তাও এক জায়গায় কেমন ছেঁড়া-ছেঁড়া বলে মনে হয়। কিন্তু মীরার গায়ের শাড়িটা চমৎকার। সস্তার একটা ছাপা শাড়ি বটে; কিন্তু শাড়ির জমির রংটা হালকা সবুজ, তার উপরে যেন কুচো কুচো জবার কুঁড়ি ছিটানো। আঁচলটাতে শুধু ঘন লালের মোটা মোটা টান আঁকা।

বিমলেন্দু বলে—আপনি বি. এ. পড়ুন। এ বিষয়ে আপনার বাবাকে আমি চিঠি দেব।

উত্তর দেয় না মীরা।

বিমলেন্দু বলে—আমি আবার আসবো।

—কবে? প্রশ্ন করতে গিয়ে মীরা সরকারের এতক্ষণের শান্ত চোখ দুটো ঝিক করে হেসে ওঠে।

বিমলেন্দু—দেখি কবে আসতে পারি। আসবার আগে অবিশ্যি চিঠি দেব।

চমকে ওঠে মীরা। বিমলেন্দু বলে—হ্যাঁ, কিন্তু এসেই যেন দেখতে পাই...।

মীরা—বলুন।

বিমলেন্দু—যেন দেখতে পাই...।

কি-যেন বলতে চায় বিমলেন্দু। চেষ্টা করে নয়, যেন বুকের ভিতর থেকে একটা আশার উল্লাস আপনি উথলে উঠতে চাইছে। কিন্তু বলতে গিয়ে ভাষা হারিয়ে ফেলেছে বিমলেন্দু।

মীরা বলে—তাহলে আমরা এখন যাই।

বিমলেন্দু—ট্রেন ছাড়ুক, তারপর...!

মীরা—না।

বিমলেন্দু—কেন?

উত্তর দেয় না মীরা।

বিমলেন্দু দু'পা এগিয়ে গিয়ে নিখিল সরকারের মেয়ের ছায়ার কাছে এসে দাঁড়ায়—বলতে পারছ না কেন মীরা, কিসের লজ্জা? ভয়ই বা কিসের?

মীরার ভয়ের মনটাকে যেন বিস্ময়ে ভরে দিয়েছে বিমলেন্দু। যেন আপনজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে মীরা। মীরা বলে—কাউকে চলে যেতে দেখলে আমার খুব খারাপ লাগে; সে যে-ই হোক না কেন?

বিমলেন্দু হেসে ফেলে—তাই বল। কিন্তু...

বিমলেন্দুর বুকের ভেতর যেন নিশ্চিন্ত হয়ে একটা আকাশ হেসে উঠেছে, সে আকাশে একটা জয়পতাকা উড়ছে। হীরাপুরে এসে ভুল করেনি, অপমানিত হয়নি, বিদ্রূপ করেনি কোন অভিশাপ। ভাগ্যের শুধু চোখ দুটো কড়া আলোর দিকে তাকাতে গিয়ে ধাঁধিয়ে গিয়েছিল।

ট্রেন ছাড়তে বোধহয় আর পাঁচ মিনিটও বাকি নেই। ওদিকের উৎসবের নাটকে ড্রপ সিন পড়ল কি?

চোখ তুলে তাকায় বিমলেন্দু। ওঃ, নাটকের শেষ অঙ্কটা যে এত নিদারুণ হবে, কল্পনাও করতে পারেনি বিমলেন্দু। সেলুনের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছেন ডি. কে. রায়। ধীরা, অতসী আর সুমনা, তিনজনের তিনটি হাত একসঙ্গে ব্যগ্র হয়ে ফুলের তোড়া তুলে ধরেছে; আশ্বাসলোলুপ তিনটে রঙিন পিপাসা যেন মরিয়া হয়ে ডি. কে. রায়ের করুণার কাছে মাথা খুঁড়তে চাইছে। দেখা যাক, দুই চোখ অপলক করে তাকিয়ে থাকে বিমলেন্দু, কাকে আশ্বস্ত করে সুখী হবে ডি. কে. রায়ের চোখের হাসি। কার হাত থেকে ফুলের তোড়া তুলে নেবে ডি. কে. রায়! দেখা যাক, সৌভাগ্যের চাঁদ কার কপালে টিপ পরিয়ে দেয়।

ডি. কে. রায় ডাক দিলেন—চাপরাসী!

চাপরাসী এগিয়ে যায়—হুজুর!

ডি. কে. রায়—এই তিনটে ফুলের তোড়া নিয়ে সেলুনের ভেতরে রেখে দাও।

হাতে পাতে চাপরাসী। তিনটে ফুলের তোড়া তিনটি হাতের মুঠো থেকে ঝুপ ঝুপ করে চাপরাসীর হাতের উপর খসে পড়ে।

ধীরা, অতসী আর সুমনা, তিনটি রঙিন ফানুষের প্রাণ যেন একটা ঝড়ের হাতের চড় খেয়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়েছে। ট্রেনের ঐ প্রান্ত থেকে এই প্রান্তের দিকে তাকিয়েছে তিনটে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

বিমলেন্দু ব্যস্ত হয়ে ডাকে—কুলি, কুলি!

মীরার দুই চোখ যেন হঠাৎ আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে ঝাপসা হয়ে যায়। বিমলেন্দু বলে—আমি চলে যাচ্ছি না মীরা। আমি নেমে যাচ্ছি। আমি যাব না।

—কেন? আরও আতঙ্কিত একটা বিস্ময়ের আর্তনাদের মত মীরার প্রশ্নটা করুণ হয়ে কেঁপে ওঠে।

ফার্স্ট ক্লাসের কামরার ভিতর থেকে বিমলেন্দুর যত জিনিসপত্র ঝটপট নামিয়ে ফেলেছে কুলিরা।

বিমলেন্দু বলে—তোমার বাবার সঙ্গে দেখা না করে আমি যাব না। তাই নেমে পড়লাম।

যেন একটা ক্লান্ত হাসির মিছিল, ধীরা, অতসী আর সুমনা যখন আস্তে আস্তে হেঁটে ট্রেনের এই প্রান্তে এসে বিমলেন্দুর ছায়ার কাছে থমকে দাঁড়ায়, তখন ট্রেনের গার্ড হুইসেল দিয়েছে, ফ্ল্যাগ দুলিয়েছে।

ধীরা চেঁচিয়ে ওঠে—আপনার ট্রেন যে ছেড়ে যাচ্ছে।

বিমলেন্দু—যাক না।

অতসী—আপনার জিনিসপত্র যে এখনও এখানেই পড়ে আছে।

বিমলেন্দু—থাকুক না।

সুমনা—আপনি যাবেন না মনে হচ্ছে।

বিমলেন্দু—তাই তো মনে হচ্ছে।

ধীরা হাসে—ব্যাপারটা কি?

অতসী হাসে—রহস্য বলে মনে হচ্ছে।

সুমনা হাসে—অদ্ভুত রহস্য।

ধীরা, অতসী আর সুমনার তিন জোড়া চোখ এইবার তীব্র হয়ে নিখিল সরকারের মেয়ের মুখটাকে যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে বিমলেন্দু—ইনিই হলেন রহস্য, নিখিলবাবুর মেয়ে মীরা।

ধীরা—তার মানে?

বিমলেন্দু—তার মানে, মীরাকে একেবারে সঙ্গে নিয়েই কলকাতায় ফিরবো।

অতসী—কি বললেন?

বিমলেন্দু—বিয়েটা হীরাপুরেই হবে।

সুমনা—তবে তো, বেশ অদ্ভুত কাণ্ডই হবে।

বিমলেন্দু—হ্যাঁ, অন্তত আপনাদের তিনজনকে নিমন্ত্রণ করতেই হবে।

শ্মশানচাঁপা

পৌষের সেই শেষ রাতে, কুশ ঘাসে ছাওয়া মাঠের বুকজোড়া কুয়াশার ভিতর দিয়ে একটা নতুন সাহসের সুখে হনহন করে পা চালিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

মাত্র এই দিন তিনেক হলো আমরা এই টাউনের নতুন একটা বান্ধব সমিতি হয়ে উঠেছি। যিনি আমাদের এই ক'জনকে নিয়ে এই সমিতি গড়েছেন, তিনি অবশ্য আমাদের মত জুনিয়র নন। তিনি হলেন মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার কাঞ্চনবাবু, আমাদের ফুটবলের নেতা, ভোলাদা যাঁকে কাঞ্চনকাকা বলে ডাকেন, তিনি।

কাঞ্চনকাকা হলেন সমিতির প্রেসিডেন্ট, আর পেট্রন হলেন সেই কুমারসাহেব, তিনপাহাড় রাজ এস্টেটের কুমারসাহেব, টাউনের কাছে মধুপুর রোডের ধারে এক নিরালায় যাঁর বাগানবাড়ি।

মানুষের উপকারের কাজ করছি আমরা, তবে মরা মানুষের উপকার। আমাদের কাঁধের উপর মচমচ শব্দে কাঁচা কাঠের একটা খাটিয়া দুলছে, আর সেই সঙ্গে খাটিয়ার উপর নড়বড় করে দুলছে তহবিল তছরুপের মামলার আসামী উমেশপ্রসাদের কাঁটা-ছেঁড়া শবের মাথা আর হাত-পা। হাজতের ভিতরে আত্মহত্যা করেছে উমেশপ্রসাদ।

মাঠের ঢালু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ছোট নদীটা এখানে এসে বেশ একটু চওড়া হয়েছে। নদীর বুকে অন্ধকারে ঢাকা বালিয়াড়ির উপর এখানে ওখানে যেন জ্বলন্ত রক্ত ছিটানো রয়েছে। বাঁশবনের গা-ভাঙা কটকট শব্দগুলি একটা মাথা-পাগলা হাওয়ার ঝড়ে হঠাৎ এক-একবার ছুটে আসছে, আর নদীর আধহাঁটু জলের পাশে বালিয়াড়ির উপর দপ করে ঝলসে উঠছে জ্বলন্ত অঙ্গার। পৌষের শেষ রাতের কুয়াশা যেন ভয়ে ভয়ে অসহায়ের মত সেই নিবু-নিবু চিতারই হাসির জ্বালায় পুড়ছে। এ কেমন একটা জগতের কাছে এসে পড়েছি?

ভোলাদা বললেন—ওই তো শ্মশান।

শ্মশানের চেহারার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়ের ভয় হয়তো সত্যিই আরও ভয়াল হয়ে উঠতো, কিন্তু কাঞ্চনকাকা আমাদের মনগুলিকে সেই সুযোগই দিলেন না। জ্বলন্ত অঙ্গার ছড়ানো সেই শ্মশানের বুকের দিকে তাকিয়ে আমাদের পিছনে আস্তে আস্তে চলতে চলতে কাঞ্চনকাকা বললেন—আমাদের এই বান্ধব সমিতিটা যদি ঠিক থাকে, যদি আর একটু জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারি, আর টাকার দিক দিয়ে যদি কুমারসাহেবের ব্যাকিং পাই, তবে মিউনিসিপ্যালিটির আসছে ইলেক্‌শনের পর সুধাসিন্ধুকে আর চেয়ারম্যান থাকতে হবে না। আমিই হব চেয়ারম্যান, বুঝলে ভোলা?

হঠাৎ কাঞ্চনকাকা একটা হাঁক দিলেন—এইবার ডাইনে ঘুরে ঐ আপিস-ঘরের কাছে দাঁড়াও।

আগে কল্পনাও করতে পারিনি যে, এহেন একটা অদ্ভুত জায়গাতে, যেখানে শুধু মানুষের চেহারা পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সেখানে একটা আপিস-ঘর থাকতে পারে, আর সেই আপিস-ঘরের ভিতরে টেবিলের পাশে একটা জলজ্যান্ত মানুষ বুকের কাছে মস্ত একটা রেজিস্টার খাতা আর হাতের কাছে একটা কলম নিয়ে বসে থাকতে পারে।

আমাদের হাঁপ-ধরা গলা থেকে একটা ক্লান্ত 'হরিবোল' আপিস-ঘরের দরজার কাছে বেজে উঠতেই ভিতরের টেবিলের উপর লণ্ঠনের কালিমাখা আলোর পিছনে হঠাৎ চমকে উঠলো একটা আবছায়াময় মাথা, আর একজোড়া ধোঁয়াটে চোখ।

লণ্ঠনের আলো একটুখানি উসকে দিয়ে আর মুখ তুলে লোকটা আমাদের দিকে তাকালো। ভোলাদা আস্তে আস্তে আমাদের কানের কাছে বললেন—ঐ, ঐ লোকটাই হলো ঘাটবাবু, চব্বিশ ঘণ্টা যার ডিউটি, আর মাইনে হলো বাইশ টাকা সাত আনা।

—লোকটা কেমন যেন। ভোলাদা আবার ফিসফিস করে বললেন। এর আগে অন্তত বার দশেক এখানে এসেছেন ভোলাদা। দেখেছেন ভোলাদা, লোকটা ঘুমোয় না। দিন হোক, আর রাত হোক, লোকটা ঠিক অমনি একজোড়া জাগা চোখ নিয়ে চুপ করে বসে থাকে, কোন্ দিকে আর কিসের দিকে যে তাকিয়ে আছে, দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

ঘাটবাবুর মুখটা ভালো করে দেখবার জন্য আমরা চোখ বড় করে তাকিয়ে রইলাম। বয়সে লোকটাকে ভোলাদার চেয়ে অনেক বড় বলে মনে হল, বোধ হয় তিরিশেরও বেশি। শরীরটা শুকনো আর চিমড়ে, কিন্তু মুখটা সে-রকম নয়।

ভোলাদা বললেন—আমার বিশ্বাস, লোকটা জেগে জেগেই...।

কথাটা আর শেষ করলেন না ভোলাদা। আপিস-ঘরের টেবিলের কাছে তেমনি করে বসে আস্তে আস্তে একবার কেশে নিয়ে ঘাটবাবু গম্ভীর স্বরে বলে—পাশের ঐ রেস্ট-ঘরের ভিতর গিয়ে মড়া নামিয়ে রাখুন।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পিছন থেকে গা-ঘেঁষা অন্ধকারটা যেন ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। চেঁচিয়ে উঠেছেন কাঞ্চনকাকা—কি হে ঘাট, খুব ভাল ডিউটি দিচ্ছ দেখছি। বলি, এরকম হুকুম করে কথা বলতে শিখলে কবে?

সঙ্গে সঙ্গে কালিমাখা লণ্ঠনের আলোর পিছনে যেন কুঁকড়ে গেল ঘাটবাবুর অদ্ভুত চেহারাটা। সত্যি, কাঞ্চনকাকার পার্সোনালিটি আছে, নইলে টাউনের একটা মানুষের ধমকে এইরকম ভয়ানক ছাই অঙ্গার আর ধোঁয়ার আত্মাটাও ভয়ে কুঁকড়ে যাবে কেন? যাই হোক, টিনের একটা শেডের ভিতরে ঢুকে আমরা খাটিয়া নামিয়ে রাখলাম।

পাশাপাশি দুটি টিনের শেড, মাঝখানে জ্বালানি কাঠের একটা ছোটখাট পাহাড়। যত শাল কেঁদ আর কুলগাছের টেরা-বাঁকা আর গাঁটভরা টুকরো যেন কতগুলি শক্ত-শক্ত কনুই কব্জি হাঁটু আর গোড়ালির স্তূপ।

কি আশ্চর্য, শেডের কাছে একটা চাঁপাগাছও যে রয়েছে দেখছি। এখানেও তাহলে চাঁপা ফোটে? কাঞ্চনকাকা বললেন—না হে না, গাছটা আছে এই মাত্র, ফুল ধরে না।

—রাম! ও রাম! পাশের শেডের আপিস-ঘরের ভিতর থেকে কে যেন ধরা-গলায় আস্তে আস্তে ডাকছে। ভয়ে ভয়ে রাম রাম করছে নাকি কেউ?

হাসলেন কাঞ্চনকাকা। —ডোমটার ঘুম ভাঙাচ্ছে ঘাট। যে ডোমটা চিতা সাজায়, তার আসল নাম হল ভালুয়া। কিন্তু টাউনের লোকে ওকে রাম নাম দিয়েছে।

—কেন কাঞ্চনকাকা?

—ভয়ে, ভয় তাড়াবার জন্য। রাম নাম শুনে শ্মশানের ভূত-প্রেত দূরে সরে যায়।

আশ্চর্য, ধরা-গলায় আর ভয়ে ভয়ে রাম নাম করে পাঁচ বছর ধরে এই ভূত-প্রেতের রাজ্যে পড়ে আছে লোকটা, ঐ ঘাটবাবু!

কাঞ্চনকাকা বলেন—যাবে কোন্ চুলোয়? আর ও বেটাও তো একটা...আমার কেমন সন্দেহ হয় যে...।

হঠাৎ কথাটা থামিয়ে কাঞ্চনকাকা অন্য একটা অদ্ভুত কথা বলে ফেললেন। —আসল কথা হলো, লোকটার জন্মেরই কোন ঠিক নেই।

তারপরে একটা গল্পই বলে ফেললেন কাঞ্চনকাকা—লোকটা কোথা থেকে একদিন টাউনে এসে জুটলো। ভদ্রলোকদের মেসে বেশ ভদ্রলোকের মতই থাকে, আর চাকরির চেষ্টা করে। ক'দিনের মধ্যে জুটিয়েও ফেলল একটা চাকরি। রাধু সাহার অত বড় কাপড়ের দোকানের ম্যানেজার হলো একটা নতুন লোক, শুনেই কেমন যেন একটা খট্‌কা লাগল আমার মনে। সোজা রাধুর দোকানে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করলাম লোকটাকে।

রাধু সাহার দোকানে, গণেশের মূর্তির পাশে বসেছিল নতুন ম্যানেজার। কাঞ্চনকাকা লোকটার একেবারে সামনে এসে সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—আপনার পিতার নাম?

প্রশ্ন শুনে হঠাৎ চমকে উঠে বোবার মত তাকিয়ে রইল লোকটা, তার পরেই পিতার নাম বললো।

কিন্তু রেহাই দিলেন না কাঞ্চনকাকা। একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন ছুঁড়লেন। —বাঁকুড়া জেলা না হয় হলো, কোন্ গাঁ? কোন্ থানা? মামাবাড়ি কোথায়? মামার নাম কি? বাপ বেঁচে নেই, বেশ তো, কাকাদের নামগুলি বলুন।

চেঁচিয়ে ধমক দিয়ে লোকটার বুকে ধড়ফড়ানি তুলে কাঞ্চনকাকা আবার প্রশ্ন করলেন—ব্রাহ্মণ যখন, তখন স্পষ্ট করে বলেই ফেলুন না, আপনার গোত্র কি? কোন্ গাঁই আর কোন্ মেল?

কোন উত্তর দিল না লোকটা। দেখেশুনে রাধু সাহাও অবাক হয়ে গেল। গণেশের মূর্তির প্রায় গা ঘেঁষে বসে আছে এই কেমন একটা অমানুষ!

লোকটাও হঠাৎ ছটফট করে একটা লাফ দিয়ে গদি থেকে উঠে দোকানের সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালো; তারপর প্রায় একটা দৌড় দিয়ে চলে গেল।

গল্প শেষ করে কাঞ্চনকাকা বললেন—কিন্তু তবু ঠিক চলে গেল না। কি অদ্ভুত জেদ। কবে আর কেমন করে বেকুব চেয়ারম্যান সুধাসিন্ধুর মন ভুলিয়ে লোকটা আবার একটা কাজ জুটিয়ে নিল, আমি জানতেই পাইনি। একদিন এই শ্মশানে এসে দেখি, সেই লোকটাই রেজিস্টার খাতা নিয়ে কাজ করছে।

এইবার শক্ত গলায় কাশলেন কাঞ্চনকাকা।—বেটা এখানে এসেও বদমায়েশী শুরু করলো।

—অ্যাঁ, বদমায়েশী?

হ্যাঁ, থানা থেকে কমপ্লেন পেয়ে আমিই একদিন এখানে এসে রেজিস্টার খাতা চেক করলাম। দেখলাম, হ্যাঁ কমপ্লেন মিথ্যে নয়। লোকটা মৃতের বাপের নাম গোলমাল করে দেয়। ত্রিবেদীমশাই-এর মৃত ছেলের নামের পাশে বাপের নাম লিখছে, অমুক রায়।

ভোলাদা—ভুল করে নিশ্চয়।

রাগ করেন কাঞ্চনকাকা—তুমিও যে সুধাসিন্ধুর মত কথা বলছ ভোলা। ভুল করে নয়, ইচ্ছা করেই এই কাণ্ড করতো লোকটা। তারপরেও দেখেছি, আরও অনেকগুলি নামের ঐ দশা করে ছেড়েছে। আমি ওকে তাড়িয়ে ছাড়ব।

ভোলাদা—তাড়িয়ে লাভ কি কাঞ্চনকাকা?

কাঞ্চনকাকা—লাভ আছে বৈকি।

ভোর হয়ে আসছে। বাঁশবনের কট্‌কট্ থেমেছে, পাখি ডাকছে, নদীর জল দেখা যাচ্ছে। কাঞ্চনকাকা বললেন—তাছাড়া এটা শ্মশান, এটাও একটা পবিত্র স্থান, এখানে ঐ রকম একটা ইয়েকে থাকতে দেওয়া উচিত নয়।

ভোলাদা বলেন—আমার কেমন বিশ্বাস, লোকটা যেন জেগে জেগে...

কাঞ্চনকাকা চেঁচিয়ে উঠলেন—আরে রাখ তোমার বিশ্বাস। আমার কেমন সন্দেহ হয়, লোকটা হল একটা...।

দু'জনেই তাঁদের কথার অর্ধেকটুকু বলে চুপ করে গেলেন। মাঝখান থেকে আমাদের মনের ধারণাগুলি আরও গোলমাল হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম না, ভোলাদার বিশ্বাসটা কি? আর কাঞ্চনকাকাই বা কি সন্দেহ করছেন।

ঘাটের কাজ যখন শেষ হল, তখন দুপুর হয়ে গিয়েছে। টাউনে ফেরার পথে সেই কুশ ঘাসে ছাওয়া মাঠের উপর দিয়ে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখা গেল, একটা টিনের ঘর রয়েছে,

চারদিকে মাদার গাছের বেড়া। ঘরই বটে, কিন্তু দেখে মনে হয়, মাঠের মাঝখানে যেন প্রকাণ্ড একটা ডাস্টবিন উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

ভোলাদা বললেন—ওটা হলো ঘাটবাবুর কোয়ার্টার।

ক'দিন পরেই আমরা দেখলাম, আর দেখতে পেয়ে আমাদের চোখগুলিও যেন অবুঝ বিস্ময়ে চমকে উঠল। সন্ধ্যাবেলা টাউনের সিনেমা হাউসের সামনের সড়কে দাঁড়িয়ে আছে ঘাটবাবু। ছাই ধোঁয়া আর অন্ধকারের দেশে বাস করে যে লোকটা, সেই লোকটা আবার এই আলোর রাজ্যে কেন? দেখতে খুবই অদ্ভুত লাগছিল। কালিমাখা লণ্ঠনের আলোকের পিছনে যার একজোড়া ধোঁয়াটে চোখ দেখেছি, তাকেই দেখেছি, জ্বলজ্বল একজোড়া চোখ নিয়ে পানের দোকানের আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে। বোধহয় পান খাবার শখ হয়েছে।

মাধাইয়ের দাদু অধর মুখুজ্জে খুবই ধীর স্থির ও শান্ত মানুষ। সাদা দাড়ির বোঝা বুকের উপর শুইয়ে দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা খাটের উপর শুয়ে থাকেন অধরদাদু, আর মাঝে মাঝে বাইরের পথের দিকে তাকান। এমন মানুষকেও সেদিন চমকে দিল ঘাটবাবু। পথের উপর দিয়ে ঘাটবাবুকে যেতে দেখতে পেয়েই হাতের এক ঠেলায় খোলা জানালার পাট সশব্দে বন্ধ করে দিলেন অধরদাদু।

একবার, দু'বার, তিনবার, আরও অনেকবার দেখলাম, টাউনের ভিতরেই ঘোরাফেরা করছে ঘাটবাবু। দেখে আরও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি, টাউনের কুকুরগুলিও বোধহয় লোকটার গা থেকে পোড়া জীবনের গন্ধ পায়। সত্যিই নারায়ণ মোদকের দোকানের সামনে একদিন দেখলাম, তিনটে-চারটে খেঁকি কুকুর পিছন থেকে ঘেউ-ঘেউ করে ঘাটবাবুকে যেন তাড়া করে নিয়ে চলেছে। একটা শালপাতার ঠোঙা হাতে নিয়ে একমনে আর আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে ঘাটবাবু।

আমাদের কাছ থেকে বার বার ঘাটবাবুর চালচলনের খবর পাচ্ছিলেন কাঞ্চনকাকা, আর শুনে চমকে উঠছিলেন। বললেন—লোকটা বড় বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করেছে দেখছি।

বুঝতে পারি না, কিসের বাড়াবাড়ি। ক'দিন পরে বান্ধব সমিতির বৈঠকে কাঞ্চনকাকা আরও জোর গলায় তাঁর সন্দেহটাকে চেঁচিয়ে ঘোষণা করলেন। —খবর পেয়েছি, লোকটা চেয়ারম্যান সুধাসিন্ধুর কাছেও একবার এসেছিল, চার দিনের ছুটি চেয়ে একটা দরখাস্তও দিয়ে গিয়েছে। আমার সন্দেহ হয়, ভয়ানক সন্দেহ হয়...

কাঞ্চনকাকার এই ভয়ানক সন্দেহের চিৎকার শুনে আশ্চর্য হবার পর প্রায় ছ'টা মাস পার হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ বান্ধব সমিতির কাছে আবার একটা কাজের ডাক এল।

আবার আমাদের কাঁধের উপর কাঁচা কাঠের খাটিয়া মচ্‌মচ্‌ করে, আর সেই সঙ্গে নড়বড় করে গলিত কুষ্ঠে ক্ষয়ে যাওয়া চরণবাবুর এইটুকু একটা শরীর। কুশ ঘাসে ছাওয়া মাঠের উপর দিয়ে দুপুরের রোদে ঘেমে ঘেমে আমরা এগিয়ে চলেছি ঘাটের দিকে। হঠাৎ ঘাটবাবুর কোয়ার্টারের দিকে তাকিয়ে যেন একটা আর্তনাদ করে উঠলেন কাঞ্চনকাকা। —এই রে, যে ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে। বেটা ঠিক কোন এক ভদ্রলোকের সর্বনাশ করে বসে আছে।

উপুড়-করা ডাস্টবিনের মত দেখতে নয়, ঘাটবাবুর কোয়ার্টার যেন রঙিন একটা ছবির মত ফুটে রয়েছে। কে জানে, কবে পাতকুয়োর ধারে পেঁপে গাছগুলি এত বড় হয়ে উঠলো। মাদার গাছের বেড়ার উপর অপরাজিতার লতা ঝুলছে। টকটকে লাল গাঁদা ফুটে রয়েছে পাতকুয়োর সামনে। আর সব চেয়ে রঙিন হয়ে ঝলমল করছে আর একটা জিনিস। পেঁপের সারির কাছে দড়ির গায়ে একটা ভেজা রঙিন হয়ে ঝলমল করছে আর একটা জিনিস। পেঁপের সারির কাছে দড়ির গায়ে একটা ভেজা রঙিন শাড়ি হাওয়ায় দুলে দুলে শুকোচ্ছে। শ্মশানের ধোঁয়ার জ্বালা আর মৃত্যুর ময়লা ছাই-এর রুক্ষতায় মাখা সেই ডাস্টবিনের মত ঘরটাকে চূর্ণ করে দিয়ে সেখানে যেন একটা নতুন কুটিরে শৌখীন জীবনের জয়পতাকা উড়ছে।

ইস্! সহ্য করতে পারছিলেন না কাঞ্চনকাকা। —লোকটা সত্যিই শেষ পর্যন্ত বিয়েও করে ফেলল। কিন্তু এই অন্যায়ের, এই ভাঁওতার, এই জোচ্চুরির ফল ওকে একদিন পেতেই হবে।

সত্যিই একটা শক পেয়েছেন কাঞ্চনকাকা। সে লোকটাকে নিতান্ত একটা অশুচি জীব বলে মনে করেন কাঞ্চনকাকা, যে লোকটা তার নিজের পরিচয় বলতে পারে না, সেই লোকটা শেষ পর্যন্ত কোথায় কোন্ এক সুখী ঘরের জাত সমাজ ও বংশের বেড়া ভেঙে একটা মেয়েকে যেন চুরি করে নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

কাঞ্চনকাকা আবার নিজের মনে গজরে উঠলেন—জানতে হবে লোকটা সত্যিই বিয়ে করেছে, না ইয়ে করেছে।

মাঠের উপর দিয়ে জোরে হর্ন বাজাতে বাজাতে মস্ত বড় একটা মোটর গাড়ি আমাদের পিছনে এসে দাঁড়ালো। কাঞ্চনকাকা ব্যস্তভাবে আর উল্লাসের সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন—আমাদের পেট্রন, আমাদের পেট্রন কুমারসাহেব, তোমরা একটু থাম।

কুমারসাহেবের গাড়িও থেমে রইল কিছুক্ষণ। দিব্যি ফরসা ছিপছিপে সুন্দর চেহারা, কুমারসাহেব। ধবধবে আদ্দির জামা গায়ে। চোখের কোণে সুর্মার সরু প্রলেপ। কোলের উপর একটা রাইফেল নিয়ে বসে আছেন কুমারসাহেব। এই মাঠ ছাড়িয়ে অনেক দূরের ঐ হরতকীর জঙ্গলে তিতির শিকার করতে চলেছেন।

মোটরগাড়ির ফুটবোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে কাঞ্চনকাকা কিছুক্ষণ কুমারসাহেবের সঙ্গে আলোচনা করলেন, মিউনিসিপ্যালিটির আগামী ইলেকশানের কথা।

আবার হর্ন বাজিয়ে মাঠের উপর দিয়ে, আর ঘাটবাবুর কোয়ার্টারের মাদার গাছের বেড়ার পাশ দিয়ে, কুশ ঘাসের উপর মোটরের চাকার চওড়া দাগ এঁকে দিয়ে ছুটে চলে গেল কুমারসাহেবের গাড়ি। আমরা এগিয়ে চললাম ঘাটের আপিস-ঘরের দিকে। আপিস-ঘরের দরজার কাছে এসে কাঞ্চনকাকার রাগ একেবারে মত্ত হয়ে ফেটে পড়লো।

ঘাটবাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন কাঞ্চনকাকা। —সত্যি কথা বলো, বিয়ে করেছো না ইয়ে...।

ঘাটবাবু বলে—বিয়ে করেছি।

কাঞ্চনকাকা—ঠিক করে বলো।

ঘাটবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। সপ্তপদী হয়েছে, কুশণ্ডিকা হয়েছে। নিয়মমত মন্ত্র পড়ে হোম করা হয়েছে। আর কি জানতে চান?

শান্তভাবে আর বেশ শ্রদ্ধা রেখে কথা বলছিল ঘাটবাবু। কথাগুলির মধ্যে কেমন যেন একটা ভীরু ভীরু আবেদনও ছিল। যেন কাঞ্চনকাকার কাছে ক্ষমা চাইবার চেষ্টা করছে ঘাটবাবু। যেন বিশ্বাস করেন কাঞ্চনকাকা, মানুষ যেভাবে বিয়ে করে ঠিক সেইভাবে এই বিয়ে হয়েছে। তবে যদি এর মধ্যে কোন অন্যায় হয়ে তাকে, সে অন্যায় ঠিক ঘাটবাবুর জীবনের অন্যায় নয়, সে কথা ভুলে গেলেই তো হয়।

কাঞ্চনকাকা সব শুনে নিয়ে বললেন—তবু এ বিয়ে বিয়েই নয়। বুঝতে পারছো আমার কথাটা?

কাঞ্চনকাকার প্রশ্নের আঘাতে সেই মুহূর্তে ঘাটবাবুর চোখ দুটো ধোঁয়াটে হয়ে গেল। এই প্রশ্ন যেন ঘাটবাবুর প্রাণের অবৈধ অস্তিত্বটাকে টানাটানি করে চিৎকার করছে, সমাজের মানুষের ঘরে ঢুকে গিয়ে বিয়ে করার কোন অধিকার নেই সে প্রাণের কোন সখ আহ্লাদ আর ইচ্ছার ।

আপিস-ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে কাঞ্চনকাকা আমাদের কানের কাছে আর একবার আস্তে আস্তে গজরালেন।—লোকটা সত্যি যদি কোন বাজে ছুঁড়িকে ভাগিয়ে নিয়ে আসতো তাহলে কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু বুঝেছি, বেটা সত্যিই পরিচয় ভাঁড়িয়ে একটা ভদ্রলোকের মেয়েকেই বিয়ে করেছে, ছিঃ।

কি ভাবতে ভাবতে ঘাটের দিকে চলে গেলেন কাঞ্চনকাকা। আমরা ঘাটবাবুর কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়ালাম।

দিব্যি মানুষের মতই দেখাচ্ছে ঘাটবাবুকে। পরিষ্কার একটা টুইলের কামিজ পরেছে ঘাটবাবু। রোগা শুকনো চেহারাটার মধ্যে একটা চকচকে হাসি-হাসি ভাব ফুটে রয়েছে। হাতে একটা নতুন ঘড়িও দেখলাম। আমাদের দেখে একটু খুশি হয়ে ঘাটবাবু ডাক দেয়—আসুন ভাই, একটু সুখ-দুঃখের গল্প করি।

প্রথমেই বলে—আমি আর এখানে থাকছি না। এ কাজ ছেড়ে দেবই দেব। এখানে কি মানুষ থাকে? স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই ভাগাড়ের কাছে থাকা অসম্ভব।

হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেলে ঘাটবাবু।—আপনাদের বৌদির এখন পাঁচ মাস।

হাসি-হাসি চোখ নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে, তারপর আমাদের দিকে তাকায় ঘাটবাবু।—আপনাদের বৌদি দেখতে বেশ সুন্দর, মাইরি বলছি। একদিন ফটো দেখাবো আপনাদের।

—এখুনি দেখান না!

ঘাটবাবু—ফটো তোলানো হয়নি এখনো।

—কবে তোলাবেন?

ঘাটবাবু হাসতে গিয়ে একেবারে গলে যায় যেন।—এই ধরুন, আর চার মাস, তারপর আরও ছ' মাস। বাচ্চাটার অন্নপ্রাশনের দিনে টাউনে গিয়ে হরেনবাবুর স্টুডিওতে একখানি বড় সাইজের ফটো তোলাবো, মাগ-ছেলেকে নিয়ে এক সঙ্গেই। কেমন, কথাটা ভাল বলিনি?

প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে ঘাটবাবু আবার প্রশ্ন করে।—ছ' মাস বয়স হলেই তো অন্নপ্রাশন দিতে হয়, তাই না?

আমরা বলি—হ্যাঁ।

—রাম নাম সৎ হ্যায়! গম্ভীর স্বরে একটা ক্লান্ত আক্ষেপের কোরাস যেন হাঁপাতে হাঁপাতে আপিস-ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপরেই আর একটা। বিরক্ত হয়ে হাঁক দেয় ঘাটবাবু—ওদিকে চলে যাও। সার্টিফিকেট রেখে ওদিকে সরে পড়। যত সব!

সার্টিফিকেটগুলিকে অবহেলার সঙ্গে খাতার নীচে চেপে রেখে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে থাকে ঘাটবাবু। হরিবোল, রাম-রাম, ধোঁয়া, ছাই আর জ্বলন্ত অঙ্গারের এই পৃথিবীটাকে কোন মতে যেন ঘৃণা চেপে সহ্য করছে ঘাটবাবু। দূরের জীবনময় সংসার থেকে খেদানো যত আবর্জনা এখানে দিনরাত্রি মিছিল করে আসছে। এখানে কি জীবনের শখ আর আহ্লাদ নিয়ে বাস করা যায়?

কুষ্ঠী চরণবাবু ছাই হয়ে যাবার পর আমরা যখন আবার মাঠের পথ ধরে ফিরে চললাম, তখন কাঞ্চনকাকা আমাদের কাছ থেকেই শুনলেন, ঘাটবাবু কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চায়।

কাঞ্চনকাকা বলেন—ওর কথা এক ফোঁটাও বিশ্বাস করো না। ও যাবে না, ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে। আমার খুব সন্দেহ হয় লোকটা হলো একটা...।

হঠাৎ কথা থামিয়ে কাঞ্চনকাকা ঘাটবাবুর কোয়ার্টারের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকালেন, তারপরেই আমাদের তাড়া দিয়ে বললেন—চলো চলো, তাড়াতাড়ি চলো, অনেক বেলা হয়েছে।

আমরাও একটু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, কুমারসাহেবের মোটরগাড়ি ঘাটবাবুর কোয়ার্টারের চারদিকে পাক দিয়ে ঘুরছে, থামছে, আবার চলে যাচ্ছে। যেন মাদার গাছের বেড়ার ঝোপে তিতির সন্ধান করছেন কুমারসাহেব।

অনেকগুলি মাস পার হয়ে যাবার পর আবার আমাদের কাধের উপর কাঁচা কাঠের খাটিয়া মচমচ করে আর নড়বড় করে ফাঁসিতে মরা প্রচণ্ড ডাকাত ইন্দ্র সিং-এর শরীর।

কিন্তু ও কি? ঘাটবাবুর কোয়ার্টারের আবার এ দশা হলো কেন? ডাস্টবিনের মত উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে একটা টিনের ঘর! চারদিকে মোটরগাড়ির চাকার আঘাতে মাটির উপর ক্ষতের রেখা আঁকা রয়েছে, গেল বর্ষার জলেও মুছে যায়নি! কোথায় অপরাজিতার লতা আর কোথায় বা লাল টকটকে গাঁদা? দড়িতে কোন রঙিন শাড়ি দুলে দুলে শুকোয় না। তবে কি ঘাটবাবু কাজটা ছেড়ে দিয়ে চলেই গিয়েছে?

ভুল ধারণা। দেখলাম, রেজিস্টার খাতা তেমনি বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুপ করে বসে আছে ঘাটবাবু। লোকটা শুকিয়ে পাকিয়ে বিশ্রী হয়ে গিয়েছে। কাঞ্চনকাকা সোজা সামনে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—খুব না বলেছিলে যে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে, তবে এখনো আছ কেন?

ঘাটবাবু বলে—যাব।

কাঞ্চনকাকা—কবে?

ঘাটবাবু—শিগগিরই।

কাঞ্চনকাকা—ভাল কথা, কিন্তু মিথ্যে কথা। যাবার হলে তুমি এতদিনে চলে যেতে।

ঘাটের দিকে যেতে যেতে কাঞ্চনকাকা আবার যেন নিজের মনেই বলতে থাকেন।—বুঝেছি, তোমাকে না সরালে তুমি সরবে না।

কাঞ্চনকাকা চলে যেতেই আমরা ঘাটবাবুকে ঘিরে ধরলাম। —কই ঘাটবাবু, সেই ফটো কই? সেই যে বলেছিলেন, তারপর একটা বছর তো পার হয়েই গিয়েছে।

ঘাটবাবু বলে—ফটো তোলানো হয়নি।

—কেন?

ঘাটবাবু—আপনাদের বৌদি এখানে নেই।

—কোথায়?

ঘাটবাবু—বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে।

—ছেলে?

ঘাটবাবু হাসে—ছেলে হয়েছে নিশ্চয়ই, এতদিনে না হবার তো কথা নয়।

—কবে আসবে ওরা?

ঘাটবাবু আবার হাসে—আসবে, তবে আসতে একটু দেরি হবে নিশ্চয়, রাগ করে চলে গিয়েছে কিনা!

আর কোন কথা না বলে আবার দূরের দিকে আনমনার মত তাকিয়ে রইল ঘাটবাবু।

এক বছর, দু' বছর, তারপর আর একটা বছর পার হয়ে গেল। বান্ধব সমিতির কাজ চলতেই থাকে। আর শ্মশানঘাটে গিয়ে ঘাটবাবুকে ঠিক তেমনই দেখতে পাই, বুকের কাছে রেজিস্টার খাতা আর হাতের কাছে কলম নিয়ে তেমনই বসে আছে। সকাল দুপুর সন্ধ্যা বা রাত, সব সময়েই জেগে রয়েছে ঘাটবাবুর চোখ। ভোলাদা বলেন—আমার বিশ্বাস, লোকটা জেগে জেগেই কি যেন দেখছে।

কাঞ্চনকাকা ভোলাদার কথা শুনে তেমনি চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করে—বাজে কথা।

ঘাটবাবু নামে এই লোকটার কথা এক ফোঁটাও বিশ্বাস করা উচিত নয়, ঠিকই বলেছিলেন কাঞ্চনকাকা। এই যাব, শিগগির যাব, যাবই-যাব করে করে বছরের পর বছর পার করে দিচ্ছে। কিন্তু যায় না।

আর, কোথায় বা সেই ফটো? একেবারে ভুয়ো একটা কথার কারসাজি মাত্র। বাপের বাড়ি থেকে বউ এইবার আসবে, এল বলে, এইবার নিশ্চয়ই আসবে বলে মনে হচ্ছে, এইরকম শুধু

বাজে কথার ছলনায় আমাদের প্রশ্নগুলিকে এতদিন ধরে শুধু ঠকিয়ে আসছে ঘাটবাবু। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওর বউ আর ছেলে এল না।

তারপর একদিন, সেদিন আমরা একেবারে শ্মশানের বালিয়াড়ির উপর নেমে এসে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে এক সাধুর সৎকার করছি। শুনেছি, ইচ্ছা-মৃত্যু বরণ করে দেহত্যাগ করেছেন এই সাধু। কাঞ্চনকাকা বললেন—তোমাদের ঘাটবাবুকে এইবার চলে যেতেই হবে মনে হচ্ছে।

—কেন?

কাঞ্চনকাকা—পুলিশও ওকে সন্দেহ করছে। সন্দেহভাজন ব্যাড কারেকটরের খাতায় ওর নাম চড়েছে।

ভোলাদা চমকে উঠলেন—কেন! কি করেছে ঘাটবাবু?

কাঞ্চনকাকা—আমাদের পেট্রন কুমারসাহেবই ওর নামে থানাতে ডায়েরি করিয়েছেন। লোকটা প্রায়ই রাত্রিবেলার অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে মধুপুর রোডে কুমারসাহেবের সেই বাগানবাড়িটার পাঁচিলের আশেপাশে ঘুরঘুর করতো। দারোয়ানেরা বলে, ভয় দেখাবার জন্য প্রেতের গলার স্বর নকল করে লোকটা কাঁদতো। একদিন ধরা পড়ে গেল ঘাট, মারও খেল, তারপর পুলিশ ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। রাত্রিবেলা টাউনের দিকে যাওয়াও নিষেধ করে দিয়েছে পুলিশ।

সাধুর চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে। হঠাৎ যেন এক লাফ দিয়ে এসে চিতার কাছে হাজির হলো ঘাটবাবু। উসকো-খুসকো চুল, লাল চোখ, ছেঁড়া খাঁকি কামিজ, ধুতির খুঁট কোমরে জড়ানো।

এসেই চিতার দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করলো ঘাটবাবু। —বাঃ, এ কেমন সাধু রে বাবা! সাত মণ কাঠ শেষ করে তবু এখনো ছাই হলো না। ওরে রাম, লগি দিয়ে এটার আঁতড়ির পিণ্ডিটাকে পিটিয়ে দে তো একবার।

এ চিতা থেকে ও চিতা, ঘুরে ঘুরে যেন শুধু টিটকারি দিয়ে ফিরতে থাকে ঘাটবাবু। টাউনের জীবন, আর সেই জীবনের মানুষগুলিকে যেন এইখানে এক বধ্যভূমির মধ্যে বাগে পেয়েছে ঘাটবাবু, আর বেপরোয়া ঘেন্না করে করে প্রতিশোধ তুলছে।

আবার হাঁক দেয় ঘাটবাবু—ওটা কে পুড়ছে রে রাম? নন্দ মুদি বোধহয়!

রাম বলে—হ্যাঁ।

ঘাটবাবু হাসতে গিয়ে যেন মুখ ভেংচে ফেলে।—তিন আনার একটা সাবান একদিন ধারে চেয়েছিলাম ওর কাছে, কিন্তু দেয়নি।

নন্দ মুদির শ্মশান-বন্ধুরা রাগ করে তাকায়—এসব আবার কি রকমের কথা বলছো ঘাটবাবু?

রামের কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে ঘাটবাবু—বেশ গনগনে আঁচ হয়েছে চিতাটার, কিছু আগুন সরিয়ে রাখ রাম, আর আমার চায়ের কেটলিটা নিয়ে এসে চাপিয়ে দে।

আবার, দূরে আর একটা চিতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—ওটা কে রে রাম? সেই খেমটাওয়ালী নাকি?

রাম বলে—হ্যাঁ।

ঘাটবাবু—কি হলো ওর? এত তাড়াতাড়িই বা এল কেন? আসছে হোলিতে নাচবার বায়না নেয়নি?

আমাদের দিকে তাকিয়ে ঘাটবাবু চেঁচাতে থাকে—এখন আর কি-ই বা এমন মড়ার ভিড় দেখছেন। কার্তিক মাসটা আসুক, তখন দেখবেন কেমন জমে।

—আমার সন্দেহ হয়। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন কাঞ্চনকাকা, ঘাটবাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে কড়া ধমক ছাড়লেন—কি পেয়েছ ঘাট, অ্যাঁ? মৃতের প্রতি এরকম ব্যবহার করলে তোমাকে আমি তিন দিনের মধ্যেই...।

ঘাটবাবু হেসে ফেলে—চলেই যাব স্যার, কারও কাঞ্চনকায়া তো রবে না, তবে কি ছার আর কেন মায়া...।

গুনগুন করে যেন একটা সুরেলা আনন্দ ভাঁজতে ভাঁজতে নদীর আধহাঁটু জলের উপর দিয়ে ছপ্-ছপ্ করে হেঁটে আপিস-ঘরের দিকে চলে গেল ঘাটবাবু। ভোলাদা বলেন—লোকটা মদ খেয়েছে বোধহয়।

কাঞ্চনকাকা বলেন—মদ তো কুমারসাহেবও খান, কিন্তু তাই বলে কি এরকম অমানুষের মত কথা কেউ বলতে পারে, যদি সত্যিই অমানুষ না হয়?

যাবার আগে দেখলাম, একটু অন্যরকম হয়ে রয়েছে ঘাটবাবু। রেজিস্টার খাতা বুকের কাছে নিয়ে যেন ছটফট করছে। চোখের দৃষ্টিটাও সেইরকম নয়। মাথা হেঁট করে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে আর যেন কিছু দেখবার নেই। বহুদিনের ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে চোখদুটো এইবার ভরসা হারিয়ে একেবারে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে। চলে যাবার জন্যই ছটফট করছে ঘাটবাবুর হাত-পা।

কিন্তু কি বিশ্রী ঘাটবাবুর এইসব কথা আর চিৎকার। যাবার আগে যেন একবার মানুষের জীবনের মত শ্রদ্ধেয় বেদনাগুলিকে এই শ্মশানের বালুতে আছড়ে আছড়ে হেসে নিচ্ছে লোকটা।

শেষ রাতের অন্ধকার। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। এতক্ষণ আমরা সড়কের ধারে একটা বটের তলায় দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের কাঁধের উপর কাঁচা কাঠের খাটিয়ায় শান্ত হয়ে পড়ে ছিল আমাদের সমিতির পেট্রন কুমারসাহেবের এক রাণীজীর দেহ।

কাঞ্চনকাকার কাছ থেকে লোক এসে খবর দিতেই সেই সন্ধ্যাতে আমরা দৌড়ে গিয়ে মধুপুর রোডের ধারে সেই বাগান-বাড়ির ফটকে দাঁড়িয়েছিলাম। বাগান-বাড়ির ভিতর থেকে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে একবার বের হয়ে এলেন কাঞ্চনকাকা। মৃত্যুর সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার। তারপর কুমারসাহেবের মোটরগাড়িও ভিতর থেকে বের হয়ে এল। মধুপুর রোডের অন্ধকার ভেদ করে কুমারসাহেবের গাড়ি তখনই দূরের তিনপাহাড় গড়ের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে গেল। মোটরগাড়ির গর্জনের মধ্যেই শুনতে পেলাম, গাড়ির ভিতরে একটা ছোট ছেলের গলার নাকানি আর ক্ষীণ স্বরের কান্না। তারপর কাঞ্চনকাকার নির্দেশমত দোতলার ঘরের এক পালঙ্কের উপর থেকে সিল্কের চাদরে ঢাকা রাণীজীকে কাঁচা কাঠের খাটিয়ায় তুলে নিয়ে আমরা সোজা ঘাটের দিকে রওনা হয়ে এতদূর চলে এসেছি।

ভোলাদাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম।—কে এই রাণীজী ভোলাদা? কুমারসাহেবের স্ত্রী?

ভোলাদা বললেন—না।

—তাহলে কে ইনি?

ভোলাদা বিরক্ত হয়ে বলেন—কুমারসাহেবদের নানা রকমের রাণীজী থাকেন, ইনিও একরকমের রাণীজী হবেন।

আবার সেই কুশঘাসে ছাওয়া মাঠ, সেই আপিস-ঘর, আর সেই ঘাট। আর সেই রকমই বুকের কাছে রেজিস্টার খাতা টেনে নিয়ে কালিমাখা লণ্ঠনের আলোর পিছনে বসে রয়েছে আবছায়াময় ঘাটবাবু।

আমাদের হরিবোল থামতেই লাফ দিয়ে উঠে এল ঘাটবাবু, আর কাঞ্চনকাকার দিকে একটা কাগজ তুলে দেখিয়ে হেসে ফেললো। —রেজিগনেশন স্যার, আর অবিশ্বাস করবেন না, এইবার চলেই যাচ্ছি।

কাঞ্চনকাকা কটমট করে ঘাটবাবুর দিকে তাকালেন, তারপর মুখ ফিরিয়ে ঘাটবাবুর কথার উত্তরটা আমাদের কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন—ক'দিন আগেই চলে গেলে ভাল করতে বাছা। তাহলে এরকম একটা শাস্তির গলাধাক্কা আর খেতে হত না।

—কি বললেন কাঞ্চনকাকা?

কাঞ্চনকাকা বলেন—কিছু না, অন্যায় করলে প্রতিফল পেতেই হয়, এই আর কি।

রেস্ট-ঘরের ভিতরে খাটিয়ার উপর সিল্কের চাদরে আবৃত রাণীজী পড়েছিলেন। কাঞ্চনকাকা বললেন—ওর মুখের ওপর থেকে চাদরটা নামিয়ে দাও।

চাদর সরিয়ে দিয়েই ভাল করে দেখলাম। হ্যাঁ, রাণীজীরই মত সুন্দর মুখ বটে। কাঞ্চনকাকার নির্দেশমত একটা লণ্ঠনও ঝুলিয়ে দিলাম রেস্ট-ঘরের কাঠের থামের গায়ে। লণ্ঠনের মৃদু আলো রাণীজীর মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ে, আরও মিষ্টি হয়ে ওঠে রাণীজীর সুন্দর মুখের শোভা।

কাঞ্চনকাকার কথাবার্তা, চোখের চাউনি আর ঘোরাফেরার ভঙ্গী কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হলো। যেন একটু বিচলিত হয়েছে কাঞ্চনকাকার বেপরোয়া মনের সাহসগুলি। কোন রাতের অন্ধকারকে যিনি কোনদিন গ্রাহ্য করেননি, শ্মশানের ভয়গুলিকে এক ধমকে যিনি ভয় পাইয়ে দিয়েছেন, সেই কাঞ্চনকাকার চোখদুটো যেন ছমছম করছে।

—মানুষটার গতর কি রকম? ক'মণ কাঠ লাগবে শুনি। বলতে বলতে রেস্ট-ঘরের ভিতর এসে ঢুকলো ঘাটবাবু। কাঞ্চনকাকা ব্যস্তভাবে আমাদের ডাক দিলেন—তোমরা সবাই এদিকে চলে এস।

রেস্ট-ঘরের ইটের সিঁড়ি দিয়ে আমরা একসঙ্গে নেমে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম সেই ন্যাড়া চাঁপাগাছের কাছে, ধোঁয়ার জ্বালায় কালো হয়ে গিয়েছে যে গাছটা।

আমরা সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছি, রাণীজীর মুখের দিকে একবার তাকাতে গিয়েই এই ন্যাড়া চাঁপাগাছটার মত একেবারে থমকে আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঘাটবাবু। তারপর ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে গেল, রাণীজীর মুখের ঢাকা আর একটু নামিয়ে দিল, তারপর খাটিয়ার পাশে মেঝের ধুলোর উপর ধপ করে বসে পড়ল ঘাটবাবু।

ভোলাদা আস্তে চেঁচিয়ে উঠলেন—ও কি?

কাঞ্চনকাকা বললেন—থাক গে, কিছু বলো না। ওর যা ইচ্ছে হয় করুক।

রাণীজীর সিঁদুরমাখানো সিঁথি, মাথাভরা একরাশ কালো চুল আর টিপ-লাগানো কপালের উপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করছে ঘাটবাবু। একটা মরা মেয়েমানুষের সুন্দর মুখের উপর লুব্ধ সাপের মত সিরসির করে ঘাটবাবুর রোগা আর শুকনো হাতটা ঘুরছে। আবার মনে হয়, যেন অনেক যন্ত্রণায় ক্লান্ত একটা মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে ঘাটবাবু।

আমাদের মনে ছ্যাঁক করে একটা সন্দেহ চমকে ওঠে। এ কি কাণ্ড! শ্মশানের লোকটা দূরের টাউনের জীবনের একটা মানুষকে এরকম ভালবাসা দেখাচ্ছে কেন? যেন বলতে চাইছে ঘাটবাবু : জীবনটাই একটা শাস্তি, ওর মধ্যে থাকতে নেই, চলে এস আমার কাছে।

আর রাণীজীর মুখটা দেখে মনে হয়, এক পলাতকার প্রাণ যেন জীবনের ভয় থেকে এতদিনে মুক্ত হয়ে এই ভস্ম আর অঙ্গারের রাজ্যে এক ঘাটবাবুর কাছে এসে শান্তির আশ্বাস নিচ্ছে।

ভোর হলো, পাখি ডেকে উঠল, চিতা সাজিয়ে ফেললো রাম। শান্ত চোখ নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে সবই দেখল ঘাটবাবু। নদীর বালিয়াড়িতে নেমে ভাল করে দেখলো, ভাল করে চিতা সাজানো হয়েছে কি না।

রাম-নাম-সৎ-হ্যায় ধ্বনির সঙ্গে শব নিয়ে আরও কয়েকটি দল এল। সবারই সঙ্গে আলাপ করে ঘাটবাবু। ভোরের শ্মশানের এই বাতাসকে যেন ভালবেসে ফেলেছে আর একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছে ঘাটবাবুর অশান্ত আত্মা।

—মোটা মোটা গেঁটে কাঠগুলো আর দিস না রাম, পুড়তে বড় দেরি করে, আর বড় ধিকি ধিকি করে জ্বলে।

বলতে বলতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকে ঘাটবাবু। এখানে ঠাঁই নিতে এসে যেন কারও কষ্ট না হয়, যেন ব্যথা না পায় শবগুলি, বড় যত্ন আর বড় মায়া নিয়ে কাজ দেখছে ঘাটবাবু।

একটু দূরে একটা ভিখারীর চিতার দিকে তাকিয়ে ঘাটবাবু ব্যথার্তভাবে আক্ষেপ করে। —আঃ, বেচারাকে ওরকম আধপোড়া করে ফেলে রাখিস না রাম, আরও কিছু কাঠ চাপিয়ে দে।

টাউন থেকে এত দূরে, এই নিরালা মাঠের শেষে, এই নদীর বালিয়াড়ির বুকে ছাই আর অঙ্গারগুলিও যেন একটা সংসার, যেন ভালবেসে ঘরও বাঁধা যায় এখানে। দুই চোখে তৃপ্তি আর শান্তি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে ঘাটবাবু। তারপরেই কাঞ্চনকাকার হাত থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে চলে যায়।

রাণীজীর চিতার জ্বলন্ত অঙ্গার জল ছিটিয়ে নিভিয়ে দেবার পর আমরা যখন টাউনে ফিরবার জন্য প্রস্তুত হলাম, তখন দুপুরও পার হয়ে গিয়েছে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, রেজিস্টার খাতার উপর মাথা নামিয়ে আর মুখ লুকিয়ে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে ঘাটবাবু। ঘুম? কি আশ্চর্য, এতদিন পরে ঘাটবাবুর চোখে ঘুম!

কাঞ্চনকাকা আস্তে আস্তে বললেন—উঃ, খুব শান্তি পেল লোকটা।

তারপরেই ব্যস্তভাবে বলেন—যাও তো ভোলা, ওর কাছ থেকে রেজিগনেশন চিঠিটা চেয়ে নিয়ে এস।

ভোলাদা একটু দ্বিধা করেন।—ও যখন নিজেই চলে যাবে বলছে, তখন আমরা আর কেন...।

কাঞ্চনকাকা—তবু আমার সন্দেহ হয় ভোলা। ওর কথা বিশ্বাস করো না। তাছাড়া আমাদের একটা কর্তব্য আছে। আমাদের পেট্রন কুমারসাহেব যার নামে পুলিশে ডায়েরি করিয়েছে, সেই লোকটাকে এখানে আর থাকতে দেওয়া কোনমতেই উচিত নয়।

ভোলাদা এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ডাক দেন—ও ঘাটবাবু!

পরমুহূর্তে রেজিস্টার খাতাটার দিকে চোখ পড়তেই চমকে ওঠেন ভোলাদা। পা টিপে-টিপে আমাদের কাছে ফিরে এসে ফিসফিস করে বলেন—শিগগির আসুন কাঞ্চনকাকা, এসে দেখে যান, লোকটা আবার নাম গোলমাল করে রেখেছে।

কুমারসাহেবের এক রাণীজী মারা গিয়েছেন, সার্টিফিকেটেও তাই লেখা আছে, কিন্তু এসব কী অদ্ভুত মিথ্যে কথা। মৃতার নাম সুমিতা গাঙ্গুলী, বয়স পঁচিশ, সধবা, সন্তানবতী, একটি ছেলে, হার্টের অসুখে মৃত্যু, মৃতার স্বামীর নাম মাধব গাঙ্গুলী, রেজিস্টারের ছক-কাটা এক-একটা ঘর পূর্ণ করে মৃতার এই অদ্ভুত মিথ্যা পরিচয় লিখে রেখেছে ঘাটবাবু। আর সেই মিথ্যা কথাগুলির পাশেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে রয়েছে মিথ্যুক লোকটা।

কাঞ্চনকাকা আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর গলার স্বরে একটু কর্কশ জোর এনে ডাক দিলেন—ওহে মাধব গাঙ্গুলী!

সঙ্গে সঙ্গে ঘাটবাবু মুখ তুলে তাকিয়ে বলে উঠল—বলুন।

এ কি কাণ্ড! তাহলে এই ঘাটবাবুই হল মাধব গাঙ্গুলী, আর ঐ যে রাণীজী এতক্ষণ ধরে চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন, তিনিই হলেন এই মাধব গাঙ্গুলীর ঘরের-মানুষ সুমিতা গাঙ্গুলী, যাঁর রঙিন শাড়ির রং অনেকদিন ঝলমল করে বাতাসে দুলেছিল ঐ কোয়ার্টারের পেঁপেগাছের কাছে। এই ব্যাপার! এতদিনে আমাদের কাছে রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ঘাটবাবুরই বউ

তাহলে একদিন এখান থেকে চলে গিয়ে রাণীজী হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তো বউ-ছেলে নিয়ে ফটো তোলবার সুযোগ আর পেল না ঘাটবাবু।

কাঞ্চনকাকা বললেন—তোমার রেজিগনেশন চিঠিটা আমার কাছেই দিয়ে দাও ঘাট।

হেসে উঠল ঘাটবাবু—না।

তারপরেই চিঠিটা পকেট থেকে বের করে আর ছিঁড়ে কুচিকুচি করে দিয়ে বেশ শান্ত ও হাসি-হাসি চোখ নিয়ে ঘাটবাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

কাঞ্চনকাকা আবার তাঁর চোখে হঠাৎ একটা শক পেলেন যেন। যেতে চায় না কেন লোকটা? হাসে কেন লোকটা? আর এই কি শাস্তি-পাওয়া মানুষের চেহারা? দিব্যি শান্ত দুটো চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে বেহায়ার মত।

বোধহয় ঘাটবাবুকে একটু ভয় পাইয়ে দেবার জন্যই কাঞ্চনকাকা বলেন—এখানে, এই চিতার ধোঁয়ার মধ্যে এভাবে তোমার পড়ে থেকে আর লাভ কি ঘাট?

কিন্তু তবু কোন হতাশার ব্যথা জাগে না, কোন আক্ষেপ নেই, কোন আতঙ্ক নেই ঘাটবাবুর চোখে। বরং কাঞ্চনকাকার দিকে তাকিয়ে আর চুপ করে কি যেন ভেবে নিয়ে, তারপর হঠাৎ উৎসাহে একটা আবেদন করে বসে ঘাটবাবু।—আমাকে একটা খবর বলবেন স্যার!

কাঞ্চনকাকা বলেন—বল, কিসের খবর চাও?

ঘাটবাবু—রাণীজীর ছেলেটা কেমন আছে?

চমকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন কাঞ্চনকাকা। খবরটা বোধহয় জানেন কাঞ্চনকাকা, কিন্তু সেই খবর বলতে তাঁর মত মানুষেরও মন দুরদুর করে উঠছে। শুনলেই লোকটা আবার একটা শাস্তির আঘাত পাবে, তাই খবরটা না বলবার জন্যই বোধহয় কাঞ্চনকাকা অন্য কথা পাড়লেন।—তোমার মাইনে-টাইনে আর এক পয়সাও বাড়বে না ঘাট, তোমার চলে যাওয়াই ভাল।

ঘাটবাবু বলে—ছেলেটা নিশ্চয়ই বেশ বড় হয়েছে এতদিনে।

কাঞ্চনকাকা—হ্যাঁ বড় তো হয়েছে, কিন্তু ...।

ঘাটবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—কিন্তু কি? বলুন না স্যার!

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে কাঞ্চনকাকা বলেন—কিন্তু যে ভয়ানক একটা রোগে ধরেছে, আর বেশিদিন টিকবে কি না সন্দেহ।

ঘাটবাবুর সারা মুখ জুড়ে ঝক করে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ ও তীব্র একটা আনন্দের 'বিদ্যুৎ যেন ঝলক দিয়ে ওঠে। —বলেন কি স্যার!

কাঞ্চনকাকা ভ্রুকুটি করেন—কি বললে ঘাট?

ঘাটবাবু—তাহলে বলুন, ছেলেটাও শিগগির আসছে, এল বলে।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে দু'পা পিছনে সরে গেলেন কাঞ্চনকাকা, যেন একটা হিংস্র ও ভয়াল প্রেতের হাতের ধাক্কা খেয়েছেন।

রাম নাম সৎ হ্যায়! ধ্বনি শোনা যায়। হন হন করে হেঁটে, আর কাঁধের উপর খাটিয়াতে ফুল ছড়ানো বিছানার উপর শব শুইয়ে নিয়ে একটা দল ঘাটের আপিসের কাছে প্রায় এসে পড়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে আর মনের উল্লাসে চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে ঘাটবাবু—ওরে ও রাম, দেখ তো কে এল?

রাম বাইরে থেকেই উত্তর দেয়—বোধহয় এক শেঠজী আসছেন।

ঘাটবাবু—ঠিক করে দেখে বল রাম, একটা ছোট ছেলে নয় তো?

রাম বলে—আরে, না বাবু।

বদ্ধ মাতালের মত চেঁচাতে থাকে ঘাটবাবু—আরে হ্যাঁ বাবু, না এসে থাকতে পারবে কেন, এল বলে, আসতেই হবে।

বউ ফিরে এসেছে, এইবার ছেলেও আসছে, লোকটা যেন শ্মশানের এই ধোঁয়ার মধ্যে আবার ঘর বাঁধবার আনন্দে লাফাচ্ছে। কিরকম ভাবে হাত কাঁপাচ্ছে, যেন একটা ছোট ছেলেকে কোলে নেবার জন্য নিশপিশ করছে লোকটার হাত।

ঘাটবাবুর এইসব চিৎকার শুনতে বিশ্রী লাগে, শুনে আমরা সবাই চমকেও উঠি, কিন্তু কাঞ্চনকাকা যেন একেবারে কেমন হয়ে গেলেন। যেন একটা বিভীষিকার দাঁত ঘষার শব্দ শুনছেন। দুটো অপলক চোখ নিয়ে, দম বন্ধ করে আর হাঁটুর কাঁপুনি কোনমতে সামলে কিছুক্ষণ ঘাটবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন কাঞ্চনকাকা, তারপরেই দু'লাফ দিয়ে আপিস-ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এসে ছিটকে পড়েন।

—কি হলো কাঞ্চনকাকা? আমরাও তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে কাঞ্চনকাকার কাছে দাঁড়াই। কিন্তু কাঞ্চনকাকা আর দাঁড়ালেন না। যেন তাঁর বুকের পাঁজরের ভিতরে ভয়ঙ্কর কালো একটা ভয় ঢুকে পড়েছে—আমার সন্দেহ হয়, এতদিন ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম।

ভোলাদা—কি?

কাঞ্চনকাকা—পিশাচ, পিশাচ, লোকটা মানুষই নয়।

বলতে বলতে মাঠের উপর দিয়ে প্রায় দৌড় দিয়েই ছুটে চলে গেলেন কাঞ্চনকাকা।

এইবার আমরাও চলে যাব। যাবার আগে ভোলাদাকে আমরা প্রশ্ন করলাম—আপনি কি মনে করেন ভোলাদা?

ভোলাদা—আমার বিশ্বাস, লোকটা মানুষই, তবে স্বপ্নের মানুষ।

—তার মানে?

ভোলাদা—লোকটা জাগা চোখে স্বপ্ন দেখে, ওটা মনের একটা রোগ।

আপিস-ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রেজিস্টার খাতা বুকের কাছে টেনে নিয়ে শ্মশানের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে যেন এক প্রতীক্ষায় অপলক হয়ে আছে ঘাটবাবুর চোখ। লাল লাল অথচ মিষ্টি-মিষ্টি আর হাসি-হাসি চোখ যেন চাঁপার মতই ফুটে রয়েছে।

ভোলাদা বলেন—বল দেখি, লোকটা কিসের স্বপ্ন দেখছে?

আমরা একটু ভেবে নিয়ে বলি—বোধহয় বউ-ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে হরেনবাবুর স্টুডিওতে ফটো তোলাচ্ছে।

কাঞ্চনসংসর্গাৎ

অটলনাথ বসু চৌধুরীর জীবনী লিখবে কান্তিকুমার!

রামগড়ে যাদের বয়স আজ ত্রিশ বছরের কম নয়, তারা প্রত্যেকেই অটলবাবুর সাবেকী চেহারাটা স্মরণ করতে পারে। বাঙালীর মতই ধুতি আর কোট পরতেন, কিন্তু মাথায় ছিল প্রকাণ্ড একটা পাগড়ি আর বগলে একটা তালিমারা ছাতা। মাসের পঁচিশটা দিন কেটে যেত কোন জংলী পরগনার ডিহিতে, কোন মান্‌ঝি অথবা মাহাতোর বাড়িতে খড়ের মাচানের ওপর শুয়ে, ছাতু খেয়ে। দু'পয়সা কমিশনের লোভে গিরিমিটিয়া কুলি রিক্রুট করে ফিরতেন অটলবাবু। শেষে বাড়ি আসাই প্রায় ছেড়ে দিলেন।

অটলবাবুর স্ত্রী মণিমালা বলেছিলেন—ছেড়ে দাও এ কাজ। দিন একরকম চলেই যাচ্ছে। ঘরে থেকে যদি পার, কিছু রোজগার কর। না পার দুঃখ নেই, আমি একরকম করে চালিয়ে নেবই।

অটলবাবু বলতেন—মানুষের পিঁজরাপোল নেই মণি। বুড়ো বয়সে যাতে উপোস করে না মরতে হয়. সেই ভাবনাই ভাবছি। কুকুর বেড়ালেরও একরকম চলেই যায়। চলে যাওয়াটা কোন কথা নয়, কথা হচ্ছে ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতের জন্যই কিছু জমাতেই হবে।

গোঁসাইপাড়ার শেষ প্রান্তে দুটি ছোট ছোট মেয়ে নিয়ে চার টাকা ভাড়ায় একটা মেটে বাড়িতে মণিমালা থাকতেন। মেয়ে স্কুলে হিন্দি-দিদিমণির কাজটা পেয়েছিলেন, তাই পনেরটা টাকা মাসে মাসে আসতো। নিজের হাতে মাটি কুপিয়ে উঠোনে লাউ-কুমড়ো ফলাতেন মণিমালা। সব্‌জিওয়ালা ডেকে দরদস্তুর করে নিজেই বেচতেন। তাঁর হাতের কাঁটা-কুরুশ কখনো থামত না। রান্নাঘরেই হোক বা বিছানায় বসেই হোক, মাঝরাত্রি পর্যন্ত ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে লেস বুনতেন। পুজোর সময় নতুন পোশাক তৈরির মরসুম লাগত ঘরে ঘরে, মণিমালার এই পরিশ্রমের পণ্য বিকিয়ে যেতো সবই।

এইভাবেই বছরের পর বছর পার হল। জনা ও প্রীতি—দুটি মেয়েই বড় হল। দু'জনেরই বিয়ে দিলেন মণিমালা; গরীব গেরস্থ ঘরের দুটি ভাল ছেলেকেই পাত্র পেয়েছিলেন। বিয়ের খরচ যোগাতে দেনা করতে হয়েছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য, নিত্য অনটনের পূর্ণগ্রাস থেকে যেন একটু একটু করে চাঁদির কণিকা বাঁচিয়ে সেই দেনাও শোধ করে দিলেন। তিনি কারও ধার ধারেননি।

মেয়েদের বিয়ের সময় অটলবাবু তবু দুটো দিন উঁকি দিয়েছিলেন। কিন্তু মণিমালার অসুখের খবর পেয়েও সহসা চলে আসতে পারলেন না। রোগটাও খারাপ ছিল। ডাক্তারেরা বললেন--হয় এনিমিয়া, নয় টি-বি, তা না হলে বোধ হয় হলদে জ্বর, ভারতবর্ষের এই ফার্স্ট কেস। কাজেই কিভাবে যে ট্রিটমেন্ট হবে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

মোট কথা রামগড়ের সকলেই বুঝতে পারলেন, বিশ বছরের কাজের খাঁচায় পোষা একটি বাঙালী নারীর ঠুনকো প্রাণ এইবার সরে পড়ছে।

অনেক খোঁজতল্লাস করে অটলনাথের হদিস পাওয়া গেল। অনেক অনুরোধ করে তাঁকে বাড়ি ফেরানো হল। প্রতিবেশী শ্রীনিবাসবাবুকে এর জন্য অফিস কামাই করতে হল চারটে দিন। তিনি এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে শিকারী কুকুরের মত ঘুরেছেন, শুধু অটলনাথকে পাকড়াও করতে।

গোঁসাইপাড়ার প্রতিবেশীরা একটু বেশি রাগ করেছিল, মণিমালার অন্তিম অভিমান হয়তো একটু বেশি করে মনে বেজেছিল, কিন্তু ভুল হয়েছিল সবারই। জীবনে যে মানুষ অন্তত হাজার গেরস্থকে গিরিমিটিয়া করে ছেড়েছে, সে-মানুষের মনে ঘরের ধর্ম যে কবেই মিথ্যে হয়ে গেছে,

তা সে নিজেই জানে না, পরের ধারণাতেও আসে না। কত ঘরের পুরুষকে ঘরছাড়া করেছে দালাল অটলনাথ—হাড়মাস তাদের ফিজির রবার গাছের গোড়ায় পচে সার হয়ে গেছে। কত ঘরের শুধু ভিটে পড়ে আছে, কত ঘরের মেয়ে জাতের বার হয়েছে। কত শিশু ভিখারী হয়েছে। আর দালালীর কমিশনে থলি ভরে উঠেছে অটলনাথের। মণিমালা মরবেন, অটলনাথের ঘরের প্রদীপটি নিভে যাবে, এর মধ্যেও আজ বিচলিত হবার মত কোন আঘাত পায় না অটলনাথ।

প্রতিবেশীরা একের পর এক এসে অটলনাথকে শুনিয়ে দিয়ে গেলেন—খুব দেখালেন মশাই! এবার যদি ভাল চান তো ওঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

জনা আর প্রীতি, মেয়ে দুটো ঠিক এই সন্ধিক্ষণে অটলনাথের উদ্বেগ বাড়িয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে ছুটি নিয়ে মরণপথযাত্রিণী মায়ের কাছে এসে জুটলো। মেয়ে দুটোর কান্নাকাটি, ডাক্তার ডাকাডাকি, লম্বাচওড়া ওষুধের প্রেসক্রিপশন, ফুড আর ফলের ফর্দ—চারদিক থেকে একটা দাবির ঝড় যেন ষড়যন্ত্র করে অটলনাথের থলিটাকে ধ্বংস করার জন্য দাপাদাপি শুরু করল।

এই সঙ্কটে অটলনাথকে বাঁচিয়ে দিল কান্তিকুমার।

টাকার থলিটা কান্তিকুমারের কাছে সঁপে দিয়ে অটলনাথ প্রায় কেঁদে ফেললেন—কান্তি, তুমি আমার বন্ধুর ছেলে। এ শহরে তুমি ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার গায়ের রক্ত-জল-করা এই সামান্য পুঁজি তোমার কাছেই থাকুক। তোমার মণিমাসী তো ফাঁকি দিয়ে আমার আগেই চললেন। শুধু কুটোর মত আমি একাই সংসারের সমুদ্রে ভেসে রইলাম। নেহাত প্রাণের দায়ে না পড়লে এই জঞ্জাল আর তোমার কাছে ফিরে চাইতে আসবো না। ওসব তোমারই হবে। তুমি এটা রেখে দাও তোমার কাছে। আর, কেউ টের না পায় যে এটা তোমার কাছে আছে।

মণিমালা বেশি দেরি করেননি। সপ্তাহের মধ্যেই মারা গেলেন। অটলনাথের থলিভরা ভবিষ্যৎ অটুট হয়ে কান্তিকুমারের কাছেই রইল। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যে এক পয়সাও খরচ করতে না পেরে অসহায় অটলনাথ কাঁদলেন অনেক, প্রতিবেশীরা তাঁকে সান্ত্বনা দিল অনেক। ওই কান্তিকুমার লিখবে এই অটলনাথ বসু চৌধুরীর জীবনী।

রামগড়ের বাতাসে একটি গোপন খবর ফিসফিস করে—কান্তিকুমার আর জয়া, জয়া আর কান্তিকুমার।

প্রতাপবাবুর মত একটি পিতৃদেব ছাড়া আপন বলতে জয়ার আর কেউ নেই। আজ ওর বয়স সাতাশ বছর। আপন করে নেবার মত কোন নতুন জনের ডাক আজও আসেনি, জীবনে আর আসবে কি না কে জানে। দেখতে সুন্দর হলেও দীর্ঘপ্রতীক্ষার অভিমানে সেই স্তোকনম্র তারুণ্য যেন বয়সের ভারে ও আলস্যে একটু নত হয়ে পড়েছে। সময় এসে পড়লে মধুবল্লীও কাঁটাগাছ জড়িয়ে ধরে। যার সময় পার হতে চলেছে, তার কাছে কান্তিকুমার তো সোনার তরুয়ার চেয়েও বেশি। এত ভাল ছেলে কান্তিকুমার!

জয়ার বাবা প্রতাপবাবু বলতে গেলে কিছুই রোজগার করে না, অথচ চলে য়ায় একরকম, কারণ কান্তিকুমার নামে এক উপকারের মহাজন তার সহায় আছে।

কান্তিকুমার প্রতাপবাবুর কেউ নয়। দু'বেলা ছেলে পড়িয়ে, আট ঘণ্টা হাজারিমলের অটোমোবিল স্টোরে কলম পিষে কান্তিকুমার যা রোজগার করে, তার উত্তমাংশ সবই প্রতাপবাবুর সংসারের শত রকম দাবির যোগান দিতেই ফুরিয়ে যায়। সামান্য উপার্জনের মাত্রা এতটা টান সইতে পারে না। তাই মাঝে ধার করতে হয় কান্তিবাবুকে। ধার শোধের সংস্থান করতে গিয়ে হয়তো তৃতীয় একটা ধুতি কেনা আপাতত স্থগিত রাখতে হয়। বর্ষার মেঘের মতই কান্তিকুমারের মনটা, পরের জন্য সমবেদনায় গলে পড়ছে, নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে।

প্রতাপবাবুর নাকি এককালে খুব ভাল অবস্থা ছিল। প্রবাদ আছে, সোনার ছিপে মাছ ধরতেন। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। ছিপটা বাঁশেরই ছিল, হুইলটা ছিল সোনার তৈরি। এখন অবশ্য মাঝে মাঝে মুনসেফ আদালতের বারান্দার এক কোণে দোয়াত-কলম নিয়ে বসেন। দু'-একটা দরখাস্ত লেখার কাজ পেয়ে যান। আট দশ আনা যা আসে তাই লাভ।

এক-একদিন ধারে ফিকিরে বের হয়ে হয়তো অনেক রাত্রে ঘরে ফেরেন প্রতাপবাবু। জয়া জেগে বসে থাকে। খেতে বসে গম্ভীর হয়ে প্রতাপবাবু বলেন—শ্রীনিবাস আজ আমায় অপমান করেছে জয়া।

জয়া—কেন?

—কিছুই কারণ নেই। গায়ে পড়ে উপদেশ দিল, কান্তির সঙ্গে তোর বিয়ে দেবার জন্য।

জয়া চুপ করে থাকে। শ্রীনিবাসবাবুর উপদেশের মধ্যে অপমানের প্রমাণ খুঁজতে গিয়ে মনে মনে হেসেও ফেলে।

প্রতাপবাবু নিজের মনে বলতে থাকেন—কান্তি ছেলেটির হৃদয় খুব মহৎ সন্দেহ নেই। নিজে দারুণ অভাবে থেকেও দরকারের সময় চাইতেই দু'-চার টাকা ধার দিয়ে দেয়। তবে সবই তো শোধ করে দেব একদিন। তাই বলে ওর সঙ্গে প্রতাপ রায়ের মেয়ের বিয়ে? কি যে বলে! শ্রীনিবাস একটা স্টুপিড।

খাওয়া শেষ হলে, হাত-মুখ ধুয়ে, পান চিবিয়ে একটা ছেঁড়া কৌচের ওপর নতুন চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে থাকেন প্রতাপবাবু। সিগারেটের নতুন টিনটা খোলেন। সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে আর একটা মিঠে-পচা গন্ধ ঘরের বাতাসে ভুরভুর করে ওঠে। জয়া বুঝতে পারে, প্রতাপবাবু আজ মদ খেয়েছেন। ঐ নতুন চাদর আর এক টিন সিগারেট আজই কেনা হয়েছে। আজই সকালে কান্তির কাছে কুড়িটা টাকা চেয়ে নিয়ে এসেছেন প্রতাপবাবু। জয়া সব খবর রাখে।

পরের দিন জয়ার সঙ্গে কান্তি একবার যখন দেখা করতে আসে, প্রতাপবাবু তখন বাড়িতে নেই। জয়া হেসে হেসে বলে—কান্তিদা, তুমি শিগগির বড়লোক হও। নইলে শেষে বড় অপমানের ব্যাপার হবে।

—কেন বল তো?

—বাবাকে তুমি এতদিন ভুল বুঝেছ, আমিও ভুল বুঝেছি। তিনি শুধু তোমার টাকা ধার নিচ্ছেন, শোধ করে দেবেন একদিন। আর কোন ভাবে তোমাকে আমল দিতে বাবা রাজি নন।

হঠাৎ জয়ার চোখ ফেটে জল দেখা দেয়। কিন্তু অভিমানিনী নায়িকার মত চুপ করে থাকার উপায় ওর নেই। তাই জয়াকে বলতে হয়—তুমি আমাকে চারদিকের এ দুর্নামের ঘেন্না থেকে বাঁচাও কান্তিদা। তুমি নিজে বড় হও, অবস্থা ভাল করে নাও। যারা আজ তোমাকে আড়ালে বদমাস বলে গালি দিয়ে বেড়ায়, তখন তারাই তোমাকে প্রেমিক বলে বাখান করবে।

যেন কৌতুক করার জন্যই মুখে হাসি টেনে কান্তিকুমার বলে—আমি এখন সত্যিই বড়লোক হয়ে আছি, জয়া। আমার কাছে নগদ দশটি হাজার টাকা আছে, তোমার বাবা কি সে-খবর জানেন?

জয়া—আমার জন্য বলবার কেউ নেই, তাই প্রাণের দায়ে বেহায়ার মত তোমাকে নিজের মুখে সব বলতে হচ্ছে। এর ওপর তুমি আর বৃথা ঠাট্টা অপমান করো না।

—বিশ্বাস কর জয়া। প্রীতির বাবা অটলবাবু টাকাটা আমার কাছে জমা রেখে গেছেন। আবার চাইতে এলে দিতে হবে।

দৃষ্টিটা আরও গভীর করে নিয়ে কান্তিকুমারের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, যেন দুর্মদ একটা আগ্রহে আকুল হয়ে জয়া হঠাৎ অনুরোধ করে বসলো—ফেরত দিও না, কান্তিদা।

—ছিঃ, ওকথা বলো না।

—পরে না হয় শোধ করে দিও, এখন টাকাটা দিয়ে একটা কারবার শুরু করে দাও।

—সেটাও অন্যায় হবে। কারবার যদি ফেল পড়ে, তখন পাপের ভাগী হবে কে?

—আমি হব। আমার জন্য তুমি এটুকু সাহস কর কান্তিদা।

—থাম জয়া। সৎপথে থেকে কি টাকা হয় না?

—সৎপথে থেকে তো শুধু দুর্নাম রোজগার করছো আর দিন দিন রোগা হচ্ছো। অটলবাবুর মত নরপিশাচের টাকা তুলে নিয়ে দামোদরের জলে ফেলে দিলেও পুণ্যি হয়।

—এত ঘাবড়ে গেলে কেন, জয়া? আমাদের ভালবাসা ঠিক থাকলে কেউ আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারবে না। ধৈর্য হারিও না। তোমার বাবারও মন বদলাতে কতক্ষণ?

জয়ার মুখ আবার করুণ হয়ে উঠল—তুমি আমার দুঃখ বুঝতে পারলে না, কান্তিদা। বড় বেশি ভালমানুষ তুমি। ধৈর্য, সৎপথ, ভালবাসা ঠিক রাখতে হবে, বাবার মন বদলাবে, এতগুলি ছুতো মানতে গিয়ে তোমার দফা শেষ হবে, দিন ফুরিয়ে যাবে। তারপর...তারপর আর কোন কিছুর মানে হয় না।

অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে গেল জয়া। জয়ার মন থেকে এই অলীক দুশ্চিন্তা আর সংশয়ের স্পর্শটুকু মুছে দেবার জন্য দুটো বেশি কথা বলে সান্ত্বনা দেবার সময়ও আর ছিল না। এখুনি আবার কাজে যেতে হবে। যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো কান্তিকুমার।

এই কান্তিকুমার লিখবে অটলনাথের জীবনী।

অটলবাবু বললেন—কন্ট্রাক্টটা পাওয়া গেলে সেটা তোমারও একরকম পাওয়া হলো, কান্তি। যদি একটু খেটেখুটে দাও, তবে তোমারও কিছু লাভের পাওনা হবে নিশ্চয়। যেভাবেই হোক, গুপ্ত ব্রাদার্সকে পথ থেকে সরাতে হবে, ওদের সঙ্গে রেট নিয়ে কম্পিটিশনে এঁটে ওঠা মুশকিল। আজকালের মধ্যেই ওরা টেন্ডার দাখিল করে দেবে। তার আগে একটা ব্যবস্থা করতেই হয়, কান্তি।

বিরক্তি চাপতে গিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে কান্তিকুমার—লোভ দেখাবেন না, অটলবাবু। আপনার সঙ্গে কারবার করে বড়মানুষ হবার কোন মোহ নেই আমার।

মুহূর্তের মধ্যে, যেন নিজের হঠকারিতার নিদারুণ ভুলটুকু বুঝতে পেরে অটলবাবুর কথাগুলি অনুতাপে পুড়তে থাকে—সত্যি, বড় লজ্জা, দিলে, কান্তি। এই অধম কুলি-বুড়োর ভাষা মাপ করো, কিছু মনে করো না। তুমি আমার বন্ধুর ছেলে, তোমার কাছে যদি একটু উপকার আশা না করি, তবে আর কার কাছে...।

প্রত্যুত্তরে কান্তিকুমারের কথাগুলিও সঙ্গে সঙ্গে শীতল হয়ে যায়—উপকারের কথা যদি বলেন, তবে অবশ্য আমি প্রতিবাদ করতে চাই না। কিন্তু আমার এমন কি সামর্থ্য আছে যে...।

অটলনাথ—আছে আছে, একমাত্র তোমারই সামর্থ্য আছে কান্তি। তোমার মত চরিত্র আর বিদ্যেবুদ্ধি, যা ছোঁবে তাই সোনা হয়ে যাবে। নইলে আমার মত গবেটের কি সাধ্যি আছে যে, বিজিনেস করতে পারি? না কান্তি, আমাকে এই উপকারটুকু তোমায় করতেই হবে।

কান্তিকুমার চুপ করে ছিল। ভদ্রলোকের ছেলে কান্তিকুমার, মনের মাটিটা তাই খুব নরম। সামান্য বর্ষাতেই ভিজে কাদা হয়ে যায়। অটলনাথের আবেদনটাও এইবার তাই ঠিক জায়গা বুঝে অঝোরে ঝরে পড়লো—এটা আমার বুড়ো বয়সের একটা শখ, একটা ব্যামো মাত্র, কান্তি, কারবার করবো। তুমি শুধু আমার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে একটু পথ দেখিয়ে দেবে, শুধু দুটো পরামর্শ, এক-আধটা পলিসি, একটুখানি প্যাঁচ, আর একটু...।

একটা প্রসন্নতার উচ্ছ্বাস চাপতে না পেরে হেসে ফেললো কান্তিকুমার। অটলনাথ বললেন—এর জন্য তোমাকে কোন দক্ষিণা দিয়ে তুষ্ট করার দুঃসাহস আমার নেই। তবে হ্যাঁ,

যদি কোন দিন তোমাকে সম্মানী হিসাবে কিছু দিতে যাই, হাত তুলে তোমাকে নিতেই হবে কান্তি। জেনো, সেটা আমার আশীর্বাদ, আমার দেওয়া উপহার মাত্র। যদি সর্বস্ব দিয়ে ফেলি, তাও তোমায় নিতে হবে। প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না কান্তি, তুমি আমার বন্ধুর ছেলে।

কান্তিকুমার বলে—আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন?

কথাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা আশ্বাসের স্নিগ্ধতা ছিল।

আশ্বাসটা সর্বসংশয়ের কুহেলিকা ঘুচিয়ে প্রখর ভাবে জ্বলে উঠলো ক'টি মাসের মধ্যেই। দেখা গেল, কন্ট্রাক্টর অটলনাথ ছোট একটি অফিস খুলেছেন। একটি দারোয়ান আছে। আর আছে কান্তিকুমার। কান্তিকুমার শুধু পাপকে ঘৃণা করে, পাপীকে ঘৃণা করে না। উপকারের সুগ্রীব কান্তিকুমার সহায় হয়েছে অটলনাথের।

সূর্যপুরা থেকে চৌধুরীঘাট, নতুন সড়ক তৈরির কন্ট্রাক্ট। কম করে ত্রিশটি হাজার টাকা মুনাফা থাকবেই।

অটলনাথ বললেন—ওয়ার্কস্ অফিসের হেড-কেরাণীকে আগে বাগাতে হবে।

কান্তিকুমার এক সন্ধ্যায় হেড-কেরাণীকে ঘুষ পৌঁছে দিয়ে এল, সাতশো টাকার নোটের একটি তাড়া।

অটলনাথ বললেন—গুপ্ত ব্রাদার্সের মেজ গুপ্তকে বিগড়ে দিতে হবে।

কান্তিকুমার দু'বোতল হুইস্কি নিয়ে মেজ গুপ্তকে নয়াবাজারের গলিতে একটা ঘর চিনিয়ে দিয়ে এল।

অটলনাথ মাঝে মাঝে হঠাৎ অফিস-ঘরের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে সভয়ে তাকিয়ে পরমুহূর্তে পাশের ঘরে লুকিয়ে পড়েন। পাওনাদার আসছে। কান্তিকুমার নীলকণ্ঠের মত পাওনাদারের যত কটূক্তি আর অপমানের বিষ হজম করে। নিঃসঙ্কোচে বলে দেয়—অটলবাবু নেই, কলকাতা গেছেন।

এই সব দুষ্কৃতির কলুষ কান্তিকুমারের মন স্পর্শ করতে পারে না। সে যেন তার বিবেককে আলগোছে সরিয়ে রাখতে পারে। কান্তিকুমার জানে, এই কারবারের অধিকর্তা হলেন অটলনাথ, সে নিজে উপদেষ্টা মাত্র। অটলনাথের কারবারী অভিযানের সকল কূটনীতির দূত মাত্র কান্তিকুমার। শুধু দৌত্যের সম্মানটুকুই তার প্রাপ্য এবং তাতেই সে তৃপ্ত। এর ওপর তার কোন দাবি নেই। বিবেকে বাধে।

কিন্তু অটলনাথ প্রতি মাসে কান্তিকুমারকে অতি নিয়মিতভাবে পনেরোটি করে টাকা সম্মানী দিতে ভুল করেন না। এই সম্মানীটা কিন্তু মজুরির চেয়ে নিয়মিত ও নির্দিষ্ট। একটা খটকা লাগে মনে, কিন্তু পরমুহূর্তে কান্তিকুমারের নীতিমুগ্ধ মনের সব সংশয়ের ভাব একটি যুক্তির আঘাতে লঘু হয়ে যায়—হলোই বা মজুরি। চাকরি বললেও ক্ষতি কি? যে মাঝি ডাকাতকে খেয়া পার করে দেয়, তার কি দোষ? মাঝি শুধু খাটুনির মজুরি পায়, লুঠের ভাগ তো পায় না। তাই তো সে পাপের ভাগীও হয় না।

প্রতাপবাবু নামছেন, আর অটলনাথ উঠছেন। এ দুয়ের মাঝখানে শুদ্ধাচলে স্থির হয়ে আছে একটি ভদ্রলোকের এক-কথার মূর্তি—কান্তিকুমার।

এই কান্তিকুমার লিখবে অটলনাথ বসু চৌধুরীর জীবনী।

জয়া জিজ্ঞাসা করেছিল—প্রীতির বাবার কারবারে তুমি নাকি চাকরি করছো?

কান্তি—হ্যাঁ, ওখানে চাকরি করাই ভাল। যা কেলেঙ্কারি আরম্ভ করেছেন অটলবাবু, ওর মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না।

জয়া—আশ্চর্য করলে তুমি। চাকরি করলে কি জড়ানো হলো না?

—না, আমি তো কারবারের লাভের ভাগীদার নই। কাজেই পাপের ভাগীদারও হব না। তাছাড়া অটলবাবুর অদৃষ্টে কখন যে হাতকড়া পরবার ডাক এসে যাবে, কে জানে? তার ভাগীদারও হতে চাই না।

—আমি যদি কান্তি হতাম, তাহলে অটলনাথকে ডুবিয়ে দিয়ে কারবারটা নিজে বাগিয়ে নিতাম। আমার কাছে সেটাই একমাত্র পুণ্য কাজ হতো।

জয়ার মুখের ভাব কঠোর হয়ে ওঠে। কান্তির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জয়ার চোখ দুটো একটা অসহ ক্ষোভের জ্বালায় ফুটতে থাকে—আচ্ছা, অটল বুড়োকে ঠকাতে না পার, আর এক বুড়োকে পারবে?

—কাকে?

—আমার বাবাকে।

—সে কি কথা? তোমার বাবাকে ঠকাবো কেন?

—হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে চল, কান্তিদা। আমি এখানে আর থাকতে চাই না। চল, কাউকে না বলেই আমরা দু'জনে চলে যাই।

মরমে মরে গিয়ে কান্তিকুমার বলে—নিজেকে এত ছোট করে ফেলছো কেন জয়া? ভুল করো না। অধীর হওয়াই ভালবাসার প্রমাণ নয়। প্রতীক্ষার জোরেই ভালবাসা বড় হয়। তুমি আমার কথাটা একবার ভেবে দেখছো না, জয়া? দেখছো না, কত দুঃখ দুর্নাম পরিশ্রম সহ্য করে দিনের পর দিন শুধু তোমারই জন্য...।

—দোহাই তোমার, একবারটি তুমি সব সহ্য ধৈর্য হারিয়ে আমার কাছে এস। আমাকে জোর করে এখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চল। আমাকে আর অপমান করো না, কান্তিদা।

—একটু ধৈর্য ধর জয়া।

ঘন শিশু গাছের আড়ালে অটলনাথ বসু চৌধুরীর বাড়িটাকে দূর থেকে কোন বাদশাহী মহল বলে মনে হয়। শুধু ফটকের থামে লেখা 'মরকত-কুঞ্জ' নামটাই সে-ভুল ভাঙিয়ে দেয়। আজকের কুলিরাও কত অল্পদিনের মধ্যে সেই ছাতুখেকো অটলনাথকে ভুলে গেছে, নইলে মরকত-কুঞ্জকে তারা কখনই 'রাজাবাবুর বাড়ি' বলতো না। এই বৈভবের ছবি মণিমালার স্বপ্নের দুরাশাতেও কখনো উঁকি দেয়নি। মণিমালা ফুরিয়ে গেছেন অনেক দিন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সে-সংসারের দুঃখী নটে-গাছটিও কবে মুড়ে গেছে। এখন আরম্ভ হয়েছে একেবারে নতুন করে। হলঘরে গজদন্তের ফ্রেমে বাঁধানো অয়েল-পেন্টিংয়ের মণিমালা নিষ্পলক চোখে কাঞ্চনপুরীর সীমাহীন প্রাচুর্যের দিকে তাকিয়ে যেন অবাক হয়ে রয়েছেন।

লোকে কত ভাবে জল্পনা-কল্পনা করেছে, কিন্তু আজও কেউ কিছু ঠাউরে উঠতে পারে না, কি করে অটলবাবু হঠাৎ এত ফেঁপে উঠলেন? কাঠুরিয়ার মাণিক কুড়িয়ে পাওয়ার গল্পকেও বিস্ময়ে ছাপিয়ে উঠেছে। শতবাহু বিস্তার করে এগিয়ে চলেছে অটলবাবুর প্রতিভা। মান-সম্পদের আকাশে যতগুলি চাঁদ-সুরজ-তারা আছে সবই যেন তিনি লুফে নেবেন। এরই মধ্যেই দশটা জয়েন্টস্টক কারবারের ম্যানেজিং এজেন্সির টুপি তাঁরই মাথায় এসে ভিড় করেছে, আরও আসছে। গালা রেশম অভ্র চা আর টিম্বার—এইসব পণ্যের রপ্তানী কারবারের ষোল আনা মালিকানা অটলবাবুকে প্রায় চাঁদসদাগর করে ফেলেছে। অটলনাথ স্বয়ং একটি উপ-ভগবান; এক হাজার কুলি কেরানী ও কারিগরের অন্নবিধাতা।

শিবাজী উৎসবে এক হাজার লোকের সভায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে নির্ভীক জনহিতৈষী অটলনাথ বক্তৃতা করতে তিলমাত্র দ্বিধা করেন না।—'বাণিজ্যে বসতে মুক্তি! দেশবাসীর কাছে আমার এই একমাত্র বাণী। মহারাজা শিবাজীর আদর্শকে যদি আজ সার্থক করতে চাই তবে বাণিজ্যের গেরুয়া ঝাণ্ডা আবার তুলে ধরতে হবে। জয়তু শিবাজী।'

করতালির শব্দে সভার উল্লাস চিড়বিড় করে ফুটতে থাকে। দেশের কল্যাণের জন্য ঘুম হয় না, এই রকম দুটো খবরের কাগজে এক হাত লম্বা শিরোনামা ফুলিয়ে অটলনাথের ভাষণ ছাপা হয়।

কান্তিকুমার প্রত্যহ অটলবাবুর লাইব্রেরি ঘরে একবার হাজিরা দিয়ে যায়। অটলবাবুর লাইব্রেরি? কথাটা শুনতে আজ আর কারও কানে খটকা লাগে না। সেদিন আর নেই। অটলবাবু ল্যাটিন ভাষায় কবিতা লিখছেন—একথা বললেও সহসা কেউ অবিশ্বাস করে ফেলতে পারবে না। ভাগ্যের ছাপর ফুঁড়ে রুপোবৃষ্টি হবার আগে, জীবনের পঁয়তাল্লিশটি বছর যে-মানুষ শুধু কথামালা কাকচরিত্র আর পঞ্জিকা ছাড়া কোন পুঁথির পাতা উল্টে দেখেননি, তাঁরই প্রাসাদের এক প্রশস্ত কক্ষে সারি সারি মেহগনির আলমারি আর মরক্কো-বাঁধাই বই। জ্ঞানকুসুমের একটি ভরা মালঞ্চ—তারই মালাকার হলেন অটলনাথ।

বাইরের লোক জানে, কান্তিকুমার হলো অটলনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারি। অটলনাথ তাই বলেন। এটা হলো কান্তিকুমারের পোশাকী পরিচয়। কিন্তু ঘরে যখন কেউ থাকে না, শুধু দু'জনে মুখোমুখি বসে, তখন অটলনাথ বেশ সমীহ করে, বেশ একটু অন্তরঙ্গতার সুরে সেই আটপৌরে নাম ধরেই ডাকেন—তা হলে বলতে হয় কান্তি মাস্টার...।

এই সেক্রেটারিগিরি তথা মাস্টারিগিরির জন্য মাসিক বিশটি টাকা দক্ষিণা পায় কান্তিকুমার।

সকাল সাড়ে ন'টা থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত হাজারিমলের অটোমোবিল স্টোরে হিসেব কষে কষে কান্তিকুমারের মাথার ভেতর পিস্টনগুলি যখন ক্ষয়ে গিয়ে ঝিমঝিম করতে থাকে, ঘাড়ের কাছে স্নায়ুর গিঁটগুলিতে স্পার্কের শক্ লাগে, বুকের ভেতর ফ্যানবেল্ট ছিঁড়ে গিয়ে দম ফুরিয়ে আসে—তখন ছুটি হয়। ঘরে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে, দুটো রুটি চিবিয়ে এক গেলাস জল খায়। নিস্তেজ মনুষ্যত্বের ইঞ্জিনটা তখন বোধ হয় একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তারপরেই এক অভিনব মাস্টারির পালা প্রায় রাত্রি দশটা পর্যন্ত।

লাইব্রেরি ঘর। টেবিলে মুখোমুখি দু'জনে বসেন। অটলনাথ বলেন—কিছু একটা পড়ে শোনাও দেখি মাস্টার।

হাত বাড়িয়ে যে-বইটা পেল এবং খুলতেই যে পৃষ্ঠা দেখা দিল, গ্রামোফোনের মত সেখান থেকেই পড়া শুরু করে দিল কান্তিকুমার।—জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে, স্ত্রী জাতি সর্বতোভাবে পুরুষের তুল্য, অতএব...

পড়া সামান্য অগ্রসর হয়েছে, অটলনাথ মাথা দোলাতে লাগলেন। বোঝা গেল, এটা একটা আপত্তির সঙ্কেত। —উঁহু, হলো না, এ যে কিছুই বাগিয়ে বলতে পারছে না, মাস্টার। গোড়াতেই ভুল করে ফেললো।

কান্তি--আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। এ বইটা রেখে দিই, কি বলেন?

—কি নাম বইটার?

—বিবিধ প্রবন্ধ।

—কে লিখেছে?

—বঙ্কিমচন্দ্র।

--কি দুঃখের কথা! শেষে কিনা বঙ্কিম পর্যন্ত একটা সাদা কথা ধরতে পারলে না, মাস্টার?

অটলনাথ তাঁর কাঁচা-পাকা রোমশ ভুরু দুটো টান করে সত্যিই আক্ষেপ করে বলেন —না মাস্টার, অন্য একটা ধর। একটু ইতিহাস শোনাও।

কান্তিকুমার ইতিহাসের বই নিয়ে বসলো। পড়া আরম্ভের আগেই অটলনাথ অন্য প্রসঙ্গ এনে ফেললেন--বঙ্কিম কি রকম ইয়ে জমিয়ে ছিল, কিছু খবর রাখ মাস্টার?

--বুঝলাম না, স্যার।

—ক্যাশ হে ক্যাশ, যাকে বলে নগদ নারায়ণ।

—আজ্ঞে না, সে খবর ঠিক জানি না।

—এগার লক্ষ তেত্রিশ হাজারের বেশি হবে কি?

—এত নগদ টাকা কোথায় পাবেন বঙ্কিম চাটুজ্যে?

—তাহলেই বোঝ মাস্টার! এত বিদ্যে-সিদ্যে নামডাক পসার সব বৃথা হল না কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তুমি এখন বুঝতে পারছো, বিদ্যে জিনিসটা বই ঘেঁটে পাওয়া যায় না। ভগবান যাকে পাইয়ে দেন, সেই পায়। কি বল?

—ঠিক কথা। আকবর বাদশাহ ক-খ জানতেন না, কিন্তু এদিকে...

—ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ না থাকলে ধর আমারই কথা, এতখানি বিদ্যে এমনি এমনি পেতাম কি?

—আপনার কথায় কোন ভুল নেই স্যার।

সত্যি কথা, অটলনাথের কোথাও কোন ভুল হয়নি। গোরক্ষা সমিতি থেকে শুরু করে আদি ভারত প্রত্নশালা পর্যন্ত সর্ব ঘটে তিনি বিরাজ করছেন। কোথাও সদস্যরূপে, কোথাও সচিবরূপে এবং কোথাও কোথাও প্রেসিডেন্ট ও পেট্রনরূপে। গত পয়লা বৈশাখেও সুরাপান নিবারণী সভার বার্ষিক বিবরণ তিনিই পড়েছেন।

কিন্তু জয়নগরের ডিস্টিলারির ডাক হবে আসছে মাসেই। বদলী হয়ে নতুন আবগারী সুপারিন্টেন্ডেন্টও এসেছে। অটলনাথ বললেন—ইতিহাস পড়া এখন রেখে দাও, মাস্টার। আবগারী সুপারিন্টেন্ডেন্টকে একটি জলসা দিতে হবে। বেশ গুছিয়ে একটা অভিনন্দন লিখে ফেল দেখি।

অটলনাথের বোধহয় ভুল হচ্ছে, অথবা অন্য কাউকে অভিনন্দন জানাতে চান। আন্দাজে ধারণা করে নিয়ে কান্তিকুমার বলে—আবগারী সুপারকে আপনি অভিনন্দন জানাবেন কেন?

—জয়নগর ডিস্টিলারির ডাক হবে হে মাস্টার। এই বছরটার জন্য আমিই ডেকে নিতে চাই। এক বছরে কত প্রফিট জান?

—কিন্তু স্যার, লোকে যে আড়ালে নিন্দে করে বলবে, শেষে কিনা অটলনাথের মত জনহিতৈষী মদের ভাটির ঠিকে নিল!

—আমার বদলে যদি রায়সাহেব বুদ্ধিচাঁদ ডিস্টিলারিটা ডেকে নেয়, তাহলেই বুঝি খুব জনমঙ্গল হবে? বছরে ছিয়াত্তর হাজার টাকার প্রফিট অবাঙালীর হাতে গিয়ে পড়ুক, তোমরা বুঝি তাই দেখলে খুশি হও?

অটলনাথ চোখ পাকিয়ে কথাগুলি বললেন। কান্তিকুমারের আর কিছু উত্তর দেবার মত যুক্তি ছিল না। অটলনাথের বাণিজ্যসাধনার পুঞ্জ পুঞ্জ মুনাফা বাঙালীর জাতীয় রাজকোষ ফাঁপিয়ে তুলেছে, চুপ করে কলমের নিব খুঁটে খুঁটে এই বিশ্বাসটাকেই বোধহয় খতিয়ে দেখতে থাকে কান্তিকুমার।

ঘড়ির কাঁটার মুখে বর্ষার রাত্রি বারোটার দিকে ঠেলে ওঠে। কান্তি হাই তোলে, চোখের পাতা শিথিল হয়ে আসে, পেটের নাড়িতে ক্ষুধার ইশারা মোচড় দেয়। তবু কান খাড়া করে থাকতে হয়, অটলনাথের কোন প্রশ্নের উত্তর যেন ফসকে না যায়।

অটলনাথ স্মরণ করিয়ে দিলেন—কই, তুমি আমার কথার কোন উত্তর দিচ্ছ না যে?

কান্তি মাস্টার যেন ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপে একেবারে গলে পড়লো—মাপ করতে আজ্ঞা হয় স্যার। আমি আপনার মত ওভাবে তলিয়ে দেখিনি। তিন বছরের জন্য ডিস্টিলারিটা ডেকে নিলে ভাল হতো স্যার।

—আপাতত, হুঁ। অটলনাথ ঢেঁকুর তুলে থেমে গেলেন।

অটলনাথের মুখের চেহারা থেকে ক্ষণিকের রুষ্ট অন্ধকার আবার ফরসা হয়ে গেল। কান্তিকুমারও নিশ্চিন্ত হয়ে ছাতাটা হাতের কাছে টেনে নেয়।

অটলনাথ বলেন—আর একটা কথা আছে মাস্টার। চিঠিপত্রে বিজ্ঞাপনে নোটিশে বা রিপোর্টে, আমার নামটা আর ওভাবে লিখবে না। এবার থেকে নামের আগে 'বাণিজ্যবীর' কথাটা বসিয়ে দেবে। বাণিজ্যবীর অটলনাথ, বুঝলে? ভুল হয় না যেন।

—যে আজ্ঞে।

কান্তিকুমার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অটলনাথও উঠে দাঁড়িয়ে আর একটা কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলেন—জীবনীটা এইবার লিখতে শুরু করে দাও মাস্টার। জিনিসটা যেন ভাল হয়, তাহলে তোমাকেও খুশি করে দেব। একেবারে একসঙ্গে নগদ-নগদ হাতে হাতে মোটা রকমই কিছু পেয়ে যাবে।

ক'দিন থেকে জয়ার জ্বর হয়েছে। প্রতাপবাবু দিনে দু'বার করে কান্তিকুমারের কাছে টাকার তাগাদায় আসছেন। টাকা নিয়ে যাচ্ছেন। এক দিন, দু'দিন—তিন দিন। প্রতাপবাবুকে খালি-হাতে ফিরে আসতে হল সেদিন। কান্তিকুমারের অর্থের সঙ্গতি একটি চাপেই খতম হয়ে গেছে। ধার করারও আর কোন নতুন আশ্রয় নেই।

জীবনে এই প্রথম কান্তিকুমারের পায়ের তলার মাটি চোরাবালির মত নরম হয়ে গেল। তার সকল আশ্বাস যেন এই একটি ঘটনায় নির্ভর হারিয়ে ফেলেছে। জয়াকে শুধু উপকারের ডোরে বেঁধে রেখেছিল কান্তিকুমার। যদি সেই বাঁধন একবার ছেঁড়ে, তবে ছিঁড়েই গেল বোধহয়।

জয়ার কাছে মুখ দেখাবে কি করে? এক অমোঘ সুসময়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জয়ার ভালবাসার অধৈর্যকে এতদিন বেঁধে রেখেছে কান্তিকুমার। আজ এসেছে দৈবের উৎপাত। টাকার অভাবে জয়ার চিকিৎসা হবে না। জ্বরের ঘোরে হেসে উঠবে জয়া। তার ভালবাসার মুরোদ ধরা পড়ে যাবে জয়ার কাছে।

টাকা চাই। রাত জেগে অটলনাথের জীবনী লিখছে কান্তিকুমার। অন্তঃসার আর নেই বোধহয়, মেরুদণ্ডটা ধনুকের মত বেঁকে যায়। দুটো নিদ্রাহীন আতঙ্কিত চোখ খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে থাকে। একটা নির্লজ্জ কলম ক্লান্তিহীন মোসাহেবী-আনন্দে পাতা ভরে ভরে এক অত্যুচ্চ সততার ইতিহাস লিখে যায়—অটলনাথের জীবনী। এছাড়া আর কোন্ পথ আছে কান্তিকুমারের?

মাস্টারিরও কামাই নেই। অটলনাথ সেদিন বললেন, মেয়ে স্কুলের প্রাইজের বক্তৃতাটা একটু ফলিয়ে লেখ মাস্টার। আজকাল প্রগতির কথা যা সব শুনছি, সেসব কিছু কিছু দাও। বেশ একটু আর্ট করে লিখবে, রবি ঠাকুরের মত।

কান্তিকুমার আরও স্পষ্টভাবে নির্দেশটা বুঝবার জন্য উৎসুকভাবে অটলনাথের দিকে তাকিয়ে রইল। অটলনাথ বললেন—বিয়ে ছাড়া মেয়েদের অন্য কোন পথ নেই, এই কথাটা জোর দিয়ে বলতে হবে। সেই সঙ্গে বেশ কড়া করে নিন্দে করতে হবে—লোকে কেন ঘরে ঘরে ধিড়িঙ্গে আইবুড়ো মেয়ে পুষে রাখে? এটা অধর্ম, এতে জাতিলোপ হবার আশঙ্কা আছে।

কান্তি—যে আজ্ঞে।

অটলনাথ—হ্যাঁ, আর একটি কথা লিখবে। পুরুষ অভিভাবক ছাড়া মেয়েদের গতি নেই। সেই অভিভাবক বাপই হোক বা স্বামীই হোক বা. .বা যে-ই হোক।

তেমনি নিবিষ্ট মনে লিখে চলেছিল কান্তিকুমার। অটলনাথ আবার বললেন—ভাষাটার দিকে একটু নজর রেখে লিখবে, মাস্টার। খারাপ করো না। অবিশ্যি, তোমার ভাষা যতই খারাপ হোক, আমি আমার পড়ার গুণেই কেমন জমিয়ে দিই, সে তো তুমি জান।

কান্তি—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অটলনাথ একবার পাশের ঘরে উঠে গেলেন। মিনিট পনের সেখানেই কাটলো। ফিরে এলেন যখন, তখন মুখের চেহারা বদলে গেছে। লালচে হয়ে গেছে, আগুনের আঁচ লাগলে যেমন হয়।

চেয়ারে বসে ছেলেমানুষের মত উসখুস করতে থাকেন অটলনাথ। কান্তিকুমারের কাছে এই দৃশ্য একেবারে নতুন নয়। একমাত্র স্কচ হুইস্কি পেটে পড়লে অটলনাথের হাবভাব এই পরিণত বয়সেও একটু দুরন্ত হয়ে ওঠে।

—কই, বক্তৃতাটা কি রকম লিখলে দেখি মাস্টার। একবার পড়ে শোনাও।

অটলনাথ সোফার ওপর শরীর এলিয়ে বসলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে ডিবেটা কান্তিকুমারের দিকে এগিয়ে দিলেন।—একটা তুলে নাও মাস্টার, লজ্জা করো না। আমেরিকার ক্রোড়পতি মালিকও চাকরানির সঙ্গে নাচতে দ্বিধা করে না, আমি তো তোমাকে বিশুদ্ধ একটি সিগারেট দিচ্ছি। নাও, নিয়ে ফেল।

কান্তিকুমার একটা সিগারেট তুলে নিয়ে খাতাপত্রের একপাশে রেখে দিয়ে লেখাটা পড়তে থাকে—আজ তোমরা ছাত্রী, কুমারী। কাল তোমরা গৃহিণী হইবে, মাতা হইবে। সেইতো জীবনের চরম সার্থকতা। তোমরা সেই জগন্মাতার অংশ, যাঁহার করুণার স্তন্যক্ষীরধারায় নিখিল বিশ্বের জীব লালিত হইতেছে ... বন্দে মাতরম্।

দু'ঠোটে লহ-লহ হাসি। ঝুঁকে-পড়া মাথাটা সোজা করে তুলে ধরলেন অটলনাথ। —বাঃ, খুব কায়দা করে বেড়ে সব দেহতত্ত্ব ঢুকিয়ে দিয়েছ, মাস্টার। চমৎকার হয়েছে।

আহ্লাদে আপ্লুত স্বরে কথাগুলি বললেন অটলনাথ। কান্তিকুমার হাবা ছেলের মত হাঁ করে তাকিয়ে তার মর্ম বোঝবার জন্য বৃথা চেষ্টা করে। চোখ বুজেই অটলনাথ আবার ডাকলেন—মাস্টার!

—আজ্ঞে।

—প্রতাপের বড় মেয়েটা বেশ বয়স্কা হয়েছে, নয় কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—প্রতাপের তো এমনিতেই পেট চলে না, মেয়ের বিয়ে দেবার সাধ্যি ওর নেই। নয় কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমাদের রাঁচী অফিসে প্রতাপকে একটা কাজ দিয়ে ওকে নিশ্চিন্ত করে দিলাম। গালার স্টোরের মেড়ো মুন্সীটাকে বিদেয় করে দিয়ে প্রতাপকে বসিয়ে দেব তার জায়গায়।

—ভালই হল স্যার!

—প্রতাপ তো রাঁচী চললো। কথা হচ্ছে মেয়েটা। মেয়েটা কোথায় থাকবে? আপাতত আমার এখানেই থাকবে। কি বল মাস্টার?

উদ্দাম কাশির মধ্যে ফিক করে হেসে ফেললেন অটলনাথ।

—আর একটা সিগারেট নাও মাস্টার। ডিবেটা সাগ্রহে কান্তিকুমারের দিকে এগিয়ে দিয়ে অটলনাথ আবার বললেন—প্রতাপটা যেন ঝড়ের আগে এঁটো পাতা। বলা মাত্র রাজি হয়ে গেছে। কালই কাজে জয়েন করতে চায়।

বলতে বলতে অটলনাথের গলার স্বর বিলোল হয়ে উঠতে থাকে।—মেয়েটাই বা কি কম যায়? এরই মধ্যে চারটে চিঠি ছেড়েছে, তার সঙ্গে ডাক্তারখানার ওষুধের বিল, বকেয়া বাড়িভাড়ার হিসাব, কাপড়ওয়ালার বিল, স্যাকরার পাওনা ..। চুকিয়ে দিয়েছি সব। অসুখ সারানো থেকে শুরু করে গয়না পর্যন্ত গড়ে দিলাম। মেয়েটা কিন্তু বাপের মত ততটা তোখোড় নয়।

আহত জানোয়ারের মত আচমকা হিংস্র মূর্তি ধরে একটা লাফ দিয়ে ছাতাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো কান্তিকুমার। সামনের সোফার উপর পড়ে এক বৃদ্ধ অজগর যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে

লালসায় কাতরাচ্ছে। মাথার উপর প্রচণ্ড একটা বাড়ি দিয়ে অজগরের জীবনের শেষ অধ্যায় এখুনি লিখে দিতে পারা যায়। কান্তি মাস্টার নয়, যেন হিংস্র এক খুনী ছুরি বাগিয়ে প্রস্তুত হয়েছে। তবু এই মূর্তিতে কান্তিকুমারকে যেন একটু বিসদৃশ মনে হয়, যেন অভিনয় করার জন্য একটা ভঙ্গী নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

অটলনাথ বললেন—উঠো না মাস্টার, কথা আছে।

কান্তিকুমারের উদ্ধত মূর্তিটা এই সামান্য একটি হুকুমের শব্দে যেন সেই মুহূর্তে চুপসে যায়। সতত সৎপথে চলা, কৃতজ্ঞতায় বাঁধা, পরোপকারে ডগমগ ও পুরস্কার-প্রীত একটি অতিভদ্রের পরবশ আত্মা ঘাড় গুঁজে চেয়ারের ওপর আবার একবারে সুস্থির হয়ে বসে। এখন তবু কান্তিকুমারকে বেশ স্বাভাবিক মনে হয়।

অটলনাথ বললেন—প্রতাপটা প্রথমে একটু চালাকি চাল চেলেছিল। বলে কিনা তার মেয়েকে বিয়ে কর, আমি নাকি সাক্ষাৎ শিব। আমি বললাম, তা হয় না। অন্নদাতা হিসেবে তার মেয়েকে রাখতে পারি, বিয়ে করতে পারি না।—আচ্ছা এবার তুমি উঠতে পার, মাস্টার।

নির্দেশমাত্র কান্তিকুমার যেন সুবাধ্য টাট্টুঘোড়ার মত খুটখাট খুরের শব্দ করে দরজার দিকে পা চালিয়ে চলতে থাকে। অটলনাথ ডাক দিলেন আবার—আর একটা কথা আছে, মাস্টার।

কান্তিকুমার দাঁড়ায়।

অটলনাথ বললেন—বাণিজ্যবীর নামটা সুবিধের নয় মাস্টার, আর ভাল লাগে না। ওটা বদলে দাও। এবার থেকে শুধু লিখবে—বাণিজ্যঋষি!

থিরবিজুরি

চিত্রা রায়ের স্বামী নিখিল রায়। লোকে বলে, হ্যাঁ, তা তো বটেই। বিয়ে যখন হয়েছে, তখন স্বামী না বলে আর উপায় কি? কিন্তু আসলে নিখিল রায় হলো একটা সাইফার।

মাত্র চার বছর হলো বিয়ে হয়েছে নিখিলের। বিয়ের মাত্র এক মাস পরেই নিখিলের সঙ্গে চিত্রা যেদিন ধানবাদের কাছে এই কলোনিতে কেরানী কোয়ার্টার্সের এই ছোট বাড়িটার ভিতরে এসে ঢুকলো, সেদিন অবশ্য কলোনির সকলেই বলেছিল, হেডক্লার্ক নিখিল রায়ের বউ এসেছে, বড় সুন্দর বউ।

নিখিল রায়ের স্ত্রী বেশ সুন্দরী, সংবাদটা রটে যেতে বেশি দেরি হয়নি। অফিসেও কাজের ফাঁকে নানা মুখের খোসগল্পের মধ্যে মাঝে মাঝে এই প্রসঙ্গটা ঝিলিক দিয়ে উঠতো। বাস্তবিক, সত্যিই নিখিল রায় একটা বিদ্যুৎ নিয়ে এসেছে। একেবারে একটি অথির-বিজুরি, মাইরি!

—নিয়ে এল কোথা থেকে?

যারা জানে তারাই উত্তর দেয়—কলকাতা থেকে।

—কলকাতার দয়া তো খুব, এমন জিনিস এমনিতেই ছেড়ে দিলে?

—এসব তো ভাই দয়া-টয়ার ব্যাপার নয়। এসব হলো ভাগ্যির ব্যাপার। খুব ভাগ্যি করেছিল নিখিল রায়।

সেদিন হেডক্লার্ক নিখিল রায়ের ভাগ্যকে অফিসের খোসগল্পগুলি হিংসে করলেও নিখিল রায়ের ভাগ্য একটুও বিচলিত হয়ে ওঠেনি। পথে বেড়াতে বের হতো নিখিল আর চিত্রা। যারা নিখিলকে চেনে, কিন্তু চিত্রাকে কখনো দেখেনি, তারাও দেখেই বুঝে ফেলতো, এই সুন্দরী মহিলাই হলো হেডক্লার্ক নিখিল রায়ের স্ত্রী।

দু'মাস যেতে না যেতে সারা কলোনিতে আর একটা সংবাদ রটে গেল খুব ভাল করেই এবং তারপর কলোনি ছাড়িয়ে ধানবাদের নানা মহলে আসরে ও কোয়ার্টারে। বেশ সুন্দর গলা, খুব ভাল গান গাইতে পারে হরিনগর কলোনির নিখিল রায়ের স্ত্রী।

—কি নাম যেন ভদ্রমহিলার?

যারা শুনেছে নাম, তারাই উত্তর দেয়। —নাম হলো চিত্রা রায়।

গানের খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে চিত্রা রায় নামটাও খ্যাত হয়ে গেল।

তারপর, চারটি মাস যেতে না যেতে, নানা জলসা, সভা ও সমিতির আহ্বানে আসতে আসতে আর উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইতে গাইতে চিত্রা রায়ের মুখটাও চিত্রিত হয়ে গেল ছেলেমহল আর মেয়েমহল থেকে শুরু করে শিশুমহলের মনে পর্যন্ত। পথে চিত্রা রায় যদি একাই বেড়াতে বের হয়, তবুও কেউ আর চিনতে ভুল করে না। —ঐ, উনিই হলেন চিত্রা রায়, নিখিল রায়ের স্ত্রী চিত্রা রায়।

সেদিন এই রকমই ছিল চিত্রা রায়ের পরিচয়। সে পরিচয় নিখিলের নামের সঙ্গেই বাঁধা। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই উল্টে গেল সেই পরিচয়। সন্ধ্যাবেলায় মার্কেটের আলোয় ঝলমল একটা দোকানের ভিতরে এসে দাঁড়ায় চিত্রা। জিনিসের দাম নিয়ে দরদস্তুর করে চিত্রা, আর নিখিল থাকে চিত্রার পাশে। দোকানের শো-কেসের কাচের উপর চিত্রা রায়ের সুন্দর চেহারার প্রতিচ্ছায়া ঝক্‌মক্ করে।

দোকানের ভিতরেই হোক, আর দোকানের বাইরে পথের উপরেই হোক, চিত্রাকে আর নিখিলকে দেখতে পেয়ে লোকের মুখে আলোচনা চলে।—ঐ ভদ্রলোক কে মশাই!

—ঐ তো, উনিই হলেন চিত্রা রায়ের স্বামী নিখিল রায়। সরকার অ্যান্ড সিন্‌হার হেডক্লার্ক নিখিল রায়।

হ্যাঁ, এক বছরের মধ্যেই উল্টে গেল পরিচয়। চিত্রারই নামের ছায়ায় ঘুরে বেড়ায় নিখিলের নাম। চিত্রাই হল আসল অস্তিত্ব। তার পাশে আছে নিখিল। চিত্রারই নামের গৌরব মানুষ করে রেখেছে নিখিলকে।

তবু তো মানুষ হয়েই ছিল, আর চিত্রার পাশেই ছিল নিখিল। কিন্তু এক বছর আগের সেই পরিচয়ও একেবারে অন্য রকমের হয়ে গেল আর তিন বছরের মধ্যে। তাই তো আজ লোকে বলে, নিখিল রায় একটা সাইফার।

চিত্রার পাশে আর নেই নিখিল। এখন চিত্রার পিছনে পড়ে গিয়েছে নিখিল। সিনেমা দেখতে, বেড়াতে, সভা-সমিতিতে বা মার্কেটে, যেখানে যখন যায় চিত্রা, তখন নিখিল তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, কিন্তু পিছনে। নিখিলের সঙ্গে যখন কথা বলে চিত্রা, তখন পিছনে মুখ ফিরিয়ে তাকাবারও কোন দরকার হয় না চিত্রার। চিত্রা যেন তার সম্মুখের পথের বাতাসকে উদ্দেশ করেই কথা বলে।—সঙ্গে টাকা এনেছ তো?

ঠিক শুনতে পায় নিখিল। শুনতে একটু ভুলও হয় না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—এনেছি।

এতদিনে, ধানবাদের কাছে এই হরিনগরে এসে চার বছরের মধ্যেই চিত্রা তার জীবনের সম্মুখের পথ একেবারে অবাধ করে নিয়েছে। অথচ, চার বছর আগে একদিন এক সকালবেলায় হরিনগর কলোনির সব বাড়ির জানালাগুলিতে থরে থরে সাজানো কৌতূহলী চক্ষুগুলি দেখতে পেয়েছিল, হেডক্লার্ক নিখিল চলেছে আগে আগে, তার পিছনে মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছে বড় সুন্দর ও শান্ত আর একটু গম্ভীর একটি মুখ নিয়ে একটি বউ। আর আজ? আজ আর সেই বউয়ের মুখটি দেখতে ঠিক সেই রকম শান্ত তো নয়, সেই একটু গভীরতার একটুও আজ আর নেই। বউয়ের মাথার কাপড় যেন এই চার বছরের মধ্যেই কোন্ এক ঝড়ের ঝাপটা লেগে খসে পড়ে গিয়েছে ঘাড়ের উপর। পড়েছে তো পড়েই গিয়েছে, আর উঠতে পারছে না। আজ চিত্রা রায়ই চলে আগে আগে, আর নিখিল পিছনে।

পিছনে হোক, তবু চিত্রার সঙ্গেই আছে নিখিল। তবে লোকে বলে কেন, একেবারে সাইফার হয়ে গিয়েছে নিখিল?

লোকে বুঝতে একটু ভুল করেছে। সামান্য একটু বাড়িয়ে বলেছে। সত্যি কথা হলো, সাইফার হয়ে যেতে চলেছে নিখিল। তাছাড়া, এবং লোকে না জানুক, আজ অফিস যাবার সময় যখন চিত্রার হাত থেকে একটা চিঠি স্বচ্ছন্দে হাত বাড়িয়ে নিয়েছে নিখিল, তখন আর কোন সন্দেহ নেই যে, এইবার সত্যি সাইফার হয়ে যাবে নিখিল।

অফিস যাবার জন্য তৈরি হয়ে প্রতিদিনের নিয়মের মত চিত্রার কাছে এসে দাঁড়ায় নিখিল।
—তাহলে আসি।

চিত্রা বলে—শোন।

খামে বন্ধ একটি চিঠি রয়েছে চিত্রার হাতে। হয়তো পোস্ট করতে হবে এই চিঠি। নিখিল বলে—চিঠি পোস্ট করতে হবে?

চিত্রা —না।

নিখিল—তবে?

হাত কাঁপে না চিত্রার, বোধহয় মনও কাঁপে না। শুধু অনামনস্কের মত অন্য দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে। তারপরেই প্রশ্ন করে—ভুল করবে না তো?

নিখিল—ভুল হবে কেন? কি এমন কঠিন কাজ করতে বলছো যে ভুল হবে?

চিত্রা—তবে শোন।

বলতে গিয়ে চিত্রার গলার স্বর একটুও কাঁপে না।

নির্দেশের প্রতীক্ষায় ব্যগ্রভাবে চিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিখিল। কিন্তু চিত্রা তাকায় না নিখিলের মুখের দিকে। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? এটা নতুন কিছু নয়। আজ চার

বছরের মধ্যে এই ঘরের ভিতর ক'দিনই বা নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়েছে চিত্রা? সেজন্য কোন দুঃখ ও দুশ্চিন্তা জাগেনি নিখিলেরও মনে। আজ নতুন করে হঠাৎ জাগবারও কথা নয়।

চিত্রা বলে—তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই বলছি।

নিখিল হাসে—আমাকে বিশ্বাস করবে না তো কাকে করবে?

নিখিল একটু আশ্চর্যই হয়। আজ একেবারে এরকম নতুন একটা প্রশ্ন কেন করছে চিত্রা। আজ পর্যন্ত তার ব্যবহারে এমন কোন ভুল কি দেখতে পেয়েছে চিত্রা, যার জন্য বিশ্বাসের কোন কথা উঠতে পারে? মনে তো পড়ে না নিখিলের, কখনো একটা প্রতিবাদ করে, কোন অভিযোগ করে, কিংবা কোন কথার উত্তর দিতে একটু দেরি করে চিত্রার মনে কষ্ট দিয়েছে নিখিল।

চিত্রা বলে—তবে, এই চিঠিটা নিয়ে...।

বলতে গিয়ে কেন জানি চুপ করে যায় চিত্রা। বিদ্যুৎ খেলে যায় যে সুন্দর চোখের দৃষ্টিতে, সেই চোখ দুটো যেন হঠাৎ একটা ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়।

কিন্তু তার পরেই আর কিছু নয়। ঝকঝক করে চিত্রার চোখ দুটো।

চিত্রা বলে—এই চিঠিটা নিয়ে গিয়ে মিস্টার সরকারের হাতে দিতে হবে।

নিখিল—দেব।

চিত্রা—মিস্টার সরকারের টেবিলের ওপর ফেলে রেখে আসলে চলবে না।

নিখিল—না, তাঁর হাতেই দেব।

চিঠি নিয়ে চলে গেল নিখিল। এইবার, আর বেশি দেরি হবে না। বোধহয় আজ সন্ধ্যা ফুরোতে না ফুরোতে সত্যিই সাইফার হয়ে যাবে নিখিল।

প্রস্তুত হয় চিত্রা। সন্ধ্যা আসতেই বা আর কতক্ষণ। চিঠি নিয়ে চলে গিয়েছে নিখিল এবং চিত্রাও জানে, ও চিঠি খুলে পড়বার জন্য মনে একটু কৌতূহলও যে জাগবে, সেরকম কোন সন্দেহের বস্তু দিয়ে তৈরিই নয় লোকটা। আর যদি কৌতূহল হয়, চিঠিটা পড়েই ফেলে নিখিল, তবুও কি কিছু বুঝবে বা মনে করতে পারবে ঐ মানুষ? কখনই না। 'ভেবে দেখলাম, আপনি আমার আপনজনের চেয়েও বেশি। আমি যাব।' এইটুকু একটা লেখা পড়ে কি-ই বা বুঝবে, আর বুঝেই বা কি করতে পারে নিখিল? এতদিন ধরে সবই দু'চোখে দেখেও যে কিছু বোঝেনি, সে ঐ সামান্য কয়েকটা লেখা কথা পড়ে ছাই বুঝবে।

আর বুঝলেই বা? নিখিল চিত্রার পথের বাধাই যে নয়। বাধা না হয়েই সে ধন্য হয়ে আছে। বাধা দেবে না নিখিল, বাধা দিতে জানে না নিখিল।

নিঃশব্দে স্থির হয়ে ঘরের ভিতর একা দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাবতে ঝকঝক করে চিত্রার চোখ, দুরন্ত বিদ্যুতের জ্বালার মত সেই বেদনাটাই মনের ভিতর ছটফট করে ওঠে। চার বছর আগে হঠাৎ বাড়ির লোকের একটা নিষ্ঠুর ঝোঁক আর সদিচ্ছার আঘাতে যেদিন চূর্ণ হয়ে গেল তার মনের স্বপ্ন, সেই দিনটাব স্মৃতি আজও জ্বলছে তার মনের মধ্যে। সেদিনের আক্ষেপ আর ঘৃণা একসঙ্গে মিলে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল তার জীবনের একমাত্র কল্পনার বুকে, সেই ক্ষতের জ্বালা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই অশান্ত হয়ে রয়েছে জীবন। কে বলেছিল ওরকম না বলে-কয়ে আর হঠাৎ ধরে-বেঁধে একটা বিয়ে দিয়ে দিতে? কি দরকার ছিল? আর যদি বিয়েই দেওয়া হলো, তবে চিত্রার মত মেয়ের জন্য পৃথিবীতে কি আর কোন মানুষ ছিল না? যেন আড়ালে আড়ালে হঠাৎ একটা ষড়যন্ত্র এঁটে ফেললেন জ্যাঠামশাই ও জ্যাঠাইমা। একটি বারের মত একটি কথাতেও কোন আভাস দিলেন না যে, বাপ-মা-মরা মেয়েকে পার করে দেবার জন্য তাঁরা একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। যদি বিয়ের পিঁড়িতে বসবার এক মিনিট আগেও বুঝতে পারত চিত্রা, ধানবাদের কাছে এক দেশী কোম্পানির এক ক্লার্ক এসেছেন বরের সাজ পরে, তবে

পৃথিবীতে কারও সাধ্য ছিল না যে, চিত্রাকে সেই পিঁড়ির উপর বসিয়ে দিতে পারে। সেদিনই সেই মুহূর্তে জ্যাঠামশাইয়ের সব চক্রান্তের উৎসব ভেঙে দিত চিত্রা, যেমন করেই হোক।

সেই সন্ধ্যাতে লগ্ন ঘনিয়ে আসবার একটু আগে বরং একটা মিথ্যা কথাই বলেছিলেন জ্যাঠাইমা। ছেলে নাকি খুব ভাল ছেলে। যে শুনেছে এই সম্বন্ধের কথা, সে-ই নাকি খুশি হয়েছে।

চিত্রা জানে, কেন অমন কাণ্ড করলেন জ্যাঠামশাই, জ্যাঠাইমা এবং আর সকলেই। লোকের অভিযোগ শুনতে শুনতে আর ভয় পেয়ে পেয়ে এরকম একটা ষড়যন্ত্র করে ফেললেন জ্যাঠামশাই। এ মেয়েকে বেশিদিন ঘরে পুষে রাখবেন না ধীরেনবাবু— বন্ধুদের আর প্রতিবেশীদের এই অভিযোগের ভয়েই সারা হয়ে গেলেন জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাইমা। তাঁরা যদি বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত না হয়ে উঠতেন, তবে কোন ক্ষতি হতো না কারও। জ্যাঠামশাইয়ের না, প্রতিবেশীদেরও না, আর আত্মীয়দেরও না। চিত্রারও না। চিত্রা নিজেই পৃথিবীতে খুঁজে নিত তার জীবনের সঙ্গী।

বেশি খুঁজতে হতো না চিত্রাকে। পারুল আর প্রীতির মত মেয়ে যখন নিজের চেষ্টায় মনের মত সঙ্গী খুঁজে নিতে পেরেছিল, তখন চিত্রাই বা পারতো না কেন? কিন্তু চিত্রার মনের আশা ও কল্পনাগুলিকে সেটুকু সুযোগও দিলেন না জ্যাঠামশাই।

সুযোগ বড় বেশি করেই আসছিল, তাই তো দুশ্চিন্তিত হয়ে পড়লেন জ্যাঠামশাই। অদ্ভুত মন ওঁদের। চিত্রার বাক্স নানারকম সনামী আর বেনামী চিঠিতে ভরে উঠলো যে! শুনতে পেয়ে আর জানতে পেরে আতঙ্কিত হলেন জ্যাঠাইমা। কিন্তু সে কি চিত্রার অপরাধ? চিত্রা কি জীবনে কোনদিন চেয়েছিল, এই সব চিঠি? চিত্রার সুন্দর মুখ দেখে মানুষ যদি পাগল হয়ে যায় সে দোষ চিত্রার নয়। বরং জেনে নিশ্চিন্ত হওয়াই উচিত ছিল জ্যাঠাইমার, কোন চিঠিরই উত্তর দেয়নি চিত্রা। কারণ চিঠিদাতাদের কাউকেই একটা মানুষ বলে মনে করতে পারেনি চিত্রা।

বিয়ের পর হরিনগরের এই কলোনিতে প্রথম এসে চুপ করে বসে ভাবতে ভাবতে মনের যন্ত্রণায় একদিন হেসেই ফেলেছিল চিত্রা। সেইসব চিঠির মানুষগুলি যে এই হেডক্লার্ক ভদ্রলোকটির চেয়ে অনেক অনেক বড় মানুষ। আজ তারা হয়তো মুখ টিপে হাসছে। শুনে অবাক হয়ে গিয়েছে পারুল আর প্রীতি, শেষে এটা কি একটা কাণ্ড করে বসলো চিত্রা! সন্দীপের মত এত গুণের, রূপের ও টাকার মানুষ, এত বড় একজন চিফ অফিসারের ব্যাকুলতাও যে চিত্রার মন টলাতে পারেনি, সেই চিত্রা বিয়ে করেছে এক দেশি কোম্পানির এক বড় কেরানীকে, যার মাইনে দুশো টাকা! প্রেম হলে না হয় বোঝা যেত। কিন্তু প্রীতি আর পারুল জানে, চিত্রা কি সেই মেয়ে যে প্রেমের আবেগে কাঙ্গালের গলায় মালা দেবে? যে-সে একটা লোকের মুখ দেখে মনে প্রেম জাগবে, এমন মনই করেনি চিত্রা।

চারবছর আগে চিত্রার জীবনের আকাঙ্ক্ষা যে ব্যথা পেয়েছিল, সেই ব্যথা মুছে যেতে পারেনি এক মুহূর্তের মতও, বরং দিন দিন আরও অস্থির, আরও মত্ত এবং আরও দুঃসাহসে শাণিত করে তুলেছে চিত্রার বিদ্রোহ।

জীবনে কি চেয়েছিল চিত্রা? আজ এখন নিজের মনকে পরীক্ষা করলে, আর স্মৃতি সন্ধান করলে ঠিক বুঝতে পারবে না চিত্রা, বিয়ের আগে কি-ধরনের সুখী-জীবন কামনা করেছিল চিত্রা। আজ শুধু মনে হয় এই কলোনিরই মালিক সরকার অ্যান্ড সিন্‌হা কোম্পানির বার আনা স্বত্বের অধিকারী বিনায়ক সরকারের মত মানুষের পাশে যদি ঠাঁই পাওয়া যেত, তবে ধন্য হতো আর সুখী হতো চিত্রার জীবন।

তবে কি বিনায়ক সরকারের টাকার পুঁজির পরিচয় জানতে পেরে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে চিত্রা? না, ঠিক টাকার জন্য তো নয়। বিনায়ক সরকারের চেয়ে বেশি টাকার মানুষ কি ধানবাদের এই

বিরাট কয়লা আর শিল্প রাজ্যের কোন অট্টালিকার মধ্যে নেই? টাকার জন্য নয়। বিনায়ক সরকার শুধু টাকার জন্যই বড় মানুষ নয়। বিনায়ক সরকার বড় সুন্দর ও বড় উজ্জ্বল এক বড় জীবনের মানুষ। ঐ রকমই এক জীবনের আলো হাসি ও উল্লাসের মধ্যে দাঁড়াবার জন্য চিত্রার মন স্বপ্ন দেখে এসেছে। নইলে বড় মানুষ তো কত রকমেরই আছে।

কিন্তু বিনায়ক সরকারের মত মানুষ পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কি না, জানে না চিত্রা। আজ মনে হয়, এই মানুষটি তার প্রসন্ন জীবনের সকল দীপ্তি নিয়ে এইখানে যেন চিত্রারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। সরকার অ্যান্ড সিন্‌হার বারোয়ানা মালিক, এতগুলি ফ্যাক্টরি যার দৌলত সৃষ্টি করছে দিনরাত, সেই মানুষও স্পষ্ট মুখ খুলে তার শূন্য মনের একটা হাহাকার প্রকাশ করেছে চিত্রারই কাছে। এইসব দৌলত সার্থক হতো, যদি চিত্রার মত মেয়ের ভালবাসার একটু ছোঁয়া লাগতো বিনায়কের জীবনে।

তাই, জীবনে যাকে দেখে আর যার মুখের হাসি আর ভাষা শুনে প্রথম মুগ্ধ হয়েছে চিত্রা, তারই কাছে চিঠি দিল এই প্রথম। বিনায়কের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার পরেও তিনটি বছর কেটে গিয়েছে কিন্তু বিনায়কের আহ্বানে এত স্পষ্ট ভাষায় সাড়া দিতে পারলো চিত্রা, এই প্রথম।

চিঠি দিতে হাত কাঁপবার কথা নয়। চিত্রার হাতের সব দ্বিধা ও ভীরুতা মুছে গিয়েছে অনেক দিন আগেই। বিনায়কের গাড়ি আসবার আগে যে হাত দিয়ে নিজেকে এতদিন সাজিয়ে এসেছে চিত্রা, সে হাত আজ একটা চিঠি দিতে কাঁপবে কেন? শুধু একবার নিঃশ্বাসটা কেমনতর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেন, কিসের জন্য? চিত্রা নিজেই জানে না, কেন।

নিশ্চয়ই নিখিলের কথা ভেবে নয়, যে নিখিল চিত্রার জীবনে একটা অস্তিত্বের বস্তুই নয়। বোধহয় বিনায়কেরই কথা ভেবে। স্ত্রী আছে বিনায়কের, বিবাহিতা স্ত্রী। সেই স্ত্রীকে বর্জন করবার সাধ্য নেই বিনায়কের। বিনায়কই বলেছে, এইখানে তার জীবনের দুঃখ একটু জটিল ও গ্রন্থিল হয়ে গিয়েছে। বিনায়কের স্ত্রী মৃদুলা সরকার জীবনে স্বামী ছাড়া আর কিছু বোঝে না। সে এক অদ্ভুত বিস্ময়ের নারী। দশ বছর হলো বিয়ে হয়েছে বিনায়কের, ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পরেই। বোম্বাইয়ের এক হোটেলে প্রথম দেখা হয়েছিল বিনায়কের সঙ্গে মৃদুলার। সেই যে দেখা, সেই দেখাই মৃদুলার জীবনের পরিণাম রচনা করে দিল। মৃদুলার ভালবাসা বুঝতে সেদিন যদি ভুল করতো বিনায়ক, তবে আজ আর পৃথিবীতে থাকতো না মৃদুলা। এ কাহিনী নিজেই চিত্রার কাছে অকপট ভাবে বলতে কোন কুণ্ঠা হয়নি বিনায়কের। যে মৃদুলা নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসার সম্পদ বলে মনে করে বিনায়ককে, সেই মৃদুলাকে অস্বীকার করবার মত শক্তি নেই, এবং সে রকম নির্মম হবার মতও শক্তি নেই বিনায়কের। তাই, শুধু তাই বিনায়কের ইচ্ছা এই যে...।

হ্যাঁ, বিনায়কের সেই ইচ্ছাই ভাল। বিনায়কের সঙ্গে চিত্রার বিয়ে হতে পারে বটে; কিন্তু হতে অনেক বাধা আর আইনের ঝঞ্ঝাটও অনেক। এত সব ঝঞ্ঝাটের ঝড়ের মধ্যে যাবারই বা দরকার কি? তাই বিনায়কের সেই ইচ্ছাই জীবনে বরণ করে নিতে আজ মনের মধ্যে কোন কুণ্ঠা নেই চিত্রার। নাই বা হলো বিয়ে; তবু বিনায়কের আপনজন হয়ে যাবে চিত্রা। চিত্রার যে হাত কতবার কত আগ্রহে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছে বিনায়ক, চিত্রার সেই হাত আজ শেষ কুণ্ঠা চিরকালের মত দূরে ছুঁড়ে ফেলবার জন্য সঙ্কল্পে কঠিন হয়ে উঠেছে।

নিখিল আছে, চিত্রার স্বামী নিখিল। নিখিল থাকবে, ঠিক যেমনভাবে সুখী মন নিয়ে আর ধন্য হয়ে সে আছে। কিন্তু চিত্রার সঙ্গে সঙ্গে আর যেতে হবে না। চিত্রার পিছনে পিছনে থাকতে হয় নিখিলকে, এই বৃথা সাথীপনার মিথ্যা স্পষ্ট করেই মিথ্যা করে দেওয়া ভাল। বস্তুহীন ছায়ার মত মানুষটাকে পিছনে পিছনে আসতে দিয়ে লাভ কি? যে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও গিয়ে দাঁড়ালে কোন গর্বের আনন্দ নেই, সেই মানুষকে একটা ছায়ার মত সঙ্গে রেখে লাভ কি? না, আর নয়। বিনায়কের মত মানুষের এত বড় মনের ভালবাসাকে আর ব্যথা দিতে পারবে না

চিত্রা। চিত্রার মন আজ নতুন প্রতিজ্ঞার দীক্ষা নিয়ে এতদিনের মিথ্যা কুণ্ঠার পাথরটাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে ধুলো করে দেবার জন্য তৈরি হয়েছে। এইবার, আজ থেকে জগতের যে-কোন নিভৃতে আর উৎসবের আসরে বিনায়কের চোখের সামনে একাই এসে ধরা দেবে চিত্রা। বিশ্রী লোকচক্ষুর প্রশ্নগুলিকে আর ভয় করে চলবার কোন দরকার নেই। চিত্রার জীবনের একটা ভুয়া অস্তিত্ব শুধু পড়ে থাক এই কেরানীর নীড়ে, কিন্তু জীবন পড়ে থাকবে বিনায়কের কাছে।

এইভাবেই আজ একেবারে সাইফার হয়ে যেতে চলেছে নিখিল। অফিসের নানা মুখের খোসগল্পও আজকাল উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।—এই অবস্থার জন্য দায়ী স্বয়ং নিখিল রায়। একটা বিশ্বাসী নির্বোধ। স্বচক্ষে সব দেখেও এতদিনে সাবধান হতে পারলো না, তাইতো...তাইতো স্বামী হয়েও সাইফার হয়ে গিয়েছে নিখিল।

বড়সাহেব বিনায়ক সরকারের চকচকে টুরারের পিছনের সিটে যদি চুপ করে বসে থাকে স্বামী নিখিল রায়, আর স্ত্রী চিত্রা রায় বসে থাকেন সামনের সিটে বড়সাবের পাশে, তবে কি এ সন্দেহ না করে থাকতে পারে হরিনগর কলোনির সাধারণ ভদ্রলোক আর অফিসের সাধারণ কেরানীর দল?

বাধা? কে বাধা দেবে চিত্রাকে? বাধা দেওয়ার যার কথা, সেই যে সবচেয়ে বেশি বাধ্য। সরকার অ্যান্ড সিন্হার হেডক্লার্ক নিখিল রায় যেন স্ত্রী-গরবেই গরবী হয়ে রয়েছেন। ভগবান জানে, লোকটার চোখ কি ধাতুতে তৈরি, আর মনটাই বা কি রকমের প্রশান্ত মহাসাগর।

চার বছর আগে কেরানীর বউ হয়ে যে নারী একটু গম্ভীর মুখ নিয়ে অথচ শান্তভাবে এসেছিল এই কলোনির টালি-ছাওয়া চালের ক্ষুদ্র গৃহে, আজ সেই নারী এ রাজ্যের যত চোখ বিস্ময়ে ধাঁধিয়ে দিয়ে সরকার অ্যান্ড সিন্হার বড়সাহেবের পাশে রাজেশ্বরীর মত বসে থাকে। চকচকে টুরারের ইঞ্জিনের গুরুগুঞ্জন ছাপিয়ে ওঠে চিত্রার মুখের কলকল ফোয়ারা-হাসির কলনাদ। সরকার ভিলার ফটকে ইউকালিপটাসের ছায়া থেকে সোজা নীল পরেশনাথের পায়ের কাছে তোপচাঁচীর লেক পর্যন্ত, বিনায়কের টুরার চিত্রার মুখের মিষ্টি কলরব বুকে নিয়ে ছুটে যায় আর আসে। পিছনের সিটে বসে নিখিলও মাঝে মাঝে হেসে ওঠে।

অফিসের নানা মুখে নানা খোসগল্প মাঝে মাঝে নানা ধিক্কারেও তিক্ত হয়ে ওঠে। —মেয়েটার আর দোষ কি? এরকম বেকুবের হাতে পড়লে সব মেয়েই ওরকম হয়ে যায়।

অফিসের মধ্যেই একজন মাদ্রাজী কেরানীর সঙ্গে একজন বাঙালী কেরানীর একদিন হাতাহাতি হয়ে গেল। মাদ্রাজী কেরানী বলেছিল, বাঙালীরাই এরকম হয়। এই ধরনের মাত্র একটা কথা সহ্য করতে না পেরে টেম্পোরারি মহিম সেই মাদ্রাজীর সঙ্গে সেদিন যে মারামারি কাণ্ড করে বসলো, সেটা স্বচক্ষে দেখেও, আর কারণটা বুঝতে পেরেও হেডক্লার্ক নিখিলের মনে কোন উত্তাপ জাগেনি। কথাগুলি যেন কথাই নয়, একেবারে বাজে মিথ্যা ও কুৎসিত কতগুলি ছোট কল্পনার আক্রোশ। যত ছোট মনের পরিচয়।

নিখিলই যখন এসব চায়, তখন কে আর বাধা দেবে চিত্রার মত মেয়েকে, চোখে যার বিদ্যুৎ খেলে, আর শাড়ি পরার ও বেণী বাঁধবার ভঙ্গীতে ফ্যাশান উথলে পড়ে। হরিনগর কলোনির সকলের চক্ষুতে ভর্ৎসনা জাগিয়ে দিয়েছে চিত্রা নামে এক নারীর এই ভয়ানক অভ্যুত্থান। কিন্তু কোন তিক্ততা বিরাগ ও ভর্ৎসনা নেই শুধু একজনের চোখে, চিত্রার স্বামী নিখিল রায়ের চোখে।

লোকে আলোচনা করে, অফিসের নানা মুখে একটা হতভম্ব অবস্থাও মাঝে ফুটে ওঠে।—এরকম হয়ে গেল কেন নিখিল রায়? কোনরকম প্রমোশন বা লিফ্‌টও তো পাচ্ছে না নিখিল। সরকার অ্যান্ড সিন্হার বার আনা প্রভু বিনায়ক সরকার যদি ইচ্ছা করেন, তবে নিখিলকে এই অফিসের অন্তত সুপারিনটেন্ডেন্ট করে দিতে পারেন। কিন্তু সেরকম কিছু আঁচ-আভাসও তো পাওয়া যায় না।

তাই টেম্পোরারি মহিম বলে—সব দোষ ঐ ভয়ঙ্কর বড়সাহেবটির। এইরকম কীর্তি করা ওঁর অভ্যাস আছে। অনেক করেছেন উনি, আপনারা কোনই খবর রাখেন না।

সত্যিই কেউ খবর রাখেন না। টেম্পোরারি মহিম কোথা থেকে এত খবর জানলো কে জানে! হয়তো একেবারে বাজে কথা। ছাঁটাইয়ের লিস্টে নাম চড়েছে বলে রাগের মাথায় যা-তা বলছে মহিম।

মহিম বলে—ওঁদের যে একটি ক্লাব আছে, আর সেই ক্লাবে কি হয়, সে-খবর আপনারা কেউ জানেন না।

তা কেউ জানে না ঠিকই। ক্লাব আছে, এইটুকু সকলেই জানে।

মহিম বলে—কারা সেখানে আসে তাও আপনারা কিছু জানেন না।

আসে কত গাড়ি-চড়া মানুষ; এইটুকু সকলেই জানে। পায়ে-হাঁটা মানুষ সেখানে কখনও আসে না, আসতে পারে না, আসবার নিয়মও নেই!

মহিম বলে—কতগুলো হোমরা-চোমরা অফিসার আসে, আর আসে কতগুলো সাহেব, আর কতগুলো লেডি। আর পিপে পিপে মদ।

—থাম থাম মহিম। বড় বেশি রঙ চড়াচ্ছ তুমি।

মহিম বলে—আমি সত্যি কথা বলছি কি না, সেটা নিখিলবাবুই জানেন। আমি নিজের কানে শুনেছি, বড়সাহেব সেই ক্লাবে নিখিলবাবুকে সস্ত্রীক যাবার জন্য বলছেন।

—অ্যাঁ?

সকলে চমকে ওঠে আর বুঝতে পারে, আসল দোষ তাহলে নিখিলেরই।

কিন্তু যার জীবনের পরিণাম নিয়ে এত আলোচনা, সেই চিত্রা রায়ের মন এইসব খুঁটিনাটির আর বিচারের অনেক উপরে চলে গিয়েছে। আজও তো ভুলে যায়নি চিত্রা, সেই একটা ঘটনার কথা। বিয়ের পাঁচ মাস আগে দার্জিলিং-এ বেড়াতে গিয়েছিল চিত্রা, জ্যাঠাইমার বোন জয়া মাসিমার সঙ্গে। লেবঙের মাঠে চিত্রাকে দেখতে পেয়ে অপলক চক্ষে তাকিয়েছিল কোন্ এক স্টেটের রাজকুমার। আর সত্যিই, এক ভদ্রমহিলা এসে জয়া মাসিমাকে ইংরেজি ভাষায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ঐ মেয়ের বাপ কোন্ স্টেটের চিফ?

এই পৃথিবীর এক স্টেটের রাজকুমারী বলে মনে হয়েছিল যে মেয়েকে সেই মেয়ের শাড়ি-পরার স্টাইল দেখেই ভয় পেয়ে গেলেন জ্যাঠামশাই। সে-মেয়ের মনের স্টাইলের কোন খবর নিলেন না। খবর নিলে বুঝতে পারতেন জ্যাঠামশাই, চিত্রাকে এভাবে একজন যে-সে লোকের হাতে ধরিয়ে দেওয়া কি ভয়ানক একটা নিষ্ঠুরতা।

সেই নিষ্ঠুরতাকে ক্ষমা করতে পারেনি চিত্রা। সেই চক্রান্তের দান নিখিল রায় নামে এই ভদ্রলোকটিকে জীবনে আপন বলে মনে মনে গ্রহণ করতে পারেনি চিত্রা। আর এই জন্য মনে কোন দুঃখ নেই চিত্রার। দেখে আরও সুখী হয়েছে চিত্রা, এই ভদ্রলোকের মনেও কোন দুঃখ নেই। চিত্রা ডাক দেওয়া মাত্র কাছে এসে দাঁড়ায়, বলা মাত্র চলে যায়, আর আসতে বললেই সঙ্গে আসে নিখিল।

স্বামী নামে পরিচিত এই মানুষটিকে একদিনের জন্য একটি রূঢ় কথা বলতে হয়নি চিত্রার। ভদ্রলোকই সে সুযোগ দেননি চিত্রাকে। নিখিল যেন চিত্রার নীরব চিন্তার বেদনাগুলিকেও শুনতে পায়; এমনই প্রখর তার কান।

ভোরে, টালি-ছাওয়া চালের ক্ষুদ্রকায় এই বাড়ির ভিতর বারান্দায় চেয়ারের উপর বসে আর সামনের ছোট টেবিলের উপর এক পেয়ালা চা রেখে যখন চুপ করে বসে থাকে চিত্রা, তখন যেন ঘরের ভিতরে থেকেও চিত্রার চোখ দুটোকে দেখতে পায় নিখিল। চিত্রার চোখ দুটো যেন উদাস হয়ে কুয়োতলার পেয়ারাগাছটার ছায়ার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘরের ভিতর থেকে বের

হয়ে এসে দেখতেও পায় নিখিল, তার ধারণা মিথ্যা নয়। চিত্রার চা জুড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু চায়ের কাপের দিকে চোখ নেই চিত্রার। অন্যমনা হয়ে কি যেন ভাবছে চিত্রা।

নিখিল তার নিজের হাতের চায়ের কাপে চুমুক দিতে পারে না।—তোমার চা যে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

নিখিলের কথায় চিত্রার স্তব্ধ হাতটার শুধু চমক ভাঙে। চায়ের কাপ হাতে তুলে নেয় চিত্রা। কিন্তু একজন মানুষ যে হঠাৎ এসে চা খাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিল, সেটা চিত্রা বুঝতেও পারে কি না সন্দেহ। নিখিলের মুখের দিকে তাকায় না চিত্রা। একটা কথা বলবার জন্যও কোন সাড়া জাগে না চিত্রার দুই ঠোঁটে, রক্তগোলাপের আভা দিয়ে আঁকা দুটি ঠোঁট।

এক-একদিন মাঝরাতে নিজের ছোট ঘর থেকে ব্যস্তভাবে চিত্রার ঘরে ঢোকে নিখিল। ঘুমিয়ে আছে চিত্রা, কিন্তু যেন একটা দুঃখের স্বপ্ন দেখে বিড়বিড় করছে চিত্রা। অস্পষ্ট সেই স্বপ্নাতুর ভাষার মধ্যে যেন অভিমানের মত একটা বেদনা বিড়বিড় করে। পাখা হাতে নিয়ে ঘুমন্ত চিত্রার মাথায় কিছুক্ষণ বাতাস দিয়ে চলে যায় নিখিল।

পরদিন কথায় কথায় নিখিল তার মনের উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারে না।—কাল ঘুমের মধ্যে তুমি বড় কষ্ট পেয়েছ।

চুপ করে থাকে চিত্রা, কোন উত্তর দেয় না, আর নিখিলের মুখে এই ধরনের কথাগুলি শুনতে ভালও লাগে না।

বোধহয় স্বপ্নের কথাগুলি মনে পড়ে যায়, তাই। যেন ঘুমের মধ্যে বড় স্পষ্ট করে দেখতে পায় চিত্রা, নিজেকে আর নিজের মনটাকেও। শাড়িতে আর বেণীতে স্টাইল আছে, মনের সখ-সাধ আর কল্পনাগুলির মধ্যেও স্টাইল আছে, কিন্তু এই স্টাইলগুলিই কি তার জীবনের একমাত্র কাম্য ছিল? না বোধহয়। ঘুমের মধ্যেই নিজের পুরনো মনটাকে যেন দেখতে পায় চিত্রা, আর বুঝতে পারে, মনের মত স্বামীর গর্বে গরবিনী হবার একটা আকাঙ্ক্ষা শুধু আঁকা আছে সেই মনে। সেই আকাঙ্ক্ষারই বেদনা বিড়বিড় করে তার পাঁজরের আড়ালে এক কোণে।

নিখিলের কথা শুনে চুপ করে থাকে চিত্রা। বলতে ইচ্ছা করলেও বলে না— আমার স্বপ্নের খোঁজ নেবার জন্য তোমার আবার এত গরজ কেন?

স্বামীর পরিচয় চিত্রার জীবনে কোন গর্ব আনেনি, আনবেও না কোনদিন। তার জীবনের এই শূন্যতা একটা চিরকেলে শ্মশানের মত মনের মধ্যে জ্বলতো, যদি বিনায়ক সরকারের সঙ্গে দেখা না হতো একদিন, এক গানের সভায়। চিত্রা জানে, ভাগ্য তাকে অন্তত এইটুকু কৃপা করেছে, অন্তত এইটুকু গর্ব এনে দিয়েছে চিত্রার মনে, বিনায়কের মত মানুষও দুঃখ পায় মনে মনে, চিত্রার মত মেয়েকে জীবনে সঙ্গিনী করতে পারেনি বলে। গর্ব তো বটেই। মৃদুলা সরকারের মত লেডি যার স্ত্রী সেই বিনায়কও আজ চিত্রাকে পাশে নিয়ে ইউকালিপটাসের ছায়ায় দাঁড়াতে পারলে সুখী হয়ে যায়। হরিনগর কলোনিতে এসে চার বছরের মধ্যেই চিত্রার চোখের বিদ্যুৎ জয়ী হয়েছে। যে মানুষকে দেখে হাজার মানুষ প্রতিদিন সেলাম আদাব ও নমস্তে জানায়, যে মানুষের মুখের দিকে অনেক লেডিই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে, যে মানুষের সঙ্গে সস্ত্রীক অন্তরঙ্গ হবার জন্য অনেক কনট্রাক্টর অনেক চেষ্টা করে, সেই মানুষ, সেই বিনায়ক সরকার শুধু বলে, এইবার শুধু তুমি আর আমি চিত্রা, আর কেউ নয়; মাঝে মাঝে এই আলো আর ধোঁয়ার ভিড় থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে শালবনের কিনারায় ছোট একটি জলস্রোতের কাছে...।

হ্যাঁ, তাই হবে। তাই বিনায়কের চিঠির উত্তর দিয়েছে চিত্রা। অনেকবার এই আহ্বানের ভাষা বুকে লুকিয়ে নিয়ে চিত্রার কাছে এসেছে বিনায়কের অনেক চিঠি। আজ প্রথম উত্তর দিল চিত্রা। কারণ, চিত্রার মনে আর কোন প্রশ্ন নেই।

সন্ধ্যার জন্য বিকাল থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল চিত্রা! আর সন্ধ্যা হবার আগেই বিনায়কের কাছ থেকে চিঠির উত্তর নিয়ে অফিস থেকে বাসায় ফিরলো নিখিল।

জানিয়েছে বিনায়ক, সুখী হলাম চিঠি পেয়ে। আজ আমার সরকার অ্যান্ড সিন্‌হার সিলভার জুবিলি। কিন্তু তুমি বুঝবে চিত্রা, আজ আমার জীবনের এক তৃপ্তির জুবিলি। কারণ চিঠিতে তোমার মন চিনতে পারলাম, এই প্রথম। গাড়ি যাবে।

চিঠি পড়ার পর চিত্রার চোখে পড়ে, নিখিলের হাতে আর একটি চিঠি রয়েছে। সোনালী অক্ষরে ছাপানো একটি কার্ড।

চিত্রা—ওটা কি?

নিখিল—নেমন্তন্নের কার্ড।

চিত্রা—কার নেমন্তন্ন?

নিখিল হাসে—মিস্টার ও মিসেস নিখিল রায়ের।

চিত্রার গলার স্বরে হঠাৎ একটা জ্বালা যেন কেঁপে ওঠে—তার মানে?

নিখিল—সরকার অ্যান্ড সিন্‌হার সিলভার জুবিলি আজ। সরকার ভিলাতে ককটেল পার্টি আছে। নেমন্তন্ন করেছেন মিস্টার সরকার।

চিত্রা—তোমাকেও?

নিখিল—হ্যাঁ, তাই তো নিয়ম।

চিত্রা চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তার পরেই যেন নিজের মনে বিড় বিড় করে—নিয়ম তো আছে জানি। কিন্তু...।

কিন্তু এই নিয়মের অর্থ খুঁজে বের করবার কোন অর্থ আজ আর নেই। বেশিক্ষণ অপেক্ষাও করতে হয় না চিত্রাকে। বড়সাহেবের চকচকে টুরার পৌঁছে যায় হেডক্লার্কের কোয়ার্টারের সম্মুখে। একই সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসে নিখিল আর চিত্রা, মিস্টার ও মিসেস রায়, স্বামী আর স্ত্রী।

গাড়িতে শান্তভাবে বসে রইল চিত্রা, কিন্তু রাগ হয় বিনায়কের উপর। আজ এত স্পষ্ট করে জানতে পেরেও এরকম ব্যবস্থা করলো কেন বিনায়ক? চিত্রা রায়ের জীবনে প্রথম প্রণয়ের অভিসারে নিখিল রায় নামে লোকটিকে চিত্রার সঙ্গে কেন যেতে বললো বিনায়ক? বিনায়ককে চিঠি দেবার সময় হাত কাঁপেনি যার, সেই শক্ত মনের চিত্রা রায়ও তার পাশের এই তুচ্ছ একটা অস্তিত্বকে সহ্য করতে অস্বস্তি বোধ করে। দুঃসহ এই অস্বস্তি।

কিন্তু সব অস্বস্তি মুহূর্তের মধ্যেই দূর হয়ে গেল। ইউকালিপটাসের পাশে মস্ত বড় শামিয়ানা আর আলোয় আলোকিত আসর। চকচকে টুরার যেন একেবারে এক নতুন জগতের সিংহদ্বারে নিয়ে এসে পৌঁছে দিল চিত্রাকে। এগিয়ে এল বিনায়ক, আর বিনায়কের অভ্যর্থনার হাতে হাত দিতেই ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠলো চিত্রার চোখের বিদ্যুৎ।

যেন ছোট ছোট কুঞ্জ দিয়ে সাজানো একটা জগৎ। প্রতিটি কুঞ্জের ফুলের স্তবকের মধ্যে বিদ্যুতের রঙিন বাতি জ্বলে। প্রতিটি কুঞ্জে একটি করে টেবিল আর দু'টি করে চেয়ার। একদিকে নাচের আসর তৈরি করা হয়েছে। ছোট একটি ডায়াস, তার দু'পাশে বসে জ্যাজ বাজায় কলকাতার বিলিতি হোটেল থেকে ভাড়া করে আনা গোয়ানিজ বাদকের দল।

বিনায়ক সরকার তার হাসিভরা মুখ চিত্রার কানের কাছাকাছি এনে তার জীবনের পরম তৃপ্তির সিলভার জুবিলির অর্থ বুঝিয়ে দেয়।—আজ এই উৎসবের এক কোণে এক টেবিলের পাশে শুধু তুমি আর আমি। আজ পৃথিবী জানবে, তুমি আমার আপনজন হয়ে গিয়েছ চিত্রা।

চিত্রার হাসিতে বিদ্যুৎ খেলে যায়—তাই বলো। আমি ভুল বুঝে তোমার ওপর রাগ করছিলাম।

বিনায়ক হাসে—আমাকে এখনো ভুল বুঝবে তুমি?

চিত্রা—না, আর কখনো না।

জ্যাজ বাজে মত্ত হয়ে। গেলাসে গেলাসে শেরি আর হুইস্কির পেগ ট্রের উপর সাজিয়ে নিয়ে ছুটাছুটি করে বয় আর বাটলার। সরকার অ্যান্ড সিন্‌হার সিলভার জুবিলির মদিরতা বিহ্বল ও উচ্ছল হয়ে ওঠে। গেলাস হাতে নিয়েই কোন সজ্জন উঠে দাঁড়ান আর টলতে টলতে আর এক টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। ওয়েলকাম জানিয়ে সেই টেবিলের সজ্জন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। আর সেই চেয়ারের লেডি খিলখিল করে হেসে ওঠেন।

জ্যাজ বাজে আরও প্রমত্ত হয়ে। অভ্যাগতা লেডিদের শেরিসিক্ত ওষ্ঠে লিপস্টিকের রঙও লাস্যে তরল হয়ে ওঠে। এক-একটি টেবিলে বিহ্বল যুগলমূর্তি। মিসেস ফর্দুনজীর টেবিলের কাছে এসে বসেন মিস্টার চৌধুরী। মিসেস চৌধুরী এই টেবিল আর সেই টেবিলের এক-এক দম্পতির সঙ্গে হাস্যালাপ বিনিময় করতে করতে শেষে গিয়ে বসেন মিস্টার পাত্রের পাশের শূন্য চেয়ারে। দেখা যায়, আসরের ঐ দিকে মিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে আলাপ করছেন মিসেস পাত্র।

আর চিত্রা বসে থাকে আসরের প্রায় মাঝখানে নীল আলোকের এক স্তবকের নীচে একটি টেবিলের কোলের কাছে, বিনায়ক সরকারের পাশে।

এই নতুন জগতের ভিড়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল চিত্রা রায়ের স্বামী নিখিল রায়?

জানে চিত্রা, দেখতেও চায় না চিত্রা, আজ তার এই জীবনান্তরের শুভক্ষণে পিছনের কোন মিথ্যা ছায়ার বাধাও আর রাখতে চায় না চিত্রা। পৃথিবীর সব চক্ষুর সম্মুখে বিনায়কের পাশে বসে চিত্রা আজ অকুণ্ঠচিত্তে জানিয়ে দিতে চায়, সে আজ বিনায়কের জীবনের সবচেয়ে নিকটের আপনজন।

পরিশ্রান্ত জ্যাজ থামে কিছুক্ষণের জন্য। তারপরেই শোনা যায়, সারা আসর যেন সম্মিলিত কণ্ঠে হুর্‌রে জানিয়ে অভ্যর্থনা করছে এক অতি মাননীয়া আগন্তুককে।

বিনায়কের কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে চিত্রা জিজ্ঞাসা করে—ইনি কে?

বিনায়ক হাসে—মৃদুলা!

চমকে ওঠে চিত্রা। মৃদুলারও কি এখানে আসবার কথা ছিল?

বিনায়ক—ছিল বৈকি।

চিত্রা—আমাকে তো বলনি যে, মৃদুলা আসবে এখানে।

বিনায়ক—এর মধ্যে বলবার কি আছে? এটা তো সাধারণ নিয়ম।

এই টেবিল থেকে ও টেবিল, তারপর আর এক টেবিল, শেরিতে উৎফুল্ল এক-একটি মুখের আনন্দধ্বনিকে যেন বিনম্র ভঙ্গিতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আপ্যায়িত করে ঘুরতে থাকেন মৃদুলা সরকার। বিরাট একটি জড়োয়া নেকলেস মৃদুলার গলা জড়িয়ে রয়েছে। ব্রোকেডের একটি স্কার্ফ এলোমেলো হয়ে লুটিয়ে রয়েছে মৃদুলার কাঁধের আর পিঠের উপর। পা টলছে মৃদুলা সরকারের। মৃদুলার এত জমকালো করে সাজানো চেহারাটা কেমন-যেন আলুথালু আর উদ্‌ভ্রান্ত। শুধু একজোড়া ডাগর চক্ষু এদিক-ওদিক তাকিয়ে মাঝে মাঝে কট্‌কট্‌ করে হেসে ওঠে।

নিজের কানেই শুনতে পায় চিত্রা, তার কাছের টেবিলের এক অতিথি তার পার্শ্ববর্তিনীকে বলছেন, মৃদুলা সরকার আজ সকাল থেকে শেরিতে ভাসছেন বলে মনে হচ্ছে?

চিত্রা তাকায় বিনায়কের মুখের দিকে।—মৃদুলার কি হয়েছে বল তো? ওরকম করছে কেন?

বিনায়ক বলে—চিরকাল যা করে এসেছে, তাই করছে।

চিত্রা—কি?

বিনায়ক—টিপ্‌সি, মাত্রা বেশি হয়ে গিয়েছে।

আলোর আসরের মধ্যে একটা অন্ধকার যেন ধুকপুক করে উঠলো। এ কি কথা বলছে আজ বিনায়ক তার নিজের মুখে? এই কি বিনায়কের গল্পের সেই পতিব্রতা প্রেমিকা স্ত্রী মৃদুলা সরকার?

চিত্রা বলে—তোমার কথা শুনে মৃদুলার সম্বন্ধে আমার অন্য রকম ধারণা হয়েছিল।

বিনায়ক —কি ধারণা হয়েছিল?

চিত্রা—মনে হয়েছিল, এই সব শেরি-টেরির মানুষ নয় মৃদুলা।

বিনায়ক—শেরি সম্বন্ধেই তোমার মনে ভুল ধারণা রয়েছে ডিয়ার চিত্রা!

চিত্রার মুখের দিকে অদ্ভুত এক অলস ভঙ্গিতে তাকিয়ে কথা বলে বিনায়ক। হাসে চিত্রা রায়। রক্তগোলাপের আভা দিয়ে গড়া দুই ঠোঁট যেন একটা বিস্ময় সহ্য করবার জন্য জোর করে হাসতে থাকে। অদ্ভুত ভীরু ভীরু হাসি। বিনায়কের অনুরোধে শেরির গেলাস দুই ঠোঁটের ভীরু হাসির কাছে তুলে নিতে গিয়েই হঠাৎ হাত থামায় চিত্রা। মৃদুলার রঙিন মূর্তিটার দিকেই আবার চিত্রার দু'চোখের দৃষ্টি ছুটে চলে যায়। মনে হয় চিত্রার, শেরির নেশায় টলমল দুটি চক্ষুর দৃষ্টি দিয়ে আর বাঘিনীর মত দুর্দান্ত একটা আগ্রহ নিয়ে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে মৃদুলা সরকার। কটকট করে হেসে উঠছে মৃদুলার চোখ।

দেখতে নেহাত অসুন্দর তো নয় মৃদুলার মুখ। নিজের রূপ সম্বন্ধে চিত্রার মনের ধারণায় যথেষ্ট অহঙ্কার থাকলেও মৃদুলাকে সুন্দর বলে স্বীকার করতে পারে চিত্রা।

যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল চিত্রা। জ্যাজের শব্দে চমক ভাঙে আর দেখতে পায়, দূরে দাঁড়িয়ে আসরের মাঝখানে এই টেবিলের দিকেই তাকিয়ে কটকট করে হাসছে মৃদুলার দুই চক্ষু।

থর-থর করে কেঁপে ওঠে চিত্রা। প্রশ্ন করে চিত্রা—মৃদুলা এখানে এসে বসবে নাকি?

বিনায়ক—ওগো না, না, না।

কিন্তু একটা ভয়ের শিহর যেন ধীরে ধীরে চিত্রার শরীরের রক্তে ঠাণ্ডা সাপের মত সিরসির করে ঘুরে বেড়ায়। বিনায়ক সরকারের পরিণীতা স্ত্রীর এ কি জীবন! বেশ তো অদ্ভুত রকমের উজ্জ্বল জীবন। আলোর মেলার মধ্যে দাঁড়িয়ে কটকট করে হাসছে ওর চোখ।

এদিকে আসে না, ওদিকেই ঘুরে বেড়ায় মৃদুলা! তবু দেখতে ভয় করে চিত্রার, বিনায়কের মত মানুষের পরিণীতা প্রেমিকা হয়েও এরকম হয়ে গেল কেন মৃদুলা? এই কি রঙিন আর উজ্জ্বল জগতের নিয়ম?

কি-যেন সন্ধান করে ফিরছে মৃদুলা। এবং টেবিলের পর টেবিলের ছায়া পার হয়ে চলে যাচ্ছে আসরের একেবারে শেষে, একেবারে শামিয়ানার রঙিন ঝালরের গা ঘেঁষা ছায়া-ছায়া একটি নিভৃতের একটি টেবিলের কাছে।

পাথরের চোখের মত স্তব্ধ আর অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে চিত্রার চোখ। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখতে থাকে চিত্রা. সুন্দর ব্রোকেডে জড়ানো এক বাঘিনীর কৌতূহল যেন এতক্ষণে শিকারের সন্ধান পেয়েছে। সেই টেবিলের পাশে বসে আছে একা একজন, তারই পাশে গিয়ে বসলো মৃদুলা! টিপ করে একটা শব্দ যেন হঠাৎ বেজে উঠলো চিত্রার বুকের ভিতর। ওখানে কেন মৃদুলা? ঐ নিরীহ নির্বোধ মানুষটার কাছে কেন মৃদুলা? হেডক্লার্ক নিখিল রায়ের সঙ্গে আলাপ করে কি লাভ হবে মৃদুলার?

বিনায়ক ডাকে—চিত্রা!

শুনতে পেয়েও মুখ ফিরিয়ে বিনায়কের দিকে তাকায় না চিত্রা। যেন সুদূর এক সংসারের রঙ্গমঞ্চের দিকে এক অদ্ভুত অদৃষ্টের খেলা দেখবার জন্য তাকিয়ে আছে চিত্রা। দেখতে পায় চিত্রা, বয়ের হাতের ট্রে থেকে দুটি গেলাস তুলে নিল মৃদুলা। একটি নিজের কাছে রেখে, আর একটি গেলাস নিখিলের হাতের কাছে সমাদরের ভঙ্গিতে এগিয়ে দেয় মৃদুলা।

—সাবধান! যেন এই মুহূর্তের 'অসাবধান মনের' এক নতুন দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে চিত্রার মুখে চমকে উঠেছে ছোট্ট একটা অস্ফুট আর্তনাদ। বিনায়ক বলে—তুমি এদিকে ঘুরে বসো চিত্রা।

জ্যাজ বাজে মত্ত হয়ে। নাচের আসরে দশ জোড়া মূর্তি দুলে দুলে পা ফেলে। কিন্তু চিত্রার মনের চাঞ্চল্য যেন হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়েছে, কোন ভাষা আর বাজনার স্বর কানে আসছে না চিত্রার। মনে হয় শুধু, আসরের শেষ দিকে শামিয়ানার ঝালরের কাছে একটা শিশুর অসহায় বুক একা দেখতে পেয়ে এক বাঘিনী গিয়ে সম্মুখে বসেছে লুব্ধ হয়ে। শেরির নেশায় তৃপ্ত হয়নি মৃদুলা, আরও কিছু খুঁজছে মৃদুলা।

—নো লাইট, ওয়ান মিনিট! কে যেন চেঁচিয়ে ফূর্তির মাথায় হাঁক দিল। সঙ্গে সঙ্গে আসরের সব আলো যেন একটি ফুৎকারে নিভে গেল।

—এ কি! সেই মুহূর্তে চিৎকার করে উঠে দাঁড়ায় চিত্রা। হঠাৎ ভীত একটা পাখির আর্তনাদের মত করুণ চিত্রার গলায় সেই শব্দ। হঠাৎ অন্ধকার যেন চিত্রার বুকের উপর তীক্ষ্ণ একটা ছুরির আঘাতের মত লাফিয়ে পড়েছে। রঙিন ব্রোকেডে জড়ানো এক ভয়ঙ্করীর শেরিসিক্ত ঠোঁট এইবার হিংস্র হয়ে কোন্ সর্বনাশ করে দেয় কে জানে! চেয়ার থেকে উঠে, যেন এই অন্ধকারের মধ্যেই দূরের সেই টেবিলের দিকে ছুটে যাবার জন্যে ছটফট করে চিত্রা।

বিনায়ক হেসে ওঠে—আঃ, বসো চিত্রা।

পথ না পেয়ে, আর যেতে না পেরে অন্ধকারের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে আসরের শেষ প্রান্তের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে চিত্রা। হঠাৎ চমকে ওঠে চিত্রা। ঝন্ করে আর্তনাদ করে সশব্দে একটা কাচের গেলাস যেন চূর্ণ হলো কোথাও। ফুরিয়েছে এক মিনিট, দপ্ করে জ্বলে ওঠে আলো।

এই কয়েকটি মুহূর্তের অন্ধকারে আসরের মধ্যে যেন একটা নাটক চমকে উঠেছিল, তারই চিহ্ন দেখা যায় আসরের দু' জায়গায়। আসরের সব মানুষ আশ্চর্য হয়ে আর ভুরু কুঁচকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, ব্যাপার কি? এদিকে, ভীত ও উদ্‌ভ্রান্ত দুটো চক্ষু নিয়ে বিনায়কের টেবিলের কাছে চিত্রা রায় পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে, আর তাকিয়ে আছে আসরের শেষ প্রান্তের একটা টেবিলের দিকে। আর ওদিকে, শেষ প্রান্তের টেবিলের কাছে একটি চেয়ার থেকে যেন হঠাৎ এক রূঢ় আঘাতে উল্টে পড়ে গিয়েছে মৃদুলা সরকার। মৃদুলারই গেলাস হাত থেকে ছুটে গিয়ে দূরে পড়েছে, আর চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

তাকিয়ে থাকে চিত্রা রায়ের পাথরের মত স্তব্ধ দুটি চক্ষু। তারপর ধীরে ধীরে বিচিত্র এক হাসির জ্যোৎস্না যেন ফুটে উঠতে থাকে সেই চক্ষুতে। আসরের সব চক্ষু তাকিয়ে দেখে, সত্যিই এক গরবিনী রাজেশ্বরীর মত ভঙ্গী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী।

হ্যাঁ, গর্ব ছাড়া আর কি? বাঘিনীর আগ্রহ অন্ধকারের সুযোগে মত্ত হয়ে ছুঁতে গিয়েছিল চিত্রা রায়ের স্বামীকে। ভুল করেছে মৃদুলা, বুঝতে পারেনি মৃদুলা, চিত্রা রায়ের স্বামী বড় কঠিন স্বামী।

বিনায়ক ডাকে—দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো চিত্রা।

—হ্যাঁ, বসছি। হেসে হেসে বিনায়কের আহ্বানে সাড়া দেয় চিত্রা।

যেন চিত্রার বুকের ভিতর থেকে অদ্ভুত একটা বিদ্রূপ হাসির ঝরনা হয়ে ঝরে পড়ছে। থামতে চায় না। এই অন্ধকারে-ভরা কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে নতুন কোন্ গর্ব পেয়ে গেল চিত্রা, যার জন্য এমন করে বিনায়কের দিকে করুণার চক্ষে তাকিয়ে স্বচ্ছন্দে অবাধে নিঃসঙ্কোচে আর মুখর হয়ে হেসে চলেছে চিত্রা?

বোধহয়, চিত্রাই তখনো বুঝতে পারেনি যে, তার জীবনের সকল ক্ষোভের গভীরে লুকানো সেই বেদনার বিদ্যুৎ আজ জ্বালা হারিয়ে একেবারে স্থির হয়ে গিয়েছে। আবার জ্যাজ বাজে মত্ত

হয়ে, নাচের আসরে জোড়া নৃত্যপর মূর্তির ছায়া দোলে। চুপ করে, নিজের বুকের ভিতরের অদ্ভুত এক প্রসন্নতার ভারে অলস ও স্নিগ্ধ হয়ে চেয়ারের উপর বসে থাকে চিত্রা।

আবার নো লাইট। নিভে গেল সব আলোক।

স্থির হয়ে, শক্ত হয়ে, চুপ করে বসে থাকে চিত্রা। পর মুহূর্তে চমকে ওঠে। শেরির গন্ধ মাখানো একটা নিঃশ্বাসের সরীসৃপ যেন চিত্রার মুখের কাছে এগিয়ে আসছে।

ঝন্‌ন্! সঙ্গে সঙ্গে একটা কাচের গেলাস চূর্ণ হয়ে যায় অন্ধকারে। একটি চেয়ার উল্টে পড়ে যায়। অন্ধকারের স্পর্ধাকে দুই হাতের ঘৃণাকঠিন একটি ধাক্কায় ধূলিসাৎ করে দেয় চিত্রা রায়।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, থরথর করে কাঁপতে থাকে চিত্রার দেহ। যেন তার দুঃস্বপ্নমুক্ত জীবনটা গর্বের আবেশে কাঁপছে।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে আলো। সারা আসরের চক্ষু দেখতে পায়, বিনায়ক সরকার চেয়ার থেকে উল্টে পড়ে গিয়েছেন, আর তাঁরই হাতের গেলাস ছিটকে পড়ে চূর্ণ হয়েছে।

আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শামিয়ানার শেষ প্রান্তের ঝালরের দিকে ছায়া ছায়া এক নিভৃতে দাঁড়ানো এক মূর্তির দিকে তাকিয়ে হাত তুলে আহ্বান জানায় চিত্রা—এস।

ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে নিখিল রায় চিত্রারই পাশে দাঁড়ায়। খপ্ করে নিখিলের একটা হাত ধরে ফেলে চিত্রা।—চল।

সারা আসরের চক্ষু কিছুক্ষণের জন্য বিস্মিত অভিভূত ও একটু বিরক্ত হয়ে দেখতে থাকে, আসর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এক ভদ্রলোক আর এক মহিলা। কিরকম যেন ওদের দু'জনের চলবার আর তাকাবার ভঙ্গি। মনে হয় একেবারেই ম্যানার্স জানে না।

চিত্তচকোর

মধুপুর থেকে চিঠি লিখেছে মীরা। —সেজদা, আমার এই চিঠি খুব মন দিয়ে পড়বে। যা লিখছি, সেটা খুব ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করবে। কারণ, আমি যা লিখছি, সেটা আমিও খুব ভাল করে বুঝে দেখেছি। বুঝেছি, এই একটা ভাল সুযোগ। এ সুযোগ যদি তুচ্ছ কর সেজদা, তবে খুবই ভুল করা হবে।

—জি. বি. কনস্ট্রাকশন লিমিটেড নামে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির নামটা শুনেছো নিশ্চয়। এরা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে বড় বড় ব্রিজ তৈরি করবার কনট্রাক্ট নিয়ে থাকে। খবরের কাগজে সম্বলপুরের মস্ত বড় রেলওয়ে ব্রিজের ছবিটা দেখেছো নিশ্চয়। সেই ব্রিজ এই জি. বি. কনস্ট্রাকশনই তৈরি করেছে। তোমাদের টাউন থেকে ষোল মাইল দূরে লালকি নদীর উপরে যে নতুন ব্রিজ তৈরি হচ্ছে সেটাও এই জি. বি. সি'র কাজ। শুনেছি, ঐ ব্রিজ তৈরি করতে মোট দেড় কোটি টাকা খরচ হবে। আমাদের মধুপুরের কাছেও ছোট ছোট কয়েকটা ব্রিজ তৈরি করছে ওরা, কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

—জি. বি. সি'র ইনস্পেকটিং ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ সরকার এখন মধুপুরে আছে। কিন্তু আর বেশিদিন থাকবে না। বোধহয় এক মাসের মধ্যেই চলে যাবে। এবার তার কাজ হলো তোমাদের ওদিকের লালকি নদীর ব্রিজের কাজের ইনস্পেকশন। বোধহয় মাসতিনেক তোমাদেরই টাউনে থাকবে। তারপর আবার সম্বলপুরের দিকে চলে যাবে।

—সৌরভ সরকার ওঁরই এক মাসির ছেলে। তিন বছর গ্লাসগোতে আর দু'বছর হামবুর্গে ছিল সৌরভ সরকার। ব্রিজ তৈরির ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্পেশ্যাল স্টাডি করে আর ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরেছে, আর এই বয়সেই জি. বি. সি'র মত বিখ্যাত কোম্পানির ইনস্পেকটিং ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। মাইনে দেড় হাজার। বয়স অবশ্য ত্রিশের কম নয়; পঁয়ত্রিশের বেশি কিছুতেই নয়। কিন্তু তোমার অণিমার বয়সও যে ত্রিশের কাছে এসে ঠেকেছে।

—সৌরভ এখনও বিয়ে করেনি। কিন্তু কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারা যায় বিয়ে করতে চায়। কাজেই বুঝতে পারছো তো, এখন তোমার আর চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। চেষ্টা করতে হবে। আমার খুব বিশ্বাস, একটু চেষ্টা করলেই সৌরভের সঙ্গে অণিমার বিয়ে হয়ে যাবে।

—মেয়েকে বি. এ. পাশ করিয়েও তিন বছর ধরে শুধু ভাবছো। অথচ কিছুই করতে পারছো না। কলকাতায় গিয়ে যদি কিছুদিন থাকতে পারতে, তবে কোন ভাল ছেলের খোঁজ হয়তো পেতে; কিন্তু সৌরভের মত ছেলের খোঁজ পেতে না। কলকাতার মত কম্পিটিশনের জায়গায় ওরকমের ছেলে ধরবার সাধ্যিও তোমার নেই। অণিমার চেয়ে অনেক শিক্ষিতা আর অনেক সুন্দরী মেয়ে সেখানে থই-থই করছে।

—কাজেই, এই একটা সুযোগ। তুমি তোমার সেকেলে মতিগতি এখন একটু চাপা দিয়ে রাখ। যে কালে যেমন নিয়ম, সেই নিয়ম মেনেই চলতে হয়। তা না হলে ঠকতে হয়। অণিমার সঙ্গে সৌরভের একটু আলাপ করিয়ে দেবে। সৌরভকে চা খেতে নিমন্ত্রণ করবে। অণিমার চেহারাটা তো সুন্দর আছেই। আমার মনে হয়, সৌরভের কোন আপত্তি হবে না। ভগবানের ইচ্ছায় সৌরভের সঙ্গে অণিমার বিয়েটা হয়েই যাবে বলে মনে হয়।

—আর একটা কথা। এটাও একটা সুযোগ। সৌরভের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ। টাউনের ভেতরে কিংবা বাইরে সৌরভের জন্য একটা বাড়ি ঠিক করে রাখবে। মাস দুই-তিন থাকবে সৌরভ। ভাড়া তিনশো হোক বা চারশো হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু সৌরভের ইচ্ছা, বাড়িটা যেন খোলামেলা হয়, একটা লন আর ফুলবাগান থাকে। চাকর-টাকরের ব্যবস্থা করতে হবে না। শুধু একটা মালী ঠিক করে রাখবে। সৌরভের কুক, বেয়ারা, চাপরাসী আর চাকর এখান থেকে সৌরভের সঙ্গে যাবে।

—চিঠিটা বউদিকেও ভাল করে পড়ে শুনিয়ে দিও। বউদি যেন আর এমন আশা না করেন যে, আজকালকার দিনে এমনিতেই ভাল পাত্র পাওয়া যাবে। মেয়েকে কারও সঙ্গে মিশতে দেওয়া চলবে না, এরকম ধারণা যেন মন থেকে বিদায় করে দেন। ভয় পেয়ে তুকু-পুকু করলে চলবে না। সৌরভ যদি অণিমাকে সঙ্গে নিয়ে একটু বেড়াতে চায়, তবু আপত্তি করবে না। এর মধ্যে অশোভন কিছু নেই।

নিবারণবাবু চিঠিটা মন দিয়ে পড়েই শোনালেন, আর অণিমার মা সুহাসিনীও মন দিয়ে শুনলেন।

নিবারণবাবু বলেন—তুমি কি বল?

সুহাসিনী বলেন—আমি তো বলি, ভাল কথাই লিখেছে মীরা।

অণিমাও মধুপুরের মীরাপিসির একটা চিঠি পেয়েছে।—তোমার বাবাকে লিখেছি, কিন্তু তোমাকেও লিখতে হচ্ছে। ভগবানের ইচ্ছেয় সৌরভের মত ছেলের সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে হয়, তবে জানবে সেটা তোমার স্বপ্নেরও অগোচর একটা সৌভাগ্য। কাজেই তোমাকেই একটু সাহস করতে হবে। মনে করো না, তোমাকে আমি বেহায়া হতে বলছি। ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে যেভাবে মিশতে হয়, সেভাবেই মিশবে। আজেবাজে কথা যেমন বলবে না, তেমনই আবার একেবারে বুড়ো ঠানদিদির মত ঠাণ্ডা কথা বলবে না। তুমি নিজেই সৌরভকে চা খেতে নেমন্তন্ন করবে। সৌরভ ফুল ভালবাসে। রোজ সকালে কিংবা সন্ধ্যায় তোমাদের বাগানের ফুল তোড়া করে বেঁধে সৌরভকে পাঠিয়ে দেবে। সৌরভ যদি কোনদিন বেড়াতে ডাকে, তবে নিশ্চয় যাবে। আমি গত বছর বহরমপুর থেকে যে বালুচর শাড়িটা পাঠিয়েছিলাম, সেটা মাঝে মাঝে পরবে। ওরকম কুঁজোটি হয়ে আর ভীতু-ভীতু চোখ করে হাঁটবে না। সৌরভ যদি গান শুনতে চায় তবে শুনিয়ে দিও। মনে রেখ, তোমার ভাগ্য তোমার হাতে। ভগবানের ইচ্ছায় ভালই হবে বলে মনে হচ্ছে।

সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করলেন—মীরা তোকেও একটা চিঠি দিয়েছে বোধহয়?

অণিমা—হ্যাঁ।

সুহাসিনী—কি লিখেছে?

অণিমা গম্ভীর হয়ে বলে—একগাদা ছাইপাঁশ লিখেছে।

সুহাসিনী—না-না, ছাইপাঁশ নয়। যা লিখেছে ঠিকই লিখেছে। তোমার ভালোর জন্যেই লিখেছে।

অণিমা গম্ভীর মুখটাকে আরও গম্ভীর করে নিয়ে বলে—আশ্চর্য।

সুহাসিনী—কিসের আশ্চর্য?

অণিমা—তুমিও দেখছি একেবারে নতুন কথা বলছো।

সুহাসিনী—যেকালের যেমন নিয়ম, সেটা মানতেই হয়। তাছাড়া সৌরভের মত ছেলেকে পাওয়া আমাদের মত অবস্থার মানুষেরও যে একটা সৌভাগ্য।

হেসে ফেলে অণিমা—সৌভাগ্যটা হলে হয়।

সুহাসিনী—হবে না কেন? সৌরভ যদি পছন্দ করে...।

অণিমা—কেন পছন্দ করবে?

সুহাসিনী—সেই কথাই তো লিখেছে মীরা। বুঝতে পারিস না কেন?

অণিমা আবার গম্ভীর হয়ে যায়—বুঝতে পারছি না।

সুহাসিনীর মুখটাও যেন একটু করুণ হয়ে যায়। মীরার ইচ্ছা, উপদেশ আর পরামর্শের কথাগুলিকে খুশি হয়ে মেনে নিতে সুহাসিনীরও মনের কোথায় যেন বাধছে। খুবই সুখের কথা হতো, যদি সৌরভ নিজেই এসে একবার অণিমাকে দেখতো আর পছন্দ করে ফেলতো। একটা

অচেনা মানুষের চোখে পছন্দ ধরাবার জন্য মেয়েটা নিজেই দৌড়াদৌড়ি করবে, কালের নিয়ম হলেও ভাবতে ভাল লাগছে না।

তবে একথাও ঠিক, সৌরভের মত ছেলে নিবারণবাবুর মত অবস্থার মানুষের আশার কাছে দুর্লভ উপহার। এককালে অবস্থা খুবই ভাল ছিল। এখন সে অবস্থা আর নেই। শুধু মস্ত বড় এই বাড়িটা আছে। আর একটা গালাকুঠি আছে। গালার বাজারও আর সেরকম নয়। বছর দুই হলো গাড়িটাকে বেচে দিতে হয়েছে। মেয়ের বিয়ের জন্য পাঁচ-সাত হাজার টাকা খরচ করবার সামর্থ্য অবশ্য আছে কিন্তু পাঁচ-সাত হাজারের খরচে যেসব ছেলে পাওয়া যায়, আর এ পর্যন্ত যেসব ছেলের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে,তাদের একজনও গুণে ও গৌরবে সৌরভের কাছাকাছি দাঁড়াবার যোগ্য নয়। তাই মীরার চিঠির পরামর্শটা মেনে নিতেই ইচ্ছে করছে।

দুই

সৌরভের জন্য বেশ ভাল একটা বাড়ি ঠিক করে ফেলতে দেরি করেননি নিবারণবাবু। টাউন থেকে সামান্য দূরে ছিল কানারি যাবার রাস্তার উপরেই ইউকালিপটাসে ঘেরা একটি বাড়ি। সবুজ ঘাসে ছাওয়া লন আছে। লনের দু'পাশে স্থলপদ্মের ভিড় নিয়ে দুটো স্কোয়ার আছে। ফটকের থামের গায়ে আইভিলতা আর সারি সারি টবেতে গাজিপুরী গোলাপ। মালী বৃন্দাবন বাগান থেকে সব শুকনো পাতা ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিয়েছে।

সৌরভ সরকারও এসেছে। সঙ্গে এসেছে কুক, চাপরাসী, বেয়ারা আর চাকর।

সৌরভ যেদিন এল সেদিন স্টেশনেই উপস্থিত ছিলেন নিবারণবাবু। ট্রেন থেকে নেমে সৌরভই নিবারণবাবুর হাসিভরা মুখটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল—আপনিই বোধহয় নিবারণবাবু!

—হ্যাঁ।

—বাড়িটা কোন্‌দিকে?

—এই যে মালী বৃন্দাবনও এসেছে। বৃন্দাবনই তোমাদের পথ দেখিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাবে।

দুটো ট্যাক্সি সৌরভ সরকারের সব জিনিসপত্র আর চাকর-বাকরদের তুলে নিয়ে চলে গেল। আগে আগে একটা ট্যাক্সিতে চলে গেল সৌরভ সরকার আর মালী বৃন্দাবন।

সন্ধ্যা হবার একটু আগেই অণিমাকে সঙ্গে নিয়ে যখন হিল রোডের বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়ান নিবারণবাবু, তখন বাড়ির বারান্দায় একটি চেয়ারের উপর বসে বই পড়ছিল সৌরভ সরকার। সত্যিই বড় চমৎকার চেহারা। পঁয়ত্রিশ বছর নয়, এ চেহারার বয়স ত্রিশের বেশি হতেই পারে না। সাদা জিনের ট্রাউজার আর সাদা টুইলের শার্ট গায়ে, আর সাদা চামড়ার স্লিপার পায়ে দিয়ে চেয়ারের ওপর বসে আছে একটি চমৎকার পরিচ্ছন্ন আর স্নিগ্ধ চেহারা। নিবারণবাবুর চোখ দুটোও যেন একটা স্নেহাক্ত আগ্রহে চঞ্চল হয়ে চিকচিক করতে থাকে।

অণিমাও বালুচর শাড়ি পরেছে। কিন্তু বাড়ি থেকে বের হয়ে এই সামান্য আধ মাইলের ছায়াময় রাস্তাটা হাঁটতে বার বার হোঁচট খেয়েছে। ভয়ানক অপ্রসন্ন দুটো চোখ বার বার যেন ভ্রূকুটি করে কুঁচকে গিয়েছে। দুঃসহ একটা অস্বস্তির নিঃশ্বাস বুকের ভিতরে একটা যন্ত্রণা ছড়িয়েছে। ছি-ছি, সৌরভ সরকার হলোই বা একটা মস্ত গৌরব আর মস্ত সৌভাগ্য, কিন্তু অণিমার ত্রিশ বছর বয়সের প্রাণটা যে এভাবে একটা কাঙাল লোভের মত এগিয়ে যেতে চাইছে না। একটুও ভাল লাগছে না।

নিবারণবাবু আর অণিমাকে দেখতে পেয়ে ব্যস্তভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সৌরভ। নিবারণবাবু হাসেন—আমি তোমাকে বিরক্ত করতে আসিনি। অণিমা কি বলবে তাই শুনে নাও।

—কে? সৌরভ যেন চমকে উঠে প্রশ্ন করে।

নিবারণবাবু বলেন—এই তো অণিমা, আমার মেয়ে।

অণিমা হাসে—বিরক্ত বোধ করলেও আপত্তি করতে পারবেন না। আজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়িতে চা খাবেন।

সৌরভের বিস্ময়ের চোখ দুটো এবার যেন মুগ্ধ হয়ে হেসে ওঠে।—বিরক্ত বোধ করবো কেন? কখ্‌খনো না। আচ্ছা...নিশ্চয় যাব।

চলে যান নিবারণবাবু আর অণিমা। যে পথে দুঃসহ অস্বস্তির হোঁচট খেয়ে খেয়ে অণিমার প্রাণটা কোনমতে হেঁটে এসেছিল, সেই পথেই আবার ফিরে যেতে হচ্ছে। কিন্তু অণিমার সেই অস্বস্তির ভার যেন লজ্জা পেয়ে এই রাস্তারই ধুলোর সঙ্গে মিশে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। চোখের সেই অপ্রসন্ন ভ্রূকুটিটাই বা কোথায় গেল? বালুচর শাড়িটাকেও আর কাঙাল লোভের সাজ বলে মনে হয় না। বরং মনে হয়, শাড়িটাকে কি বিশ্রীভাবে এলোমেলো করে পরা হয়েছে। যেন ভয়ে ভয়ে একটা মেঘ দেখতে গিয়েছিল অণিমা, কিন্তু একটা চাঁদ দেখে ফিরে এসেছে।

তিন

হিল রোডের বাড়িতে ফুল পাঠাতে ভুল করেনি অণিমা। যাকে দেখবার জন্য মনটা সব সময় উৎসুক হয়ে থাকে, সেও হিল রোড ধরে বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এসে গোলাকুঠির মালিক নিবারণবাবুর টাউনের বাড়িতে আরও দু'দিন চা খেয়ে চলে গিয়েছে। দেখে আশ্চর্য হয়েছেন নিবারণবাবু, আর বেশ খুশিই হয়েছেন সুহাসিনী। মুখচোরা মেয়ে অণিমা তিন দিনের চেনা এই সৌরভের সঙ্গে এক-এক সময় যেন নাকে-মুখে কথা বলতে থাকে। সেই ভীতু ভীতু অণিমা নয়, এখন যেন একটা ব্যস্ত হাসির অণিমা ঘরের বাইরের বারান্দায় ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যা হলেই ছটফট করতে থাকে। সাজ সারতে আধ ঘণ্টারও বেশি সময় পার হয়ে যায়, তবু অণিমার শাড়ি আর সাজ যেন অণিমার চোখের পছন্দ হয়ে উঠতে পারে না। এরই মধ্যে একদিন নিজেরই চোখে দেখতে পেয়েছেন সুহাসিনী, চলে যাবার সময় ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে সৌরভ যেন খুব আস্তে খুব ব্যাকুলতার একটা কথা বললো; তা না হলে কথাটা বলতে গিয়ে সৌরভের মুখটা ওরকম লাজুক হয়ে যাবে কেন? অণিমাও যেন চমকে উঠেছে। তারপরেই মাথা হেঁট করেছে। তারপরেই মাথা নেড়ে হ্যাঁ করেছে। মেয়েটার সারা মুখটাও যে লালচে হয়ে উঠেছে।

না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারেননি সুহাসিনী—সৌরভ কিছু বলে গেল নাকি?

—হ্যাঁ।

—কি বললে?

—আজ সন্ধ্যেবেলা সঙ্গে বেড়াতে যেতে বলেছে।

—যা তবে।

—যাব।

সন্ধ্যা হবার আগেই বের হয়ে যায় অণিমা। আজ একাই হিল রোডের বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে বেড়াতে বের হতে হবে, যার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে আর কিছু বাকি নেই অণিমার, শুধু আজকের জন্যে এই আহ্বান নয়, চিরকালের জন্য। মীরাপিসিমা মিছিমিছি একটা ভয় দেখিয়েছিলেন; যেন একটা তপস্যার জন্য অণিমাকে প্রস্তুত হতে বলেছিলেন। কিছুই দরকার হয়নি; মুখ খুলে বেহায়ার মত স্পষ্ট করে একটা কথাও বলতে হয়নি; স্নিগ্ধ হাসির মানুষটার নিজেরই চোখ দুটো বার বার পিপাসিতের মত অণিমার মুখের দিকে তাকিয়ে কত স্পষ্ট করে সবই বুঝিয়ে দিয়েছে, অণিমার আশার মনটাকে ধন্য করে দিয়েছে।

হিল রোডের উপর একটা দেবদারুর কাছে দাঁড়িয়ে আছে সেই অভ্যর্থনা, সেই সাদা জিনের ট্রাউজার আর টুইলের শার্ট। পায়ে সাদা চামড়ার শু। চোখ দুটো কালো নয়, কেমন যেন নীলাভ আর নিবিড়। এক সময় মনে হয়, সে চোখে যেন নীল আকাশের ছায়া হাসছে।

অণিমা হাসে—মনে হচ্ছে, কিছু সন্দেহ করে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছেন।

—কিসের সন্দেহ?

—মনে করেছিলেন বোধহয়, আমি আসবোই না।

—তা একবার মনে হয়েছিল ঠিকই।

—কেন?

—এখানে এসে এই তিন দিনের মধ্যেই এত বড় একটা উপহার পেয়ে যাব, এতটা যে বিশ্বাস করতে সাহস হয়নি অণিমা। কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি যে, তোমার মত মেয়ে আমার মত মানুষের একটা অনুরোধের কথা শুনে...।

—ওকথা বলো না।

—কেন?

—তোমার মত মানুষ আমাকে ডাকতে পারে, একথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে সাহস পাইনি।

হিল রোড ধরে অনেকদূর এগিয়ে যায় অণিমা আর অণিমার ভালবাসার সৌরভ। রোডটা যেখানে খুব বেশি নিরিবিলি, সেখানে দু'জনে হাত ধরাধরি করে হেঁটে যেতেও ভুলে যায় না। মাঝে মাঝে অণিমার উচ্ছল হাসির শব্দ শুনে সড়কের পাশের করঞ্জ গাছের কাক ফুড়ুৎ করে পালিয়ে যায়।

হিল রোড ধরে ফেরবার পথটাও আবছায়াময় সন্ধ্যার মায়ায় ঢাকা পড়ে যেন কল্পলোকের একটা কুহকের পথ হয়ে যায়। সত্যিই তো, কোনদিন কল্পনাতেও অনুভব করতে পারেনি অণিমা, মনের মত সঙ্গীর হাত ধরে পথ চলতে হলে প্রাণটা এমন বিহ্বল হয়ে যায়।

—চল তোমাকে তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি, অণিমা।

অণিমা হাসে—এখনই পৌঁছে দেবে?

—ইচ্ছে তো করে না; কিন্তু আজ আর উপায় নেই।

—কেন?

—এখনই একবার স্টেশনে যাব।

—কেন?

—সাহেব আসবেন বোধহয়।

—কোথাকার সাহেব?

—ইঞ্জিনিয়ার সরকার সাহেব।

—সরকার সাহেব কে?

—সৌরভ সরকার। তোমার মধুপুরের পিসিমাদেরই তো কি-রকমের যেন আত্মীয় হন।

অণিমার বুকের ভিতর থেকে দুঃসহ একটা আর্তনাদ গুমরে ওঠে। —কি বলছো তুমি? কি ভয়ঙ্কর কথা!

—কি বললে?

—তুমি কে?

—আমি হলাম...আমি।

—কে তুমি? ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে অণিমা।

—আমি তো সরকার সাহেবের স্টেনো-টাইপিস্ট-ক্লার্ক।

—তোমার নাম কি?

—তাও জান না?

—না।

—এ তো বড় আশ্চর্যের কথা।

—যতই আশ্চর্যের কথা হোক, বল, বলে ফেল, তাড়াতাড়ি বলে দাও।

—আমি বিনয় দত্ত।

—তুমি তাহলে সরকার সাহেব আসবার আগেই...।

—হ্যাঁ, স্টাফ তো আগেই আসে; তারপর সাহেব।...কিন্তু...আমি যে ব্যাপারটা এবার বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি, অণিমা।

—কি বুঝেছ?

—তুমি ভুল করে আমাকেই সরকার সাহেব মনে করে...আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি অণিমা। তুমি সব ভুলে যাও। তোমার বাবাকে বলো, তিনিও যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

হিল রোডের সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে অণিমা যেন অদৃষ্টের একটা বিদ্রূপের করুণ ভাষার আক্ষেপ শুনছে। স্টেনো-টাইপিস্ট বিনয় দত্তের গলার স্বর যেন আবার ভয় পেয়ে ছটফটিয়ে ওঠে,—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, সরকার সাহেব এলেই তাঁর কাছ থেকে যে-ভাবেই হোক ছুটি আদায় করে আমি দু'দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাব।

অণিমা বলে—আপনি এখন যান। শিগগির চলে যান।

স্টেশনের দিকে চলে বিনয়; আর অণিমা তার বালুচরের শাড়ির আঁচলটাকে দাঁতে চেপে আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ি ফিরে যায়।

চার

সকালবেলা একটা চিঠি হাতে নিয়ে হাসতে থাকে অণিমা। মধুপুরের মীরাপিসিমা লিখেছেন চিঠিটা। খামের চিঠি নয়, একটা পোস্টকার্ড। অণিমার কাছে নয়, নিবারণবাবুর কাছে এই চিঠি দিয়েছেন মীরা।—সৌরভ কলকাতা গিয়েছে! বোধহয় দিন সাত পরে তোমাদের ওখানে পৌঁছে যাবে। সৌরভের স্টেনো-ক্লার্ক বিনয়কে বলে দিও, যেন স্টেশনে উপস্থিত থাকে।

সুহাসিনী বলেন—কার চিঠি পড়ে এত হাসছিস?

—মীরাপিসিমার চিঠি।

—কি লিখেছে মীরা?

—লিখেছেন, সৌরভ সরকার এখন কলকাতায় আছেন।

—তার মানে?

—তার মানে সৌরভ সরকার এখনো এখানে আসেননি।

—কী বলছিস পাগলের মত?

—পাগলের মত নয়; পাগল হয়েই বলছি।

নিবারণবাবু ব্যস্ত হয়ে ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে আসেন। আর অণিমার মুখটার দিকে আতঙ্কিতের মত তাকিয়ে থাকেন।—কি হলো?

—সৌরভ সরকারের স্টেনো-ক্লার্ক বিনয় দত্ত তোমাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

—কে বিনয় দত্ত?

—ঐ যে, যাকে সৌরভ সরকার বলে মনে করা হয়েছে, যাকে তিন দিন নেমন্তন্ন করে চা খাওয়ানো হলো।

নিবারণবাবু আর সুহাসিনী যেন আর্তনাদ করবারও শক্তি হারিয়েছেন। যেন একটা হিংস্র কৌতুকের আক্রমণে আহত দুটো অসহায় অদৃষ্ট। মাথা হেঁট করে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সুহাসিনী আর নিবারণবাবু।

নিবারণবাবুর চোখ দুটো ভিজে গিয়ে আরও করুণ হয়ে ওঠে; আর সুহাসিনীর চোখ দুটো জলে ভেসে যায়।

কিন্তু চেঁচিয়ে হেসে ওঠে অণিমা—আমাকে এখনই একবার বের হতে হচ্ছে।

নিবারণবাবু আর সুহাসিনী, দু'জনেই মুখ তুলে তাকান। সত্যিই যে বেশ সুন্দর করে সেজেছে অণিমা। সত্যিই বাইরে যাবে মনে হচ্ছে। কিন্তু কোথায় যাবে? ওরকম অদ্ভুতভাবে হাসছেই বা কেন?

সুহাসিনী—কোথায় যাবি?

—যার কাছে জোর করে পাঠাতে চেয়েছিলে, তার কাছে।

—তার মানে?

—দেখে আসি, সৌরভ সরকার এসেছেন কিনা, বোধহয় এসেছেন।

—না, এখনই যেয়ে কাজ নেই।

—এত ভয় পাচ্ছ কেন?

—মনে হচ্ছে, তুমি ভুল করে যত আবোল-তাবোল কথা বলে ফেলবে।

কিছ্ছু ভুল হবে না, কোন আবোল-তাবোল কথা বলবো না। মীরাপিসিমা যা বলে দিয়েছেন, ঠিক তাই বলবো।

সুহাসিনী আর নিবারণবাবু বেশ কিছুক্ষণ ধরে অপলক চোখ তুলে অণিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যেন কালের নিয়মের আরও একটা বিস্ময় দেখছেন। নিয়মটা সত্যিই যে একটা প্রজাপতি। এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছে, এতক্ষণ কোথায় ছিল আর কোন্ বনের ফুলের পরাগ পাখায় মেখেছিল। অণিমার হাসিটাও যেন একটা নতুন ব্যস্ততা। কালকের সন্ধ্যাবেলার হাসিটাকে আর সেই হাসির মনটাকেও বোধহয় তুচ্ছ অকেজো ধুলোর মত একেবারে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছে অণিমা।

সুহাসিনী আর নিবারণবাবুর চোখে একটা আতঙ্কও থম্‌কে রয়েছে। মেয়েটার ভাগ্যটা নতুন আশা নিয়ে আবার একটা নতুন বিদ্রূপের কাছে যাচ্ছে না তো?

অণিমা বলে—তোমরা খুবই ভাবছো বলে মনে হচ্ছে।

সুহাসিনী—নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

অণিমা—কেন?

সুহাসিনী—সত্যি করে বল, সৌরভের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিস তো?

অণিমা হাসে—সত্যি সত্যি সত্যি।

নিবারণবাবু কোন কথা না বলে আবার ঘরের ভেতরে চলে যান।

সুহাসিনী বলেন—সৌরভকে কি বলবি?

অণিমা—যা বলা উচিত, যা বলে দিয়েছেন মীরাপিসি, তাই বলবো। চা খেতে নেমন্তন্ন করবো।

সুহাসিনী যেন কুণ্ঠিতভাবে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন,—আয় তবে।

পাঁচ

লনের ঘাসের উপরে বেতের চেয়ারে বসে আছেন সৌরভ সরকার। বেশ দৃঢ় বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ; বেশ হাসি-হাসি মুখ। গলা থেকে খুলে-নেওয়া টাইটাকে কাঁধের উপর ফেলে রেখেছেন। দাঁতে পাইপ কামড়ে ধরে এক মনে খবর-কাগজ পড়ছেন।

ফটকের থামের গায়ে আইভিলতা দুলছে। একবার থমকে দাঁড়ায় অণিমা। যেন একটা মূর্ছার ঘোর হঠাৎ ভেঙে গিয়েছে; তাই হঠাৎ চমকে উঠেছে অণিমা। কেন? কিসের জন্য? কোথায় কার কাছে ছুটে চলেছে অণিমার উদ্‌ভ্রান্ত ইচ্ছাটা? সত্যিই কি সৌরভ সরকারের কাছে কোন আশা নিয়ে আর অদ্ভুত এক লোভের অভিসারের নায়িকা হয়ে এখানে এসেছে অণিমা? কিংবা, সৌরভ সরকারের সঙ্গে দেখা করবার ছুতো করে আর কাউকে দেখতে এসেছে?

না, চলে যায়নি। ঐ যে, এখনও ঐ বারান্দার উপরে একটা টেবিলের কাছে বসে আছে সেই ক্ষমা-চাওয়া আর আতঙ্কিত আত্মাটা। হাতের পাশে একগাদা কাগজের ফাইল। ছোট টাইপরাইটার মেশিনটাকে প্রায় বুকের কাছে টেনে নিয়ে আর মাথা ঝুঁকিয়ে ব্যস্তভাবে টাইপ করছে। ঠুক্ ঠুক্, ঠুক্ ঠুক শব্দ করে বাজছে টাইপরাইটার। যেন বিনয় দত্ত নামে নিতান্ত একটা কাজের মানুষের পাঁজরা শব্দ করে বাজছে। ঐ মানুষ আর কালকের সেই মানুষ নয়।

মুখ তুলে একবার তাকিয়েছে বিনয় দত্ত; কিন্তু ওর চোখের ঐ শান্ত উদাস ভাবটা দেখে মনে হয়, অণিমাকে জীবনে কোনদিন দেখেনি বিনয় দত্ত। অণিমার চোখে ছোট্ট একটা ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে।

—আসুন। ডাক দিয়েছে সৌরভ সরকার। চমকে ওঠে অণিমার আনমনা কৌতূহলের চোখ দুটো। বুঝতেই পারেনি অণিমা, বারান্দার দিকে তাকাতে তাকাতে কখন সৌরভ সরকারের এত কাছে চলে এসেছে অণিমার ছায়াটা।

এইবার যেন অণিমার হৃৎপিণ্ডের ভিতরে একটা প্রশ্ন চিৎকার করে ওঠে, কেন এসেছো? সৌরভ সরকার তো বেশ হেসে হেসে আর বেশ ভদ্রতানম্র ভঙ্গিতে ডাক দিয়েছে। কিন্তু অণিমার অন্তরাত্মা তবে এমন অপ্রস্তুত হয়ে যায় কেন?

এমন আহ্বান শুনতে পাবে বলে বোধহয় কল্পনা করতে পারেনি অণিমা। যেন বাবা মা আর মীরাপিসিকে একটা বাজে স্বপ্নের ভুল ধরিয়ে দেবার জেদ নিয়ে এখানে এসেছে অণিমা। একটা পরীক্ষাকে একটু পরীক্ষা করে চলে যেতে হবে। সৌরভ সরকারকে একবার চা খেতে নেমন্তন্ন করতে হবে। তারপর বাবা আর মা দেখতেই পাবেন, আর মীরাপিসিও চিঠি পেয়ে জানতে পারবেন, সৌরভ সরকার নিবারণবাবুর বাড়ির চায়ের নেমন্তন্ন শুনে মনে মনে হেসেছে; যেতে ভুলেও গিয়েছে; দেড়হাজার টাকা মাইনের মানুষ এক দেউলে-গোছের গালা মার্চেন্ট নিবারণবাবুর মেয়েকে একটু করুণার চক্ষেও দেখবার সময় পায়নি।

ঠিকই, অণিমার মুখের সেই ব্যস্ততার হাসিটাকে ঠিক বুঝতে পারেননি নিবারণবাবু আর সুহাসিনী। সৌরভ সরকারের মত গৌরবকে তপস্যা করলেও যে নিবারণবাবুর মত মানুষের মেয়ের কোন লাভ হবে না, এই সহজ সরল সত্যটাকে পৃথিবীকে বুঝিয়ে দেবার জন্য অণিমা যেন দুঃসাহস করে একটা ভুয়া অভিসারে এখানে এসেছে।

সৌরভ হাসে।—বসুন আপনি। আপনাকে আপনার পরিচয় আর বলতে হবে না। আমি জানি কে আপনি। মীরাবউদি আপনাদের কথা আমাকে আগেই বলে রেখেছেন।

হাসতে চেষ্টা করে অণিমা, কিন্তু হাসিটা যেন একটা এলোমেলো করুণ হাসি। সে করুণ হাসি আরও এলোমেলো হয়ে যায়, যখন সৌরভ সরকারের চোখদুটো বেশ নিবিড় হয়ে অণিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সৌরভ বলে—আপনি এসেছেন; খুবই ভাল লাগছে।

ভুলেই গিয়েছে অণিমা, তাই প্রাণপণে স্মরণ করতে চেষ্টা করে, কি যেন বলবার ছিল? কি যেন বলবার জন্যে এখানে এসেছে অণিমা? চিঠিতে কি যেন লিখেছিলেন মীরাপিসিমা?

সৌরভ সরকার হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে খুশির স্বরে হাসতে থাকে।—চলুন আপনার বাবা আর মা'র সঙ্গে দেখা করে আসি।

অণিমা বলে—বাবা আর মা দু'জনেই বলে দিয়েছেন...।

—কি?

—আপনি আজ আমাদের বাড়িতে চা খাবেন।

—তবে আর দেরি করি কেন?

কাঁধের ওপর ফেলে-রাখা টাইটাকে ট্রাউজারের পকেটে পুরে দিয়েই ব্যস্ত হয়ে ওঠে সৌরভ সরকার—চলুন।

ফটকের থামের গায়ে জড়ানো আইভিলতায় ঝড়ো হাওয়ার টান লেগেছে। পাতাগুলি যেন ছিঁড়ে পড়তে কিংবা উড়ে যেতে চায়। ভয়ানক দুলছে, ভয়ানক কাঁপছে। মনে হয় অণিমার, যেন সৌরভ সরকারের উচ্ছল খুশির বাতাসটাই ঝড় হয়ে উঠেছে। ফটকটা পার হবার সময় সৌরভ সরকার নিজের মনের খুশির আবেগে বলে ওঠে।—ভালোই হলো, তিন-চারটে দিন তেমন কোন কাজও নেই। খুব কুঁড়েমি করে নেওয়া যাবে। নয়তো আপনাদের বাড়ির চায়ের আসরে বসে...অবশ্য আপনি যদি বলেন, তবেই যাব।

—কি বললেন?

—আপনি যদি বলেন, তবেই যাব।

—যাবেন বইকি। রোজই যাবেন।

—রোজই সম্ভব হবে না, অণিমা। আমার স্টেনো-ক্লার্ক বিনয় ছুটি নিয়ে আজই সন্ধ্যার ট্রেনে চলে যাচ্ছে। তাই, তিন-চারটে দিন, তার মানে নতুন ক্লার্ক না আসা পর্যন্ত একটু জিরিয়ে নিতে পারা যাবে। ... কি হলো?

রাস্তার পাশের একটা গাছের গায়ে হাত দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে অণিমা। যেন মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল, টলে উঠেছিল পা দুটো, আর চোখে কিছু দেখতেও পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই বিবশ শরীরটাকে সামলাবার জন্য গাছের গায়ে হাতের ভর রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে অণিমা।

অণিমা বলে—না, কিছু নয়।

কিন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকায় অণিমা; যেন পিছন থেকে কেউ অণিমার বালুচর শাড়ির আঁচলটাকে ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়েছে। দেখতে পাওয়া যায়, বারান্দার উপরে একেবারে শান্ত ও সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিনয় দত্ত। এদিকেই তাকিয়ে আছে। যেন সত্যিকারের একটা কুহকের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছে।

ছয়

সুহাসিনী বলেন—সৌরভ যা বলে গেল, তাতে তো এই ধারণাই করতে হয় যে, সৌরভের আপত্তি নেই।

নিবারণবাবু—আমার ধারণাও তাই। আর কত স্পষ্ট করে বলবে?

আস্তে আস্তে নয়, বেশ জোরে, যেন কাউকে শোনাবার জন্যই কথাগুলি বলছেন নিবারণবাবু আর সুহাসিনী। ঘরের ভিতরে বসে অণিমাও শুনতে পায়। শুনেও অণিমার চোখে-মুখে কোন কৌতূহল চঞ্চল হয়ে ওঠে না। কারণ অণিমারও যে তাই ধারণা।

চা খেয়ে আর অনেকক্ষণ বসে নিবারণবাবু আর সুহাসিনীর সঙ্গে অনেক গল্প করেছে সৌরভ। যাবার সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর বেশ স্নিগ্ধস্বরে অণিমাকে যে কথাটা বলেছে সৌরভ, সেকথা সুহাসিনী আর নিবারণবাবু ঘরের ভিতরে বসেই শুনতে পেয়েছেন।

—মীরাবউদি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন, অণিমা। ...কিন্তু থাক, আজ আর বলতে চাই না। এত তাড়াতাড়ি বলে ফেলা বোধহয় উচিত নয়।

চলে যায় সৌরভ। আর অণিমা সেই যে ছটফটিয়ে ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতরে বসেছে, তারপর এই এতক্ষণের মধ্যে একবারও বাইরে আসেনি, একটা কথাও বলেনি।

কিন্তু চমকে ওঠেন নিবারণবাবু আর সুহাসিনী। ঘর থেকে বের হয়েছে অণিমা; আর, কি আশ্চর্য, যেন বাইরে যাবার জন্যই সেজেছে। আজই এই সন্ধ্যায় আবার কোথায় যাবার জন্যে মেয়ের মন এত ব্যস্ত হয়ে উঠলো? এ কি? কাঁদে কেন মেয়েটা?

—কি হলো? চেঁচিয়ে ওঠেন সুহাসিনী।

—আমি যাচ্ছি।

—কোথায়?

—স্টেশনে।

—স্টেশনে কেন?

—বিনয় বোধহয় সন্ধ্যার ট্রেনেই চলে যাবে।

—চলে যাক না বিনয়।

—যাবে কেন?

—বিনয়ের ইচ্ছা বিনয় চলে যাবে। বিনয়ের কাছে তোর কিসের কাজ?

—কাজ আছে বইকি। তা না হলে যাব কেন?

—কি কাজ?

—ডেকে নিয়ে আসি।

—কেন?

—যাবার আগে এ বাড়ির চা খেয়ে যাক।

—বিনয় আবার এখানে এসে চা খাবে কেন?

—তোমাদের মেয়ের সঙ্গে বিনয়ের বিয়ে হবে বলে।

—কে বললে?

—আমি বলছি।

নিবারণবাবুর মুখের দিকে তাকান সুহাসিনী। তারপর দু'জনেই একসঙ্গে অণিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কি বলতে চাইছে অণিমা? আজকের সকালবেলার হাসিটাই মিথ্যে, আর এই সন্ধ্যার কান্নাটাই তাহলে সত্যি?

নিবারণবাবু বলেন—আমার আর কিছু বলবার নেই।

সুহাসিনী বলে—আমি ভাবছি, মীরাকে আমি তাহলে বোঝাবো কি বলে?

হেসে ফেলে অণিমা—একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দেবে, ভগবানের ইচ্ছেয় যা হবার ছিল, তাই হলো।

মানগুহ্কা

ট্রাফিকের বড়সাহেব মাঝে মাঝে তাঁর শিকার-করা বাঘের শবটাকে স্টেশনের মুসাফিরখানায় শুইয়ে রাখতেন, আর দর্শকের সমাগমে নিরেট একটা ভিড় লেগে থাকতো সমস্ত দিন। আজকেও একটা ভিড় লেগেছে—অনেকটা সেই রকমের ভিড়। লোক ছুটে আসছে, যেন একটা গুলি করে মারা বাঘ দেখবার তীব্র কৌতূহল নিয়ে। স্কুলের ছাত্রেরা সাইকেল চালিয়ে এসে সজোরে ব্রেক কষে থামছে, সাইকেলগুলিকে সশব্দে রেলিংয়ের ওপর ঠেলে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে হুড়োহুড়ি করে মাথা ঢোকাচ্ছে। ভেলকিওয়ালার ডুগডুগি বাজলে পাড়ার ছোট ছেলেপিলেরা যেমন দুরন্ত এক প্রেরণায় চঞ্চল হয়ে ওঠে—বরাচক স্টেশনের মুসাফিরখানায় তেমনি ভদ্র-ভদ্রেতর ছেলে-বুড়ো সবাই প্রায় দৌড়ে দৌড়ে আসছে। তর সইছিল না কারও।

কয়েকজন কুলিও ওজন-কলটার ওপর বসে এই দৃশ্য দেখছিল। আপ-ডাউন ট্রেনগুলি এসে চলে গেছে, তবু সেদিকে তাদের ভ্রুক্ষেপ ছিল না। এক অপার্থিব আমোদের পুলকে রোজগারের তাড়নাও ভুলে গেছে তারা।

দর্শকদের দৃষ্টি যেন লালায়িত হয়ে চকচক করছিল। ভিড়ের মাঝখানে বসেছিল তিনজন কনস্টেবল, মাঝে মাঝে জনতার উপদ্রবে বিরক্ত হয়ে মৃদু ধমক হাঁকছিল। কিন্তু তাদের হাবভাব একটা কৃতিত্বের ভারিক্কি দেমাকে ভরে উঠেছিল, যেন কি ভয়ানক এক কীর্তিকে তারা লাগাম বাগিয়ে ধরে রেখেছে।

কনস্টেবলদের কাছে বসেছিল একটা মেয়ে, ঠিক কোন জাতের তা বোঝা যায় না। বোধহয় কোন জংলী জাত। বছর কুড়ি বয়স হবে। একটা নতুন থান কাপড় পরে বসে আছে মেয়েটা। থানার দারোগা দিয়েছেন এই কাপড়,কারণ ওর কাপড়-চোপড় দু'দিন আগেই এক কলঙ্কিত কাহিনীর সাক্ষ্যবস্তু হয়ে সদর হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে চলে গেছে। আজ শুধু পুলিশের হেফাজতে ওর দেহটা চলেছে সদরে।

জনতা সাধ মিটিয়ে দেখছিল—সেই মেয়েটা, জলাপুরের সেই অপঘটনার নায়িকা। মানুষেরই জৈবক্ষুধার সেই হিংস্র কাহিনী আজ তিন দিন ধরে শুনে শুনে চারদিকের দশটা গাঁয়ের শুদ্ধতা শিউরে উঠেছে।

মেয়েটার নাম আগো। সাহাদের নতুন বাড়ির দীঘি কাটাতে যে একদল মেয়ে-পুরুষ মজুর এসেছে, আগো এসেছিল তাদেরই সঙ্গে আর কাজ করছিল ভালই। কিন্তু হঠাৎ দু'দিন কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল। তারপর এই সেদিন নিজেই থানায় এসে রিপোর্ট দিয়ে গেছে। তিনটে পানওয়ালা গ্রেপ্তার হয়েছে—আগো তাদের ঠিক ঠিক সনাক্ত করেছে। সেই বিচিত্র বীভৎসতার নায়িকা আগো এইখানে সশরীরে উপস্থিত। মেয়েটাকে ভাল করে দেখবার জন্যে ভিড়ের মধ্যে গুঁতোগুঁতি আর মাথা ঠোকাঠুকি আরম্ভ হলো।

শান্তভাবে বসেছিল আগো। সহজ ভাবে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল জনতার কাণ্ড-কারখানা। মাঝে মাঝে মুখ নামিয়ে বড় লাজুক হাসি হাসছিল মেয়েটা। দেখতে সবচেয়ে অদ্ভুত লাগছিল এই হাসি। জনতার দৃষ্টির শরজালে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে আগো; তবুও ওর গায়ে যেন কিছুই বিঁধছে না। অপরিচিত এই পৃথিবীর বাসর-ঘরে যেন সকলে মিলে জোর করে ওর ঘোমটা টেনে নামিয়ে দিয়েছে। তারই পুলকে বিব্রত হয়ে না হেসে থাকতে পারছিল না মেয়েটা। শুধু চোখের তারা দুটো মাঝে মাঝে ঝিক্‌ঝিক্ করে জ্বলছিল।

সন্ধ্যে হবার একটু আগে থাকতেই ভিড় কমতে আরম্ভ করলো। শেষ রাত্রির ট্রেন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। একজন সেপাই হালুইকরের দোকান থেকে কিছু খাবার এনে রাখলো আগোর সামনে।—খেয়ে নে; যদি পেট না ভরে তো বলিস, আরও এনে দেব। আমাদের চাকরিটা খাবার জন্যে আজকের দিনটার মত মরে-টরে যাসনি বাবা।

আগোর খাওয়া শেষ হলো। ভিড় তখন আর নেই। সেপাই তিনজন কম্বল পেতে গড়িয়ে পড়লো।

আগো একটা অস্বস্তিতে ছটফট করছিল এবং একটা লজ্জাকাতর বেদনার দৃষ্টি দিয়ে সেপাইদের দিকে তাকাচ্ছিল বার বার। সেপাইরা ব্যাপারটা বুঝলো। কিন্তু ততটা প্রশ্রয় দেবার মত উদারতা দেখাতে সেপাইদের কেউ রাজি ছিল না।

বুড়োগোছের সেপাইটা বলে—তোমার বাইরে যেতে হলে ঐখানে আমাদের সামনেই যাও। দূরে যেতে পারবে না।

রুষ্ট সাপের মত আগোর মাথাটা দুলে দুলে কাঁপতে থাকে। চেঁচিয়ে বলে—আমাকে গরু পেয়েছ নাকি?

সেপাই তিনজন একসঙ্গে পাল্টা গর্জন করে ধমক দেয়।—ওরে আমার পর্দানসীন রে? লজ্জার চোট দেখ একবার! যা হুকুম করছি চুপচাপ কর, নয়তো এইখানে বসে থাক, উঠতে পারবি না।

আগো চুপ করে বসেই রইলো।

কম্বলশয়ান সেপাইরা আগোকে প্রশ্ন করে—সত্যি বল তো, পানওয়ালারা তোকে টাকা দিয়েছিল, না এমনি...।

আগো মাথা নেড়ে জানালো—না টাকা দেয়নি?

—তুই চেয়েছিলি?

—হ্যাঁ।

—থানাতে এই কথা বলেছিস?

—হ্যাঁ।

তিন সেপাই একসঙ্গে হেসে উঠলো।—তাহলে এই কেস আর টিকেছে? উল্টো তোরই কয়েদ না হয়ে যায়।

বুড়ো সেপাই আনমনা হয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবে, তারপর আক্ষেপ করে—সত্যিই জবরদস্তির মত পাপ আর কিছু হয় না। হ্যাঁ, ফুসলে-ফাসলে অনেক বদমাস অনেক কাণ্ড করে, তার একটা মানে হয়। কিন্তু এসব কোন জুলুম? গুণ্ডাদের বাড় বেড়েছে আজকাল, থানাও কিছু বলে না, নইলে...।

বুড়ো সেপাই কেন জানি রেগে উঠলো, আগোর দিকে তাকিয়ে মুখ ভেঙচে বললো—তোমার অদৃষ্টে বারটা বেজে গেছে। এরি মধ্যে হয়েছে আর কি? আরও কত বেইজ্জতি আছে দেখবি। ডাক্তারি রে, সওয়াল রে, জেরা রে...। কেন এসেছিলি বাবা মজুর খাটতে এ বয়সে, এই বিদেশে?

কোন উত্তর দেয় না আগো। মুসাফিরখানার দেওয়ালে টাঙানো কেরোসিনের ধোঁয়ায় ঘেরা আলোটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে, থানকাপড়ে জড়ানো শান্ত ও সুস্থির একটা মেয়ে।

রাত্রি দশটা। বরাচক স্টেশনের মুসাফিরখানায় তিনটি সতর্ক আইনের দূত তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। প্যাসেঞ্জার-ট্রেন তখন আসানসোলে পৌঁছে আবার হাঁসফাঁস করে অন্ধকারে পাড়ি দিয়েছে কলকাতার দিকে। একটা থার্ড ক্লাস কামরার বেঞ্চের নীচে ভীরু মুরগীর মত কুঁকড়ে শুয়েছিল আগো। চলন্ত ট্রেনের শব্দের আভরণ বাজছে সুচ্ছন্দে—তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে আগোর হৃৎপিণ্ডটা যেন আসন্ন মুক্তির আশায় নেচে চলেছে।

এক ভদ্রলোক দশ-বারটা কমলালেবুর ঝুড়ি সঙ্গে নিয়ে কামরাতে ঢুকলেন। বেঞ্চের তলায় ঝুড়িগুলি সাজিয়ে রাখতে গিয়েই বাধা পেলেন। তারপর নীচু হয়ে বেঞ্চের তলায় উঁকি দিয়ে সরোষে একটা ধমক দিলেন।—এই চোট্টা, নিকাল্ শিগ্‌গির, নইলে চেকার ডেকে ধরিয়ে দেব।

ভদ্রলোক বেঞ্চের তলায় হাত ঢোকালেন মানুষটাকে টেনে বার করার জন্য। ট্রেনের অন্য আরোহীরা হাসির সোর তুলে চেঁচিয়ে উঠল—হাঁ হাঁ হাঁ, করেন কি?

ভদ্রলোক—কি ব্যাপার?

আরোহীরা—মেয়েমানুষ শুয়ে আছে। ওর টিকিট নেই।

ভদ্রলোক—হা পরমেশ্বর। একে কি মেয়েমানুষ বলে! এমনি করেই লাজ লেহাজ বিসর্জন দিতে হয়!

ভদ্রলোক একটা ধিক্কার দিয়ে হাত সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সারারাত ট্রেন চললো আসানসোল থেকে কলকাতা। বেঞ্চের ওপর থেকে নানা জাতের যাত্রীর দশ জোড়া পা সাপের মত ঝুলে রইল। যতদূর সম্ভব আগো তার শরীরটাকে এই সর্পিল সংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করলো, কিন্তু বৃথা। পামশু-পরা, খড়ম-পরা ও নাগরা-পরা পাগুলি সারা রাত ধরে ও নানা কৌশলে ক্ষুধার্ত নখরের মত বেঞ্চের নীচে যেন অন্ধকারের মাংস খুঁজে বেড়ায়। কখনও বা বেপরোয়া আঁকড়ে ধরে—পিষে দেয়। সত্যি করে শ্মশানের শব তো নয়, একটা চোর মেয়েমানুষের জ্যান্ত দেহ, সে দেহের অদ্ভুত একটা আস্বাদ আছে; একটু আঘাত এবং বেশ একটু যন্ত্রণা না দিলে সে আস্বাদের সুখ পূর্ণ হয় না।

একজন রেল মিস্তিরি পাশের বেঞ্চে বসেছিল। হঠাৎ যেন একটা রসিকতার দমকা লেগে লাফিয়ে উঠলো, বেঞ্চের তলার দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে চেঁচাতে লাগল, বিচ্ছু! বিচ্ছু! ইয়া বড় বিচ্ছু! শীগ্‌গির বেরিয়ে আয়।

কামরার আরোহীর দল হো হো করে হাসতে থাকে।

ভোরবেলা। হাওড়া স্টেশনের সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মের ফটক দিয়ে যাত্রীরা বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে টিকিট দেখিয়ে পার হচ্ছে। সেই স্বচ্ছন্দ জনপ্রবাহের সঙ্গে আগোও এগিয়ে চলেছিল। বাধা পড়লো ফটকে। চেকার টিকিটের দাবী জানিয়ে আগোর মুখের দিকে উৎসুকভাবে তাকিয়ে রইলেন। ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে আগো যা বললো তাতে কোন অর্থ স্পষ্ট বোধগম্য হলো না।

—খাড়া রহো! টিকিট চেকারের হুকুমে আগো একপাশে সরে দাঁড়িয়ে রইলো। চেকারমশায় আগোর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বাকি যাত্রীদের টিকিট চেক করে গেটের কাছে জনারণ্যের ঝড় সামলাতে লাগলেন। ভিড় ফাঁকা হয়ে গেলে আবার এদিকে মনোযোগ দিলেন। দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণে গোঁফের ডগা চিবিয়ে দু'বার হাসলেন। ইতিউতি দু'বার তাকালেন। তারপর টিকিট ফুটো করার যন্ত্রটা দিয়ে আগোর পিঠে আস্তে একটু চাপ দিয়ে, ব্যস্তভাবে বললেন—জলদি ভাগ্ এখান থেকে। আর কেউ ধরে ফেললে আরও অনেক কিছু আদায় করে ছাড়বে।

আগো একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে গেল। শুধু পানওয়ালা নয়, দুনিয়ার জীবাত্মা যেন একটা জুলুমের আনন্দে মতিচ্ছন্ন হয়ে আছে। শুধু জোর আর জোর। এ ছাড়া কি অন্য ব্যবহার ভুলে গেছে সবাই? কিন্তু, চাইলেই তো অনেক কিছু দেওয়া যায়, বললে অনেক কিছু শোনা যায়, অনুরোধে অনেক কিছু বিনিময় করা যায়। কিন্তু শুধু জোর আর জবরদস্তি। এ কোন্ রীতি?

শহর কলকাতা—বিস্ময়ে প্লাবিত দুটি চোখের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে থাকে আগো। পথের পর পথ, শুধু চলার জন্যই, কোন গন্তব্য বোধহয় নেই। তবু বিচিত্র এই জনপদের রূপ। এই বর্ণ শব্দ গতির রূপ আগোর দেহমন এক নতুন পরিচয়সুখের আবেশে অভিভূত করে। বরাচক স্টেশনের ক্ষুদ্র জনতার মত এই শহর শুধু আগোর দিকে লোলুপ চোখে তাকিয়ে নেই। বিরাট এক ঐশ্বর্যের মেলায় সবাই যেন ঠাঁই পেয়েছে। সবাই পাশে পাশে চলে, কিন্তু কেউ কারও নয়। সাহাবাবুদের দীঘি, বরাচক স্টেশন, রাত্রির ট্রেন, হাওড়ার সাত নম্বর ফটক—একে একে সব ঘটনাই মনে পড়ে। সেখানে যেন পানওয়ালাদের মত গামছা দিয়ে একটা নারীদেহের

মুখ-হাত-পা বাঁধবার জন্য একটা আয়োজন সর্বদা ওত পেতে বসে আছে। কিন্তু মনে হয় শহর কলকাতা সেরকম নয়। আগো একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। বলাৎকৃতা নারীর অভিমানের জ্বালা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গেল আগো।

হেঁটে চললো আগো—সকাল থেকে দুপুর, তারপর বিকেল। রাস্তার ধারে একটা কল থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে, তার তলায় একটা মোষ আরামশয়ানে শুয়ে গায়ে জল নিচ্ছে। খুব তেষ্টা পেয়েছিল আগোর। জল খাবার জন্যে এগিয়ে যেতেই মোষটা শিং নাড়লো। কিন্তু মোষের এই শিং নাড়া হুমকি গ্রাহ্যই করলো না আগো, মোষের পাশে উবু হয়ে বসে নিশ্চিন্ত মনে আঁচল ভরে জল খেতে থাকে।

নির্বোধ দৃষ্টি তুলে মোষটা আগোর জল খাওয়ার দৃশ্য দেখতে থাকে শিং নাড়া থামিয়ে।

জল খাওয়া হয়ে যায় আগোর, তবুও জায়গাটা ছেড়ে যেতে যেন মন চায় না। দুই হাঁটুর ওপর চিবুক পেতে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে আগো। মোষটা এরই মধ্যে তার কাদাজলে মাখা গলাটাকে বাড়িয়ে দিয়ে আগোর পিঠের ওপর এলিয়ে দিয়েছে। আগো যেন আরও নিশ্চিত হয়ে একটা সুখস্পর্শের নীড়ে সব ভাবনা ভুলে বসে থাকে। উঠে যেতে ইচ্ছে করে না।

গামছা-পরা একটা লোক হঠাৎ এসে কাছে দাঁড়ালো, বোধহয় মোষের প্রভু; আগোর মুখের দিকে গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল লোকটা, তারপরেই আগোর পাশে বসে মোষের গলার কাদা ধুয়ে দেবার জন্য জল ছিটাতে শুরু করলো।

লোকটাকে দেখতে পেয়েও অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিল আগো। কিন্তু এই অন্যমনস্কতার আনন্দটুকু আর বেশিক্ষণ কপালে সইল না। হঠাৎ চমকে ওঠে এবং আশ্চর্য হয় আগো, গামছা-পরা লোকটা একটা হাত দিয়ে বাঘের থাবার মত আগোর হাঁটুটাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

গামছা-পরা চি[illegible] হাতটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে উঠে দাঁড়ায় আগো। চলে যায়, পেছন দিকে আর তাকায় না।

অনেকক্ষণ ধরে নানা পথে ও নানা দিকে শুধু চলতেই থাকে আগো। এতক্ষণে মনে হয়, জাদুকরের তৈরি এই শহরে পথ আছে অনেক, কিন্তু পথের শেষ নেই। শুধু হাঁটা যায়, কিন্তু দাঁড়ানো যায় না; শুধু ক্লান্ত হওয়া যায়, কিন্তু ক্লান্তি রাখবার মত কোন শাল-মহুয়ার ছায়া নেই এখানে।

রোদে পথ চলতে চলতে অনেকক্ষণ পরে দাঁড়াবার মত একটা জায়গা চোখে পড়ে আগোর। জায়গাটাতে ছায়া আছে। এগিয়ে যায় আগো।

হঠাৎ চোখে পড়ে—একটু দূরে একজন দাঁড়িয়ে আছে তারই দিকে তাকিয়ে। রুগ্ন বকের মত শীর্ণ চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, হাতে একটা ছড়ি। আগোর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লোকটা হাসল কালো-কালো দাঁতের হাসি, পানখেকো লাল জিভটাও দেখা যায়—কেমন ঘেয়ো ঘেয়ো।

এমন সুন্দর শহরে এই নেকড়েটা এল কোথা থেকে? গত তিনটি কালরাত্রির আতঙ্ক আবার আগোকে ভাবিয়ে তুললো। আবার অন্য পথে ঘুরে যেতে হলো আগোকে।

পথে যেতে যেতে বার বার পেছনে তাকায় আগো এবং দেখতে পায়, লোকটা প্রেত-ছায়ার মত ঠিক ধাওয়া করে আসছে। চোখাচোখি হলেই সেই কালো দাঁতে অদ্ভুত হাসি চমকে ওঠে। এক এক সময়ে আবার কোথায় যেন লোকটা অদৃশ্য হয়ে যায়। আগোর মন থেকে আশঙ্কার ভার নেমে যায়।

কারখানাগোছের একটা বাড়ির ফটকের সামনে এসে দাঁড়ায় আগো; দেখতে দেখতে তার চারদিকে একটা ভিড় জমে ওঠে।

ভিড়ের ভেতর থেকে নানা জনে নানা প্রশ্ন করে। বাড়ি কোথায়? যাচ্ছ কোথায়? কি কাজ কর? কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না আগো। ভিড়টা অনুপ্রাণিত হয়ে আরও ঘনিষ্ঠভাবে আগোকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে।

উত্তর দিতে চেষ্টা করে আগো, কিন্তু কি বলবে ভেবে পায় না। কারণ, সে নিজেই জানে না, কোথায় চলেছে সে। শুধু এইটুকু স্মরণ করতে পারে, সে পালিয়ে এসেছে আদালত আর ডাক্তারির ভয়ে এবং এখনও পালিয়ে চলেছে। পেছন থেকে একটা ব্যাধের দল যেন এখনো তাড়া করে আসছে তার জ্যান্ত দেহটাকে ধরবার জন্য। জবরদস্তি করো না, দুটো কথা জিজ্ঞেস করে নাও, একটু ভাবতে দাও, রাজি হই কিনা একটু অপেক্ষা করে দেখ—হাতজোড় করে মাটিতে মাথা ঠুকে, দু'চোখ জলে ভাসিয়ে, আর অভিশাপের ভয় দেখিয়ে বারবার অনুরোধ করলেও কোন ফল হয় না যে পৃথিবীতে, সেই পৃথিবী থেকে কোন মতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছে আগো।

ভিড়ের ভেতর থেকেই আগোর পেছনে দাঁড়িয়ে কে যেন আচমকা তার আঁচলটা টেনে দিয়ে সরে গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখবার চেষ্টা করে না আগো, শুধু দু'হাতে স্খলিতপ্রায় কাপড়টাকে শক্ত করে চেপে ধরে এবং সতর্ক হয়। বুঝতে পারে, ভিড়টা যেন তার শ্লথবসন ও বিব্রত শরীরটার সঙ্গে বড় বেশি ঘনিষ্ঠ হবার জন্য আরও কাছে এগিয়ে আসছে।

সামনের দিক থেকে ভিড়ের দুটো লোক এগিয়ে এসে আগোর একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই পাশ কাটিয়ে সরে যায় আগো। সবেগে জনতার বেড়া ভেদ করে বাইরে এসে পড়ে। এরই মধ্যে অনুভব করে আগো, ভেতর থেকে একটা লম্বা হাত মুহূর্তের মধ্যে তার কোমরের ওপর জোরে একটা চিমটি কেটে আবার লুকিয়ে পড়ল।

দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে যায় আগো। শুনতে পায়, পিছনের ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন বলছে—পাগল, আস্ত পাগল! আর একজন বলে—বদমাস। এরপর আর একজন কি বললো শুনতে পেল না আগো, ততক্ষণে ভিড়ের কাছ থেকে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছে আগো।

আগো বিশ্বাস করে, সে পাগল নয়, সে বদমাস। সে নিজে একথা জানে, এবং তারাও সবাই জানে যারা আগোকে জানে। আগোর গাঁয়ের লোক, পাশের গাঁয়ের লোক এবং কুটুমের দল, সবাই জানে—আগোর চরিত্র নেই। মাদি জন্তুরও যেটুকু সতর্কতা থাকে নিজের সম্বন্ধে, মানুষের মেয়ে হয়ে আগোর সেটুকুও নেই। যতবার গাঁয়ের বাইরে কয়লাখনিতে কামিন খাটতে গেছে আগো, ততবার একটা না একটা ঘটনায় সে ধরা পড়ে গেছে। সর্দার বিরক্ত হয়ে আগোকে দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। নতুন দলে ভর্তি হয়েছে আগো। কিন্তু আবার। আবার একদিন মাঝরাতে রাস্তার ওপর একটা রহস্যময় মোটরগাড়ির হর্ন শুনে ধাওড়া ছেড়ে বের হয়ে গেছে আগো। ফিরেছে যখন, তখন ভোর হয়ে গেছে এবং আগোর দু'কানে তখন দু'টি মেকি সোনার দুল, খোঁপায় চামেলী তেলের গন্ধ এবং আঁচলে বাঁধা দুটো টাকা।

অনেক পথ চলা হয়েছে। একটু জিরিয়ে নেবার জন্যেই একটা ল্যাম্পপোস্টের কাছে এসে দাঁড়ায় আগো। পথ ছাপিয়ে মানুষের দল স্রোতের মত চলেছে, দেখে দম বন্ধ হয়ে আসে আগোর। এত মানুষ আছে পৃথিবীতে এবং এত মানুষের থাকবার জায়গাও আছে।

আনমনা হয় আগো। মনটা হঠাৎ উধাও হয়ে যেন ভেলুডিহির কাছে সেই পাথর-বিছানো নতুন সড়কের ধারে খেজুর পাতা দিয়ে তৈরি একটা কুলিশিবিরের ভেতর ফিরে গিয়ে ঠাঁই খুঁজছে। অনেকদিন মনে পড়েছে, বার বার মনে পড়েছে, এবং আজ কেন জানি আরও বেশি করে মনে পড়েছে ভেলুডিহির কথা। এক মাটিকাটা দলের সঙ্গে গত বছর শীতের শেষে কামিন খাটতে গিয়েছিল আগো ভেলুডিহির নতুন সড়কে। মাত্র সাতটা দিন পরেই দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে, ঝাঁকড়া চুলে চিরুনি গোঁজা সেই রাখালটার সঙ্গে, একটা পাহাড়ী স্রোতের কাছে, সেই

সকালে জল আনতে গিয়ে। শালপাতার ঠোঙায় করে কতকগুলি পাকা ডুমুর এনে দিল রাখালটা, তারপর আগোর হাত থেকে কলসীটা নিয়ে স্রোতের মাঝখান থেকে জল ভরে আনলো। নিজেই কাঁধে করে জলভরা কলসীকে আগোর খেজুর পাতার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। তারপর, সেই সন্ধ্যাতেই খেজুর পাতার কুলিশিবিরের ওপর যখন চাঁদের আলো পড়েছে, তখন বাঁশি বাজলো নিকটেরই একটা শালগাছের ছায়ার অন্ধকারে। ঘরে থাকতে পারেনি আগো। সেই বাঁশির আহ্বান ব্যর্থ হতে দেয়নি।

বাঁশির সুরে ডাকলেই তো হয়, একটু হাসিমুখে অনুরোধ করলেই তো হয়। এক ঠোঙা ডুমুর হোক, একটু চামেলী তেলের গন্ধ হোক, দুটো টাকা হোক বা একজোড়া মেকি সোনার দুল—যা হোক কিছু উপহার আর মূল্য দিলেই তো হয়। কিন্তু চিতে বাঘের মত থাবা দিয়ে ধরা আর গামছা দিয়ে মুখ বেঁধে সব ইচ্ছা অনিচ্ছাকে চুপ করিয়ে দেওয়া, এ কোন রীতি? এই সামান্য কথাটা অনেকে বোঝে না, আশ্চর্য! বিমর্ষভাবে পথের চলন্ত জনতার দিকে তাকিয়ে আগোর মনে হয়, এমন অবুঝের সংখ্যাই বোধহয় বেশি।

এগিয়ে যায় আগো। কোথায় যাচ্ছে, যদিও সে তা জানে না, তবু এতক্ষণে বুঝতে পারে, মন তার কি খুঁজছে। কিন্তু এ শহরে তো শালবন নেই। এখানে সন্ধ্যে হলে গাছের নীচে কোন বাঁশি বাজতে পারে, বিশ্বাস করতে পারে না আগো। এখানে সন্ধ্যের পর আকাশে চাঁদ ওঠে কি না, কে জানে। ভুল হয়েছে, পালাতে গিয়ে ভুল পথে একেবারে নতুন ও অদ্ভুত একটা জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছে আগো। কিন্তু একটা আশ্রয় যে চাই!

চোখে পড়ে, একটু দূরে ঘাসে ঢাকা ছোট এক টুকরো মাঠ, তার ওপর এখানে-ওখানে এক-একটা গাছ। একটা গাছের ছায়ায় বসে একটা বুড়ি উনোন জ্বেলে টিনের গামলায় ভাত রান্না করছে। আগো এগিয়ে যেয়ে বুড়ির কাছে বসলো ফুটন্ত ভাতের বাষ্পের দিকে তাকিয়ে।

বুড়ি বলে—তুমি এখানে কে গো? তোমার ভাবনা কিসের, অমন গতর থাকতে?

বুড়ির ভাষা না বুঝলেও আগো এইটুকু বুঝতে পারে, বুড়ি তাকে ভাত খেতে অনুরোধ করছে না।

উঠতে হবে, কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করে না। যেতে হবে, কিন্তু কোন পথে যাবে এবং গেলেই বা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, কিছু বুঝতে পারে না আগো।

চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখতে থাকে আগো, এবং দেখতে গিয়ে চমকে ওঠে। একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে সেই কালোদাঁত ও লালজিভ লোকটা, আগোর দিকেই হাসিমুখে তাকিয়ে হাতের ছড়ি দোলাচ্ছে।

উঠে পড়ে আগো এবং চোখের সামনে যে গলিটা দেখতে পায় তারই ভেতর ঢুকে হনহন করে হাঁটতে থাকে। অনেক দূর চলে আসার পর পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। দেখে নিশ্চিন্ত হয়, কালোদাঁত আর লালজিভ নিয়ে কোন হাসিমুখ নেকড়ে আর পিছু ধাওয়া করে আসছে না।

একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে যায় আগো। বুঝতে পারে, এটা একটা দেবতাবাড়ি, একটা মন্দির। আগোর গাঁ থেকে ধানবাদ যাবার পথে ঝিলের ধারে ঠিক এইরকম একটা দেবতাবাড়ি আছে, সেখানে সন্ধ্যেবেলা ঘণ্টা বাজে এবং সাধুবাবারা শুয়ে থাকেন দাওয়ার ওপর।

মন্দিরটার দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল আগো। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মন্দিরের ভেতর থেকে মোটা মোটা চেহারার জনতিনেক লোক বের হয়ে এল। তাদের মাথায় বড় বড় টিকি আর কপালে তিলক। এরকম মানুষ এর আগেও দেখেছে আগো।

আগোর মুখের দিকে তাকিয়ে একজন জোরে নিঃশ্বাস ফেলে, একজন হাই তোলে এবং একজন আঙুল মটকাতে থাকে। আগো জিজ্ঞেস করে—গির্জা যাব কোন পথে?

—গির্জা? কেন? তুই কোন জাত?

—খিরিস্তান হব।

তিনজনেই একসঙ্গে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ধমক দেয়, বিদ্রূপও করে—তার চেয়ে বিলেত চলে যা, যেখানে তোর শ্বশুরের ছেলে বসে আছে।

হুমকি দেখে আগো আবার পিছিয়ে এল। সুমুখে তাকাতেই চোখে পড়ল, কালোদাঁত লোকটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে।

এক মুহূর্ত দেরি না করে প্রায় ছুটে চলে যায় আগো। আর কোথাও থামে না, ফিরে তাকায় না, যেন মরুভূমিতে ক্লান্ত ঘোড়ার মত মরিয়া হয়ে ছুটে চলেছে আগো, মুখ থুবড়ে পড়ে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আর থামবে না।

সন্ধ্যা হয়েছে। ময়দানের ধারে একটা গাছতলায় বসেছিল আগো। কাল রাত থেকে খাওয়া নেই। অবসাদে শরীরটা পাথরের মত অনড় হয়ে এসেছে। তেষ্টায় গলার নলিটা শুকিয়ে ঝিঁ-ঝিঁ করে কাঁপছে।

অনেক ঘুরেছে। একটা গির্জেও খুঁজে বের করেছিল আগো, কিন্তু গির্জের ফটকটা কি প্রকাণ্ড! সমস্তক্ষণ বন্ধ থাকে। সেখানে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে ফিরে এসেছে আগো। ভেতরে ঢোকবার সাহস হয়নি।

বৈশাখের সূর্য পশ্চিমে নেমে গেছে অনেকক্ষণ। গির্জের ঘণ্টা অনেকক্ষণ বেজে বেজে থেমে গেছে। চৌরঙ্গীর দালানগুলির মাথায় যেন অতিদূরের একটা দগ্ধ জ্যোতিষ্কের রক্তাভ জ্বালা এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আগোর জীবনে এই সন্ধ্যা সম্পূর্ণ অভিনব। গরু চরিয়ে শালের ডাঙায় ঘেসো পথ ধরে ধরে ফেরার ক্লান্ত-সন্ধ্যা নয়। শব্দের হর্ষে এই শহরের প্রাণ যেন দিনের শেষে নতুন করে ঝুমুর গেয়ে উঠেছে।

তেলেভাজার ঝুড়ি নিয়ে, কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে একটা লোক নিকটেই দোকান সাজিয়ে বসলো। আগো তার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। তারপর কখন ঘুমে চোখ বুজে এসেছে, তা সে নিজেই জানে না।

ভুল ভেঙে গেছে আগোর। এত রোশনাই, এত সুন্দর, এত হাসি-খুশি প্রকাণ্ড একটা কল চলছে শুধু। এও আর একরকমের একটা উল্টোপুরী—শুধু পথ আছে, আশ্রয় নেই। কেউ এখানে মন দিয়ে খোঁজে না, বাঁশির সুরে কাছে ডাকে না, মূল্য দিয়ে আদায় করতে চায় না। শুধু পথ আটক করতে চায় গায়ের জোরে।

প্রয়োজনহীন মাটির ঢেলার মত পড়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। এ শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে কালই সকালে, যদি আজকের রাতটার মত প্রাণটা বাঁচে।

একবার আচমকা চোখ মেললো আগো। তেলেভাজার পশারীটা তখনও কুপি জ্বালিয়ে বসে আছে। তার সামনে বসে আছে একটা লোক—ঠোঙা হাতে নিয়ে খাবার খাচ্ছে। নজর পড়তেই চমকে ওঠে আগো, বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে। ঐ তো দেখা যায়, লোকটার কালো দাঁত উদার আনন্দে হাসছে আর লালজিভ কাঁপছে।

ইচ্ছে করে আগোর, মাঠের এই কিনারা থেকে, এই মিটমিটে কেরোসিনের আলোর ষড়যন্ত্র থেকে এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে মাঠের ভেতরে সত্যিকারের অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে; সারারাত দু'হাত দিয়ে প্রাণপণ জোরে মাটি আঁকড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে থাকতে, যেন পৃথিবীর কোন মাংসলোলুপ পৌরুষের জানোয়ার শত নির্মম চেষ্টা করেও তাকে টেনে তুলতে আর এই মেয়েলী শরীরটার সব গর্ব রূঢ় অপমানের আঘাতে চূর্ণ করতে না পারে।

চারদিকে আলো নিববে কখন, আর শেয়াল ডাকবে কতক্ষণ পরে? মাঠের ভেতরে ঘনতর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে আগো, আজ রাতের মত ঐখানে গা-ঢাকা দিয়ে

থাকতে পারা যাবে বোধহয়। ঐ অন্ধ মাঠের ঘাসের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে তার নিঃশ্বাসের সব শব্দ লুকিয়ে ফেলতে পারবে। লালজিভ আর কালোদাঁত এই লোকটার নজর এড়িয়ে এক ফাঁকে দৌড়ে সরে পড়তে হবে মাঠের ভেতরে ঐ অন্ধকারের মধ্যে, যেন পিছু ধাওয়া করবার আর কোন পথ না খুঁজে পায় লোকটা।

লোকটা কি এখনো তাকিয়ে আছে? মুখ ফিরিয়ে আড়চোখে তাকাতে গিয়ে চমকে ওঠে আগো। সর্বনাশটা যে একেবারে কাছে এসে পড়েছে, এবং আগোর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার পায়ে যেন মানুষখেকো বাঘের পায়ের মত নরম থাবা আছে, হাঁটলে শব্দ হয় না। এত নিঃশব্দে কেমন করে কখন কাছে চলে এসেছে, কিছুই বুঝতে পারেনি আগো।

ভয় পায়, বুক ধড়ফড় করে আগোর। মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসে বুকের ভেতর আতঙ্কিত নিঃশ্বাসগুলিকে সামলাতে গিয়ে কাঁপতে থাকে। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, আগোর মনের সব ভীরুতা হঠাৎ মথিত করে একটা হিংস্র আক্রোশ মরিয়া হয়ে জেগে ওঠে, আরণ্য-শ্বাপদিকার চোখের মত। গায়ে হাত দেবার আগেই লোকটার টুঁটি কামড় দিয়ে ধরবার জন্য এবং লালজিভটাকে খিমচে ধরে উপড়ে ফেলার জন্য গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায় আগো।

কিন্তু একটু অপ্রস্তুত হয়ে এবং একটু বিস্মিত হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে আগো। একটা ঠোঙায় করে তেলেভাজা খাবার নিয়ে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। আগোর হাতের কাছে ঠোঙাটা এগিয়ে দিয়ে লোকটা বলে—উঠলে কেন? বসো, খাবার খেয়ে নাও, তারপর রাস্তার ধারে ঐ কল থেকে জল খেয়ে এস।

কোন কথা বলে না আগো। হাত তুলে খাবারের ঠোঙাটা নিতে পারে না। শুধু লোকটার মুখের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে।

খাবারের ঠোঙা মাটিতে নামিয়ে রেখে লোকটা বলে—লজ্জা করো না, ভয় করবারও কিছু নেই। তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল, আমি দেখেছি আজ সারাদিন তোমার খাওয়া হয়নি।

অপ্রস্তুত হয়েছিল আগো, এইবার বিচলিত হয়। সত্যিই তো লোকটা নেকড়ে নয়, জলাপুরের পানওয়ালা নয়। কাছে এসেও লোকটা শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে হাত তোলা দূরে থাক, এখন পর্যন্ত একটা লোভের কথাও বলেনি লোকটা। মাঠের কিনারার এই এক কোণে নিরালা আবছায়ার মধ্যে জোর করবার সুযোগ পেয়েও লোকটা এক ঠোঙা উপহার তার পায়ের কাছে রেখে দাঁড়িয়ে আছে, দেবতাবাড়ির ভক্তের মত।

ভুল হয়েছে আগোর। ভুল বুঝতে পারে, এবং মনে মনে একটু অনুতপ্তও হয়। আজ সকাল থেকে এই পরিচয়হীন শহরে যে সমাদরের আহ্বান তার পিছু পিছু ঘুরেছে, তাকেই মনের ভুলে কি ভয়ানক সন্দেহ করেছে আগো।

লোকটার মুখের ওপর অদূরের কেরোসিন কুপির কম্পিত শিখা থেকে মলিন একটুখানি আলোর কাঁপুনি এসে লাগছে। তাইতেই দেখা যায়, লোকটা শান্তভাবে হাসছে। চোখ ফিরিয়ে নেয় না আগো, বরং সাগ্রহে দেখতে থাকে, লোকটার মুখটা ধীরে ধীরে কেমন সুন্দর হয়ে উঠছে।

কি একটা কথা আগো বলতে চেষ্টা করতেই লোকটা বাধা দিয়ে বলে—তুমি আগে খেয়ে নাও, তারপর কথা হবে।

আর এক মুহূর্তও দ্বিধা করে না আগো। ঘাসের ওপর বসে পড়ে এবং তেলেভাজার ঠোঙা হাতে তুলে নেয়। নিঃসংকোচে এবং লজ্জাহীন উৎসাহে খাবার খেতে থাকে।

খেতে খেতে হাসি ফুটে ওঠে আগোর মুখে। এতক্ষণে যেন ধন্য হয়েছে আগোর আত্মা। সারাদিনের ভিড় থেকে এতক্ষণে একটা মানুষ বের হয়ে এসেছে আগোকে মূল্য দেবার জন্যে, উপহার দিয়ে আপন করার জন্যে, মান দিয়ে মন পাওয়ার জন্যে।

ভয় করা দূরে থাক, একটু ব্যস্তভাবে খাবার খেতে থাকে আগো, কারণ লোকটার হাতে হাত রাখবার জন্য মনটাও যেন এরই মধ্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

আগোর খাওয়া শেষ হয়। লোকটা বলে—তুমি এখানেই থাক, আমি জল নিয়ে আসছি।

চলে যায় লোকটা। তেলেভাজার দোকান থেকে দুটো মাটির খুরি নিয়ে রাস্তার কিনারায় কলের দিকে জল আনতে চলে যায়। বসে বসে শুধু দেখতে থাকে আগো। জানা নেই, চেনা নেই, একটা লোক তার তৃষ্ণার জল আনবার জন্য ছুটাছুটি করছে, দৃশ্যটা দেখতে দেখতে যেন তৃষ্ণা মিটে যাচ্ছে। এমন মানুষের কাছে নিশ্চিন্ত মনে নিজেকে ছেড়ে দিতে কোন আপত্তি নেই আগোর।

জল নিয়ে ফিরে এল লোকটা। আগো তার ঠোঁট দুটো কুণ্ঠাহীন ইচ্ছায় সুস্মিত করে লোকটার দিকে তাকায়, হাত বাড়িয়ে জলের খুরি তুলে নেয়।

দুই চুমুকে জল খেয়ে নিয়ে মাটির খুরি দুটোকে অন্ধকারের মধ্যে সবেগে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আগো, কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুখটা জোরে ঘষা দিয়ে মুছে নেয়। ভুরু বাঁকা করে তাকায়, মিটিমিটি হাসে, এবং গা মোড়া দিয়ে ক্লান্ত দেহের অলস সংযম নির্লজ্জের মত ভেঙে দিয়ে বলে—এবার বল, কি বলছিলে?

লোকটা হাসে—তুমি বল।

আগো—তুমি যা বলবে তাই হবে।

লোকটা কৃতার্থভাবে বলে—আমার সঙ্গে চল।

একসঙ্গেই দু'জনে উঠে দাঁড়ায় এবং মাঠের নিভৃত কিনারা ছেড়ে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে এসে রাস্তার ধারে দাঁড়ায়।

চলন্ত মোটরবাসগুলি একের পর এক এসে থামে আর চলে যায়। লোকটা কৌতূহলী হয়ে এক-একটা মোটবাসের মাথায় লেখা নম্বর পড়তে থাকে, তারপরেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, পছন্দমত কোন মোটরবাস যেন খুঁজে পাচ্ছে না লোকটা।

একটা নীল রঙের বাস এসে দাঁড়ায়, অনেক দূরে যাবার বাস, কলকাতা শহরের সীমা ছাড়িয়ে একটা চটকলের এলাকায় গিয়ে এই বাস থামে। আগোকে নিয়ে বাসের দিকে এগিয়ে যায় লোকটা, কিন্তু পরমুহূর্তে থমকে দাঁড়ায়, সামান্য দূরে একটা ল্যাম্পপোস্টের দিকে সতর্ক দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে।

নীল রঙের বাস চলে যায়। লোকটা ছটফট করতে থাকে। আগোর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—আমার সঙ্গে তোমার আর যাওয়া হতে পারে না।

আগো বিরক্ত হয়, এবং একটু অপমানিত বোধ করে—কেন?

লোকটা বিব্রতভাবে বলে—পুলিশ আমার পিছু নিয়েছে। তুমি থাকলে আমি পালাতে পারবো না।

আগো চমকে ওঠে, তারপরই মুখ ভার করে, এবং তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—পালাও, এখুনি পালিয়ে যাও।

লোকটা বিষণ্ণভাবে হাসে—তোমাকে কোন অসুবিধেয় পড়তে হবে না তো?

আগো তিক্তস্বরে বলে—না, কোন অসুবিধে হবে না।

কয়েকটা মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে লোকটা। তারপরই জিজ্ঞাসা করে—তোমার যাবার জায়গা আছে তো?

আগো—সে খোঁজে তোমার দরকার কি?

লোকটা—চেনা লোক কেউ নেই?

আগো—জানি না।

লোকটা আবার কিছুক্ষণ কি যেন ভাবে। তারপরই ব্যস্তভাবে বলে—তাড়াতাড়ি বল।

আগো—কি বলবো?

লোকটা—কি করতে হবে বল। তোমার একটা ব্যবস্থা না করে আমি যে পালাতে পারছি না।

আগো—তুমি যাও।

লোকটা—তুমি কোথায় যাবে?

আগো—আমি এখানেই থাকবো।

লোকটা—এই মাঠের মধ্যে?

আগো—হ্যাঁ।

লোকটা—তাহলে তোমার কি আর কিছু থাকবে?

আগো—তাতে তোমার কি?

আবার কয়েকটা মুহূর্ত কি যেন ভাবতে থাকে লোকটা। তারপরেই জিজ্ঞাসা করে—তোমার বাড়ি কোথায়?

আগো—জামুডিহি।

লোকটা—কোন স্টেশন?

আগো—ধানবাদ।

একসঙ্গে চারটে বাস এসে থেমেছে। যাত্রীদের ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে হল্লা হচ্ছে খুব। আগোর হাত ধরে ব্যস্তভাবে টান দেয় লোকটা—চটপট চলে এস।

হাওড়া স্টেশন। ধানবাদ যাবার থার্ড ক্লাসের একটা টিকিট কিনে নিয়ে লোকটা আগোকে বলে—চটপট পা চালিয়ে চল, আর সময় নেই।

বেশি সময় ছিল না, ধানবাদ যাবার ট্রেনের ইঞ্জিনটা তখন রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে জোরে ধোঁয়া ছাড়ছিল। মেয়েদের থার্ড ক্লাসের একটা কামরায় আগোকে উঠিয়ে দিয়ে লোকটা বাইরে প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে রইল, কামরার জানালার কাছে। হাঁপ ছেড়ে খুশি মনে লোকটা বলে—ব্যস, আর ভাবনা নেই।

আগো ফ্যালফ্যাল করে অদ্ভুত লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—কিসের ভাবনা?

লোকটা—তোমার জন্যেই ভাবনা হচ্ছিল খুব। তুমি একটা আস্ত জংলী, তোমার একটু বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। এই বয়সের মেয়েমানুষ রাতেরবেলা মাঠের মধ্যে পড়ে থাকলে তার গায়ের মাংস কি আর একটুকরোও খুঁজে পাওয়া যেত? জান না তো বাছাধন, কলকাতা জঙ্গলের চেয়েও কত বেশি ভয়ানক।

হো হো করে হেসে ওঠে লোকটা! সে হাসির শব্দে আগোর হৃৎপিণ্ডটা উল্টেপাল্টে কেমনতর হয়ে যেতে থাকে। একটা আক্রমণের নরক থেকে সরিয়ে নিয়ে আগোকে নির্ভয়ের জগতে পৌঁছে দিতে এসেছে লোকটা এবং মাত্র এইটুকু করতে পেরেই কত খুশি হয়ে গেছে। এক রাতের মেয়েমানুষকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যে ভাবনা করে, উপহার দিয়ে আর উপকার করেই সরে যায়, এমন পুরুষ জীবনে এই প্রথম দেখলো আগো।

ট্রেনটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নড়ে ওঠে। আস্তে আস্তে চলতে শুরু করে। লোকটা কামরার জানালা এক হাতে ছুঁয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে বলে—আমি যাই।

আগো—কোথায় যাবে?

লোকটা—পুলিশ যেখানে নিয়ে যাবে।

চমকে ওঠে আগো। মুখ বিবর্ণ হয়। গলাভাঙা স্বরে প্রশ্ন করে—পুলিশে নিয়ে যাবে কেন?

—সময়মত আর পালাতে পারলাম না, অনেক দেরি হয়ে গেল।

জংলী চোখে বেদনার্ত দৃষ্টি তুলে আগো জিজ্ঞাসা করে—পুলিশ তোমার পিছু নিয়েছে কেন?

—আমার যে বদনাম আছে।

—কিসের বদনাম?

প্ল্যাটফর্মের চঞ্চল ভিড়ের দিকে বন্যপশুর মত তাকিয়ে লোকটা বলে—ওরা আমাকে গুণ্ডা বলে, কলকাতায় থাকতে আমার মানা আছে।

ব্যথিত বিস্ময়ে আগো আর্তনাদ করে ওঠে—তুমি গুণ্ডা?

—হ্যাঁ গো, তুমি কি আমাকে একটা সাধু-মহাত্মা ভেবেছিলে?

ট্রেনের গতি একটু দ্রুততর হয়। দু'হাত দিয়ে লোকটার উল্কি-আঁকা একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আগো এবং তার ওপর মুখটা পেতে দেয়।

ট্রেনের গতি আরও দ্রুত হয়। প্ল্যাটফর্মের ভিড় জোরে হল্লা করে। পৃথিবীর সব হল্লার বুক মাড়িয়ে ট্রেন যেন ছুটতে আরম্ভ করেছে কোন পরোয়া না করে এবং পিছনে কারও দিকে না তাকিয়ে।

আঁকড়ে-ধরা হাতটা কখন কামরার জানালা থেকে সরে গেছে বুঝতে পারেনি আগো। ট্রেন তখন প্ল্যাটফর্মের সীমা প্রায় ছাড়িয়ে এসেছে। মুখ বাড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় আগো, দু'জন পুলিশ লোকটার হাত শক্ত করে চেপে ধরেছে। সত্যিই পালাতে পারেনি লোকটা।

অনেকক্ষণ পরে, আর একবার চমকে উঠলো আগো। তার পাশেই বসেছিল যে বিলাসপুরী কুলিবুড়িটা, সে-ই আগোর গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে বলে—কাঁদবেই যদি, তবে মরদটাকে ছেড়ে দূরে যাও কেন?

চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে, বুঝতে পারে আগো। আর বুঝতে পারে, জীবনে এই প্রথম একটা মরদের সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত তার এই বহু বদনামের দেহটা যেন কাঁপতে কাঁপতে চলেছে। কপাল মন্দ, এমন মরদকে কাছে পেয়েও হারাতে হলো, তাকে সুখী করার কোন সুযোগই পাওয়া গেল না।

তারপরই, একটু বুদ্ধি খাটিয়ে নিজের মনকে বোঝায় আগো—লোকটা বোধহয় কোন সাধু-মহাত্মাই হবে। ভালই হয়েছে, এমন মানুষের হাতে শুধু মাথা ছুঁইয়ে সরে আসতে পেরেছে সে। এছাড়া আর কিছু হলে খুবই খারাপ হতো, খুব পাপ হতো।

জয়ন্তী

আজও কি বাইরে বের হবে মুক্তি? আজ যে রবিবার। আর, মুক্তিও জানে যে, রাজীব আজ এখন ঘরেই আছে। এসময়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বের হবার মত কোন শখের তাগিদও যে রাজীবকে ব্যস্ত করে তোলে না, এই বাস্তব সত্যটা মুক্তিরও জানা আছে। তবু মুক্তি একবার ব্যস্ত হয়ে এমন অনুরোধ করে না যে, তুমিও চল।

এমন কত রবিবার এসেছে আর চলে গিয়েছে। কত মেঘলা রবিবার, কত কুয়াশামাখা আর আলো-ঝলমল রবিবার। রাজীব ঘোষ শুধু এই ঘরের ভিতরে চুপ করে বসে টেলিভিশনের যত নাটুকে মুখরতার শব্দ শুনেছে। সত্যি শুনেছে কিনা সন্দেহ; শোনবার চেষ্টা করেছে, এইমাত্র। কিন্তু শুনতে গিয়ে চোখ-মুখের চেহারাটা বোবা-বধিরের চোখ-মুখের মত ছটফট করেছে।

মনের ভিতরে ঐ একটা প্রশ্ন ছটফট করেছে, আজও কি বাইরে বের হবে মুক্তি? সত্যিই যদি বের হয়, তবে কি নিজেই এসে রাজীবকে অন্তত সামান্য একটা মুখের কথাও বলবে না যে, তুমিও চল?

এক-এক সময় এমন আশার ভাষাও রাজীব ঘোষের কল্পনার কানের কাছে, যেন একটা মিষ্টি হাসির সান্ত্বনা ফিসফিস করে কথা বলেছে, না, আজ আর আমি বাইরে যাব না। আজ শুধু এখানে তোমারই পাশে বসে থাকবো।

পরমুহূর্তে, যেন রাজীব ঘোষের এই চমৎকার আশার দুঃসাহসটাকে ভয়ানক ঠাট্টা করে রাজীবের হাতের কাছের টেলিফোন বেজে উঠেছে। অন্য ঘরের ভিতর থেকে, খুব সম্ভব সাজঘরের মিররের সামনে দাঁড়িয়ে টেলিফোন ধরেছে মুক্তি—আমি বাইরে যাচ্ছি।

না, তারপর আর কোন প্রশ্ন নয়। রাজীব ঘোষের হাতের টেলিফোনও কোন প্রশ্ন করেনি; রাজীব ঘোষের মনের ভিতরেও কোন আশার প্রশ্ন ফিসফিস করেনি। এইবার টেলিভিশনের নাটুকে মুখরতাকে ভাল করে শুনতে চেষ্টা করেছে রাজীব। তাই শুনতে পায়নি, করিডরের কার্পেটের উপর দিয়ে নরম কঠিন স্টিলেট হীলের মৃদু শব্দ একটা নাচুনে চালের আনন্দকে কখন টেনে নিয়ে চলে গেল।

কিন্তু ছেলেটা কোথায়? বুঝে নিতে অসুবিধে নেই, ছেলেটাকে আগেই পার করে দিয়েছে মুক্তি। এই তো কিছুক্ষণ আগে বুড়ি লুইসার হাত ধরে করিডরের কাচ-ঢাকা ছোট ফোয়ারাটার কাছে দাঁড়িয়েছিল আর ভোরের পাখির মত নানারকম স্বরে আর সুরে আবোল-তাবোল কথা বলছিল ছেলেটা। কোন সন্দেহ নেই, বুড়ি লুইসা আগেই রবিনকে বেড়াতে নিয়ে চলে গিয়েছে।

ওর নাম রবিন; ওরই নাম লালু। রাজীব ঘোষ আর মুক্তির ছেলে; আজ ওর বয়স, দু'বছর। তিন বছর আগের একটি শুভদিনে রাজীব আর মুক্তি স্বামী-স্ত্রী হয়ে এই ফ্ল্যাটে এসে ঠাঁই নিয়েছিল। আজও মনে করতে পারে রাজীব ঘোষ, দু'বছর আগে যেদিন খবরের কাগজের এক কোণে লালুর জন্মের ছোট্ট খবরটা ছাপার হরফে ফুটে উঠেছিল, সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে রাজীবের ঘরের টেলিফোন মোট ছাপ্পান্ন বার বেজে উঠেছিল। শুধু উচ্চকিত উচ্ছ্বসিত আনন্দের অভিনন্দন বার্তা। রাজীবের চেনামহলের এমন কেউ ছিল না, যে একবার টেলিফোন করে রাজীবকে কনগ্র্যাচুলেশন জানায়নি। হাউসমেড বুড়ি লুইসার আশি বছুরে থুড়থুড়ে বাবা পিটার্সও রাজীবকে টেলিফোনে জানিয়েছিল—থ্যাঙ্ক গড, আপনি আজ প্রাউড ফাদার অব এ সন।

ছেলেটার এই নাম রাজীবেরই দেওয়া নাম। ছেলেটার জন্মের দিনে, কী আশ্চর্য, রিজেন্ট পার্কে বেড়াতে গিয়ে একটা প্লাম গাছের ডালের উপরে সেই পাখি দেখতে পেয়েছিল রাজীব, যে-পাখিকে এখানে কোনদিন কেউ দেখতে পায়নি। একটা রবিন রেডব্রেস্ট। একটু কালচে

রঙের ছোট্ট নরম পাখিটি, বুকটা রঙিন লালে টলটল করছে। লোকের ভিড় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পাখিটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। রিজেন্ট পার্কের গাছে কালো রবিনের চেহারা প্রায় সব সময়ই দেখা যায়। কিন্তু রঙিন রেডব্রেস্ট? না, এর আগে কখনও কেউ দেখেছে বলে স্মরণ করতে পারছে না।

গল্পটা রাজীব ঘোষের জানাই ছিল। ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টের মাথাটিকে পাখার ছায়া দিয়ে ঢেকে রেখেছিল এক পাখি রবিন। খ্রিস্টের দেহের সেই যন্ত্রণার রক্তের ছায়া রবীনেরও বুকের উপর পড়েছিল। রবীনের বুকে সেই রক্তিমতা চিরন্তন হয়ে রয়ে গেল।

ঐ তো, সামান্য একটু দূরে, গ্রেট পোর্টল্যান্ড স্ট্রীটের যে চমৎকার বাড়িটা ডাক্তার হাম্‌ফ্রির মেটার্নিটি হোম, তারই একটি কক্ষে রাজীব ঘোষের স্ত্রী মুক্তি এখন হয়তো ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। হয়তো মুক্তির চোখ থেকে খুশির আলো উপচে পড়ছে। গিয়েছিল রাজীব ঘোষ; তখনই গিয়ে তের ঘণ্টা বয়সের ছেলেকে দেখে এসেছিল।

দেখে চমকে উঠেছিল রাজীব ঘোষের চোখ। রাজীব কখনও কল্পনাও করতে পারেনি যে, ছেলেকে দেখেই শান্ত কৌতূহলের চোখ দুটো এমন যন্ত্রণাক্ত হয়ে ছটফটিয়ে উঠবে। ছেলেটাকে দেখে সত্যিই যে রবিন রেডব্রেস্টের গল্পটা মনে পড়ে যায়। গল্পটা যেন দাউ-দাউ করে মনের ভিতরে জ্বলে-পুড়ে শব্দ করছে। তের ঘণ্টা বয়সের ওই বুকটা যে সত্যিই টুকটুকে লালে রঙিন হয়ে রয়েছে। তের ঘণ্টা বয়সের এই মুখটাও কী অদ্ভুত রকমের স্পষ্ট আর সুন্দর। মুক্তির আশার স্বপ্ন সফল হয়েছে। কিন্তু রাজীবের মাথার ভিতরে কেমন-যেন একটা যন্ত্রণা। সন্দেহ হয়, ব্রেন হেমারেজ নয়তো?

কিন্তু তারপরেই রাজীব ঘোষের চোখ-মুখের চেহারা শান্ত হয়ে গিয়েছিল। মুক্তির হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে রাজীবও হাসতে পেরেছিল।

ফিরে যাবার সময় আবার আরও ভাল করে হেসেছিল রাজীব—ছেলের নামও ঠিক করে ফেলেছি।

মুক্তি—কি নাম?

রাজীব—রবিন লালু।

মুক্তি—দেশী আর বিলিতি নামের মিকশ্চার মনে হচ্ছে।

রাজীব—শুনতে তাই মনে হবে। যাই হোক, তুমি ওকে ডাকবে রবিন, আমি ডাকবো লালু।

মুক্তি—খুব ভাল।

রাজীব আর মুক্তি যে ভাষায় কথা বলে, সেটা ইংরেজি ভাষা। বাংলা ভাষা ভাল করে কোনদিনই শেখেনি মুক্তি; তাই ভুলে যেতে কোন অসুবিধেই হয়নি। রাজীব ঘোষের মনের মধ্যে বাংলা ভাষাটা অবশ্য আজও মরে যায়নি; কিন্তু রাজীবেরও মুখের ইংরেজি শুনলে মনে হবে, সে জীবনে কোনদিন বাংলা জানতো না; আর কোনদিন বাংলা দেশের বর্ধমান কলেজের ছাত্রও ছিল না।

বদলে গিয়েছে, নিজেকে একেবারে নতুন করে ফেলতে পেরেছে রাজীব ঘোষ। লন্ডনের দশ বছরের জীবন রাজীবের কাছে যেন একটা বিপুল জীবনান্তর।

হেমন্তের একটি রবিবার, রিজেন্ট পার্কের ঘাসের উপর শুকনো পাতা উড়ছে, পাতা-ঝরানো হেমন্তের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সাতটা বেজেছে, তবু আলবানি স্ট্রীটের চ্যাপেলের মাথার শার্সিতে রোদের সোনালী প্রলেপ ঝকঝক করছে। আটটার আগে আঁধারী সন্ধ্যা নামবে না। কোন সন্দেহ নেই, এখন বেড়াতে বের হলে অন্তত আরও এক ঘণ্টা ধরে পার্কের যত হাইড-রেঞ্জিয়া আর টিউলিপের রঙিন রূপের মায়া দু'চোখ ভরে দেখতে পাওয়া যাবে।

মুক্তি যদি অন্তত এই সামান্য একটি কথা বলে যায় যে, আমি এই রিজেন্ট পার্কেরই এদিকে-ওদিকে একটু ঘুরে-ফিরে বেড়াবো; বেশি দূরে অন্য কোথাও যাব না; তবে অন্তত বুঝতে পারা যেত যে...।

তবেই বা কি বুঝতে পারা যেত, অনেক চেষ্টা করে বুঝে উঠতে পারে না রাজীব ঘোষ। মুক্তির জীবন যে একেবারে ভিন্ন এক শাসনের জীবন; রাজীবের কাছে মুক্তির শখ ইচ্ছা আর কাজের কোন কৈফিয়তও নেই। অথচ রাজীব জানে, মুক্তি জানে, দু'জনের একশো বান্ধব আর বান্ধবীও জানে, ওরা দু'জন হলো স্বামী আর স্ত্রী। তিন বছর ধরে চেনা-শোনা আর ভালবাসার পর বিয়ে করা দুটি মিলিত জীবন। বুড়ি লুইসা রোজই ওদের বিয়ের দিনের সাজপরা যুগলছবির ফ্রেম মুছতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়ে। বিয়ের দিনে তোলা ফটোটিকে ইটালিতে পাঠিয়ে মোজেয়িক পোর্ট্রেট করিয়ে আনা হয়েছে। ছয় ফুট লম্বা আর চার ফুট চওড়া ছবি; আইভরির ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো। কিন্তু এই ছবির দিকে এই এক বছরের মধ্যে একবার চোখ তুলেও তাকায়নি রাজীব, মুক্তিও না। ছবিটা আজ ওদের এই ফ্ল্যাটের বাইরের লাউঞ্জের একটি চমৎকার ইন্টিরিয়র ডেকোর মাত্র। ঐ ছবিতে ওদের জীবনের ঘটনার মায়া কিংবা ছায়া মিশে আছে, এটা যেন ওদের আজ আর মনেই পড়ে না।

অথচ তিন বছর আগের তিনটি বছর, ওদের দু'জনের জানা-শোনা আর মেলামেশার ঘটনা যেন দুটি উচ্ছল কলস্রোতের মিলে-মিশে আপন হয়ে যাওয়ার ঘটনা। রাজীব নিজেও কতবার মুক্তিকে বলেছে, সত্যি মুক্তি, তোমাকে প্রথম দেখেই আমারও মনে হয়েছিল—তুমি ফ্যান্টম্ অব ডিলাইট। মুক্তিও বলেছিল, আমিও একটা কথা বলতে পারি।

—কি? বলেই ফেল।

—তোমাকে দেখেই মনে হয়েছিল, এই তো আমার...।

—কি?

—দি ম্যান!

সেদিন মুক্তির মত মেয়ের মুখ থেকে এত বড় অভিনন্দনের ভাষা আশা করেনি রাজীব। তার কারণ নিজের অদৃষ্টের উপর যেন একটা নিদারুণ অবিশ্বাস ছিল। কিন্তু সেই অবিশ্বাসের সব বেদনা মুক্তির মুখের ওই একটি কথাতেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মুক্তিকে সৌভাগ্যের এক পরম উপহার বলে মনে হয়েছিল; আর ধন্য হয়ে গিয়েছিল রাজীব ঘোষের পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের পৌরুষের প্রাণ।

ধন্য হবারই কথা। রাজীব ঘোষের দেশের জীবনের ঘটনাটা যে একটা শাস্তির, একটা দুঃস্বপ্নের, একটা নিদারুণ চক্রান্তের মত ঘটনা। অন্য কারও তো বোঝবার সাধ্যিই নেই, রাজীব ঘোষ নিজেও আজ বোধহয় চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারবে না যে, সত্যিই তার প্রথম যৌবনের দিনগুলি ভয়ানক এক অভিশাপের বাঁধনে বন্দী হয়ে তার জীবনের সব স্বপ্ন একেবারে ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছিল।

বাবা তখন আর ছিলেন না। গরীব কাকা নিতাই ঘোষ ষোল বছর বয়সের ভাইপো রাজীবকে সিউড়ির চালকলের এক কেরানীবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। এত অল্প বয়সের ছেলের বিয়ে দিতে আইনের নিষেধ আছে; কিন্তু ভয় পাননি নিতাই ঘোষ। কে জানে ঠিক কত টাকা বরপণ পেয়েছিলেন নিতাই ঘোষ। চালকলের কেরানীবাবু কত টাকা বরপণই বা দিতে পারে?

স্কুলের পড়া শেষ করে মাত্র কলেজে ঢুকেছে ছেলে। ছেলে পড়াশোনায় খুব ভাল। ছেলে দেখতে চমৎকার। সিউড়ির চালকলের কেরানীবাবুর বাড়ির সব মানুষ কিন্তু জামাইকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর, সে বাড়ির সব মানুষও বুঝতে পেরেছিল, সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে যে, সে হলো তাদের ঐ মেয়েটি, ঐ জয়ন্তী, বয়স যার বারো বছর। বৈকুণ্ঠপুরের

বউঠান জয়ন্তীকে দু'হাতে তুলে নিয়ে বর রাজীবের কোলে বসিয়ে দিয়েছিলেন; আর জয়ন্তীও একটুও বিচলিত না হয়ে রাজীবের কোলের উপর এলিয়ে বসে পড়েছিল। শুধু কি তাই? মুখ তুলে রাজীবের মুখের দিকে অপলক চোখে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়েছিল। বৈকুণ্ঠপুরের বউঠান চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—কী সাংঘাতিক মেয়ে, এই বয়সেই হাঁ করে বরের রূপ গিলতে শিখে ফেলেছে।

কিন্তু তারপর? সায়েন্সের গ্র্যাজুয়েট রাজীব তখন কলকাতার একটা ফার্মে চাকরি করে। ফার্মের বড়সাহেব বলেছেন, রাজীবকে বিলেত যাবার আর কাজ করবার সুযোগ করে দেবেন। তারপর নিজের ভাগ্য নিজের হাতে। কয়েকটা বছর রিসার্চ করে, তারপর অন্তত ফসফেট সম্পর্কে স্পেশ্যালাইজ করতে পারলে রাজীবের মত প্রতিভার মানুষ একদিন ব্রিটেনের কোন বড় কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রীর ম্যানেজার হতে পারবে।

কাকা তখন আর বেঁচে নেই। বর্ধমানের বাড়িটা তখন যে গলা-পচা একটা ইটের ঢিপি হয়ে শিয়ালকাঁটায় ছেয়ে গিয়েছে, সে খবরও রাখে না রাজীব। কাকা ছাড়া আর এমন কেউ সে বাড়িতে ছিলও না যে, খোঁজখবর নিতে হবে।

হ্যাঁ, অন্য একটা বাড়ি তখনও একেবারে জীবন্ত থেকে, আর, একটা রাক্ষুসে মতলবে যেন উন্মত্ত হয়ে বার বার চিঠি দিয়ে রাজীবকে ডাকতে শুরু করেছে—একবার এস। সেটা হল সিউড়ির চালকলের কেরানীবাবুর বাড়ি। জয়ন্তীর বাবা নিজে কলকাতায় এসে রাজীবকে হাতে ধরে সেধে গিয়েছেন, একবার চল বাবাজীবন। সকলে তোমাকে দেখবার জন্যে ছটফট করছে। বৈকুণ্ঠপুরের বউঠানের চিঠিটা বেশ একটু নির্লজ্জ ভাষায় অনুযোগ করেছিল—জয়ন্তী যে এখন বড়টি হয়েছে; তুমি এখন একবার না এলে কি ভাল দেখায়?

রাজীব ঘোষের জীবন আর যৌবনের স্বপ্নের উপর যেন পাঁক লেপে দেবার একটা চক্রান্ত ভয়ানক হয়ে উঠেছে! সিউড়ির চালকলের কেরানীবাবুর বাড়িতে যাবার মত কোন প্রেরণা যে রাজীবের মত ছেলের রক্তমাংসে ও নিঃশ্বাসে থাকতে পারে না, এই সহজ সরল ও বাস্তব সত্যটা ওরা কেউ বুঝতে পারে না। তাছাড়া, জয়ন্তী নামে ঐ মেয়ে। নিতান্ত বাজে চেহারার একটা মেয়ে, কুৎসিতই বলতে পারা যায়; বিয়ের দিনেই জয়ন্তীর কালো মুখের উপর চন্দনের লবঙ্গ ছাপগুলিকে দেখতে কত বিশ্রী লেগেছিল রাজীবের সেটা আজও ভুলে যায়নি রাজীব।

এমন মেয়ে বড়টি হয়েছে, তাই রাজীবকে একবার তার কাছে যেতে হবে—কি জঘন্য ইচ্ছার অনুরোধ! বৈকুণ্ঠপুরের বউঠানের চিঠিটা যেন পশুর ভাষায় কথা বলেছে।

জয়ন্তীর এক মেসোমশাইও একবার কলকাতায় এসে রাজীবকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে আর ছলছল চোখ নিয়ে অনুরোধ করেছিলেন—এটা তো আমরাও বুঝি বাবা; তোমার উপর একটা অন্যায়ই করা হয়েছে। তোমার মত চমৎকার ছেলের সঙ্গে জয়ন্তীর মত মেয়েকে একটুও মানায় না। কিন্তু উপায় কি? শত হোক, সে তো তোমারই স্ত্রী। মানিয়ে নিতে তো হবে বাবা।

সিউড়ির চালকলের কেরানীবাবুর বাড়ির সবাই এই সত্য স্বীকার করে। রাজীবের মত রূপের আর গুণের ছেলের কাছে জয়ন্তী সত্যিই যে আস্তাকুঁড়ের কুটো; একটুও মানায় না। ছেলেটারই দুর্ভাগ্য বলতে হবে। ওর সঙ্গে কোন রাজবাড়ির মেয়েকেই ভাল মানায়। কিন্তু উপায় কি?

জয়ন্তীর দাদা বলেছেন আরও একটা চিন্তার কথা। রাজীব যদি বিলেত যায় তবে কি আর ফিরে আসবে? যদি ফিরেও আসে, তাতেই বা কি? জয়ন্তীর মত মেয়ের সঙ্গে ঘর করবার মন এখনই যখন নেই, তখন তো একেবারেই থাকবে না। কিন্তু রাজীবের বিলেত যাওয়া বন্ধ করাই বা যায় কি করে? উপায় কি?

সেদিন সিউড়ির চালকলের কেরাণীবাবুর বাড়ির সব মানুষ জয়ন্তীর একটা কথা শুনে চমকে উঠেছিল।—বিলেত যাওয়া বন্ধ করবার দরকার কি? এটা কি ভাল কথা?

চমকে ওঠবারই মত কথা। কত ছোট মুখে কত বড় কথা। ঐ তো রূপ; তার উপর লেখাপড়া যা জানে তা তো সবাই জানে। কাঁকড়ার মত বিদঘুটে আকারের অক্ষরে, সব বানানের মাথা খেয়ে কোনমতে একটা চিঠি লিখতে পারে। এমন মেয়ে যে বিলেত-ফেরত শিক্ষিত স্বামীর জীবনে কোন কাজেরই সঙ্গিনী হতে পারে না, এই সামান্য সত্যটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি নেই বলেই এত সহজে কথাটা বলতে পেরেছে জয়ন্তী।

দাদা চেঁচিয়ে ধমক দেন--বিলেত গেলে এদেশে কার জন্যে ফিরে আসবে রাজীব? তোর জন্যে?

জয়ন্তী—না, আমি কি একটা মানুষ যে আমার জন্যে ফিরে আসবে?

দাদা গরগর করেন—তবে?

জয়ন্তী—নিজেরই মনের গরজে ফিরে আসবে।

দাদা—তার মানে?

জয়ন্তী—মানে-টানে জানি না।

—তবে চুপ করে থাক।

—না, চুপ করে থেকে লাভ নেই।

—কি বললি?

—তোমরা ওকে একবার কোনমতে এখানে নিয়ে এস তো; তারপর যা হবার হবে।

দাদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে অন্যদিকে তাকান, আর কি-যেন ভাবতে থাকেন। বৈকুণ্ঠপুরের বউঠান ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বলেন—আমিও তাই বলি। রাজীবকে কোনমতে একবার এখানে নিয়ে এস।

একটা টেলিগ্রাম—জয়ন্তীর খুব অসুখ। দেরি না করে চলে এস। সিউড়ির টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতার রাজীব কিন্তু উতলা হয়নি। সন্দেহ করতেও দেরি হয়নি, এই নভেম্বর মাসের পয়লা তারিখেই সিউড়ির মতলবটা যেন রাজীবের বুদ্ধিকে এপ্রিলফুল করতে চাইছে। এটা জয়ন্তীর অসুখের সংবাদ নয়; এটা ছল করে রাজীবকে সিউড়িতে নিয়ে যাবার ধূর্ত চেষ্টা।

যাই হোক, এই ছল টেলিগ্রামের অনুরোধে একবার সিউড়ি ঘুরে এলেই বা কি এসে যায়? রাজীবের জীবনের স্বপ্নকে বাজে কথার জোরে ভুল করিয়ে দেবার সাধ্যি চালকলের কেরানীবাবুর বাড়ির কোন মানুষের নেই। যাবে আর চলে আসবে, এই তো সামান্য একটা অনিচ্ছার কাজ।

বিয়ের সময়ে দেখার পর জয়ন্তীর সঙ্গে রাজীবের এই প্রথম দেখা। সিউড়ির বাড়িতে ঢুকে, সকালবেলার আলোতে জয়ন্তীর হাসিভরা মুখটাকে দেখতে পেয়েই বুঝতে পেরেছে রাজীব, হ্যাঁ, চক্রান্তটা এইবার খুব বেশি চতুরতা চালাতে চেষ্টা করেছে। জয়ন্তীর চোখে-মুখে অসুখের কোন চিহ্নই নেই। বেশ সুস্থ চেহারা। আর বৈকুণ্ঠপুরের বউঠান যে কথা লিখেছেন, সেটাও একেবারে নির্ভুল সত্য। বড়টি হয়েছে বইকি জয়ন্তী। গোলা সিঁদুরের টিপ কপালে, শাঁখা আর চুড়িগুলি বেশ একটু আঁট হয়ে হাতে জড়িয়ে রয়েছে। খোঁপাটা বড় বেশি ভারী বলে মনে হয়; জয়ন্তীর চোখের দৃষ্টিটাও বেশ একটু অদ্ভুত; একুশ বছর বয়সের চোখ বোধহয় এইরকমই হয়ে যায়।

কিন্তু খুব ভুল করছে জয়ন্তী। ওভাবে রাজীবের মুখের দিকে তাকাবার কোন মানে হয় না। মিথ্যে আশা আর মিথ্যে সাহস না করলেই ভাল করবে জয়ন্তী। সে সুযোগ পাবেও না জয়ন্তী। সন্ধ্যা হবার আগেই বিকেলের ট্রেনে কলকাতা চলে যাবে রাজীব।

কিন্তু এ কী কাণ্ড! বৈকুণ্ঠপুরের বউঠানের চিঠির ভাষাটা যেন জীবন্ত হয়ে ঠিক দুপুরবেলাতেই রাজীবের হালকা ঘুমের আবেশ ছিঁড়ে দিয়ে চোখের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আর কথা বলছে। দরজা বন্ধ। ঘরের ভিতরে জয়ন্তী।

—এ কি, তুমি এখানে কেন? বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করে রাজীব।

জয়ন্তী হাসে—তোমাকে বিলেত যেতে মানা করবো না।

—মানা করলেই বা শুনছে কে?

—কিন্তু ফিরে আসতে হবে।

—তাই বা বলি কি করে?

—বল আর না বল, আসতেই হবে।

—কেন?

—বলবো না; আমি জানি, না এসে পারবে না।...যাকগে, আমি এখন তোমার কাছে শোব।

—কি বললে?

জয়ন্তী হাসে—একটু সর, জায়গা দাও; বিছানা জুড়ে শুয়ে থাকলে আমি কোথায় থাকি।

রাজীব চেঁচিয়ে ওঠে—না।

—কেন?

—তাহলে তুমিই শোও, আমি অন্য ঘরে গিয়ে বসি।

—ছিঃ, আমি যে তোমারই জন্য তোমার কাছে এসেছি।

—আমার জন্যে?

—নিশ্চয়। আমি তোমার কে, সেটাও বুঝিয়ে বলতে হবে?

—কে তুমি?

—আমি তোমার বউ।

—তাতে কি?

—আমি তোমার ছেলের মা হব; তাও কি জান না?

সেই মুহূর্তে আতঙ্কিতের মত বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় রাজীব। রাজীবের একটা হাত দু'হাতে আঁকড়ে ধরে জয়ন্তী। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রাজীব বলে—এরকমের বিশ্রী বাড়াবাড়ি করো না। তোমার কাছে আমার ওসব কোনো দাবী নেই, ইচ্ছেও নেই।

জয়ন্তীর কালো মুখের উপর কালো চোখের দৃষ্টিটাও যেন একেবারে ঘন কালো হয়ে টলমল করতে থাকে—ওভাবে বলতে নেই। তুমি বিদেশে যাবে, আমার কাছে তোমার ছেলে থাকবে, তুমি অনেকদিন পর ফিরে এসেও ছেলেকে দেখতে পাবে; সেটা কত সুখের কথা হবে ভেবে দেখ তো।

রাজীব—না, আমি তোমার সঙ্গে এসব কথা আলোচনাই করতে চাই না।

জয়ন্তী—কেন? আমি কুরূপ বলে ভয় পাচ্ছ?

রাজীব—ভয়?

জয়ন্তী—হ্যাঁ, ভয় করছো যে তোমার ছেলে যদি আমার চেহারা পেয়ে [illegible], এই তো?

রাজীবের চোখের তারা দুটো এবার যেন ঘেন্না পেয়ে কেঁপে ওঠে—সে ভয় তো আছেই।

—না; বিশ্বাস কর, তোমার ছেলে তোমার চেয়েও সুন্দর হবে। আমি স্বপ্নে দেখেছি, ভোরবেলার স্বপ্ন মিথ্যে হবার নয়।

—আমি বিকেলের ট্রেনেই রওনা হব। আর বোধহয় সময় বেশি নেই।

রাজীবের হাত দুটোকে শক্ত করে ধরে এবার নিজেরই বুকের উপর চেপে রাখে জয়ন্তী। —আমি জানি, তোমার কাছে আমাকে একটুও মানায় না। আমি তোমার মত বিদ্যার মানুষের কোন দরকারে কিছু করতে পারবো না। আমার যে রূপগুণ কিছুই নেই। কিন্তু...।

—আর বেশি কথা বলো না তুমি। শুনতে আমার খুব খারাপ লাগছে।

জয়ন্তী—কিন্তু আমি তোমাকে যা দিতে পারি, তাই দিতে চাইছি। তুমি ঘেন্না করো না, লক্ষ্মীটি।

রাজীব—সবচেয়ে ঘেন্নার কথা এইবার সত্যিই মুখ খুলে বলে ফেললে। সরে যাও, এছাড়া আমার আর কিছু বলবার নেই।

রাজীবের হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের দুই হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকে জয়ন্তী। তারপর মেঝের উপর বসে পড়ে। আর একটি কথাও বলে না, চেঁচিয়ে কাঁদেও না, নিঃশ্বাসের শব্দটাকেও ফুঁপিয়ে উঠতে দেয় না।

রাজীবও নিঃশব্দে কখন ঘর ছেড়ে বের হয়ে স্টেশনের দিকে চলে গিয়েছে, সে খবর সন্ধ্যার আগে বাড়ির কোন মানুষও জানতে পারে না। সন্ধ্যা হবার পর বৈকুণ্ঠপুরের বউঠান জয়ন্তীকে ঘরের মেঝের উপর পড়ে থাকতে দেখে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠেন। —কি হলো? বিষ-টিষ খেলি নাকি সর্বনাশী!

বিষ খেলেও মুখের চেহারা ওরকম হয়ে যায় না; একেবারে ফ্যাকাসে আর শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে যাওয়া একটা মুখ তুলে জয়ন্তী বলে—বিষ খাব কোন দুঃখে?

—তবে?

—সে চলে গেছে।

আলবানি স্ট্রীটের এই দিকটা বেশ নিরিবিলি; তার উপর মাঝে মাঝে রাস্তাটাও যেন একেবারে নিঝুম হয়ে যায়। পুলিশ হঠাৎ এসে ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিকও বন্ধ করে দিয়ে একেবারে নো-এন্ট্রি সাইনপোস্ট দাঁড় করিয়ে দেয়। আজও বোধহয় তাই করেছে পুলিশ। তাই বিগ বেনের সময়ের আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে ভেসে এলেও বেশ স্পষ্ট শোনা গেল। আর রাজীবের এই ঘরের বাতাসে একটা অদ্ভুত সৌরভের আবেশও এসে ছড়িয়ে পড়ল।

বুঝতে পারা গেল, মুক্তির সাজ অর্ধেক সারা হয়েছে এতক্ষণে। তাই এই সৌরভের আবেশে এখানেও ঘরের বাতাস থমথম করছে। তিন রকমের ফারসী সেন্ট আর ভ্যানিলার আরক পাঞ্চ করে, তার সঙ্গে ওডিকলোনের দুটো ফোঁটা মিশিয়ে দিয়ে নিজের পছন্দসই একটা সৌরভ তৈরি করে নেয় মুক্তি; এই অদ্ভুত মিশালী সৌরভকে স্লিম-করসেট আর ব্রেসিয়ারের উপর স্প্রে করে তারপর উপরের সাজ পরে মুক্তি। শাড়ি নয়; স্ল্যাক কিংবা কাপ্রি প্যান্ট।

বুড়ো আর্ল রাসেল আবার বলেছেন, আণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা করে বাতাস বিষাক্ত করবার নিদারুণ খেলার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করবেন। এক হাজার মানুষ সঙ্গে নিয়ে তিনি ট্রাফালগার স্কোয়ারের চারদিকের রাস্তার উপর বসে থাকবেন। পুলিশও সাবধান হয়ে নোটিশ দিয়েছে যে...!

হাতের খবরের কাগজটাকে মেঝের কার্পেটের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেয় রাজীব। শুধু রেডিও-অ্যাক্‌টিভ ভস্ম নয়, একটা সুগন্ধও মানুষের পৃথিবীর বাতাসকে বিষাক্ত করে চলেছে। মুক্তির শখের এই পাঁচমিশালী সৌরভ যেন একটা নিষ্ঠুর নিঃশ্বাসের উৎকট গন্ধ। মনপ্রাণ আর শরীরের নিয়ম ছাড়া একটা মত্ততার উৎসব মাতিয়ে তুলতে চাইছে এই গন্ধটা। কিন্তু কি আশ্চর্য, তবু সহ্য করছেন রাজীব ঘোষ, জনসন ব্রাদার্সের বিরাট ল্যাবরেটরির একটি সেকশনের কেমিস্ট ইনচার্জ, ক্রোড়পতিদেরও ছেলেমেয়েদের প্রিয় ক্লাবের নাচ আর ককটেলের আসরে যাঁর নিমন্ত্রণ প্রায় লেগেই থাকে। আজ পর্যন্ত স্পষ্ট করে আর মুখ খুলে মুক্তিকে বলতেই পারেনি রাজীব ঘোষ, কেন এই ঘরের জীবনের সবকিছুই তার কাছে আজ এত দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

বোধহয় সেই আশাটা এখনও মনের গভীরের এক কোণে জেগে আছে; মুক্তি হয়তো হঠাৎ একদিন নিজেই ইচ্ছে করেই এ সময়ে বাইরে বেড়াতে যাওয়াটা ছেড়ে দেবে। কিংবা বলেই ফেলবে, তুমিও চল। নয়তো বলবে, বাইরে গিয়েই কাজ নেই; এখানে এই ঘরের ভিতরে রবিনকে নিয়ে আমরা দু'জন টেলিভিশনের নাটক দেখি। কিংবা সেই গানের রেকর্ডগুলি বাজাই; আমার সবচেয়ে প্রিয় সেই সাউথ প্যাসিফিক পীস—আই অ্যাম ইন লাভ উইথ এ ওয়ান্ডারফুল গাই!

ব্যস, তাহলেই তো রাজীবের কাছে এই ফ্ল্যাটের জীবনটা একরকমের সুসহ হয়ে যায়। তাহলে লালুকে গাল টিপে আদর করতেও সেই বিশ্রী অস্বস্তিটা বোধহয় আবার কাঁটার মত মনের ভিতরে বিঁধবে না। এর বেশি কিছু আশা করবার এখন আর কোন মানেও হয় না।

মুক্তি কিন্তু এই ফ্ল্যাটের এ-ধরনের জীবনের মধ্যেই একেবারে খাঁটি সুখের একটি ফুল্ল হাইডরেঞ্জিয়া। মুক্তির মুখের হাসি একটুও শুকনো হয়ে যায়নি। মুক্তির রূপের ছাঁদ একটুও এলোমেলো হয়ে যেতে পারেনি। বিয়ের আগে ঠিক যেমনটি দেখেছিল রাজীব, বিয়ের পরে এই তিন বছর ধরে ঠিক সেই রকম; মুক্তির দেহ-মন-প্রাণ অবাধ জলের ঝরণার মত আপন আবেগের সুখে ধন্য হয়ে আছে। মাসের মধ্যে অন্তত তিনটে দিন সারারাতের নাচের ক্লাবে যাবেই যাবে মুক্তি; দুপুরবেলা বোর্দো আর রাত্রিবেলা বারগাণ্ডির শেরি খাবেই খাবে মুক্তি। মুক্তির অবশ্য একটা কাজের দায়িত্ব আছে। আমোদ জগতের নানা নতুন খবর প্রকাশ করে, এরকম একটা সাপ্তাহিক কাগজের জন্য প্রবন্ধ লিখতে হয়; ব্যালেক্রিটিক হিসাবে কিছু সুনামও আছে মুক্তির।

বিয়ের আগে মুক্তির জীবনের এইসব সাধ আর সুখের কোন খবর রাজীবের কাছে অজানা থাকেনি। সবই নিজের চোখে দেখেছিল আর নিজের মন দিয়ে বুঝেছিল রাজীব। কতবার রাজীবের সঙ্গিনী হয়ে সমুদ্রতটের হোটেলে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে মুক্তি, গায়ে শুধু ছোট্ট একটি বিকিনি; সেই সামান্য বাঁধন-ছাদনের কামুফ্লাজ গোলাপী শরীরের রঙের সঙ্গে মিলেমিশে চমৎকার এক অনাবরণ ফুল্লতার ইলিউশন জাগিয়ে তুলেছে। জলে ঝাঁপ দেয় মুক্তি। স্নানের নরনারীর ভিড় উল্লাসের শোর তুলে হাততালি দেয়—পারফেক্ট মারমেড! বিউটিফুল! উৎফুল্ল রাজীবও হাততালি দিতে ভুলে যায়নি।

কিন্তু মুক্তি তো সত্যিই মারমেডের মত কোন কল্পিতা অপার্থিবা নয়। সে বেচারীও নিতান্ত এক পার্থিবা নারী, খাঁটি বাঙালি বাপ-মা'র মেয়ে। নাগপুরের ডাক্তার আলফ্রেড মিত্র আর তাঁর স্ত্রী এক বছর বয়সের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ইংলণ্ডে বেড়াতে এসে শেষে রয়েই গেলেন। নতুন দেশের জল-বাতাসের গুণে তাঁর পুরনো হাঁপানি একেবারে সেরে গিয়েছিল। সাহেব হবার কোন শখের জন্যে নয়, স্বাস্থ্যের জন্যে, এই নতুন জল-বাতাসের মায়ায় পড়ে তিনি এই নতুন দেশে স্থায়ী ঠাঁই করে নিয়েছিলেন। টাকার অভাব ছিল না। কেন্টের এক গ্রামে এক সুন্দর নিভৃতে তাঁর সাধ করে কেনা একটি কটেজ আজও আছে। সেই কটেজে মুক্তির মা আজও আছেন, আলফ্রেড মিত্র অবশ্য আজ আর নেই। তিনি নিকটের এক চ্যাপেলের প্রার্থনা ধ্বনি শুনতে শুনতে এক সন্ধ্যায় হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেলেন।

এহেন আলফ্রেড মিত্রের মেয়ে মুক্তির জীবনে কিন্তু কোন চ্যাপেলের প্রার্থনার ধ্বনি নেই, কেন্টের গ্রামের কটেজের কোন শান্ত ছায়ার ছায়াও নেই। মুক্তিকে ইংরেজি শখের নারী বলে মনে করলে বেশ একটু ভুলই করা হবে। বলা যায়, নতুন শখের নারী। পৃথিবীতে যেখানে যা-কিছু নতুন হয়ে দেখা দিচ্ছে, তার সব কিছুকেই যেন মনে-প্রাণে ও শরীরে অভ্যর্থনা করতে চায় মুক্তি। মুক্তিরই তিন অন্তরঙ্গা অভিনেত্রী বান্ধবী—ডোরিন, এলেন আর পার্লও শুনে আশ্চর্য হয়ে যায়, ডায়মন্ড আর ফার-এর লেটেস্ট দর-দাম ডিজাইন আর আমদানির কত নতুন খবর কত সহজে বলে দিতে পারে মুক্তি। লন্ডনের ভারতীয় মহলের নর-নারীদের ক'জনই বা মুক্তিকে চেনে? যাঁরা কিছু খবর জানেন, তাঁরা জানেন যে এঞ্জিনিয়ার নটরাজনের সঙ্গে মুক্তির বিয়ে প্রায় ঠিকই হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কেন যে সে বিয়ে হলো না, সেটা কেউ জানে না। কিন্তু দেখা গেল, নটরাজন বেশ খুশি হয়ে লন্ডন ইউনিভার্সিটির ভারতীয়া ছাত্রী রঞ্জনাকে বিয়ে করলেন।

লন্ডনের খবরের কাগজে একদিন ছোট্ট একটা সংবাদও বের হয়েছিল—চেল্‌সি স্টুডিওর সুন্দরী ভারতীয়া মডেল মুক্তি মিত্র এইবার রিজেন্ট পার্কের খোলা আঙিনার স্টেজে তিনটে

সেক্সিপীয়রীয় নাটকে নায়িকার অভিনয় করবেন। এই খবরটাই যেন প্রজাপতির দূতের ভাষা হয়ে রাজীব ঘোষের মনের ভিতরে অদ্ভুত এক অনুভবের আবেশ জাগিয়ে তুলেছিল। খোলা-আঙিনার থিয়েটার দেখেছিল রাজীব; আর, 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট'-এর রোজালিন্ডকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তার কাছে একটি চিঠিও লিখেছিল। সে চিঠির ইচ্ছা যে ব্যর্থ হয়নি, তার প্রমাণ আলবানি স্ট্রীটের এই সুন্দর ফ্ল্যাটের সংসার; রাজীব মুক্তি আর রবিন লালু; স্বামী-স্ত্রী আর ছেলে।

বিলেতী ধরন-ধারণ আর শখ-সাধের জন্য রাজীবের মনে কোন ভক্তি বা কোন মোহ নেই। নিজের দেশকে যে একটু ছোট করে ভাবতে ভাল লাগে রাজীবের, তাও নয়। রাজীবেরও অন্তরাত্মার মধ্যে বোধহয় একটা প্রচণ্ড পিপাসা ছিল, একেবারে নতুন একটা জীবন পাওয়ার পিপাসা। যদি কারও উপর কোন ঘৃণা বা ভয় রাজীবের মনে থেকেও থাকে, তবে সেটা বোধহয় তার সেই পুরনো জীবনের একটা পুরনো অভিশাপের উপর। রাজীবের জীবনের উপর একটা ক্ষত দেগে দিতে চেয়েছিল একটা দুর্ভাগ্যের ঘটনা। সেই দুর্ভাগ্যের গায়ে একটা পশু-পশু গন্ধ ছিল।

কিন্তু ওসব কথা নিয়ে চিন্তা করবার আর কোন মানে হয় না। সেই ভয়ের জীবনটা যেন একটা দুঃস্বপ্নের মিথ্যে ভয়ের মত ভোরবেলার জাগা-চোখের হাসিতে আপনিই মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। কলকাতা থেকে লন্ডনে আসবার মাত্র পাঁচ মাস পরে একটি অদ্ভুত চিঠি পেয়েছিল রাজীব, সিউড়ির চিঠি। নানা জায়গার নানা ডাকঘরের ছাপ নিয়ে চিঠিটা একদিন রাজীবের জনসন ব্রাদার্সের অফিসে এসে টেবিলের উপর পড়েছিল। জয়ন্তী মারা গিয়েছে।

খবর পড়ে একটু দুঃখিত হতে হয়েছিল বইকি। আনফরচুনেট নারী। যদি অন্য কোন একজন নিতান্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিয়ে হতো জয়ন্তীর, তবে বেচারা বোধহয় ওর সেই ইচ্ছের আনন্দ নিয়ে সুখেই থাকতে পারতো। যাই হোক, খবরটা যেন এক টুকরো কালো ছায়ার জলে ডুবে যাবার খবর। রাজীবের এমন দুঃখময় আক্ষেপটাও যেন জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে, সামান্য একটা বাতাস হয়ে সেই মুহূর্তে মিলিয়ে গিয়েছিল।

তাই মুক্তির এই নামটাকেও যে মুক্তির প্রতিশ্রুতি বলে মনে হয়েছিল। মুক্তির লাল ঠোঁটের হাসির ভঙ্গিটির সঙ্গে মিল রেখে মুক্তির দুই চোখের অমন ঘনকালো নকল আইল্যাশও কী সুন্দর কাঁপতে পারে।

রাজীব আর মুক্তি, দু'জনে দু'জনের কাছে একেবারে খাঁটি নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি। মনে-প্রাণে একেবারে অসাধারণী, এমন এক নারীকেই রাজীবের প্রাণটা যেন এতদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আর, মুক্তিও নিশ্চয় কামনা করেছিল, তাকে অসাধারণীর গৌরব নিয়ে বেঁচে থাকতে মনে-প্রাণে সাহায্য করবে, এমন একজন অসাধারণ বন্ধুত্বের মানুষই তার স্বামী হোক। কোন সন্দেহ নেই, এক বছরের মেলামেশার পরীক্ষাতে দু'জনেই বুঝে ফেলেছিল, জীবনের আনন্দের কারবারে রাজীব আর মুক্তির মত চমৎকার দুই পার্টনার আর কেউ হতে পারে না। দু'জনের পক্ষে স্বামী আর স্ত্রী হয়ে যেতে আর কোন চিন্তার কথা নেই। বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেলেই ভাল হয়।

তাড়াতাড়ি করতে গিয়েও আরো দুটো বছর পার হয়েছে। লন্ডনের ভারতীয় মহলের দু'চারজন যারা মুক্তির জীবনের কিছু খবর জানেন, তারা এবারও আশ্চর্য হয়েছেন। কেমিস্ট রাজীব ঘোষের সঙ্গে মুক্তির বিয়ে কেন যে হলো, তাও কিছু বুঝতে পারা গেল না।

ঠিক কথা; নটরাজনের সঙ্গে মুক্তির বিয়ে না হওয়া যেমন, রাজীবের সঙ্গে বিয়ে হওয়াও তেমনি সমান বিস্ময়ের ব্যাপার। নটরাজন যে কেমিস্ট রাজীব ঘোষের তুলনায় রূপে গুণে খ্যাতিতে আর টাকা-পয়সায় অনেক বড় মানুষ।

এই রহস্যটার কিছু সত্য জানতে পেরেছিল যারা, তারা হল মুক্তির তিন প্রিয় বান্ধবী—ডোরিন, এলেন আর পার্ল। মুক্তিই বলেছে, নটরাজন ইজ নট ম্যান্‌লি।

—তার মানে? ডোরিন চোখ বড় করে আর সহানুভূতির স্বরে বিস্ময়ের প্রশ্ন করেছে।

মুক্তি—আমার পার্সোনালিটিকে সে ভয় পায়।

—ভয়? পার্ল-এর ভুরু কুঁচকে ওঠে।

মুক্তি—আমার জীবনের চমৎকার একটা ইচ্ছাকে সে একটুও সম্মান দিতে রাজি হয়নি।

এলেন ফিসফিস করে—ভদ্রলোককে একটু কাওয়ার্ড বলে মনে হচ্ছে।

মুক্তি—মনে-প্রাণে কাওয়ার্ড। কিন্তু রাজীব ঠিক তার বিপরীত।

এলেন—তারপর?

মুক্তি—তারপর আর কি? রাজীবের সঙ্গে বিয়ে হবে।

কোন মিথ্যের গল্প নয়। মুক্তির এই গল্পের মধ্যে একটি কথাও বাড়িয়ে বলা কথা নয়। রিজেন্ট পার্কের ফুলকুঞ্জের পাশে দাঁড়িয়ে মুক্তির গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, আর মুক্তির ঠোঁটের উপর বিপুল আগ্রহের একটি চুমো সঁপে দিয়ে, সেদিনই বলেছিল রাজীব—আমি তোমার সব ইচ্ছার বন্ধু। আমি আর পাঁচটা পুরুষের মত নিতান্ত হ্যাজব্যান্ড-ডেভিল হতে চাই না।

সেদিন নিজেই শখ করে শাড়ি পরেছিল মুক্তি। পার্কের জনতার চোখে একটা বিস্ময় ফুটে উঠেছিল; কোন ভারতীয়া নারীকে এভাবে লোকচক্ষুর সামনে দাঁড়িয়ে প্রেমিকের চুম্বন বরণ করতে কোনদিন তারা দেখেনি। এই ভারতীয়া নিশ্চয় একটি অসাধারণী।

রাজীব ঘোষের সেদিনের অঙ্গীকারের মধ্যে একটি কথাও যে বাড়িয়ে বলা কথা ছিল না, সে সত্য এই তিন বছরের বিবাহিত জীবনে আরও ভাল করে বুঝতে পেরেছে মুক্তি। মুক্তির কোন ইচ্ছাকেই বাধা দেয়নি রাজীব।

এমন কি এই সেদিনও, আর্টিস্ট মন্টিলেনির টেলিফোনের নিমন্ত্রণ পেয়ে যেদিন সান্ধ্যনাচের একটা ক্লাবে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো মুক্তি, সেদিনও মুক্তির সঙ্গে হেসে-হেসে যত স্বাদু খাবারের গল্প করেছিল রাজীব। —যাই বল তুমি, একটু কাঁচামাংসের গন্ধ থাকলেও আমার কাছে ইংলিশ স্টেক হলো সবচেয়ে সুস্বাদু খাদ্য।

মুক্তিও হাসে—তার চেয়েও সুস্বাদু জিনিস আছে। কাঁচা অয়েস্টার উইথ ক্রিম অ্যান্ড লেমন ড্রপ, লাভলি।

মন্টিলেনি, সেই ইতালীয়ান শিল্পী ভদ্রলোক, যিনি রাজীব আর মুক্তির বিয়ের দিনের ফটো থেকে মোজেয়িক পোর্ট্রেট তৈরি করেছিলেন, তিনি এই তিন মাস হলো ইতালি ছেড়ে লন্ডনে চলে এসেছেন। ভদ্রলোক মনে-প্রাণে সৌখীন। লন্ডনে তাঁর ছবি বেচা ব্যবসাও ভাল চলতে শুরু করেছে। লন্ডনে এসেই সবার আগে রাজীব আর মুক্তির সঙ্গে আলাপ করে গিয়েছিলেন। সেই আলাপের আনন্দ এখন অন্তরঙ্গতার আনন্দে পরিণত হয়েছে।

রবিন-লালুকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করেছেন মন্টিলেনি—আহা, কী সুন্দর খাঁটি ইন্ডিয়ান গোলাপের এই কুঁড়ি। কত বয়স?

মুক্তি হাসে—এক বছর ন'মাস।

মন্টিলেনি নিজেই গল্প করেছেন—আমি পুরনো চালে চলতেই পারি না; পুরনো কিছুই আমি সহ্য করতে পারি না।

এটাও বাড়িয়ে বলা কথা নয়। পুরনো এই লন্ডনেও টিকে থাকতে পারলেন না মন্টিলেনি। লন্ডন থেকে বেশ দূরে, কোলচেস্টার কাস্‌ল্ পার হয়ে, মেঠো এসেক্সের একটা নিরালা রাস্তার কিনারায় নিজের প্রিয় ক্যারাভান 'কোভাদিস' হলো মন্টিলেনির ঘর। এই ক্যারাভানেই মন্টিলেনি

থাকেন, ছবি আঁকেন, মাঝে মাঝে লন্ডনে আসেন আর চলে যান। যাবার আগে কিন্তু একবার রাজীব আর মুক্তির সঙ্গে দেখা না করে যান না।

এক বুড়ো জিপ্‌সি নাকি ঠাট্টা করে মন্টিলেনিকে বলেছে—গুডম্যান, হোয়াই স্টিল আওয়ার অল্‌ড্‌ পিগ? শেষে আমাদেরই বুড়ো শুয়োর চুরি করলে কেন হে ভালমানুষ?

এই গল্প নিয়েই রাজীব আর মুক্তির কাছে বলেছেন, আর খুশির হাসিতে যেন আত্মহারা হয়ে বার বার কেশেছেন মন্টিলেনি। সত্যিই নতুন সখের মানুষ বটে মন্টিলেনি, জিপ্‌সি বুড়োর ঠাট্টাটার কোন অর্থ হয় না।

হ্যাঁ, শুধু একটিবার, রবিনের জন্মের প্রায় দশ মাস আগে মুক্তির হাসিভরা মুখের ভাষাতে একটা ইচ্ছার কথা শুনতে পেয়ে রাজীব ঘোষের মুখের উপর শুধু এক ঝলক তপ্ত রক্তের আভা উথলে উঠেছিল; দুই চোখে কোন দুঃসহ বিস্ময়ের ভ্রূকুটি চমকে উঠতে পারেনি। মুক্তকণ্ঠে বার বার হেসে বলে দিতে পেরেছিল রাজীব—বেশ তো, বেশ ভাল অ্যাডভেঞ্চার, ট্রাই ইট!

একটি ছেলে বা মেয়ে পেতে চায় মুক্তি; কিন্তু সে ছেলে বা মেয়ের চেহারা যেমন-তেমন হলে চলবে না। মুক্তির মন-প্রাণ তার ছেলে বা মেয়েকে যে রূপ নিয়ে পৃথিবীতে আসতে দিতে চায়, সেটা সে প্রায় এক মাস ধরে ভেবে ভেবে ঠিক করে নিয়েছে। নীল চোখ, সোনালী চুল আর ছোট দাঁত, চিবুকের গড়নটি নিখুঁত হওয়া চাই। গলার স্বরও মিষ্টি হবে। এটা মুক্তির স্বপ্ন, মুক্তির সাধ, মুক্তির ইচ্ছা।

হেসে হেসে ঘাড় দুলিয়ে কথা বলে মুক্তি—তুমি কি কখনও বুঝতে পেরেছ, তোমার হাত দুটো তোমার শরীরের তুলনায় কত ছোট।

রাজীব হাসে—না।

মুক্তি—তোমার গলাতে শত চেষ্টাতেও কোনদিন গান গাওয়া সম্ভব হবে না।

রাজীব আবার হাসে—আমি কিন্তু ছেলেবেলায় বাংলা গান গাইতাম। যাই হোক্...।

মুক্তি—তবে চল।

রাজীব—কোথায়?

মুক্তি—ডাক্তার লুকাসের ক্লিনিকে; আমি আগেই সব কথা বলে এসেছি। যে-রকম জিনিস আমার দরকার তাও জানিয়ে এসেছি। কিন্তু ফর্মে তোমার একটা অনুমতির সই চাই।

রাজীব অদ্ভুতভাবে হাসে—নইলে ছেলে বে-আইনী ছেলে বলে প্রমাণিত হয়ে যেতে পারে, তাই না?

মুক্তি—না, সে ভয় করি না। আইন বলছে, স্বামীর সম্মতি না থাকলে ব্যাপারটা স্ত্রীর পক্ষে আনফেথফুল কাজ।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে রাজীব। মুক্তিও একটু আশ্চর্য হয়ে রাজীবের এই উচ্চকণ্ঠ হাসির শব্দটাকে বুঝতে চেষ্টা করে। আই লাইনার বোলানো বড় বড় দুই চোখের নকল আইল্যাশও যেন একটা জ্বলজ্বলে জিজ্ঞাসার আবেগ কোনমতে চেপে রাখতে গিয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে। মুক্তি বলে—বিশ্বাস করি, তোমার কোন আপত্তি নেই।

রাজীব—একটুও না। চল তবে।

দেরি হয়নি। বেশি দূরে নয়, রিজেন্ট স্ট্রীটেরই একটি সাতমহল ভবনের অটোমেটিক লিফট যেন গোঁ-গোঁ করে উপরতলায় চলে গেল। রাজীব আর মুক্তি, আর কেউ নয়, শুধু স্বামী আর স্ত্রী হাত ধরাধরি করে যেন এক অপার্থিব দানের ভাণ্ডারের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। ডাক্তার লুকাসের ক্লিনিক—নকল প্রাণবীজ প্রদাতার ক্লিনিক। বড়-বড় হরফে সত্যিই একটা অপার্থিব সঙ্কেত ঝকঝকে পিতলের ফলকে ফুটে রয়েছে—'এড' অর্থাৎ এ আই ডি; অর্থাৎ আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিশন ডোনার।

ডাক্তার লুকাসের সঙ্গে বেশ হেসে হেসে কথা বলে, ফর্মের উপর অনুমতির সই দিয়েই চলে যায় রাজীব। মুক্তি কখন কিংবা কবে প্রাণময়ী হয়ে এই চমৎকার সৃষ্টির কারখানা থেকে ছাড়া পাবে, সে খবর জেনে নিতেও ভুলে যায়। শুনতেও পায়নি রাজীব, কেমন চমৎকার বৈজ্ঞানিক ভাষায় মুক্তির প্রাণের কামনাকে সান্ত্বনা দিলেন ডাক্তার লুকাস—ইয়েস ম্যাডাম, মাত্র তিন ঘণ্টা আগের সংগ্রহ, ফ্রেশ অ্যান্ড ব্রাইট।

সত্যি, সেদিন বাড়ি ফিরতে বেশ একটু দেরিও হয়ে যায়। যেন বাড়ি যাবার পথটা কিংবা দিকটা ঠিক ঠাহর করতে পারছে না, রাজীবের চোখের দৃষ্টিটা সত্যিই বেশ এলোমেলো হয়ে যায়। নিকটেই একটা পাব্; কোনদিন পাবে বসে ড্রিঙ্ক করেনি যে মানুষ, তারও হঠাৎ ইচ্ছে হয়, পাবের ভিতরে মাতালের ভিড়ের সঙ্গে বসে, আর সামান্য একটু সাদা মদ পান করে কিছু সময় নষ্ট করলে মন্দ কি? না, দরকার নেই; এগিয়ে যায় রাজীব। গ্রেট পোর্টল্যান্ড স্ট্রীটের আন্ডারগ্রাউন্ট স্টেশনের দেয়ালের গায়ে এক ফুলওয়ালী বুড়ি ফুলের গ্যালারি সাজিয়ে বসেছে। মুক্তিকে এখনই একটা প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?

বাঃ, লন্ডন ট্রান্সপোর্টের এই বিজ্ঞাপনী পোস্টার তো বড় সুন্দর ছবি। গ্রীক পুরাণের চন্দ্রা দেবী সিলিনের ক্লান্ত ঘোড়া রক্তবর্ণ হয়ে দিগ্‌বলয় থেকে নেমে সমুদ্রের জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

না না না, এসব বাজে চিন্তার কোন মানে হয় না। রাজীবের প্রাণের আনন্দ সিলিনের ঘোড়ার মত ক্লান্ত হয়নি, কোন সমুদ্রের জলে তলিয়েও যাচ্ছে না। আলবানি স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়ে টেলিভিশনের নাটক শুনতে থাকে রাজীব।

তবে আজ আবার নতুন করে এত কথা ভাবছে কেন রাজীব? মুক্তিকে তো কোনদিনও একথা বলেনি রাজীব যে, তার মনের ভিতরে কোন অভিযোগ আছে। লালুকে কোলে নিয়ে কতবার চুমো খেয়েছে রাজীব, দেখে কত খুশি হয়ে জ্বলজ্বল করেছে মুক্তির দুই চোখ।

কিন্তু রবিন যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন রবিনের মুখের দিকে কেমন অদ্ভুত একজোড়া চোখের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে রাজীব; সেটা কখনও মুক্তির চোখে পড়েনি।

সত্যিই তো, কোথা থেকে একগাদা চমৎকার রক্তমাংস যোগাড় করে সুন্দর একটা পুতুল তৈরি করে নিয়ে এসেছে মুক্তি। রবিনের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রাজীবের চোখের দৃষ্টিটা যেন ধক্‌ধক্ করে জ্বলতে থাকে। তারপরেই চোখ দুটো যেন ছলছল করে। ঘুমন্ত রবিনের গাল টিপে চলে যায় রাজীব।

যাই হোক, এই নতুন জীবনের সব কিছুরই সঙ্গে নিজেকে তো মানিয়ে নিয়েছে রাজীব। এই জীবনই চিরকাল এই রকম সুন্দর হাসি-খুশির নাটক হয়ে টিকে থাকুক। শুধু মুক্তি একটু চিন্তা করুক। একবার ভেবে দেখুক মুক্তি, তার স্বামী এখানে এই ঘরের ভিতরে এখন বসে আছে। বাইরে যাবার আগে একবার দেখা করে যাক; অন্তত একটা মুখের কথায় বলে যাক, কখন ফিরবে। ওরকম ক্যাপরিপ্যান্ট আর সাদা টেনিস জুতো পরে বাইরে বেড়াতে না গিয়ে একবার তো শাড়ি পরেও বেড়াতে যেতে পারে। ভুলেই গেল কি মুক্তি, খোলা আকাশের নিচে সবার চোখের সামনে যেদিন রাজীবের চুমো প্রথম পেয়েছিল মুক্তি, সেদিন যে মুক্তির গায়ে ইন্ডিয়ান সিল্কের একটি সুন্দর শাড়ি ছিল?

চমকে ওঠে রাজীব। আসছে মুক্তি; কোন ভুল নেই, শুনতেই পাওয়া যাচ্ছে, প্রাণের খুশির গুঞ্জন তুলে চলে যাচ্ছে মুক্তি। কিন্তু এ ঘরের দরজার কাছে কেউ দাঁড়িয়েছে বলে মনে হয় না; দরজার পর্দাটা তুলে কেউ একটু উঁকিও দিল না। চলেই যাচ্ছে মুক্তি। নরম জুতোর কঠিন স্টিলেট হীলের শব্দ কার্পেটের উপর নরম-নরম ঠোকর দিয়ে চলে যাচ্ছে।

সোফা থেকে উঠে আর পর্দা ঠেলে করিডরের উপরে এসে দাঁড়ায় রাজীব। করিডরের বাতাসে মুক্তির গলার মৃদু গুঞ্জন আর সাজের সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। কে জানে কেন, লাউঞ্জের

একটা সোফার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুক্তি। মুক্তি আজ তার সবচেয়ে আদরের সাজটি পরেছে—সান-ফ্লাওয়ার ডিজাইনের স্কার্ট, তার উপর লাইল্যাক শেড; জ্যাকেটের রং লবস্টার-রেড।

—মুক্তি! চেঁচিয়ে ডাক দেয় রাজীব।

মুক্তির দুই চোখও যেন হঠাৎ বিস্ময়ের দুটো চোখ হয়ে, আর, আরও নিবিড় হয়ে রাজীবের দিকে তাকায়।

এগিয়ে যায় রাজীব। —আমি শুধু জানতে চাই, কোথায় চললে?

মুক্তি—হঠাৎ এমন বিশ্রী প্রশ্ন কেন? এমন ভয়ানক গলার স্বরে চিৎকার করাই বা কেন?

রাজীব—আমার তো মনে হয়, একটুও বিশ্রী প্রশ্ন করিনি; আর কোন ভয়ানক রকমের গলার স্বরে চিৎকারও করিনি। তোমাকে ব্যস্তভাবে ডেকেছি, এইমাত্র।

মুক্তি—এই ব্যস্ততাই বা কেন?

রাজীব হাসতে চেষ্টা করে—সব স্বামীই স্ত্রীর জন্যে এরকম ব্যস্ততা দেখায়।

মুক্তির দুই চোখের দুই ভুরুর উপর তুলি-টানা কালিমার কোমল রেখাও হঠাৎ ছটফটিয়ে শিউরে ওঠে। --কিন্তু তোমার এ রকমের ব্যস্ততা আমার সহ্য করা সম্ভব হবে না।

রাজীব—সহ্য করা উচিত।

মুক্তি—কেন?

রাজীব—আমি তোমার স্বামী।

মুক্তি—কে অস্বীকার করেছে? কিন্তু স্বামী-ডেভিল তো নও।

রাজীব—তার মানে?

মুক্তি—আমার ছেলের বাবা তুমি নও। রবিন আমার আনন্দ, কিন্তু সেজন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ নই।

রাজীব—কিন্তু আমি তো রবিনকে আমারই...।

মুক্তি—চুপ কর; মিথ্যে কথা বলো না। রবিন তোমার কাছে একটা সুন্দর জীবন্ত ডল মাত্র।

চমকে ওঠে রাজীব। —তুমি কি বলতে চাইছো, স্পষ্ট করে বল।

মুক্তি—রবিনকে তোমার চেয়ে বেশি ভালবাসতে পারে, এমন মানুষ পৃথিবীতে অনেক আছে।

রাজীব—তারপর?

মুক্তি—আর কিছু বলবার নেই।

রাজীব—কখন ফিরবে?

মুক্তি—বলতে পারি না।

রাজীব—বলতে হবে। রাজীবের চোখের তারা দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলতে থাকে। সমুদ্রের জলে ডুবে যাবার আগে চন্দ্রা দেবীর ক্লান্ত ঘোড়ার করুণ চোখ দুটো আগুন লেগে জ্বলে উঠেছে।

নরম জুতোর কাঠের স্টিলেট-হীলের শব্দ সেই মুহূর্তে লিফটের দিকে ছুটে চলে যায়। লিফটের শাটার টেনে দিয়ে আর হাত তুলে সুইচের বোতাম ছুঁয়ে চেঁচিয়ে ওঠে মুক্তি—ফিরবো না।

চমৎকার একটা গুঞ্জনের মত শব্দ করে লিফটও নিচে নেমে গেল।

ধীরে ধীরে লাউঞ্জের একটি সোফার উপর বসে, আর টেলিফোনের রিসিভার এক হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বসে থাকে রাজীব।

কার কাছে কি কথা বলতে চায় রাজীব? পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, তিনটি ঘণ্টাও পার হয়ে যায়; কিন্তু এই একই ভঙ্গিতে টেলিফোনের রিসিভার আঁকড়ে ধরে বসে থাকে কেন রাজীব? চোখ দুটোই বা তন্দ্রালু চোখের মত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন?

বুড়ি লুইসা এসে বলে—বেবীকে মাদাম নিয়ে গিয়েছেন। আমি তবে এখন যাই স্যার। গুডনাইট স্যার।

জানালা দিয়ে দেখা যায় ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ছোট্ট এক টুকরো চাঁদ ঝিকঝিক করছে। ঠিক এই রকমের একটা টুকরো চাঁদের শোভা কবে কোথায় আর কতদিন আগে একবার দেখতে পেয়েছিল রাজীব, চেষ্টা করেও মনে করতে পারে না। কিন্তু রাজীবের হাত দুটো যেন আক্রোশে ব্যস্ত হয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নেয়, আর একটা নম্বর ডায়াল করতে থাকে।

সলিসিটর সাদারল্যান্ড প্রশ্ন করেন—কি ব্যাপার?

রাজীব—ডিভোর্স চাই।

সাদারল্যান্ড—হেতু?

রাজীব—হেতু এই যে, উনি এখন আমার এখান থেকে বেশ দূরে আর্টিস্ট মন্টিলেনির ক্যারাভানে বসে আছেন; আর সারারাত সেখানেই থাকবেন।

সাদারল্যান্ড—ঠিক বলছেন?

রাজীব—একেবারে খাঁটি সত্য।

অল্‌রাইট! সাদারল্যান্ডের কথা শেষ হয়; রিসিভার নামিয়ে রাখে রাজীব। কিন্তু আশ্চর্য, রিসিভারটাকে আবার শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাজীবের হাতটা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে।

কী ব্যাপার? আবার কার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে রাজীব? চোখের দৃষ্টিটাও শিথিল হয়ে ঢুলে পড়ছে কেন? তবে কি খুব ভয় পেয়েছে রাজীব? কিসেরই বা ভয়?

রাজীবের মাথাটা অবশ হয়ে টেলিফোনের রিসিভারের উপর ঝুঁকে পড়ে। না, তার কাছে আজ আর কোন টেলিফোনের বার্তা পৌঁছবে না। সম্ভব হলে বলে দিতে পারা যেত, তোমার কথাই সত্যি হলো; আমার ছেলে আমার চেয়ে অনেক সুন্দর চেহারা পেয়েছে।

কালাগুরু

কত মহকুমা অফিসার এল আর গেল, কিন্তু মিস্টার টেনব্রুকের মত কেউ নয়। ছোট শহর সেখপুরার হৃদয় তিনি প্রায় জয় করে বসেছেন। একা উদ্যোগী হয়ে, চাঁদা তুলে আর গ্রান্ট বাগিয়ে হাসপাতালটাকে তিনিই মন্দদশা থেকে উদ্ধার করেছেন। পদগৌরবে তিনি মহীরুহ সমান, কিন্তু ব্যবহারে তৃণাদপি সুনীচ। অতি অমায়িক মিশুক প্রকৃতির লোক। আজ সন্ধ্যায় তাঁকে দেখা যায় দর্জিপাড়ার মিলাদে অন্তরঙ্গ হয়ে মিশে আছেন; কাল সন্ধ্যায় হরিসভার প্রাঙ্গণে। জুতো জোড়া দরজার বাইরে খুলে রেখে আসতে কখনো ভুল করেন না। কোনো মতেই তাঁর নিষ্ঠার খুঁত ধরা যায় না।

মিষ্টার জেরোম টি এল টেনব্রুক ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একটি নতুন নক্ষত্র। আর আলোটাও একেবারে নতুন ধরনের। তাছাড়া তিনি একজন ইন্ডোলজিস্ট। নিউ-ইয়র্কের স্যামসন ইনস্টিটিউটের মুখপত্রে তাঁর গবেষণার বিবরণ নিয়মিতভাবে ছাপা হয়। তাঁর ভারতী বিদ্যার গভীরতা পশ্চিমা পণ্ডিতেরা প্রথম জানতে পারেন সেই বিখ্যাত থীসিস থেকে—ঋগ্বেদের প্যানথীইজ্‌মে কেলটীয় চারণসঙ্গীতের প্রভাব। এই দুরূহ সিদ্ধান্তকে প্রমাণে অনুমানে প্রতিপন্ন করতে হলে যে-পরিমাণ সপ্রতিভ যোগ্যতা থাকা দরকার, টেনব্রুক সাহেবের সে সবই আছে। তিনি দেবনাগরী লিপি পড়তে পারেন, বাংলা লিখতে পারেন ও হিন্দীতে বক্তৃতা দিতে পারেন। তাঁর দাদু ক্যাপ্টেন টেনব্রুক ছিলেন বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্ক টোয়েনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভারতীয় কাল্‌চার সম্বন্ধে নানা নিগূঢ় তথ্য তিনি দাদুর কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলেন। আজকাল ইন্ডিয়াতে একটা জাতিবাদী অনুদারতার মালিন্য দেখা দিয়েছে, নইলে টেনব্রুকের প্রতিভার এই দিকটাও লোকে চোখে দেখতে পেত। জগদীশপুর থেকে বদলি হবার সময় বিদায়-সভায় বক্তৃতাক্রমে তিনি তাঁর মনের কথা অকপটে খুলে বলেছিলেন—আমার বুঝতে ভুল হতে পারে, হয়তো আমার জানার মধ্যে ভুল আছে, কিন্তু ইন্ডিয়ার আত্মাটিকে আমি একরকম চিনেছি। চিরধবল কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার মত ভারতের সেই আত্মাটিকে আমি ভালবাসি।

অনেকদিন আগে রাজগীরের মাঠে একটা পাথরের ধূপদান কুড়িয়ে পেয়েছিলেন টেনব্রুক। ধূপদানটা একটা লালচে বেলেপাথরের ফোটা পদ্মফুলের মত। স্টুডিয়োতে একটা লম্বা তেপায়া স্ট্যান্ডের ওপর ধূপদানটা বসানো থাকে। প্রতি সন্ধ্যায় বেয়ারা এসে ধূপদানের বুকে প্রায় আধমুঠো কালাগুরু পুড়তে দেয়। টেনব্রুক বলেন—এর মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রাচ্য সৌগন্ধের জাদু লুকিয়ে আছে।

বিদ্যাপীঠের ছোট ছোট ছেলেরা ফুটবল খেলছিল। আচমকা একটা হুডখোলা টুরার সড়ক ছেড়ে একেবারে সশব্দে দৌড়ে মাঠের গায়ে লাগলো। দুষ্টু ছেলের মতই উৎসাহে চঞ্চল টেনব্রুক গাড়ি থেকে এক লাফে মাঠে নেমে পড়লেন। ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে লেগে গেলেন।

খেলার মাস্টার অনাদিবাবুর বুকে দুরু-দুরু শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য হুইসেল বাজানো ভুলে গেলেন। তবু বার বার ডেভিড হেয়ারের কথা স্মরণ করে কোনো মতে নিজেকে ধীরে ধীরে আশ্বস্ত করে আনলেন। আবার আগের মত খেলা জমে উঠলো।

কিন্তু করালীবাবুর ছেলেটা—ঐ বলাই হলো এক নম্বরের বেয়াড়া। বল ছেড়ে দিয়ে যেভাবে পেছন থেকে সাহেবকে লেঙ্গি মারবার চেষ্টা করছে, ঘন ঘন ফাউল হেঁকেও ওকে দুরস্ত করা যাচ্ছে না। অনাদি মাস্টারের মনের শান্তি ক্ষণেক্ষণে খুঁচিয়ে নষ্ট করছিল বলাই—হিতাহিত ভাবনা নেই ছেলেটার।

খেলার শেষে টেনব্রুক সাহেব কিন্তু সব ছেলেদের মধ্যে বলাইকেই পিঠে চাপড়ে বাহবা দিয়ে গেলেন। সাহেব চলে যাবার পর অনাদি মাস্টার তবু বলাইকে আর একবার ভাল করে ধমকাতে ছাড়লেন না—ভবিষ্যতে আর কখনও এরকম গোঁয়ারের মত খেলবে না।

অনাদি মাস্টারের মন কেমন জানি ভরসা পাচ্ছিল না।

টেনব্রুক সাহেবকে লোকে আরও ভাল করে চিনতে পারলো সেইদিন—দরবার দিবসের অনুষ্ঠানে। ধন্য ধন্য পড়ে গেল। বার লাইব্রেরী ও তালুকদার সমিতির প্রত্যেকটি সভ্য, তাছাড়া যত কেরাণী বেনিয়া পাদরী, সকলেই টেনব্রুক সাহেবের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে ঘরে ফিরে গেলেন।

টেনব্রুক সাহেব তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন—আমি প্রত্যেকটি সরকারী কর্মচারীকে এবং বিশেষ করে পুলিশকে একটি সত্য স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেই সত্য হলো, তাঁরা যেন কখনো না মনে করেন যে, তাঁরা জনসাধারণের ভাগ্যবিধাতা। তাঁরা পাব্লিকের সেবক মাত্র। পুলিশ যেন সর্বদা মনে রাখে যে তারা মস্তিষ্ক নয়—তারা দুটি হাত মাত্র। তাদের কর্তব্য শুধু অর্ডার পালন করা। আজকের সুপ্রভাতে আমার মনে কেন জানি একটা আবছা আশঙ্কা থেকে থেকে উঁকি দিচ্ছে—ভারতের আকাশে অলক্ষ্যে কোথাও বোধহয় এক টুকরো অবাঞ্ছিত বেদনার মেঘ ঘনিয়ে উঠছে। বোধহয় একটা পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসছে। আমাদের এই ছোট সুখী শহরেও ঝড় দেখা দিতে পারে। সেই পরীক্ষায় পাব্লিক ও গবর্ণমেন্টের সম্পর্ক যেন অনর্থক তিক্ত না হয়ে ওঠে। সেইজন্য আমি আগে থেকেই সবার আগে পুলিশকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে এই সতর্কবাণী শুনিয়ে দিতে চাই। পুলিশ যদি আইনের মাত্রা লঙ্ঘন করে, তবে সেটাও রাজদ্রোহ বলে গণ্য করতে গবর্ণমেন্ট বাধ্য হবে, তার শাস্তিও আছে।

বক্তৃতার সময় সকলেই একটা তীব্র কৌতূহল ও ঐতিহাসিক প্রতিশোধের তৃপ্তি নিয়ে ডি-এস-পি রায়বাহাদুর জানকীপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। পুলিশ-প্রধান জানকীপ্রসাদের মুখে কিন্তু কোনো ভাববৈকল্য দেখা দেয় না। লড়াইয়ের ঘোড়ার মত তাঁর কপালের মোটামোটা শিরাগুলি এক অবধারিত আশ্বাসে শান্ত গর্বে দপ দপ করছিল—তেমনি নির্বিকার, তেমনি স্পষ্ট।

বিদ্যাপীঠের খেলার মাঠের মত সেখপুরার জীবন হাসিখুশিতে চঞ্চল হয়ে ছিল। টেনব্রুক সাহেব রোজ না হোক, সপ্তাহে তিনটি দিন অন্তর খেলতে আসেন। অনাদি মাস্টার একটা আশঙ্কা থেকে রেহাই পেয়েছেন। বলাই আর টেনব্রুক সাহেব একই সাইডে খেলে। দু'জনের মধ্যে আর সংঘর্ষের কোনো অবকাশ নেই। ছেলেগুলি সত্যি সত্যি খেলার ব্যাপারে যেন টেনব্রুকের ন্যাওটা হয়ে উঠেছিল। প্রতি বৈকালে ওরা সাগ্রহ প্রতীক্ষায় সাহেবের গাড়ির শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

তবু মেঘ দেখা দিল। সেখপুরা শহরকে সত্যিই যেন একটা ঝড়ের আবেগ চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। লোকাল বোর্ডের একুশ জন্য সদস্য ইস্তফা দিল। তিনটে দিন হরতাল হলো। রাজগঞ্জ কোলিয়ারিতে শুরু হল ধর্মঘট। জৈন ধর্মশালার আঙ্গিনায় একটা জনসভাও হয়ে গেল। একটা হাজার-মানুষের শোভাযাত্রা স্বরাজ পতাকা নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে গেল।

মিস্টার টেনব্রুক অবিচল ছিলেন। একটিও লোক গ্রেপ্তার হলো না, একশো চুয়াল্লিশ জারি করে কোনো ঢোলের শব্দ বাজলো না। পুলিশ শুধু সেজেগুজে কোতোয়ালীতে বসে থাকে। বাইরে যাবার কোনো প্রয়োজন হয় না—টেনব্রুকের কড়া নির্দেশ।

সূর্যকুণ্ডের জলের মত সেখপুরা যেন তিনটে মাস ধরে উত্তেজনায় ফুটতে লাগলো; তার মধ্যে মিস্টার টেনব্রুক শুধু একটি কাজ করলেন; দিকে দিকে ইস্তাহার ছড়িয়ে দিলেন— "আমার প্রিয় সেখপুরার পাবলিকের কাছে এই আবেদন করতে চাই যে, যে কোনো বিবাদ বা

প্রতিবাদ হোক—আলোচনা করে তার নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। সভ্যতার চরম উন্নতি হলো ডেমোক্রোসী, ডেমোক্রেসীর প্রাণ হলো ডিসিপ্লিন। সেই ডিসিপ্লিন যেন নষ্ট না হয়।"

ঘটনাগুলি যেন নিজের উত্তেজনাতে অবসন্ন হয়ে ক্রমে থিতিয়ে এল। কোথাও প্রতিহত হলো না বলেই বোধহয় ফুরিয়ে গেল। টেনব্রুক তাঁর নৈতিক এক্সপেরিমেন্টের এই অভাবিত সাফল্যে খুশিতে বিভোর হয়ে রইলেন। শহরের নানা সম্প্রদায়ের দশজন বেসরকারী এবং পাঁচজন সরকারী প্রধানকে ডেকে নিয়ে শান্তি কমিটি করলেন। কে যেন পরামর্শ দিল, ডি-এস-পি'কে কমিটির মধ্যে গ্রহণ করা হোক। শুদ্ধাদর্শী টেনব্রুক শুচিবাতিকের মত নাক কুঁচকে আপত্তি জানালেন—না, কোনো মতেই নয়।

শুধু থামছে না প্রভাতফেরীর গান। ঝড়টা যেন পালিয়ে গেছে শুধু ভৈরবী সুরের একটা আক্রোশ রেখে দিয়ে। সেখপুরার নিথর সুপ্তির মধ্যে প্রতিদিন শেষ রাত্রে কারা যেন পথে পথে গান গেয়ে চলে যায়। টেনব্রুক দিন গুনছিলেন, এই চৌরচপলতাও ক্রমে শান্ত হয়ে আসবে।

অনেক দিন গোনা হয়ে গেল। টেনব্রুক তবু ধৈর্য ও বিশ্বাসে অটল ছিলেন। শান্তিকমিটি কত গোপন খবর এনে দিল, তবু প্রভাতফেরীর ওই রহস্যটা আজও ঘুচলো না। কেউ বলতে পারে না কারা গান গায়, কোথা থেকে আসে এবং কোথায় চলে যায়। মাঝরাত্রে শহরের সব পাড়ার কত ছেলেবুড়ো উঠে বসে থাকে। প্রতীক্ষায় নিঝুম মুহূর্তগুলি পার হতে থাকে। হতাশ হয়ে ভাবে—আজ বুঝি আর গানটা এল না। সেই আনমনা অবকাশের মধ্যে চকিতে বাইরের পথে গানের শব্দ উতরোল হয়ে ওঠে। দরজা খুলে বাইরে আসতে আসতেই মিলিয়ে যায়—কাউকে দেখা যায় না।

এ গান কখনও বন্ধ হবে না। শহরে একটা কাহিনী ছড়িয়ে পড়ছে—এই গয়া রোড ধরে যদি মাইলখানেক পশ্চিমে এগিয়ে যাও, তবে প্রথমে পড়বে ডুমরিচকের ডাকবাংলো। সেখান থেকে ডাইনে বেঁকে আরও পাঁচ ক্রোশ। পুরনো কারবালা পার হয়ে একটা বহেড়ার জঙ্গল, তার উত্তর ঘেঁষে একটা নদী। নদীর একপাশে একটা প্রকাণ্ড পিপুল গাছ হেলে আছে। অন্য পাশে পি-ডব্লু-ডি'র সড়ক।

হ্যাঁ আছে। সবাই জানে, সার্ভিস বাসগুলি গিরিডির পথে মোড় ফেরবার আগে একটু জিরিয়ে নেয়—রেডিয়েটারে নতুন জল ঢালে। একটা চৌকীদারী ফাঁড়ি আছে সেখানে। পিপুলতলার একটা গাঁথনির ওপর দ্রাঘিমার নম্বর লেখা আছে।

শোকাবহ বেদনার কাহিনীটা আরও করুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে—সেই সব সাতান্নের গদরে ঠিক ঐ জায়গাটিতে একশো জন ছত্রী সেপাইয়ের প্রাণ গিয়েছিল। এক কার্নাইল সাহেব ঐ পিপুলতলায় তোপ বসিয়ে বন্দী ছত্রীদের উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে কাহিনীটা সবার কানে কানে চুপি চুপি ফিস্‌ফিস্ করে যায়—গানটা সত্যিই কোনো মানুষের গলার গান নয়—প্রভাতফেরী-টেরী নয়। একটা শব্দমরীচিকা মাত্র। গয়া রোডের দিক থেকেই শব্দটা প্রথম শোনা যায়। সারারাত ধরে এগিয়ে আসে, তারপর শহরে ঢোকে এবং ভোর হতে না হতেই সরে পড়ে।

মিস্টার টেনব্রুকও কাহিনীটা শুনলেন; বিভ্রান্ত ও সন্ত্রস্ত শান্তি কমিটিকে তিনিই আশ্বাস দিয়ে জানালেন—ঘাবড়াবার কিছু নেই। এইসব প্রেতরাগিণী ও কিংবদন্তীর সঙ্গে লড়বার কায়দাও আমি জানি।

অঘ্রাণের রাত্রি ভোর হয়ে আসে। মোড়ের মাথায় মিউনিসিপ্যাল ল্যাম্পপোস্টের মাথাটা তখনো জ্বলছে। শিশির-ভেজা সড়কটা নেতিয়ে পড়ে আছে অলসভাবে। শালের ডালপালাগুলি এক একটা কুয়াসার স্তবক আঁকড়ে নিঝুম হয়ে আছে। সেই ফিকে অন্ধকার আর মূক নিসর্গের মাঝখানে কাছারী রোডের ধারে একটা গাছতলায় মিস্টার টেনব্রুক যেন গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—এক অবাস্তব দেশের সেনাবারাকে সতর্ক শান্ত্রীর মত।

এতক্ষণে শুনতে পাওয়া গেল। মন্থর বাতাসের গায়ে দূরাগত সেই অদ্ভুত সুরের শিহর এসে লাগছে। গানের ভাষা স্পষ্ট বোঝা যায় না। ছোট ছোট শব্দময় স্রোত এক সঙ্গে মিশে গিয়ে যেন এক সুরপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। তারা এগিয়ে আসছে।

নয়া জামানার সূর্য উঠেছে। জাগো আমার হিন্দুস্থানী ভাই আর বহিন। জেগে উঠে এই নতুন রশ্মি সাগ্রহে পান কর।

গাইতে গাইতে প্রভাতফেরীর দলটা সামনে এসে পড়লো। ছোট ছোট কতগুলি গীতপ্রাণ অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি। চেনবার জো নেই। মিস্টার টেনব্রুক স্তব্ধ হয়ে নিশ্বাস রুখে শুনছিলেন। কতগুলি কচি কিশোর মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বর—তার হর্ষ উল্লাস আক্ষেপের প্রত্যেকটি ধ্বনি তাঁর পরিচিত। টেনব্রুকের চোয়াল দুটো রুদ্ধ উত্তেজনায় নিঃশব্দে কঠিন হয়ে উঠতে থাকে।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন টেনব্রুক। পরিশ্রান্ত গানের সুরটা যেন এপাড়া-ওপাড়া ছুঁয়ে এলোপাথাড়ি দৌড়ে চলে যাচ্ছে। মাঠের কাছাকাছি গিয়ে আর একবার বিজয় প্রসাদের মত উদ্দাম হয়ে উঠলো, তারপরেই আকস্মিক একটা বিরাম। কিছুই শোনা যায় না। অনেকক্ষণ পরে আবার গুমরে উঠলো—একেবারে অন্যদিকে। বোধহয় পশ্চিমের ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে রেললাইন ডিঙিয়ে দর্জিপাড়ার দিকে ছুটে চলেছে। চটুল ঘূর্ণি বাতাসের মত গানটা উড়ে যাচ্ছে।

গল্প আছে আওরঙ্গজেব অক্ষয় বটের শেকড় তুলে ফেলে তাতে গরম সীসা ঢেলে দিয়েছিলেন, যেন ভবিষ্যতে কোনদিন আর চারা গজিয়ে না ওঠে। একেই বোধহয় আমূল চিকিৎসা বলে।

টেনব্রুক বোধহয় গল্পটা জানতেন। বিকালে বিদ্যাপীঠের ছুটির পর ছাত্রেরা কেউ বাড়ি ফিরতে পারেনি। স্বয়ং টেনব্রুক উপস্থিত থেকে ছাত্রদের একটা শোভাযাত্রা রওনা করিয়ে দিলেন। রাত দশটা পর্যন্ত শহরের সর্বত্র একটা শোভাযাত্রা ঘুরবে। ফিরে বিদ্যাপীঠে এসেই শেষ হবে। তারপর খাওয়া-দাওয়া হবে। টেনব্রুক জিলিপি কেনবার জন্য দশটি টাকা দিলেন।

প্রায় একশো ছাত্রের পুরোভাগে অগ্রনায়কের মত একটু এগিয়ে দাঁড়িয়েছিল বলাই। তাকেই শোভাযাত্রা চালিয়ে আর গাইয়ে নিয়ে যাবার ভার দেওয়া হয়েছে। টেনব্রুক সাহেবের নির্দেশ।

বলাইয়ের মাথাটা সামনের দিকে ভাঙা গাছের ডালের মত ঝুঁকেছিল। মাটির দিকে একটা উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি নিয়ে দেখছিল্ বলাই। ওর সমস্ত দুরন্তপনা এক চরম অপমানের আঘাতে যেন অসাড় হয়ে গেছে। আসন্ন মূর্ছার সময় রোগীকে যেন জোর করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

গানটা টেনব্রুকের রচনা। নামতা পড়ার ভঙ্গীতে বলাই সুর করে গানের পদটি গাইলো—'আমি যীশুর ছোট মেষ'।

শোভাযাত্রী ছেলেরা বিষণ্ণ পাখির ঝাঁকের মত কিচিরমিচির করে ধুয়া ধরে গাইলো—'আমি যীশুর ছোট মেষ।'

যেন জিভে কামড় পড়েছে, বলাই হঠাৎ আরও জোরে বিকৃত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—'প্রতিদিন মোর সুখ অশেষ—'

ছেলের দল প্রতিধ্বনি করলো—'প্রতিদিন মোর সুখ অশেষ'।

শোভাযাত্রা রওনা হলো। হিতৈষী অভিভাবকের মত মনের স্নেহ মনেই গোপন রেখে, শাসনের দোর্দণ্ড বিগ্রহের ভঙ্গীতে টেনব্রুক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন, বাংলোয় চলে গেলেন। তিনি জানলেন, রাত্রি দশটা পর্যন্ত এইভাবে সুপথে চলে ছেলেগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়বে—বিপথে যাবার উৎসাহও নিভে যাবে; তাছাড়া দশ টাকার ঘুমপাড়ানী মিষ্টির ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। আর ভাবনা নেই। টেনব্রুক নিশ্চিন্ত হলেন।

সন্ধ্যা হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারখানা টেবিলের ওপর রাখা ছিল। ইন্ডোলজিস্ট টেনব্রুক আজ সেখপুরার প্রত্নরহস্যের বুক চিরে খানাতল্লাসী করবেন। ঐ প্রতিহিংসাপরায়ণ কিংবদন্তীটা ভয়াবহ ব্যাধির মত সারা সেখপুরার নাগরিক বুদ্ধি বিষাক্ত করে তুলেছে। এর পেছনে কোনো সত্যের ভিত্তি আছে কি?

গেজেটিয়ার হাতড়ে হাতড়ে টেনব্রুক এক জায়গায় এসে বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। সত্যিই যে লেখা আছে ছাপার অক্ষরে—ডুমরিচকের ডাকবাংলো থেকে এগার মাইল দূরে যে পিপুল গাছের তলায় স্থানীয় দ্রাঘিমারেখার পরিচয় লেখা আছে, সেখানে একদিন কোম্পানী ফৌজের কামানের বেদী ছিল। স্থানীয় লোকেরা বলে, মিউটিনির সময় ঐখানে সেপাই বন্দীদের প্রাণদণ্ড হয়েছিল।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কোন্ গবেট সার্ভেয়ার এই ষাঁড়-মোরগ গল্পটি সরকারী গ্রন্থের পাতায় ফেঁদে গেছেন; মিস্টার টেনব্রুক মনে মনে সেই মূঢ় পণ্ডিতের বুদ্ধিকে লিঞ্চ করলেন। ধিক্কার দিলেন—এই সব রন্ধ্র দিয়েই একদিন শনি ঢোকে এবং হয়েছেও তাই। জন কোম্পানীর বেনেবুদ্ধি দিয়ে বিংশ শতাব্দীর কলোনি শাসন চলে না। চাই আমূল চিকিৎসা। ইন্ডোলজিস্ট টেনব্রুক তাঁর প্রতিভার ছুরিকে শানিয়ে নিলেন।

নতুন করে প্যারা লিখলেন টেনব্রুক। —'ডুমরিচক ডাকবাংলো থেকে এগার মাইল দূরে, নদীর ধারে, পিপুলগাছের তলায় যেখানে দ্রাঘিমারেখার পরিচয় লেখা হয়েছে, সেখানে (প্রথম পৌরাণিকের যুগে—খৃষ্ট মৃত্যুর পরে পঞ্চম শতকে) ব্রহ্মদত্ত নামে এক ঋষির আশ্রম ছিল...

হঠাৎ একবার কলম থামালেন টেনব্রুক। ভাবতে ভাবতে ভুরু দুটো কোঁচোর মত পাকিয়ে উঠলো। কদর্য একটা কুহক যেন ছোট ছায়ামূর্তি ধরে তাঁর দৃষ্টিপথ জুড়ে নেমে বেড়াচ্ছে। এই মূর্তিটাকে চিনতে পারা যায়—গান্ধী গান্ধী গান্ধী। সবাই তাকে বলে গান্ধী! কে এই গান্ধী? এই অশান্ত অবাধ্য দুষ্টু ফকীর গান্ধী? কী ভেবেছে সে?

দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত করে কলমটা আবার তুলে ধরলেন টেনব্রুক। যেন একটা প্রেরণার আবেশে লিখে ফেললেন—'এক দুর্দান্ত পাপী কিরাতের দৌরাত্ম্যে রাজ্যের সুখ শান্তি নষ্ট হতে বসেছিল। ক্ষত্রিয় রাজা দেবপ্রিয়ের সেবায় ও প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে ঋষি ব্রহ্মদত্ত সেই কিরাতকে অভিশাপ দিয়ে ভস্ম করে ফেলেন।'

টাইপরাইটার মেসিনটাকে সাগ্রহে বুকের কাছে টেনে নিলেন টেনব্রুক। নতুন একটি কাগজের স্লিপের ওপর এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে টাইপ করে সাজালেন। পুরনো প্যারাগ্রাফের ওপর খাপে খাপে মিলিয়ে আঠা দিয়ে সেঁটে দিলেন। চেপে চেপে বসিয়ে দিলেন, চার পাশ থেকে দেখলেন, যেন কোথাও কোনো ফাঁক না থাকে।

এই সামান্য কাজটুকু করতেই হাঁপিয়ে উঠেছিলেন টেনব্রুক। ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। একটা বাচাল ঝর্ণার মুখে যেন পাথর চাপা দিচ্ছেন। আশ্বস্ত হলেন, আর কোন ফাঁক নেই।

বাকী রইল আজকের রাতটা। তখন সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে। এক পেয়ালা কফি খেয়ে পরিশ্রান্ত টেনব্রুক ঘরের ভেতর কিছুক্ষণ পাইচারি করে নিলেন। তারপর ল্যাম্পের ওপর নীল কাচের ঘেরাটোপ টেনে দিয়ে পড়তে বসলেন। সার্থক আনন্দের আরামে সোফার ওপর শরীর এলিয়ে দিলেন।

বাইরের শব্দহীন অন্ধকারটা তখন জমাট বেঁধে গেছে—একটা শোকাচ্ছন্ন রাত্রির হৃদ্‌পিণ্ডের মত। আমবাগানের ভেতর দিয়ে ছাত্রদের শোভাযাত্রা ফিরছে এতক্ষণে। একশত ক্লান্ত ভাঙা-গলায় একটা বিকৃত গানের শব্দ আসছে। ঠিক শব্দ নয়—শব্দের রুষ্ট নিশ্বাস। একটা আহত সর্পযূথ যেন বিষদাঁত নতুন করে ঘষে নেবার জন্য আড়াল দিয়ে সরে পড়ছে।

হঠাৎ শিউরে উঠলো টেনব্রুক। ভারতের আত্মার ছবিটা টেনব্রুকের মনের ভেতর হঠাৎ ঘোলা হয়ে গেল—কাঞ্চনজঙ্ঘার চিরধবল চূড়ার মত নয়, বলাইয়ের মুখটার মত বর্ণচোরা হিংসুক ও ভীরু।

টেনব্রুক খোলা জানালার দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। একটা নিষ্ঠুর নৈরাশ্য চিন্তার শিরায় শিরায় শিউরে উঠতে লাগলো—না, ওরা মানবে না। আবার ওরা আসবে। আজই রাত্রিশেষে—একটা প্রেতের দল, বায়ুভূত নিরালম্ব ছোট ছোট মসীমূর্তি—শয়তানী আনন্দে অপমৃত্যুর কোরাস গাইতে গাইতে আবার আসবে—দল বেঁধে—কাতারে কাতারে।

রাজগীরের ধূপদানের বুকটা তখন প্রবলভাবে পুড়ে চলেছে। কুণ্ডলী কুণ্ডলী ধোঁয়া জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে বাইরে উড়ে যাচ্ছে। টেনব্রুকের মাথার ভেতর একটা বোবা বিভীষিকা ছটফট করে। অসহ উদ্বেগে টেনব্রুক টেবিলের ওপর ঘণ্টি ঠুকতে লাগলেন। বেয়ারাটা তন্দ্রা ছেড়ে ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এসে ডাকলো—হুজুর।

টেনব্রুকের সারা মুখে একটা রক্তাক্ত জ্বালার দীপ্তি। মাত্রা ছাড়িয়ে অস্বাভাবিক রকম স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—জলদি দৌড়ে যাও, ডি-এস-পি সাহেবকে সেলাম দাও। সুবেদার মেজরকে বোলাও। জলদি কর। আজ রাত্রে ইস্টার্ন রাইফেলস্‌ ঘুমোতে পারবে না। শহরটাকে কর্ডন দিয়ে রাখ। সমস্ত রাত পাহারা দিতে হবে। শিকারীর মত তাড়া করে আজ ওদের ধরে ফেলতে হবে। চরম শিক্ষা শিখিয়ে দিতে হবে আজ।

ডেমোক্রেসীর এই সঙ্কটের শেষ ঘটনা হলো সম্রাট বনাম বলাইয়ের মোকদ্দমা। তার বিবরণ জানবার উপায় নেই। কে ঢুকবে আদালত এলাকায়। যে-ভয়ানক লাঠি আর লালপাগড়ীর আস্ফালন। বন্দীবাহী মোটর লরিটা থেকে নামবার সময় দূর থেকে বলাইকে চকিতে একটুখানি দেখতে পাওয়া যায়—মাথায় ব্যাণ্ডেজ, কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া। ডি-এস-পি জানকীপ্রসাদের মূর্তিটাই সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে—আদালতের উঁচু বারান্দার ওপর টান হয়ে দাঁড়িয়ে বেল্টের ওপর হাত বোলান, কপালের ওপর মোটা শিরাগুলি অশান্ত গর্বে দপদপ করে ফুলে ওঠে, আর ফটকের বাইরে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গর্জন করে ওঠেন—ডিসপার্স!

তারপরেই ফটকের পুলিশ পিকেটের দিকে তাকিয়ে থাবা তুলে অর্ডার হাঁকেন—চার্জ!

পারমিতা

পারমিতা জানে, আর ভাবনা করবার কোন মানে হয় না।

আজ না হয় কাল, না হয় তো আর একটি বা দু'টি মাসের মধ্যে এই বাড়ির আসল মানুষটি পারমিতাকে নাম ধরে সেই সুরে ডাক দিয়ে ফেলবে, যে সুরে ডাক দিলে আর কোন সন্দেহ থাকে না যে, কেন ও কিসের জন্য ডাকবার দরকার হয়েছে।

এই বাড়ি হলো সেই মনোময় মজুমদারের বাড়ি, অবাঙালীর দেশে বিপুল ও বিরাট ব্যবসায়ের কৃতিত্বে যিনি বিখ্যাত হয়েছেন। যে বাঙালী গোয়ালিয়র বেড়াতে গিয়েছেন, তিনি দেখেছেন এবং দেখে খুশি হয়েছেন যে, গোয়ালিয়র স্টেশন থেকে সিটি লস্করে যাবার পথে যতগুলি সুন্দর বাড়ি দেখা যায়, তার মধ্যে এই বাড়িটিই সবচেয়ে বেশি সুন্দর, যার ফটকের গায়ে কুচকুচে কালো কষ্টি পাথরের ফলকের উপর সোনালী অক্ষরে লেখা আছে, মজুমদার হাউস।

মজুমদার? মজুমদার তো মারাঠী নামেরও পদবী হতে পারে। না, তা নয়, একটু খোঁজ নিয়েই তিনি জানতে পেরেছেন, এই বাড়ি হলো বাঙালী মনোময় মজুমদারের বাড়ি। ভদ্রলোকের বয়সও বেশি নয়, চল্লিশ পার হয়ে বড় জোর বেয়াল্লিশ কিংবা তেতাল্লিশ হয়েছে। ভদ্রলোক খুব শিক্ষিত। পাঁচ বছর গ্লাসগোতে ছিলেন, নানারকম কলকারখানার কাজ শিখে এসেছেন। তা ছাড়া, ঝাঁসিতে পৈতৃক ভূসম্পত্তি যেটা ছিল, তার আয়ও মানুষকে চিরকাল বড়লোক করে রাখবার মত আয়। যাই হোক, পিতার মৃত্যুর পর মনোময় মজুমদার সেই পৈতৃক ভূসম্পত্তির উপর আর কোন মোহ রাখেননি। সব বেচে দিয়ে যে পুঁজি হলো তাই দিয়ে একটা হোসিয়ারি, একটা সুগার মিল আর একটা ঢালাই কারখানা গড়ে তুললেন।

মজুমদার হাউসের লনের উপর দশ বছর বয়সের যে ফুটফুটে মেয়েটিকে সকাল-বিকেল ছুটোছুটি করতে দেখা যায়, সেটি মনোময় মজুমদারেরই মেয়ে। এই মেয়ে ছাড়া এবাড়িতে আপনজন বলতে মনোময়ের আর কেউ নেই। একজন যিনি ছিলেন, তিনি পাঁচ বছর আগে মারা গিয়েছেন। এই মণ্টু, আজ যার বয়স দশ বছর, সে সেদিন পাঁচ বছর বয়সের বুদ্ধিতে মরা মাকে ঘুমন্ত মা মনে করে যখন বার বার ডেকে ডেকে মায়ের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করেছিল, ঠিক সেই সময়ে সেদিন সাত দিনের শিকারসফর শেষ করে, গাড়ির কেরিয়ারে দশটা ময়ূর আর একটা সম্বর বোঝাই করে বাড়ি ফিরেছিল মনোময়।

খুবই আশ্চর্য হয়েছিল, আর দুঃখিত হয়েছিল মনোময়। মনেও পড়েছিল মনোময়ের, মনোময়কে শিকারীর সাজ পরতে দেখে কি যেন বলবার জন্য কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল মণ্টুর মা। কিন্তু কিছুই বলেনি। কি অদ্ভুত কাণ্ড, সাতদিন আগে যে-মানুষটার সামান্য একটু জ্বর হয়েছিল বলে শুনতে পেয়েছিল মনোময়, সেই মানুষটা আজ একেবারে চুপ!

কিন্তু অনেকেই শুনে আশ্চর্য হয়েছিল, সেদিন এমন একটা আঘাতের দিনেও কারবারের কর্তব্য ভুলে যায়নি মনোময়। সেদিনও ঠিক সন্ধ্যা হতেই টেলিফোনে তিন কারখানার তিন ম্যানেজারকে ডেকে পাঠিয়েছিল, নতুন অর্ডারের ফাইলগুলিও দেখেছিল, আর, আরও যা বলবার ছিল সবই বলেছিল।

বিপত্নীক মনোময় আর বিয়ে করেনি। বিপত্নীক হবার পর এই পাঁচটা বছরের মধ্যে জীবনে কোন শূন্যতা বোধ করেছে কি না মনোময়, তাও বোঝা যায় না। মাঝে ঢোলপুর থেকে ব্যানার্জিবাবু একদিন এসে বলেছিলেন—এরকম একলাটি হয়ে তোমার পড়ে থাকা আর ভাল দেখায় না মনোময়।

—আমি তো খুব ভাল দেখছি।

—তার মানে?

—আমি নিজেকে একটুও একলাটি বোধ করি না।

—তার মানে বুঝলাম না।

—তার মানে হলো, আবার একা বিয়ে করবার কথা ভাববারই সময় নেই, দরকারও নেই।

মজুমদার হাউসের ড্রইংরুমে বসে মনোময়ের এই কথার উত্তর দিতে গিয়েই যাকে দেখে চমকে উঠেছিলেন ব্যানার্জিবাবু, সে হলো এই পারমিতা। মণ্টুর হাত ধরে লনের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে এক তরুণী, দেখে বিধবা বলেই মনে হয়। সাদা ধবধবে থানের সাজ, সিঁথিটা শূন্য, হাতে ও গলায় সোনাদানার কোনো চিহ্নও নেই। পায়ে একজোড়া চটি, তাও সাদা।

মনোময় কিছু না বললেও, বোধহয় কল্পনায় বুঝে নিয়েছিলেন ব্যানার্জিবাবু, না, সত্যিই মনোময়ের বিয়ে করবার দরকার নেই।

কী চমৎকার দেখতে এই মহিলা? ও চেহারাতে রঙীন শাড়ির সাজ আর সোনার গয়নার কোন দরকারই হয় না। ফোটা টগরের সাদার মধ্যে একটা রঙীন প্রজাপতির শরীর পড়ে থাকলে সে প্রজাপতিকে যেমন দেখায়, মহিলাকে প্রায় সেইরকমই দেখাচ্ছে। মণ্টুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হেসে উঠেছে মহিলা, হেসে ফেলতে গিয়েই দুলে উঠেছে মাথাটা; সঙ্গে সঙ্গে মস্ত বড় একটা ফাঁপানো খোঁপার ভার ভেঙে গিয়ে চিকন কালো চুলের গোছা খুলে যাচ্ছে। দু'হাত দিয়ে চুলের গোছা তুলে আবার খোঁপা বাঁধছে মহিলা। হাত দুটিও একেবারে নিটোল, আর খোঁপা চেপে ধরবার ভঙ্গিটিও ঠিক খাজুরাহোর মন্দিরের সেই পাথুরে অপ্সরাটির মত।

—উনি কে? একটু কুণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করেছিলেন ব্যানার্জিবাবু।

—কে? কার কথা বলছেন?

—ঐ যে আপনার মেয়েটির হাত ধরে ওখানে...।

—ওঃ, পারমিতার কথা বলছেন? পারমিতা হলো মণ্টুর নাচের টিচার।

—কিসের টিচার? একটু আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন ব্যানার্জিবাবু।

—নাচের, নাচের।

—আচ্ছা, আমি এখন উঠি। বলতে বলতে চেয়ার থেকে উঠে তখনই চলে গেলেন ব্যানার্জিবাবু।

দু'বছর আগে এই বাড়িতে এসে ব্যানার্জিবাবু কল্পনাতে যে বিস্ময় স্বীকার করে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, তার কোন সংবাদ রাখে না পারমিতা। জানেও না পারমিতা, কি ধারণা নিয়ে চলে গিয়েছিলেন ব্যানার্জিবাবু। জানলে অবশ্য পারমিতা মনে মনে ব্যানার্জিবাবুর ধারণাকে আজ ধন্যবাদ না দিয়ে পারতো না। ঠিকই তো, আমি থাকতে মনোময় মজুমদারের জীবন একলাটি হয়ে যাবে কেন।

কিন্তু ব্যানার্জিবাবুর ধারণার মধ্যে একটা ভুলও আছে। তিনি যতটা হয়ে গিয়েছে বলে মনে করেছেন, ঠিক ততটা আজও সত্য হয়ে ওঠেনি। আজও ডাক আসেনি। মনোময় আজও তার কারখানার কাজ আর শিকারের সাধ নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু সে ডাক আসতে আর কতই বা দেরি হতে পারে?

মনোময়ের এই বাড়ির সব শূন্যতাকে ভালবাসায় ভরে দিয়েছে যে পারমিতা, তার আশার হিসাবেও বা ভুল হবে কেন? ঠিক কথা, মণ্টু তার মা হারাবার দুঃখ এই দু'বছরের মধ্যেই ভুলে গিয়েছে। বাড়ির চাকর মালী বেয়ারা আর খানসামাও এখন সাবধান হয়ে গিয়েছে। যে পারমিতা দেবীকে একদিন তারা নেহাতই নাচের মাস্টারণী বলে মনে করেছিল, আজ তারা তাকেই বেশ একটু ভীতভাবে দেবীজী বলে ডাকে। মণ্টু ডাকে—পারু মাসী। আজ আর খানসামার কোন

সাধ্যি নেই যে, বাজার সরকার গণেশবাবুর কাছ থেকে এক সের ঘি-এর দাম নিয়ে গিয়ে আধ সের ঘি নিয়ে আসে। গণেশবাবুর কাছেও মাঝে মাঝে কৈফিয়ত চায় পারমিতা—কুকুরের জন্যে ও মাসে যদি আশি টাকার মাংসের বিল হয়ে থাকে, তবে এ মাসে একশো কুড়ি টাকার বিল হয় কেন? বাগানের মালী সারাটা বিকেল ঘুমিয়ে পড়ে থাকবার আর সুযোগ পায় না। যে চাকরটা এত বড় বারান্দার উপর শুধু একটু ঝাড়ু বুলিয়ে কাজ সেরে দিত, তাকে আজ দু'বেলা বারান্দা মুছতে হয়, যতক্ষম না বারান্দার মোজেয়িক আয়নার মত চকচকে হয়ে হেসে ওঠে।

এর মধ্যে শুধু একটা কঠোর নামের ডাক, যে নাম পারমিতার জীবনে আজ নিতান্ত অবান্তর হয়ে গিয়েছে, সেই নাম ধরে ডাক দিয়ে মাঝে মাঝে কথা বলে যান এমন এক ভদ্রলোক, যাকে ভদ্রলোক বলে মনে করাই ভুল। লোকটার নাম হর্ষনাথ; সাজ পোশাক দেখলে মারাঠী বলেই মনে হবে, কিন্তু ভাষা শুনলে ধরা পড়ে যায় যে, লোকটা নিতান্ত বাঙালী। পারমিতাও জানে, লোকটা সিটির জয়াজী চকের কাছাকাছি কোন্ এক মহল্লার একটা গলিতে থাকে। দারোয়ান বলে, লোকটা নাকি কোন্ একটা অনাথ স্কুলে মাস্টারী করে।

কে জানে কেমন মাস্টারী করে লোকটা? কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, সে মাস্টারীতে লোকটার পক্ষে মানুষ হয়ে থাকবার মত ভাত-কাপড় হয় না। আগে তো প্রায় রোজই দুপুরে এই মজুমদার হাউসের কিচেনের কাছে এসে খানসামাকে ডাক দিত হর্ষনাথ—ভুলে যেও না খানসামা, আজ দুপুরে আমি এখানেই আছি। দেখতেও পেত পারমিতা, লোকটা কিচেনের বারান্দার উপর দিব্যি জুত করে বসে রুটি মাংস খেয়ে চলে গেল। এমন কি মাঝে মাঝে পেটুকে লোভে বেহায়া হয়ে প্রশ্নও করতো—আজ ক্যা রায়তা বনায়া নেহি খানসামা?

—হ্যাঁ, বনায়া।

—তবে দিচ্ছ না কেন?

বড় একটা পাথরের বাটি ভরে রায়তা নিয়ে হর্ষনাথের পাতের কাছে এগিয়ে দিত খানসামা; আর হর্ষনাথও খুশিতে ধন্য হয়ে সবটা রায়তা চেটেপুটে খেয়ে ফেলতো।

কিন্তু সেদিন আর নেই। আর রোজ দুপুরে মজুমদার হাউসের অতিথি হতে পারে না, রোজ আসেও না হর্ষনাথ। পারমিতাই নিয়ম করে দিয়েছে। রোজ নয়, সপ্তাহে বড় জোর একদিন, শুধু রবিবারে যদি দুপুরের খাওয়া খেতে হর্ষনাথ এখানে আসে, তবে খাবে। খানসামাকে শাসিয়ে দিতেও ভুলে যায়নি পারমিতা—এই বাড়ি দানছত্র নেহি হ্যায় খানসামা, সাবধান।

এই হর্ষনাথই মাঝে মাঝে, এবং কথা বলবার দরকার না থাকলেও পারমিতার কাছে এসে কথা বলে—একবার সময় করে নিয়ে মোতিমহল প্যালেসটা দেখে এলে পারেন মিসেস রায়।

মিসেস রায়! নামটা যেন পারমিতার জীবনের স্মৃতিটাকে একটা খোঁচা দিয়ে বিরক্ত করে তোলে। পারমিতার যে পরিচয় এই দু'বছরে প্রায় নীরব হয়ে গিয়েছে এবং আর কয়েকদিন পরে একেবারে নীরব হয়ে যাবে, সেই পরিচয় শুধু এই হর্ষনাথ নামে লোকটার সম্ভাষণে মুখরিত হয়ে ওঠে। মুখে কিছু না বললেও, পারমিতার মন ক্ষুব্ধ হয়ে হর্ষনাথের মূর্খতাকে নীরবে ধিক্কার দেয়। কি আশ্চর্য, মূর্খতাও এত অন্ধ হতে পারে? লোকটা কি দেখতে পায় না যে, পারমিতা আজ এই বাড়ির জীবনের কর্ত্রী? মনোময় মজুমদারও যে এই বাড়িতে পারমিতার সর্বময় প্রতিষ্ঠা স্বীকার করে নিয়েছে। এখনও বুঝতে ভুল করে কেন হর্ষনাথ, পারমিতার এই যে সাদা সাজ, সে সাজ শুধু মনোময়ের কাছ থেকে একটি শুভ আহ্বানের অপেক্ষায় আছে। সে আহ্বান আসতে আর দেরিও নেই; তারপর এই সাদা এখানেই একটি উৎসবের আশীর্বাদে রঙীন হয়ে যাবে।

মিসেস রায় বলে ডাকলে সে অতীতের ছবি মনে পড়ে যায়, যে অতীতের জন্য আর দুঃখ করে লাভ নেই। সে অতীতের কথা ভেবে আর লজ্জা করবারও কোন মানে হয় না। মনটা যখন

নতুন করে একজনের কাছে চলেই গিয়েছে, তখন আর মনের সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ কি? পারমিতাও কি ছাই ভাবতে পেরেছিল যে, এক ভদ্রলোকের মেয়েকে নাচ শেখাতে এসে তিরিশ বছর বয়সের একটা শক্ত সাবধানী বিধবা মনও এমন কাণ্ড করে বসবে?

সে অতীতের ছবিটা মনে পড়ে গেলে বুকের ভিতরে আজও একটা ছায়াময় ভাব যেন ছমছম করে। কী ভয়ানক সেদিনের সেই শূন্যতা, কী করুণ সেদিনের পারমিতার সেই কান্না, আর কী দুঃসহ সেই অসহায়তা!

চাঁদিবাজারের ভিতরে একটা সরু রাস্তার ধারে বাঙালী ফোটোওয়ালা রায়বাবুর যে ছোট একটি স্টুডিও ছিল, সে কথা চাঁদিবাজারের লোক এতদিনে হয়তো ভুলেই গিয়েছে। ফোটোওয়ালা রায়বাবু যেদিন হঠাৎ দু'বার রক্তবমি করে মরে গেলেন, সেদিনের স্মৃতিও বোধহয় আজ চাঁদিবাজারের মানুষের মন থেকে মুছে গিয়েছে। কি উপায় হবে রায়বাবুর বউটার? উদ্বিগ্ন হয়ে সেদিন এই কথাই ভেবেছিলেন প্রফেসর ক্ষিতীশ দত্তের মা আর সার্জন পি ভটচাযের স্ত্রী।

পারমিতার তিন কুলের এমন কেউ নেই যাকে আপনজন বলে মনে করে তার কাছে চলে যাওয়া যায়। —একেবারে অনাথ, কী কপাল করেছিল গো মেয়ে। আক্ষেপ করেছিলেন ক্ষিতীশ দত্তের মা। কিন্তু আশ্বাস দিয়েছিলেন পি ভটচাযের স্ত্রী—দেখি, ওরা থাকতে, এতগুলি বাঙালী থাকতেও এই বিভূঁয়ে একটা বাঙালী মেয়ের কোন গতি করা যাবে না?

কি গতি হবে? কেমন করেই বা হবে? এই মেয়ের নামটাই শুধু গালভরা একটা নাম, কোন গুণের বালাই নেই। লেখাপড়া জানে না বললেই চলে। না জানে সেলাই, না জানে গান। রাঁধুনি খাটবার মত গতরও করেনি; ওরকম বুলবুলের মত নরম ছাঁদের একটা শরীর নিয়ে রাঁধুনি খাটা চলে না। তা ছাড়া, পি ভটচাযের স্ত্রীর অভিমতও এই যে, বেচারাকে যদি রাঁধুনি খেটে পেটের ভাত যোগাড় করতে হয়, তবে গতি আর কি হলো? ওটা তো অগতি, শাস্তি।

হ্যাঁ, জেনে খুশি হলেন পি ভটচাযের স্ত্রী, যেদিন পারমিতা নিজেই ভয়ে ভয়ে, কুণ্ঠিত হয়ে, লজ্জায় মুখ লাল করে বলে ফেললো—আমি নাচ জানি!

—নাচ? বেশ তো! একটি ছোট মেয়েকে নাচ শেখাতে পারবে?

—পারবো।

সেদিনই সার্জন পি ভটচায মজুমদার হাউসে এসেছিলেন, আর মনোময়ও প্রস্তাব শুনে এককথায় রাজি হয়ে বলেছিলেন—বেশ তো, মণ্টুর একজন নাচের টিচার থাকবে, ভালই হবে।

পারমিতার জীবনে দু'বছর আগের পাওয়া সেই নাচের চাকরি আজ আর চাকরি নয়। ঠিকই, প্রথম এসে রোজই দু'বেলা মণ্টুকে নিয়ে হলঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াতে হতো, দরজার পর্দাগুলো ভাল করে টেনে দিতে হতো, আর গ্রামোফোনে পর-পর বাজনার রেকর্ড বাজাতে হতো। সেই বাজনার তালের সঙ্গে হিন্দোলিত হয়ে পারমিতার সুঠাম শরীরের ছাঁদগুলিও বিভোর হয়ে নাচতো। মুগ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠতো মণ্টু—

তুমি কী সুন্দর নাচতে পার পারুমাসী।

—তোমাকেও এ-রকম সুন্দর নাচতে হবে। হেসে হেসে জবাব দিত পারমিতা।

কিন্তু আজ আর মণ্টুকে দেখে নাচ শেখাবার দায় পারমিতার মনেও পড়ে কি না সন্দেহ। মণ্টুকে দেখলে বরং সন্দেহ করে পারমিতা, আজও বোধহয় দুধ খেতে ভুলে গিয়ে শুধু খেলা নিয়ে ব্যস্ত আছে মেয়েটা, তা না হলে মুখটা এরকম শুকনো দেখাবে কেন?

ধমক খায় মণ্টু—খেলা করতে তো কোনদিন ভুল হয় না, তবে দুধ খেতে ভুল হয় কেন?

মণ্টুকে পড়াবার জন্য যে মাস্টার রাখা হয়েছে, সে মাস্টারকে ছাড়িয়ে দিতে হবে বলে ঠিক করে ফেলেছে পারমিতা। মাস্টার ভদ্রলোক যদি সাতদিনের মধ্যে তিনদিন কামাই করে, আর

সেই তিনদিনও যদি মণ্টুর কাছে শুধু ভূতের গল্প বলে, তবে মেয়েটা যে নিরেট একটা মুখ্‌খু হয়ে যাবে। মাস্টারকেও একদিন স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছে পারমিতা—পড়াবার নাম করে এরকম ফাঁকি আর চলবে না।

একদিন মাথার ব্যথার জন্য সারারাত ঘুম হয়নি মণ্টুর; তাই পারমিতারও সারারাত ঘুম হয়নি। সকাল হতেই বেয়ারাকে দু'বার সিটিতে পাঠিয়ে ডাক্তার ডেকেছে পারমিতা। ওষুধ খেয়ে আর একটা লম্বা ঘুম দিয়ে দুপুরবেলা মণ্টুর মাথাব্যথা যখন সেরে গেল, তখন স্নান করতে আর ভাত মুখে দিতে পেরেছিল পারমিতা!

মাঝেমধ্যে এই মণ্টুই অদ্ভুত একটা কথা বলে পারমিতাকে ভাবিয়ে তোলে, কিন্তু পরমুহূর্তে ভাবনা ভুলে গিয়ে হেসে ফেলে পারমিতা।

—তোমার স্বামী কোথায় পারুমাসী?

—হারিয়ে গেছে।

—আবার পাবে তো?

অ্যাঁ?—চমকে ওঠে পারমিতা। চোখের চাহনি গম্ভীর হয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই হেসে ফেলে পারমিতা—কপালে থাকলে পাব।

মণ্টুও যেন ধৈর্য হারিয়ে আর গাল ফুলিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। —না, আর দেরি হলে চলবে না পারুমাসী। শীগগির পাওয়া চাই।

পারমিতার বুকের ভিতরে গোপন করা একটা মায়াময় সান্ত্বনাও হেসে ওঠে—শিগগিরই পাবে, মনোময় মজুমদার অন্ধ নয়।

সবই যে জানে মনোময়। এই বাড়ির সব বাজে খরচ শক্ত হাতে দমিয়ে দিয়েছে পারমিতা, এ খবর মনোময়ের অজানা নয়। মণ্টুর পুরনো মাস্টারকে ছাড়িয়ে দিয়ে নতুন মাস্টার রাখা হয়েছে। এত বড় বাড়ির কোন বারান্দার কোণে এক কণা ধুলোও আজ জমে থাকতে পারে না। পারমিতার শাসনে সব ঝকঝক তকতক করছে। নিশ্চয় শুনে খুশি হয়েছে, দেখেও খুশি হয়েছে মনোময়। তাই যদি না হতো, তবে কি এতদিনের মধ্যে একটি দিনও পারমিতার কাছে এসে আপত্তি জানিয়ে যেত না মনোময়—এই বাড়ির ভাল করবার জন্য তোমাকে এত ব্যস্ত হতে কে বলেছে?

না, কোনদিন ভুলেও এরকম কথা বলেনি মনোময়। পারমিতার ইচ্ছার কাছে এই বাড়ির সব যত্নের দায় ছেড়ে দিয়েছে মনোময়। আর, নিশ্চয় সেই জন্যেই এত নিশ্চিন্ত হয়ে সপ্তাহে তিনদিন শিকারের আমোদ নিয়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে ভদ্রলোক।

কারবার আর শিকার; শিকার আর কারবার। দেখে মনে হয়, এই দুটি ছাড়া ভদ্রলোকের জীবনে আর কোন সাধ নেই। এমনই ব্যস্ততা যে, মণ্টুর মা পাঁচটা বছর এ বাড়িতে বেঁচে ছিল কি করে?

সন্দেহ হয়, মণ্টুর মা বোধহয় ভুল করে মনোময়ের জীবনটাকে এরকম একটা ঘরছাড়া ব্যস্ততার জীবন করে তুলেছিল; নিশ্চয় চাকর খানসামার হাতে মনোময়ের সব যত্নের দায় ছেড়ে দিয়েছিল সেই মহিলা। নইলে শিকার থেকে ফিরে এসে ক্লান্ত হয়ে পাখার নিচে কোচের উপর বসে, চা-এর জন্যে আজও খানসামাকে কেন ডাক দেয় ভদ্রলোক? ভদ্রলোকের কি মনেও হয় না যে এমন সময় খানসামার হাতের চা কারও তৃষ্ণার শান্তি হতে পারে না।

চা-এর জন্য পারমিতাকে কাছে ডাকে না মনোময়, হয়তো এটা মনোময়ের পুরনো অভ্যাসের ভুল। কিন্তু পারমিতা ভুল করে না। নিজেই কিচেনে গিয়ে নিজের হাতে চা তৈরি করে; খানসামা শুধু সেই চা তুলে নিয়ে গিয়ে মনোময়ের কাছে রেখে দেয়। কতবার দেখতেও পেয়েছে পারমিতা, তার এই ব্যস্ততার ছবিটাও মনোময়ের চোখে ধরা পড়ে গিয়েছে। কোচের উপর বসে সোজা কিচেনের দিকে তাকিয়ে পারমিতার গৃহিনীপনার মূর্তিটাকে দেখেছে মনোময়।

তবে আর দেরি কেন? পারমিতাকে নিজের থেকে ডাক দিয়ে কাছে আসতে বলতে আজ তো কোন কুণ্ঠা থাকবার কথা নয়।

ভুলতে পারে না পারমিতা, শিকার থেকে ফিরে আসা মনোময়ের ক্লান্ত চেহারাটাও কেমন ঝলমল করে, মুখের উপর একটা লালচে আভা টলমল করে. এমন রূপবান পুরুষ লাখে একজন মেলে কি না সন্দেহ। চোখ দুটোও সুন্দর—সত্যিই ভ্রমরকালো চোখ।

অনুভব করতে পারে পারমিতা, তার বুকের ভিতরেও যেন একটা গর্বের বাতাস থমথম করছে। এ হেন মানুষের একটা সুন্দর জীবন পারমিতার বুকের কাছে প্রায় ধরা দিয়ে ফেলেছে।

তাই মাঝে মাঝে মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে, আর দেরি কেন? কবে আসবে ডাক? একটা মিথ্যা আড়াল আজও দুজনের মাঝে সত্য হয়ে থাকে কেন?

মণ্টু মাঝেমধ্যে বাইরে বেড়াতে যাবার বায়না ধরে। মণ্টুর এই বায়নার কথা শুনলেই পারমিতার মন একটু বিরক্ত হয়ে ওঠে। বেড়াতে যেতে যে পারমিতার খুব অনিচ্ছা, তা নয়। কিন্তু বেড়াতে যাবার ব্যবস্থা করবার জন্য যে লোকটাকে খবর দিতে হবে, সেই লোকটা হল সেই বেহায়াটা হর্ষনাথ, সেই একগুঁয়ে মূর্খটা, যে আজও পারমিতাকে মিসেস রায় বলে ডাকে।

হর্ষনাথকে এই বাড়ির ফটকে দেখতে পাওয়া মাত্র দারোয়ানও বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে—ব্যস্, পঁহুছ গিয়া খুসামোদকা টাট্টু।

মিথ্যে বলেনি দারোয়ান; মনোময় মজুমদারকে সর্বক্ষণ চাটু কথায় তুষ্ট করাই হর্ষনাথের একমাত্র কাজ। হর্ষনাথ অবশ্য লোকের কাছে বলে—আমি হলাম মিস্টার মজুমদারের শিকারের ম্যানেজার।

হর্ষনাথের এই কথাটা অবশ্য খুব মিথ্যে কথা নয়। মনোময়ের শিকারের জন্য দরকারের সব সাজসরঞ্জাম যোগাড় করে রাখা, তাঁবু সেলাই-এর তদারক করা থেকে শুরু করে টোটা কিনে নিয়ে আসা, জঙ্গলে গিয়ে মাচান বেঁধে দিয়ে আসা, হাঁকোয়া কুলি যোগাড় করা, সবই হর্ষনাথের কাজ। এর জন্য খুশি হয়ে পকেট থেকে যা বের করে হর্ষনাথের হাতে ধরিয়ে দেয় মনোময়, তাতেই খুশি হর্ষনাথ। খানসামা বলে—তাতেই ওর পেট চলে যায়, মাস্টারীতে কিছুই হয় না।

মনোময়ের সামনে দাঁড়িয়ে অবিরাম স্যার-স্যার ধ্বনি, খোসামোদের আবেগে সব সময় একটু কুঁজো হয়ে থাকা আর হাত কচলানো, দুর্বল লোভের প্রাণীর মত যার চরিত্র, সেই হর্ষনাথ পারমিতার সঙ্গেও কথা বলতে গিয়ে যেন মহাসম্ভ্রমে কুঁজো হয়ে যায়। —আপনি আজ্ঞে, যখনই আমাকে ডাকবেন আজ্ঞে, তখনই আমি হাজির হব।

বেড়াতে যাবার দরকার ছাড়া আর কোন দরকারে সেই লোকটাকে ডাকবার দরকার হয় না। একবার নয়, অনেকবার বেড়াতে যেতে হয়েছে। কখনও সুহানিয়া মন্দির, কখনও ফোর্ট, কখনও বা জয়বিলাস প্যালেসের বাগান। গাড়ির পিছনের সীটে বসে পারমিতা আর মণ্টু, সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে হর্ষনাথ। কিন্তু লোকটা সারাটা পথ মুখ ফিরিয়ে প্রায় হাঁ করে পিছনের সীটের পারমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আর কথা বলে। বিশ্রী একটা অস্বস্তি বোধ করে পারমিতা, আর সেই অস্বস্তি সহ্য করতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু সেই বিরক্তি মন থেকে মুছে ফেলতে দেরী হয় না। হর্ষনাথের এই চাহনি নিতান্ত এক হতভম্ব দীনতার চাহনি। পারমিতার মুখটাকে চোখ ভরে দেখবার জন্যে ইচ্ছে করে এরকম বেহায়াপনা বোধহয় করে বেচারা। এত বড় মতলব মনের ভিতর পুষে রাখবার সাহসই ওর থাকতে পারে না। তাই, আর রাগ না করে মুখ ফিরিয়ে মাঝে মাঝে হাসি লুকোবার চেষ্টা করে পারমিতা।

সেদিনটা আষাঢ় মাসের একটা দিন, শিকারের সফর শেষ করে বাড়ি ফিরেছে মনোময়। পারমিতাও একটা স্বস্তির হাঁপ ছেড়েছে। বর্ষা নামতে আর দেরি নেই; মনোময়ের শিকার সফর

এইবার স্থগিত থাকবে, অন্তত তিনটে মাস। সময় পাবে মনোময়, পারমিতার দিকে অপলক চোখ নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার সুযোগ পাবে। তারপর?

ভাবতে গিয়ে আয়নার কাছ থেকে সরে যায় পারমিতা, নিজের মুখের অদ্ভুত ছবিটা দেখে আর লজ্জা পেতে চায় না। যেন একটা রক্তাভ আশার ঝড় কোথা থেকে ছুটে এসে পারমিতার মুখটাকে রাঙিয়ে নিয়েছে বুকের ভিতরে একটা গুঞ্জরন, আর দেরি নয়, বোধহয় আজই, এখনই, ঐ ড্রইংরুমের নিভৃত হতে একটি ব্যাকুল সমাদরের ডাক ছুটে আসবে--একবার এখানে এসে একটা কথা শুনে যাও পারমিতা।

না,কোন আপত্তি করবে না পারমিতা। বরং মাথা হেঁট করে, চোখের চাহনির অভিমান লুকিয়ে রেখে বলে দিতে পারবে পারমিতা—সব বুঝেও মিছে এত দেরি করলে কেন?

দেখতে পায় পারমিতা, শিকার থেকে ফিরে আসা যত আয়োজনের সামগ্রী বারান্দার কাছে স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। তাঁবু, দড়ি, কুড়ুল, ক্যামেরা, বাইনাকুলার, বন্দুক, রাইফেল, বুলেটের মালা আর খাটিয়া। ফিকা সবুজ বুশ জ্যাকেট গায়ে মনোময় পা ছড়িয়ে একটা চেয়ারের উপর বসে আছে। কাছেই আর একটা স্তূপ, বড় বড় বাঁকানো শিং-এর পালকের আর রোঁয়ার ছোট একটা পাহাড়। একটা চৌশিঙ্গা, এক গাদা হাঁস, এক জোড়া কৃষ্ণসার আর চারটে কাকর হরিণের নিষ্প্রাণ চেহারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। সেই দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে মনোময়। দু'পায়ের ভারী ভারী হব-নেল বুট যেন একটা প্রাণহরণ জয়ের উল্লাসে দুলছে।

এ সময়ে বাইরে বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে না, এখন যে মনোময়ের জন্য নিজের হাতে চা তৈরি করবার সময়; কিন্তু বায়না ধরেছে মণ্টু আর বেড়াতে যাবার সময় যে লোকটা সঙ্গে যায় সেই হর্ষনাথও আছে; ঐ যে গদ্‌গদভাবে কুঁজোটি হয়ে মনোময়ের চোখের সামনে ঘুরঘুর করছে হর্ষনাথ।

মণ্টুর ব্যস্ততার হাঁকডাক শুনে ড্রাইভারও গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে তৈরি হয়। হর্ষনাথও গাড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে তেমনি এক জোড়া বেহায়া চোখের চাহনি নিয়ে বারান্দার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর রওনা হয়ে যেতে আর দেরি হয় না। দেরি করতে চায় না পারমিতা, বরং একটু তাড়াতাড়ি করতে চায়; যেন আজকের আষাঢ়ে সন্ধ্যার কোন মেঘ আকাশের তারা ঢেকে ফেলবার আগেই ফিরে আসতে পারে পারমিতা।

ফোর্ট পর্যন্ত এসেও মণ্টুর বেড়াবার সাধ মেটে না। ফোর্টের ভিতরে ঢুকে বাদলমহল দেখতে চায় মণ্টু। তা ছাড়া একটা মন্দির আছে, যার নামে মজার গল্প শুনেছে মণ্টু, সাস-বহু অর্থাৎ শাশুড়ি-বউ মন্দির, সে মন্দির চোখে না দেখে মণ্টুর সাধ আর শান্ত হবে না।

হর্ষনাথ বলে—সব দেখাবো, সব দেখাবো। আপনিও দেখুন মিসেস রায়।

কি ছাই দেখবে পারমিতা? ফোর্টে ভিতরে ঢুকেও আনমনার মত হাঁটতে থাকে পারমিতা, মাঝে মাঝে চমকে উঠতেও হয়, কারণ হর্ষনাথের তোষামুদের গলার স্বর যেন বর্বর আনন্দে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে। --এই তো বাদলমহল, কী প্রকাণ্ড, কী আশ্চর্য; কী অদ্ভুত একটা...।

মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকায় পারমিতা। আনমনার মত পথ চলতে থাকে।

—ঐ যে চলুন আলমগিরি গেট পার হয়ে আর একটু এগিয়ে যাই। যেন ফুরফুরে বৈকালী বাতাসের ছোট একটা ঝড়ের উৎসাহ এক দমে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে আর ছটফট করে হাঁকডাক করতে থাকে হর্ষনাথ।

মণ্টু প্রায় ছুটে ছুটে এগিয়ে যেতে থাকে। আর পারমিতার আনমনা উদাসীনতা হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। সত্যিই পারমিতার গা সিরসির করে উঠেছে। পারমিতার একেবারে কাছে, এসে, পারমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে, পারমিতার পাশে পাশে হেঁটে চলেছে হর্ষনাথ।

হর্ষনাথ বলে—এর নাম হিন্দোলা গেট আর এই মহলটা হলো গুজরি মহল। সে গল্প আপনিও বোধহয় শুনেছেন মিসেস রায়, রাজা মানসিংহ এক সুন্দরী রাখালী মেয়েকে...।

—চুপ করুন। বলতে গিয়ে পারমিতার চোখে ছোট্ট একটি ভ্রূকুটি কেঁপে ওঠে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, হর্ষনাথের বেহায়া চোখের চাহনি ঝিকঝিক করে হাসছে। পারমিতার মনে হয়, নির্জন হিন্দোল গেটের চারদিকের নীরবতাও যেন চক্রান্ত করে হর্ষনাথের হাসিটাকে থরথর করে কাঁপাচ্ছে।

হঠাৎ যেন রহস্যময় একটা আবেশে বিনীত হয়ে আর কুণ্ঠিতভাবে হর্ষনাথ বলে—আমি একটা কথা বলতে চাই।

পারমিতা—কি কথা?

হর্ষনাথ—আপনি যেমন বিধবা আমিও তেমনি বিপত্নীক।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে হর্ষনাথের দিকে একটা কঠোর দৃষ্টি হানে পারমিতা; যেন এই নির্জনতার বেহায়া আকাঙ্ক্ষার করুণ দুঃসাহস এখনই ভস্ম করে দিতে চায়। কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত হয়ে যায়, একটা ভ্রূক্ষেপও আর করে না পারমিতা। মুখ ফিরিয়ে আর চেঁচিয়ে ডাক দেয়—মণ্টু!

ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে মণ্টু।

পারমিতা বলে—চল, এবার বাড়ি ফিরে যাই।

আষাঢ়ে সন্ধ্যায় মেঘ আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েনি। আকাশের তারা দেখা যায়। আর দেখা যায় এবং দেখতে পেয়ে পারমিতার চোখের আশা জ্বল জ্বল করতে থাকে, মনোময়ের ঘরের ভিতর থেকে যেন রঙীন জ্যোৎস্না উথলে উঠে দরজার পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়েছে। গ্রামোফোনের মিষ্টি সুরের বাজনার রেকর্ড বাজছে। সত্যি যে মনোময়ের ঘরে একজনকে কাছে ডেকে আপন করে নেবার উৎসব জেগে উঠেছে! এই দু'বছরের মধ্যে মনোময়ের ঘরে এমন আলো আর এমন সুরের মেলা জেগে উঠতে কখনও দেখেনি পারমিতা।

কি আশ্চর্য, সারা শরীরটা লজ্জা পেয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রাণটাকেই কত ভার-ভার মনে হয়। ডাক শোনবার পর, সত্যিই যেতে পারবে তো পারমিতা? চোখ দুটো মিছে জলে ভরে গিয়ে একটা যা-তা কাণ্ড বাধিয়ে ফেলবে না তো?

বেয়ারা এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দেয়—দেবীজী!

—কি?

—সাহেব আপসে বাত করেঙ্গে।

—আচ্ছা।

চলে যায় বেয়ারা। তারপর আর কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, নিজের মুখের ছবির দিকে তাকিয়ে, বুকের ভিতরের উতলা বাতাসটাকে চেপে দিতে যতটুকু সময় লাগে, শুধু ততক্ষণ, তারপর আলোছায়ার ভিতর দিয়ে ফুলের টবের পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে, একটা মুগ্ধ সত্তার ভার কোনমতে টেনে নিয়ে মনোময়ের দরজার কাছে দাঁড়ায় পারমিতা। আস্তে একটা হাঁপ ছেড়ে নিয়ে ঘরের ভিতর ঢোকে।

—এ কি? পারমিতার বুকের ভিতর থেকে যেন একটা নিষ্ঠুর বিস্ময়ের আক্ষেপ আর্তনাদ হয়ে বেজে ওঠে। ঘরের ভিতরে শুধু মনোময় নয়, আরও তিনজন বসে আছেন। এমন কি বেহায়া হর্ষনাথও মোসাহেবী সুখের পুতুলের মত চুপ করে ঘরের এক কোণে একটা টেবিল ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টেবিলের উপর গ্রামোফোন। হ্যাঁ, বুঝতে পারা যায়, একটা কাজের ভারও নিয়েছে হর্ষনাথ। এই ঘরের উৎসবকে মাতিয়ে দেবার জন্য হর্ষনাথ গ্রামোফোনে বাজনার রেকর্ড বাজাচ্ছে।

মনোময় ডাকে—পারমিতা!

পারমিতা বিড়বিড় করে কথা বলে—বলুন।

মনোময়—তুমি তো ভাল নাচ জান শুনেছি।

পারমিতা—কি বললেন?

মনোময়—আস্তে, ওভাবে বলো না। আমাকে প্রশ্ন করবার কোন দরকার নেই। কথা হচ্ছে, আমার এই গেস্ট, এই তিন বন্ধুকে তোমার নাচ দেখিয়ে খুশি করে দাও।

—কি অদ্ভুত কথা বলছেন আপনি? আমাকে এসব কথা বলা কি...।

—আস্তে! কথা বলতে হলে আস্তে বল। মনোময়ও গম্ভীর স্বরে ও আস্তে আস্তে কাটা-কাটা ভঙ্গীতে মুখের ভাষাটাকে যেন শক্ত চাবুকের মত আছড়ে দিয়ে কথা বলে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পারমিতা। স্বপ্নের খেলাঘর একটা প্রচণ্ড হিংস্রতার গর্জনে আর লাথির আঘাতে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, যেন তারই শব্দ শুনছে পারমিতা। ভালবাসার ভ্রমর-কালো দুটি চক্ষু নয়, ঘুটঘুটে অন্ধকারের মত কালো দুটো হুকুমের চোখ অচঞ্চল হয়ে শুধু বাধ্যতার একটা দাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

গেলাস হাতে নিয়ে আর চোখ-মুখ লাল করে বসে আছেন যে গেস্ট, সেই গেস্ট পারমিতার সাদা থানের শাড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ঘাড় দুলিয়ে হেসে ওঠেন—এই কি নাচের ড্রেস?

আর একজন গেস্ট প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন—ড্রেস-ফ্রেস না থাকলেই ভাল।

মনোময় বলে—ঠিক কথা। হ্যাঁ, শুনলে তো? এখন ডু ইওর ডিউটি।

—তার মানে? মনোময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে পারমিতার চোখের চাহনি যেন একটা জ্বালায় পুড়ে পুড়ে ভস্ম ছুঁড়তে থাকে।

মনোময়—আস্তে! চেঁচিয়ে কথা বলো না। এঁরা যা বলছেন, শোন।

বিলিতী বাজনার যে রেকর্ডটা এতক্ষণ বাজছিল, সেটা বেজে বেজে নীরব হয়ে গিয়েছে। অন্য একটা রেকর্ড হাতে তুলে নিয়েছে হর্ষনাথ। কিন্তু কেমন যেন হয়ে গিয়েছে মোসাহেব হর্ষনাথের চেহারাটাই। মনে হয় যেন ঢোক গিলে গিলে একটা আর্তনাদ কোনমতে চেপে রাখতে চেষ্টা করছে হর্ষনাথ।

তামাকের পাইপটা দাঁতে চেপে ধরে একজন গেস্ট হর্ষনাথের দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে—পাঞ্জাবী ঢোলক গীত কিংবা কাজরী গানের রেকর্ড থাকে তো বাজাও। ঢোলক-গীত ড্যান্সকো বহুত ফূর্তি দেতা হ্যায়।

আর একবার যেন শেষবারের মত মনোময় মজুমদারের ঘুটঘুটে কালো চোখের দিকে তাকিয়ে সে চোখের ইচ্ছাটাকে বুঝতে চেষ্টা করে পারমিতা। না, আর বুঝতে অসুবিধা নেই। লাখ টাকার মানুষ মনোময় মজুমদার, ওস্তাদ শিকারী মনোময় মজুমদারের চোখ একটা বুনো হরিণীর শরীরের সুঠাম মাংসলতার রূপ দেখবার জন্য উগ্র হয়ে তাকিয়ে আছে।

আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে ঘরের এক কোণে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হর্ষনাথের মুখের দিকে তাকায় পারমিতা। এখনও কেমন চুপটি করে এক হাতে একটা রেকর্ড নিয়ে, মোসাহেবী দুর্বল মেরুদণ্ডটাকে তেমনই কুঁজো করে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। ছিঃ, পৃথিবীতে বুঝি মানুষ নামের কতকগুলি চেহারা আছে, মানুষ নেই।

যেন একটা আশার হৃদয় যাচাই করে দেখবার জন্য পারমিতার চোখ দুটো একটা ধূর্ত চক্রান্তের জ্বালায় জ্বল জ্বল করে। —বেশ, যা বলছেন তাই হবে! মনোময়ের মুখের দিকে তীব্রভাবে তাকিয়ে কথাগুলি বলে নিয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয় পারমিতা। পারমিতার চোখের চাহনি এবার হর্ষনাথের দিকে তাকিয়ে তার স্তব্ধ চেহারাটার উপর যেন অভিশাপের জ্বালাময় ভস্ম ছুঁড়তে থাকে।

কিন্তু হঠাৎ একটা রুদ্র রুষ্ট আপত্তির শব্দ এই ঘরের মেজের উপর আছাড় খেয়ে চমকে ওঠে। হর্ষনাথের হাত থেকে রেকর্ডটা কি হঠাৎ পড়ে গেল? কিংবা ইচ্ছে করেই ঘরের মেজের উপর রেকর্ডটাকে আছড়ে দিয়েছে হর্ষনাথ?

তাই তো, হর্ষনাথ যে থরথর করে কাঁপছে, আর পারমিতার মুখের দিকে যেন অগ্নিময় একটা বোবা ধিক্কার বর্ষণ করছে। পারমিতার মুখটা যেন একটা দুঃসহ ঘৃণার ছবির মত হর্ষনাথের চাহনিকে অপমান করছে। আর বোধহয় সহ্য করতে পারবে না, আর দেরিও করে না হর্ষনাথ। দু'হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ঘর ছেড়ে বের হয়ে যায়।

পাথরের উপর অবাধ আবেগে লুটিয়ে পড়া ঝরণার উল্লাসের মত কলকল করে হেসে ওঠে পারমিতা। মজুমদার হাউসের দু'বছরের একটা বঞ্চক বিদ্রূপকে যেন ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে চেঁচিয়ে ডাক দেয়—হর্ষবাবু!

ঘর ছেড়ে পারমিতাও ছুটে বের হয়ে যায়। —হর্ষবাবু একটু দাঁড়ান।

দাঁড়ায় হর্ষনাথ। বাইরের বারান্দার উপর ছায়াময় চেহারাটা হঠাৎ বিস্ময়ে কঠিন কালো পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

মনোময় মজুমদারের শান্ত চেহারাটাও হঠাৎ বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে বাইরে ছুটে আসে। রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে মনোময়—একি? তুমি কোথায় চললে?

পারমিতা—আস্তে! ওভাবে প্রশ্ন করবেন না।

—কি বললে? মনোময় আবার চেঁচিয়ে ওঠে!

পারমিতা বলে—চুপ, কথা বলতে হয় তো আস্তে বলুন। হ্যাঁ, আমার একটা কথা ছিল...।

মনোময়—কি?

পারমিতা—মণ্টু যদি জিজ্ঞেস করে পারুমাসী কোথায় গেল, তবে বলে দেবেন...।

ভ্রূকুটি করে মনোময়—কি বলবো?

পারমিতা—বলে দেবেন, পারুমাসী এতদিনে আবার স্বামীকে পেয়ে স্বামীর কাছে চলে গিয়েছে।

দেবতারে প্রিয় করি

সংসারের উপর রাগ করে নয়, বিরক্ত হয়েও নয়, সংসারকে চিনতে পেরেছেন বলেই এইবার একটু সাবধান হয়েছেন সনাতনবাবু। সংসার যেন আর মন কেড়ে না নেয়। এই মাত্র। সাবধান হবার মত বয়স হয়েছে সনাতনবাবুর, সময়ও হয়েছে।

আর কেন এত মায়া, এত উদ্বেগ আর এত চিন্তা? সংসারের জন্য অনেক খেটেছেন, চোখের জলও ফেলতে হয়েছে অনেক, কিন্তু আর নয়। সনাতনবাবু এইবার একটু আলগা হয়ে থাকতে চান। কাজের জীবনের স্বেদ ক্লান্তি ও চঞ্চলতা থেকে রেহাই পেয়েছেন এতদিনে। এখন শুধু খেয়াঘাটের মাটিতে দাঁড়িয়ে বেলাশেষের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা এক প্রতীক্ষার জীবন, যতদিন না সেই ডাক আসে আর চলে যেতে হয়।

কিন্তু এই প্রতীক্ষার শান্তি যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, তাই সাবধান হয়েছে সনাতনবাবু। এতদিন ধরে অনেক শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়েছেন তিনি, এইবার শুধু শান্ত হতে চান।

জীবনের শোকের আঘাত পেতে হয়েছে অনেকবার। তিন ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে বেঁচে আছে শুধু একজন, একটি ছেলে। সেই সব দুঃসহ বেদনার দিনে সনাতনবাবুর সিক্ত চক্ষুর বেদনাকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করার জন্য নিজের চোখে জল নিয়ে যিনি সামনে এসে দাঁড়াতেন, তিনিও আজ আর নেই। অনেক মায়া আর যত্নে একটি মাত্র ছেলেকে বড় করে দিয়ে সনাতনবাবুর স্ত্রী সব মায়ার ধরাছোঁয়ার অতীত হয়ে গিয়েছেন অনেকদিন আগেই।

একটিমাত্র ছেলে হরেন, সে ছেলে এখন বড় হয়েছে, নানা বিদ্যার ডিগ্রী লাভ করেছে, এখন এক ভাল কলেজে অধ্যাপনা করছে, এবং মাইনে পাচ্ছে ভালই। সুতরাং, অর্থচিন্তার বন্ধন থেকে সনাতনবাবু এইবার মুক্ত হতে পেরেছেন। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এক ক্ষান্তিহীন খাটুনির চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে এইবার সনাতনবাবু চিন্তা করতে পারছেন তাঁরই কথা, জীবনের এই অবসরটুকু যাঁর চিন্তায় উৎসর্গ করে দিতে পারলে শান্ত হয় জীবন।

সংসারের প্রতি তাঁর একটি যে কর্তব্য ছিল, তাও চুকিয়ে দিয়েছেন সনাতনবাবু। হরেনের বিয়ে দিয়েছেন। পুত্রবধূ কমলাও সত্যিই গৃহলক্ষ্মী। সুতরাং সনাতনবাবুর মনে এখন আর কোন আক্ষেপও নেই। সংসারকে তুচ্ছ করেননি, সংসারের সঙ্গে বিরোধও করেননি, বরং সংসারকে বেশ সুখী করে দিয়ে সব কর্তব্য আর দায় বুঝিয়ে দিয়ে তিনি নিজে এইবার ছুটি নিয়েছেন।

এখন তাঁর হাতের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত আর চোখের সম্মুখে দেয়ালের গায়ে টাঙানো ছবিতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীবিষ্ণু। আর, মনের মধ্যে এই মূর্তিরই ধ্যান। চুলচেরা বিচার প্রশ্ন আর তর্ক নিয়ে তত্ত্বের ভীড়ের মধ্যে ঢুকবার জন্য আর কোন আগ্রহ নেই সনাতনবাবুর। তিনি সরল বিশ্বাসের মানুষ। এতদিন ধরে জীবনের প্রত্যেক আপদে ও আঘাতে হঠাৎ যাঁকে একটি নাম ধরে ডেকে উঠতেন, আজ এই অবসরের জীবনে তাঁকেই সারাক্ষণ ধরে এবং সারা মন দিয়ে সেই নামেই ডাকছেন সনাতনবাবু। নারায়ণ! নারায়ণ! আগে মাঝে মাঝে শুধু বেদনার মধ্যে যাঁকে ডাকতেন, আজ এই অবসর সময়ে জীবনের শান্তির মধ্যে তাঁকেই ডেকে-ডেকে আরও বড় শান্তির স্বাদ মনেপ্রাণে পেতে চাইছেন।

নিজের সংসার প্রিয় ছিল এতদিন, এইবার দেবতাকে প্রিয় করবার দিন এসেছে। তাই সংসারের কোন মায়ায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে আর চান না সনাতনবাবু। এই গৃহে আজও কলরব আছে, ভাবনা আছে, হাসির উচ্ছ্বাস আর অভিমানও আছে। ছেলের বিয়ে দেবার পর থেকে এই গৃহেরই মধ্যে সাংসারিক মায়াগুলি যেন আরও নতুন করে জেগে উঠেছে। উঠুক, থাকুক, ভালই, কিন্তু সনাতনবাবু এই ভালর ভাবনা, চঞ্চলতা ও মোহ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

হরেনও গৃহজীবনের কোন সমস্যা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে সনাতনবাবুকে ডেকে আনে না। পিতার অবসর জীবনের শান্তিকে বিচলিত করতে চায় না। কমলাও শ্বশুরের এই শান্তির আগ্রহকে শ্রদ্ধা করেই চলে। ধ্যান পূজা জপ আর দেবতার চিন্তা নিয়ে বাড়ির এক নিভৃতে শান্ত হয়ে রয়েছেন। বুড়োমানুষ, থাকুন না, তাঁকে আর সংসারের ভালমন্দের চিন্তার মধ্যে টেনে এনে লাভ কি? যেমন হরেন, তেমনি কমলা, দুজনেই সারাক্ষণ সতর্ক থাকে, সনাতনবাবুর এই নির্লিপ্ত জীবনের শান্তি যেন তাদের কোনো আচরণের ভুলে ক্ষুণ্ণ না হয়। সনাতনবাবুর জন্য ফুল গঙ্গাজল আর আসন ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতেই সাজানো থাকে। আত্মীয় কুটুম্ব যাঁরা আসেন, তাঁদের অনেকেই জায়গা-জমি চালের দর আর চা-বাগানের শেয়ারের কথা বলতে ভালবাসেন। কিন্তু হরেন আর কমলা সাবধানে থাকে, অভ্যাগতদের স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলে না—বাবার কাছে গিয়ে ওসব কথা আর আলোচনা করবেন না। উনি ওঁর নারায়ণ নিয়ে শান্তিতে আছেন, শান্তিতে থাকতে দিন।

ঘরের মধ্যে ঝি-চাকরকেও কথাবার্তার স্বর মৃদু করে রাখতে হয়। যেন কোন সোরগোল না হয়। আজেবাজে ভিখিরীর দল এসে চিৎকার করে ওদিকের দরজার কাছে; এদিকে সনাতনবাবুর ঘরের দরজার কাছে শুধু একজন বৈরাগী ভিখিরী আসবার সুযোগ পায়। বিষ্ণুনাম গান করে চলে যায় সেই বৈরাগী।

এই বাড়ির বাতাসে নবজাত প্রাণের কান্না বেজে উঠল একদিন। সনাতনবাবু তখন পূজায় বসেছেন মাত্র এবং কান্নার স্বর তাঁর কানে এসে পৌঁছতেই তার শান্ত চক্ষুর তারকা হঠাৎ একটু চমকেও উঠলো। নারায়ণ! নারায়ণ! প্রিয় দেবতার নাম উচ্চারণ করে এবং বিষ্ণুমূর্তি স্মরণ করে শান্তমনে পূজা সমাপন করলেন সনাতনবাবু।

বাড়ির বাতাসকে হঠাৎ ধ্বনিময় করেছিল যার কান্না, তাকে চোখ মেলে দেখলেনও সনাতনবাবু। ফুলের মত একটা কচি মানুষের টুকটুকে দেহ তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে ধাই হাসিমুখে সনাতনবাবুর সামনে এসে দাঁড়ালো, আর বললো—নাতিকে দেখুন। দেখলেন সনাতনবাবু, তার পরেই নারায়ণের মূর্তি স্মরণ করে চোখ বন্ধ করলেন।

কয়েক মাস পরে এই বাড়ির মধ্যে একদিন একটু সোরগোলের সাড়া শুনতে পেয়ে হঠাৎ একটা কৌতূহল যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলো সনাতনবাবুর মনে। একটা উৎসবের মুখরতার মত সেই সোরগোলের অর্থ কল্পনাতে তিনি সহজেই বুঝে নিলেন, এবং তারপরেই হরেন ও কমলাকে ডাক দিয়ে বললেন—ওর নাম রাখ নারায়ণ।

তবে কি সংসারের জন্য আবার কোন আগ্রহ দেখা দিল সনাতনবাবুর মনে? না, হরেন আর কমলা বুঝতে পারে যে, এই সংসারের একটা নতুন মানুষের নামকে দেবতার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার একটা ডাক করে রেখে দিলেন সনাতনবাবু। নাতিকে কেউ নাম ধরে ডাকলেই নাতির দাদুর মনে তাঁর প্রিয় দেবতার মূর্তি জেগে উঠবে। তাই এই নির্দেশ।

সনাতনবাবুর নির্দেশই সবাই মেনে নিল। তাঁর নাতির নাম রাখা হলো নারায়ণ। ঘরের ভিতরে ফিরে গিয়ে হরেন কমলাকে হেসে হেসে বলে—ভালই হলো, ছেলেকে যদি চিৎকার করে ডাক, তবুও বাবার মনে শান্তি নষ্ট হবে না।

কমলাও হাসে—ভালই হলো।

হ্যাঁ, ভালই হলো। সনাতনবাবুর নাতি বড় হয়ে উঠতে থাকে, আর সেই সঙ্গে বড় হতে থাকে নাতির দুষ্টুমি ও চাঞ্চল্য। কিন্তু নাতির এই দুষ্টুমি ও চাঞ্চল্যর কিছুই দেখতে পান না সনাতনবাবু। সনাতনবাবুর নিভৃতের শান্তি যেন দুরন্ত ছেলের উপদ্রবে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে লক্ষ আছে হরেনের ও কমলার। এই বাড়ির ঐ দুরন্ত একটি মায়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্য কোন

আগ্রহও নেই সনাতনবাবুর মনে। নাতিকে দেখতে চান না সনাতনবাবু, দেখতে পানও না, শুধু শুনতে পান। এই বাড়ির এতদিনের শান্ত বাতাসে একটা ডাক ছুটোছুটি করছে। ও নারায়ণ! ওরে নারায়ণ! কখনো হরেন, কখনো কমলা, কখনো বা ঝি-চাকর, দুরন্ত ছেলেকে খুঁজে খুঁজে ডাকতে থাকে। বাগানের এক কোণে ছোট বকুলের কাছ থেকে ধুলোখেলা ছেড়ে দিয়ে ছুটে আসে নারায়ণ।

কদাচিৎ কখনো নাতিকে চোখে দেখতে পান সনাতনবাবু, যখন ঐ ছোট বকুলের কাছে ধুলো খেলতে আসে নারায়ণ, তখন। বারান্দার উপর একটি চেয়ারে জপের মালা হাতে নিয়ে বসে থাকেন সনাতনবাবু, আর ছোট বকুলের ছায়ার দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই দেখতে পান, দু'হাতে ধুলো ঘাটছে তিন বছর বয়সের একটা মানুষ। একবার তাকিয়েই চোখ বন্ধ করেন সনাতনবাবু, অথবা ভাগবতের পাতা খুলে পড়তে থাকেন। ডাক শোনা যায়,—নারায়ণ, নারায়ণ। ঝি চেঁচিয়ে ডাকছে। সনাতনবাবুর মনে মূর্তি জাগে, প্রিয় দেবতার মূর্তি।

আরও শান্ত এবং আরও প্রসন্ন হয় সনাতনবাবুর চোখের দৃষ্টি। বিষ্ণুধ্যানের স্তোত্র মনের মধ্যে মৃদু গুঞ্জরন করে বেড়ায়। দেবতার মূর্তি ফুটে উঠেছে সনাতনবাবুর মনের গভীরের এক আকাশে। কি নয়নাভিরাম সেই মূর্তি। শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম, বৈজয়ন্তী মাল্য ও কৌস্তুভ মণি, কিরীটে ও কুণ্ডলে শোভিত দেবতা। জ্ঞানীরা বলেন এবং সাধকেরা তো দেখতেই পান, এই সুন্দর পীতাম্বর দেবতার ভ্রূপল্লবের শিহরে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের রহস্য শিহরিত হয়।

আর একদিন, সেদিনও সবেমাত্র পুজোয় বসেছেন সনাতনবাবু! এই বাড়ির বাতাসে বেজে উঠলো সেই ডাক—নারায়ণ নারায়ণ। সোরগোলও শোনা যায়। অনেক পায়ের শব্দ ছুটাছুটি করছে। কিন্তু সকল শব্দ ছাপিয়ে শুধু একটি ডাক বাজছে—নারায়ণ, নারায়ণ! কি তীব্র, কী করুণ, বুকের পাঁজর চূর্ণ করা সেই ডাক। যেন কেউ একটা হিংস্র কামড় দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঐ সংসারটার সবচেয়ে বড় লোভের আদরের আর মায়ার কোন জিনিসকে। হঠাৎ মনে পড়ে সনাতনবাবুর, ঠিকই তো, অনেকদিন হলো ঐ বকুলের ছায়ার কাছে সেই ছোট্ট মানুষটাকে ধুলো খেলতে আর দেখা যায়নি! সত্যিই কি ধুলোখেলার সেই মানুষটাই চলে যাচ্ছে?

সত্যিই তাই, বুঝতে দেরী হয়নি সনাতনবাবুর। শোকাহত এক সংসারের বিলাপ বাতাস মথিত করছে। তার মধ্যে শুধু আছাড় খেয়ে বাজছে সনাতনবাবুরই দেবতার নাম—নারায়ণ, নারায়ণ। চিৎকার করে নাম ধরে ডাকছে আর আকুল হয়ে কাঁদছে বাড়ির ভেতরের মানুষগুলি।

শুধু একবার মাত্র শিউরে ওঠে সনাতনবাবুর পূজার হাত, চোখের তারা এক মুহূর্তের মত শুধু একটু কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু পরমুহূর্তে, এই বাড়ির আহত বাতাসের গ্রাস থেকে নিজের মনটাকে ছিন্ন করে এক ভিন্ন আকাশের কোলের উপর নিক্ষেপ করেন সনাতনবাবু। দেকতে পান,—শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম নিয়ে উজ্জ্বল অদ্ভুত ও সুন্দর এক মূর্তি যেন তাঁর বুকের কাছে আপন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! শান্ত মনে পূজা করতে থাকেন সনাতনবাবু। ধীর স্বরে স্তব আবৃত্তি করতে করতে অদ্ভুত এক শান্তির গভীরে মনটাকে ডুবিয়ে দিতে থাকেন। বাড়ির আহত বাতাসও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁপিয়ে ক্লান্ত হয়ে শেষে ঘুমিয়ে পড়ে আর নীরব হয়ে যায়।

ব্যথাহত সংসারের পাশেই যেন ব্যথার অতীত এক শান্তির ঠাঁই পেয়ে গিয়েছেন সনাতনবাবু। আকাশে সেই রকমই আলো জাগে সকালবেলায়, আর শালিক লাফালাফি করে বকুলের পাতার আড়ালে। সেই বৈরাগী ভিখারী আসে, আর বিষ্ণুনাম গান করে চলে যায়। পূজার ফুল গঙ্গাজল আর আসন ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতেই সাজানো থাকে। হাতের কাছে ভাগবত, আর চোখের সামনে দেয়ালের গায়ে রঙীন ছবির শ্রীবিষ্ণু।

কিন্তু হঠাৎ একদিন ব্যস্তভাবে ডেকে উঠলেন সনাতনবাবু—বউমা, বউমা!

কমলা কাছে এসে দাঁড়ায়। সনাতনবাবু বলেন—না, কিছু না।

আবার একদিন, এবং তারপর থেকে প্রায়ই হঠাৎ ডেকে ওঠেন সনাতনবাবু।—ও হরেন, ও বউমা। হরেন আসে, কমলাও আসে। কিন্তু সনাতনবাবু বলতে পারেন না, কি হয়েছে তাঁর, আর কেনই বা ডাকছেন।

বারান্দার চেয়ারের উপর বসে আর জপের মালা হাতে নিয়ে তেমনি বসে থাকেন সনাতনবাবু। নারায়ণ, নারারণ—চোখ বন্ধ করে নাম উচ্চারণ করা মাত্র চোখ মেলে তাকিয়ে ফেলেন। দেবতার মূর্তি স্মরণ করতে গিয়ে বোধহয় বার বার বাধা পাচ্ছেন সনাতনবাবু।

ছটফট করেন সনাতনবাবু; যেন তাঁর প্রিয় দেবতার মূর্তি ঐ ডাক শুনেই দূরে পালিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে, খুঁজে পাচ্ছেন না সনাতনবাবু। কই সেই শঙ্খ চক্র গদা আর পদ্ম? সেই বৈজয়ন্তী মালা আর কৌস্তভ মণিহার? কি হলো? কি হলো? জলভরা মেঘের বেদনার মত কি যেন একটা বেদনার ছায়া এসে ঝাপসা করে দিচ্ছে তাঁর চোখের দৃষ্টি। দেখতে পাচ্ছেন না দেবতার মূর্তিকে। ঐ নামে দেবতাকে ডাকতে গিয়ে তিন বছর বয়সের একটা মানুষের মূর্তি শুধু মনের মধ্যে জেগে উঠছে। ঐ নাম, ঐ প্রিয় দেবতার নাম যেন একটা আঘাত, তাই বার বার সেই আঘাতে চোখ খুলে যায় সনাতনবাবুর আর দেখতে পান শুধু...ঐ যে, ও কে? কে রে তুই? চেঁচিয়ে ওঠেন সনাতনবাবু—বউমা শিগ্‌গির এস।

কমলা কাছে এসে দাঁড়ায়। সনাতনবাবুর শান্ত উদাস দুই চক্ষু কাঁপতে থাকে। তারপর বলেন—আমার এ কি হলো বউমা?

কমলা বিস্মিত হয়—কি হলো বাবা!

সনাতনবাবু বলেন—দেবতার নাম উচ্চারণ করলেই এ কি দেখতে পাচ্ছি বউমা। এ যে সহ্য করতে পারছি না।

কমলা ভয় পেয়ে প্রশ্ন করে—কি দেখছেন?

ছোট বকুলের ছায়ার দিকে তাকিয়ে সনাতনবাবু বলেন—ঐ যে ওখানে।

কমলা বলে—ওখানে তো কেউ নেই।

সনাতনবাবু তবু অপলক চোখে ছোট বকুলের ছায়ার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলেন—তুমি ঠিক বুঝতে পারলে না বউমা।

চমকে ওঠে কমলা, সেই মুহূর্তে বুঝতে পারে, আর বুঝতে পেরেই অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে নেয়। আর সনাতনবাবু, যিনি এত বোঝেন, তিনি অবুঝের মত ছোট বকুলের ছায়ার দিকে লোভীর মত, পিপাসীর মত তাকিয়ে থাকেন। নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ! প্রিয় দেবতার নাম উচ্চারণ করা মাত্র দেবতার মূর্তি যেন ঐখানে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে।

না, ঠিক লুকিয়ে পড়ে না। তাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন সনাতনবাবু। আর বোধহয় দেখতেও পান, তাঁর প্রিয় দেবতা শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম হারিয়ে সংসারের একটা তিন বছর বয়সের শিশু হয়ে ছোট বকুলের ছায়ায় বসে ধুলো ঘাঁটছে।

শুক্লাভিসার

কলের চিম্‌নি কলোনি আর চওল নিয়ে বোম্বাইয়ের দাদার। ঘাটি মজুরদের দেখলে মনে হয়, ওরা যেন একটা ছত্রভঙ্গ বিলদার পল্টনের লোক—বেঁটেখাটো শক্ত কালো কাজে-ছেঁচা শরীর। ওদেরই পূর্বপুরুষ একদিন মহারাজা শিবাজীর সহায় থেকে রাজ্য ও রাজা ভেঙেছে ও গড়েছে, পেশোয়াদের মুলক্‌গিরি সার্থক করেছে। আজ আবার ওদেরই শ্রমের স্বেদ স্বাতীজলের মত বোম্বাইয়া বেনিয়াদের ভাগ্যের ঝিনুকে মুক্তা ফলিয়ে রাখছে।

ওদের মধ্যে অনেকে দেবল ত্রিপাঠীকে চেনে, মান্য করে, আর গুরুজী বলে ডাকে। শুধু গুরুজী বললেই ওরা সব পরিচয় বুঝে ফেলে। দেবল ত্রিপাঠীর বাড়ি যে দূর জব্বলপুরের কাছে কোন একটা গাঁয়ে, আর তার বাবা যে একজন সেকেলে জায়গীরদার—এত সব কুলমানের খবর তারা রাখে না। ত্রিপাঠীকে আজ প্রায় আড়াই বছর ধরে তারা এইভাবেই দেখে আসছে; মাথায় বড় বড় চুল, ঢিলে পায়জামা আর গায়ে আঁটসাট চোগা। সুগঠন ফর্সা চেহারার এই নওজোয়ানকে তারা প্রায়ই ঘুরতে দেখে—হাতে একটা ঝোলা, তার মধ্যে বই কাগজপত্র ইস্তাহার ও আরও কত কী যে থাকে কে জানে! মজুর এলাকায় আজ যে এগারোটা স্কুল চলছে, তা সবই একা ত্রিপাঠীর কায়পাত মেহন্নতের ফল। আরও কত হবে।

রাত-বেরাতে হঠাৎ হয়তো নতুন মহল্লার কোনো চওলের আঙিনায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে ত্রিপাঠী। এদিক ওদিক জোড়া জোড়া তাড়িকষা লাল চোখের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি জ্বলতে থাকে। আচম্বিতে একটি ঘাটি যুবকের ক্রুদ্ধ মূর্তি পথ রুখে দাঁড়ায়, পেছন থেকে নিঃশব্দে আরও পাঁচ সাতজন ঘিরে ধরে। এক-আধটা লোহার ডাণ্ডাও থাকে কারও হাতে।

ক্রুদ্ধ মূর্তিটা দাঁতে দাঁত চিবিয়ে প্রশ্ন করে—কুঠে ঘর?

ত্রিপাঠী অলক্ষ্যে মুচকে হেসে জবাব দেয়—হিন্দুস্তান।

সন্দেহ আরও শাণিত হয়ে ওঠে। নাসিক নয়, সুরট নয়, সাতরা পুনা নয়, কাথিয়াবাড় নয়—হিন্দুস্তান?

আবার প্রশ্ন করে—তোমারা নাম?

ত্রিপাঠী উত্তর দেয়—গুরুজী।

গুরুজী। সঙ্গে সঙ্গে সবাই মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানায়। কতদিন ধরে তারা আশাপথ চেয়ে আছে, কবে গুরুজী এই দিকে আসবে। এতদিন শুধু নামই শুনে এসেছে তারা। গুরুজী এলেই একটা স্কুল খুলে যাবে, তাছাড়া আরও কত নতুন কথা শোনাবে গুরুজী, অন্য পাড়ায় সবাই শুনেছে। সেই ধুলোর ওপর বসে পড়ে সবাই। হাঁক ডাকে আরও কত লোক চলে আসে।

ত্রিপাঠীর কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। মজুরেরা নতুন কথা শোনে। গুরুজীর কথাগুলির পেছনে যেন এক সুদিনের সূর্য কিরণজাল গুটিয়ে স্থির হয়ে রয়েছে। গুরুজীর কথামত সাহসে ও প্রতিজ্ঞায় একবার দল বেঁধে উঠে দাঁড়ালেই যেন সেই সূর্য দেখা যাবে। কিন্তু সব কাজের আগে একটা স্কুল খুলে যায়। সবাই শিখবে—বাপ ছেলে নাতি কেউ বাদ যাবে না।

বরুত্রীর সঙ্গে দেবল ত্রিপাঠীর দেখা হয়েছিল আকস্মিকভাবে।

জানকী বাই ধর্মশালার একটি কুঠুরীর চৌকাঠের ওপর বসে একা-একা কাঁদছিল বরুত্রী। একে বাংলাদেশের বিধবা, তায় বয়স অল্প, তায় বিদেশ। দেশে তিন কুলের কোনো সংসারে দুটো সম্মানের ভাত কপালে জোটেনি বলেই একটা অনির্দেশ ভরসায় ঝাঁপ দিয়ে চলে এসেছে দূর বোম্বাই শহরে, চাকরি পাবে বলে।

ত্রিপাঠীর মত চলতি হাওয়ার পথিক যারা, ধর্মশালা তাদের কাছে একটা ঝড়ের রাতের আশ্রয়। ত্রিপাঠী সেদিন ধর্মশালাতেই ছিল। বরুত্রীর কাণ্ড দেখে জিজ্ঞাসা করলো—কাঁদছেন কেন?

বরুত্রী—চাকরি খুঁজতে এসেছিলাম, কিন্তু দেখছি চাকরি পাওয়া যাবে না।

ত্রিপাঠী হেসে ফেললো—চাকরির জন্য কান্না? আচ্ছা কালই আপনাকে চাকরি জুটিয়ে দেব।

ঠিক পরের দিন এসে ত্রিপাঠী বরুত্রীকে ধর্মশালা থেকে নিয়ে গেল। শেঠ গোকুলদাস ফন্ডের কর্তাদের ধরাধরি করে প্যারেলে একটা হরিজন মেয়েদের স্কুল খোলবার ব্যবস্থা করে ফেললো ত্রিপাঠী, এক রাত্রির মধ্যেই। বরুত্রী কাজ পেয়ে গেল, হরিজন মেয়ে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

ত্রিপাঠী বলে গেল—এখন শুধু হাইজিন, সেলাই আর ড্রিল শেখাবেন। হিন্দীটা আগে ভাল করে শিখে নিন আমার কাছে, আর সামান্য একটু মারাঠি। মাত্র তিনটি মাস প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে আমি আপনাকে হিন্দী শেখাবার জন্য সময় নষ্ট করবো। এর বেশি আর এক ঘণ্টাও নয়।

ত্রিপাঠীকে অগত্যা বরুত্রীর গুরুজী হতে হলো। এই তিন মাসের মধ্যে বরুত্রী ত্রিপাঠীকে একরকম চিনেছে। এটা ঠিক দাদারের মজুরদের মতন করে চেনা নয়। এমন একজন স্বার্থহীন হিতব্রত কর্মীর ওপর শ্রদ্ধা না এসে পারে না; বরুত্রী ত্রিপাঠীকে শ্রদ্ধা করে। অচেনা জনতার মাঝখানে একটা দরদী হৃদয়ের সান্নিধ্য এত সুলভ হলে কে না অন্তরঙ্গ হতে চায়? কিন্তু কী আশ্চর্য, এইটুকুতেই বরুত্রী তার অন্তরের অঙ্গনে যেন এক প্রীতমের আওন-কি-আওয়াজ শুনতে পায়। একটি সুন্দর মুখের টানে তার চোখের চাহনি লজ্জায় বিপন্ন হতে থাকে। কিন্তু এই পর্যন্ত।

একটা পশমী কাপড়ের টুপির ওপর লাল সুতো দিয়ে জোড়া-হরিণের নক্সা তুলে রেখেছিল বরুত্রী। তিন মাসের শেষে শেষ-পড়ার দিন বরুত্রী সাহস করে ত্রিপাঠীকে উপহারটা দিয়েই ফেললো। বরুত্রীর মনে যাই থাক, মুখে বললো—গুরুদক্ষিণা দিলাম।

কিন্তু উপহারটা শুধু মাথায় উঠেই রইল বোধহয়। ত্রিপাঠীর মনের ভেতর পৌঁছয়নি। পৌঁছলে তার সাড়া ফুটে উঠতো নিশ্চয়, মুখের ভাবে একটু রক্তাভ বিড়ম্বনার ছায়া, একটু সলজ্জ হাসি-। কিন্তু কই? টুপিটা মাথায় দিয়ে ত্রিপাঠী বললো—বাঃ, বেশ জিনিসটি।

বিদায় নেবার সময় ত্রিপাঠী বলে গেল—এবার তুমি নিজেই নিজেকে ট্রেনিং দাও বরুত্রী। প্রথমে ভুলে যাও যে তুমি শুধু চাকরি করছো। যে কাজ নিলে তাকে ভালবাসতে শেখ। তাহলে এর মধ্যে তুমি জীবন খুঁজে পাবে, নইলে চিরকাল একাজ তোমার কাছে মাত্র একটা জীবিকা হয়ে থাকবে।

ত্রিপাঠীর কথায় বরুত্রীর মেয়েলী প্রত্যয়ে হঠাৎ একটা রূঢ় আঘাত লাগে। বাঙালী মেয়ের মনের আলপনার রং সাতশো মাইল দূরের মহাকোশলের একটি ছেলের চোখে ধরা পড়ে গেছে কত সহজে। কিন্তু কেজো-জীবনে এসবের কোনো প্রয়োজন নেই। তাই বোধহয় সতর্কবাণী।

যথা নিযুক্তোঽস্মি। স্কুলটাই সর্বস্ব হয়ে উঠলো বরুত্রীর। যত অভাগার ঠাঁই থেকে কতগুলি নোংরা মহরের মেয়ে কুড়িয়ে এনে স্কুল গড়া হয়েছে। এদেরই লেখাপড়া শেখাতে হবে। বাঁধাকাজের একঘেয়ে রুক্ষতা, হেলাফেলা দিনযাপনের গ্লানি মুছে গেল বরুত্রীর। অদ্ভুত এক তৃপ্তির স্বাদে কাজের মুহূর্তগুলি মিষ্টি হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট মহরের মেয়েগুলি, এরই মধ্যে সুর মিলিয়ে 'জন-গণ-মন' গাইতে শিখেছে। কত বাধ্য! ঠিক নিয়মমত সপ্তাহে শনি-মঙ্গলে ফ্রকগুলি কেচে নিতে ভুল করে না। সেদিন সেই একেবারে অপোগণ্ড ভাঙ্গি মেয়েটা বরুত্রীর ধমক খেয়ে যেভাবে অভিমানে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো, বরুত্রী আর চুপ করে থাকতে পারলো না। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মেয়েটাকে কোলের ওপর তুলে জড়িয়ে ধরলো। প্রসূতি মাতার পুলকের মত আবেগের ছোঁয়া লেগে বরুত্রীর দেহমন শিউরে ওঠে। যেন এক শিশু মহাজাতির স্পর্শ। যেন বরুত্রীর মন আর প্রাণের সকল ক্ষুদ্রত্বের বদ্ধ দুয়ার খুলে যায়—ঘরে যেন নতুন আলো আসে।

ত্রিপাঠীর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। গল্পে আর কথায় দুজনের মন উৎসাহে অস্থির হতে থাকে। বরুত্রীর মনে পড়ে যায়, সেই টুপি উপহার দেবার প্রগল্‌ভতা। তার মধ্যে যেন ঘুষ দেবার মত একটা দীনতা ছিল! ত্রিপাঠীকে কত সস্তা চরিত্রের লোক মনে করেছিল বরুত্রী। কী মতিছন্নতা হয়েছিল তার।

কিন্তু তবুও, আর একটু পরেই ত্রিপাঠী চলে যাবে! বড় একা ও ফাঁকা মনে হবে। বরুত্রীর সকল ভাবনা বিষণ্ণ তন্দ্রার মত বাকী অবসরটুকু অর্থহীন করে দেয়।

এক-এক দিন ত্রিপাঠী এসে বরুত্রীকে বেড়াতে নিয়ে যায়। মহলছ্মীর তালের সারির ছায়ায় শুক্লা সন্ধ্যায় বালিয়াড়ীর ওপর দুজন হেঁটে ফিরতে থাকে। বরুত্রীর মনে হয়, অস্থির জীবনের নক্ষত্রলোকে এক সঙ্কল্পের ছায়াপথে তারা দুজনে যেন পাশাপাশি চলেছে। জাতি কুল ভাষা পরিচ্ছদ প্রদেশ—সব ভেদ যেন এখানেই খারিজ হয়ে গেছে। এখানে আপনা হতেই হাতে বরমাল্য উঠে আসে। সকল কুলজী বিচার এখানে মিথ্যে হয়ে যায়।

বরুত্রী বলে—আমাকে তোমার সঙ্গে রাখ দেবল। আরও কাজ দাও আমাকে। তুমি একা কত কাজ করছো, আমি কিছুই জানতে পারি না। কিছুই বল না আমাকে।

ত্রিপাঠী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে—আর একটু ভেবে বলো বরুত্রী। এত তাড়াতাড়ি ওকথা বলতে নেই। ভুল হতে পারে.

বরুত্রী ত্রিপাঠীকে ভালবেসে ফেলেছে; অস্বীকার করলে মিথ্যা হয়। সংকল্প—এ যুগের নরনারীর মিলনে প্রণয়ে এই এক নতুন রাখী। সংকল্পে যারা এক হতে পেরেছে, জীবনে তাদের এক হয়ে যেতে দোষ কি?

তবু মনে হয়, এই রাখীর সূত্রে কোথায় যেন একটা পাক আলগা হয়ে রয়েছে। তাই টানে জোর হয় না। বরুত্রী বুঝতে পারে, একে ঠিক পাশাপাশি চলা বলে না। ত্রিপাঠী চলেছে আগে আগে, বরুত্রী তার পেছনে। মাঝে বেশ খানিকটা মহত্ত্বের ব্যবধান। বড় বেশি তীক্ষ্ণ উদার উঁচু-মাথার মহত্ত্ব। তিলমাত্র হৃদয়ের তাপ নেই।

একটি বছরও পার হয়নি, পুষ্কর মিত্রকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—বরুত্রীর সঙ্গে মহরপাড়া আর ভাঙ্গিদের বস্তিতে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়ায়। পুষ্কর বলে—আমার বাপ বড়লোক, কিন্তু আমি ছোটলোক। আমিও আমার ভবিষ্যৎ ঠিক করে ফেলেছি বরুত্রী। আমিও একটা হরিজন স্কুল খুলবো।

পুষ্করের কথা বলার ভঙ্গীতে একটু বেশি উচ্ছ্বাস থাকলেও বরুত্রী ওর আন্তরিকতাটুকু সন্দেহ করে না। খুশি হয়। স্টীভেডর মিত্র এন্ড কোম্পানীর মালিক শ্রীকান্ত মিত্রের একমাত্র ছেলে পুষ্কর। জুহুতে এক পাহাড়ী টিপির ওপর পালেৎসা ঢঙে এমন একখানা বাড়ি; তবু এই প্রচণ্ড বনেদী বিত্তের ছলনা পুষ্করকে আটকে রাখতে পারেনি। সে নিজেই বলে—এটা ঠিক জেনো বরুত্রী, ঘরে বসে বাপের দৌলত ফুঁকে জীবনটা পার করে দেব, সে পাত্র আমি নই। তার চেয়ে একবেলা দুটো বাজ্‌রার রুটি চিবিয়ে দেশের গরীবের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে থাকবো। আমি তোমারই মত সেবার ব্রতে নেমে আসতে চাই।

বরুত্রী হেসে ফেলে— নেমে আসতে চাই? সে কি? বল, উঠে আসতে চাই।

পুষ্কর—এরকম ব্যাকরণের ভুল ধরলেই গেছি। তোমাদের কাজ করতে গিয়ে কোথায় কবে পান থেকে চুনটি খসবে, আর তোমরা সবাই তখন—

বরুত্রী—তোমাদের কাজে মানে? বল আমাদের কাজে।

পুষ্কর কাঁচুমাচু হয়ে বলে—আমার ভুল হয়ে যাচ্ছে বরুত্রী, আরও হয়তো হবে। তুমি শুধরে নিও।

পুষ্করের এই ধরনের কথাতে বেশি বিচলিত হয়ে পড়ে বরুত্রী। অবুঝ আদুরে ছেলের যেমন পাত্রাপাত্র জ্ঞান নেই, হঠাৎ বায়না ধরে বসে; পুষ্করের কথাগুলি সেই ধরনের। কথায় কথায় সে নিজেকে বরুত্রীর সদিচ্ছার ওপর সঁপে দিতে চায়। বরুত্রীর চিত্ত ঘিরে একটা যে সতর্ক বেড়ার আঁটুনি আছে, তার মধ্যে কোথাও দুর্বলতার ফাঁক আছে নিশ্চয়। নইলে পুষ্কর বরুত্রীর কাছে এতটা প্রশ্রয় কখনই পেত না।

ভোর রাত্রে উঠে এক-একদিন পুষ্কর আর বরুত্রী বস্তির পোয়াতি মেয়ে আর শিশুদের স্বাস্থ্যের রিপোর্ট নিতে বার হয়। পথে যেতে দেখা যায়, মহাজনদের দালানের অলিন্দের নীচে কয়েকটা বুড়ো-হাবড়া মুটে আর ভিখিরী ছেলেমেয়ে উবু হয়ে বসে পথের ধুলো হাতড়াচ্ছে। পোষা পায়রার উচ্ছিষ্ট ছোলার দানা খুঁজছে তারা। পুষ্করের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করে—তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর বরুত্রী, এই সব দুঃখ দূর করা সম্ভব? এ কী চারটিখানি কথা? দু'চারটে স্কুল করে লেখাপড়া শেখালেই যে কী হাতিঘোড়া লাভ হবে বুঝি না।

ফেরবার পথে ট্রাম থেকে নেমে বাইকুলা পুল ছাড়িয়ে একটা মুচিদের বস্তির ভেতর ঢোকে বরুত্রী। পুষ্করের মনের প্রসন্নতার ওপর চকিতে একটা ফাঁড়া ঘনিয়ে আসে। রুমাল বার করে বার বার নাক মোছে, ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকায়।

বস্তি থেকে যখন দুজনে বেরিয়ে আসে, তখন মাথার ওপর রোদ চন্‌চন্‌ করে। পুষ্কর এইবার বরুত্রীকে অনুরোধ না করে পারে না—একটা কাফেতে ঢুকে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিলে ভাল হতো না কি বরুত্রী? না হয় সামনের ঐ হিন্দু বিশ্রান্তি গৃহেই গিয়ে বসি; একটু সামান্য সরবত-টরবত...

বরুত্রী হেসে ফেলে আর অনুযোগ করে—ওসব বদভ্যাস ছাড় এবার।

বরুত্রীর স্কুলঘরে সেদিন পুষ্কর বসে গল্প করছিল। ঘরে ঢুকলো ত্রিপাঠী।

—এটা আবার কে রে বাবা? পুষ্কর কথাটা উচ্চারণ করেই বরুত্রীর দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে রইল। বরুত্রীর দৃষ্টিতে ভর্ৎসনার খরবিদ্যুৎ যেন পুষ্করকে সাবধান করে দিল। বাচালতা সংযত করে নিল পুষ্কর।

ত্রিপাঠীর সঙ্গে পুষ্করের আলাপ আলোচনা হলো অনেকক্ষণ। এই প্রসন্ন সময়টুকুর মধ্যেই বার বার পুষ্করের মনস্কতা ভেঙে যাচ্ছিল। ত্রিপাঠীর সম্পর্কে বরুত্রীর আচরণ—দুর্ভেদ্য হেঁয়ালীর মত হতবুদ্ধি করে দিচ্ছিল তাকে। ত্রিপাঠী চলে গেলে পুষ্কর সোজাসুজি কথাটা না বলে আর পারলো না—তুমি যে ত্রিপাঠীর কাছে কৃতজ্ঞতায় বাঁধা পড়ে গেছ বরুত্রী। এই সামান্য চাকরিটার জন্যে তো?

বরুত্রী—বড় খারাপ ভাবে কথাগুলি বলছো পুষ্কর। এরকম বলো না।

পুষ্কর চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। বরুত্রী দেখলো, পুষ্করের দু'চোখের কোণ সজল হয়ে উঠেছে। মুখটা হৃতাশ্রয় মানুষের মত বেদনায় করুণ।

—এ-কী? ছি-ছি, আমাকে এভাবে বিপদে ফেল না পুষ্কর। বরুত্রী একটা অস্বস্তিতে ছটফট করে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে। পুষ্করের হাতটা ধরে জোর করে বসিয়ে দেয়; শেষে অভিভাবকের মত স্পর্ধিত শাসনের সুরে যেন ধমক দিয়ে ওঠে—অবাধ্য হয়ো না। বসো।

পুষ্করের বুদ্ধির কোন্ রন্ধ্রে যেন এক শনি ঢুকেছে। কোথা থেকে এক প্রচণ্ড বাঙালিয়ানার দর্প এসে পুষ্করের মেজাজ ঝলসে দিয়েছে। সে বলে—পলিটিক্স আর কালচারে আমি আগে বাঙালী, পরে অন্য কিছু। তুমিও তাই বরুত্রী, তবু মুখে সেটা মানতে চাও না।

কখনও বলে—ত্রিপাঠীর মধ্যে কেমন একটা কাটখোট্টাই ভাব আছে। নয় কি বরুত্রী?

বরুত্রীর অন্তরাত্মা যেন একটা অশুচি হাতের ধাক্কা খেয়ে চমকে ওঠে।

পুষ্কর তবু বলে যায়—শত হোক, ওদের সঙ্গে শুধু কথা বলা যায়। মেলামেশা যায় না।

পুষ্করের সর্বশেষ অনুরোধ—তুমি বেঙ্গলে ফিরে চল বরুত্রী। সেখানে অজস্র হরিজন পাওয়া যাবে। আমাদের কাজের কোনো অভাব হবে না।

বরুত্রীর মনের ভেতরে প্রতিবাদ আর আত্মগ্লানির ঝড় উদ্বেল হয়ে উঠতে থাকে। পুষ্কর তার নিরর্গল মনের সাধ অকপটভাবে বলে যায়। কিন্তু কথাগুলি যেন ভয়ানক এক মন্দাহিংসার বাচালতা। শুনে স্তব্ধ হয়ে থাকে বরুত্রী।

অনেকক্ষণ পরে শুনতে পায়, পুষ্কর বলেই চলেছে—তোমার হাতে আমি নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। শুধু একটি প্রতিশ্রুতি দিও বরুত্রী; তোমাকে আপন করে নেবার মত যোগ্যতা যেন আমি পাই! যেদিন পাব, সেদিন তুমি দূরে সরে থাকতে পারবে না।

চমকে উঠে বরুত্রী। দুর্বলতা চরম হয়ে ওঠে। পুষ্কর যেন জোর করে তার জায়গা করে নিচ্ছে। পুষ্করের আত্মনিবেদনের দুঃসাহস ঠেকিয়ে রাখার মত-শক্তি কুলিয়ে উঠতে পারে না বরুত্রী। আর স্পষ্ট করে বলতে কিছু বাকী নেই, পুষ্কর কি চায়? পুষ্করের এই হরিজন সেবার উৎসাহ একটা কপট তপস্যা মাত্র। মনের দিক থেকে তার অনুমাত্র তাগিদ নেই, তবু ভালবাসার দায়ে আগুন ছুঁয়েছে পুষ্কর।

পুষ্করের বাঙালিয়ানা। ভূ-ভারতের পথের ভিড় থেকে সঙ্গহারা করে সে বরুত্রীকে এই নেপথ্যে নিয়ে যেতে চায়। ভীরু মাকড়সার মত পুষ্কর যেন এক কোণে জাল পেতে বসে আছে। সেখানে বরুত্রীকে একবার যদি পাওয়া যায়, অমনি তাকে আপন বৃত্তের মধ্যে লুফে নেবে পুষ্কর।

বাপের দৌলত। এই রূপোর পাহাড়ের ওপর বসে থাকলে বরুত্রী দূরেই সরে থাকবে। এমন দৌলতে কোন প্রয়োজন নেই পুষ্করের। সব বঞ্চনা নিন্দা ত্যাগ ও ক্লেশের কাঁটাভরা পথের সর্ত সে মেনে নিয়েছে। সে পৌঁছতে চায় বরুত্রীর কাছে। বরুত্রীই ওর কাছে একমাত্র সত্য।

ভাবতে গিয়ে, নতুন এক প্রত্যয়ের মদিরতা বরুত্রীর সকল বিচার আচ্ছন্ন করে ফেলে। আগে ভালবাসতে হয়—তবেই সঙ্কল্পে সমান হওয়া যায়। মিলনেই সব সহজ হয়ে যায়। ভিন্নপথের ধাঁধা ঘুচে যায়। পুষ্কর তাই এগিয়ে আসছে। না এসে উপায় নেই। ভালবাসা ঠিক থাকলে, এক ব্রতে তাদের মিলতেই হবে। এ রাখীর কোনো সুতো আলগা রাখেনি পুষ্কর। শত কামনার গিঁট দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। আপনা থেকেই গলায় তুলে নিতে ইচ্ছে করে।

পুষ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে বরুত্রীর বড় বড় চোখ দুটি যেন আবেশে টলমল করে। কয়েকটি মুহূর্ত যেন মনের শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়! বরুত্রীর মাথাটা পুষ্করের কাঁধের কাছে ঝুঁকে থাকে। খোঁপা থেকে কাঁটাগুলি এক-এক করে খুলে নামিয়ে রাখতে থাকে পুষ্কর। ভারনম্র তরুশাখা থেকে পুষ্কর যেন এক-একটি ফুল তুলছে।

বরুত্রী হঠাৎ একটা ঠেলা দিয়ে ধড়ফড় করে ওঠে, দূরে গিয়ে বসে—অত্যাচার করো না পুষ্কর। আজকের মত দয়া করে একটু বাইরে যাও। এখানে থেক না।

দেবল ত্রিপাঠী এসে বললো—কিছুদিনের মত বাইরে চলে যাচ্ছি বলেই দেখা করতে এলাম। একটা কথা বলি, কিছু মনে করো না! পুষ্কর মিত্র ভালোমানুষ সন্দেহ নেই, কিন্তু সে একজন এডভেঞ্চারার মাত্র। আমার ভয় হয়, তুমি ভুল করছো বরুত্রী।

বরুত্রী চুপ করে থাকে। মনে মনে বলে—হ্যাঁ, আমার ভুল হতে পারে। কিন্তু তুমি স্বয়ং কি? শত নিরীহতায় তুমি অপরাধী। তুমি সোনার গাছ—নিষ্ফল শুচিতায় শুধু স্থির হয়ে আছো। তোমার ছায়া হয় না। তুমি শুধু বুদ্ধিমান। তুমি হৃদয়ের দাম বুঝবে না কোনদিন। মনের প্রতিবাদ চাপতে গিয়ে বরুত্রীর দৃষ্টি আনত হয়ে আসে।

ত্রিপাঠী বলল—ফিরে এসে হয়তো দেখবো, তোমরা দুজনে বিবাহিত জীবনে সুখী হয়ে রয়েছ। ভালই হবে। আমারও তাই ইচ্ছে। তবে স্কুলটা যেন ঠিক থাকে বরুত্রী।

একথা বলতে ত্রিপাঠীর গলার স্বর একবারও কেঁপে উঠলো না; গুরুজীর আসনে বসে ত্রিপাঠী তাকে আজ বেশ একটু হীন করে দেখছে—স্কুলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা করছে। যাক, এই ভুলের আবরণ ঘুচাতে কতক্ষণ? বরুত্রী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে—ত্রিপাঠী ফিরে এসেই দেখবে স্কুলের কতটা উন্নতি হয়েছে। আরও দেখবে, এক দুর্বোধ্য এডভেঞ্চারারকে বশ করে সে কিভাবে তাকে জাতিসেবার ব্রতে দীক্ষিত করে নিয়েছে। ত্রিপাঠী বুঝবে—গুরুজীদেরও ভুল হতে পারে। আরও বুঝবে, পৃথিবীর বরুত্রীরা ভুয়ো নয়।

ত্রিপাঠীকে বিদায় দিতে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল বরুত্রী। সামনের গলিটা বড় অন্ধকার। একটা কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে দরজার কাছে রাখলো। ত্রিপাঠী পথে পা দিতে, বরুত্রী আঁচলসুদ্ধ হাত দুটো তুলে কপালে ঠেকালো—নমস্তে। —স্পষ্ট উচ্চারিত হলো না। বরুত্রীর মাথাটা অলসভাবে জোড়হাতের ওপর ঝুঁকে পড়ে রইল কিছুক্ষণ।

ত্রিপাঠী চলে গেছে। বরুত্রীর কাজের প্রেরণা তবু প্রদীপের মত জ্বলতে থাকে। কোন ফাঁকি, কোনো শৈথিল্য, কোন অবসাদ তিলেকের জন্য তাকে বিভ্রান্ত করে না।

নিরাতঙ্ক আনন্দে মজে আছে পুষ্কর। মনে মনে হাঁপ ছাড়ে, উপদ্রব যেন শান্ত হলো এতদিনে। সারা বাংলায় পৌরুষকে অপমান করার জন্যই যেন ত্রিপাঠী তৈরি হয়েছিল। একজাতি আর মহাজাতি! ওসব ফাঁকা বুলি কংগ্রেসের বৈঠকী প্রস্তাবেই ভাল শোনায়।

পুষ্কর আর বরুত্রীর বিয়ে এখনও হয়নি। যে কোনো দিন হয়ে যেতে পারে। বেঙ্গল ক্লাবের গল্পগুজব ছ'মাস ধরে এই প্রসঙ্গের গন্ধে ও আমোদে ভন্‌ভন্ করছে—হরিজন মেয়েস্কুলের এক বিধবা মাস্টারণীর পাল্লায় পড়েছে টাকার কুমীর শ্রীকান্ত মিত্রের একমাত্র ছেলে পুষ্কর। শ্রীকান্ত মিত্রও শক্ত লোক। স্পষ্ট ভাষায় প্রতিজ্ঞা শুনিয়ে দিয়েছেন, যদি এই বিয়ে হয়, তাহলে পুষ্কর মিত্রকে একটি কাণাকড়িও ছুঁতে হবে না। ফুলের টবগুলি পর্যন্ত দান-খয়রাতের জন্য লিখে দিয়ে যাবেন।

পুষ্কর মিত্র ঘাবড়ে যাবার ছেলে নয়। সে নিজের পথ করে নিতে জানে এবং করেও নিয়েছে। সে-কথাই জানাবার জন্য সেদিন বৈকালে স্কুল ঘরে আচম্বিতে এসে বরুত্রীর কাজে বাধা দিল—ওসব ঠেলে সরিয়ে রাখ এখন। বাইরে ঘুরে আসি চল। অনেক কথা আছে।

বিরক্তি ও অনিচ্ছা চেপে রেখে বরুত্রীকে যেতে হলো পুষ্করের সঙ্গে। পথে তিনবার ট্রাম-বাস বদল করে মেরিন লাইন পৌঁছানো পর্যন্ত বরুত্রী একটা সংশয় নিয়ে পুষ্করের হাবভাব আচরণ লক্ষ করে। কোথায় যেন তালভঙ্গ হয়েছে মনে হচ্ছে। অন্যদিনের তুলনায় বেশ একটু বিসদৃশ।

মেরিন-লাইনের নতুন পোস্তার ওপর দুজনে পাশাপাশি বসে রইল অনেকক্ষণ। পেছনে পিচ্ছিল পিচের নদীর মত কুইন্‌স্ রোড ছাপিয়ে দলে দলে লোক বেড়াতে আসছে। সূর্য ডুবছে, কাদাটে আরব সমুদ্রের জলে গুলালী আলোকের চূর্ণ ছড়িয়ে পড়েছে। একটা পার্শী ঠাকুর্দা নাতিনাতনীর সঙ্গে ভেজা বালি দিয়ে একটা নকল গেট-অব ইন্ডিয়া তৈরি করে হাসছেন খেলছেন। অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতেই তারা চলে গেল। দূরে রাতের মালাবার হিল—আকাশ থেকে যেন একটা দীপান্বিতা মেঘপুরী সমুদ্রের জলের ওপর ঝুলছে।

পুষ্কর বলে—যে কাজটা পেয়েছি, তাতে আমিই প্রথম বাঙালী। প্রথম ইন্ডিয়ান বলতে পার। কোন মেড়োকে আজ পর্যন্ত এই পোস্ট দেওয়া হয়নি।

গায়ে আধময়লা একটা খদ্দরের শাড়ি, পায়ে নিজের হাতে তৈরি এক জোড়া রঙীন বেতের স্যান্ডেল—তাও ছিঁড়ে গেছে। প্রকাণ্ড রুক্ষ খোঁপাটা ঘাড়ের ওপর হেলে পড়েছে। বরুত্রী নিষ্কম্প দৃষ্টি তুলে তার পাশের প্রসন্নভাগ্য এই পুরুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পুষ্কর বলে—ভারতবর্ষের এই প্রথম একটি আসমানী ফৌজ তৈরি হলো। এক বছর

প্রবেশনার হয়ে কাজ করবো, তার পরেই অফিসার করে দেবে। যতদিন না পারমানেন্ট হই বরুত্রী, ততদিন তোমাকে একটু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। তারপরই এসে তোমায় নিয়ে যাব।

বরুত্রীর সকল বোধ বিচার আর অনুভবের স্নায়ুজাল যেন নিদারুণ এক অর্থহীনতায় ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছিল।

বরুত্রী—নিয়ে যাবে? কোথায়?

পুষ্কর—আলমোড়া। ছোট একটি বাংলো ভাড়া করবো, সেইখানে তুমিই গিয়ে আমার সংসার সাজিয়ে বসবে।

বরুত্রীর সংবিৎ যেন অনড় পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে যায়। পুষ্কর উৎসাহিত হয়ে বলে—তোমার ভাগ্যের জোরেই এত ভাল কাজটা পেয়ে গেলাম। এইবার তোমার ঐ নোংরা চাকরির দুঃখ দূর হবে। শুনে তুমি খুশি হচ্ছো না বরুত্রী?

বরুত্রী তার মাথার জ্বালা দূর করার জন্যই বোধহয় একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালো। মনের ভেতর একটা চরম ব্যর্থতার জ্বালার হলকা ছুটছিল। বরুত্রী বললো—বুঝেছি, তুমি সেপাই হতে চলেছ। এতদিনে মনের মত আদর্শ খুঁজে পেয়েছ।

পুষ্কর—তুমি রাগ করছো। মস্ত ভুল করছো বরুত্রী। আর দুটি মাস মাত্র এখানে আছি। আর্যসমাজের শাস্ত্রী মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক করে এসেছি।

বরুত্রী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছিল। মেরিন-লাইন স্টেশনে একটা লোকাল ট্রেন আসবার সিগন্যাল পড়েছে। বরুত্রী খোঁপাটা এঁটে নিয়ে তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে গেল। পুষ্কর একা বসে রইল অনেকক্ষণ। কী রকম একটা বিশ্বাস ছিল, বরুত্রী একটু শান্ত হয়েই আবার ফিরে আসবে। এসেই আবার ডাকবে। এর আগে কতবার তো এমনি করে ডেকেছে।

কঠিন ধৈর্যে দিন গুনে গুনে দুটো মাস প্রায় শেষ হতে চললো। পুষ্কর এসে বললো—আমার সময় হয়ে এল বরুত্রী।

বরুত্রী—তুমি যেতে পারবে না।

পুষ্কর—কেন?

—তোমাকে হরিজন স্কুলে কাজ করতে হবে।

—আমি বলছি, তোমাকে স্কুল ছাড়তে হবে।

—অসম্ভব। আমার জীবনের একটা তৃপ্তি আমি মিথ্যে করে দিতে পারি না। স্কুলের মেয়েদের ছাড়া পৃথিবীর কোনো আলমোড়ার বাংলো আমার ভালো লাগবে না।

—চিনতে পারলাম তোমাকে। আমি এবার বিদায় হই।

—ভুলে যাচ্ছ পুষ্কর, তোমার চলে যাবার অধিকার নেই। মনে করে দেখ, শিগগিরই কে আসবে আমার কাছে। সে যখন আসবে, তার ভার নেবে কে?

—ভয় দেখিও না বরুত্রী। তুমিই তো তাকে তোমার হরিঘোষের গোয়ালের একটা পশু করে রাখতে চাও। আমি চাইছিলাম তাকে মানুষের ঘরে তুলে নিয়ে যেতে।

পুষ্কর তার সকল ব্যর্থ আগ্রহের জ্বালা সংবরণ করে শেষে মিনতি করে—তুমি এসব ছেড়ে আমার সঙ্গে চলে এস, বোকামি করো না, বরুত্রী লক্ষ্মী...

বরুত্রী বললো—না, পারবো না।

পুষ্কর—আচ্ছা, যাই।

জামিনে ছাড়া পেয়ে য়েরোড়া জেলহাজত থেকে একবার বোম্বাই আসতে হলো ত্রিপাঠীকে। স্কুলঘরের টিনের দরজায় টোকা দিয়ে ডাকলো—বরুত্রী!

সাড়া না পেয়ে আবার ডাকলো—পুষ্করবাবু!

দরজা খুলে গেল। ত্রিপাঠী হাসিখুশির ফোয়ারার মত ঘরে ঢুকেই বরুত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো—কী সৌভাগ্যবতী? কী খবর তোমাদের বল। পুষ্করবাবু কোথায়?

বরুত্রী—আলমোড়া গিয়েছেন। ভাল সরকারী চাকরি পেয়েছেন।

ত্রিপাঠীর চোখে পড়লো, বরুত্রীর চোখ মুখ ফোলা ফোলা। গলার স্বর ভাঙা ভাঙা। একটা কান্নার বর্ষা যেন শরীরের ওপর দিয়ে পার হয়ে গেছে। ছেলেমানুষের মত দুরন্ত কৌতূহল আর দরদ নিয়ে ত্রিপাঠী বরুত্রীর কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ায়—সব খুলে বল বরুত্রী। কিছু লুকোতে পারবে না আমার কাছে। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

বরুত্রী সব দ্বিধাসঙ্কোচ দূরে ঠেলে ফেলে প্রস্তুত হয়ে নেয়। আজ যেন তার মানত শেষ হবার দিন। বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সব প্রমাদ পতনের স্বীকৃতি শুনিয়ে যাবে।

কাহিনী শেষ করতে বরুত্রীর মাত্র দশটি মিনিট সময় লাগলো। ত্রিপাঠীর মুগ্ধ মুখের দীপ্তি ধীরে ধীরে রঙীন হয়ে উঠতে থাকে।

বরুত্রী বলে—পুষ্কর আমার মনের একটি সত্যি কথা জানতে পারলো না—তাকে আমি আজ শ্রদ্ধা করি। সে সাহসী ও শক্ত মানুষ; তার আদর্শে সে ঠিক আছে। আমিই তাকে ভুল বুঝেছিলাম।

ছোট ছোট নিরভিমান ঢেউয়ের মত বরুত্রীর কথাগুলি যেন একটি সমাপ্তির কিনারায় এসে ভেঙে পড়ছে। ত্রিপাঠী চঞ্চল হয়ে উঠলো। তাকিয়ে রইল বরুত্রীর মুখের দিকে। পাথর ছড়ানো কাজের পথে এতদিনে যেন একটি স্ফটিক আবিষ্কার করেছে ত্রিপাঠী। দুরন্ত লোভীর মত দৃষ্টিটা চক্‌চক্‌ করছিল ত্রিপাঠীর।

বরুত্রী—যাবার আগে গুরুনিন্দা আর করবো না, তাই আর একটি কথা আমার বলা হলো না। শুধু অপেক্ষায় ছিলাম, এইবার আমাকে বিদায় দেবার ব্যবস্থা করুন। স্কুলের জন্য অন্য লোক দেখুন।

ত্রিপাঠী—কেন?

বরুত্রী—বলেছি তো আমার জীবনে দুর্নামের দাগ লেগেছে। স্কুলের সম্মান আগে বাঁচাতে হবে।

ত্রিপাঠী—হ্যাঁ, বাঁচাতে হবে। আমি আর তুমি দুজনে মিলে বাঁচাবো।

বরুত্রী—দুজনে মিলে?

ত্রিপাঠী—হ্যাঁ গো সাহেবা। আমি মহাপুরুষ নই। আমি কাজের মানুষ। দুজনে মিলে কাজ করতে জানি।

উতলা আকাঙ্ক্ষার দুটি পুরুষবাহু বরুত্রীকে চকিতে বুকের উপর টেনে নিয়ে সাপটে ধরলো। বরুত্রী যেন আনন্দে ফুঁপিয়ে উঠলো—এ কী করছো, দেবল?

ত্রিপাঠী—তোমাদের দুজনকে চুমো খাচ্ছি।

হেঁয়ালির মত শোনালো। বরুত্রী জিজ্ঞেস করলো—দুজনকে? তার মানে? শীগ্‌গির বল দেবল, আমার ভয় করছে।

ত্রিপাঠী—হ্যাঁ, দুজনকে, তোমাকে আর...

বরুত্রী—আর কাকে?

ত্রিপাঠী—আমার ছেলেকে।

স্বর্গ হতে বিদায়

যদি এখান থেকে কেউ একজন আজ ধানবাদের হীরাপুরে গিয়ে প্রশান্ত রায়ের বাড়িটার দিকে তাকায়, তবে সে নিশ্চয় খুব আশ্চর্য হবে। ওই বাড়িটা কিন্তু এই আশ্চর্যের আসল কারণ নয়। ওরকম শৌখীন ও সুন্দর চেহারার বাড়ি এখানে দমদমের এই মোতিঝিলেও অনেক আছে। আশ্চর্য হবার আসল কারণ হলো, অরুণা।

আশ্চর্য হবারই কথা। দমদমের মোতিঝিলের একটা ছন্নছাড়া পাড়ার একটা সরু ও ময়লা চেহারার সড়কের পাশে নিতান্ত দীনহীন একটা চল্লিশ টাকার ভাড়াবাড়িতে যিনি থাকেন, সেই হিতেশবাবু নামে সামান্য এক কেরানী-বাপের মেয়ে অরুণা হীরাপুরের ওই বাড়িতে চিরকালের জীবনের ঠাঁই পেয়ে গিয়েছে। প্রশান্ত রায়ের স্ত্রী অরুণা। সেই প্রশান্ত রায়, ধানবাদের এদিকে আর ওদিকে যাঁর চারটি কোলিয়ারি আছে।

প্রশান্ত রায়ের এই বাড়ির গ্যারেজে তিনটে গাড়ি। বাড়ির চারদিকে পাম, ভিতরের লনের চারদিকে ঝাউ। এ বাড়ির বারান্দার দেয়ালের কলিং-বেলের বোতাম টিপলে চমৎকার সেতারের ঝংকারের মত একটা সুরেলা শব্দ বেজে ওঠে, সে শব্দে ওই শান্ত ও নীরব বাড়ির সব বাতাসও যেন ঝংকার দিয়ে হেসে ওঠে।

অরুণাকে দেখা যায়, সকালবেলায় বাড়ির পেছনের দিকের আর বিকালবেলায় সামনের দিকের লনের সবুজ ঘাসের উপর লালরঙা বেতের চেয়ারের ওপর চুপ করে বসে আছে। প্রশান্ত রায়ের এই বাড়ির নতুন একটি শোভা এই অরুণা। বর্ষার সকালে ও বিকালে, লনের চারদিকের ঝাউয়ের মাথার উপর যখন ঝুরু-ঝুরু বৃষ্টি ঝরে পড়ে, দূরের পাহাড়ের মাথার উপর কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের ঝিলিক ছটফটিয়ে ওঠে, আর বাগানের ভেজা গোলাপের গন্ধে বাতাস ভরে যায়, তখন দেখা যায়, উপরতলার একটি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে অরুণা।

কেউ কি কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করতে পেরেছিল যে, প্রশান্ত রায়ের মত মানুষের সঙ্গে অরুণার মত মেয়ের বিয়ে হতে পারে? না, কেউ কল্পনা করেনি, কেউ ভাবতেও পারেনি যে, একালের একটা ফাল্গুন মাসে সত্যিই সেকালের রূপকথার একটা গল্প একেবারে শাঁখ-সানাই বাজিয়ে আর উৎসব করে মানুষের জীবনের সত্য হয়ে উঠতে পারে। প্রশান্ত রায় এম-এ পাস করবার পর একটা বছর ইওরোপে ঘুরে বেড়িয়েছিল। আর, অরুণা পাটনাতে ওর মামার বাড়িতে থেকে তিনটি বছর পড়াশুনা করে, আর ক্লাস নাইন থেকে ক্লাস টেনে উঠতে না পেরে আবার মোতিঝিলের বাড়িতে ফিরে এসেছিল। প্রশান্ত রায়ের এই বাড়ির গ্যারেজের ঘরের জানালাতেও সিল্কের পর্দা। আর অরুণা তার জীবনে প্রথম যেদিন সিল্কের শাড়ি পরেছে, সেটা হলো বিয়ের দিন। ঠিক দিন নয়, রাত্রি। ফাল্গুন মাসের সুন্দর একটি রাত্রি। সে রাত্রে মোতিঝিলের সরকারবাবুদের বাগানে একটা কোকিল কী অদ্ভুত মিষ্টি স্বরে ডেকে ডেকে সকলকে আশ্চর্য করে দিয়েছিল।

ঘটনাটা যেন হঠাৎ মেঘ-ভাঙা চাঁদের আলোর ঝলকের মত একটা ব্যাপার। গরীব বাপ-মা ভেবে ভেবে কোন উপায়ই খুঁজে পাচ্ছেন না, কী করে মেয়ের বিয়ে হবে? কিন্তু কী আশ্চর্য, হিতেশবাবুর পিসতুতো দাদা রাজেনবাবুর বাড়িতে অরুণাকে দেখতে পেয়ে প্রশান্ত কী যে স্বপ্ন দেখে ফেললো, কে জানে। হিতেশবাবুর ওই রাজেনদার কাছে লজ্জিতভাবে হেসে হেসে প্রশান্ত নিজেই কথাটা বলেছিল—আপনারা থাকতে আজও আমার বিয়ে হলো না, এটা কী ব্যাপার ছোটকাকা?

রাজেনবাবুর জ্ঞাতি-ভাই মাধব রায়ের ছেলে প্রশান্ত। কলকাতার অ্যাডভোকেট রাজেনবাবুরও ঝরিয়ার প্রায় দশটা কোলিয়ারির শেয়ার আছে। মাধব রায় আজ আর নেই; মাধবের স্ত্রী শান্তিলতাও নেই। বাপের এক ছেলে প্রশান্ত আজ এত সম্পত্তির স্বত্ব নিয়েও, বয়সে আর শিক্ষায় এত যোগ্য হয়েও হীরাপুরের ওই সুন্দর প্রকাণ্ড বাড়িতে নিতান্ত একলা হয়ে পড়ে আছে, এটা রাজেনবাবুর জানা ছিল না। মাধব রায় মারা যাবার পর এই সাত বছরের মধ্যেও প্রশান্ত রায়ের জীবনের কোন খবর জানতে পারেননি রাজেনবাবু। জানবার তেমন কোন দায়িত্বও ছিল না। খুবই দূর-সম্পর্কের; নিতান্ত জ্ঞাতিভাই সম্পর্কের মাধব রায়ের সঙ্গে আট বছর আগে আসানসোলের স্টেশনে একবার দেখা হয়েছিল, জানা-শোনার ইতিহাস সেখানেই শেষ।

বলেছিল প্রশান্ত—আমাকে দেখে আপনি যা মনে করছেন, আমি কিন্তু তা নই, ছোটকাকা। আমি সাহেবী মেজাজের মানুষ নই, নিজেকে একটা কোল-কিং বলেও মনে করি না।

রাজেনবাবু হাসেন—সে তো খুব ভাল কথা।

প্রশান্ত—হ্যাঁ ছোটকাকা; এমন কি বি-এ এম-এ পাস-টাশের ওপরেও আমার কোন শ্রদ্ধা নেই।

রাজেনবাবু—কিন্তু তাই বলে তো তুমি নিতান্ত স্কুলে-পড়া একটা যেমন-তেমন মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না। অথচ...

প্রশান্ত—খুব পারি। আমার ইচ্ছাও তাই।

রাজেনবাবু—কিন্তু খুব গরীবঘরের মেয়ে হলে তো চলবে না।

প্রশান্ত—খুব চলবে।

শুনে একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন রাজেনবাবু—আমি সত্যিই তোমাকে দেখে বুঝতে পারিনি প্রশান্ত, সত্যিই যে তুমি একটা লিবারাল মন নিয়ে...

বাধা দেয় প্রশান্ত—লিবারাল নয় ছোটকাকা; বলুন, খাঁটি অর্থোডক্স মন।

রাজেনবাবু—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই না হয় হলো। সেটাও তো বেশ একটু আশ্চর্যের ব্যাপার।

রাজেনবাবুর স্ত্রী মহামায়া খুব খুশি হয়ে তখনই চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—তবে তো অরুণার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হতে পারে।

প্রশান্ত—নিশ্চয় হতে পারে, আমার কোন আপত্তি নেই ছোটকাকিমা।

ছোটকাকিমার কাছেই সব শুনতে পেল প্রশান্ত। গরীবের মেয়ে অরুণা। বিদ্যে ক্লাস নাইন পর্যন্ত। কোনরকম স্টাইল-ফাইল জানেও না, বোঝেও না। তার উপর যেমন মুখচোরা, তেমনই লাজুক। অরুণার মা সুনন্দা যখন অকারণে, একেবারে মিছিমিছি, এই এত-লাজুক মেয়েটাকে বেহায়া বলে ধমক দেয়, তখনও ওই মেয়ে শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আর চোখ মোছে। দুঃখকষ্ট কত হাসিমুখে সহ্য করতে পারে মেয়েটা। পুজোর সময় নিজেই হেসে হেসে হিতেশকে বলে—আমার জন্য শাড়ি কেনবার কোন দরকার নেই বাবা। শুধু মণ্টু আর ছায়ার শাড়ি হলেই হবে।

সত্যিই তো, একটা বাইশ বছর বয়সের মেয়ে, দেকতে এত ভাল, সেই মেয়ে একটা ছাপা শাড়ির তিনটে ছেঁড়া সেলাই করে আর সেই শাড়ি পরেই বিজয়া দশমীর দিনে জেঠাইমা মহামায়াকে প্রণাম করতে আসে। দুঃখকষ্ট সহ্য করবার অদ্ভুত শক্তিও আছে এই মেয়ের মনে। তা না হলে....

মহামায়া বলেন—তুমি যদি সত্যিই রাজী থাক প্রশান্ত, তবে আমি চেষ্টা করে এই ফাল্গুন মাসেই...

প্রশান্ত বলে—তাই করুন, ছোটকাকিমা।

হিতেশবাবু আর তাঁর স্ত্রী সুনন্দা তো বিশ্বাসই করতে পারেননি, বরং একটা সন্দেহ করে মনে মনে বেশ কষ্ট পেয়েছিলেন, ঠাট্টা করছেন মায়াদি।

মহামায়া রাগ করে বলেছিলেন—এই তো তোমাদের দোষ। তোমরা একটা সৌভাগ্যকে চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পার না, এমনই তোমাদের মনের ছিরি।

এই ভর্ৎসনা যেন মোতিঝিলের ওই ক্ষুদ্র বাড়িটার অবিশ্বাসে ভরা একটা ক্ষুদ্র জীবনের উপর একটা ধিক্কার। চমকে উঠলেন হিতেশবাবু, চমকে উঠলেন সুনন্দা। বিশ্বাসও করলেন, কারণ প্রশান্তের লেখা একটা চিঠিকে দুজনের চোখের সামনে রেখে সব কথা পড়ে শোনালেন মহামায়া—আমি তৈরি হয়েই আছি, ছোটকাকিমা। আপনি শুধু দিনটা আমাকে জানিয়ে দিন। ...না, ফোটো চাই না! নিজের চোখেই যখন দেখেছি, তখন আর ফোটোর দরকার কি?

চুপ চুপ চুপ। হিতেশবাবু আর সুনন্দা, দুজনেই এই সৌভাগ্যের বার্তাটিকে সবরকম মুখরতার ভয় থেকে গোপন করে রাখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যেন কেউ জানতে না পায়; এমন কি এত কাছের ওই সরকার বাড়ির গিন্নীও জানতে না পারেন, যদিও তিনি অরুণাকে খুবই ভালবাসেন। অরুণার বিয়ের জন্যেও খুব চিন্তা করেন। এই সেদিনও এসে বলে গিয়েছেন, তোমরা রাজী হও তো বল। আমার মনে হয়, বিনয়ও রাজী আছে।

এটা কিন্তু একেবারে অজানিত একটা নতুন কথা বলেননি সরকার-গিন্নী। হিতেশবাবু আর সুনন্দা, দুজনের কারও বুঝতে বাকি নেই যে, বিনয় রাজী আছে। কিন্তু... ভাবতে সত্যিই একটু খারাপ লাগে, অরুণা কি এমনই একটা অপাত্রী মেয়ে যে বিনয়ের মত একজন স্কুল-মাস্টার ছাড়া আর কেউ ওকে আপন করে নেবার মত একটা মেয়ে বলে মনে করতে পারবে না? কিন্তু সত্যিই যে পাওয়া গেল না। কত চেষ্টা করা হলো, কত সন্ধান নেওয়া হলো, কত লেখালেখি আর যাওয়া-আসা করা হলো, কিন্তু শুধু মেয়ের সুন্দর মুখ দেখে খুশি হয়ে, আর কোন রকম দাবি-দাওয়া না করে বিয়ে করতে রাজী হয়ে যাবে, এমন একটি পাত্রও পাওয়া গেল না। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে রাজী হবার মত পাত্রের সন্ধান পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তারা কি সত্যিই পাত্র? গরীবের মেয়ে বলেই কি অরুণাকে ওই অদ্ভুত চেহারার বিপত্নীক ভদ্রলোক নরেশ মজুমদারের মত একজন সাব-ওভারশিয়ারের স্ত্রী হতে হবে? তার তুলনায় বিনয় মন্দ কিসের?...প্রশ্নটা হলো বিনয়ের চেয়ে ভাল পাত্র পাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব?

বিনয় তো আছেই। এ সত্য জানেন হিতেশবাবু, জানেন সুনন্দা। বিনয় এ-বাড়িতে প্রায়ই আসে। অরুণার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথাও বলে বিনয়, যদিও মন্টু আর ছায়ার সঙ্গে স্কুলের গল্পই বেশি করে বলে আর হাসে বিনয়। এ-বাড়ির সঙ্গে বিনয়ের একটা কুটুম্বিতার সম্পর্কও আছে। বিনয় হলো সুনন্দার এক জেঠতুতো দাদার শালার ছেলে। বিধবা চারুদির বড় ছেলে। চারুদির আর তিনটে ছেলে বয়সে এখনও বেশ ছোট। সরকার-গিন্নীই বলেছেন, বিনয়ের মা চারুদি একবার তাঁর কাছে পঞ্চাশটা টাকা ধার নিয়ে গিয়েছেন। ছেলের পরীক্ষার ফী জমা দিতে হবে, কিছু টাকার দরকার হয়েছিল চারুদির। বিনয়ের যা রোজগার, তাতে তো সব দিকের দাবি মিটতে পারে না, ধার করতেই হয়।

নিজের কানেই শুনেছেন সুনন্দা, একদিন এখানে এসে অরুণাকে চোখে পড়তেই চেঁচিয়ে হেসে উঠেছিল বিনয়—কী? তুমি হঠাৎ এত রোগা হয়ে গেলে কেন?

অরুণা—বাঃ, খুব বললেন! সাবিত্রী এই মাত্র বলে গেল, আমি এই এক মাসের মধ্যে কী ভয়ানক মুটিয়ে উঠেছি। আর আপনি বলছেন...

না, এর চেয়ে বেশি কোন কথা, কিংবা এ-ধরনের ছাড়া অন্য কোন ধরনের কথা বলে না বিনয়। কিন্তু একদিন, সেদিন যখন সরকারবাবুদের বাগানে পুজোর বোধনের ঢাক আর কাঁসর বেশ মত্ত হয়ে বাজতে শুরু করেছে, তখন এ-বাড়ির সামনের রাস্তার এদিকে বিনয় আর অরুণা

দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। বিনয় তাকিয়েছিল সরকার বাবুদের বাগানের আমগাছের দিকে আর অরুণা তাকিয়েছিল অন্যদিকে, সন্তুদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা রিক্সার দিকে। বুঝতে পেরেছিলেন সুনন্দা, ওরা শুধু কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কোন কথা বলছে না। কিন্তু, কী আশ্চর্য, এ-রকম পনেরো-বিশ মিনিট ধরে দুজনে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থেকে কেউ একটা কথাও বলে না, কেউ কারও মুখের দিকে তাকায়ও না। এ কী ব্যাপার! অরুণা কি তবে শুনতে পেয়েছে, সরকারগিন্নী এসে বিনয়ের নাম ধরে যে সব কথা বলেন? শুনে বোধহয় খুশি হয়নি মেয়েটা! অরুণার মনের ভিতর বোধহয় একটা অভিমান মুখভার করে রয়েছে, বিনয় ছাড়া কি আর-কোন আর একটু ভাল পাত্র নেই?

বিয়ের দিনেও পাড়ার মানুষ বুঝতে পারেনি, কার সঙ্গে অরুণার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সাত দিন পরে অনেক খবর শুনেও পাড়ার মানুষ বিশ্বাস করতে পারেনি যে, সত্যিই এমন অঘটনও ঘটতে পারে। কিন্তু এক মাস পরে নিত্যবাবু যেদিন ধানবাদ থেকে ফিরে এসে সরকার বাবুদের বাড়ির বৈঠকে তাঁর চোখে দেখা অভিজ্ঞতার রিপোর্ট দিলেন, সেদিন পাড়ার মানুষেরা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল, সত্যিই রূপকথা; এক রাজার কুমার এসে এক বনবালা মেয়েকে বিয়ে করে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছে।

বনবালার দুই চোখ কিন্তু তার ওই বুনোঘরের দুয়ার পার হয়ে গাড়িতে চড়বার সময় কান্নার জলে ভেসে গিয়েছিল। কাঁদবেই তো; শকুন্তলাও কেঁদেছিল। হোক বরের বাড়ি রাজপ্রাসাদ, কিন্তু বাপের বাড়ির ভাঙা বেড়াটির মায়াও যে তার চেয়ে অনেক মিষ্টি। গাড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে বিনয় কিন্তু হেসে উঠেছিল—এ কী? কান্নাটান্না আবার কেন? কোন মানে হয় না।

হেসে ফেলে অরুণা! রুমাল দিয়ে চোখদুটো মুছে নিয়েই সবার দিকে তাকায়।

হিতেশবাবু হাসেন—পাগলা মেয়ে। সুনন্দা হাসেন—বোকা মেয়ে। অরুণাকে নিয়ে চলে যাবার আগে গাড়িটাও যেন হর্ন বাজিয়ে হেসে উঠল!

২

আজকাল হীরাপুরের বাড়িতে লনের সবুজ ঘাসের উপর লালরঙা বেতের চেয়ারে চুপ করে বসে থাকে যে অরুণা, সে অরুণা কিন্তু সেদিন, যেদিন প্রথম এই বাড়িতে এসে উঠেছিল, দোতলার ঘরে এই জানালার কাছে প্রশান্তর পাশে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। দূরের পাহাড়ের আর আকাশের দিকেও তাকিয়েছিল। আর, তার চেয়ে বেশি, বার বার অনেক বার প্রশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। অরুণার মুখের সেই হাসি, সত্যি একটি সুখী শোভার হাসি। আশ্চর্য হয়ে-যাওয়া একটা তৃপ্তির হাসি। এই মানুষটি, প্রশান্ত যার নাম, সে আজ অরুণার স্বামী; ভাবতে গিয়ে অরুণার শুধু বার বার একটি কথাই মনে হয়েছিল, ঠিক কথা, ছায়া যে-গানটা খুব মিষ্টি করে গাইতে পারে, সেটা খুবই সত্যি কথার একটা গান। ছেঁড়া আঁচল ভরে দিলে এমন দানে দানে। ভাগ্য যাকে ভালবাসে, তাকে ঠিক এই রকমের উপহার দেয়।

—সামনে ওটা কাদের বাড়ি? অরুণার প্রশ্ন শুনে সামনের বাড়িটার দিকে তাকায় প্রশান্ত। জবাবও দেয়—ওটা ইঞ্জিনিয়র মুখার্জীবাবুর বাড়ি।

অরুণা—ওই যে বারান্দার একেবারে ওদিকে চুপ করে বসে আছেন ভদ্রলোক, উনিই কি...

প্রশান্ত—হ্যাঁ, উনিই মুখার্জী।

অরুণা—কিন্তু...

প্রশান্ত--কি?

অরুণা—ভদ্রলোক ওরকম ভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? কী দেখছেন ভদ্রলোক?

হেসে ফেলে প্রশান্ত—এখনও দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু এইবার দেখতে পাবেন। সময় হয়ে এল।...হ্যাঁ, ওই যে, এসেই গিয়েছে।

এসেছে একটা ট্যাক্সি। সড়কের ধুলো উড়িয়ে আর ছুটে সে ট্যাক্সিটা ঠিক মুখার্জী বাড়ির ফটকের সামনে এসে থেমে যায় আর হর্ন বাজায়। ট্যাক্সির ভিতরে বসা এক ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বার বার তাঁর হাত-ঘড়িটার দিকে তাকাতে থাকেন।

মুখার্জীর সেই বাড়ির একটি ঘরের পর্দা সরিয়ে বাইরে বের হয়ে এলেন এক মহিলা।

প্রশান্ত বলে---ইনি ওই মুখার্জীর স্ত্রী, শ্রীযুক্তা লতিকা মুখোপাধ্যায়।

অরুণা যেন অদ্ভুত এক খুশির আবেগে ছটফট করে হাসে। —ঠিক আমাদের পাটনার সরযূ দিদিমণির মতো, ঠিক সেইরকম টানা-টানা চোখ। কিন্তু...

অরুণার মুখের ছটফটে হাসিটা হঠাৎ করুণ হয়ে যায়। কিন্তু এই লতিকাদির মুখটা এত গম্ভীর কেন? আর চোখ দুটোই বা ওরকম করে দপদপে বাতির আলোর মতো হঠাৎ এক একবার জ্বলে উঠছে কেন?

আধ-ময়লা একটা হলদে রঙের ধনেখালি পরেছেন লতিকাদি, আঁচলটার এক জায়গাতে মস্ত বড় একটা ছেঁড়া। কী আশ্চর্য, এলোমেলো করে একটা খোঁপাও বাঁধেননি লতিকাদি, চুলের রাশ ঘাড়ে-পিঠে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে যেন একটা ঝড়ের শব্দ শুনে ব্যস্ত হয়ে ঘরের বাইরে ছুটে এসেছেন। যেমন গলাটা, তেমনই হাত দুটোও একেবারে খালি। হাতে সামান্য ছোট্ট একটা ব্যাগও নেই। যেন ইচ্ছে করে অদ্ভুত এক শূন্যতার মূর্তি হয়ে কোথাও চলে যাচ্ছেন লতিকাদি।

ঠিকই, মুখার্জীর বাড়ির ফটক পার হয়ে আর সড়কের উপরে উঠেই গাড়ির দিকে তাকালেন লতিকা। গাড়ির ভিতরে বসে থাকা ভদ্রলোকের দিকে চোখ পড়তেই লতিকার জলভরা চোখ দুটো একেবারে স্নিগ্ধ হয়ে হেসে উঠল। তার পর আর এক মুহূর্তও দেরি করলেন না লতিকা! গাড়িতে উঠলেন। ছুটে চলে গেল গাড়ি।

প্রশান্ত হাসে---কিছু বুঝতে পারলে, অরুণা?

অরুণা—না।

প্রশান্ত—কিন্তু একটু আশ্চর্য হয়েছ বোধহয়?

অরুণা—হ্যাঁ। যাবার সময় মুখার্জীবাবুর সঙ্গে একটা কথাও বললেন না লতিকাদি। একবার মুখার্জীবাবুর দিকে তাকিয়েও দেখলেন না। এ কী অদ্ভুত কাণ্ড।

প্রশান্ত—অদ্ভুত নয়। যা হবার ছিল, যা হওয়া উচিত ছিল, তাই হয়েছে।

ভয় পেয়ে চমকে ওঠে অরুণা—কী হয়েছে?

প্রশান্ত—এই লতিকা আর এই বাড়িতে ফিরে আসবেন না।

অরুণা—তার মানে?

প্রশান্ত—তার মানে, ওই লতিকাদেবী আর এই মুখার্জীবাবুর কাছে ফিরে আসবেন না।

অরুণা---কিন্তু মুখার্জীবাবু যে লতিকাদির স্বামী। লতিকাদি আর ফিরে আসবেন না কেন?

প্রশান্ত---এমন স্বামীর কাছে কোন স্ত্রীর ফিরে না আসাই ভাল।

অরুণা—মুখার্জীবাবু কি খুব খারাপ রকমের মানুষ?

প্রশান্ত—নিশ্চয়। ভদ্রলোকের একটা কুৎসিত রোগ আছে। অনেক দিনের রোগ।

অরুণা—কুষ্ঠরোগ?

প্রশান্ত—প্রায় ওই রকমেরই। কাজেই লতিকারও যা করা উচিত ছিল, তাই...।

চেঁচিয়ে ওঠে অরুণা—ছি-ছি, লতিকাদির একটুও উচিত হয়নি। স্বামীর একটা ব্যাধি আছে বলেই তাকে ছেড়ে চলে যাবে স্ত্রী, বাঃ, একেবারে একটা ইয়ে, মেয়েমানুষের প্রাণ নয়।

প্রশান্তর চোখ-মুখ অদ্ভুত এক খুশির উচ্ছ্বাসে হেসে ওঠে। —সবাই তোমার মত প্রাণের মেয়ে নয়।

প্রশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণার চোখের চাহনি আরও নিবিড় হয়ে যায়। প্রশান্তর গা ঘেঁষে দাঁড়ায় অরুণা।

প্রশান্ত বলে—সেই জন্যেই তো তোমার মতো মেয়েকে বিয়ে করেছি।

মোতিঝিলের সামান্য কেরানীর মেয়ে অরুণার ভাগ্যটাকে যেন প্রশস্তির ভাষা শুনিয়ে হীরাপুরের আকাশ হাসছে! প্রশান্তর হাত ধরে অরুণা। আর ভাবতে গিয়ে আশ্চর্যও হয়, সত্যিই তো, এই হাত ধরতে একটুও ভয় করে না। কত ভালও লাগে। অথচ, বিয়ের আগে আবোল-তাবোল কত কী ছাই বাজে কথা ভেবে মনটা কত ভয়ই না পেয়েছিল।

প্রশান্ত বলে—আমি মুখার্জির মতো একটা বেকুব মানুষ নই, অরুণা। আমি জানি কোন ধরনের মেয়ে স্বামীর ঘরে থাকতে ভালবাসে। বেশি বুদ্ধির মেয়ের সঙ্গে কথা বলা চলে, কিন্তু ঘর করা চলে না। মুখার্জী ওই এম-এ পাস করা ভয়ানক ইন্টেলিজেন্ট মেয়ে লতিকাকে বিয়ে করেই ভুল করেছে। তা না হলে...আনমনার মতো কি যেন ভাবছ তুমি?

অরুণা—ভাবছি, লতিকাদি কতদিন আর ফিরে না এসে থাকতে পারবে?

হেসে ফেলে প্রশান্ত—চিরদিন। ওই যে গাড়ির ভিতরে বসেছিলেন এক ভদ্রলোক, মণিভূষণ যার নাম, যে লোকটা রেলওয়ের একটা গার্ড মাত্র, সে লোকটাই যে লতিকার...

অরুণা—ছি-ছি!

প্রশান্ত—ছি-ছি করবার মানে হয় না। ওই গার্ড লোকটা লতিকার জীবনের এককালের একটা বেশ ভাল রকমের চেনা মানুষ। কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার...

অরুণা—কি?

প্রশান্ত—মুখার্জীর সঙ্গে বিয়ের পাঁচ বছর পরে লতিকা আজ ঠিক সেই পুরনো প্রাণের বন্ধুটিকেই ডাক দিয়ে...

অরুণা রাগ করে—থাম তুমি।

প্রশান্ত—বিশ্বাস কর। লতিকা নিজেই চিঠি দিয়ে মণিভূষণকে ডেকেছে। তাই সে এসেছে। লোকটার প্রাণও যেন এই পাঁচ বছর ধরে উপোসী বাঘের মতো চুপ করে আড়ালে ওত পেতে বসেছিল। লতিকার সাড়া পেয়ে এক লাফে বের হয়ে এসেছে।

অরুণা—কিন্তু...

প্রশান্ত—না না, এর মধ্যে কোন কিন্তু-টিন্তু নেই, আমি সব খবর জানি। আর একটা বছর পরে কী ব্যাপার হবে, তাও জানি।

অরুণা চমকে ওঠে—অ্যাঁ? কি বললে, কি ব্যাপার হবে?

প্রশান্ত—মণিভূষণের সঙ্গে লতিকার বিয়ে হবে।

—এমন বিয়ে বিয়েই নয়। বলতে গিয়ে ঝক করে জ্বলে ওঠে অরুণার চোখের তারা। এই রকম একটা বিশ্রী ঘেন্নার গল্প না শুনলেই ভাল ছিল। লতিকাদির গায়ের ওই হলদে রঙের ধনেখালি শাড়িটা যেন একটা বিশ্রী ময়লা প্রাণের সাজ। চোখে না দেখতে পেলেই ভাল ছিল।

প্রশান্ত—বলে—আচ্ছা, আমি এখন একটু ঘুরে আসি।

অরুণা হাসে—এখনই যাবে?

প্রশান্ত—হ্যাঁ।

অরুণা—আমি যাব না?

প্রশান্ত আশ্চর্য হয়—তুমি? তুমি কোথায় যাবে?

অরুণা—তোমার সঙ্গে।

প্রশান্ত—আমি তো এখন বীরপুর কোলিয়ারির ক্লাবে যাব। ফিরতে একটু রাত হয়েও যেতে পারে।

অরুণা—কাজ আছে?

প্রশান্ত হাসে—আছে বইকি। টেবিল-টেনিস খেলাটাও আমার একটা কাজ।

অরুণা হাসতে চেষ্টা করে—কিন্তু আমি ততক্ষণ একা-একা কী করবো বল?

প্রশান্ত—গান কর।

অরুণা—আমি গান জানি না।

—বই পড়।

—বই পড়তে আমার ভাল লাগে না। তা ছাড়া, তোমার ওই সব ইংরেজী বই পড়ে আমি কিছু বুঝবোও না।

অরুণার মাথা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কথা বলে প্রশান্ত—তবে আরও সুন্দর করে সেজে লনের উপর একটা চেয়ার পেতে বসে থাক। লনের সবুজ ঘাসের উপর তোমাকে সত্যিই একটি জীবন্ত রঙীন গোলাপ বলে মনে হবে। ঠিক ওই রকম, ওই দেখ।

ঘরের দেয়ালের গায়ে একটি ছবিকে দেখিয়ে দেয় প্রশান্ত। একটি গোলাপের ছবি; গোলাপের রূপ যেন এক তরুণী নারীর মুখশোভার ছবি হয়ে ফুটে রয়েছে।

প্রশান্ত বলে—রোমে থাকবার সময় ওই ছবিটা আমি অনেক টাকা দিয়ে কিনেছিলাম।

হীরাপুরের বাড়ির জীবনের এই প্রথম দিনের যে বিস্ময় মোতিঝিলের মেয়ে অরুণার দুই চোখের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল, সে বিস্ময় আজও একটুও নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি, যদিও একটানা পুরো একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে তিনবার ধানবাদে এসেছেন মোতিঝিলের নিত্যবাবু, আর নিজের চোখেই দেখে গিয়েছে, হিতেশবাবুর মেয়ে অরুণা সত্যিই এই চমৎকার ঐশ্বর্যের বাড়িতে সবুজ ঘাসের লনের উপর লালরঙা বেতের চেয়ারে বসে থাকে। বেশ শান্ত হাসি-হাসি মুখ।

অরুণার মুখের ওই শান্ত সুখী হাসি দেখতে পেয়ে সবচেয়ে খুশি হয়েছে যে, সে ওই অরুণারই স্বামী প্রশান্ত। অরুণার মনে ও প্রাণে যেন কোন প্রশ্ন নেই। প্রশান্তর মতো স্বামীকে আর প্রশ্ন করে জানবারই বা কি আছে? যতক্ষণ বাড়িতে থাকে প্রশান্ত, ততক্ষণ অরুণাও যেন একটা তৃপ্ত জীবনের শোভা! প্রশান্ত না ডাকলেও কাছে এসে দাঁড়ায় অরুণা। প্রশান্ত যখন অরুণার একটা হাত ধরে, অরুণা তখন তার অন্য হাতটিকে প্রশান্তর হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। অরুণার চোখে কোন অভিমান প্রখর হয়ে ওঠে না, যদি অনেক রাতে বাড়ি ফিরে আসে প্রশান্ত। বিকাল হতেই হঠাৎ যখন ব্যস্ত হয়ে বাইরে যাবার সাজ পরতে থাকে প্রশান্ত, তখনও অরুণা আর জিজ্ঞাসা করে না, কোথায় যাবে?

হয়তো কোনদিন, যেদিন খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে, প্রায় দৌড়ে দৌড়ে গ্যারেজের দিকে ছুটে যায় প্রশান্ত, সেন্টের শিশিটা হাতে নিয়ে ব্যস্তভাবে বাইরে আসে। ডাক দেয়--তোমার রুমালটা দাও একবার।

থমকে দাঁড়ায়, ফিরে এসে অরুণার হাতের কাছে পকেটের রুমালটাকে এগিয়ে দেয় প্রশান্ত। কিন্তু হেসে ফেলে প্রশান্ত, আর বলেও ফেলে—তুমি এরকম দুষ্টুমি করো না, অরুণা।

অরুণা—কি করলাম?

প্রশান্ত হাসে—আমি কিন্তু খুব বোকামানুষ নই, অরুণা। সব বুঝতে পারি।

আশ্চর্য হয় অরুণা—কি বুঝলে?

প্রশান্ত—তুমি আমার দেরি করিয়ে দিতে চাও।

এরপর আর কোন কথা বলে না অরুণা। বুঝতে পারে, ঠিকই বলেছে প্রশান্ত। অরুণা যে সত্যিই চায়, আরও কিছুক্ষণ বাড়িতে থাকুক প্রশান্ত। এই তো সবেমাত্র বিকেল হয়েছে। ফিরবে তো সেই, কে জানে কখন, হয়তো মাঝরাতও পার হয়ে যাবার পর।

এক-একদিন বাইরে বের হয়ে যাবার আগে অরুণাকে একটা অনুরোধের কথা বলে যায় প্রশান্ত।—তুমিও বাইরে একটু-আধটু বেড়িয়ে এলে ভাল করতে অরুণা। ড্রাইভার রামকুমারকে বলো, যেন নতুন টুরারটা বের করে আর তোমাকে এদিক-ওদিক বেড়িয়ে নিয়ে আসে।

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে এক-একদিন রামকুমারকে ডাক দেয় অরুণা—চল, একবার ঘুরে আসি।

—কোথায় যাবেন?

অরুণা—ভাল চা কোথায় পাওয়া যাবে?

—ভবানী স্টোরে পাবেন।

শুধু মার্কেটের ভবানী স্টোরে নয়, এক-একদিন অনেক দূরে, গোবিন্দপুর পার হয়ে রায়গঞ্জ পর্যন্ত চলে গিয়েছে অরুণা। পরেশনাথের মাথার উপর বিকালের লালচে রোদের আভা কালো হয়ে ওঠবার আগেই হীরাপুরে ফিরে এসেছে।

এই হীরাপুরের এই বাড়ির নিকটের কোন বাড়ি থেকে, কিংবা কোন দূরের বাড়ি থেকে কোনদিন কেউ প্রশান্ত রায়ের স্ত্রী অরুণাকে একবার চোখে দেখে যাবার জন্যেও এল না; এটা নিশ্চয় খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। হীরাপুরে কি অরুণার মায়ের বয়সী কোন মহিলাও নেই? মোতিঝিলের সরকার-গিন্নীর মতো কোন প্রৌঢ়া নেই? অরুণার মতো বাইশ-তেইশ বছর বয়সের কোন মেয়েও নেই? নিশ্চয় আছে। তবু কেউ আসে না। আরও আশ্চর্যের কথা, সেজন্য অরুণা যেন একটুও আশ্চর্য বোধ করে না। কোনদিনও সামান্য একটু সন্দেহ নিয়ে প্রশান্তকে জিজ্ঞাসাও করে না, নয়নবাবুর মেয়েরা এই সড়ক দিয়ে যেতে যেতে এ-বাড়ির জানালার দিকে বার বার তাকায়, তবু একবারও আসে না কেন?

প্রশান্ত কিন্তু অরুণার এই শান্ত প্রসন্ন ও প্রশ্নহীন উদাস মনটাকে বুঝতে পেরে খুশি হয়েছে। প্রশান্ত নিজেই হেসে হেসে বলে—আমি যা আশা করেছিলাম অরুণা, তোমার কাছ থেকে ঠিক তাই পেয়েছি।

অরুণার দুই চোখের শান্ত হাসি-হাসি আভা যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রশান্ত বলে—আজ বাদে কাল, কাল বাদে পরশু, তার পরের দিনটা কিন্তু তোমাকে একটু বেশি একলা হয়ে থাকতে হবে। কাপুর সাহেবের ফ্যামিলির সঙ্গে একদিনের জন্য বেড়াতে বের হব। রাত্রিটাও বাইরে কেটে যাবে। কম দূর নয় তো সূর্যকুণ্ড। চমৎকার হট-স্প্রিং, কাছেই বেশ নিরিবিলি একটা ডাকবাংলো আছে।

ঠিকই, ঠিক পরশুদিনের পরের দিন, সকালবেলার রোদ যখন পামের মাথায় শিশির-ভেজা পাতার উপর পড়ে ঝিকমিক করে, তখন চটপট সাজ সেরে নিয়ে বের হয় প্রশান্ত, আর দেখতে পেয়ে বেশ একটু আশ্চর্য হয়, খুশিও হয় প্রশান্ত, এই সকালেই কী সুন্দর সাজ করে, আর চোখে-মুখে অদ্ভুত একটা ঝিকমিকে হাসি ফুটিয়ে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে অরুণা। রোজ যেমন, আজও তেমন, প্রশান্তের বাইরে বের হয়ে যাবার সময় যেন অরুণার প্রাত্যহিক জীবনের একটা উৎসবের লগ্ন। ঠিক এই সময়ে সবচেয়ে সুন্দর সাজ করে অরুণা। মোতিঝিলের কোরানী হিতেশবাবুর মেয়ে বটে, কিন্তু সাজ করবার কাজে এই মেয়েই যেন ঝিকমিকিয়ে রূপ ফুটিয়ে তোলবার একটি পাকা আর্টিস্ট।

না, কোন প্রশ্ন করবার জন্যে নয়, বাধা দেবার জন্যে নয়, অরুণা শুধু দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যেই এ রকম চমৎকার একটি মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

—চলি তবে। বলতে বলতে অরুণাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় প্রশান্ত। অরুণা তেমনই শান্ত ও অবিচলিত একটি মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মোতিঝিলের চিঠি আসে।—কবে আসবে? প্রশান্তকে একটু বুঝিয়ে বল, যেন তোমাকে অন্তত এক মাসের জন্য মোতিঝিলে থাকতে দিতে রাজী হয়। তোমার চিঠি পেলেই তোমাকে আনবার জন্য কাউকে পাঠিয়ে দেব।

জবাব দেয় অরুণা—যাবই তো, কিন্তু তোমরা এত তাড়াহুড়ো করো না।

মোতিঝিলের নিত্যবাবু আরও একবার ধানবাদে এসেছিলেন। হীরাপুরের এই বাড়ির সবুজ ঘাসের লনের দিকে একবার তাকিয়েও গিয়েছেন। কিন্তু এইবার তিনি অরুণাকে দেখতে পাননি। লনের উপর লাল-রঙা বেতের চেয়ার ছিল না, আর হিতেশ কেরানীর মেয়ে অরুণাও লনের এদিকে বা ওদিকে কোথাও ছিল না। দোতলার জানালার পর্দাটা হাওয়া লেগে ফুলে ফাঁক হয়ে রয়েছে। কিন্তু শুধু জানালাটাকে দেখে গিয়েছেন নিত্যবাবু, অরুণাকে দেখতে পাননি।

দেখতে না পাওয়ারই কথা। নিত্যবাবু জানেন না যে অরুণা আজকাল ঘরের ভিতরে থাকে। ড্রাইভার রাজকুমার নতুন টুবার বের করে অনেকবার বলেছে, হাওয়া খেতে যাবেন নাকি মা? যায়নি অরুণা, বাইরে বেড়াতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু, এতদিনের সেই অভ্যাসটাকে ছাড়তে পারেনি। প্রশান্ত যখন বাইরে বের হয়, ঠিক তখন, তার মানে ঠিক তার কিছুক্ষণ আগে, চমৎকার সাজ করে ও সুন্দর একটি রূপের মূর্তি হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে।

যাবার আগে অরুণাকে দেখতে পেয়ে প্রশান্তর চোখের বিস্ময় শুধু খুশি হয়, চমকে ওঠে না। আজ কিন্তু চমকে ওঠে প্রশান্ত। এ কী মূর্তি ধরেছে অরুণা! এ যে ঠিক একেবারে...

কথা বলতে গিয়ে প্রশান্তর গলার স্বরও যেন চমেক উঠে হেসে ফেলে। —এ কী অরুণা! তুমি হঠাৎ একেবারে নন্দা চৌধুরীর মতো ডবল বেণী দুলিয়ে দুই ভুরু আর চোখের পাতায় কালো পেন্ট করে...কী আশ্চর্য, তুমি কি ওই মহিলাকে কোনদিন দেখেছ?

অরুণা হাসে—দেখেছি। ভবানী স্টোরে চা কিনতে গিয়ে দেখেছি সেদিন। রাজকুমার বললে, ওই মিস সাহেব হলেন বীরপুর কোলিয়ারির সেই চৌধুরী সাহেবের মেয়ে।

চমকে ওঠবারই কথা। অরুণা যেন বর্ণে বর্ণে আর ছন্দে ছন্দে নন্দা চৌধুরীর সাজ আর প্রসাধনের নকল করেছে। খুব পাতলা শিফনের হালকা নীল রঙের শাড়ি পরে নন্দা। অরুণাও তাই পরেছে, আর ঠিক নন্দারই মতো শাড়ির আঁচলটা টেনে শক্ত করে কোমরের উপর এক পাক জড়িয়ে নিয়েছে।

কিন্তু অরুণার মুখের দিকে আর তাকায় না প্রশান্ত। হাতঘড়ির দিকে তাকায়। ব্যস্তভাবে চলেও যায়।

অরুণার এই ফ্যান্সি সাজ কি প্রশান্তর বাইরে যাবার পথ আটক করে প্রশান্তকে ঘরে ধরে রাখবার একটা করুণ আবেদন? না, তা মনে করে না প্রশান্ত। মনে করার কোন মানেও হয় না। কারণ দেখতেই পাচ্ছে প্রশান্ত, কত খুশি আর কত শান্ত হয়ে অরুণার চোখ মুখ হাসছে।

প্রশান্ত বলে—কিন্তু তোমার কি শুধু নন্দা চৌধুরীকেই চোখে পড়ল? পৃথিবীতে এত মেয়ে থাকতে তুমি বেছে বেছে শুধু নন্দার সাজটাই নকল করলে কেন?

অরুণা—নন্দা যে সত্যিই অদ্ভুত।

প্রশান্ত—তার মানে?

অরুণা—অদ্ভুত স্টাইল।

প্রশান্ত এইবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠে!—তাই বল! তোমারও তাহলে অদ্ভুত স্টাইল করবার শখ হয়েছে।

আবার একদিন, সেদিন সকালবেলাতেই বের হয়ে যাবার জন্যে যখন সাজ সেরে নিয়ে উপরতলা থেকে নেমে আসে প্রশান্ত, তখন দেখতে পায়, বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আছে অরুণা। দুই চোখ টান করে আর একটু বেশি আশ্চর্য হয়ে অরুণার দিকে তাকিয়ে থাকে প্রশান্ত।—এ কী? তুমি কি কোনদিন ওই মহিলাকেও দেখেছ, আমাদের কাপুর সাহেবের শ্যালিকা সোহিনীকে?

অরুণা হাসে—হ্যাঁ, রাজগঞ্জ থেকে বেড়িয়ে ফিরবার সময় দেখেছিলাম। টেনিস ব্যাট হাতে এক মহিলাকে দেখিয়ে দিয়ে রামকুমার বললে, উনিই হলেন কাপুর সাহেবের আগের মেমসাহেবের বোন।

—তাই বল। প্রশান্তর মনের বিস্ময়টা এইবার যেন হাঁফ ছেড়ে কথা বলে।

সত্যিই আশ্চর্য না হয়ে পারে না প্রশান্ত। ঠিক সোহিনী কাপুরের মতো গোলাপীরঙের চোলি পরেছে অরুণা; মাথার উপর চূড়ো করে খোঁপা বেঁধেছে, আর বেশ টকটকে লাল স্টিক বুলিয়ে ঠোঁট দুটোকেও রঙীন করেছে।

প্রশান্ত হাসে—তুমি কিন্তু সত্যিই আর্টিস্ট। তা না হলে এত চমৎকার একটা নকল...সত্যিই তোমাকে এখন হঠাৎ দেখলে সোহিনী বলে ভুল হতে পারে।

অরুণার চোখের পাতা একটুও কাঁপে না। রঙিন ঠোঁটের হাসিটা একটুও বিচলিত হয় না। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুধু দেখতে থাকে, গাড়ির সুইচের চাবি হাতে নিয়ে দোলাতে দোলাতে গ্যারেজের দিকে চলে গেল প্রশান্ত।

এইবার অরুণাও চলে যায়। বারান্দা থেকে সরে গিয়ে ঘরের ভিতরে, তারপর সিঁড়ি ধরে উঠে উপরতলার একটি ঘরের জানালার কাছে, যে জানলার কাছে দাঁড়ালে হীরাপুরের আকাশটাকে খুব ভাল করে দেখা যায়।

না, আজ আর ইচ্ছে করলেও দূরের ওই পাহাড়তলীর কাছে গিয়ে মাঠের উপর দাঁড়িয়ে আর খোলা আকাশের বাতাস বুকে ভরে নিয়ে ফিরে আসা যাবে না। রামকুমার নেই; কলকাতায় গিয়েছে ড্রাইভার রামকুমার, সঙ্গে তার বউকেও নিয়ে গিয়েছে। রামকুমারের খুড়ো মরেছে, খবর এসেছে।

কিন্তু কই, এখনও তো গাড়ির শব্দ শোনা গেল না। প্রশান্ত কি এখনও গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করেনি? গাড়ি বের করতে কি এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগে? আকাশের দিকে নয়, গ্যারেজের দিকে তাকায় অরুণা।

গ্যারেজের দরজা খোলা। তাই দেখা যায়, গাড়িটার সামনের কাঁচে বাইরের ঝাউয়ের ছোট্ট প্রতিচ্ছবি দুলছে। গ্যারেজের সামনে বা কাছে কেউ নেই। প্রশান্তও নেই।

হীরাপুরের এই বাড়ির আদুরে টেরিয়ার, যার নাম টমাস, সে-ই বা কোথায় গেল? কুকুরটা যে প্রশান্তরই সঙ্গী হয়ে রোজই একই গাড়িতে বাইরে বের হয়ে যায়। প্রশান্তর কাছ-ছাড়া হয়ে যে থাকতেই পারে না টেরিয়ার টমাস।

বাগানের একেবারে ওইদিকে যে দুটি ঘর, ড্রাইভার রামকুমারের সপরিবারে থাকবার ঘর। ঘরের টালির চালা থেকে একগাদা লতা যেন ছেঁড়া পর্দার মোটা সুতোর মতো ঝুলছে। রামকুমার ও তার বউ তো এখন কলকাতায়। কিন্তু ওই দুটি ঘরের কোন একটি ঘরে চামেলী নিশ্চয় আছে। রামকুমারের বড় ভাইয়ের বেটি চামেলী। মেজর গুপ্তের বাড়িতে আয়ার কাজ করে চামেলী। আজ তো রবিবার। হ্যাঁ, সপ্তাহে এক একটি দিন চামেলীকে কাজে বের হতে হয় না। তাই প্রায় সারাটা দিন ঘরে থেকেই গুন গুন করে গান গায়। ...কিন্তু, ও কি। কী আশ্চর্য, কুকুর টমাস চুপ করে ওই ঘরের বারান্দার উপর বসে আছে!

হীরাপুরের বাড়ির ঝাউয়ের মাথায় আবার সকালবেলার রোদ হাসে। দুপুরবেলার গরম বাতাসে আবার গোলাপের গায়ের বাষ্প গন্ধ ছড়ায়। বিকেলের আকাশে সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়। সন্ধ্যা হয়। দুটো-একটা জোনাকি উড়ে এসে লনের ঘাসের উপর বসে আর মিটমিট করে জ্বলে।

জানে না অরুণা, কুকুর টমাস কখন ফিরে এসেছে, আর অরুণারই ঘরের ভিতরে ঢুকে লুটোপুটি করে একটা ভিজে রুমালকে মুখে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। প্রশান্তও জানে না, অরুণা কতক্ষণ ধরে উপরতলার এই ঘরে বিছানার ওপর ওভাবে নিস্পন্দ-শরীর হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু সন্ধ্যা হয় যখন, প্রশান্ত যখন বাইরে যাবার সাজে সেজে নিয়ে আর খুব ব্যস্ত হয়ে নীচের তলায় নামে, তখন হঠাৎ চমকে ওঠে আর থমকে দাঁড়ায়। বারান্দার উপর অরুণা দাঁড়িয়ে আছে। অরুণার চোখ দুটো যেন ধিকধিক আলোর মতো জ্বলে জ্বলে হাসছে।

চেঁচিয়ে ওঠে প্রশান্ত—একি? তোমার আজ হঠাৎ একটা আয়ার মতো সাজ করবার শখ হল কেন? কী ভেবেছ তুমি? সত্যি করে বল।

আয়া চামেলী যেমন সাজ করে, ঠিক তেমনি সাজ। বেশ ঝলমলে রঙীন একটা সাটিনের শাড়ি পরেছে অরুণা। খোঁপাতে সাদা ফুলের মালা জড়িয়ে রয়েছে। গলাতে লাল-পাথরের একটা মালাও পরেছে। পাউডার ছিটিয়ে মুখটাকে একেবারে সাদা করে দিয়েছে অরুণা। আর, রেশমী জালির একটা ওড়নাকে এলোমেলো করে গায়ে জড়িয়ে রেখেছে।

প্রশান্ত—বলতেই হবে, তুমি আজ চামেলীর মতো সাজ আর চেহারা ধরলে কেন? এটাও কি সত্যিই একটা শখ?

অরুণা—ইচ্ছে।

প্রশান্ত—অদ্ভুত ইচ্ছে। যাক-গে, আমার এখন আর বেশি কথা বলবার সময় নেই। আমার বোধহয় আজ...হ্যাঁ, আজ আর বাড়ি ফিরে আসা সম্ভব হবে না। কাপুর সাহেবের ফ্যামিলির সঙ্গে পিকনিকে যাচ্ছি। কম দূর নয় তো হুডরু। ওই দেখ।

দেয়ালের গায়ে টাঙানো হুডরু ঝর্ণার ছবিটাকে দেখিয়ে দেয় প্রশান্ত।—দেখছো? সত্যিই খুব চমৎকার ঝর্ণা। নয় কি?

হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই ব্যস্তভাবে চলে যায় প্রশান্ত।

দুদিন পরে যখন হীরাপুরের বাড়িতে ফিরে এল প্রশান্ত, তখন মেঘে মেঘে বিকালের আকাশ ভরে গিয়েছে। এসে দেখতে পেয়েছে প্রশান্ত, একেবারে শান্ত ও নিশ্চিন্ত একটি প্রাণের ছবির মতো বিছানার ওপর ঘুমিয়ে পড়ে আছে অরুণা।

সন্ধ্যা হতেই সাজ সেরে নিয়ে আর গাড়ির সুইচের চাবিটাকে দোলাতে দোলাতে উপরতলা থেকে নীচে নেমে আসে প্রশান্ত।

চমকে ওঠে প্রশান্ত—এ কী, অরুণা?

প্রশান্তর মুখের আর চোখের হাসি আজ সত্যিই যেন ভয়ানক একটা আশ্চর্যের পাথরের উপর আছাড় খেয়ে পড়েছে। কিন্তু হাসতে চেষ্টা করে প্রশান্ত। —এ কী ব্যাপার, অরুণা? তুমি যে দেখছি, ঠিক সেই লতিকার মতো সাজ করেছো।

হ্যাঁ, ঠিক সেই লতিকাদির মতো আধময়লা একটা হলদে রঙের ধনেখালি পরেছে অরুণা। উসকো-খুসকো চুলের গোছা ঘাড়ে-পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। অরুণার চোখে ঠিক সেই লতিকার চোখের মতো একটা শান্ত দৃষ্টি। অরুণার মুখে কোন হাসির ছায়া নেই।

প্রশান্ত হাসে—হ্যাঁ, নকলটা খুবই নিখুঁত হয়েছে, অরুণা। কিন্তু এত ভয়ানক গম্ভীর হবার দরকার ছিল না।

—কেন? হীরাপুরের জীবনে এই প্রথম অরুণার মুখের প্রশ্ন এত তীব্র স্বরে বেজে ওঠে।

প্রশান্ত—আমি তো সত্যিই মুখার্জীর মতো একটা কুৎসিত ব্যাধির মানুষ নই। আমার ওপর রাগ করবার সাধ্যি তোমার নেই।

কথা বলে না অরুণা। চুপ করে ফটকের কাছে সড়কটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—কি? কথা বলছো না কেন? চেঁচিয়ে ওঠে প্রশান্ত।

জবাব দেয় না অরুণা। প্রশান্তর চোখের দৃষ্টিটা, সেই সঙ্গে মুখের ভাষাটাও যেন ছটফট করে। তুমি তো সত্যিই সেই লতিকার মতো...

একটা ট্যাক্সি ছুটে এসে ফটকের কাছে দাঁড়ায় আর হর্ন বাজায়। চমকে ওঠে প্রশান্ত—এ কী? ঠিক সেইরকম একটা ট্যাক্সিও ছুটে এসেছে দেখছি।

ট্যাক্সির ভেতরে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। ফটকের সামনেই ল্যাম্প পোস্ট, তাই আলোটা একেবারে ভদ্রলোকের মুখের ওপর পড়েছে।

হেসে উঠেছে অরুণার চোখ দুটোও; ওই আলো যেন অরুণার চোখের উপর পড়েছে।

আর এক মুহূর্ত দেরি করে না অরুণা। ফটকের সেই গাড়িটার দিকে চোখ রেখে এগিয়ে যেতে থাকে। চেঁচিয়ে ওঠে প্রশান্ত—তুমি কি সত্যিই ওই লোকটাকে, ওই বিনয়বাবুকে চিঠি দিয়েছিল?

জবাব দেয় না অরুণা। প্রশান্ত আবার চেঁচিয়ে ওঠে—কী আশ্চর্য, লতিকার সেই মণিভূষণের মতো ওই বিনয়বাবুও কি তোমার পুরনো চেনা মানুষ? তুমিও কি তবে...

অরুণা জবাব দেয় না। প্রশান্তও শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, গাড়িতে উঠে বসল অরুণা। বেশ জোরে হর্ন বাজিয়ে আর হু-হু করে ছুটে চলে গেল গাড়িটা।

সাধ না মিটিল

সারা মন-প্রাণ যখন খুশি হয়ে বিপুল তৃপ্তির হাসি হাসছে, তখন যদি কোন কান্নার শব্দ শুনতে হয়, তবে একটু বিরক্ত না হয়ে পারা যায় না।

কালীচরণও বিরক্ত না হয়ে পারে না। বস্তির ভিতরে ঢুকতেই যেন অনেকগুলি গলার করুণ স্বরে মেশানো একটা করুণ সোরগোল কালীচরণের কান ছুঁয়ে ছুটে চলে গেল। আনমনার মতো হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়ায় কালীচরণ। চোখ দুটো বিরক্ত হয়ে কুঁচকে ওঠে। বুকের ভিতরে যখন একটা তুফানী খুশির সোরগোল শুনে নিজের ভাগ্যটাকে বার বার বাহবা দিতে ইচ্ছে করছে, তখন বাইরের একটা কান্নার স্বর শুনলে মেজাজ খারাপ হবেই বা না কেন? মনে হয়, ঐ কান্না যেন কালীচরণের জীবনের এত বড় একটা আহ্লাদের ঘটনাকে হিংসে করে আর মতলব করে এমন করুণ হয়ে বাজতে শুরু করেছে।

বুঝতে পারা যায়, দূরে যে মেটে ঘরটার দরজার কাছে অনেকগুলি ছোট ছোট আলো ছুটোছুটি করছে, সেখান থেকেই কান্নার ঐ শব্দটা ছুটে আসছে। কিন্তু ঐ ঘর যে পাইপ-মিস্তিরি রমেশের ঘর। কি হলো রমেশের? আজও তো সকালবেলা রমেশকে কাজে বের হতে দেখেছে কালীচরণ। যন্ত্রপাতির ভারে ভারী হয়ে একটা পুরনো চটের থলে রমেশের হাতে ঝুলছে; কে জানে কোন্ বাবুর বাড়িতে জলের কল মেরামত করতে হবে। রোগা শরীরটাকে হন হন করে হাঁটিয়ে নিয়ে সকালবেলা যখন রমেশের প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেল কালীচরণ, তখনও তো রমেশকে দেখে অসুস্থ বলে মনে হয়নি।

রমেশই কি তাহলে চিরকালের মতো ছুটি নিল? না, তা তো মনে হয় না। কান্নার একটা শব্দকে যে রমেশেরই কান্নার স্বরের ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ওরকম মিহি গলার কান্না রমেশ ছাড়া আর কারও হতে পারে না।

এগিয়ে যায় কালীচরণ। তারপর আর কোন সন্দেহ থাকে না। হ্যাঁ, রমেশেরই অদৃষ্ট কাঁদছে। রমেশের বউ মারা গিয়েছে। কাঁদছে রমেশের বড় মেয়ে আরতিটা, কাঁদছে রমেশের ছোট ছোট ছেলেদুটো। মনে হয়, রমেশও এই কিছুক্ষণ আগে ঘরে ফিরেছে, কারণ যন্ত্রপাতির থলেটা রমেশের পাশেই মাটির উপর যেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। দুই হাতে কপাল চেপে মিহি গলায় কান্না কেঁদে চলেছে রমেশ।

বস্তির মানুষের সংসারে একটা মৃত্যুর ঘটনা অভাবিত অথবা আশ্চর্যের কিছু নয়। এ-ধরনের করুণ কান্না মোটেই নতুন একটা কোন ব্যাপারও নয়। প্রতিবেশীরা ছুটে এসেছে। কেউ-কেউ সান্ত্বনার কথা বলেছে, এবং কেউ-কেউ এরই মধ্যে কাঁচা কাঠের একটা খাটিয়া, দড়ির গোছা হাতে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে কালীচরণ। হয়তো আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকতো, কিন্তু দাঁড়াতে দিল না রমেশের বড় মেয়ে আরতিটাই; মেয়েটা কালীচরণের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—ওগো কালীকাকা গো, মাকে তোমরা কোথায় নিয়ে চললে গো! আমার যে আর দু'মাস পরে...।

আরতির কান্না হঠাৎ গুমরে উঠেই একেবারে নীরব হয়ে যায়। কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল আরতি।

আর দু'মাস পরে? কালীচরণের কানের কাছে ফিসফিস করে নিমাই—দুঃখ হবারই কথা। আর দু'মাস পরে মেয়েটার বিয়ে হবে। ব্যবস্থা একরকম ঠিক হয়েই আছে।

মেয়ের বিয়ে দেখে যেতে পারল না রমেশের বউ। অথচ কত সাধ ছিল; কিন্তু রোগের জ্বালা সে সাধটুকু মিটিয়ে নেবার সময়টুকুও বেচারাকে দিল না। ভাবতে বড় বিশ্রী লাগে। মানুষের এমন দুর্ভাগাও হয়।

যাক্, আর কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মেয়েটা কালীকাকা গো বলে কেঁদে চেঁচিয়ে আরও কত দুর্ভাগ্যের কথা বলতে থাকবে কে জানে? সরে পড়াই ভালো।

চলে যায় কালীচরণ। বস্তির ভেতর দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে বার বার ঘুরে এইবার এমন একটি ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে কালীচরণ, যে ঘরের অদৃষ্ট আজ হেসে উঠেছে। তার নিজেরই ঘর। ময়দানে সারা সন্ধ্যাটা ঘুরে ফিরে মসলা-মুড়ি বেচে ক্লান্ত হওয়া এই চেহারাটাকে কোনদিন এত খুশিতে ভরে নিয়ে ঘরে ফিরতে পারেনি কালীচরণ। আর কালীচরণের বউ সনাতনীও কোনদিন ভাবতে পারেনি যে, কালীচরণের খাটুনির জীবন কোনদিন সত্যিই এভাবে হেসে উঠবে।

কালীচরণের এই ঘর চিরকালের ঝগড়ার ঘর। এমন দিন যায়নি, যেদিন স্বামী-স্ত্রীতে অন্তত এক ঘণ্টার মতো একটা ঝগড়ার পালা মুখর না হয়ে উঠেছে। মাগের একটা সামান্য শখ মেটাবার মুরোদ নেই, সে মানুষ কি পুরুষ মানুষ? সনাতনীর অভিযোগের জবাবে কালীচরণ বলতে ছাড়ে না, সামান্য এক জোড়া সোনার দুল কানে দোলাতে পারা গেল না বলে যে মেয়েমানুষ স্বামীকে গঞ্জনা দেয়, সে কি সত্যিই মেয়েমানুষ?

বেশি কিছু নয়, সনাতনীর দাবী সামান্য, শুধু সোনার একজোড়া দুল। এই দাবীর বয়সও প্রায় বিশ বছর। বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে এসে একটা বছরও পার হতে না হতেই ষোল বছর বয়সের সনাতনী সেই যে একদিন লাজুক হাসি হেসে আর কালীচরণের পিঠের উপর মুখটা গুঁজে দিয়ে অনুরোধ করেছিল—দাও না, একজোড়া সোনার দুল গড়িয়ে, এখনই যদি না পরি তবে কবে আর পরবো?

দেব, নিশ্চয় দেব। কথা দিয়েছিল পঁচিশ বছরর বয়সের যে যুবক কালীচরণ, সে তার অদৃষ্টের এই বিশ বছরের ইতিহাসে শুধু সেই প্রতিজ্ঞা এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে। একজোড়া সোনার দুল, অন্তত টাকা তিরিশ দরকার। কিন্তু দিতে পারেনি কালীচরণ। অনেক চেষ্টায় অনেক খেটে আর ভাত-কাপড়ের দাবী অনেক কাটাছাঁটা করে মাঝে মাঝে বড় জোর দশ বারো টাকা জমেছে; কিন্তু তারপরেই একটা না একটা অঘটন, একটা অসুখ অথবা ভাঙা-ঘরের চালা বা দেয়াল সারাবার দাবী মেটাতেই সে-টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে।

মাঝে মাঝে একটু শান্ত স্বরে, চোখে-মুখে সত্যিই অদ্ভুত একটা মায়ার ভাব টেনে নিয়ে সনাতনীকে অনুরোধ করেছে কালীচরণ—আমাকে গঞ্জনা দিয়ে কোন লাভ হবে না সনু, দেবতার কাছে দাবী কর, যেন তোর সোনার দুল হয়। দেবতা না ইচ্ছে করলে মানুষের কি সাধ্যি যে, সোনা-দানা ঘরে আনতে পারে?

সনাতনী কালীঘাটে গিয়েছে। কতবার যে গিয়েছে, তার হিসেব সনাতনীও দিতে পারবে না। কালীচরণও বুঝে ফেলেছে, কালীঘাটে গিয়ে দেবীর কাছে কি প্রার্থনা করে এসেছে সনাতনী।

তবুও ঝগড়ার সময় তপ্ত মেজাজের মাথায় সনাতনীকে কতবার শুনিয়ে দিয়েছে কালীচরণ—তোর মত মেয়েমানুষের প্রার্থনা দেবতা শোনে না, কখখনো না।

আজ কিন্তু ঘরের ভিতরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠতে হবে—শুনেছে, দেবতা তোর প্রার্থনা শুনেছে, সনু।

আজ ময়দানের সন্ধ্যায় আলোছায়ায় ঘুরে ফিরে মসলা-মুড়ি ফেরি করবার সময়, সবুজ ঘাসের 'পর একটা চকচকে বস্তু পড়ে থাকতে দেখে টপ করে হাতে তুলে নিয়েছে কালীচরণ। একটা সোনার দুল।

কি আশ্চর্য, হে ভগবান, একি কাণ্ড, সত্যিই যে সোনার একটা দুল। দেবতা যে সত্যিই কালীচরণের এই বিশ-বছরের জীবনের একটা বেদনা মুছে দেবার জন্য এই উপহার ময়দানের ঘাসের উপর রেখে দিয়ে গিয়েছে।

একজোড়া নয়, একটা দুল। কিন্তু সেজন্য কোন আক্ষেপ নেই। দেবতা যখন প্রসন্ন হয়ে

একটা জুটিয়ে দিয়েছে, তখন আর একটা জুটে যাবেই। অন্তত আর একটা কেনবার মত টাকা জুটে যাবেই। মাধব স্যাকরাকে বললে ঠিক এই রকম একটি দুল সে দু'দিনে গড়িয়ে দিতে পারবে। দাম? কত আর দাম? বড় জোর টাকা পনর লাগবে। সে পনর টাকা কি আর দেবতার কৃপায় জুটে যাবে না?

ঘরে ঢুকেই পকেট থেকে ছোট একটা কাগজের পুরিয়া বের করে হাঁক ছাড়ে কালীচরণ—বল্ দেখি সনু, এটা কি চীজ!

সনাতনী ভ্রূকুটি করে—তোমার শূলব্যথার ওষুধ, আবার কি?

—না।

—না তো না; হাসি দেখলে গা জ্বলে!

কাগজের পুরিয়া খুলে সোনার দুলটা সনাতনীর চোখের সামনে তুলে ধরেই চেঁচিয়ে ওঠে কালীচরণ—দেবতা পাইয়ে দিলে।

সনাতনী খপ করে দুলটা হাতে তুলে নিয়ে, চোখ মুখ হাসিয়ে আর ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠে।—সে কি গো?

কালীচরণ—ময়দানে কুড়িয়ে পেলাম।

সনাতনীর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অদ্ভুত হাসির শিহর মুখের উপর থরথর করতে থাকে—আর একটা কই?

কালীচরণ—সেজন্যে ভাবিস না। হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, বিশ্বাস করে সনাতনী, দেবতা যখন একটা পাইয়ে দিয়েছে, তখন আর একটাও পাইয়ে দেবে।

কালীচরণ—এইবার একটু হাত টেনে খরচ করে, অন্তত পনরটা টাকা জমিয়ে ফেলতেই হবে সনু।

সত্যিই যেন দেবতার আশীর্বাদে নতুন একটা দুঃসাহসের সোনাও পেয়েছে কালীচরণ। কী ভয়ানক খাটুনি, কিন্তু একটুও ভয় করে না কালীচরণ।

সকালে উঠেই মসলা-মুড়ি ফেরি করতে বের হয়ে যায়; ফিরে আসে রাত্রিবেলা। সনাতনীও মরিয়া হয়ে উঠেছে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত শুধু জল খেয়ে পার করে দেয়। কালীচরণ ঘরে ফেরবার পর আধ-হাঁড়ি ভাত দু'জনে ভাগ করে খায়।

টাকাও জমেছে। এক সপ্তাহে তিন টাকা জমে গেল। এক মাসে জমলো প্রায় ন'টাকা। হে ভগবান, আর ছ'টাকা কি আর এক মাসে জমবে না?

মাধব স্যাকরাও বলেছে; হ্যাঁ, পনর টাকাতেই ঠিক এরকম এক-আনি সোনার একটা দুল হয়ে যাবে।

আরও একটা মাস পার হয়। রাত্রিবেলা ময়দান থেকে যখন ঘরে ফিরে এসে সনাতনীর মুখের দিকে তাকায় কালীচরণ, তখন কিছুক্ষণের জন্য কালীচরণের দুই চোখ অপলক হয়ে যায়! হাসছে সনাতনী, সেই বিশ বছর আগের আশাময় সুন্দর লাজুক মুখটি হাসছে।

সত্যিই লজ্জিত হয় সনাতনী। —অমন করে কি দেখছো? বয়স হয়েছে, ভুলে যাও কেন?

কালীচরণ—তোর কিন্তু বয়স হয়নি সনু। তোকে আজও ঠিক সেই রকমটি দেখাচ্ছে।

—কি রকমটি?

—সেই যে ষোল বছরের কাঁচা মুখটি। এত বড় কালো খোঁপাটি। নরম নরম গাল দুটি? আর...।

সরে যায় না সনাতনী। রোগা শরীরটাকে, একবেলা ভাত খাওয়ানো সেই শ্রান্ত-ক্লান্ত প্রাণটাকেই যেন ষোল বছর বয়সের তরুণতায় বিহ্বল করে দিয়ে কালীচরণের দু'হাতের ইচ্ছার কাছে সঁপে দেয় সনাতনী। ফিসফিস করে বলে—পনর টাকা জমেছে কিন্তু।

দরজার বাইরে মিস্তিরি রমেশের ডাক শোনা যায়—কালী ঘরে আছ কি?

—হ্যাঁ আছি। সাড়া দেয় কালীচরণ।

মেয়ের বিয়েতে কালীচরণকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছে রমেশ মিস্তিরি। কাল সন্ধ্যাতেই বিয়ে। কালীচরণ বলে—হ্যাঁ, নিশ্চয় যাব।

রমেশ বলে—তুমি একা গেলে চলবে না। তোমার ঘরের মানুষটিরও যাওয়া চাই। জানই তো, মা-মরা মেয়ের বিয়ে। ওদের মত দু-চারজন মানুষ কাছে থেকে মেয়েটাকে একটু আদুরে কথা বলে...সত্যিই মায়ের কথা ভেবে মেয়েটা বড় কাঁদছে হে।

হ্যাঁ, শুনে খুশি হয় কালীচরণ। রমেশকে কথা দেয়; সনাতনীও রমেশের মেয়ে আরতির বিয়েতে যাবে।

রমেশ চলে যাবার পর কালীচরণ বলে—বেশ হবে সনু, তুই এবার সোনার দুল পরে বিয়ে-বাড়িতে যেতে পারবি। কালই সকালে গিয়ে মাধব স্যাকরাকে ধরবো যেন চটপট দুলটা গড়ে দেয়, যেন সন্ধ্যা হবার আগেই পেয়ে যাই।

—কই, নতুন দুলটা কেমন হলো দেখি। ঠিক ঠিক মিলে গেছে তো? হাত পাতে সনাতনী।

সন্ধ্যাবেলা মাধব স্যাকরার কাছ থেকে ঘরে ফিরেছে কালীচরণ। কিন্তু কালীচরণের চোখ দুটো যেন দুটো দৃষ্টিহীন কোটর। মুখটা যেন মরা মানুষের মুখের মত বিবর্ণ।

নতুন দুল আনতে পারেনি কালীচরণ। কুড়িয়ে পাওয়া পুরানো দুলটাও ফিরিয়ে আনতে পারেনি। শুধু পনেরটি টাকা, যেমন হাতে করে নিয়ে গিয়েছিল, তেমনি হাতে করে ফিরে এসেছে।

মাধব স্যাকরার ঘরেতে রমেশের সঙ্গে দেখা হয়েছে কালীচরণের। চুপ করে শুনেছে আর দেখেছে কালীচরণ, দেবতাও কি ভয়ানক ঠাট্টা করতে পারে।

রমেশ মিস্তিরি একটা অদ্ভুত রকমের করুণ মুখ নিয়ে মাধব স্যাকরার কাছে এসেছে, পকেট থেকে ছোট্ট একটা দুল বের করে মাধবকে অনুরোধ করেছে রমেশ—এইরকম একটি দুল গড়িয়ে দাও মাধব। এটা হলো মেয়েটার মরা মায়ের দুল। কিন্তু দামটা এখন দিতে পারবো না মাধব।

মাধব বলে—তা হয় না, মাপ কর মিস্তিরি!

কালীচরণ হঠাৎ আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠে। একটা দুল কেন হে রমেশ।

রমেশ—একটা হারিয়ে গেছে রে ভাই। আমিই একদিন দুল জোড়া বেচতে নিয়ে গিয়ে একটাকে যে কোথায় হারিয়ে ফেললাম, কে জানে?

কালীচরণ—ময়দানের দিকে গিয়েছিলে কি?

রমেশ—ঠিক সন্দেহ করেছো। ময়দান পার হয়ে কয়লাঘাট হয়ে হাওড়াতে এক বাবুর কাছে দুলজোড়া বেচতে নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ।

ফ্যাল ফ্যাল করে রমেশের হাতের দুলটার দিকে তাকিয়ে থাকে কালীচরণ। রমেশ বলে—মেয়ের মা বেচারা মরবার আগেও জানতে পারেনি যে একটা দুল হারিয়েছে। মরবার আগের দিনও বলেছে—বিয়ের দিন মেয়েটার কানে আমার দুলজোড়া পরিয়ে দিও।

থরথর করে কালীচরণের হাতটা কাঁপতে থাকে। তারপরেই পকেটের ভিতর থেকে একটা দুল বের করে রমেশের হাতের কাছে এগিয়ে দেয়—দেখ, দেখি, এটা সেই হারানো দুল কি না?

—এই তো, এই তো! কোথায় পেলে তুমি? উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে রমেশ।

কালীচরণ যেন একটা আর্তনাদ চেপে বলে—ময়দানে।

আর কোন কথা না বলে, দুলটাকে রমেশের হাতে ফেলে দিয়ে সোজা ঘরে ফিরে এসেছে কালীচরণ।

—কই? কথা বলছো না যে। আবার প্রশ্ন করে সনাতনী।

মেঝের উপর ধপ করে বসে পড়ে কালীচরণ। যেন একটা মূর্ছার ঘোরে বিড়বিড় করে।
—ওটা রমেশের বউ-এর দুল। আজ জানতে পেলাম।

—তারপর? কি করলে দুলটাকে? বুকফাটা আর্তনাদ শিউরে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সনাতনী।

--রমেশের হাতেই ওটা ফেলে দিয়েছি।

—হায় রে হায়! মানুষও এত গোমুখ্খু হয়? মেঝের উপর গড়িয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে সনাতনী। কালীচরণও স্তব্ধ হয়ে বসে তেমনই ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে থাকে, সনাতনীর কান দুটো মেঝের সঙ্গে ঘষা লেগে যেন একটা মাটিমাখা নিষ্ঠুরতার আঘাত সহ্য করতে গিয়ে ছটফট করছে।

কালীচরণ যেন ভীরু অপরাধীর মত বিড়বিড় করে—কি করবো বল? রমেশের বউ মরবার আগে বলে গিয়েছিল, মেয়েটাকে যেন বিয়ের দিনে ওর দুলজোড়া পরিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে, রমেশের সাধ্যি নেই যে, নতুন একটা দুল গড়াতে পারে। কাজেই...।

মাটিতে লুটিয়ে-পড়া সনাতনীর শরীরটার করুণ কাতরতা আর ছটফট জ্বালা যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপরেই মনে হয়, যেন ঘুমিয়ে পড়েছে সনাতনী।

আশ্চর্য হয় কালীচরণ, সত্যিই এত দুঃখ পেয়েও কি সুন্দর শান্তটি হয়ে, যেন সুখের ঘুমে বিভোর হয়ে আছে সনাতনী।

রাত কত হলো! সারা বস্তি যে একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছে।

কালীচরণ ডাকে—সনু!

সনাতনী ধড়ফড় করে জেগে ওঠে; —রাত অনেক হলো বুঝি?

—হ্যাঁ।

—তবে তো মেয়েটার বিয়ে হয়েই গিয়েছে।

—হ্যাঁ, সন্ধ্যাতেই লগ্ন ছিল।

—যাঃ, আক্ষেপ করে সনাতনী।

কালীচরণ—কি হলো?

সনাতনী—বিয়েটা দেখা হলো না।

সনাতনীর মুখটাকে ভাল করে দেখবার জন্য কালীচরণের শুকনো চোখের দৃষ্টিটা যেন হঠাৎ তীব্র হয়ে জ্বলজ্বল করে।

বিড়বিড় করে কালীচরণ—ভারি তো বিয়ে, রমেশ মিস্তিরির মেয়ের বিয়ে না দেখা হলো তো বয়েই গেল।

সনাতনী আঁচল দিয়ে চোখ-মুখ মুছতে মুছতে বলে—না গো, মায়ের দুলজোড়া কানে দিয়ে মেয়েটাকে কেমন দেখাচ্ছে, দেখবার বড় সাধ ছিল।

কোন মিল নেই, তবু মিল

সেদিন সেখানে যে-কাজ করতে হয়েছিল, সেটা ছিল রিলিফের কাজ। আজ এখানে যে কাজের জন্য এসেছি, আর ক্যাম্পও করে ফেলেছি, সেটাও রিলিফের কাজ। কিন্তু পাঁচ বছর আগের সেই আগস্ট, আর আজকের আগস্টের আলো-ছায়ার মধ্যে কোন মিল নেই। সেই আগস্টের সকালবেলার বাতাসে যদিও হাড়-কাঁপানো ঠান্ডার কামড় ছিল না, কিন্তু কুয়াশার মধ্যে যেন মৃদু হিমের একটা মোলায়েম আমেজ ছিল। সেই আমেজের ছোঁয়াচ লেগে গরম কফির স্বাদও নিবিড় হয়ে যেত। তারপরেই দেখতে পাওয়া যেত, কুয়াশা গলিয়ে দিয়ে রৌদ্রের আভা ক্যাথিড্রালের সবচেয়ে উঁচু চূড়াটার উপর লুটিয়ে পড়েছে। সোনার মিনারের মতো ঝলমল করছে সেই চূড়া।

আর আজ এখানে দেখতে পাচ্ছি, একটা গেঁয়ো মন্দিরের মাথার ত্রিশূল জলের উপর ভেসে রয়েছে। তার মানে বন্যার জল মন্দিরটাকে ডুবিয়ে দিয়ে ত্রিশূলের গোড়া অবধি উঠেছে। সেই আগস্টের আকাশে সূর্য ছিল, আজকের এই আগস্টের আকাশে শুধু মেঘ আর মেঘ। সন্দেহ হয়, আবার বৃষ্টি হবে। এই মেঘ সহজে সরে যাবার মেঘ নয়।

দানাপুরের আর্মি মেডিক্যালের অফিস থেকে হঠাৎ জরুরি অর্ডার এসেছে—অতঃপর কর্নেল সলিল মজুমদার কোশীর পূবদিকের এলাকাতে রিলিফের কাজ চালাবেন, আর কর্নেল মালহোত্র নদীর পশ্চিম দিকের এলাকার রেস্ক্যু কাজের ভার নেবেন।

শান্তিপুর থেকে বড় মাসিমারও একটি চিঠি এসেছে--বাবা সলিল, অন্তত সাত দিনের ছুটি নিয়ে একবার চলে এস।

ছুটি নিয়ে শান্তিপুর যাবার জন্য বড় মাসিমার এই তাগিদের কারণও চিঠিতে লেখা আছে। বড় মাসিমা জানিয়েছেন, তার বাগানের তিনটি ভাদুই আমের গাছ—মধুনাথ, ভোজেশ্বর আর গোলবদন খুব ভালো ফলেছে। ফল পাকতে শুরু করে দিয়েছে। আর বোধহয় দশ দিনের মধ্যেই সব ফল পেকে সারা হয়ে যাবে। কাজেই...।

বড় মাসিমার কাছে আজকের আমি অর্থাৎ আর্মি মেডিক্যালের কর্নেল সলিল মজুমদার বোধহয় কুড়ি বছর আগের সেই বারো বছর বয়সের সলিল, আমের লোভ দেখিয়ে চিঠি দিলেই যে-ছেলে শান্তিপুরে ছুটে যেত।

আজ এখানে আমার ক্যাম্পের একটি চেয়ারে বসে আর রিলিফ অপারেশনের চার্ট ও ম্যাপের দিকে তাকিয়ে যে-সব গ্রামের নাম দেখছি, তাদের সঙ্গে সেইসব গ্রামের নামের কোন মিল নেই। এখানে এরা হলো, বাহাদুরগঞ্জ মকবুলপুর হারু-মারু ভিখপুরা আর চাঁদিবাজার। পাঁচ বছর আগে সেখানে যাদের বুকের উপর দিয়ে আর্মি মেডিক্যালের কনভয় ছুটিয়ে দিয়ে যেতে হয়েছিল, তারা হলো--লাস্ত্রা কলম্বানো, সিগনা আর মন্টিলুপো। সেদিন সেখানে নদী আর্নোর জল পার হতে হয়েছিল। আজ এখানে নদী কোশীর জল পার হয়ে দুর্ভাগা গ্রামের আটক পড়া মানুষগুলিকে উদ্ধার করতে হবে। ঘরে ঘরে ক্ষুধার খোরাক পৌঁছে দিতে হবে।

যেতে হবে মকবুলপুর, যেতে হবে চাঁদিবাজার। কিন্তু বার বার পাঁচ বছর আগের সেই ফ্লোরেন্সের কথা মনে পড়ছে কেন? হ্যাঁ, একটা কারণ আছে। সেদিনও ফ্লোরেন্সের ভিতরে কনভয় নিয়ে ঢুকে পড়তেই হঠাৎ অর্ডার পেয়েছিলাম, মারাঠা ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে এইবার আমার মেডিক্যাল ইউনিটকেও থাকতে হবে, আর রেল ব্রিজ দখল হয়ে যাবার পর রিলিফের কাজ করতে হবে।

ফ্লোরেন্স দখল করবার সেই দিনগুলিকেও মনে পড়ছে। বারুদের গন্ধধূমে অন্ধ হওয়া আর গোলাগুলির শব্দে বধির হওয়া তিনটি ভয়ানক যুদ্ধের দিন। মাইনের জালে জড়িয়ে পড়ে, আর

মৃত্যুময় এক-একটি বিকট বিস্ফোরণের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে ওয়েস্ট কেন্টের আগুয়ান জিপগুলি টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ছে। প্রচণ্ড জ্বালা আর শব্দের বিভীষিকার মধ্যে রুষ্ট ড্রাগনের মতো এক-একটি জার্মান ট্যাঙ্ক একটু একটু করে পিছনে হটে যাচ্ছে। এক নম্বর গোর্খাদের একটা কোম্পানি শুধু কুকরি আর গ্রেনেড হাতে নিয়ে আর 'কালী মায়ী কি জয়' হাঁক দিয়ে জার্মান ট্যাঙ্কের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। মুনোনি ক্যানেল পার হবার সময় নিহত গোর্খাদের লাশের মধ্যে একটি পরিচিত মুখের ছবি দেখতে পেয়েছিলাম। গায়ের উর্দিতে শুকনো রক্ত তখনও লাল হয়েই আছে, আর কুকরিটাকে হাতে ধরে রেখেছে, মাটির জংলা ড্যাফোডিলের উপর পড়ে আছে নিষ্প্রাণ নন্দু থাপা, যে একদিন আমাকে কাসিনোতে গরম হালুয়া খাইয়েছিল।

একুশ ইন্ডিয়ান ইনফ্যানট্রি ব্রিগেডের উপর নির্দেশ আছে, জার্মান ট্যাঙ্ক হটিয়ে দিতে ও ধ্বংস করতে হবে, ফ্লোরেন্সের বুভুক্ষুদের মধ্যে রুটি ময়দা মাখন আর ওষুধের বিলি বিতরণের কাজও করতে হবে। আমার মেডিক্যাল ইউনিটকেও তাই বিশুদ্ধ রিলিফেরও ইউনিট হয়ে আর ফ্লোরেন্সের ভিতর গিয়ে ঠাঁই নিতে হবে।

পিয়াৎসা ভাসারি, সড়কের পাশে একটি ধসে পড়া সিনেমা ভবনের মধ্যে রুটি ময়দার বিরাট সম্ভার নিয়ে বসে আছি। মারাঠাদের একটি প্লেটুন আমার রিলিফ ক্যাম্প পাহারা দিচ্ছে। কাঁটাতারের বেড়ার ওদিকে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষুধার্ত নরনারী, বৃদ্ধ ও শিশু, যুবা ও তরুণী। জমাদার বলবন্ত স্টিক উঁচিয়ে সেই ক্ষুধার্ত ভিড়কে শান্ত হতে আর সুশৃঙ্খল হতে নির্দেশের সঙ্কেত দোলাচ্ছে। আর, মাঝে মাঝে, কে জানে কিসের উল্লাসে সুর করে শিস দিচ্ছে।

রুট মার্চ করে ওয়েস্ট কেন্টের ব্যাটেলিয়ন শহরের আরও ভিতরে চলে গেল। দেখতে পাচ্ছি, সড়কের দু'পাশের বাড়ির উপরতলা থেকে অনেক ফুল, স্বাগত অভ্যর্থনার অনেক ফুলের উপহার ঝরে পড়ছে ঘর্মাক্ত ব্যাটেলিয়নের মাথার উপর। খবর পাচ্ছি, একে একে শহরের সব এলাকাই দখল হয়ে চলেছে। তিন নম্বর পাঞ্জাবের একটি ব্যাটেলিয়ন হিপোড্রাম আর জ্যাকোপিনো এলাকাতে ডেরা করে ফেলেছে। কিন্তু পিয়াৎসা কাভুর, বেচারিয়া আর ডোনাটেনো এখনও উচ্ছৃঙ্খল। সেখানে গলায় লাল রুমাল বেঁধে ফাসিস্তির ছোকরাদের দল পিস্তল আর হাতবোমা নিয়ে পার্টিজান ছোকরাদের মারছে আর মরছে। কিংস ড্রাগন গার্ডের একটি দল এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে দু'পক্ষেরই দুরন্তদের হত্যা করছে। পিয়াৎসা মার্কোর খবর বড়ই করুণ। সেখানে ফ্যাসিস্তির ছোকরাদের লাশের সঙ্গে কিছু নিরীহ ঘরোয়া মানুষেরও লাশ ছড়িয়ে পড়ে আছে; তার মধ্যে বুড়োবুড়ি আর ছোট ছেলেমেয়েও আছে। এদের হত্যা করলো কে? জমাদার বলবন্ত বলে—টমিলোগ। খুব বেশি মদ খেয়ে মাতাল হয়েছিল ওই ড্রাগন গার্ডের দল।

সেদিনে আর এদিনে কোন মিল নেই, সে জায়গা আর এই জায়গার রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শের মধ্যেও কোন মিল নেই। সেখানে বিলি করতে হয়েছিল রুটি ময়দা মাখন। এখানে বিলি করতে হচ্ছে চিঁড়ে গুড় আর ছোলা। সেখানে রাতের বুলেভারে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেয়েছি, বেহালা বাজিয়ে গান গাইছে একটা পাগল। এখানে এই কিছুক্ষণ আগে নিকটের একটা গ্রামে রিলিফ পৌঁছে দিতে গিয়ে দেখে এলাম, খড়ের মাচানের উপরে বসে অনেক লোক শোকের কান্নার মতো ভীরু করুণ স্বরে আর একসঙ্গে চিৎকার করে গান গাইছে, হে সীতানাথ রাম! হে রঘুনাথ রাম!

ওয়েস্ট কেন্টের মাথার উপর তো অনেক ফুল ঝরে পড়েছে। কিন্তু বুঝতে পারা যাচ্ছে না, কারা ঝরিয়েছে ফুল। সড়কের দু'পাশের বাড়ির উপরতলায় খোলা জানলাতে অনেক সুস্মিতা ও বিহ্বলা সুন্দরীর হাত দোলানো ফূর্তির খেলাও দেখতে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারা গেল না, ওরা কারা? এ তবে কি একটা ছল অভ্যর্থনার ফাঁদ?

পালাৎসো রিকার্ডি, যেখানে অ্যালায়েড মিলিটারি সরকারের হেড কোয়ার্টার স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে অদ্ভুত একটা কাণ্ড হয়ে গেল। ওয়েস্ট কেন্টের ছোকরাদের মুখে আর সে হাসি নেই, বাড়ির উপরতলার জানালাতে খোঁপা বেণী আর স্ফীতবক্ষ জামা দেখতে পেয়েও ওরা আর হল্লা করে গান গেয়ে ওঠে না। কারণ, ওই পালাৎসো রিকার্ডির গেটের সামনে ওয়েস্ট কেন্টের মেসিনগানের সবচেয়ে জবরদস্ত যে পাহারা দিচ্ছে, তাদের মাথার উপর অনেক ফুলের সঙ্গে অনেক বোমাও ঝরে পড়েছে। তাই এবার অর্ডার হয়েছে পাড়ায় সন্ধান করে আর ঘর তল্লাশি করে যাকে সন্দেহ হবে তাকেই ধরো।

রিলিফের কাজ মাত্র সকালে ও বিকেলে দু'ঘণ্টা। তারপর সন্ধান আর ধর পাকড়ের কাজ। শুধু আমার মেডিক্যাল ইউনিটকে নয়, সড়ক মেরামতের একটা ফিল্ড কোম্পানিকেও পেট্রল দিতে বের হতে হয়। ফিল্ড কোম্পানির হাবিলদার চন্দন সিং বলে—আজব তামাসা। আমরা মিস্তিরির দল ব্রেনগান হাতে নিয়ে পাহারাদারি আর খবরদারি করবো, আর কেল্টু-জেন্টু যত কামবাটান ঘরের ভিতরে নেচে গেয়ে হুল্লোড় করবে, বাঃ!

বুঝতে পারছি না, আজ এখানে বানভাসি কোশীর কাছে, সেকেলে একটা পুরনো গড়-কেল্লার উঁচু চাতালের উপরে বস্তা বস্তা চিড়ে গুড় আর ছোলার ভিড়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে, আর নিকটে ও দূরের এক-একটা প্রায় ডুবন্ত গাঁয়ের চেহারার দিকে তাকিয়ে বার বার শুধু ফ্লোরেন্সের কথা মনে পড়ে কেন? বেশ অদ্ভুত রকমের একটা মনের খেলাই বলতে হবে। এই জল দেখে সেই কুয়াশার কথা মনে পড়ে। এই পিছল কাদার সড়কটাকে দেখে সেই পিয়াৎসা মার্কো আর পিয়াৎসা ভাসারির কথা মনে পড়ে। আর, এই ডুবুডুবু মন্দিরের বিষণ্ণ ত্রিশূলটার দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে, রোদের আভা লেগে সোনার মিনারের মতো ঝলমল করছে ফ্লোরেন্সের কাথিড্রালের চূড়া।

বানের জলের উপর দিয়ে রিলিফের লটবহর নিয়ে আর পাঁচটি মোটর বোট ভাসিয়ে যখন মকবুলপুরে পৌঁছলাম তখন বেলা দশটা। কিন্তু রোদ নেই। আকাশের মেঘের দিকে তাকালে বুঝতে পারা যায়, রোদের ছিটে-ফোঁটা আসার কোন চিহ্নও সেখানে নেই। এই কাদাঘোলা বানের জলের চেহারাও কত কালো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই আর্নো নদীর জল গোলা বারুদের কালো ধোঁয়ার ছায়া মেখেও এত কালো হয়ে যায়নি। সে জলে এমন প্রবল ঢলও ছিল না। কলকল টলমল ছলছল, আর্নো নদীর নীলজল। তবু কী আশ্চর্য, এই কোশীর জল পার হতে গিয়ে বার বার সেই আর্নোকে মনে পড়ে যাচ্ছে। আর আর্নোকে মনে পড়তেই ফ্লোরেন্সের কথা মনে পড়ে যায়।

হ্যাঁ, এটা মকবুলপুর, এদিকে ওদিকে শুধু যত গলা-পচা মাটির ঘর। মরা মহিষ ফুলে ঢোল হয়ে পড়ে আছে। পেয়ারা গাছের মাথার সঙ্গে ভাঙা খাটিয়া জড়িয়ে রয়েছে। পচা খড়ের মাচানের উপর শকুন। এ গাঁয়ে একটিও মানুষ নেই। সিভিল হাসপাতালের কম্পাউন্ডার মোহনরাম, যাকে বন্যা এলাকাতে আমার গাইড হয়ে কাজ করবার জন্য এস-ডি-ও পাঠিয়েছেন, তিনি আক্ষেপ করে চেঁচিয়ে উঠলেন—ওঃ, সব বহ্ গিয়া।

—তার মানে, সবাই মরে গিয়েছে?

—নেহি সাহেব, কিছু ভেগেছে, আবার কিছু নিশ্চয় মরেছে।

মানুষ নেই তো চিড়ে গুড় দেবো কাকে? খড়ের মাচানের উপর বসে শকুনটা একগাদা নাড়িভুঁড়ি খাচ্ছে। ওর কাছে উপোস কিংবা বুভুক্ষা কোন সমস্যাই নয়।

রিলিফের চার্ট আর ম্যাপের দিকে তাকিয়ে আর এস-ডি ও'র রিপোর্টটা একবার পড়ে নিয়ে বুঝলাম, চাঁদিবাজারের কিছু মানুষ আটক পড়ে আছে বলে মনে হয়।

চাঁদিবাজার পৌঁছতে সময় লাগলো পুরো একটি ঘণ্টা। কিন্তু কোথায় বা চাঁদি আর কোথায় বা বাজার? শুধু ছোট্ট একটি একতলা দালানের ছাদ ছাড়া আর সবই ডুবে গিয়েছে। মোহনরাম

বললেন, ওটা হলো একটা পুরনো থানাবাড়ি। ছাদের উপর জন পঞ্চাশ মানুষের একটা ঠাসাঠাসি সমাবেশ। শুধু কান্না আর চিৎকার—বাঁচাইয়ে সাহেব, জলদি বাঁচাইয়ে! হ্যাঁ, একটু দূরে আর একটা ছোট্ট সুশ্রী একতলা পাকা বাড়ি, যার ছাদ ডোবেনি, কিন্তু মেঝে ডুবে গিয়েছে। কম্পাউন্ডার মোহনরাম বলেন—ওটা মেয়ে ইস্কুলের বাড়ি। ওখানে একজন বাঙালিনী মাস্টারণী আছেন।

—আছেন নাকি?

—এখন আছেন কিনা জানি না, কিন্তু ছিলেন। দ্বারভাঙ্গার পুলিনবাবুর মেয়ে।

—আপনার চেনা মানুষ?

—পুলিনবাবুকে চিনি, পুপরিহা রেল স্টেশনের চায়ের স্টলের ঠিকে নিয়েছেন।

দালানের ছাদের সঙ্গে মই লাগিয়ে আটক মানুষগুলিকে এক-এক করে নামিয়ে মোটরবোটে তুলতে থাকে সেপাই রাজারাম আর অবতার সিং। ওরা দু'জনেই খুব পোক্ত কর্মী। ক্যাসিনোতে দে.খছিলাম ওদের প্রথম। ওরা তখন জাঠ দলের একটা অ্যাম্বুলেন্স কোম্পানিতে ছিল।

মেয়ে স্কুলের আধ ডুবন্ত বাড়িটার খোলা দরজা আর খোলা জানালার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থেকেও কারও চেহারার দেখা পাওয়া গেল না। কে জানে, বাঙালিনী মাস্টারণী এখনও আছে, না চলে গিয়েছে, না মরেই গিয়েছে। ভাবতে গিয়ে খুবই দুঃসহ একটা অস্বস্তি সহ্য করতে হচ্ছে।

কিন্তু বুঝতে পারছি না, এখানে এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে, সেই সুদূর ফ্লোরেন্সের পিয়াৎসা ভিসারার একটা ছোট বাড়ির জানালাকে মনে পড়ে কেন? এখানে ওই জানালাটা খোলা—সেখানে সেই জানালা বন্ধ। কিন্তু কে জানে কেমন করে জমাদার বলবন্ত দেখে ফে.লেছিল, সেই বন্ধ জানালার ওদিকে ঘরের ভিতর চুপ করে একটা চেয়ারের উপরে বসে আছেন এক তরুণী ইতালিয়ানী।

সকালবেলাতে এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় এক হাজার অভাবী আর উপোসী নরনারীর হাতে দশটি রুটির এক-একটি প্যাকেট তুলে দেবার পর আমার ইউনিটের লোকগুলি যখন ক্লান্ত হয় আর সিগারেট খায়, তখন আমিও হাঁপ ছাড়ি আর সিগারেট ধরাই। কিন্তু জমাদার বলবন্ত তেমনই অদ্ভুত এক উল্লাসের শিস বাজায় আর আমাকেই বার বার অনুরোধ করে—জেরা উধর তো দেখিয়ে সাহেব।

উধর মানে ওই ছোট বাড়িটা, যার জানালা সব সময় বন্ধ। জমাদার বলবন্ত হঠাৎ একটা হাত তুলে গোঁফের দু'দিক মুচড়ে দিয়ে যেন একটা অদ্ভুত খুশির হাসিকেও মোচড় দিয়ে লুকিয়ে ফেলে আর বলে—ওদিকে একটা দরজা আছে, দেখুন।

ঠিকই, ওদিকে একটা দরজা আছে। আস্তে একটা ঠেলা দিতেই সে দরজা খুলে গেল, আর দেখতেও পাওয়া গেল, একটা চেয়ারের কাঁধ আঁকড়ে ধরে আর একেবারে নিথর হয়ে বসে আছে এক তরুণী। বাড়িতে দ্বিতীয় কোন মানুষের সাড়া শোনা যায় না, দ্বিতীয় কোন ছায়াও দেখা যায় না। মনে হয়, বাড়ির পুরুষেরা সবাই পালিয়েছে।

আমার পায়ের শব্দ শুনেও তরুণী ইতালিয়ানী কোন সাড়া দিল না। মুখ তুলে একবার তাকালও না। তবে কি খেতে না পেয়ে আর খুব ভয় পেয়ে ওর প্রাণ মন আর শরীরটাও একেবারে নিথর হয়ে গিয়েছে?

মিথ্যে নয় আমার ধারণা। কাছে এগিয়ে যেতেই দেখলাম, আস্তে আস্তে ধুঁকছে একটা শুষ্ক ও শীর্ণ নারীর বুক। দুই চোখ কোটরের ভিতরে বসে গিয়েছে। চমৎকার সোনালী চুল, কিন্তু উসকো-খুসকো। টেবিলের উপর একটা কাঁচের বোতল টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে। বোধহয় জ্যাম কিংবা জেলি ছিল এই বোতলে। তাই বোতল ভেঙে জ্যাম জেলির শেষ

প্রলেপটুকুও চেটেপুটে খেয়ে ফেলেছে এই মেয়ে, সোনালী চুলের ক্রিমের ফিকে গন্ধ এখনও বাতাসে লেগে রয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—সিনোরিনা?

—সি।

—ইওর নেম?

—আনা।

—হাংরি?

—মি দিয়া ভিনো।

বুঝলাম ক্যাসিনোতে থাকতে চেষ্টা করে যেটুকু ইতালীয় ভাষা বুঝতে শিখেছিলাম তাতেই বোঝা গেল, তরুণী মদ চাইছে।

কী আশ্চর্য, আনার শুকনো এই চোখ দুটো থেকে এত জল ঝরে পড়ছে কেমন করে?

আমি বলি—ইল পানে? খাদা?

আনা বলে—সি সি।

ঘড়ঘড় করছে আনার অদ্ভুত গলার স্বর। কাঁপছে আনার মাথাটা, চোখ দুটোও যেন লোভী হয়ে চকচক করছে।

আনার হাতের কাছে খাবার পৌঁছে দিতে একটুও দেরি করি না। দশটি রুটির একটি প্যাকেট, এক ডিবে মাখন, আর হ্যাঁ, ব্রান্ডির একটি বোতলও আনার ঘরের টেবিলের ওপর রেখে দিলাম।

—গ্রাৎসিয়ে! গ্রাৎসিয়ে! চেঁচিয়ে উঠলো সেই শীর্ণা ও শুষ্কা আনা। কিন্তু কী আশ্চর্য, আনা যে চেয়ার ছেড়ে আমারই কাছে এগিয়ে আসছে। এ কী কাণ্ড, আনা যে আমার গা ঘেঁষে আর একেবারে বুক সেঁটে দাঁড়িয়েছে। কী চায় আনা? মুখটাকে আর শুকনো ঠোঁট দুটোকে আমার মুখের কাছে এমন করে তুলে ধরে কেন?

ভাগলপুরের সেজমামার কথা মনে পড়ছে। খেতে বসে পাতের উপর একগাদা মাছভাজার দিকে তাঁর চোখ দুটো লোলুপ হয়ে তাকিয়ে থাকতো। তবু তিনি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকতেন, মনে মনে বিড়বিড় করে কী যেন বলতেন। সেজমামী বলেছিলেন—ওটা ওঁর অভ্যাস, দেবতাকে আগে নিবেদন না করে কিছু খান না। সেজমামীর কথা শুনে আমরা মুখ টিপে হাসতাম।

আনার কাণ্ড দেখে এখন আমার মনটাও যেন মুখ টিপে হাসছে। বুঝতে পারছি, এটা হলো আনার প্রাণের একটা লোভের নিবেদন। কিন্তু কী অদ্ভুত লোভ।

কিন্তু চমকে উঠলাম। বাইরে থেকে বন্ধ জানলাটার গায়ের উপর হঠাৎ একটা শিসের শব্দ যেন আছড়ে পড়েছে, জমাদার বলবন্তের অদ্ভুত উল্লাসের শিস। এক হাত দিয়ে আস্তে একটু ঠেলা দিয়ে আনাকে সরিয়ে দিলাম।

সরে গেল আনা, কিন্তু আরও কিছুক্ষণ অপলক চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে চোখে যেন হঠাৎ আহত একটা বিস্ময় করুণ হয়ে ছমছম করছে।

আনা বলে—আরিভের্দচি।

আবার এস। বিদায় দেবার একটা বুলি। একটা কথার কথা, এইমাত্র।

শুনতে পাচ্ছি, লাস্ট পোস্ট বাজিয়ে আমাদেরই একুশ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের ব্যান্ড সড়ক ধরে কোথায় যেন যাচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে ছুটে চলে এলাম।

কম্পাউন্ডার মোহনরাম বলছেন, চলুন একবার ওই ইস্কুল বাড়িটার ভিতরে গিয়ে খোঁজ করি, সত্যি কেউ আছে কি নেই।

—হ্যাঁ চলুন।

বুঝতে পারছি না, চোখ দুটো, সেই সঙ্গে বুকের ভিতরে নিঃশ্বাসের বাতাসটাও হঠাৎ এক-একবার ছটফট করে উঠছে কেন? এই নিঃশ্বাস কি কাউকে আবার দেখতে আর কাছে পেতে চাইছে? যদি তাই হয়, তবে তো বুঝতে হবে যে, এটা হলো পাঁচ বছরের পুরনো একটা পিপাসার ছটফটে নিঃশ্বাস।

আমার মোটর বোট ইস্কুল বাড়িটার প্রায় দেয়ালের কাছে এসে ঠেকলো। এক হাঁটু জলের ভিতরে নামলাম, বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। আর চমকেও উঠলাম। একটা তক্তপোষের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে আছে এক তরুণী। কোন সন্দেহ নেই, এই সেই বাঙালিনী মাস্টারণী, পুলিনবাবুর মেয়ে।

বললাম—ভয় নেই, উঠে বসুন।

ডাক শুনে চোখ মেলে তাকালো পুলিনবাবুর মেয়ে। কী ভয়ানক উদাস দুটো চোখ। যেন তাকিয়েও কিছু দেখতে পাচ্ছে না। গাল চুপসে গিয়েছে, গলার একটা শিরা ফুলে ফুলে কাঁপছে, আর হাতের চুড়িগুলি কবজি পার হয়ে ঝুলে পড়েছে।

—আপনার নামটা বলবেন?

—রমা!

—কতদিন না খেয়ে রয়েছেন?

—সাত দিন।

—খাবেন কিছু?

—হ্যাঁ।

এই শুষ্কা ও শীর্ণা রমাও একটি অতি করুণ দুর্ভাগ্যের ছবি। উস্কোখুস্কো সোনালী চুলের স্তবক নেই, কালো চুলের ঢিলে বেণী। নীলচে চোখ নয়, বেশ কালচে চোখ। রমাকে দু'হাত দিয়ে ধরে খাটের উপর বসিয়ে দিতে গিয়েই বুঝতে পারলাম, কাঁধের হাড় খটখট করছে। সন্দেহ হচ্ছে, ভয়ও পাচ্ছি, এই রমার বুকের ভিতরে নিঃশ্বাসের জোরটুকু এখুনি ফুরিয়ে যাবে না তো?—জলদি কীজিয়ে কম্পাউন্ডারবাবু, আমার বোট থেকে এক গেলাস দুধ তাড়াতাড়ি গরম করে নিয়ে আসুন। আর ব্র্যান্ডির শিশিটাও আনবেন। হ্যাঁ, আর কিছু বিস্কুটও।

রমার বুক আর শ্বাস পরীক্ষা করতে দশ মিনিটও সময় লাগলো না। কম্পাউন্ডারবাবু ততক্ষণে গরম দুধ ব্র্যান্ডি আর বিস্কুট এনে দিয়ে আবার ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গরম দুধ, ব্র্যান্ডির শিশি আর বিস্কুটের প্যাকেটের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রমা। দেখতে পাচ্ছি, রমার দুই চোখে ক্ষুধা আর পিপাসার জ্বালা যেন হঠাৎ স্নিগ্ধ হয়ে গিয়ে চিকচিক করছে।

ডাক দিলাম—শোনো। শোনামাত্র খাট থেকে নেমে এক হাঁটু জলেরই মধ্যে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো রমা। ওই নিদারুণ শুকনো আর হাঁপ ধরা ধুকপুকে শরীরে এভাবে হঠাৎ উঠে দাঁড়াবার শক্তি কোথা থেকে আর কেমন করে এসে গেল।

আমার মুখের দিকে তাকায়, আর আমারই একেবারে কাছে এসে দাঁড়ায় রমা। কী যেন বলতে চায়, তবু বলতে পারে না।

এটা ফ্লোরেন্স নয়, ফ্লোরেন্সের পিয়াৎসা ভিসারাও নয়, আর রমার মুখের ভাষাটা আনার মুখের ভাষা ইতালীয়ও নয় যে, রমার কথা আমি বুঝতে পারবো না, কিংবা আমার কথা রমা বুঝতে পারবে না। তবু রমা কথা বলতে পারছে না, আমিও কথা বলতে পারছি না। ভুল হয়ে যাচ্ছে। রমা আর আনা। আনা আর রমা। রমার ঢিলে বেণীতে নারকেল তেলের ফিকে গন্ধ, কোন ক্রিমের ফিকে গন্ধ নয়। কোন মিল নেই, তবু মিল। বলতে ইচ্ছে করছে, আবার এসেছি।

জমাদার বলবন্ত তো এখানে নেই যে, অদ্ভুত উল্লাসের শিস বাজিয়ে সমস্যাটার একটা হঠাৎ সমাধান করে দেবে। বুঝতে পারছি না, রমাকে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে সরিযে দিতে পারা যাবে কি যাবে না। আমিই তো রমাকে কাছে ডেকে ফেলেছি, সরিয়ে দেবো কী করে?

কিন্তু দরজার বাইরে একটা ছায়া যেন হঠাৎ নড়ে উঠলো। জোরে গলা ঝেড়ে কেশে উঠলেন কম্পাউন্ডার মোহনরাম। চমকে উঠলো রমা, সরে গেল রমা।

সেখানে সেদিনের জমাদার বলবন্তের শিসের শব্দ, আর আজ এখানে কম্পাউন্ডার মোহনরামের কাশির শব্দ—কোন মিল নেই, তবু মিল আছে বলে মনে হয়।

ডাক দিলাম—শোনো আনা।

রমা—কী বললেন?

হেসে ফেললাম—পাঁচ বছর আগে ইতালিতে একদিন একটি উপোসী মেয়েকে ঠিক এইরকমই খাবার দিয়ে সাহায্য করতে হয়েছিল, তার নাম রমা।

রমা অদ্ভুতভাবে তাকায়—কী বললেন?

আমি বলি—যাকগে, গরম দুধটা এখুনি খেয়ে নিন, তারপর চলুন।

মাটির দীক্ষা

দেশ তখনো ভাঙেনি, ভাঙবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, সেই সময়।

ভয়ানক এক হিংসার ঝড়ে নোয়াখালির পল্লীর শান্তি বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে কুটিরের ভগ্নস্তূপ, হিন্দু নরনারীর জীবন অপমানিত। যারা ঘরে আছে, নির্যাতিত বন্দীর মতো তাঁদের মূর্তি। যারা ঘর ছেড়েছে, শোকার্তের মতো তাদের চোখের দৃষ্টি। সেই সময়।

সেই সময় প্রথম দেখা হয়েছিল নরেশ ও অমিতার সঙ্গে। চৌমুহনী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ওপর তারা বসেছিল। অমিতার কোলে আঁচলে জড়ানো একটি ছ'মাসের শিশুও ছিল।

লাকসাম যাবে যে ট্রেন, তারই অপেক্ষায় বসেছিলাম। অনেক রাত হয়েছিল, ট্রেনের আসবার সময়ও পার হয়ে গিয়েছিল। তাই একটা অনিশ্চয়ের মধ্যে বসে বসে প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলি নিঃশব্দে জপের মালার মতো যেন চিন্তার ভেতর দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল।

সব অনিশ্চয়ের মধ্যে। দূরান্তরে ঐ অন্ধকারাবৃত ক্ষেত মাঠ ও তরুবীথিকার জগতে আজ মানুষের মানমর্যাদা ও জীবন অনিশ্চয়ের মধ্যে। ঐ অন্ধকারের বুকে হিংসার গরল পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। নীলকণ্ঠ কোথায়? কিন্তু সংসারের তিনি কি মানুষের ইতিহাস থেকে বিদায় নিয়ে সরে গেছেন? এই রকম সংশয়েই তখন মনের ভেতর যেন তোলপাড় করছিল এবং ভারত জীবনের শঙ্কাহরণ নায়ক মহাত্মা গান্ধী তখনো নোয়াখালি এসে পৌঁছননি। তবু সংবাদ শুনেছি, কলকাতা থেকে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন। তিনি আসছেন, সেই সময়।

চারদিকের এই অনিশ্চয় ও অন্ধকার সত্ত্বেও অনেক রাতে চাঁদ উঠলো চৌমুহনীর আকাশে। সকল পার্থিব মূঢ়তার বহু ঊর্দ্ধে থেকে যেন কোটি কোটি স্নিগ্ধ আলোকের কণিকা এসে ছড়িয়ে পড়ছে। তারই মধ্যে দেখলাম, প্ল্যাটফর্মের ওপর বসে আছে এক যুবক ও তার পাশে এক তরুণী, কোলের ওপর একটি শিশু। চারদিকে রাত্রির নিস্তব্ধতা, ঘুমন্ত স্টেশন, তারই মধ্যে নিঃশব্দে বসে আছে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান। মনে হচ্ছিল, এ পৃথিবী যেন আজও অসমাপ্ত রচনার মতো এখনো অর্থহীন ও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। তারই মধ্যে প্রথম দেখা দিয়েছে পৃথিবীর প্রথম পিতা-মাতা ও সন্তান। এখনো তারা যেন গৃহজীবন লাভ করেনি।

সেই সময় পরিচয় হলো তাদের সঙ্গে। নরেশ ও অমিতা। দেশ ছেড়ে তারা চলে এসেছে, দেশের দিকে ফিরে তাকাবার ইচ্ছা তাদের আর নেই। শুধু প্রাণ ছাড়া আর সব গেছে। লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত সেই দেশের ভিটার কালিমাখা মূর্তিকে শেষ বিদায় জানিয়ে তারা চলে এসেছে।

কিছুই সঙ্গে নেই। একটা ছোটখাট পোঁটলাও না। নিরাভরণ সর্বস্ববর্জিত রূপ নিয়েই তারা বসেছিল। তাই মনে হচ্ছিল, ওরা দুটি অনিশ্চয়ের পথিকমাত্র, শুধু প্রাণ ছাড়া আর কোন পাথেয় নেই।

নরেশ ও অমিতার সঙ্গে আলাপ করলাম, কিন্তু আলাপ করবার মতো কোন উৎসাহ তাদের ছিল না। কেমন একটা উদাসীন ভাব, এই পৃথিবীতে তারা যেন বাইরের লোক, নব আগন্তুক মাত্র। কাউকে বিশ্বাস নেই, কোথাও সমবেদনা আশা করে না। বিরাট একটা সর্বনাশের অভিসন্ধির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যেন তারা অদৃষ্টকে এক পাশে আলগোছে সরিয়ে এনে রেখেছে। দেশ থেকে এখানে, এখান থেকে দূরে, দূর থেকে দূরান্তরে, শুধু সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

নরেশের পায়ে জুতো ছিল না। বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে। তার সমস্ত সত্তা যেন অতল এক অসহায়তার মধ্যে ডুব দিয়ে রয়েছে। অমিতা একটু অন্য রকমের। পরিশ্রান্ত ও মলিন মুখ, কিন্তু দৃষ্টি প্রখর। চারদিকে সাবধানে তাকিয়ে দেখার শক্তিটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। অমিতার শাড়িতে তখনো কচুরিপানার শেকড়ের কুচি লেগে রয়েছে। সেই শাড়ির আঁচলে ঢাকা ঘুমন্ত শিশুটি মাঝে মাঝে ছটফট করে। অমিতা একটু ব্যস্ত হয়।

জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় যাবেন?

নরেশ অনিচ্ছার সঙ্গে উত্তর দিল—কোন ঠিক নেই।

অমিতা বললো—কলকাতা যাবার ইচ্ছে আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কলকাতা যাবার মতো পথের খরচ সঙ্গে আছে তো?

নরেশ কোন উত্তর দিল না। অমিতাও উত্তর দিল না। অমিতার কোলের শিশুটি একটু ছটফট করে কেঁদে উঠলো।

একটু স্পষ্ট করেই বললাম—যদি কোন সাহায্যের দরকার থাকে বলুন, আমার পক্ষে যা সাধ্য...।

নরেশ তিক্ত স্বরে বলে—না।

অমিতা বলে উঠলো—একটা কাজ যদি করতে পারতেন...।

নরেশ অপ্রসন্নভাবে অমিতার মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু অমিতা শান্তভাবেই বলে—একটা ফুড যদি জোগাড় করে দিতে পারেন তবে...।

তবে কি? বুঝলাম অমিতার আঁচলে জড়ানো একটা শিশুর প্রাণ ক্ষুধার্ত হয়ে আছে। তাই অমিতা স্থির থাকতে পারছে না। তাই কলকাতা যাবার পথের খরচ নয়, সসাগরা পৃথিবীর সব মণিমাণিক্যও নয়, এই মুহূর্তে শুধু এক শিশি গুঁড়ো দুধের ফুড পেলেই সে সুখী হবে।

এতক্ষণ দেখতে পাইনি, এখন দেখতে পেলাম, অমিতার কানে একজোড়া সোনার দুল আছে। একটা দুল খুলে নিয়ে অমিতা বলে—এছাড়া দাম দেবার মতো আর কিছু নেই। এটা নিয়ে আপনি...।

নরেশ অমিতাকে ধমক দিয়ে উঠলো—না, রেখে দাও।

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম—এসবে আমার কোন দরকার নেই। এত রাত্রে, এইরকম জায়গায় ফুড কোথায় পাব জানি না। কিন্তু দেখি...।

নরেশ এবার আমাকেই ধমক দিল—না, কোন দরকার নেই।

একটু চুপ করে থেকে নরেশ বললো—আমিই চেষ্টা করছি।

নরেশ উঠলো। কোথায় যাবে জানি না। এই নিস্তব্ধ রাত্রির নির্মম ঘুমের দ্বারে দ্বারে সন্ধান করে কোথায় যে এক শিশুমানুষের ক্ষুধার বেদনা দূর করার মতো ফুড পাবে নরেশ, তা সেই জানে। তবু দেখলাম, নরেশ যেন এক ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তার প্রাপ্যের সন্ধানে যাত্রা করছে।

ট্রেনের শব্দও শোনা যাচ্ছে, নরেশ আমার দিকে তাকিয়ে বললো—আপনি যান, আপনার ট্রেন আসছে।

বহুদিন পরে আবার দেখা, নরেশ ও অমিতার সঙ্গে। তখন খবরের কাগজে কতগুলি কথা নিত্য প্রচারিত হয়ে চলেছে—বাস্তুহারার সমস্যা, উদ্বাস্তুর দাবী, শরণার্থীর কর্তব্য, আশ্রয়প্রার্থীর প্রশ্ন ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশ স্বাধীন হয়েছে, আর কলকাতায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগন্তুক মানুষ হাজারে হাজারে আশ্রয় নিয়েছে প্রতি অঞ্চলে ও বস্তিতে। বেনিয়াপুকুর অঞ্চলে এক বাড়ির সিঁড়িকোঠায় ক্ষুদ্র পরিসর এক অন্ধকারময় স্যাঁতসেঁতে আশ্রয়ে বাসা নিয়ে রয়েছে নরেশ, অমিতা ও সেই শিশুটি। শিশুটি বেশ বড়সড় হয়েছে।

চৌমুহনীর সেই গভীর রাত্রির জ্যোৎস্নালোকে নরেশ ও অমিতাকে যেরকম দেখেছিলাম, বেনিয়াপুকুরের ধুলো ধোঁয়া আর দ্বিপ্রহরের রোদে তাদের আর সেরকম মনে হলো না। সেদিন তাদের দেখেছিলাম দুটি পথিক প্রাণের মতো ক্লান্ত ও পীড়িত, কিন্তু তবু সান্ত্বনা চায় না। সেদিন পৃথিবীর প্রথম দম্পতির মতো যেন একটা কঠোর অহঙ্কার নিয়েই তারা সকল অনিশ্চয়ের ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে ঊর্ধ্বগগনের চন্দ্রালোক গায়ে জড়িয়ে বসেছিল।

আজ দেখলাম, নরেশের চেহারা ও আচরণ অন্যরকম হয়ে গেছে। আমি খুব অল্পই প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু নরেশ গায়ে পড়ে অনেক কথা বললো, অনেক অভিযোগ, অনেক দুঃখের কথা, অনেক ক্ষোভের কথা।

একটা চাকরি পেয়েছে নরেশ, কিন্তু সেদিন তারা ধর্মঘট করেছে। মালিক মাইনে বাড়ায় না, তারই প্রতিবাদে। ধর্মঘট কমিটির সহকারী সেক্রেটারি হয়েছে নরেশ।

হাতের সিগারেটে শেষ টান দিয়ে নরেশ বলে—আমাদের দুঃখের আর অন্ত নেই, সাধনবাবু। কেউ মুখ তুলে তাকায় না।

দেখলাম, নরেশের সত্যিই ক্ষোভের অন্ত নেই। এ পৃথিবীতে কারও মনে কোন সমবেদনা নেই। সামান্য একটা সাহায্য পেতে হলে দশ জায়গায় দরখাস্ত নিয়ে ছুটোছুটি করতে হয়। এই হলো নরেশের অভিযোগ।

অমিতা ভদ্রতা করলো, সিঁড়িকোঠার সামনে বসে চা খেলাম। অমিতাও বললো—কিছুই ভালো লাগছে না, এও একরকমের নির্বাসন। প্রতি মুহূর্তে এত অসুবিধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে মানুষ কি করে বাঁচে বলুন? ক'দিন হলো ফ্রি রেশন বন্ধ করে দিয়েছে।

ঠিক এরকম কথা অবশ্যই আশা করিনি। এই তো সেই নরেশ, আর সেই অমিতা, নিদারুণ এক অনিশ্চয়ের মধ্যেও যারা আমার সাহায্যের প্রস্তাব তুচ্ছ করতে পেরেছিল। মনে হলো, প্রথম দিনের দেখা সেই প্রাণের সব গর্ব যেন পরাভূত হয়ে গেছে।

সিঁড়িকোঠায় আশ্রিত নরেশ ও অমিতার সংসারের চেহারাও লক্ষ করলাম। হ্যাঁ, দুঃখ ও অভাব আছে বৈকি। এঘরে মানুষের বাস করা উচিত নয়। অমিতার চেহারা আগের তুলনায় অনেক শীর্ণ হয়ে গেছে। ফ্রি রেশনে যে খাদ্য পাওয়া যায়, তার চেয়ে ভালো খাবার অধিকার নিশ্চয় ওদের থাকা উচিত। ছেলেটার গায়ের জামাটা দু'জায়গায় ছেঁড়া, কিন্তু নরেশের গায়ে একটা দামী কাপড়ের কামিজ। ঘরে কোন দেব-দেবী বা মহাপুরুষের ছবি নেই, কোন বই নেই। অথচ দেখলাম একগাদা কাঁচের ও অ্যালুমিনিয়ামের বাসন। মস্ত বড় একটা পাকা কাঁঠাল মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে, এবং মোটা মোটা মাছি উড়ছে তার চারদিকে। রঙিন কাঁচের ফুলদানির ভেতরে এক প্যাকেট সিগারেট আর দুটো সিনেমার টিকিট। অভাব আর অপচয়, কোথাও শূন্যতা কোথাও অতিরিক্ততা, সব মিলিয়ে কোথায় যেন ছন্দ নষ্ট করে দিয়েছে, যার জন্যে বড়ই শ্রীহীন মনে হচ্ছিল এই দম্পতির সিঁড়িকোঠার সংসার। হয় পৃথিবী এদের সঙ্গে ছন্দ রাখতে পারছে না, নয় এরাই পৃথিবীর সঙ্গে ছন্দ রেখে চলতে পারছে না। কোথায় যেন ভুল রয়ে গেছে। অথচ এই নরেশ ও অমিতাকে একদিন দেখেছি, একটা পোঁটলাও সঙ্গে নেই, নিরাভরণ দুটি মূর্তি নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে সুস্থির হয়ে বসে আছে। কিংবা হয়তো আমারই ভাবতে ভুল হচ্ছে। কিন্তু কেন জানি মনে হয়, সেদিন দুঃখ ছিল ভয়ানক কিন্তু এরা ছিল সুন্দর। আর আজ ওদের দুঃখটা বিশ্রী, এবং ওরাও শ্রীহীন।

ওঠবার সময় নরেশ বললো, আপনার সঙ্গে কোন কাপড়ওয়ালার জানাশোনা আছে কি?

—কেন?

—কয়েক গজ টুইলের দরকার ছিল। যদি ধারে পাইয়ে দেন, তবে বড় ভাল হয়।

কোন কাপড়ওয়ালার সঙ্গে জানাশোনা ছিল না, তাই নরেশের অনুরোধ রক্ষার কোন প্রতিশ্রুতি না দিয়েই উঠলাম।

* * *

অনেক দিন পরে দেখা, এই নরেশ ও অমিতার সঙ্গে। ছেলেটিও বেশ বড় হয়ে উঠেছে দেখলাম।

বেনিয়াপুকুর নয়, ধুলো ধোঁয়া এবং কলকাতার দিনের আলোকে নয়। রাজীবপুরে এক পৌষের প্রভাতে।

ধানচাষীদের এক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। সভা সাঙ্গ হবার পর ভিড় থেকে বাইরে এসে দাঁড়াতেই সেই চাষী জনতার ভেতর থেকে খাটো ধুতি এবং ফতুয়া পরা মূর্তিতে বেরিয়ে এসে হাসিভরা মুখ নিয়ে যে লোকটি নমস্কার জানালো, তাকে চিনলাম। নরেশ।

বিস্ময়ের দৃশ্য নিশ্চয়। সকল অনিশ্চয়ের অগ্নিপরীক্ষার জ্বালা উত্তীর্ণ হয়ে একটা মানুষের প্রাণ যেন এইবার তার জীবনের ভিটা খুঁজে পেয়েছে। নরেশকে দেখে তাই মনে হচ্ছিল।

নরেশের অনুরোধে আজ আমিই এক কৌতূহলী পথিকের মতো, কি জানি কি দেখবার জন্যে, তার নতুন ঘরে এসে পৌছালাম।

মাটির ঘর, খড়ের ছাউনি, বড় আঙিনা, লতার বেড়া। কুমড়োর মাচানও আছে। কয়েকটা নতুন পেঁপেগাছ। খুঁটোর সঙ্গে দড়ি বাঁধা একটা কালো গরুও আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

অমিতা হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালো। সে হাসির সঙ্গে আগুনের আঁচের মতো একটা লালচে আভাও মিশে ছিল। একটা একচালার নীচে উনুনের সামনে বসে এতক্ষণ ধান সেদ্ধ করছিল অমিতা।

আর একবার দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে নরেশ ও অমিতার সংসার দেখলাম। আঙিনায় তুলসীগাছ আছে। ঘরের দেয়ালে কুলুঙ্গিতে একটি লক্ষ্মীর সরা ও ছবি রয়েছে। দেয়ালে মহাত্মা গান্ধী ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি আছে। দাওয়ায় মাদুরের ওপরে কয়েকটা বইও পড়ে আছে দেখলাম—গীতা, রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য আর চণ্ডীদাসের গান।

নরেশ হাসতে হাসতে বলে—কলকাতার জীবন আর সহ্য হলো না।

—কেন?

—সেখানে দুঃখের শেষ নেই, অভাবেরও শেষ নেই মশাই। তার চেয়ে এই ভাল।

—কি?

—এই চাষার জীবন।

—এখানে এসে কি দুঃখ অভাব সব মিটে গেছে?

—তা মিটবে কেন? সবই আছে।

—তবে?

নরেশে সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিতে পারলো না। একটু চেষ্টা করে তার যুক্তিগুলিকে যেন গুছিয়ে নিয়ে বললো—তবে শান্তি আছে। নিজের হাতে খেটে দুঃখ-অভাব দূর করবার একটা চেষ্টা তো করতে পারছি। তাছাড়া...।

নরেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—তাছাড়া এখানে এসে দু'দণ্ড ধর্মটর্ম পুজোটুজো করতে পারি, কলকাতায় থেকে ওসব রুচিও যেন চুলোয় যেতে বসেছিল।

অমিতা বললো—তাছাড়া...।

—বলুন।

অমিতা হেসে হেসে বলে—এখানে এসে হাঁপ ছাড়তে পারছি। কত বড় মাটির আঙিনা দেখছেন?

মাটির আঙিনার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। বিশ্বাস করলাম, নরেশ ও অমিতার জীবন একটা বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসের ইতিহাস পার হয়ে, এইখানে এসে মাটির উদার স্পর্শ লাভ করে ধন্য হয়েছে। তাই হাঁপ ছাড়ছে। এই মাটির করুণা নিয়ে ওরা নিজের হাতেই ভাগ্য গড়বে। ওদের চোখে মুখে আর সেই বেনিয়াপুকুরের সিঁড়িকোঠার বিশ্রী দুঃখের ছাপ নেই। ওদের জীবন মাটির দীক্ষা লাভ করেছে। তাই আজ বোধহয় এত সুন্দর ও সুশ্রী দেখাচ্ছে নরেশ আর অমিতাকে।

মনে হলো, এইরকমই এব মানবদম্পতি বোধহয় মানুষের প্রথম সংসার রচনা করেছিল, এবং এইরকমই একটি মাটির আঙিনা ছিল সেই সংসারে।

সমীক্ষা দক্ষিণ পলাশপুর

দক্ষিণ পলাশপুর নামে একটি গ্রামে সমীক্ষার এই রিপোর্ট প্রকাশ করে দেওয়া হলো। কারণ, লোকগণনার সাধারণ রিপোর্ট কিংবা ব্লক উন্নয়নের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হতে এখনও দেরি আছে। আর, সেই দুই রিপোর্টে দক্ষিণ পলাশপুরের নাম করে বিশেষ কোন কথা থাকবে কি থাকবে না, তারও কোনও ঠিক নেই।

বলতে হয়, এটি একটি যথার্থ অনুন্নত গ্রামজীবনের রিপোর্ট। সবচেয়ে নিকট রেল-স্টেশন হলো ষোল মাইল দূরের মতিনগর হল্ট। আর সবচেয়ে নিকট যে পথে ছোট মোটরগাড়ি অনেক কষ্টে চলতে পারে, সেটা হলো দেড় ক্রোশ পশ্চিমে ধানক্ষেতের সঙ্গে প্রায় একাকার সেই পুরনো অহল্যাবাঈ সড়ক।

এহেন দক্ষিণ পলাশপুরের গ্রাম্যতার মধ্যে একেলে উন্নতির ছোঁয়া কিংবা ছোঁয়াচ কতটুকুই বা লাগতে পারে? জেলার ম্যাপের মধ্যে দক্ষিণ পলাশপুরের নামের পাশের চিহ্নটা হলো ছোট্ট একটা কালো বিন্দু। ছোট্ট একটা নীল তারার চিহ্ন নেই, লাল তারার চিহ্নও নেই, তার মানে দক্ষিণ পলাশপুরের কোন কৃষিপণ্য নেই, শিল্পপণ্যও নেই। সন্দেহ হয়েছিল—দক্ষিণ পলাশপুর বোধহয় দশ-বিশ ঘর মানুষের বসতি নিয়ে অতি সামান্য কোন গ্রাম্য অস্তিত্ব কিংবা নিছক একটা নাস্তিত্ব।

পুরনো অহল্যাবাঈ সড়কের পাশে তালডাঙ্গা নামে যে একটু জায়গা আছে, সেখানে এসে পৌঁছতেই বুঝতে পারা গেল, সত্যিই দক্ষিণ পলাশপুর নামে একটা যথার্থ গ্রাম আছে। এখানে একটা বুড়ো বটের ছায়াতে দু'-চারটে গো-গাড়ি সব সময়েই পড়ে থাকে আর ঝিমোয়, যতক্ষণ না দেড় ক্রোশ দূরের দক্ষিণ পলাশপুরে যাবার জন্যে কোন বমাল ব্যাপারী কিংবা অব্যাপারী মানুষ একে হাঁকাহাঁকি ও ডাকাডাকি করে।

গ্রামের ভিতর ঢুকতে সবার আগে যা চোখে পড়বে, সেটা চমকে ওঠার মতো কোন বিস্ময়ের মনুমেন্ট নয়। একটা মন্দির। বটের শিকড়ে আর জটাতে জড়ানো এই মন্দিরের সর্বাঙ্গে বড় বড় ফাটল হাঁ করে রয়েছে। বিগ্রহ নেই, সেবাইত নেই। মন্দিরের ভিত্তির গায়ে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে একটা শ্লোক খোদিত আছে। শাকে বারমতঙ্গবাণ হরিণাঙ্কে নাঙ্কিতে শঙ্করং সংস্থাপ্যাশুঁ...বাস্, এই পর্যন্ত। শ্লোকের বাকি লেখা সবই মুছে গিয়েছে। বোঝা যায়, এটা শিবমন্দির। ১৮৫৭ শকে অর্থাৎ ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল। কে নির্মাণ করেছিলেন, কে জানে? শ্লোকের লিপির সবটুকু যদি থাকতো, তবে নিশ্চয় তার পরিচয় পাওয়া যেত। মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার কাজে সতের শতকের দক্ষিণ বঙ্গের শিল্পরুচির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। খুব সূক্ষ্ম সুন্দরতার কারুকলা না হলেও দেখতে চমৎকার। কিন্তু মন্দিরের ভিত্তির গোড়ার দিকের পাথরে মূর্তিকলার যে কাজ দেখা যায়, তার সঙ্গে বরেন্দ্রভূমির মহাস্থানগড় বৌদ্ধবিহারের পাথুরে রেলিং-এর মূর্তিকলার সাদৃশ্য আছে। প্রশ্ন করতে হয়, পাল যুগের মূর্তিকলার স্টাইল দক্ষিণ পলাশপুরের এই শিবমন্দিরের ভিত্তির পাথরে কেমন করে এল? দক্ষিণ পলাশপুর তবে কি পাল যুগের আলোছায়ার সৃষ্টি?

যাই হোক, প্রমাণ পাওয়া গেল যে, আজকের এই দক্ষিণ পলাশপুর যতই অনুন্নত হোক না কেন, অর্বাচীন নয়। কয়েক শতাব্দী আগে এই দক্ষিণ পলাশপুর অনেক স্বপ্ন দিয়ে তৈরি আর অনেক স্মৃতি দিয়ে ঘেরা একটি উন্নতির উপনিবেশ ছিল। আজ দেখা যাচ্ছে যে, সেকালের উজ্জ্বল আলোর একটি দীপ আজ শুধু পোড়া সলতের কালি হয়ে পড়ে আছে। যে ছিল খুব উন্নত, সে-ই আজ খুব অবনত।

এই মন্দির, সতের শতকে ভগবান শঙ্করের কাছে নিবেদিত এই প্রত্নকীর্তিটি আজ বিংশ শতাব্দীর যে মানুষটির সম্পত্তি, তিনি হলেন দক্ষিণ পলাশপুরের জয়ন্ত ঘোষ। লোকে বলে, চার-আনি। অর্থাৎ ইনি দক্ষিণ পলাশপুর জমিদারির চার-আনি মালিক। আজ অবশ্য আর বলা চলে না। বলতে হয় ছিলেন। জমিদারি চলে গেলেও চার-আনি নামটা চলে যায়নি। আর যে বা যাঁরা বার-আনি ছিলেন, তিনি বা তাঁরা কবে কোথায় যে চলে গিয়েছেন তা কেউ জানে না। যাই হোক, মন্দিরটা যখন চার-আনির সম্পত্তি, তখন চার-আনি কেন মন্দিরটার নিদারুণ জীর্ণতার সামান্য একটু সংস্কারও করেন না? মন্দিরটা যে আর সাত-আট বছরের মধ্যে একেবারে ধসে পড়ে জঞ্জালের একটা ভয়ানক স্তূপ হয়ে যাবে।

২

চার-আনির বাড়িটা অদ্ভুত। রাতের মেঘলা আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠলে দেখতে পাওয়া যায়, বিরাট ও গম্ভীর একটা প্রাসাদের চেহারা চমকে উঠেছে। কিন্তু ভোরের আলোতে দেখা যায়, বড়ই পুরনো আর মলিন চেহারার একটা চকমিলান দালান। দেউড়ির মাথা ভেঙে পড়ে গিয়েছে, থামগুলির গায়ে পলেস্তারার চিহ্ন নেই। ইট খসে পড়ে চারিদিকের উঁচু পাঁচিল এমনই খর্ব হয়ে গিয়েছে যে, বাগানে ঘুরে ফিরে ফুল তুলতো যে মেয়েটি তাকে খুব স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যেত। বাসন্তী রঙের একটি শাড়ি পরে ভোরের আলোতে বাগানের ফুল তোলা এই মেয়ের নিত্যদিনের একটা অভ্যাস ছিল। চার-আনির সেই মেয়ে প্রীতিলতার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

চার-আনির জয়ন্ত ঘোষ বললেন, না মশাই, ওই সাংঘাতিক ভাঙা মন্দিরের মেরামত করবার রুচি আমার নেই, যদিও ওটা আমারই সম্পত্তি।

আদুড় গায়ের উপর জড়ানো একটা ময়লা চেহারার শাল, বেশ ছোট বহরের ধুতি আর পায়ে বাঘছালের চটি, যার রোঁয়াগুলি প্রায় সবই ঝরে পড়ে গিয়েছে। চার-আনির জয়ন্ত ঘোষের ধবধবে ফরসা চেহারার মধ্যে কেমন যেন একটা করুণতা আছে।

জয়ন্ত ঘোষ বললেন—আমার পিতামহ, পিতা আর আমি, আমরা তিন পুরুষ ধরে চার-আনি। বার-আনির সবাই দু'পুরুষ আগে জমিদারি বেচে দিয়ে সরে পড়েছে।

দেয়ালের তাক থেকে পুরনো নথিপত্রের একটা বাণ্ডিল তুলে নিয়ে এসে, তার ভিতর থেকে বেছে বেছে একটা দলিল বের করলেন জয়ন্ত ঘোষ—এই দেখুন, আমাদের তিন পুরুষ আগের সেই বিবাদের আপসনামা। বত্রিশ বছর ধরে মামলা চলবার পর শেষে আপস হলো : কামাখ্যাচরণ ঘোষ বাদী, বিশ্বনাথ ঘোষ গয়রহ বিবাদী। দরখাস্ত পক্ষে বাদী ও উত্তরকারী বিবাদীগণের নিবেদন এই—আমরা বাদী ও বিবাদী পরস্পরের আত্মীয় বটি। মামলা চলিলে উভয় পক্ষের অমঙ্গল হইবে বিধায় আমরা পক্ষগণের দরখাস্ত ও সালিসে রোএদাদ ইত্যাদির উপর লক্ষ না রাখিয়া নিম্নলিখিত রূপে আপসে নিষ্পত্তি করিলাম। অত্র সোলেনামা ডিক্রির একাংশ গণ্য হইবে এবং আমরা উভয়পক্ষ ইহাতে বাধ্য থাকিব।

দলিলের বয়ান আর বেশি না পড়ে জয়ন্ত ঘোষ অল্প কথায় বুঝিয়ে দিলেন। এই ভদ্রাসনের দখল পেলেন কামাখ্যাচরণ ঘোষ, আর পিতামহ। আর, পেলেন জমিদারির চার-আনি। ওদিকে বিশ্বনাথ ঘোষ গয়রহ পেলেন জমিদারির বার-আনি। কিন্তু তাঁদের ছেলেরা একদিন সেই বার-আনি জমিদারিকে আট লক্ষ টাকায় বেচে দিয়ে সরে পড়লেন।

কোথায় সরে পড়লেন?

বিলেতে। বার-আনির বংশের সবাই আজ বিলেতে। তারা কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ প্রফেসর, কেউ বা মস্ত বড় হোটেলর মালিক।

জয়ন্ত ঘোষের দুই চোখের তারা চিকচিক করে যেন হাসতে থাকে। —কী সৌভাগ্য, কী চমৎকার জীবন, কী সুখের সংসার। ওরা সবাই বিবাদীর গুষ্টি হলেও আমি বলবো, ওরাই ভাগ্যিমান। বাবার শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণের চিঠি পেয়েও ওদের কেউই আমাকে চিঠি দিয়ে সামান্য দু'-চারটে শোক-দুঃখের কথাও জানায়নি। ওরা আমাকে বোধহয় একটা মানুষই বলে মনে করে না। তবু আমি বলবো ওরাই মানুষ—। কিন্তু হ্যাঁ...।

পুরনো নথিপত্রের বাণ্ডিলটাকে হাত দিয়ে শক্ত রকমের একটা ঠেলা দিয়ে হেসে উঠলেন চার-আনি জয়ন্ত ঘোষ। —কিন্তু হ্যাঁ, আমিও প্রতিশোধ তুলে নিয়েছি। আমার মেয়ে প্রীতিলতার বিয়েতে কাউকেও নিমন্ত্রণের চিঠি দিইনি। বিয়ে হয়ে যাবার এক মাস পরে সবাইকে একটি করে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি যে, প্রীতির বিয়ে হয়ে গিয়েছে, জামাই হলো বিলেত ফেরত ডাক্তার মনোময় দত্ত। এ হলো লন্ডনের হাসপাতালে চক্ষু-চিকিৎসার চিফ সার্জন সেই মনোময় দত্ত, বার-আনি গুষ্টির সন্তু ঘোষ যার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল।

চার-আনি জয়ন্ত ঘোষের আদুড় গায়ে জড়ানো শালটা হঠাৎ শিথিল হয়ে ঝুলে পড়লো। ঢিপ ঢিপ করছে বুকটা। সন্দেহ হয়, জয়ন্ত ঘোষের বুকের ভিতর থেকে প্রতিশোধের গর্ব ও আনন্দ যেন একসঙ্গে উথলে পড়তে চাইছে। বুকের উপর হাত বুলিয়ে জয়ন্ত ঘোষ বলেন—ওরা কেউ আমার চিঠিরও জবাব দেয়নি; দেবে কি করে? লজ্জার মার তো কম সাংঘাতিক মার নয়। আজ মনে মনে ওরা নিশ্চয় স্বীকার করছে যে, চার-আনি জয়ন্ত ঘোষ যে-সে মানুষ নয়।

বেশ জোরে একটা হাঁফ ছাড়লেন জয়ন্ত ঘোষ। —যাক্ গে ওসব কথা। আমার জামাই মনোময় এখন কলকাতাতে প্র্যাকটিস করছে। বিলিতী স্টাইলের ফার্নিচারে সাজানো দুটি বাড়ি, আর দুটি গাড়ি তার আছে। আমার জামাই মনোময় শুধু সাজ-পোশাকে নয়, মনে-প্রাণেও সাহেব মানুষ। আপনিও হয়তো মনোময়কে দেখেছেন।

—না, দেখিনি।

—যা-ই হোক, আমিও আমার স্বপ্ন সফল করে ছেড়েছি। চার-আনি হয়ে দক্ষিণ পলাশপুরের অজ গেঁয়েমির মধ্যে পড়ে থাকলেও আমার ভাগ্যটা শেষ পর্যন্ত অজ হয়ে যায়নি।

অজ গেঁয়েমি বলতে চার-আনি জয়ন্ত ঘোষ কী বোঝেন, তা তিনিই জানেন। কিন্তু দক্ষিণ পলাশপুরের জমির রূপ-গুণের যে-সব অদ্ভুত তথ্য পাওয়া গেল, তাতে বিশ্বাস করতেই হয় যে, এই জমিতে সত্যিই অদ্ভুত এক অজন্মার ভূত ভর করেছে। উত্তরে তালডাঙ্গা আর পশ্চিমে রাজহাট, এই দুই সীমার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আছে যে জমি, তার প্রায় সবটাই কোনকালে দক্ষিণ পলাশপুরের চার-আনি কর্তার ভূসম্পত্তি ছিল। সে জমিতে ধান ফলে না, কোন কৃষিই সম্ভব হয় না, কেশে ঘাসে ভরাট হয়ে আর পতিত হয়ে পড়ে আছে ওই জমি। ল্যান্ড রেকর্ড অফিসের নথিতে স্বত্বাস্বত্বের খোঁজ নিলে জানা যাবে যে, কেশে ঘাসে ভরাট ওই পতিতের মধ্যে আজকের দক্ষিণ পলাশপুরের দু'পুরুষ আগের যত লাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর আর চাকরান মুখ লুকিয়ে পড়ে আছে।

নদীটার নাম ভাসানি। একটা মজা নদী। চেহারা দেখে বিশ্বাস হয় না যে, কোন কালে এই ভাসানির জলে কোন নৌকা ভেসে বেড়িয়েছে। এই নদীটাই হলো দক্ষিণ পলাশপুরের জমির অভিশাপ, দুর্ভাগ্যের আসল কারণ। এই মজা নদী ভাসানি বর্ষার জলের ঢল বইতে পারে না। সে জল প্রতি পাঁচ হাজার বিঘে ধেনো জমির উপর গড়িয়ে পড়ে অদ্ভুত এক রকমের লালবালুর কাদা ছড়িয়ে দেয়। এরকম বালুর কাদা কোথা থেকে যে বয়ে নিয়ে আসে ভাসানির বর্ষার জলের

ঢল, তা কেউ বলতে পারে না। এরকম লালবালুর কাদাতে শুধু কেশে ঘাসই ভালো ফলে, আউশ আমন ও রবির কোন শস্য ফলাতেই পারে না।

গ্রামের গা ঘেঁষে অবশ্য রবির বেশ ভালো এঁটেল জমি আজও আছে। পূবদিকের তিনশো বিঘে হলো কালচে দোঁয়াশ। ধান মন্দ ফলে না। সে ধানের নাম হীরেশালি, পশ্চিমে রোগা-রোগা সরু জাতের বাঁশের একটা জঙ্গল আর পানের বরজ গোটা কুড়ি।

দক্ষিণ পলাশপুরের ভিতরে ও বাইরের চারদিকে বড় বড় গাছের চেহারা দেখলে একটু আশ্চর্য হতেই হবে। অনুন্নত এই গ্রামের কয়েকটা গাছ বড় বেশি উন্নত। দেবদারু অর্জুন আর পিয়াশাল, অশোক পলাশ জারুল আর শিমূল, কদম ডুমুর আর পাকুড়। কোন সন্দেহ নেই যে, এদের মধ্যে কয়েকটা বুড়ো বুড়ো গাছের বয়স অন্তত দু'-তিনশো বছর হবে। হতে পারে, এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো সতের শতকের স্মৃতি নিয়ে একালের দক্ষিণ পলাশপুরের মাটিতে পুরনো আদরের ছায়া ছড়ায়।

চার-আনির দালানবাড়ির সামনের বাগানে যে কেতকীর একট কুঞ্জ ধরনের ভিড় আছে, সে কেতকীকে একটা বিস্ময় বলে মনে করা চলে। কেতকীর কুঞ্জটাকে নয়, বিস্ময়ের সত্যটাকে আবিষ্কার করেছেন যিনি, তিনি হলেন স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার কৌশিক বসু।

একদিন ভোরবেলাতে, সেটা ছিল আজ থেকে প্রায় দেড় বছর আগের এক ফাল্গুনের প্রথম দিন, একজন অপরিচিত যুবককে বাগানের কেতকীর কুঞ্জটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুবই অপ্রসন্ন হয়েছিলেন চার-আনি জয়ন্ত ঘোষ। বেশ রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করেছিলেন—কে মশাই আপনি? না বলে কয়ে এখানে এই সময়ে...।

কৌশিক কিন্তু বেশ শান্ত স্বরে জবাব দেয়—আমি আপনাদের এই দক্ষিণ পলাশপুরের স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার।

—আপনি আবার কবে সেকেন্ড মাস্টার হলেন?

—সেকেন্ড মাস্টার হৃদয়বাবু কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন। আমি এই এক মাস হলো তাঁরই জায়গাতে এসেছি।

—কিন্তু এখানে কি মনে করে?

—আমি আপনাদের এই কেতকী দেখে খুবই আশ্চর্য হয়েছি।

—কেন?

—আমি জানতাম, সকলেই জানে যে কেতকী ফোটে বর্ষাকালে, আর কেতকীর রং হলো সাদা। কিন্তু কালিদাস লিখেছেন কেতকী বসন্তকালে ফোটে, তার রং হলো হেমাভ, সোনার আভার মতো হলদে। ধারণা ছিল, কালিদাস ভুল কথা লিখেছেন। কিন্তু এই তো এখানে, আপনাদের কেতকীর যে ফুল এই ফাল্গুনে ফুটেছে, তার রং যে সত্যিই হেমাভ।

শুনে শান্ত হলেন জয়ন্ত ঘোষ। তারপর বেশ শান্তস্বরে বললেন—আচ্ছা, এখন তবে আসুন।

ফুলের সাজি হাতে নিয়ে বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে এসেই চমকে উঠলো প্রীতিলতা!—কী ব্যাপার! কী হয়েছে বাবা?

জয়ন্ত ঘোষ বললেন—কিছুই না। গাছ আর ফুলের সম্পর্কে উনি ওঁর বিদ্যের কথা বলছেন।

৩

দক্ষিণ পলাশপুরের বিদ্যা আর শিক্ষার অবস্থা যে কী রকমের করুণ, সেটা স্কুলবাড়ির চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। পুরনো ইঁট দিয়ে আর লাল বালুর কাদা দিয়ে তৈরি এই স্কুলবাড়ির দেয়ালের গাঁথুনি অবশ্য নড়বড় করে না, কিন্তু উপরের খড়ের চালা আর বাঁশের বাতা নড়বড় করে। স্কুলবাড়ির কাছের একটা মাঠে ধসে-পড়া একটা দালানের অনেক ইটের স্তূপ দেখা যায়। বুনো জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গিয়েছে একটা পুরনো পুষ্করিণীর জল; তার ঘাটটাও আজ পুরনো ইটের একটা স্তূপ। এইসব ইট দিয়ে স্কুলবাড়ির দেয়াল গাঁথা হয়েছে। জানা গেল, সেই ভয়ানক বর্ধমান জ্বরের আমলে ভয় পেয়ে বার-আনির যে শরিকের সুখী মানুষগুলি গ্রাম ছেড়ে চিরকালের মতো পালিয়ে গিয়েছিল, এইসব পুরনো ইট তাদেরই দালানের অবশেষ। স্কুলের মর্যাদা এখনও উচ্চ পর্যায়ে উঠতে পারেনি। নবম শ্রেণী পর্যন্ত এসে ঠেকে রয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে বেশিরভাগই হলো কাছাকাছি পাঁচ-সাতটি গ্রামের ছেলে। এই স্কুল পত্তন করেছিল জেলা বোর্ড। এখন সরকারী গ্র্যান্টের সাহায্যে এই স্কুলের স্কুলতা কোনমতে চলছে।

এহেন একটি নিদারুণ গ্রাম্য স্কুলে মাস্টারি করতে কৌশিকের মতো স্কলার ছেলে কেনই বা এল, আর কেনই বা স্থায়ী হয়ে থেকে গেল সেটা ঠিক বুঝতে পারা যায় না।

হেডমাস্টার গৌরহরিবাবু বললেন, আমিও ঠিক বুঝতে পারি না।

শুধু একজন স্কলার ছেলে বললে কৌশিকের পরিচয়ের সবটুকু বলা হয় না। কৌশিক বসু ওই গ্রামের ছেলে নয়, বাইরে থেকে আগত একজন আগন্তুক। কৌশিকের চেহারা দেখে মনে হবে, বোধহয় দ্বিতীয় এক বল্লাল সেন বাইরে থেকে একজন খাঁটি ক্ষত্রিয়কে আমদানি করেছেন। দীঘল বলিষ্ঠ শরীর, কিন্তু নাক চোখ ও মুখের শ্রী বড়ই কোমল। কৌশিক বসু দেখতে খুবই সুন্দর।

হেডমাস্টার গৌরহরিবাবু বললেন—বংশের দিক দিয়ে কৌশিক হলো আদি দশরথ বসুর পরে ষোল পুরুষ। আর, ওদিকে চার-আনির জয়ন্ত ঘোষ হলেন আদি মকরন্দ ঘোষের পরে পনেরো পুরুষ। তাঁর মেয়ে প্রীতিলতাকে বলা চলে, ষোল পুরুষ। কাজেই দু'দিকের কৌলিন্যের দিক থেকে দু'জনের মধ্যে বেশ ভালো মিল ছিল। কিন্তু...হ্যাঁ, আপনার কি সরকারী মৎস্য চাষ বিভাগের কোন কর্তার সঙ্গে চেনাশোনা আছে?

—কেন বলুন তো?

—এ তল্লাটে মাছের উন্নতি করবার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

শুনতে পাচ্ছি, ভয়ানক হল্লা চলছে। বুঝতে পারছি, স্কুলের ক্লাসে পড়া চলছে। ছিপ হাতে তুলে নিয়ে গৌরহরিবাবু বললেন—কিছু মনে করবেন না, আমাকে এখন মাছ ধরবার জন্য বের হতে হবে।

—কোথায় যাবেন?

—ওই যে, বেশি দূরে নয়, ওই রঘুরামের বিলে। অবিশ্যি সেই অঢেল মৎস্য সম্পদ আজ আর নেই। শুধু শোল, চিতল আর বোয়াল। তার চেয়ে বেশি হলো বড় বড় জলঢোঁড়া আর কচ্ছপ। তবু, আজও কিছু-কিছু বাটা, ফলুই আর ট্যাংরার বংশ বেঁচে আছে বলেই ওখানে যাই। বাবার মুখে গল্প শুনেছি, প্রতি বছর আষাঢ় মাসে রঘুরামের বিলে খ্যাপলা জাল ফেলে ইজারাদারের জেলেরা হাজার-হাজার রুই-কাতলা তুলতো আর নৌকা বোঝাই করে বাইরে চালান দিত। সে সময় নদী ভাসানির এরকম মজা অবস্থা ছিল না। মাছের নৌকা তর্‌তর করে ভেসে তিন ঘণ্টার মধ্যে নীলগঞ্জের ঘাটে পৌঁছে যেত। আর এক ঘণ্টার মধ্যে পাইকারেরা লুঠেরার মতো ব্যাকুল হয়ে সব মাছ কিনে ফেলতো। কিন্তু আজ দেখুন...আচ্ছা নমস্কার। আপনার যা জানবার তা ওই কৌশিকের কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন।

জানবার আর কী-ই বা বাকি আছে।

কৌশিক বসু কিন্তু বেশ মুখচোরা স্বভাবের ছেলে। সহজে কিছু বলতে চায় না। তবু, কথায় কথায় একটা অদ্ভুত কথা বলে ফেলেছে কৌশিক। মাত্র পঁচাশি টাকা মাইনে পায় বলে কৌশিকের মনে কোন ক্ষোভ অভিযোগ নেই।

ঠিকই, বেশ সুখী ও শান্ত মন নিয়ে দক্ষিণ পলাশপুরের সেকেন্ড মাস্টরির জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে কৌশিক। বি-এ পাশ করে আর রেলওয়ের সার্ভিসে বেশ ভালো মাইনের কাজের জন্য প্রতিযোগিতার পরীক্ষা দিয়েও শুধু অপেক্ষায় আর আশায় চুপ করে বসে থাকতে পারেনি কৌশিক। গ্রামের স্কুলে তিন-চার মাসের জন্য টেম্পোরারি সেকেন্ড মাস্টারির চাকরি, মাইনে পঁচাশি টাকা, মন্দ কি? একটা নতুন পরিবেশের বাতাস গায়ে লাগানো যাবে।

তিন-চার মাস পরে চলে যাবার জন্যই এখানে এসে সেকেন্ড মাস্টার হয়েছিল কৌশিক। অঙ্কেতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। কৌশিকের মুখের দিকে তাকিয়ে গৌরহরিবাবু আশ্চর্য হয়েছিলেন। —আপনাকে পার্মানেন্ট করা হলেও বোধহয় আপনি এখানে থাকবেন না।

—আজ্ঞে না।

—রেলওয়ের চারশো টাকা মাইনের চাকরিটা আপনি পেয়ে যাবেনই বলে মনে হয়। আপনি ভয়ানক কোয়ালিফায়েড।

—খবর পেয়েছি প্রতিযোগিতার পরীক্ষাতেও আমি ফার্স্ট হয়েছি। কাজেই...।

—চাকরির চিঠি বোধহয় তিন-চার মাসের মধ্যেই এসে যাবে?

—তার আগেও আসতে পারে।

ভুল কথা বলেনি, এমন কিছু বাড়িয়েও বলেনি কৌশিক। দুটো মাস হতে না হতেই চাকরির চিঠি এসে গেল, ঠিক আর দু'মাস পরে নতুন মাসের পয়লা তারিখে চাকুরির কাজে যোগ দিতে হবে।

—কিন্তু কী ব্যাপার? রেলওয়েতে এইরকম ভালো মাইনের একটা চাকরি না নিয়ে আপনি এখানেই রয়ে গেলেন কেন?

প্রশ্ন শুনে কৌশিক হাসতে থাকে—রয়ে গেলাম।

—কিন্তু তার একটা কারণ থাকবে তো?

—কারণ কিছুই নেই। ইচ্ছে হলো, তাই রয়ে গেলাম। দেশের বাড়িতে কাকারা আছেন, মা আছেন কাশীতে। প্রতি মাসে মাকে ত্রিশ টাকা পাঠিয়ে দিই।

—এতেই আপনার জীবনের সব সাধ মিটে গেল?

—না, ছুটির দিনে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে পুরনো পুঁথি সংগ্রহ করি, আর তার পাঠ উদ্ধার করি। সময়টা ভালোই কেটে যায়।

হাসছে কৌশিক। সত্যি বেশ আছে কৌশিক।

৪

জাতের হিসাব নিলে জানা যায় এই গ্রামে অনেক জাতের মানুষ আছে, তাদের ভিন্ন-ভিন্ন পাড়াও আছে। বারুজীবী, বণিক, যুগী, মোদক, কলু, কাঁসারি, কুমার, কামার, নাপিত, রজক আর ভুঁইমালী। কোন পাড়াতে মাত্র দশ ঘর মানুষ, কোন পাড়াতে আবার পঞ্চাশ ঘর। দশ-বিশ ঘর নিয়ে বামুন কায়েতের পাড়াও আছে। একজন কবরেজমশাইও আছেন।

জাত আছে, কিন্তু জাতের পেশা একেবারে নেই বললেই চলে। সেই বর্ধমানের জ্বরের প্রকোপে নয়, একটা অদ্ভুত দুর্ভাগ্যের জ্বরে এই গ্রামের সব জাতের সব পেশা যেন

শুকিয়ে-পাকিয়ে মরে গিয়েছে। মঙ্গলবারে শিবমন্দিরের কাছে ডাঙ্গাতে যে হাট বসে, তার মধ্যে দক্ষিণ পলাশপুরের সব জাতেরই মানুষ তিন সারিতে বসে আর সবজি বিক্রি করে। উচ্ছে, ধুঁদুল, কুমড়ো, লাউ আর কাঁকুড়। মাস বুঝে ওল, সিম, বরবটি আর কাঁচা পেঁপেও থাকে। মুদিদের ডাল নুন আর মশলার পসরাও দেখা যায়। বিশ বছর আগেও এই হাটে দা, কাটারি, লাঙ্গলফলা আর বঁটির অনেক দোকান বসতো। তাছাড়া কাঁসার বাসনের পসরাও ঝকঝক করে খদ্দেরের চোখের লোভ জাগিয়ে তুলতো। এখন আর সে সব পণ্যের কিছুই আসে না। গোবর্ধন অবশ্য দশ-বিশ সের মুগকলাই বিক্রি করে, আর যুগী-পাড়ার শ্রীধর ও চন্দ্রনাথ বিক্রি করে খেরো গামছা। পানের বেচাকেনার হল্লাটাও যেন অনেকগুলি রোগীর কাতরানির শব্দ। গো-বাড়িতে বোঝাই হয়ে বাইরে থেকে অবশ্য চকমকে অনেক রকমের পণ্যের আগমন হয়। প্লাস্টিকের খেলনা আর বাসন, রঙিন শাড়ি আর কোরা ধুতি, সূতির গেঞ্জি আর উলের সোয়েটার, রূপসী ফিল্মি তারকাদের ছবি, টর্চ আর সাইকেলের সরঞ্জাম।

তালডাঙার কাছে মোটর ট্রাক থামিয়ে রেখে পাইকারেরা আসে, সব সবজির সম্ভার কিনে আর গো-গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে চলে যায়। দক্ষিণ পলাশপুরের অর্থনৈতিক প্রাণটা মঙ্গলবারের হাটে বিকেল পর্যন্ত এই ভাবে ও এইরকম একটা সাড়া নিয়ে একটু চঞ্চল হয়, আর সন্ধ্যা হতেই ফুরিয়ে যায়। মোদক মহেন্দ্রের মেঠাইয়ের দোকানে সারাদিনের বিক্রিতে দশ টাকার বেশি আসে না।

সবচেয়ে বেশি করে আসে আর সবচেয়ে বেশি বিকিয়ে যায়, সেটা হলো বাইরের থেকে আসা একটা পণ্য, মিলের মোটা সুতোর ধুতি আর শাড়ি। নীলগঞ্জের তাঁতের কুসুম ফুলের রসে রঙিন করা বাসন্তী রং-এর শাড়ি হলো সবচেয়ে সৌখীন আর দামী পণ্য, খুব কমই বিক্রি হয়। এই গ্রামে ওই শাড়ির ক্রেতা হলো শুধু ওই এক চার-আনি জয়ন্ত ঘোষ।

সন্দেহ হয়, এই হাট বোধহয় সতেরো শতকের একটি সমৃদ্ধ হাটের ধ্বংসাবশেষ। বাইরে থেকে আজও যে এত ক্রেতা-বিক্রেতার আগমন এখানে হয়, তার কারণও বোধহয় স্মৃতিচারণার মতো একটা ব্যাপার। পুরনো অভ্যেসের জের। নইলে পলাশপুরের মতো এরকম একটা দুর্গম অনুন্নত গ্রামে এরকম কোন হাট বসতো না।

জাতপেশার কী অদ্ভুত অসহায় অবস্থা। প্রায় সব পেশারই হাত অসাড় হয়ে গিয়েছে, হাতিয়ারে মরচে ধরেছে। জাতপেশা ছেড়ে দিয়ে কিংবা ভুলে গিয়ে অনেকেই ভিন গাঁয়ের ক্ষেতে মনিষ হয়ে কাজ করে আর দিনমজুরির আড়াই টাকা নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

কাঁসারিপাড়ার মথুরানাথের বিবৃতি : কলকাতা থেকে মহাজনেরা এসে দাদন সাধে বটে, কিন্তু দাদন নিতে পারি না। কাঁসার বাসনের যে দর তারা বেঁধে দিতে চায়, সে দর আমাদের পোষায় না। কাজেই পেশা ছেড়ে দিতে হয়েছে। এ তল্লাটে আমার কাঁসার বাসন কেনবার মতো লোকও নেই। অনেক মেহনত করে পদ্মকলির মতো ধাঁচের একটা পেতলের পিলসুজ গড়েছিলাম। চার-আনির বাবুকে কত করে বললাম, আপনার মেয়ের বিয়ের দানসামগ্রীর জন্য জিনিসটা কিনুন। তিনি বললেন—না, দরকার নেই। বর হলো বিলেত-ফেরত মানুষ, তার বাড়িতে পিলসুজ-টিলসুজ মানায় না।

নীলু ঘোষের বিবৃতি : আমার গোয়ালে এখনও ছ'টা গাই আছে বটে। কিন্তু থেকেও নেই। দুধ যা হয় তাতে দই-ক্ষীরের কিছু কারবার চলছে বটে কিন্তু আর কতদিন চলবে, তা বলতে পারি না। মশার কামড়ে গাইগুলো দিন দিন রক্তহীন হয়ে যাচ্ছে। চার-আনির বাবুকে সেধেছিলাম, আপনার মেয়ের বিয়েতে অন্তত সের দশেক ক্ষীরের অর্ডার আমাকে দিন। তিনি বললেন, না, ক্ষীর-টীরের দরকার নেই। বর হলো বিলেত ফেরত মানুষ। বরযাত্রীদের সাহেবী কেতায় খাওয়ানো হবে।

কবিরাজ অনাদি সেনের বিবৃতি : আমার সালসা-পাঁচনের কোন কদর নেই। রোগীর নাড়ি টেপাটিপি করবার জন্যেও আমাকে কেউ আর ডাকে না। কাজেই আমাকে স্কুলের বাংলা পণ্ডিতের কাজ নিতে হয়েছে। চার-আনির বাবু মাথা ধরার কষ্টে ভুগছিলেন, তাকে দেড় টাকা দামের একটা তৈল দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি নিলেন না। বললেন : আপনার তৈল মাথাতে দিলে আমার মাথার কষ্ট বাড়বে।

অদ্ভুত ব্যাপার, পেশা হারিয়ে দুঃখী হয়ে যাবার এই গ্রাম্যজীবনের অবসাদ ও বিষাদের মধ্যে একটা নতুন পেশা বড়ই ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করে। এরকম বিচিত্র পেশা এবং তার এরকম মূর্তিমন্ত রূপ পৃথিবীতে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় বলে মনে হয় না।

দন্তে তৃণ কাটি, অর্থাৎ একটা খড়কুটোকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে, আর জ্বলন্ত ধুনোর একটা তপ্ত ধুনুচি হাতে নিয়ে গ্রামের এপথে-সেপথে ছুটোছুটি করে একটা লোক। এক-একবার থামে, গরুর মতো একটা বোকাটে শব্দের ডাক ছাড়ে। তারপর সারা গায়ে তপ্ত ধুনুচির ছেঁকা লাগায়। লোকটার নাম হলো ভক্ত হারু।

ভক্ত হারুর বিবৃতি : নিজের পাপের জন্যে নয় মশাই, আমি পরের হয়ে তার পাপের জন্য দন্তে তৃণ কাটি প্রাশ্চিত্তির করি। দক্ষিণা নিই মাত্র পাঁচটি টাকা। অন্য গাঁ থেকেও প্রাশ্চিত্তির করবার কাজ পাই। এ জগতে কে যে কত সাধু পুরুষ, তা আমার জানা হয়ে গিয়েছে। কে না প্রাশ্চিত্তির করালো? কে আর বাকি আছে? শুধু ওই চার-আনির বাবু ভয়ানক ভচ্ছোনা করে আমাকে খেদিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর নাকি প্রাশ্চিত্তির করবার কোন দরকারই কোনদিন হবে না। আমি সেদিন মনে মনে হেসেছিলাম আর বলেছিলাম, দেখাই যাক্ দরকার হয় কি না।

৫

ধর্ম আছে উৎসবও আছে। পাঁচু ঠাকুরের পুজো হলো এই দক্ষিণ পলাশপুরের নিত্যদিনের ধর্মীয় ব্যস্ততা। পাঁচু ঠাকুরের কাছে পুজো আর মানতেও হুড়োহুড়ি লেগেই আছে। শ্মশানে যাবার পথে আছে চণ্ডীতলা, অশ্বত্থের তলায় একটি সিঁদুর মাখানো শিলা। পালপাড়ার জগদ্ধাত্রীর পুজোটাই হলো এই গ্রামের একমাত্র ও সবচেয়ে হর্ষমুখর একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান। এই উৎসবে সবচেয়ে বেশি আমোদ জমিয়ে তোলে নীলগঞ্জের সখীদের গান। ছেলেরা মেয়ে সেজে গান গায়। গানেতে গ্রামের যার-তার নামে যথেচ্ছ রগড়ের কথা থাকে। এ বছরের সখীদের গানে চার-আনির বাবুর মেয়ের নামেও ইঙ্গিত করে কিছু কথা গাওয়া হয়েছে : 'ভাগ্যি নয়তো মাগ্‌গি ভাই ভাদুদিদি বলেন। ফুলতুলুনী মেয়ে আমার মেম সাহেবটি হলেন।'

ঠিক কথা। জানাজানি হতে আর রটে যেতে বেশি দেরি হয়নি। চার-আনির বাবুর মেয়ে তার শ্বশুরবাড়িতে খুবই সুখে আর আদরে আছে। শ্বশুর আর শাশুড়ি দু'জনেই প্রীতিলতাকে খুব ভালোবাসে। বিলেত ফেরত স্বামীর বাড়িতে সাহেবী চালচলনের সঙ্গে নিজেকে খুবই সহজে মানিয়ে নিয়েছে প্রীতি। মঙ্গলবারের হাটে তোলা আদায় করেন যিনি, চক্রবর্তীমশাই, যিনি চার-আনির সব কাজের একজন সরকারমশাই, তিনি এক বছরের মধ্যে তিনবার কলকাতায় গিয়ে প্রীতিকে দেখে এসেছেন। তিনিই বলেছেন, প্রীতি এখন আর সেই বাসন্তী শাড়ির আর ফুলের সাজির প্রীতি নয়। জামাই মনোময়ের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে যখন ময়দানে বেড়াতে যাবার জন্য গাড়িতে ওঠে প্রীতি তখন তাকে সত্যিই শাড়িপরা একটি মেমসাহেব বলে মনে হবে। প্রীতিলতার সাজ-পোশক আর খোঁপাতে নতুন রকমের রঙ আর ভঙ্গী। প্রীতিকে ভালো করে লেখাপড়া শেখাবার জন্য দেড়শো টাকা মাইনের একজন মাস্টার আছেন। প্রীতির বাপের বাড়িতে যাবার কোন কথা উঠলেই শাশুড়ি গম্ভীর হয় আর জামাই মনোময়ের চোখমুখের ভাবটা করুণ হয়ে যায়। শাশুড়ি বলেছেন, বিয়ের পর একটা বছর পার না হওয়া

পর্যন্ত নতুন বউয়ের পক্ষে বাপের বাড়ি যাওয়া আমাদের নিয়ম নয়। প্রীতিও চক্রবর্তীমশাইকে বলেছে—তাই ভালো। আপনি বাবাকে আর মাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন কাকা। এদের দুঃখিত করে এখন দক্ষিণ পলাশপুরে যেতে আমার একটুও ভালো লাগবে না।

মদ খেয়ে সব সময় টং হয়ে থাকেন যিনি, যাঁর নাম রায়বাবু, গো-গাড়ি ভাড়া খাটিয়ে যিনি বেশ ভালোই আয় করেন, তিনি বলেন—কিন্তু একবার এই দক্ষিণ পলাশপুর ছেড়ে চলে গেলে আর ফিরে না আসাও তো একটা নিয়ম।

—তার মানে?

—তার মানে, ছাড়ার মতো করে একবার ছেড়ে চলে গেলে আর কখনও ফিরে না আসাই ভালো। ফিরে এলে নির্ঘাৎ কোন আঘাত অপঘাত পেতে হয়। কবরেজমশাইয়ের বড় ছেলে সুধাকর, যে সুধাকর আজ প্রায় পাঁচ বছর হলো কলকাতাতে আছে, কলকাতাতে চাকরি করে, কলকাতাতেই বিয়ে করেছে, আর মাগ-ছেলে নিয়ে কলকাতাতে ভাড়ার বাসাবাড়িতে থাকে, সে বড়দিনের ছুটিতে একবার এসেছিল। দিনদুপুরে পথের উপর একটা কেউটে সুধাকরকে তাড়া করেছিল। সেদিনই বিকেলে কলকাতাতে ফিরে চলে গিয়েছিল সুধাকর।

জানা গেল, দক্ষিণ পলাশপুরের জীবনে এরকম আরও অনেক নিয়ম আছে। শনিবারের সন্ধেতে পথ হেঁটে তালডাঙাতে না যাওয়াই ভালো, কারণ পথ ভুল করিয়ে দেবার জন্য পথেরই উপর আলেয়া ঘুরে বেড়ায়। চণ্ডীতলার কাছে ডুমুরগাছটা আছে, তার ফল রান্না করে খেতে নেই। খেলে অমঙ্গল হয়। গাছপাকা ডুমুর খাওয়াই ভালো, এবং খাওয়ার পর মুখ ধুতে নেই। রাত্রিবেলাতে কুকুরের কান্নার শব্দ কানে এলে ঘরের দরজার কপাটে তিনবার টোকা দিতে হয়। পূবমুখো হয়ে হাই তুলতে নেই। যদি মাঝরাতে পায়ের শব্দ শুনতে পাও, কিন্তু কোন ছায়া দেখতে না পাও, তবে দরজার হুড়কোতে পুরনো ঝাঁটা একবার ছুঁইয়ে দেবে। ভোরবেলাতে চার-আনির দেউড়ির মাটি মাড়াতে নেই; মাড়িয়ে ফেললে একটু গোবর মাড়িয়ে নিতে হবে।

দক্ষিণ পলাশপুরের এইসব করতে নেই আর করতে হয় যেন গ্রামবাসী মানুষগুলির মনের পাতালের যত দেবতা; কেউ ভয় দেখায় কেউ বা লোভ দেখায়। এবং এদের বিক্রমও কিছু কম নয়। গ্রামের কোন মানুষ এদের শাসন মেনে চলতে কখনও ভুল করে না, ভুলেও যায় না।

মোড়লের শাসন এখন আর নেই বললেই চলে। জাতের শাসন অবশ্য কিছুটা আছে। গত এক বছরের মধ্যে একঘরে করে শাস্তি দেবার তিনটে ঘটনা হয়েছে।

এক বছরের চুরির সংখ্যা হলো একুশ, খুনের সংখ্যা দুই, আর মেয়েমানুষ নিয়ে গণ্ডগোল ও মারামারির সংখ্যা হলো সাত।

রোগের মধ্যে মা শীতলার কৃপার ঘটনা সবচেয়ে বেশি। গত বছর মা শীতলার মাথাতে তুলসীপাতা রাখতে পারা যায়নি। যতবার রাখা হয়েছে ততবারই নাকি গড়িয়ে পড়ে গিয়েছে। গত বছরে বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েছিল প্রায় একশত জন, মরেছিল আশি জন। ওলাউঠায় মৃতের সংখ্যা ছয়, সর্পাঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা তিন।

মনে হতে পারে, দক্ষিণ পলাশপুরের এইসব রোগ মরণ আর দরিদ্রতার হাহাকারের দাপটে আনন্দের সব বাদ্য-টাদ্য নীরব হয়ে গিয়েছে। গান-টানও প্রায় বোবা হয়ে গিয়েছে। চড়কের সময় ঢাক অবশ্য বাজে, কিন্তু সেই বাজনার তেমন কোন জোর নেই। কচিৎ কোন সন্ধ্যাবেলাতে চাষী গেরস্থের মেটে ঘরের দাওয়াতে কেরোসিনের কুপি জ্বলে, খোলের শব্দও বাজে। ঘণ্টা দু'তিন নামকীর্তন চলে—হা রে কিষ্ণ, হা রে কিষ্ণ, হা রে কিষ্ণ হারে হারে! কে জানে, নামকীর্তনের ভাষার এই বিকার নিতান্ত উচ্চারণের বিকার কিনা। ব্যস্, ওই পর্যন্ত। এই গ্রামের মাঠে কোন রাখালিয়া বাঁশি-টাশি বাজে না। দক্ষিণ পলাশপুরের অবস্থা দেখলে মনে হবে, ওটা নিতান্তই মিথ্যে কবি কল্পনা।

কিন্তু কী আশ্চর্য, রায়বাবুর গরু চরায় যে ছেলেটি, তার হাতে সব সময় একটা ট্রানজিস্টার দুলে-দুলে আর ঘুরে ঘুরে ফিল্মি গান শোনায়।

না, ধারণা করলে ভুল হবে যে, দক্ষিণ পলাশপুরে এই গ্রাম্যতার সবটাই হলো সেকেলে জীবনের যত জীর্ণ-শীর্ণ অবশেষ। একেলে জীবনের বিচিত্র রকমের অনেক রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ এই অনুন্নত গ্রামটির জীবনে প্রবেশ করেছে। পালপাড়ার বাচ্চা ছেলেমেয়েরা প্লাস্টিকের রঙিন ডিসেতে মুড়ি খায়। গো-গাড়ি হাঁকিয়ে রোজ তালডাঙ্গাতে যায় যে বৈদ্যনাথ আর লক্ষ্মীচরণ, তাদের চোখে কালো কাঁচের চশমা, কড়া রোদের চেহারা ওদের চোখে আর সহ্য হয় না। স্কুলে যাবার সরু রাস্তাতে অনেক ধুলো অনেক কাদা আর অনেক গর্ত। তবু রায়বাবুর দুই ছেলে সাইকেল চেপে স্কুলে যায়। রায়বাবু বলেন—বিলিতী ওষুধের একটা শিশিও এ গাঁয়ে দেখতে পাবেন না, কিন্তু চেষ্টা করে খোঁজ নিলে দু'-চারটে বিলিতী মদের বোতল নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন।

দুঃখ হয়, দক্ষিণ পলাশপুরের এই অবস্থা যেন একটা আধপোড়া ফিনিক্স পাখির যন্ত্রণাময় চেহারাটার দৃশ্য। ভালো হতো, যদি ভালো করে পুড়ে গিয়ে একেবারে ভস্ম হয়ে যেত এই দক্ষিণ পলাশপুর। তাহলে নতুন করে প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠতো হয় সতের শতকের অখণ্ড-অটুট একটি গ্রাম্যতার চেহারা নিয়ে, নয়তো সিন্ধ্রি চিত্তরঞ্জন ও দুর্গাপুরের মতো বিশ শতকের জনপদী মূর্তি নিয়ে।

তাই ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য বোধ করতে হয়, কৌশিক বসুর মতো আধুনিক স্কলার ছেলে রেলওয়ে সার্ভিসের চারশো টাকা মাইনের একটা অফিসারী পদের মায়া তুচ্ছ করে কেন আর কিসের জন্য এই আধপোড়া দশার দক্ষিণ পলাশপুরে পড়ে আছে।

৬

এক বছর আগের ফাল্গুনেরই একটা মঙ্গলবারের হাটে তোলা আদায় করতে যখন ব্যস্ত ছিলেন চক্রবর্তীমশাই তখন সেই ব্যস্ততারই মধ্যে হেডমাস্টার গৌরহরিবাবুর মুখে একটা খবরের কথা তিনি শুনেছিলেন। আর চমকে উঠেছিলেন। খবরের মতো খবর আর চমকে ওঠবারই মতো কথা। সেকেণ্ড মাস্টার কৌশিক বসুর মস্ত মাইনের একটা চাকরির চিঠি এসেছে। চাকরির শুরুতেই চারশো টাকা মাইনে। চলে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে কৌশিক। তাই এখন ভাবতে হচ্ছে কী করে আর কোথা থেকে আবার একজন সেকেন্ড মাস্টার পাওয়া যায়। কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার দরকার হবে বোধহয়।

সেই মুহূর্তে আরও ব্যস্ত হয়ে, আর, বলতে গেলে একরকম দৌড় দিয়ে চার-আনির জয়ন্ত ঘোষের বাড়িতে এসে খবরটাকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন চক্রবর্তীমশাই। তারপর স্কুলবাড়িতে গিয়ে আর কৌশিক বসুকে সঙ্গে নিয়ে জয়ন্ত ঘোষের বাড়িতে এলেন আর হাঁফ ছাড়লেন।

জয়ন্ত ঘোষ খুশি হয়ে হাসলেন আর বললেন—এস বাবা, বসো বসো। শুনেছি তুমি নাকি স্কুলের মাস্টারির কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে?

কৌশিক—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—শুনেছি, তুমি নাকি রেলওয়েতে চারশো টাকা মাইনেতে একটা চাকরি পেয়েছ?

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর কতদিন এখানে আছ?'

'বড় জোর আর একটা মাস।'

'তোমরা তো কুলীন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমাদের দেশ?'
'ত্রিবেণী, হুগলী।'
'দেশে বাড়ি আছে?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ।'
'বাড়িতে আর কে আছেন?'
'কাকারা আছেন।'
'তোমার বাবা?'
'তিনি নেই।'
'তোমার মা?'
'কাশীতে আছেন।'
'তোমার বড়কাকার নামটা আর ঠিকানাটা বলবে?'
'হ্যাঁ, জ্ঞানময় বসু, নতুনবাজার, ত্রিবেণী, হুগলী।'
'একটু চা খাও।'
'দিন।'

চেঁচিয়ে ডাক দিলেন জয়ন্ত ঘোষ—প্রীতি, চা দিয়ে যা।

প্রীতি আসে, চা দিয়েই চলে যায়। জয়ন্ত ঘোষ বললেন—আমার এই মেয়েই আমার একমাত্র সন্তান।

জয়ন্ত ঘোষের সঙ্গে এই আলাপ সংলাপের ঘটনার পর মাত্র সাতটা দিন পার হয়ে আর একটা মঙ্গলবারের সকালবেলার রোদ যখন ঝলমল করে জেগে উঠেছে, ঠিক তখন একটা হঠাৎ বিস্ময়ের আবির্ভাবের মতো চার-আনির বাড়ির দেউড়ির কাছে গো-গাড়ি থেকে নামলেন এক ভদ্রলোক, কলকাতার ডাক্তার শ্রী সুবিনয় দত্ত।

প্রজাপতির কি চমৎকার নির্বন্ধ। মামা সুবিনয় দত্ত তার ভাগ্নী প্রীতিলতার জন্য একটি পাত্রের খবর নিয়ে এসেছেন। পাত্র হলো সুবিনয় মামারই জ্ঞাতি সোমেন দত্তের ছেলে মনোময়। বিলেত ফেরত ডাক্তার মনোময়। পাত্রের ইচ্ছা আর পাত্রের বাপ-মার ইচ্ছার একমাত্র দাবী হলো, খুব সুন্দর মেয়ে চাই। আর কোন দাবী নেই। এবং কোন সন্দেহ নেই যে, প্রীতির মতো সুন্দর মেয়ে হাজারে কেন, লাখেও একটা পাওয়া যায় না। সুতরাং...

সুতরাং শুভস্য শীঘ্রম্। আর দশটা দিন পরেই প্রীতিলতার বিয়ে হয়ে গেল। বর মনোময়কে দেখবার জন্য পুরনো মন্দিরের কাছে রাস্তার উপর দক্ষিণ পলাশপুরের ছেলে-মেয়ে বুড়োর বিরাট একটা ভিড় যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। বিয়ের অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকে পুরুত এসে মন্ত্র পড়েছিল, হোম করেছিল। আর, সুবিনয় মামা তাঁর নিজের চেষ্টায় সব বন্দোবস্ত করে আর বেশ খরচ করে চার-আনির এই পুরনো দালানের বারান্দাতে বরযাত্রীদের সাহেবী কেতায় ডিনার খাইয়েছিলেন। কেটারিং-এর লোক এসেছিল দশ জন, বরযাত্রী পাঁচ জন।

গ্রামের কেউই নিমন্ত্রিত হয়নি। মামা সুবিনয় দত্ত বলেছিলেন, গ্রামের কাউকে লুচিমণ্ডা খাওয়ানো চলবে না। হাটের তোলা আদায় করে যার জীবনযাত্রা কোন মতে কায়ক্লেশে চলছে, তার মেয়ের বিয়েতে গেঁয়োদের নিয়ে দীয়তাং ভুজ্যতাং করবার কোন মানে হয় না।

তারপর? তারপর আর কি-ই বা হতে পারে। দক্ষিণ পলাশপুরের কোন আলোছায়ার চেহারা বদলে যায়নি। শুধু একটি দৃশ্য মুছে গিয়েছিল, চার-আনির বাগানে সকালবেলাতে ঘুরে ফিরে ফুল তুলতে সেই সুন্দরী মেয়েটিকে আর দেখা যায়নি।

সকালবেলার রোদে অনেককালের পরিত্যক্ত বৈরাগীপাড়ার যত বাস্তুভিটার ঘাসের উপর কেউটে ঘুরে বেড়িয়েছে। শুধু কি কেউটে? দাঁড়াশ কালচিতি শাঁকিনী বেত-আছড়া ও আরও

কত জাতের কত যে আছে, তার হিসেব করা সম্ভব নয়। ঠাট্টা করে বলতে ইচ্ছে করে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ খুব একটা গ্র্যান্ড সাকসেস হয়নি। সাপেরা হাজারে হাজারে পালিয়ে এসে এই দক্ষিণ পলাশপুরে ঠাঁই নিয়েছিল। দক্ষিণ পলাশপুরের সর্প সম্পদ বড়ই বিপুল।

এর মধ্যে যে সাপের নাম সন্ন্যেসী গোখ্‌রো, সে সাপ এই বিশ্বে অন্য কোথাও নেই বলে মনে হয়। গেরুয়া রং-এর গোখ্‌রো। এরা চার-আনির বাড়ির দেউড়ির আর পাঁচিলের ফাটলের মধ্যে বাস করে। ডানপিটে ছেলেরা কোন সন্ন্যাসী গোখ্‌রোর মাথা লক্ষ করে ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি করলেই রেগে যান আর চেঁচিয়ে ধমক দেন মাতাল রায়বাবু। —থাম্ ছোঁড়ারা। ওরা কার কি ক্ষেতি করেছে রে? ওদের মারিসনে, কখ্‌খনো মারবিনে। ওরা গুপ্তধন পাহারা দেয়।

কিন্তু ডানপিটে ছেলেরা, কিংবা আগন্তুক বেদেরা ও ব্যাধেরা যখন গুলতি চালিয়ে আর আঠা মাখানো জাল পেতে গ্রামের গাছের পাখিগুলোকে মারে আর ধরে, তখন হেসে হেসে চেঁচিয়ে ওঠেন রায়বাবু—ধর ধর ধর। সব ধরে ফেল। ঘুঘুর মাংস তো মাংস নয়, আয়ু বাড়াবার ওষুধ।

তবু দক্ষিণ পলাশপুরের পক্ষিসম্পদ একেবারে ফুরিয়ে যায়নি। জলপাইগুড়িতে পাখির সরকারী স্যাংচুয়ারিতে যাদের খুব কম দেখা যায় কিংবা দেখতেই পাওয়া যায় না, সেরকম বিরল জাতের অনেক পাখি এখানে আছে। সাদা পেঁচা, ময়না, টিয়া, ধনেশ, দোয়েল আর নীলকণ্ঠ অনেক দেখা যায়।

একটা বৎসর চুপ করে থাকবার পর দক্ষিণ পলাশপুরের দোয়েল যেদিন ডুমুরগাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে শিস বাজাতে শুরু করেছিল, সেটা ছিল ফাল্গুনেরই একটা দিন। গ্রামের ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সবাই আবার দলে দলে এসে আর ভিড় করে গ্রামের মাঝপথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো। কলকাতার শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এসেছে চার-আনির মেয়ে। গো-গাড়ির ভিতরে বসে আছেন সেই মেয়ে; কী চমৎকার তার সাজের শাড়িটি। চুড়োর মতো খোঁপা। মেয়ের দু'ঠোঁটের মিষ্টি হাসির রকমটাও বদলে গিয়েছে। চার-আনির সেই মেয়েকে আর চেনাই যায় না।

হেডমাস্টার গৌরহরিবাবু বেহায়ার মতো সেদিন সন্ধেবেলা কেন যে নিজেই যেচে কিংবা কে জানে কিসের গরজে চার-আনি জয়ন্ত ঘোষের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, তা তিনিই জানেন। বাইরের ঘরে বসে তখন গল্প করছিলেন চার-আনির বাপ মা ও মেয়ে।

গৌরহরিবাবুকে এভাবে হঠাৎ উপস্থিত হতে দেখে খুবই রাগ করেছিলেন জয়ন্ত ঘোষ। —কী ব্যাপার? আপনি আবার আমার এখানে কেন, কিসের জন্য? একটা সেকেন্ড মাস্টার পেতে হলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিন।

'আজ্ঞে না, বিজ্ঞাপন দেবার দরকার নেই।'

'কেন?'

'সেই সেকেন্ড মাস্টার কৌশিক তো আর চলে যায়নি।'

'কেন?'

'কে জানে কেন! অদ্ভুত এক খেয়ালী ছেলে। যত সব অদ্ভুত খেয়ালের কাণ্ড! চাকরির চিঠিটাকে একদিন ফরফর করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলো, আমি আর যাব না স্যার, এখানেই থাকবো।'

'কাণ্ডটা কবে হলো?'

'সেই যেদিন আমাদের মা-মণির বিয়ে হয়ে গেল।'

চার-আনি জয়ন্ত ঘোষের রাগের চোখ দুটো একবার কেঁপে উঠেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর গৌরহরিবাবুর সেই মা-মণি প্রীতিলতার চোখদুটো হঠাৎ নিষ্পলক হয়ে গৌরহরিবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

তারপর, রাত্রি ফুরিয়ে ভোর হতেই যখন ডুমুরগাছের দোয়েল শিস বাজাতে শুরু করেছে, তখন দেখা গেল কী অদ্ভুত ব্যাপার, চার-আনির মেয়ে প্রীতিলতা, আর মাত্র তিন দিন পরে কলকাতায় শ্বশুরবাড়িতে চলে যাবে যে মেয়ে, সেই মেমসাহেব মেয়ে নীলগঞ্জের তাঁতের বাসন্তী শাড়ি পরে আর ফুলের সাজি হাতে নিয়ে বাগানের ফুল তুলছে। বোধহয় চোখ দুটো ছলছল করে উঠছে, তাই বার বার মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে আর বার বার থমকে দাঁড়াচ্ছে প্রীতিলতা।

সেদিন দুপুরবেলার ঘটনার দৃশ্যটা আরও অদ্ভুত, একেবারে ভয়ানক রকমের অদ্ভুত। চার-আনির বাড়ির বারান্দার কাছ থেকে একটা দৌড় দিয়ে দেউড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আর দন্তে তৃণ কাটি গরুর ডাক ছাড়ছে ভক্ত হারু নামে সেই চিমড়ে চেহারার লোকটা।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে সারা শরীর ঝাঁকিয়ে ছটফট করলো ভক্ত হারু। প্রাশ্চিত্তিরের যন্ত্রণা দেখাচ্ছে হারু। তারপর জ্বলন্ত তপ্ত ধুনুচি হাতে নিয়ে দৌড় দিল। হঠাৎ এক-একবার থামে, রাস্তার ধুলোর উপর শুয়ে পড়ে আর তপ্ত ধুনুচি দিয়ে বার বার বুকের উপর ছেঁকা দিতে থাকে।

এই অনুন্নত অদ্ভুত দক্ষিণ পলাশপুরের উন্নতির জন্য সমীক্ষার রিপোর্টে আপাতত এই সুপারিশ করতে হয় যে, ভাসানি নদীটার একটা বাঁধ দরকার। জলের ঢল সামলাবার জন্যে সেই বাঁধে বেশ বড় কয়েকটা স্লুইস গেটও দরকার। স্কুলটার জন্য সাহায্যের গ্র্যান্ট বাড়াবারও দরকার আছে যাতে দশম শ্রেণী সহজে চালু করা সম্ভব হয়। অন্তত তালডাঙ্গা থেকে দক্ষিণ পলাশপুর পর্যন্ত কাঁচা রাস্তাটাকে পাকা করে দেওয়া উচিত। আর, জানা দরকার কিসের জন্য গ্রামের মানুষগুলির পুরনো পেশা ও কুটিরশিল্প একেবারে মরেই গেল। জানা দরকার, সরকারী পুরাকীর্তি সংরক্ষণের কর্তারা আজও সতেরো শতকের জীর্ণ মন্দিরটাকে সংস্কার করে টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন না কেন। তাছাড়া আরও একটু জানা দরকার, এত ভয়েল শিফন আর জর্জেট থাকতে সেদিন নীলগঞ্জের তাঁতের বাসন্তী শাড়ি কেন পরেছিল চার-আনির মেয়ে প্রীতিলতা? আর বাগানের ফুল তুলতে গিয়ে তার চোখ দুটোই বা ছলছল করছিল কেন?

ধূলিস্নান

এরা দু'জন যেন সাংখ্যের পুরুষ আর প্রকৃতি। প্রকৃতি চালাচ্ছেন আর পুরুষ চলছেন।

অবিনাশবাবু, যিনি এককালে কোন এক কলেজে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি এখনও মাঝে মাঝে হেসে হেসে আর শান্তস্বরে যাদের সম্পর্কে কথাটাকে বলে থাকেন, তারা হলো অবিনাশবাবুর বাড়ির ঠিক সামনের বাড়ির স্বামী আর স্ত্রী।

ফটিকদা, যিনি শখের থিয়েটারে অনেক অভিনয় করে নিজের মুখের ভাষাটাকেও বেশ একটু নাটুকে করে তুলেছিলেন, তিনি বলতেন, এ যেন মেঘের বিদ্যুতের বাসা। যাদের দু'জনের সম্পর্কে ফটিকদার ধারণাটা খুব আশ্চর্য হয়ে কথা বলতো, তারা হলো ওই স্বামী আর স্ত্রী, অবিনাশবাবুর বাড়ির ঠিক সামনের বাড়ির নরেশ আর নীরজা। নরেশ দেখতে খারাপ নয়, আর নীরজাও রূপসী নয়। তবু ফটিকদার কথাটাকে খুব ভুল তুলনার বাচালতা বলে কেউ মনে করেনি। নরেশ যখন কারও মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায়, তখন মনে হবে, নিতান্ত এক নিরীহতার দুটি চোখ যেন তাকিয়ে আছে। কিন্তু নীরজার চোখের তারা ঝিকমিক করে; মনটা যেন ওই চোখের চাহনিতে অদ্ভুত একটা আলো হয়ে ঠিকরে পড়তে চায়।

কে যেন নিন্দে করেই কথাটা বলে ফেলেছিল—একটুও মানায় না। তার মানে, নরেশের মতো নিরীহতার কাছে নীরজার মতো একটা ঝকমকে ব্যস্ততাকে একটুও মানায় না। সত্যি, নরেশ যেন একটা অলস শান্তির ছবি। বাইরের ঘরে একটা চেয়ারের উপরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একেবারে সুস্থির হয়ে বসে থাকে। আর, নীরজা যেন সব সময় কাজে ব্যস্ত একটা চঞ্চলতার হাওয়া। ডাক পিয়ন এসে দরজার কাছে দাঁড়ালে নীরজাই ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে। সব চিঠি নীরজাই পড়ে। তারপর নীরজা নিজেই সেইসব চিঠিকে আবার হাতে তুলে নিয়ে বাইরের ঘরে নরেশের হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে একটা-দুটো চিঠি নীরজার হাতেই থেকে যায়; কিন্তু সেজন্য নরেশের চোখে কোন প্রশ্নের ছায়াও দেখা যায় না। নীরজার ইচ্ছা, নীরজা নিজেই জানে ও বোঝে, কোন্ চিঠি নরেশের পড়বার দরকার আছে, আর, কোন্ চিঠি নরেশের পড়বার কোন দরকার নেই।

বাগানের মালী যখন লাল গোলাপের গায়ে পোকার ওষুধ ছিটিয়ে দেবার জন্য পিচকারী হাতে নিয়ে ঘোরাঘুরি করে, তখন নীরজাও ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে। মালীর কাছে দাঁড়িয়ে কাজ দেখে, যেন কাজে কোন ফাঁকি না থাকে, যেন কোন ভুল না হয়।

পাঁচ বছর আগে একদিন ওই লাল গোলাপ নেবার জন্য স্কুলের ছেলেরা এসেছিল। স্কুলের প্রাইজের অনুষ্ঠানে টেবিল সাজাতে হবে, তাই লাল গোলাপের দুটো তোড়া দরকার। ছেলেরা সে দরকারের কথা নরেশের কাছে বলেও ছিল। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। নরেশ শুধু শান্তভাবে হেসে একটি কথা বলেছিল—আমি তো কিছু বলতে পারছি না, তোমরা ওঁকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ।

হ্যাঁ, ছেলেরা শেষে নীরজারই কাছে গিয়ে অনুরোধের কথাটা বলেছিল। আর, নীরজাও খুশি হয়ে মালীকে দিয়ে প্রায় এক ঝুড়ি লাল গোলাপ তুলিয়ে নিয়ে ছেলেদের দিয়েছিল।

কিন্তু আগের দিনের নরেশ ঠিক এরকমের একজন শুদ্ধ নরেশ ছিল না। আজ থেকে দশ বছর আগে এই বাড়িতে যে নরেশ তানপুরা হাতে নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা যখন-তখন গান গেয়েছে, সে নরেশ আর গান গায় না। সেজন্য অবিশ্যি এই সংসারের গানের প্রাণের কোন ক্ষতি হয়নি, হবেও না। কারণ, নরেশের গলার সেই গানে শোনবার মতো অথবা শুনে খুশি হবার মতো কোন ব্যাপারই ছিল না। অনেকেই জানেন, বিশেষ করে সামনের বাড়ির অবিনাশবাবু জানেন যে, নরেশের গানের বাতিক একদিন নীরজারই ইচ্ছার একটি স্পষ্ট কথার কাছে বিনত হয়ে শেষে একেবারে স্তব্ধ হয়েই গিয়েছে।

শুধু গান গেয়েই জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, সে গান পৃথিবীর কোন দরকারে লাগুক বা না লাগুক, এরকম একটা নিশ্চিন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি ছিল বলেই বোধহয় নরেশ আর আইনের পরীক্ষাটা দেয়নি। উকিল না হলেও চলবে। নরেশের বাবা তাঁর একমাত্র ছেলের জন্য এই শহরের মধ্যেই ছোট-বড় যে দশটি বাড়ি রেখে গিয়েছেন, তার ভাড়াই যথেষ্ট। নীরজার বাবাও বোধহয় নরেশের শুধু এই সম্পত্তির দিকে তাকিয়ে অনেক কথা ভেবেছিলেন, তাই নরেশের মতো ছেলের কাছে তাঁর একমাত্র মেয়ে নীরজাকে সঁপে দিয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন।

এই দশ বছর ধরে নীরজাও যেন প্রতি মুহূর্তের চিন্তা আর আগ্রহ দিয়ে এই বাড়িকে নিজেরই মনের মতো একটি খুশির স্বর্গ করে গড়ে নিয়েছে। নরেশের কোন আপত্তি গ্রাহ্য করেনি নীরজা। আইন পাশ করতেই হবে, নীরজার ইচ্ছার সেই নির্দেশ যেন একটা দুরন্ত আকাশবাণী। অবাধ্য হতে পারেনি নরেশ। পাটনাতে গিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে, আইন পাশও করেছে। তারপর নীরজা যা চেয়েছে, তাও হয়েছে। মুন্সেফ আদালতে রোজই একবার ঘুরে আসে নরেশ। ঠিক সকাল দশটার সময় বের হতে হয়। নীরজা বলেছে, কেস থাক বা না থাক, রোজ একবার আদালতে যেতেই হবে।

এই শহরের এই পাড়ার প্রায় সকলেই জানে, আজকের এই নরেশ আর সে নরেশ নয়। বদলে গিয়েছে নরেশ। যে নরেশ ঘরের ভিতরে চুপ করে বসে থাকতেই পারতো না, বেলবাগানের কাছে ওই এবড়ো-খেবড়ো মাঠেরই এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করে বেড়াত, বাচ্চা ছেলেগুলোর সঙ্গে ডাণ্ডা-গুলি খেলতে গিয়ে সারা বিকালটাই পার করে দিত, সেই নরেশ আজকাল যেন শান্ত এক তপস্বীর মতো এই বাড়ির বাইরের ঘরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। নীরজা বলেছে, ওরকম ছেলেমানুষি ছটফটানি তোমাকে একটুও মানায় না। একটুও ভালো দেখায় না। কাজ যখন থাকবে না, তখন চুপ করে ঘরের ভেতরে বসে থাকবে।

অবিনাশবাবুর আজও মনে পড়ে এই নরেশ. যার মাথাতে আজ খুব ছোট করে ছাঁটা চুলের একটা স্তবক শক্ত হয়ে বসে রয়েছে, তার মাথার ঢেউ-খেলানো চুলের ঝালর প্রায় কান পর্যন্ত গড়িয়ে পড়তো আর দুলতো। ফুটবল বেশ ভালোই খেলতো নরেশ। পাড়ার অনেকে আজও স্মরণ করতে পারে, খেলার মাঠে যখন ছুটে ছুটে বল ধরতো নরেশ, তখন নরেশের মাথার ঢেউ খেলানো চুল যেন পাগল সন্ন্যাসীর জটার মতো এলোমেলো হয়ে উড়তো। সেই নরেশকে আজ দেখলে মনে হবে, এই মানুষ জীবনে কোনদিন কোন ফুটবলের চেহারাও বোধহয় দেখেনি।

নীরজার দুই চোখের ওই দ্যুতির সঙ্গে যেন একটা তৃপ্তিও আলো হয়ে হেসে ওঠে। সত্যিই যা চেয়েছিল নীরজা, তাই হয়েছে। অবিনাশবাবুর মেয়ে চিত্রালীর কাছে বলতে গিয়ে নীরজার চোখের ওই আলো সত্যিই ঝিলিক দিয়ে হেসে ওঠে—আমি যদি যেতে বলি, তবেই উনি যাবেন। নইলে যাবেন না, যেতে পারবেনই না, অসম্ভব।

অর্থাৎ, শিশিরবাবুর মেয়ের বিয়েতে নেমতন্ন রক্ষা করতে আজ সন্ধ্যাবেলা নরেশদা যাবেন কিনা—চিত্রালী শুধু এই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল, কারণ শিশিরবাবু বার বার চিত্রালীর বাবা অবিনাশবাবুকে অনুরোধ করেছেন, যেমন করে পারেন নরেশকে নিয়ে আসবেন।

ওই শিশিরবাবুর সঙ্গে নরেশের একটা আত্মীয়তার সম্পর্কও আছে। তাছাড়া নরেশের বাবা ছিলেন শিশিরবাবুর অন্তরঙ্গ উপকারী বন্ধু। শিশিরবাবুও জানেন, বিয়ের পর কত বদলে গিয়েছে নরেশ। এই নরেশ যে নিজেই যখন-তখন শিশিরবাবুর বাড়িতে এসে চেঁচিয়ে ডাক দিত, এক গেলাস ঠান্ডা জল দিন কাকিমা। সে নরেশ এই দশ বছরের মধ্যে মাত্র একদিন শিশিরবাবুর বাড়িতে এসেছিল, যেদিন ওই কাকিমাই এক গেলাস জল খেতে গিয়ে হেঁচকি তুলে অজ্ঞান হয়ে গেলেন, তারপর মরে গেলেন। তিন বছর ধরে ভয়ানক রকমের একটা বুক-ব্যথার রোগে ভুগছিলেন শিশিরবাবুর স্ত্রী, নরেশের আত্মীয়া কাকিমা।

নীরজার প্রাণটা যেন একজন শিল্পী, আর নরেশ যেন একটা শিল্প। নীরজা যেমন করে গড়েছে, তেমনভাবেই গড়ে উঠেছে নরেশ। কোনদিনও আপত্তি করেনি। কোন প্রশ্নও করেনি। নীরজার ইচ্ছার কথাগুলিকে যেন শোনামাত্র মাথা পেতে মান্য করে নিয়েছে নরেশ। নীরজা যদি মনে করে, এই বোশেখ মাসের গরমে খাঁটি দুধ নরেশের পক্ষে ভালো নয়, দই ভালো, তবে নরেশও মনে করে, দই ভালো, খাঁটি দুধ এই শরীরে আর এই গরমে কখনই সহ্য হবে না।

অবিনাশবাবুর স্ত্রী মনোরমার আজও বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে, ওই নীরজা এই বাড়িতে প্রথম যেদিন এল, সেদিন নীরজার কাছে কম করে বোধহয় দশটা হাসির গল্প বলেছিলেন মনোরমা। নীরজা কিন্তু একটুও হাসেনি। শুধু দুই কালো চোখের দুটো ঝিকঝিকে তারা থেকে অদ্ভুত রকমের একটা আলো, যেন একটা তীব্র দীপ্ত জিজ্ঞাসার যন্ত্রণাকে ঠিকরে দিয়ে মনোরমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সেই নীরজা আজকাল সব সময় সারা মুখ হাসিয়ে নিয়ে ওই বাড়ির সব কাজের ব্যস্ততার মধ্যে ছুটোছুটি করে। যেন এক কৃতার্থা জয়িনীর মূর্তি। এই বাড়ির যত ঘরের দরজা ও জানালার পর্দাগুলি নীরজারই ইচ্ছার বাছাই-করা রং আর ডিজাইন নিয়ে দুলতে থাকে, যখন পাহাড়তলির সবুজ শালবনের ঠান্ডা হাওয়া ছুটে এসে শহরের পাড়ায় পাড়ায় যত গাছপালার মাথার পাতা দুলিয়ে দেয়।

নীরজা কোন দিনও এই বাড়ির বাইরে গিয়ে কোন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলেনি। যদি কোন মহিলা হঠাৎ কোনদিন এবাড়িতে এসে পড়েন, তবে নীরজা অবশ্য একটা নিরীহ অস্তিত্বের মতো মুখ লুকিয়ে কিংবা নীরব হয়ে বসে থাকে না। না, নীরজার ব্যবহারে সৌজন্যের অভাব কেউ কখনো দেখতে পায়নি। নীরজা যে কারও বাড়িতে যায় না, সেটাও বোধহয় একটা কঠিন অহমিকা নয়। খুব সম্ভব, একটা অভিরুচি। যেন নিজের ঘরে একেশ্বরী হয়ে থাকবার আনন্দের কাছে আর কোন আনন্দ ভালোই লাগে না। চিত্রালী কতবার বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছে, একবার আসুন না বউদি। ক্যারম খেলবেন, আসুন। কিন্তু শুধু হেসে সাড়া দিয়েছে নীরজা, না ভাই, এখন সম্ভব নয়।

—কেন? এখন তো বেলা তিনটে মাত্র। নরেশদা তো আদালত থেকে ফিরবেন সেই প্রায় পাঁচটায়।

নীরজা হাসে—না, ঠিক সাড়ে চারটেয়।

—কেন?

—আমার বলা আছে, বাড়ি আসতে যেন সাড়ে চারটের পর আর এক মিনিটও দেরি না হয়।

—যদি দেরি হয়?

নীরজা—হবেই না, অসম্ভব।

চিত্রালী জানে, ঠিকই বলেছেন নীরজা বউদি। নরেশদা যেন কাঁটায় কাঁটায় বাধ্য একটা যন্ত্রের মতো নীরজা বউদির কথা মান্য করে চলেন। ঝড়-বাদল থাকলেই বা কি? ঠিক সাড়ে চারটেয় বাড়ি ফিরে আসেন নরেশদা। নীরজা বউদি বলেন, না, আজ আর চা খেতে হবে না, আজ সরবত খাও। এক-একদিন সত্যিই অদ্ভুত রকমের এক-একটা কথা বলে ফেলেন নীরজা বউদি—আজ চা নয়, সরবতও নয়। আজ এখন শুধু কাশির ওষুধটা খেয়ে চুপ করে বসে থাক।

কতবার দেখতে পেয়েছে চিত্রালী, কাশির ওষুধ খেয়ে নিয়ে বাইরের ঘরের চেয়ারে কত শান্ত হয়ে বসে আছেন নরেশদা।

চিত্রালীর মা মাঝে মাঝে খুব আশ্চর্য হয়ে একটা কথা বলেন—ভাগ্যি ভালো যে, ছেলেপুলে নেই।

চিত্রালীর মা মনোরমা বোধহয় মনে করেন, ছেলেপুলে নেই বলেই নীরজার স্বামী- যত্নের চেষ্টা আর কাণ্ডটা এরকম চব্বিশ ঘণ্টার চিন্তার একটা বাতিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু ছেলেপুলে আর হবে কবে? দশটা বছর তো পার হতেই চললো।

এরকম একটা রিক্ততার ভাব নীরজার জীবনের একটুও দুঃসহ বলে বোধ হয়েছে কিনা কে জানে! শশিবাবুর মা কিন্তু বেশ একটু রাগ করেই রগড় করেন। —এ মেয়ের আর ছেলেপুলেতে দরকারই বা কি? স্বামীটাকেই তো একেবারে একটা শিশু করে ফেলেছে।

এক-এক সময় সত্যিই মনে হয়, নরেশ একটা ব্যক্তিই নয়, একটা শিশু। চকবাজারে গিয়ে আর দোকানে দোকানে ঘুরে যখন দরকারের জিনিস কেনাকাটা করে নীরজা, তখন নরেশ ওই চকবাজারের রাস্তার একপাশে একটা রিকশার উপরে চুপ করে বসে থাকে। কারণ নীরজা বলে গিয়েছে, আমি এখনই আসছি, তুমি ততক্ষণ এই রিকশাতেই চুপ করে বসে থাক।

যাই হোক, পাড়ার মানুষ যতই আশ্চর্য হোক, আর শশিবাবুর মা যতই নিন্দে করুক, পুরো দশটা বছর তো এই দু'জনের জীবনে একটা শান্তির একটানা প্রবাহের মতো পার হয়ে গিয়েছে। ঠাট্টা করলেও বাড়িয়ে বলেননি দার্শনিক অবিনাশবাবু; সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির মতো, একজন শুধু চলেছেন, আর একজন শুধু চালিয়েছেন। মাস পয়লার দিনে নীরজাই স্মরণ করিয়ে দেয়, যাও, আজ বাড়ি ভাড়া আদায় করে নিয়ে এস, আজ আর আদালতে যেতে হবে না। তখুনি ব্যস্ত হয়ে বের হয়ে যায় নরেশ। যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি। যদি কোনবার মাস পয়লা পার হয়ে যায়, আর, বাড়িভাড়া আদায়ের কথা নরেশকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলে যায় নীরজা, তবে নরেশও ভুলে যায়। কোন দিন নিজের স্মৃতিশক্তির দোহাই দিয়ে একথা বলেনি নরেশ, মাস-পয়লা তো পার হয়ে গেল, এবার বাড়িভাড়া আদায়ের চেষ্টা করাই উচিত।

দশ বছরের মধ্যে মাত্র এই শেষ তিনটে মাস, নরেশের ওই বাড়ির বাইরের ঘরে মাঝে মাঝে এমন এক দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে, যার পরিচয় এই পাড়ার কারও জানা নেই। অবিনাশবাবু শুধু অনুমান করেন, ভদ্রলোক খুব সম্ভব নরেশের স্ত্রী নীরজারই কোন আত্মীয়স্বজন। হ্যাঁ, যে গাড়িতে চড়ে এই আত্মীয় ভদ্রলোক আসেন সেই গাড়িটা এই পাড়ার অনেকেরই কাছে পরিচিত। ওটা হলো দয়াগঞ্জ ফ্যাক্টরির ম্যানেজার বিলাস দত্তের গাড়ি। হতে পারে, এই ভদ্রলোক হয়তো বিলাস দত্তেরও কোন আত্মীয়স্বজন।

বেশ সুন্দর ঝকঝকে চেহারা, তেমনই সুন্দর সাজ-পোশাক; ভদ্রলোক যেন চমৎকার এক অভিরুচির দীপ্ত ছবি। ভদ্রলোক যখন হেসে হেসে কথা বলেন, তখন মনে হয় নরেশের বাড়ির ওই বাইরের ঘরটা যেন চমকে চমকে অদ্ভুত একটা উৎসবের গান শুনছে। ভদ্রলোক নিজেই ব্যস্ত হয়ে অনুরোধ করেন, কই, এবার তাড়াতাড়ি এক কাপ চা দিয়ে ফেলুন; খেয়ে নিয়েই চলে যাই।

এবাড়ির এই দশ বছরের জীবনে কোন দিনও কারও অনুরোধের ভাষা শুনে কাজ করেনি নীরজা। কারও আদেশও শুনতে হয়নি। কিন্তু গত তিন মাসের মধ্যে অন্তত পনেরোটা দিন এই আত্মীয় ভদ্রলোকেরই একটা অনুরোধের কথা যেন উচ্চকিত একটা হর্ষের আদেশের মতো বেজে উঠেছে। শুনে খুশি হয়েছে নীরজা। খুব ব্যস্ত হয়ে, আর, একটুও সময় নষ্ট না করে চা তৈরি করেছে। সত্যিই, ভাবতে গিয়ে বেশ আশ্চর্যও বোধ করে নীরজা। এই তো সেই শম্ভুবাবু, যার নামে কত গল্প শক্তিগড়ের বউদির মুখে নীরজা শুনেছিল। শম্ভুবাবু খুব ভালো ছবি আঁকেন; বছরের ছ'টা মাস গোপালপুরে থাকেন, সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়ান। কে জানতো যে, গল্পে শোনা সেই শম্ভুবাবুকে একদিন এখানেই এমন করে চোখে দেখতে পাওয়া যাবে? দয়াগঞ্জের ফ্যাক্টরির ম্যানেজার বিলাস দত্তের মামাতো ভাই এই শম্ভুবাবুর চোখ গোপালপুরের সমুদ্র দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে যায়নি। সে রকম কোন কারণ নয়, শম্ভুবাবু মাত্র তিন-চার মাসের জন্য ছোট

পাহাড়, ঝরনা আর শালবনের সঙ্গে মেলামেশা করবার জন্য এসেছেন। ছবি আঁকার সব সরঞ্জামও সঙ্গে এনেছেন।

ওই, সপ্তাহের দুটি-তিনটি দিন কোন ছোট পাহাড়ের কাছে, কিংবা ঝরনার কাছে, অথবা কোন শালবনের কাছে গিয়ে বসে থাকেন শম্ভুবাবু; তারপরেই এই শহরে নরেশের এই বাড়িতে এসে একটা দুটো ঘণ্টা কাটিয়ে যান। শিল্পী মানুষের চোখের হাসি দেখে মনে হয়, সেই চোখ বোধহয় নীরজাকেও একটা ঝরনা মনে করে আর খুশি হয়ে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু নরেশের বাড়ির বাইরের ঘরের এই হর্ষমুখর ব্যস্ততার নূতন পালা কি এই তিনটি মাস পার হয়েই ফুরিয়ে গেল? অবিনাশবাবু লক্ষ করেছেন, নরেশের বাড়ির বাইরের ঘর আবার তেমনই নীরব। ঘরের ভিতরে একটা চেয়ারের উপরে নরেশের সেই চুপটি করে বসে থাকা অস্তিত্ব একাই পড়ে থাকে।

চিত্রালী এসে জিজ্ঞাসা করে—কেমন আছেন বউদি?

নীরজা হাসে। সেই তৃপ্তির, সেই খুশি আর গর্বের হাসি। —ভালো আছি।

—নরেশদা কেমন আছেন?

নীরজা—আমি যেমন রেখেছি, ঠিক তেমনই আছেন।

এইবার চিত্রালীও হেসে ফেলে—তা তো জানি। কিন্তু...।

নীরজা—না ভাই, কোন কিন্তু-টিন্তু নেই। আজ এই দশ বছরের মধ্যে ভদ্রলোকের ওপর একটি মুহূর্তের জন্যেও রাগ করতে পারিনি। এ কী আমার কম সৌভাগ্যের কথা?

চিত্রালী বলে—নরেশদা আপনাকে সত্যিই...।

নীরজা—কি? বলেই ফেল না কেন?

চিত্রালী—আপনাকে খুব বেশি ভালোবাসেন।

নীরজা—অস্বীকার করতে পারি না। যদি তাই না হতো, তবে কি আমার ইচ্ছা আর আমার কথার কাছে ভদ্রলোক তাঁর জীবনটাকে এমন করে ছেড়ে দিতে পারতেন?

কী আশ্চর্য, যেদিন চিত্রালীর কাছে নরেশের নামে এরকম একটা উদাত্ত প্রশস্তির কথা বলে দিয়ে আর একটুও লজ্জাকুণ্ঠিত না হয়ে হাসতে পেরেছিল নীরজা, ঠিক সেদিনই বিকালের রোদ যখন একটু লাল হয়ে এসেছে, তখন বাড়ির বাইরের বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপারে অবিনাশবাবুর বাড়ির দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে নীরজা। দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে চিত্রালী। আশ্চর্য হন অবিনাশবাবু আর মনোরমা। এরকমভাবে পরের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে নীরজা, এটা যে চোখে না দেখলে সত্যিই বিশ্বাস হতো না। কী হলো, কিসের জন্যে, কোন্ দরকারে, অবিনাশবাবুর বাড়ির দিকে এরকম একটা অসহায়তার করুণ ছবির মতো তাকিয়ে আছে নীরজা?

নীরজা যেন সাজ আর প্রসাধনের সব চমক একেবারে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে নিজেকে সাজিয়েছে। সবুজ শাড়ি, সত্যিই যে বৃষ্টিতে ধোওয়া শালবনের সরস সবুজের মায়া আজ নীরজার সুঠাম শরীরটাকে ঘিরে ধরেছে। আর একটু রাত হলে, আর, আগের কাল হলে মনে হতো, ওই সাজ একেবারে খাঁটি অভিসারিকার সাজ। তাই, ভাবতে অদ্ভুত লাগবেই তো; সে নারী আজ এত সাজে কেন? নীরজা কি সত্যিই কোথাও যাবার জন্যে তৈরি হয়েছে?

বাইরের ঘরে তেমনি একটা চেয়ারের উপর চুপ করে বসে আছে নরেশ। নীরজার দিকে তাকিয়েও আছে নরেশ, কিন্তু নরেশের চোখে কোন বিস্ময় নেই, চমক নেই, শিহর নেই, চঞ্চলতাও নেই। কোন প্রশ্নও নেই নিশ্চয়। নইলে এত শান্ত হয়ে তাকিয়ে থাকতে পারবে কেন নরেশের ওই দুই চোখ?

কিন্তু নীরজার এই সুন্দর করে সাজা চেহারাটা যেন ভীরু বহুরূপীর মতো ক্ষণে ক্ষণে রঙ

পাল্টিয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। কালো চোখ দুটো হঠাৎ একেবারে সাদা আর লাল ঠোঁট একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

চমকে উঠলেন অবিনাশবাবু, চমকে উঠলেন মনোরমা। নীরজা যেন একটা উতলা আতঙ্কের মতো ছুটে এসে অবিনাশবাবুর বাড়ির ফটকের দরজাটাকে ঠেলা দিয়ে খুলে দিল। ভিতরে ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠে নীরজা—কাকাবাবু!

দার্শনিক অবিনাশবাবুর বুকের ভিতরটাই যেন চমকে ওঠে। আর কেঁদে ফেলে। নীরজার মতো মেয়ে যে প্রতিবেশী বৃদ্ধকে কাকাবাবু বলে ডাকতে পারে, একথা আগে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না। এই ডাক যেন নীরজার বুকের ভিতরে ফুঁপিয়ে ওঠা একটা ভয়ের ডাক। কিন্তু কিসের ভয়?

অবিনাশবাবুর গলার স্বর করুণ হয়ে ছটফট করে—কোন ভয় নেই। আমরা আছি, কোন চিন্তা নেই। কী হয়েছে বলো?

নীরজা—আমি আর কত সহ্য করবো বলুন? এরকম একজন একরোখা অবাধ্য মানুষ, আমার সামান্য একটা অনুরোধের কথাকেও যে মানুষ একটুও গ্রাহ্য করে না, তার সঙ্গে আমি কি করে ঘর করি, বলুন!

মনোরমা চেঁচিয়ে ওঠেন—কে? কে? কার কথা বলছো? নরেশ?

নীরজা—তাছাড়া আর কার কথা বলছি, কাকিমা? আমি কোনদিনও স্বপ্নেও সন্দেহ করিনি কাকিমা, ভদ্রলোক এরকম একটা পাথরের মতো বধির হয়ে বসে থাকবেন, আমার কোন কথা শুনতেই পাবেন না।

মনোরমা—কথা শুনতে পাবে না, এর মানে কি?

নীরজা—যেন আমাকে চোখেও দেখতে পাচ্ছেন না, এমন করে তাকিয়ে আছেন।

মনোরমা—এর মানেই বা কি?

নীরজা—এর মানে আমাকে তুচ্ছ করা। আমার জীবনের কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছা আর সাধ-অসাধকে একটুও গ্রাহ্য না করা। আমি যা চাই, ঠিক তার উল্টোটি হয়ে আর চুপ করে বসে থাকা।

মনোরমা—তুমি এখন বোধহয় কোথাও বেড়াতে যাবার জন্য...।

—ছি ছি, কখ্খনো না, অসম্ভব, কোথাও বেড়াতে যেতে চাই না। দূর সম্পর্কের আত্মীয় মাত্র, তার একটা মুখের কথা শুনেই আমি বেড়াতে বের হয়ে যাব কেন?

মনোরমা—এই যে কিছুদিন আগে নতুন ভদ্রলোক, যিনি তোমাদের...।

নীরজা—হ্যাঁ তিনি, তিনি বলেছিলেন, একবার দয়াগঞ্জে গিয়ে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি।

মনোরমা—নরেশ কী বলে?

— সে যদি একটা কথাও বলতো, কাকিমা—একবার রাগ করেও একটা আপত্তি করতো, তবে আমাকে এত ভয় পেতে হতো না। কিন্তু সে যে অদ্ভুত অবাধ্য একরোখা মানুষ, একটা কথাও বলে না।

কেঁদে ফেলে নীরজা : কালো চোখের দুই তারার সেই ঝিকঝিকে আলো যেন ভয় পেয়ে নিবে গিয়েছে।

মনোরমা বলেন—বলবে, বলবে, নিশ্চয় বলবে। চলো আমি তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি। দেখি নরেশ কেমন করে তোমার সঙ্গে কথা না বলে থাকতে পারে।

নিকষিত হেম

বাবা, মা আর বউদির সঙ্গে রাজগীরে বেড়াতে গিয়েছিল প্রমিতা। রাজগীরে গিয়ে একদিন থাকা, তারপর আবার গয়ার বাড়িতে ফিরে আসা। এই তো সামান্য একটা ঘটনা। কিন্তু এই সামান্য ঘটনাটা প্রমিতার মনটাকে যে ভাবনায় ভরে দিয়েছে, তার ভার সামান্য নয়। প্রমিতার প্রাণটা যেন দুটো দাগ নিয়ে ফিরে এসেছে।

সাদা শাড়ির আঁচলের উপর হঠাৎ একটু আবীরের গুঁড়ো ছিটকে এসে লাগলে যেমন দাগ হয়, একটা দাগ যেন সেই রকমের একটা রঙিন চিহ্ন। তুচ্ছ করে আর আঁচল ঝাড়া দিয়ে সে চিহ্ন ঝরিয়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে না।

আর একটা দাগ যেন নিতান্ত কর্কশ আর গা-জ্বালানো একটা আঁচড়ের চিহ্ন। একটা অভদ্র মতলবের লোভ সত্যিই প্রমিতার গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। গায়ে যেন একটা কাঁটা বিঁধেছে; ছটফট করে সরে গিয়েছিল প্রমিতা। সেকথা মনে পড়লে এখনও গা সিরসির করে।

দুই পরিবারে দেখা হয়েছিল বক্তিয়ারপুরে। প্রমিতা, প্রমিতার বাবা খগেনবাবু, মা তরুলতা আর বউদি মাধুরী; এই দলটি চলে গেল রাজগীরে। আর, একটি পরিবার রাজগীর থেকে বেড়িয়ে ফিরে পাটনা চলে গেল। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, এক প্রৌঢ়া মহিলা, প্রমিতারই বয়সের এক তরুণী; সেইসঙ্গে একটি যুবক, দেখতে খুবই সুন্দর।

প্ল্যাটফর্মের উপর কাছাকাছি দুটি জায়গায় দাঁড়িয়েছিল দুই পরিবার। তরুলতা ফিসফিস করে পুত্রবধূ মাধুরীর কানের কাছে কথা বলেন—বুঝতে পারছি, ওঁরা দু'জন হলেন মেয়েটির বাবা আর মা। কিন্তু ছেলেটি কে, তা তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

মাধুরী বলেন—আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি।

তরুলতা—কী?

মাধুরী—কেউ নয়।

তরুলতা—তার মানে?

মাধুরী হাসে—তার মানে, এখনও কেউ নয়। কিন্তু শিগগিরই ওঁদের জামাই হবেন বোধহয়।

তরুলতা—কেমন করে বুঝলে?

মাধুরী—মেয়েটির কথাবার্তার রকম-সকম আর কাণ্ড দেখেই বুঝতে পারছি।

যুবক ভদ্রলোকের প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আজেবাজে কত কথাই না অনর্গল বকে যাচ্ছে মেয়েটা। মেয়েটা দেখতে একটুও ভালো নয়। কিন্তু সাজের চেহারা দেখলে বোঝা যায়, সুন্দর দেখাবার জন্য কী চেষ্টাই না করেছে। গায়ের রঙটা বেশ কালো, কিন্তু সাদা মালাবার সিল্কের শাড়িটাকে এমনই কায়দা করে গায়ে জড়িয়েছে যে, ওই কালো চেহারাতেও যেন সাদা জ্যোৎস্নার আভা চিকমিক করে হাসছে। ছোট ছোট চোখ, কিন্তু কাজলের বড়-বড় টানা দিয়ে চোখের চাহনিটাকে কত বড় করে তুলেছে। খোঁপাতেও ফুল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন—মৃণাল, চা খাবে নাকি?

যুবক ভদ্রলোক বলে—না। উৎপলা বোধহয় খাবে।

মেয়েটি ভ্রূকুটি করে যুবক ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে কথা বলে—না, তুমি না খেলে আমিও খাব না।

প্রমিতার মা তরুলতা আবার পুত্রবধূ মাধুরীর কানের কাছে ফিসফিস করেন। —কিন্তু বুঝতে পারছি না, কেমন করে এই ছেলে ওই মেয়ের বর হবে। মেয়েটাকে যে ছেলেটার সঙ্গে একটুও মানাচ্ছে না। হ্যাঁ, আমাদের পমির সঙ্গেই এরকম ছেলেকে চমৎকার মানায়।

কথাটা শুনতে পেয়েছে প্রমিতা, সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুতভাবে চমকেও উঠেছে। কারণ, এতক্ষণ ধরে আনমনার মতো কি যেন ভাবছিল প্রমিতা, আর উৎপলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওই মৃণালের মুখের দিকেও তাকিয়েছিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলছেন—তুমি আবার কবে ছুটি পাবে মৃণাল?

মৃণাল বলে—যদি চিফ এঞ্জিনিয়ার এখন জার্মানি না যান তবে আমাকে এখন ধানবাদেই থাকতে হবে।

—তুমিই বোধহয় চিফ এঞ্জিনিয়ারের জায়গায় অফিসিয়েট করবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উৎপলা আবার মৃণালের মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় কথা বলে—তুমিও আবার বিদেশে পাড়ি দেবে না তো?

মৃণাল হাসে—না।

উৎপলা—কিন্তু আবার ছুটি পাবে কবে? পাটনাতে আবার আসবে কবে?

মৃণাল—ঠিক বলতে পারছি না। তবে গয়াতে একবার আসতে হবে। দেখি...।

উৎপলা—দেখি আবার কি? গয়া থেকে একবার পাটনা ঘুরে যেতে কতক্ষণ লাগবে?

উৎপলার মাথাটা যেন দুর্বার এক আবদারের ঝোঁকে মৃণালের কাঁধের উপর হেলে পড়তে চাইছে। কিন্তু সামলে নিয়েছে উৎপলা। মাথাটাকে কাত করে, আর, একহাতে খোঁপার ফুল চেপে রেখে, মৃণালের মুখের দিকে যেন একটা লোভী পিপাসার বেহায়া দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে উৎপলার চোখ দুটো অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে, কাজলের টান দিয়ে বড় করে আঁকা দুটো ছোট-ছোট চোখ।

শুনতে পায় প্রমিতা, বেশ উৎফুল্ল স্বরে আর হেসে-হেসে উৎপলার সঙ্গে কথা বলছে মৃণাল—হ্যাঁ, চেষ্টা করলে ক'দিনের ছুটি নিয়ে একবার পাটনা ঘুরে যেতেও পারি, কিন্তু তুমি আবার রাজগীর-রাজগীর করবে না তো?

উৎপলা—করলে ক্ষতি কি? রাজগীরে আসতে তোমার কি ভালো লাগে না?

মৃণাল—লাগে বইকি। কিন্তু প্রতি বছর একবার করে একই রাজগীরে বেড়াতে আসতে কেমন যেন লাগে, একটু একঘেয়ে লাগে। তোমাদের সঙ্গে রাজগীরে বেড়াতে আসা এবার নিয়ে মোট তিনবার হলো।

উৎপলা—তা তো হলোই, কিন্তু আমার একটুও একঘেয়ে মনে হয় না। ভালো লাগলে আবার একঘেয়ে মনে হবে কেন?

প্রমিতার চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা অস্বস্তি ছটফট করে ওঠে। মুখ ঘুরিয়ে দূরের ঐ সিগন্যালের দিকে তাকিয়ে থাকে প্রমিতা। মৃণাল নামে ওই ভদ্রলোকের জন্য বোধহয় একটা করুণার ভাব প্রমিতার মনের ভিতরে হঠাৎ আক্ষেপ করে উঠেছে। কী অদ্ভুত একটা বিপদেই না পড়েছেন ভদ্রলোক, একটা শাস্তিও বলা যায়। একঘেয়ে লাগছে, তবু বলতে হচ্ছে, ভালো লাগছে। বুঝতেই তো পারা গেল, অন্তত তিন বছর ধরে মৃণাল নামে ওই ভদ্রলোকটি উৎপলা নামে ওই শক্ত ফন্দির মায়াজালে পড়ে বোকা হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সত্যিই কি মায়ার জাল?

একগাদা ফুল খোঁপায় গুঁজে আর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নাকে-মুখে কথা বলতে পারে—একটা বেহায়াপনার জাল।

সন্দেহ হয়, ভদ্রলোক নিজেই বোকা, তাই এত সহজে উৎপলার মতো মেয়ের মায়াজালে ধরা পড়েছেন। ভদ্রলোক একবার মুখ ফিরিয়ে এদিকে-ওদিকে তাকাবার চেষ্টাও করতে পারছেন না, উৎপলা যেন অনবরত কথা বলে বলে ভদ্রলোকের চোখদুটোকে শুধু ওর নিজেরই মুখের দিকে টেনে ধরে রেখেছে। যদি একবার এদিকে তাকাতে পারতেন ভদ্রলোক, তবে

দেখেই চমকে উঠতেন যে, পৃথিবীতে এমন মুখও আছে, যার কাছে উৎপলার মুখটা একটা অন্ধকার মাত্র।

পাটনার ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মের গায়ে লেগেছে, ট্রেনের একটা কামরার দিকে ওরা চলে গেল। ইস, কী বিশ্রী রকমের নির্লজ্জ হয়ে মৃণালের গা ঘেঁষে ঘেঁষে কামরার দিকে হেঁটে গেল উৎপলা। প্রমিতার চোখে যেন নতুন একটা সন্দেহ হেসে ফেলতে চাইছে। সত্যিই রুমাল তুলে একটা অস্বস্তির হাসিকে এইবার চাপা দিতে চেষ্টা করে প্রমিতা। মৃণালের সঙ্গে এই বেহায়া ধরনের গা-ঘেঁষা ভাবটা কি সত্যিই নিশ্চিন্ত মনের একটা খুশির উৎসাহ? না, হারাই হারাই সদা ভয় হয়; একটা উদ্বিগ্ন সতর্কতা? হেসেই ফেলে প্রমিতা।

মাধুরী বউদি বলেন—তোমার আবার কি হলো?

প্রমিতা—আমার আবার কি হবে? কিছুই না।

সেই মুহূর্তে প্রমিতার মুখের এই হাসি হঠাৎ সাবধান হয়ে যায়। গম্ভীর হয়েছে, কিন্তু লাল হয়ে গিয়েছে প্রমিতার সারা মুখটাই। চোখের দুটি কালো তারার দৃষ্টিও যেন কেমনতর হয়ে গিয়েছে।

ট্রেনের কামরার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মৃণাল নামে সেই ভদ্রলোক সোজা প্রমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। মৃণালের পাশে বসে কত কথাই না বলছে উৎপলা। কিন্তু মৃণাল তবু মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আর উৎপলার দিকে তাকিয়ে কোন কথা শুনতে কিংবা বলতে পারছে না। ট্রেন ছাড়বার আগে মৃণাল যেন এই বক্তিয়ারপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে থাকা এক মায়াময়ী ক্ষণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে।

ট্রেন ছেড়েছে। উৎপলা ব্যস্ত হয়ে বলেছে—আমার ঘড়িতে দশটা তেরো হয়েছে। তোমার ঘড়িতে কি বলছে?

মৃণাল কিন্তু তার হাতের ঘড়ির দিকে তাকাতে পারল না। প্রমিতারই মুখের দিকে তাকিয়ে মৃণালের চোখ দুটো যেন একটা মুগ্ধ বিস্ময়ে সুন্দর মুখটিকে শেষ দেখে নিচ্ছে।

জোরে স্পিড নিল ট্রেনটা। কী আশ্চর্য, মৃণাল নামে অচেনা অজানা এই ভদ্রলোকও অভিবাদনের ভঙ্গীতে হঠাৎ হাত তুলছেন। হতে পারে, খগেনবাবু আর তরুলতাকে লক্ষ করে অভিবাদনের একটা সঙ্কেত জানালেন মৃণাল নামে ওই ভদ্রলোক। কিন্তু প্রমিতার রুমাল-ধরা হাতটা হঠাৎ কেঁপে ওঠে। কী বিপদ, আর একটু হলে প্রমিতার রুমাল-ধরা হাতটা বোধহয় পাল্টা সাড়া দিয়ে বিদায়-অভিবাদনের ছোট্ট একটি ভঙ্গী দুলিয়ে দিত।

রাজগীর যাবার ট্রেনটা ছাড়তেও আর বেশি দেরি করেনি। রাজগীরে পৌঁছতেও খুব বেশি সময় লাগেনি। বিম্বিসারের ভাঙা প্রাসাদের যত পুরনো পাথরের চারদিকে অনেক ঘুরে বেড়ান হলো। রেস্ট হাউসে চায়ের টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়েই বুঝতে পারে প্রমিতা, না, মা আর বউদির কাছে চেয়ারে বসে চা খাওয়া সম্ভব নয়। সেই কথা, সেই পুরনো অভিযোগের কথাই শুরু করেছেন মা। আর, মাধু-বউদিও শতবার শোনা সেই কথাগুলিকেই চুপ করে শুনছেন।

তরুলতা বলেন—আমি তো কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না, মাধু। আমরা চেষ্টা করে যে পাত্রের খোঁজ পাই, তাকে ওর পছন্দ হবে না, আবার নিজেও যে ইচ্ছে করে কাউকে...।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে সরে যায় প্রমিতা।

একটা সমস্যারই কথা বলেছেন প্রমিতার মা তরুলতা। বয়স হয়েছে, এম. এ. পড়ছে কিন্তু কী অদ্ভুত রকমের ভীতু স্বভাবের মেয়ে প্রমিতা। বিয়ের সম্বন্ধ আসে, পাত্রের পরিচয়ও জানতে পারে প্রমিতা, কিন্তু প্রমিতার আপত্তির কারণ এই যে, ভয় করে। —না না বউদি, কখ্খনো না। একটা অচেনা-অজানা মানুষের সঙ্গে বিয়ে, আমার ভাবতেই ভয় করে।

বউদি কতবার বলেছেন—তবে চেনা-জানা করে নিয়েই বলো।

—ছিঃ, ঘেন্না করে। ওসব হবে না।

বউদি—এদিকে হবে না, ওদিকেও হবে না, তাহলে কি করে হবে?

কোন ভদ্রলোকের ছেলে যদি ইচ্ছে করে প্রতিমার কাছে চেনাজানা হতে চেষ্টা করে, তাহলেও কিছু হবে না। বউদি জানেন, ভাগলপুরের সুহাস প্রমিতার সঙ্গে একটু গল্প করবার জন্য কতবার এসেছে আর চেষ্টা করেছে। কিন্তু সুহাসের সঙ্গে ভালো করে কথাও বলেনি প্রমিতা।

—না, আমার এসব এখন ভালোই লাগে না বউদি।

বউদিও বিরক্ত হয়ে বলেছেন—তবে দেখ, কখন ভালো লাগে আর কাকে ভালো লাগে।

রাজগীরের মাঠের হাওয়া হু হু করে ছুটে এসে রেস্ট হাউসের প্রমিতার শাড়ির আঁচল উড়িয়ে দেয়। আঁচলটা যেন এক বিজয়িনীর পতাকা হয়ে উড়ছে। প্রমিতার চোখ দুটোও হাসছে। মৃণাল নামে সেই ভদ্রলোক এখন যদি হঠাৎ এখানে এসে পড়েন, আর উৎপলা যদি সঙ্গে না থাকে, তবে কী বলতেন ভদ্রলোক? এই তো, কী আশ্চর্য, ভাবতেই পারিনি যে আপনার সঙ্গে আবার কখনো দেখা হবে।

রাতের ট্রেন আবার বক্তিয়ারপুর হয়ে পাটনা ফিরে যাচ্ছে। বক্তিয়ারপুরের প্ল্যাটফর্মে এত লোকের ভিড়, কিন্তু তারই মধ্যে যেন একটা শূন্যতা আছে মনে হয়। সে ভদ্রলোক এরই মধ্যে এখানে আবার ফিরে আসবেন কেমন করে? অসম্ভব।

কিন্তু ইনি আবার কে? ছোট একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে এই কামরাতেই ঢোকবার জন্যে এদিকে এগিয়ে আসছেন। ওদিকের কত কামরা খালি পড়ে আছে, তবু এই কামরার দিকে কেন?

কামরার ভিতরে ঢুকে প্রমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছেন ভদ্রলোক। তাকাবার কী ভঙ্গী। যেন একটা হাবা ছেলের চোখ জাদুঘরের একটা আশ্চর্যের জিনিসের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

কামরার এদিকে ওদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আনমনার মতো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন ভদ্রলোক। টিকিট চেকার কামরাতে উঠে ভদ্রলোকের গায়ে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন—জেরা আগে বাড়িয়ে সাহেব। তবু ভদ্রলোকের হুঁশ নেই?

এ কী? খুব হুঁশ আছে দেখছি। খুব বুদ্ধিও রাখে মনে হচ্ছে। প্রমিতারই পাশে সিটের উপর হাতের ব্যাগটাকে ঝুপ করে ফেলে দিয়ে ভদ্রলোকও ঝুপ করে বসে পড়লেন। ব্যাগটাও যে একটা অভদ্র ভার হয়ে প্রমিতার শাড়ির আঁচলটাকে চেপে রেখেছে, এটুকুও ভদ্রলোকের চোখে পড়ছে না। ভদ্রলোকের ব্যাগটা আর শরীরটা, দুটোই যেন দুর্ভার ক্লান্তি হয়ে প্রমিতার গা ঘেঁষে সিটের উপর এলিয়ে পড়েছে।

এক হাত দিয়ে আস্তে টেনে শাড়ির আঁচলটাকে সেই অভদ্র ভারের চাপ থেকে ছাড়িয়ে নেয় প্রমিতা। ব্যাগটার ছোঁয়া থেকে অনেকখানি তফাত রেখে সরে বসে। এভাবে তফাত হয়ে বসে থাকতেও অস্বস্তি হয়; ভয় হয়, যে-কোন মুহূর্তে আর যে-কোন ছুতো করে লোকটার এই এলিয়ে পড়া চেহারাটা প্রমিতার ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়বে।

ট্রেন ছাড়লো, কামরাটা দুলে উঠলো। ঠিক তখনই উঠে দাঁড়ালেন অদ্ভুত মতলবের এই ভদ্রলোক। কী উপদ্রব! লোকটা অন্ধ না হয়েও অন্ধের মতো এ কী কাণ্ড করছে! প্রমিতার ঘাড়ের কাছে মাথাটা নিয়ে এসে জানালার বাইরে ঝুঁকি দিলেন ভদ্রলোক। প্রমিতা ভ্রূকুটি করে নিজেরই মাথাটাকে কাত করে একপাশে সরিয়ে রাখে।

ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন—জল, এই জল! এই পানি!

আহা! কী চতুর বোকামি। ট্রেন ছাড়লো, ঠিক সেই সময়ে বাইরের পানিপাঁড়ের কাছে জল চাওয়া। পানিপাঁড়েটা যদি এখন ছুটেও আসে, তবু চলন্ত ট্রেনের এই কামরার কাছে পৌঁছতে পারবে না।

ভদ্রলোকের কামিজের বুক পকেটে বোধহয় কোন ভারী জিনিস আছে, বোধহয় রুমালে বাঁধা টাকা আধুলি সিকি আর পয়সা। বুক পকেটটা ঝুলে পড়ে প্রমিতার কাত মাথার খোঁপাটাকে ছুঁয়ে রয়েছে। প্রমিতা মাথা নাড়লেও বুক-পকেট সরে যায় না। নাঃ, উঠে গিয়ে আরও দূরে গিয়ে সরে না বসলে এই উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। কিন্তু আর কত দূরেই বা সরা যায়? এপাশে বউদি, ওপাশে কোন জায়গাই নেই।

বেশ কিছুক্ষণ পরে, আবার নিজেরই জায়গায় বসলেন ভদ্রলোক। কিন্তু কে জানে কেন, হঠাৎ আবার উঠে দাঁড়ালেন। চট্ করে পা সরিয়ে নেয় প্রমিতা। লোকটা প্রমিতার পায়ে পা ঠেকিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

এইবার খগেনবাবু বলেন—ও মশাই, আপনি এরকম করছেন কেন? একটু স্থির হয়ে বসুন।

খগেনবাবুর কথায় ফল হলো। ভদ্রলোক নিজেরই জায়গায় চুপ করে বসে রইলেন। চশমাটা মোছবার জন্যে বুক পকেট থেকে রুমাল বের করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা টাকা, সিকি আর আধুলি পকেট থেকে এদিকে সেদিকে গড়িয়ে গেল।

চশমাটা তিন মিনিট ধরে মুছলেন। তারপর ঘাড় ঝুঁকিয়ে আর আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে টাকা সিকি আর আধুলিগুলোকে তুললেন। একটা টাকা প্রমিতার পায়ের জুতোর গা ঘেঁষে পড়ে আছে। সে টাকাটাকে তুলে নেবার জন্য কোন চাড় দেখা যাচ্ছে না। বুঝতে পারা যায়, ইচ্ছে করেই এই টাকাটাকে দেখতে ভুলে যাচ্ছেন ভদ্রলোক। তার মানে, এই আশা করছেন যে, প্রমিতা নিজেই টাকাটাকে হাতে তুলে নিয়ে ভদ্রলোকের হাতের কাছে এগিয়ে দেবে—এই যে, আপনার টাকা।

প্রমিতা খগেনবাবুর দিকে তাকিয়ে হাত তুলে ইশারা করে আর পায়ের কাছের টাকাটাকে দেখিয়ে দেয়।

খগেনাবাবু ডাকেন—ও মশাই, ওই যে ওখানে, আপনার একটা টাকা।

ভুল, খুব ভুল করেছে প্রমিতা। এমন উপদ্রব সহ্য করতে হবে কল্পনা করতে পারলে, নিজেরই হাতে টাকাটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোকের গায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিত। তা-ও ভালো ছিল। কিন্তু, এ যে অসহ্য।

টাকাটাকে তোলবার জন্যে ভদ্রলোক হাত বাড়াতে গিয়ে এমন ভঙ্গীতে ঝুঁকে পড়লেন যে, চশমাটা চোখ থেকে ঝুপ করে প্রমিতার কোলের উপর পড়ে গেল। প্রমিতার হাঁটুতেও মাথাটাকে একবার ঠুকে নিলেন ভদ্রলোক, তারপর নিজেই হাত বাড়িয়ে প্রমিতার কোলের উপর থেকে চশমাটাকে তুলে নিলেন।

মাধু বউদি এইবার আস্তে আস্তে ফিসফিস করেন—ভদ্রলোক কেমন যেন, চালচলনের কোন ইয়ে নেই।

খগেনবাবুর কানের কাছে তরুলতাও খুব আস্তে আস্তে চাপা স্বরে কথা বলেন—ছেলেটি তো দেখতে ভালোই, বয়সও বেশ অল্প বলেই মনে হচ্ছে। কে জানে, এখনও হয়তো বিয়ে হয়নি।

খগেনবাবু হাসেন—থাম থাম, সব সময় এক কথা নিয়ে এত চিন্তে করতে নেই।

তরুলতা—বেশ তো, মেয়েকে তবে আইন-টাইন পড়িয়ে একটা উকিল করে দাও—আমারও চিন্তের লেঠা চুকে যাক।

অনেকক্ষণ পরে, ভদ্রলোকের চালচলনের আরও একটা কাণ্ড দেখে একটু নিশ্চিন্ত হয় প্রমিতা। যাক্, ওভাবে লোকটা দু'চোখ বন্ধ করে নিঝুম হয়ে পড়ে থাকলেই বাঁচা যায়।

ঘুমোচ্ছেন ভদ্রলোক। কিন্তু কোন রোগ আছে বলে মনে হচ্ছে। বোধহয় চোখের রোগ। হঠাৎ যখন এক একবার চোখ মেলে কামরার আলোটার দিকে তাকাচ্ছেন, তখন বেশ স্পষ্টই দেখা যায়, চোখ দুটো লালচে হয়ে ছলছল করছে।

রোগী মনে হলেও ভদ্রলোককে এখন বেশ ভালোমানুষটির মতোই দেখাচ্ছে। কিন্তু...।

প্রমিতার মনের এই কিন্তুময় সন্দেহটাই সত্য হলো। ট্রেন থেকে নামাবার সময় দরজার মুখে দাঁড়িয়ে হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়েছিল প্রমিতা। সেই মুহূর্তে পিছন থেকে সেই ভদ্রলোক যেন একেবারে হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। প্রমিতার কাঁধটাকে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে আর পাশ কাটিয়ে নেমে পড়লেন। তারপরেই স্টেশনের লোকের ভিড় আর শোরগোলের মধ্যে উধাও হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

ভদ্রলোক তো নয়, একটা যাচ্ছেতাই অভদ্রলোক। প্রমিতা লোকটাকে একটা ধিক্কার দেবারও সুযোগ পেল না, এমনই হন্তদন্ত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে পলাতক হয়ে গেল লোকটা।

২

গয়ার বাড়িতে একটানা সাতটা-আটটা মাস থাকলেই যেন হাঁপ ধরে যায়। তাই, শুধু প্রমিতা নয়, খগেনবাবুও মনে করেন, একবার বাইরে বেড়িয়ে আসা ভালো। গত বছরে সারনাথে বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল, এবছর রাজগীর। মাঝে মাঝে গিরিডির বাড়িতেও একটা দুটো মাস কাটিয়ে দিতে ভালো লাগে। তারপর আবার গয়া।

সেই পুরনো গয়া। প্রমিতার অভিযোগ সবচেয়ে বেশি মুখর হয়ে দেখা দিয়েছিল বলেই কোর্ট কামাই করে এইবার বাড়ির সবাইকে রাজগীর ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন খগেনবাবু। ছেলে অসিত আর্মিতে আছে, অসিত মাধুরীকে চিঠি দিয়ে ঠাট্টাও করেছে, এখন আরও কিছুদিন ইচ্ছেমত রাজগীর করে নাও; আর বেশি সুযোগ পাবে না, আমি হয়তো এই বছরেই কোয়ার্টার পেয়ে যাব।

মাধু-বউদিও ঠাট্টা করেন—তার আগে তোমার একটা কোয়ার্টার হয়েছে দেখতে পেলেই ভালো হতো।

প্রমিতা—আর হয়েছে কোয়ার্টার! এই গয়াতেই গয়াপ্রাপ্তি হবে।

মাধু-বউদি—এত হতাশ হয়ে পড়লে কেন? কোন কারণ তো নেই?

প্রমিতা—না, গয়া আর ভালো লাগে না বউদি। দেখবার কি আছে এখানে? শুকনো ফল্গুর বালি আর কতগুলো মন্দির, এই তো! আর কত দেখবো? একশোবার দেখা হয়ে গিয়েছে।

গয়া যার কাছে একটা একঘেয়ে জীবনের পুরনো ভার বলে মনে হয়েছিল, সেই প্রমিতার মনে যেন গয়ার জন্য একটা নতুন মায়া দেখা দিয়েছে। বাড়ির বাইরে বেড়াতে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল যে মেয়ে, সে মেয়েকেই এখন দেখা যায়, কখনও চকে, কখনও স্টেশনে, আর কখনও বা ফল্গুর ধারে ধারে অনেক দূরে বেড়িয়ে আসে। ড্রাইভার নালিশ করে—দিদিমণি পেট্রলের খরচ ডবল করে দিয়েছেন।

ছোটকাকা বলেন—কি হলো তোর প্রমিতা? গয়াতে আবার এত দেখবার কি পেলি?

ছোটকাকার কথার জবাব না দিলেও নিজের মনের কাছে জবাবটাকে লুকোতে পারে না প্রমিতা। জবাবটা যে প্রমিতার মনের একটা আশার কথা। সে আশা সত্যিই লাল আবীরের গুঁড়োর ছোট্ট একটি দাগের মতো হাসছে। সেই ভদ্রলোক, যার নাম মৃণাল, উৎপলাকে যার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুবই খারাপ লেগেছিল প্রমিতার, সে ভদ্রলোকের একবার গয়াতে আসবার কথা আছে।

কে জানে এসেছেন কি না? সত্যিই এসেছেন আর এরই মধ্যে চলে যাননি তো? এলেও সত্যিই কি হঠাৎ একবার দেখা হয়ে যেতে পারে না? পৃথিবীতে কত কিছুই তো হঠাৎ হয়ে যায়। মৃণালের সঙ্গে একদিন গয়ার পথে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়াই বা অসম্ভব হবে কেন?

দেখতে সত্যিই বেশ ভয় করছিল প্রমিতার, মৃণালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আর হাত নেড়ে কী বিশ্রীভাবে কথা বলছিল উৎপলা। যেন মাকড়সার মতো জাল বুনে বুনে বেচারা মৃণালকে

বাঁধতে চাইছে ছোট-ছোট চোখের বেহায়া খুশি। কিন্তু মৃণাল বাঁধা পড়েছে মনে হয় না। তা না হলে ট্রেন ছাড়বার সময় প্রমিতার দিকে হাত তুলে ওরকম সুন্দর একটা বিদায়ভঙ্গী জানাতে পারতো না।

মাধু-বউদি একদিন প্রমিতার কাছে এসে চম্‌কে চম্‌কে হাসতে থাকেন। —কী আশ্চর্য, প্রমিতা, সত্যিই আশ্চর্য।

—কী হলো?

—সেরেস্তাঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একবার ভেতরে উঁকি দিয়ে চলে এস।

—কেন?

—সেই ভদ্রলোক। সেই, কী যেন নামটা, মৃণালবাবু।

প্রমিতার চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে। —তুমি একটা মিথ্যে সন্দেহ করে আমাকে একটা বাজে ঠাট্টা করছো বউদি, কোন মানে হয় না।

বউদি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকেন—কিসের সন্দেহ? ঠাট্টাই বা করবো কেন? কি বলছো তুমি?

—মৃণালবাবু এখানে আসবেন কেন?

—নিশ্চয়ই আদালতে কোন কাজ আছে, তাই বাবার কাছে এসেছেন।

—কিন্তু...।

—বলো, চুপ করে রইলে কেন?

—আমি কিছুই বলতে পারবো না।

—তুমি একবার দেখা করবে?

—ছিঃ!

—তবে?

—ছোটকাকাকে একবার বলো, বউদি।

মাধু-বউদি হাঁপ ছেড়ে হাসেন—তাই বলো। এরকম স্পষ্ট করে বললেই তো বুঝতে পারি।

মৃণালকে বৈঠকখানার ঘরে ডেকে নিয়ে আলাপ করলেন ছোটকাকা। মাধু-বউদি মৃণালের জন্য চা পাঠিয়ে দিলেন।

মৃণালের সঙ্গে অনেক গল্প করলেন ছোটকাকা। ছোটকাকার হাসির সঙ্গে মৃণালের গলার হাসির শব্দটাও কত স্বচ্ছন্দে বাজছে, এই ঘরের ভিতরে বসে শুনতে পাচ্ছেন মাধু-বউদি, ও ঘরের ভিতরে বসে প্রমিতা।

প্রমিতার মা তরুলতাও ব্যস্ত হয়েছেন; সেরেস্তা থেকে খগেনবাবুকে ডাকিয়ে নিয়ে এসে বললেন—ঠাকুরপোকে একবার ভিতরে ডেকে নিয়ে এসে বলে দাও...।

—কি বলবো?

—ছেলেটির রাশি আর গণ যেন জেনে নেয়।

—ছেলেটির রাশি গণ জানবার সময় যখন হবে, তখন জানাই যাবে।

মৃণাল চলে যাবার পর ছোটকাকা যখন বৈঠকখানা থেকে বের হয়ে এলেন, তখন সবার আগে মাধু-বউদি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হলো ছোটকাকা?

—অনেক কথা হলো। চমৎকার ছেলে।

—আবার আসতে বলেছেন তো?

—বলেছি বইকি।

—কি বললেন মৃণালবাবু?

—সে তো বেশ খুশি হয়েই বললো, নিশ্চয় আসবে।

—কিন্তু পাটনাতেও তো যাবেন? —মাধু-বউদি কেমন যেন অপ্রস্তুতভাবে কথাটা বলে ফেললেন।

ছোটকাকা বলেন—না, এখন পাটনা যাবার কোন কথা নেই।

—কেমন করে বুঝলেন?

—নিজেই বললে, আদালতের কাজ শেষ হলে সোজা ধানবাদে ফিরে যাবে। আমি জিজ্ঞেস করিনি, নিজেই হঠাৎ বললে, পাটনাতে কোনদিন যাওয়া হবে কিনা সন্দেহ। পাটনাকে একটুও ভালো লাগে না। পাটনাতে গেলে মিছিমিছি নানা ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয়। পাটনাতে যেতে ভয় করে।

মাধু-বউদির চোখ বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে আরও বড় হয়ে যায়। —এত কথা নিজেই বলেছেন ভদ্রলোক?

—হ্যাঁ, আমি কিন্তু এসব কথার বিশেষ কোন মানে বুঝতে পারিনি।

—আপনি না বুঝুন, প্রমিতা বুঝতে পারবে।

—সে কি! যাক্, ভালোই তো, এতদিনে প্রমিতার কিছু বুদ্ধি-সুদ্ধি হয়েছে তাহলে?

—মনে হচ্ছে।

—তাহলে একটা কাজ করতে হয়। মৃণাল এলে প্রমিতা নিজেই যেন চা নিয়ে যায়।

গয়ার বাড়ির আশাটাকে আর খুব বেশিদিন উদ্বিগ্ন করে রাখেনি মৃণাল। আদালতের কাজ শেষ হয়েছে, এইবার ধানবাদে ফিরে যেতে হবে। এক সন্ধ্যায় মৃণাল এসে এই বাড়ির বারান্দার উপর দাঁড়ালো।

বৈঠকখানার ভেতরে এসে ছোটকাকার সঙ্গে গল্প করে মৃণাল। এইবার এবাড়ির দিক থেকে শুধু একটি অভ্যর্থনা এগিয়ে গিয়ে মৃণালকে চা দিয়ে আসবে। মৃণাল যদি প্রমিতার সঙ্গে আলাপ করতে চায়, আরও কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে প্রমিতা। মাধু-বউদি বলে দিয়েছেন—বোবার মতো শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। অন্তত দু'-একটা কথা বলবে।

সবই ভেবে রাখা আর ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। নিজেরই হাতে চা তৈরি করলো প্রমিতা। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ যেন চমকে ওঠে প্রমিতা—পারবো না বউদি।

—কি পারবে না?

—আমি ওঘরে চা নিয়ে যেতে পারবো না।

—কেন?

—কেমন ভয়-ভয় করছে।

—তোমার মাথা আর মুণ্ডু!

—না বউদি, আজ থাক; না হয় অন্য কোনদিন হবে, আজ পারবো না।

কি আর করা যাবে! অগত্যা চাকর রামধারীকেই আদেশ করেন মাধু-বউদি—ওঘরে চা পৌঁছে দিয়ে এসে রামধারী।

৩

মৃণাল যেদিন ধানবাদ চলে গেল, সেদিন ছোটকাকা স্টেশনে গিয়ে মৃণালের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। মৃণাল বলেছে, আমি ঠিক তিন মাস পরে আবার গয়াতে আসবো।

—অফিসের কাজে?

—না, ছুটি নিয়েই আসবো। এক মাসের ছুটি না পাই, অন্তত পনেরো দিনের পাওয়া যাবে।

—শুনে খুবই খুশি হলাম।

শুনে আশ্বস্ত হয়েছে গয়ার বাড়ি। আবার আসবে মৃণাল। এবার অফিসের কোন কাজের জন্যে নয়; এক মাস কিংবা পনেরো দিনের ছুটিকে আনন্দে হাসিয়ে রাখবার জন্য এই গয়াতেই

আসবে। বুঝতে আর অসুবিধে কোথায়, মৃণালের আশা যে এই গয়ারই কাছ থেকে একটি পরম উপহার চাইছে।

কিন্তু প্রমিতা যদি আবার এরকম মাথামুণ্ডুহীন লজ্জার জন্য অভদ্র হয়ে যায়, মৃণালের কাছে গিয়ে একটা কথা বলতেও না চায়, তবে কি হবে?

তরুলতা রাগ করে বলেছেন—তাহলে আইন পড়বেন মেয়ে। আর কি করবেন?

মাধুরী হাসে—এত রাগ করবেন না। প্রমিতা বলেছে, এবার আর কোন গোলমাল হবে না।

তরুলতা—দেখ তাহলে? আমি অবিশ্যি এ মেয়ের মতিগতিকে একটুও বিশ্বাস করি না?

কিন্তু বিশ্বাস না করবারই বা কি কারণ থাকতে পারে? মাধু-বউদি প্রমিতার একটা আপত্তির কথা শুনেই বুঝতে পারলেন যে প্রমিতাকে অবিশ্বাস করবার কোন মানে হয় না।

খগেনবাবু বলেছেন—চল, অন্তত দশটা দিন গিরিডির বাড়িতে কাটিয়ে আসি।

বাড়ির সবাই রাজি হয়েছে। রাজি হতে চায় না শুধু প্রমিতা। মাধু-বউদিকে বেশ স্পষ্ট করে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করে ফেলেছে প্রমিতা—এ সময়ে হঠাৎ আবার গিরিডি কেন?

মাধু-বউদি হাসেন—কোন ভয় নেই। যথাসময়ে ফিরে আসা যাবে।

সত্যি, গিরিডি যাবার দিনে খুবই গম্ভীর হয়ে যায় প্রমিতা। বউদির কাছ থেকে এত স্পষ্ট আশ্বাসের কথা শুনতে পেয়েও যেন একটা সন্দেহ প্রমিতাকে নিশ্চিন্ত হতে দিচ্ছে না। যথাসময়ে গয়াতে ফিরে আসতে পারা যাবে তো!

গয়া ছেড়ে গিরিডি যাবার দিনেও কিন্তু প্রমিতা তার মনের এই সন্দেহটাকে ঠিক চিনতে পারেনি। কিন্তু গিরিডিতে এসেই একদিন একটি শান্ত আনমনা ভাবনার মধ্যে সন্দেহটাকে চিনতে পেরে চমকে ওঠে প্রমিতা। ছিঃ, এ কি হলো?

বক্তিয়ারপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের একটি ছবি হঠাৎ চোখের উপর ভেসে উঠেছে। উৎপলার ছোট-ছোট দুটো চোখে বড় করে কাজল বোলানো; কিন্তু সেজন্যে বেচারাকে ঠাট্টা করবে কেন পৃথিবীর চোখ? কি দোষ করেছে উৎপলা? যাকে ভালো লেগেছে, তা গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে তারই মুখের দিকে বার বার তাকাচ্ছে। বেচারা যে প্রাণ দিয়ে আর আত্মা দিয়ে ওর জীবনের পছন্দের মানুষটিকে জড়িয়ে ধরে রাখতে চাইছে।

কে জানে এখন কি করছে পাটনার উৎপলা? কে জানে কতবার স্টেশনে এসেছে আর ট্রেনের কামরার কাছে এসে উঁকি দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে চোখ, হেলে পড়েছে মাথাটা, ঝরে পড়ে গিয়েছে খোঁপার ফুল। মৃণাল যে আর কোন ছুটিতেই পাটনা যাবে না সেটা কি এখনও বুঝতে পারেনি উৎপলা?

বুঝতে পারলেই বা কি করবে উৎপলা? হয়তো একদিন বক্তিয়ারপুরে এসে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই তো প্ল্যাটফর্ম, যেখানে ওর খুশির ভাগ্যটাকে ভয়ানক এক অভিশাপ ছুঁয়ে দিয়েছিল।

মন্দ হয় না, যদি গয়া ফিরতে দুটো মাস দেরি হয়ে যায়, আর মৃণালও গয়াতে এসে দেখতে পায় যে, খগেনবাবুর মেয়ে সেখানে নেই। আরও ভালো হয়, যদি পাটনার উৎপলা হঠাৎ সব জানতে পেরে সোজা গয়াতে চলে আসে। তাহলে গয়ার রাস্তায় উৎপলা আর মৃণালের হঠাৎ মুখোমুখি দেখা একদিন হয়েই যাবে। তারপর ওদের ভাগ্য জানে, কি হবে আর কি না হবে?

নিজেরও ভাগ্যটার রকম দেখে বেশ আশ্চর্য হতে হয়। সবই যেন অকারণে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। শেষে একটা চাকরি-টাকরিই হয়তো ভাগ্যের সব ঝঞ্ঝাটের মীমাংসা করে দেবে। তাই ভালো, আর প্রাণটাকে বেহায়া করে নিয়ে, একটা চায়ের পেয়ালা হয়ে কারও কাছে এগিয়ে যাবার দরকার নেই।

গিরিডির দিনগুলি মন্দ কাটে না। সারা দিন বাড়িতেই বসে থাকা, আর বিকেল হলে একটু বেড়িয়ে আসা। শুধু সড়ক ধরে সামান্য কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে উশ্রী নদীর কিনারাতে একটা

কালো পাথরের উপর চুপ করে বসে থাকা। বিকেলের রঙিন রোদ পাখায় মেখে বকের দল উড়ে যাচ্ছে; চুপ করে কিছুক্ষণ দেখা।

এখন মনের সন্দেহটাও যেন সব জোর হারিয়ে হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। কি আর করা যাবে? মৃণাল যদি পাটনাকে কোনমতেই আপন করে নিজে রাজি না হয়, আর গয়ার উকিল খগেনবাবুর বাড়িতেই বার বার এসে এক পেয়ালা চায়ের অভ্যর্থনা আশা করে, তবে তাকে স্বীকার করে নিতেই হয়। আর খুঁতখুঁত করবার কোন মানে হয় না।

চমকে ওঠে প্রমিতা, কার পায়ের শব্দ যেন ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে একেবারে প্রমিতার পাথরের পিছনে একটা ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। মুখ ফেরাতেই চোখে পড়ে, ভয়ানক একটা অসম্ভবই সম্ভব হয়ে প্রমিতার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। ঘেন্নায় গা সিরসির করে প্রমিতার, রাগে চোখ জ্বলে ওঠে। আর নিজের ভাগ্যটাকেও ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে, বেশ হয়েছে, গয়া ছেড়ে চলে আসবার ভুলের এই রকমই শাস্তি হওয়া উচিত! উশ্রী নদীর কিনারায় এমন নিরিবিলিতে, এই কালো পাথরটার উপরে কিছুক্ষণ বসে থাকবার শান্তিও আর ভাগ্যে সইল না।

সেই ভদ্রলোক, সেই বিশ্রী মতলবের লোকটা, বক্তিয়ারপুর থেকে গয়ায় ফেরবার পথে ট্রেনের কামরাতে যে লোকটা প্রমিতার শাড়িল আঁচল চেপে দিয়ে, গা ছুঁয়ে দিয়ে, পা মাড়াবার চেষ্টা করে আর কাঁধে ঠেলা দিয়ে, একটা নীচ লোভের খুশি হাসিল করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। চরম অভদ্রতার সেই ভদ্রলোকের ছায়া এখানেও প্রমিতার এই নিরিবিলি শান্তির উপর আঁচড় দাগতে চলে এসেছে। শুনলে মাধু-বউদি যে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। এমন অঘটনও সম্ভব হয়?

প্রমিতার ঘৃণা আর রাগের চোখ দুটো শুধু চকিতে একবার ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়েই যেন ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে। কী অদ্ভুত রকমের দুটো চোখ নিয়ে প্রমিতাকে দেখছেন ভদ্রলোক। লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, ভয় নেই। যেন প্রমিতার চেহারাটাকে গিলে খাবার একটা লোভ অচঞ্চল হয়ে চক্‌চক্ করছে।

তাড়াতাড়ি চলে যায় প্রমিতা। ভদ্রলোক শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

এই ভয়ানক ছায়ার ভয়ে ওদিকে বেড়াতে যাবার আর উশ্রীর কিনারাতে ওই পাথরের উপরে বসবার আশা ছেড়েই দিতে হলো। বাড়ির সামনেই সড়কের উপর পায়চারি করে বিকেলবেলার বেড়াবার সাধ মিটিয়ে নেয় প্রমিতা। কিন্তু ভেবে একটু আশ্চর্য না হয়েও পারে না, সে ভদ্রলোক যে সত্যিই এই সড়কে কোনদিন দেখা দিল না। সেই নির্লজ্জ মতলব তো অনায়াসে এই রাস্তাতেও এসে প্রমিতার বেড়ানো বন্ধ করে দিতে পারে। মনে হয় লোকটা এখন গিরিডিতে নেই।

কিন্তু আর সাহসও হয় না, উশ্রীর কিনারার নিরিবিলিতে কালো পাথরের উপর চুপ করে বসে থাকতে হলে আর একা-একা না যাওয়াই ভালো।

মাধু-বউদি বলেন—তোমাকে আর ওখানে একা-একা যেতে হবে না। আজ আমারই যাব। আমদের সঙ্গে চল। দেখে আসি, সত্যিই এই লোকটা সেই লোক কিনা।

ঠিকই, বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেলেন খগেনবাবু, তরুলতা আর মাধু-বউদি, সেই ভদ্রলোক স্তব্ধ হয়ে পাথরটার উপর বসে আছেন। খগেনবাবু বলেন—তাই তো, কি আশ্চর্য, সেই ছেলেটিই যে বসে রয়েছে।

মাধু-বউদি বলেন—একবার জিজ্ঞাসা করে দেখুন না, কেন এখানে এসে বসে রয়েছে।

—ওহে ইয়ংম্যান, শুনছো?

খগেনবাবুর গম্ভীর গলার ডাক শুনে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ান আর নমস্কার করেন।

খগেনবাবু—আমাদের চিনতে পেরেছো নিশ্চয়?

—আজ্ঞে না।

—সত্যি কথা বলছো?

—মিথ্যে কথা বলবো কেন?

—বক্তিয়ারপুর থেকে গয়া যেতে ট্রেনের কামরাতে আমাদের একদিন দেখতে পাওনি?

—একদিন ওই ট্রেনে যেতে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু আপনাদের কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

—তাহলে তো বলতে হয়, তোমার বিস্মৃতির রোগ আছে।

ভদ্রলোক হেসে ফেলেন—আজ্ঞে না।

—তুমি সেদিন খুবই অশোভন রকমের কাণ্ড করেছিলে।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে আর চুপ করে কি যেন ভাবলেন। তারপরেই খুব শান্ত স্বরে আস্তে আস্তে কথা বলেন—হতে পারে।

খগেনবাবু বেশ ক্ষুব্ধভাবে বলেন—কেন হতে পারে? কারণটা কি?

—একটা টেলিগ্রাম পেয়ে সেদিন খুবই...।

—তার মানে?

—টেলিগ্রাম পেলাম, স্ত্রী হঠাৎ মারা গিয়েছেন।

শুধু খগেনবাবু নয়, তরুলতা আর মাধু-বউদি, আর ওপাশে প্রমিতাও বোধহয় চমকে ওঠে।

খগেনবাবু—তোমার স্ত্রী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কতদিন আগে বিয়ে হয়েছিল তোমাদের?

—এই তো কয়েক মাস হলো। বিয়ের দু'মাস পরেই শান্তি মরে গেল।

তরুলতা—শান্তি মানে?

—হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর নাম শান্তি। সে এই গিরিডিরই মেয়ে।

তরুলতা—কি হয়েছিল শান্তির?

—বলতে গেলে কিছুই হয়নি। সামান্য একটু জ্বর হয়েছিল। তাই এরাও আমাকে কোন খবর জানায়নি। আমি তখন নালন্দাতে। সকালবেলা কাগজ কলম নিয়ে শান্তিকেই চিঠি লিখছি; হঠাৎ টেলিগ্রাম এল, শান্তি নেই।

খগেনবাবু—নালন্দা থেকে সোজা গিরিডিতেই এসেছিলে নিশ্চয়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এসেও কিন্তু শান্তিকে দেখতে পাইনি। পৌঁছতে দেরি হয়েছিল। এসে দেখি ওরা চিতে ধুয়ে-টুয়ে সব শূন্য করে রেখে দিয়েছে।

খগেনবাবু—থাক, আর বেশি বলো না, শুনতে খুবই কষ্ট হচ্ছে।

তরুলতা—তোমাদের বাড়ি এখানেই?

—আজ্ঞে না। কলকাতায়। আমি কলেজে ইতিহাস পড়াই।

খগেনবাবু—তোমার নাম?

—মনীশ রায়।

খগেনবাবু—এবার বুড়োমানুষের একটা অনুরোধের কথা শোন মনীশ।

—বলুন।

—চেষ্টা করে মনটাকে শান্ত করো। কি আর করবে বলো? দুঃখ ভুলে যেতে পারলেই ভালো।

মনীশের মুখের করুণ হাসিটাও যেন প্রসন্ন হয়ে উঠতে চেষ্টা করে—কথাটা ঠিকই বলেছেন। কাল সন্ধ্যাতেই কলকাতা রওনা হব। কাজেই আজ শেষবারের মতো এখানে...।

চমকে ওঠে প্রমিতার চোখের তারা। মাধু-বউদিও যেন চোখ দু'টি বড় করে বুঝতে চেষ্টা করছেন, কি বলতে চাইছে মনীশ।

মনীশ বলে—শান্তির একটা অভ্যেস ছিল; প্রায়ই এখানে এসে এই পাথরের উপর বসে বিকেলের উশ্রীর শোভা দেখতো। আমিও এখানে এসেই বসতাম। কিন্তু আজ দেখুন, সেই উশ্রী আছে, আমিও আছি—শুধু শান্তি নেই।

তরুলতার চোখ ছলছল করে—আচ্ছা এবার আমরা চলি।

খগেনবাবু—আচ্ছা তুমি বসো মনীশ। আমরা চলি। কিছু মনে করো না, মিছামিছি তোমাকে একটু বিরক্ত করে গেলাম।

মাধু-বউদি হঠাৎ উদ্বিগ্নভাবে প্রমিতার কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করেন—এ কি? কি হলো? তুমি এরকম করছো কেন প্রমিতা?

রুমাল দিয়ে চোখ চেপে ধরে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রমিতা। এখন যে চলে যেতে হবে, চলে যাবার জন্যে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রমিতা যেন কিছুই দেখতে বুঝতে আর শুনতে পারছে না। বোধহয় সব হিসেব ভুল হয়ে গিয়েছে, কিংবা হিসেবের সব ভুল ধরা পড়ে গিয়েছে।

—কথা বলো, প্রমিতা? মাধু-বউদি আবার ফিসফিস করেন।

কি বলবে আর কেমন করে বলবে প্রমিতা? গিরিডির মেয়ে শান্তি এসে যেখানে বসে থাকতো, সেখানে ভুল করে গয়ার মেয়ে এসে বসে পড়েছিল, দেখতে পেয়ে কে জানে কী ভেবেছিলেন ভদ্রলোক।

প্রমিতা বলে—ভদ্রলোক কি এখনও এখানে একা-একা বসে থাকবেন?

মাধু-বউদি—হ্যাঁ।

প্রমিতা—এটা ভালো দেখায় না বউদি।

মাধু-বউদি আশ্চর্য হয়ে প্রমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কি বলতে চায় প্রমিতা? মনীশ নামে এই ভদ্রলোককে একটা শূন্যতার মায়ার কাছে একা রেখে চলে গেলে কি অভদ্রতা হবে?

মাধু-বউদি বলেন—যা বলবার স্পষ্ট করে বলেই ফেল, প্রমিতা।

প্রমিতা—ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে চল না কেন?

মাধু-বউদি—কেন? কোথায় যাবেন ভদ্রলোক?

প্রমিতা—আমাদের বাড়িতে, চা খাবেন।

চমকে ওঠেন মাধু-বউদি—তারপর কি হবে? নিজেই চা নিয়ে ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে?

—পারবো।

—ঠিক তো?

—নিশ্চয় পারবো। এবার দেখে নিও, কোন ভুল হবে না।

পরীক্ষিত ও সুশোভনা

সেই নিদাঘের মধ্যদিনের আকাশ সেদিন তপ্ত তাম্রের মত রক্তাভ হয়ে উঠেছিল, বলাকামালার চিহ্ন কোথাও ছিল না। জ্বালাবিগলিত স্ফটিকের মত স্বচ্ছ সেই সরোবরসলিলে মীনপংক্তির চাঞ্চল্যও ছিল না। খর সৌরকরে তাপিত এক শৈবালবর্ণ শিলানিকেতন বহ্নিস্পৃষ্ট মরকতস্তূপের মত সরোবরের প্রান্তে যেন শীতলস্পর্শসুখের তৃষ্ণা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মন্ডুকরাজ আয়ুর প্রসাদ।

সরোবরের আর এক প্রান্তে ছায়ানিবিড় লতাবাটিকার নিভৃতে কোমল পুষ্পদলপুঞ্জের আসনে সুস্নাত দেহের স্নিগ্ধ আলস্য সঁপে দিয়ে বসেছিল মণ্ডুকরাজ আয়ুর কন্যা সুশোভনা। সম্মুখেই নীলবর্ণ ও নিবিড় এক কানন, উত্তপ্ত আকাশের দুঃসহ আশ্রয় থেকে পালিয়ে নীলাঞ্জনের রাশি যেন ভূতলে এসে ঠাঁই নিয়েছে।

মণ্ডুকরাজ আয়ু বিষণ্ণ, তাঁর মনে শান্তি নেই। এই দুঃখ ভুলতে পারেন না মণ্ডুকরাজ, কন্যা তাঁর নারীধর্মদ্রোহিনী হয়েছে। সুশোভনাকে যোগ্যজনের পরিণয়োৎসুক জীবনে সমর্পণের আশায় কতবার স্বয়ংবরসভা আহ্বানের ইচছা প্রকাশ করেছেন মণ্ডুকরাজ । কিন্তু বাধা দিয়েছে, আপত্তি করেছে এবং অবশেষে অবমর্দিতা ভুজঙ্গীর মত রুষ্ট হয়েছে সুশোভনা। —তোমার স্নেহপিঞ্জরের শারিকার জন্য নূতন বীতংস রচনা করো না পিতা, সহ্য করতে পারব না।

স্বয়ংবরসভা আহ্বানের আর কোন চেষ্টা করেন না নৃপতি আয়ু। ভয় পেয়ে চুপ করে থাকেন।

ভয়, অপযশের ভয়। লোকাপবাদের আশঙ্কায়. ম্রিয়মান হয়ে আছেন মণ্ডুকরাজ আয়ু। কিন্তু কৌতুকিনী কন্যার গোপন মূঢ়তার কাহিনী লোকসমাজে নিশ্চয়ই চিরকাল অবিদিত থাকবে না, এই দুশ্চিন্তার মধ্যেও বিস্মিত না হয়ে পারেন না নৃপতি আয়ু আজও কেন এই অগৌরবের কাহিনী জনসমাজে অবিদিত হয়ে আছে এবং তিনি কেমন ক'রে লোকধিক্কারের আঘাত হতে এখনও রক্ষা পেয়ে চলেছেন।

সে রহস্য জানে শুধু কিংকরী সুবিনীতা। কৌতুকিনী রাজতনয়ার ছললীলার সকল রীতি-নীতি ও বৃত্তান্তের কোন কথা তার অজানা নেই।

অপযশ হতে আত্মরক্ষা করার এক ছলনাগূঢ় কৌশল আবিষ্কার করেছে সুশোভনা। প্রণয়াভিলাষী কোন পুরুষের কাছে নিজের পরিচয় দান করে না সুশোভনা। কেউ জানে না, কে সেই বরবর্ণিনী নারী কোথা হতে এল আর চিরকালের জন্য চলে গেল? সে কি সত্যই এই মর্ত্যলোকের কোন পিতার কন্যা? সে কি সত্যই মানবসংসারে লালিতা কোন নারী? সে কি কোন বনস্থলীর সকল পুষ্পের আত্মমথিত সুরভি হতে উদ্ভূতা? অথবা কোন দিগঙ্গনার লীলাসঙ্গিনী, মুক্তা কুড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য ধূলিময় মর্ত্যে নেমে আসে দুদিনের জন্য? কিংবা ফুল্লারবিন্দের স্বপ্ন অথবা নক্ষত্রনিকরের তৃষ্ণা?

আকাশচ্যুত চন্দ্রলেখার মত কে সেই ভাস্বরদেহিনী অপরিচিতা, প্রমত্ত অনুরাগের জ্যোৎস্নায় প্রণয়িজনের হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত করে আবার কোন এক মেঘতিমিরের অন্তরালে সরে যায়? শালীননয়না সেই পরিচয়হীনা প্রেমিকার বিরহ সহ্য করতে না পেরে এক নৃপতি উন্মাদ হয়েছেন, একজন তাঁর রাজত্বভার অমাত্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে বনবাসী হয়েছেন। আনন্দহীন হয়েছে সবারই জীবন। প্রিয়াবিরহক্লিষ্ট সেই সব নরপতিদের সকল দুঃখের বৃতান্ত জানে

সুশোভনা, আর জানে সুবিনীতা। কিন্তু তার জন্য রাজতনয়া সুশোভনার মনে কোনে আক্ষেপ নেই, আর কিংকরী সুবিনীতা সকল সময় মনে মনে আক্ষেপ করে।

—কেন এই মায়াবিনী বৃত্তি আর এই অপ্সরী প্রবৃত্তি? ক্ষান্ত হও রাজকুমারী! কিংকরী সুবিনীতার এই আকুল আবেদনেও কোন ফল হয়নি। সুবিনীতা আরও বিষণ্ণ হয়েছে, মণ্ডুকরাজ আয়ু আরও ম্রিয়মান হয়েছেন এবং শৈবালবর্ণ শিলাপ্রাসাদের চূড়ায় হৈমপ্রদীপ নীহারবাষ্পের আড়ালে মুখ লুকিয়ে আরও নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু সুশোভনার কক্ষে আরও প্রখর হয়ে দীপ জ্বলেছে। অভিসারশেষে ঘরে ফিরে এসে যেন বিজয়োৎসব প্রমত্তা হয়ে ওঠে সুশোভনা। মাধ্বী আসরের বিহ্বলতায় সুতন্ত্রিবীণার স্বরঝংকারে, আর কেলিমঞ্জুল স্বর্ণমঞ্জীরের ধ্বনিতে সুশোভনার উৎসব আত্মহারা হয়। নৃত্যপরা সেই নিষ্ঠুরা নায়িকার জীবনের রূপ দেখে আতঙ্কে শিহরিত হয় সহচরী, তার করধৃত বীজনপত্র দুঃখে ও ত্রাসে শিহরিত হতে থাকে।

মুগ্ধ প্রেমিকের আলিঙ্গনের বন্ধন থেকে কি করে এত সহজে মুক্ত হয়ে সরে আসতে পারে সুশোভনা? কোন মায়াবলে? কেউ কি বাধা দেয় না, বাধা দেবার কি শক্তি নেই কারও?

মায়াবলে নয়, ছলনার বলে। এবং সে-ছলনা বড় সুন্দর। বিভ্রমনিপুণা সুশোভনা পুরুষচিত্তবিজয়ের অভিযানের শেষে অদৃশ্য হয়ে যাবার এক কৌশলও আবিষ্কার করে নিয়েছে।

প্রতি প্রণয়ীকে সঙ্গদানের পূর্বমুহূর্তে একটি প্রতিশ্রুতি প্রার্থনা করে সুশোভনা। কপট ভয় আর অলীক ভাবনা দিয়ে রচিত করুণমধুর একটি নিয়ম। —তোমার জীবনের চিরসঙ্গিনী হয়ে থাকতে কোন আপত্তি নেই আমার, হে প্রিয়দর্শন নরোত্তম। কিন্তু একটি অঙ্গীকার করুন।

—বল প্রিয়ভাষিণী।

—আমাকে কোন মেঘাচ্ছন্ন দিনে কখনও তমালতরু দেখাবেন না।

—তমালতরুতে তোমার এত ভয় কেন শুচিস্মিতা?

—ভয় নয়, অভিশাপ আছে প্রিয়।

—অভিশাপ?

—হ্যাঁ, মেঘমেদুর দিবসের যে মুহূর্তে তমালতরু আমার দৃষ্টিপথে পড়বে, সেই মুহূর্তে আমাকে আর খুঁজে পাবেন না। জানবেন, আপনার প্রণয়কৃতার্থা এই অপরিচিতার মৃত্যু হবে সেদিন।

প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন প্রণয়ী—মেঘমেদুরে দিবসের সকল প্রহর এই বক্ষঃপটের অনুরাগশয্যায় সুখসুপ্তা হয়ে তুমি থাকবে বাঞ্ছিতা । তমালতরু দেখবার দুর্ভাগ্য তোমার হবে না।

আর দ্বিধা করে না সুশোভনা। প্রণয়ীর আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করে এবং পরমুহূর্ত হতে অন্তরের গোপনে শুধু একটি ঘটনার জন্য কৌতুকিনীর প্রাণ যেন অপেক্ষা করতে থাকে। এক প্রহর বা দুই প্রহর, একদিন বা দুই দিন, অথবা সপ্ত দিবানিশা, কিংবা মাসান্ত —আসঙ্গমুগ্ধ এই পুরুষচক্ষুর দৃষ্টি হতে খরকামনার বহ্নিচ্ছায়া সরে গিয়ে কবে অন্তরের ছায়া নিবিড় হয়ে ফুটে উঠবে?

এই প্রতীক্ষা সেদিন সমাপ্ত হয়, যেদিন সুশোভনার করপল্লব সাগ্রহ সমাদরে বুকের উপর তুলে নিয়ে প্রাতঃসূর্যের কিরণকিশলয়ে অরুণিত উদয়শৈলের দিকে তাকিয়ে প্রণয়ী বলে —এত আনন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে বড় ভয় করে প্রিয়া ।

—কিসের ভয়?

—যদি তোমাকে কখনও হারাতে হয়, সে দুর্ভাগ্য জীবনে সহ্য করতে পারব না বোধ হয়।

সুশোভনার করপল্লব শিহরিত হয়, আনন্দের শিহরণ। প্রণয়ীর ভাষায় অন্তরের বেদনা

ধ্বনিত হয়েছে। এতদিনে ও এইবার আন্তরিক হয়ে উঠেছে এই মূঢ় পুরুষের প্রেম। অন্তরজয়ের অভিযান সফল হয়েছে সুশোভনার।

তারপর আর বেশি দিন নয়। নবাম্বুদের আড়ম্বরে আকাশ মেদুর হয়ে ওঠে যেদিন সেদিন কৌতুকিনী সুশোভনা বর্ণায়িত দুকূলে কুসুমে আভরণে ও অঙ্গরাগে সজ্জিত হয়ে সুলীল আবেগে প্রণয়ীর হাত ধরে বলে—উপবনভ্রমণে আমায় নিয়ে চল গুণাভিরাম। আজ মন চায়, দুই চরণের মঞ্জীর নৃত্যভঙ্গ শিঞ্জিত করে তোমার শ্রবণপদবীর সকল আকুলতাকে রম্যনিনাদে নন্দিত করি।

উপবনে প্রবেশ করতেই শোনা যায়। তমালতরুর পত্রান্তরাল হতে কেকারব ধ্বনিত হয়ে দিক চমকিত ক'রে তুলছে। প্রণয়ীর হাত ধ'রে সুশোভনা যেন সত্যই কেকোৎকণ্ঠা বর্ষাময়ূরীর মত আনন্দে চঞ্চল হয়ে তমালতরুর কাছে এসে দাঁড়ায়।

হঠাৎ প্রশ্ন করে সুশোভনা —শিখিবাঞ্ছিত এই পত্রালীসুন্দর তরুর নাম কি প্রিয়তম?

—তমাল।

—ভাল লক্ষণ দেখালেন নৃপতি!

দুই অধরের স্ফুরিত হাস্য লুকিয়ে কেলিকপটিনী সুশোভনা বেদনার্তভাবে প্রণয়ীর দিকে তাকায়।—অভিশাপ লাগল আমার জীবনে, এইবার আমাকে হারাবার জন্য প্রস্তুত থাকুন নৃপতি।

আর্তনাদ করে ওঠেন প্রণয়ী। সুশোভনার অলক্তরঞ্জিত চরণদ্বয় দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরবার জন্য লুটিয়ে পড়েন। সরে যায় সুশোভনা।—আজ আমাকে একটু নির্জনে থাকতে দিন নৃপতি।

সন্ধ্যা হয়, তমালতলে অন্ধকার নিবিড়তর হয়ে ওঠে। একাকিনী বসে থাকে সুশোভনা। তার পর আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রণয়ী জানেন, খুঁজে আর পাওয়া যাবে না। নীলবর্ণ বনস্থলীর সকল পুষ্পের আত্মামথিত সুরভি হতে উদ্ভূতা সেই পরিচয়হীনা বিস্ময়ের নারী এই মেঘাবৃত সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। মৃত্যু হয়েছে সেই সুন্দরাধরা আকস্মিকার,অনামিকা প্রেমিকার।

নীলবর্ণ কাননের দিকে তৃষ্ণার্তের মত তাকিয়ে বসে থাকে রাজনন্দিনী সুশোভনা। সম্মুখে বসে থাকে ব্যজনিকা সহচরী সুবিনীতা।

নবীন কিশলয়ের বৃন্ত কুঙ্কুমরসে অনুলিপ্ত করে সুশোভনার বক্ষঃপটে পত্রলিখা এঁকে দেয় সহচরী। বীজনপত্র আন্দোলিত করে সুশোভনার স্বেদাঙ্কুরব্যথিত কপোলে সমীর সঞ্চার করতে থাকে। নিপুণা কলাবতীর মত ধীরসঞ্চালিত করাঙ্গুলি দিয়ে রাজনন্দিনী সুশোভনার কপাললগ্ন চিকুরনিকুরম্বে বিলোল ভ্রমরক রচনা করে সহচরী। স্তবকিত মেঘভারের মত কবরীবদ্ধ কেশদামের উপর একখণ্ড সুপ্রভ চন্দ্রোপল গ্রথিত করে দেয়। তারপর এক হাতে সুশোভনার চিবুক স্পর্শ করে দুই চক্ষুর সাগ্রহ দৃষ্টি তুলে দেখতে থাকে সহচরী, রাজকুমারীর মুখশোভা সম্পাদনে প্রসাধনের আর কিছু বাকি থেকে গেল কিনা।

সহর্ষে দুই ভ্রূধনু ভঙ্গুরিত করে রাজকুমারী সুশোভনা সহচরীর দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে প্রশ্ন করে —কি দেখছে সুবিনীতা?

—তোমার রূপ দেখছি রাজনন্দিনী।

—কেমন লাগছে দেখতে?

—সুন্দর।

—কি রকম সুন্দর?

—রত্নখচিত অসিফলকের মত উজ্জ্বল, কনকধুতুরার আসবের মত বর্ণমদির, পুষ্পাচ্ছাদিত

কন্টকতরুর মত কোমল। প্রতিধ্বনির মত তুমি সুন্দরস্বরা। তুমি শ্রাবণী দামিনীর মত ক্ষণলাস্যনটী বহ্নি।

সুশোভনা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে—তুমি ভাষাবিদগ্ধা চারণীর মত কথা বলছ সুবিনীতা, কিন্তু তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না।

সহচরী সুবিনীতার কণ্ঠস্বরে যেন এক অভিযোগ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে— রূপাতিশালিনী রাজতনয়া, তোমার রূপ বড় নিষ্ঠুর । এই রূপ মুগ্ধপুরুষের হৃদয় বিদ্ধ করে বিবশ করে, আর বিক্ষত করে। তোমার কণ্ঠস্বরের আহ্বান প্রতিধ্বনির ছলনার মত শ্রবয়িতার হৃদয় উদ্‌ভ্রান্ত করে করে শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। তুমি চকিতস্ফুরিত তড়িল্লেখার মত পথিকজননয়ন শুধু অন্ধ করে দিয়ে সরে যাও। রূপের কৈতবিনী তুমি। সবই আছে তোমার, শুধু হৃদয় নেই।

সহচরীর অভিযোগবাণী শ্রবণ করে ক্ষুদ্ধ হওয়া দূরে থাক, উল্লাসে হেসে ওঠে সুশোভনা —তুমি ঠিকই বলেছ সুবিনীতা। শুনে সুখী হলাম।

—কিংকরীর বাচালতা ক্ষমা কর রাজকুমারী, একটি সত্য কথা বলব?

—বল।

—আমি দুঃখিত।

—কেন?

—তোমার এই রূপরম্যা মূর্তিকে রত্নাভরণে সাজাতে আর আমার আনন্দ হয় না। মনে হয়, বৃথাই এতদিন ধরে তোমাকে এত যত্নে সাজিয়েছি।

—বৃথা?

—হ্যাঁ, বৃথা। একের পর এক, তোমার এক একটি প্রেমহীন অভিসারের লগ্নে তোমার পদতল বৃথাই লাক্ষাপঙ্কে রঞ্জিত করেছি। বৃথাই এত সমাদরে পরাগলিপ্ত করেছি তোমার বরতনু। বৃথাই সুচারু কজ্জলমসিরেখায় প্রসাধিত করে তোমার এই নয়নদ্বয়ে মৃগলোচনদর্পহারিণী নিবিড়তা এনে দিয়েছি।

—তোমার কর্তব্য করেছ কিংকরী, কিন্তু বৃথা বলছ কোন দুঃসাহসে?

—দুঃসাহসে নয়, অনেক দুঃখে বলেছি রাজনন্দিনী। তুমি আজও কারও প্রেমবশ হলে না, কোন প্রণয়িহৃদয়ের সম্মান রাখলে না। আমার দুহাতের যত্নে সাজিয়ে -দেওয়া তোমার প্রেমিকামূর্তি শুধু প্রণয়ীর হৃদয় বিদ্ধ বিক্ষত ও ছিন্ন করে ফিরে আসে। আমার বড় ভয় করে রাজনন্দিনী।

অবিচলিত স্বরে সুশোভনা প্রশ্ন করে —ভয় আবার কিসের কিংকরী?

—এক একটি ছলপ্রণয়ের লীলা সমাপ্ত ক'রে যখন তুমি ভবনে ফিরে আস কুমারী, তখন আমি তোমার এই পদতলের দিকে তাকিয়ে দেখি। মনে হয়, তোমার চরণাসক্ত অলক্ত যেন কোন্ এক হতভাগ্য প্রেমিকের আহত হৃৎপিণ্ডের রক্তে আরও শোণিম হয়ে ফিরে এসেছে।

প্রগল্‌ভ হাসির উচ্ছ্বাস তুলে যৌবনমদয়িত তনু হিল্লোলিত করে সুশোভনা বলে— তোমার মনে ভয় হয় মূঢ়া কিংকরী, আর আমার মনে হয়, নারীজীবন আমার ধন্য হলো। এক একজন মহাবল যশস্বী ও অতুল বৈভবগর্বে উদ্ধত নরপতি এই পদতললীন অলক্তে কমলগন্ধবিধুর ভৃঙ্গের মত চুম্বন দানের জন্য লুটিয়ে পড়ে, পরমুহূর্তে সে উদ্‌ভ্রান্তের জন্য শুধু শূণ্যতার কুহক পিছনে রেখে দিয়ে চিরকালের মত সরে আসি। বল দেখি সহচরী, নারীজীবনে এর চেয়ে বেশি সার্থক আনন্দ ও গর্ব কি আর কিছু আছে?

—ভুল বুঝছ রাজতনয়া, এমন জীবন কোন নারীর কাম্য হতে পারে না।

—নারীজীবনের কাম্য কি?

—বধূ হওয়া।

আবার অট্টহাসির শব্দে ব্যজনিকা কিংকরীর উপদেশ যেন বিদ্রূপে ছিন্ন করে সুশোভনা বলে—বধূ হওয়ার অর্থ পুরুষের কিংকরী হওয়া, কিংকরী হয়েও কেন সেই ক্ষুদ্র জীবনের দুঃখ কল্পনা করতে পার না সুবিনীতা? আমাকে মরণের পথে যাবার উপদেশ দিও না কিংকরী।

—আমার অনুরোধ শোন কুমারী, পুরুষহৃদয় সংহারের এই নিষ্ঠুর ছলপ্রণয়বিলাস বর্জন কর। প্রেমিকের প্রিয়া হও, বধূ গেহিণী হও।

বিদ্রূপকুটিল দৃষ্টি তুলে সুশোভন আবার প্রশ্ন করে —কি করে প্রিয়া বধূ-গেহিণী হতে হয় কিংকরী? তার কি কোন নিয়ম আছে?

—আছে।

—কি?

—প্রেমিককে হৃদয় দান কর, প্রেমিকের কাছে সত্য হও?

হেসে ফেলে সুশোভনা—আমার জীবনে হৃদয় নামে কোন বোঝা সেই সুবিনীতা। যা নেই, তা কেমন ক'রে দান করব বল?

ব্যজনিকা কিংকরীর চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়। ব্যথিত স্বরে বলে —আর কিছু বলতে চাই না রাজনন্দিনী। শুধু প্রার্থনা করি, তোমার জীবনে হৃদয়ের আবির্ভাব হোক।

বিরক্ত দৃষ্টি তুলে সুশোভনা জিজ্ঞাসা করে—তাতে তোমার কি লাভ?

— কিংকরীর জীবনেরও একটি সাধ তাহলে পূর্ণ হবে।

—কিসের সাধ?

—তোমাকে বধূবেশে সাজাবার সাধ। ঐ সুন্দর হাতে বরমাল্য ধরিয়ে দিয়ে তোমাকে দয়িতভবনে পাঠাবার শুভলগ্নে এই মূর্খা ব্যজনিকার আনন্দ শঙ্খধ্বনি হয়ে একদিন বেজে উঠবে। এই আশা আছে বলেই আমি আজও এখানে রয়েছি রাজকুমারী, নইলে তোমার ভর্ৎসনা শুনবার আগেই চলে যেতাম।

সুশোভনা রুষ্ট হয়—তোমার এই অভিশপ্ত আশা অবশ্যই ব্যর্থ হবে কিংকরী, তাই তোমাকে শাস্তি দিলাম না। নইলে তোমার ঐ ভয়ংকর প্রার্থনার অপরাধে তোমাকে আজই চিরকালের মত বিদায় ক'রে দিতাম।

সুশোভনা গম্ভীর হয়। সহচরী সুবিনীতাও নিরুত্তর হয়। স্তব্ধ নিদাঘের মধ্যাহ্নে লতাবাটিকার ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে অঙ্গরাগসেবিত তনুশোভা নিয়ে বসে থাকে মণ্ডুকরাজপুত্রী সুশোভনা। সম্মুখের নীলবর্ণ কাননের উপান্তপথের দিকে অদ্ভুত তৃষ্ণাতুর দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে। আর, ব্যজনিকা সুবিনীতা নিঃশব্দে বীজনপত্র অন্দোলিত ক'রে কিংকরীর কর্তব্য পালন করতে থাকে।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে সুশোভনা। কাননপথের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি সুশোভনার দুই চক্ষু মৃগয়াজীবা ব্যাধিনীর চক্ষুর মত দেখায়। কি যেন দেখতে পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে সুশোভনার নিবিড় কৃষ্ণপক্ষ্মসেবিত দুই লোচনের তারকা। সহচরী সুবিনীতাও কৌতূহলী হয়ে কাননভূমির দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিতভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়। শিহরিত হস্তের বীজনপত্র আতঙ্কে কেঁপে ওঠে।

অশ্বারূঢ় এক কান্তিমান যুবাপুরুষ কাননপথে চলেছেন। বোধ হয় পথভ্রান্ত হয়েছেন, কিংবা পিপাসার্ত হয়েছেন। তাই শীতল সরসীসলিলের সন্ধানে কাননের অভ্যন্তরের দিকে ধীরে ধীরে চলেছেন। তাঁর রত্নসমন্বিত কিরীট সূর্যকরনিকরের স্পর্শে দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। কে এই বলদৃপ্ততনু যুবাপুরুষ? মনে হয় কোন রাজ্যাধিপতি নরশ্রেষ্ঠ।

উঠে দাঁড়ায় সুশোভনা। ঐ কিরীটের বিচ্ছুরিত দ্যুতি যেন সুশোভনার নয়নে খর বিদ্যুতের

প্রমত্ত লাস্য জাগিয়ে তুলেছে। কিংকরী সুবিনীতা সভয়ে জিজ্ঞাসা করে —ঐ আগন্তুকের পরিচয় তুমি জান কি রাজকুমারী?

—জানি না, অনুমান করতে পারি।

—কে?

—বোধ হয় ইক্ষ্বাকুগৌরব সেই মহাবল পরীক্ষিৎ। শুনেছি, আজ তিনি মৃগয়ায় বের হয়েছেন।

সুবিনীতা বিস্মিত হয়ে এবং শ্রদ্ধাপ্লুত স্বরে প্রশ্ন করে—ইক্ষ্বাকুগৌরব পরীক্ষিৎ? অযোধ্যাপতি, পরম প্রজাবৎসল মহাবদান্য, ভীতজনরক্ষক, আর্তজনশরণ সেই ইক্ষ্বাকু?

সুশোভনা হাসে —হ্যাঁ কিংকরী, সুরেন্দ্রসম পরাক্রান্ত ইক্ষ্বাকুকুলতিলক পরীক্ষিৎ। ঐ দেখ, ধর্নুবাণ, ও তূণীরে সজ্জিত, কটিদেশে বিলম্বিত দীর্ঘ অসি, দৃপ্ত তুরঙ্গের পৃষ্ঠাসীন বীরোত্তম পরীক্ষিৎ। কিন্তু ....কিন্তু তোমাকে আর আশ্চর্য করে দিতে চাই না সুবিনীতা। তুমি মুর্খা, তুমি কিংকরী মাত্র, কল্পনাও করতে পারবে না তুমি, ঐ ধনুর্বাণতূণীরে সজ্জিত পরাক্রান্তের পুরুষহৃদয় একটি কটাক্ষে চূর্ণ করতে কি আনন্দ আছে!

কিংকরী সুবিনীতা সন্ত্রস্ত হয়ে সুশোভনার হাত ধরে। —নিবৃত্ত হও রাজতনয়া । অনেক করেছ, তোমার মিথ্যাপ্রণয়কৈতবে বহু ভগ্নহৃদয় নৃপতির জীবনের সব সুখ মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ....প্রজাপ্রিয় ইক্ষ্বাকুর সর্বনাশ আর করো না।

মদহাস্যে আকুল হয়ে কিংকরীর হাত সরিয়ে দেয় সুশোভনা। মণিময় সপ্তকী কাঞ্চী ও মুক্তাবলী তুলে নিয়ে নিজের হাতেই নিজেকে সজ্জিত করে। তারপর হাতে তুলে নেয় একটি সপ্তসরা বীণা। প্রস্তুত হয়ে নিয়ে সুশোভনা বলে—আমি যাই সুবিনীতা । বৃথা মুর্খের মত বিষণ্ন হয়ো না। কিংকরীর কর্তব্য সদাহাস্যমুখে পালন কর, তাহলেই সুখী হবে।

লতাবাটিকার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে সুশোভনা একবার থামে। কয়েক মুহূর্ত কি যেন চন্তা করে। তার পরেই সুবিনীতাকে আদেশ করে। —প্রতি সন্ধ্যায় ইক্ষ্বাকুর প্রাসাদলগ্ন উপবনের প্রান্তে চর ও শিবিকা অতি সঙ্গোপনে প্রেরণ করতে ভুলবে না কিংকরী।

লতাবাটিকার নিভৃত থেকে বের হয়ে পান্থবিটপীর ছায়ায় ছায়ায় কাননভূমির দিকে অগ্রসর হতে থাকে সুশোভনা। মাথা হেঁট করে অশ্রুসিক্ত নেত্রে অনেকক্ষন লতাবাটিকার নিভৃতে চুপ করে বসে থাকে সুবিনীতা। আর একবার কাননপথের দিকে তাকায়, সুশোভনাকে আর দেখা যায় না। লতাবাটিকার নিভৃত হতে মণ্ডুকরাজের শৈবাল বর্ণ প্রাসাদের কক্ষে একাকিনী ফিরে আসে সুবিনীতা।

সুন্দর কানন। বহুলবল্কল প্রিয়াল আর শিবদ্রুম বিল্বের ছায়ায় সমাকীর্ণ। লতাপরিবৃত শতশত নক্তমাল কোবিদার ও শোভাঞ্জন। চণ্ড নিদাঘের ভ্রূকুটি তুচ্ছ ক'রে এই নিবিড় বনভূভাগের প্রতি তৃণলতা ও পুষ্পের প্রাণ যেন বিহগস্বরলহরী হতে উৎসারিত নাদপীযূষ পান করে সরসিত হয়ে রয়েছে। কমলকিঞ্জল্কে সমাচ্ছন্ন এক সরোবরের জল পান ক'রে পিপাসার্তি শান্ত করলেন পরীক্ষিৎ। মৃণাল তুলে নিয়ে এসে ক্লান্ত অশ্বকে খেতে দিলেন। তার পর শ্রমক্লম অপনোদনের জন্য নবলবকুলপল্লবের ছায়াতলে তৃণাস্তীর্ণ ভূমির উপর শয়ন করলেন।

পরীক্ষিতের সুখতন্দ্রা অচিরে ভেঙে যায়। উৎকর্ণ হয়ে ওঠে বসেন পরীক্ষিৎ। বীণার তন্ত্রিঝংকার, তার সঙ্গে রমণীকণ্ঠনিঃসৃত শ্রুতিরমণীয় সুস্বর, মন্থর বনবায়ু যেন সেই স্বরমাধুরীতে আপ্লুত হয়ে গিয়েছে।

উঠলেন রাজা পরীক্ষিৎ। বনস্থলীর প্রতি তরুতলে লক্ষ্য রেখে সন্ধান ক'রে ফিরতে থাকেন। অবশেষে দেখতে পান, সেই সরোবরের তটে শৈবালাসনে উপবিষ্টা

চন্দ্রোপলপ্রভাসমন্বিতা এক নারী সলিলহিল্লোলিত রক্তকোকনদের মৃণালকে তার অলক্তলিপ্ত পদের মৃদুল আঘাতে আন্দোলিত ক'রে যেন উচ্ছল যৌবনের অভিমান লীলায়িত করছে। করধৃত বীণার তন্ত্রীকে চম্পককলিকাসদৃশ করাঙ্গুলির স্পর্শে সুস্বরিত ক'রে গান গাইছে নারী।

মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকেন রাজা পরীক্ষিৎ। ও কি কোন মানবনন্দিনীর মূর্তি? অথবা প্রমূর্তা বনশ্রী? কিংবা এই সরোবরের সলিলোত্থিতা দ্বিতীয়া এক সুধাধরা দেবিকা?

এগিয়ে যান রাজা পরীক্ষিৎ। অপরিচিতার সম্মুখবর্তী হন। গীত বন্ধ ক'রে অপরিচিতা নারী আগন্তুক পরীক্ষিতের দিকে অপাঙ্গে নিরীক্ষণ করে। এতক্ষণে স্পষ্ট করে দেখতে পান পরীক্ষিৎ, নারীর কবরীগ্রথিত চন্দ্রোপলের রশ্মির চেয়েও বেশি সান্দ্র ও স্নিগ্ধ এই নারীর দুই এণলোচনের রশ্মি।

কথা বলেন পরীক্ষিৎ— পরিচয় দাও এণাক্ষী।

—আমার পরিচয় জানি না।

—তোমার পিতা? মাতা? দেশ?

—কিছুই জানি না।

—বিশ্বাস করতে পারছি না বিম্বোষ্ঠী। সপ্তকীমেখলা আবৃত ঐ কৃশককটিতট মুক্তাবলীশোভিত ঐ সুধাধবল কণ্ঠদেশ, কুঙ্কুমাঙ্কিত ঐ কোমল বক্ষঃপট; তোমার কবরীর ঐ চন্দ্রোপল আর এই সপ্তস্বরা বিপঞ্চী, এ কি পরিচয়হীনতার পরিচয়?

—আমার পরিচয় আমি। এছাড়া আর কোন পরিচয় জানি না।

নীরবে, অপলক নেত্রে শুধু তাকিয়ে থাকেন পরীক্ষিৎ।

নারী প্রশ্ন করে —কি দেখছেন গুণবান?

—দেখছি, তুমি বিস্ময় অথবা বিভ্রম।

—আপনি কে?

—আমি ইক্ষ্বাকু পরীক্ষিৎ।

—এইবার যেতে পারেন নৃপতি পরীক্ষিৎ। বনলালিতা এই পরিচয়হীনার কছে আপনার কোন প্রয়োজন নেই।

—কর্তব্য আছে।

—কি কর্তব্য?

—নৃপতির সুখসুন্দর মণিময় ভবনে তোমাকে নিয়ে যেতে চাই, এই বনবাসিনীর জীবন তোমাকে শোভা দান করে না সুনয়না।

—বুঝলাম, রাজার কর্তব্য পালন করতে চাইছেন মহাবদান্য প্রজাবৎসল পরীক্ষিৎ। কিন্তু রাজকীয় উপকারে আমার কোন সাধ নেই নৃপতি।

ক্ষণিকের জন্য নিরুত্তর হয়ে থাকেন পরীক্ষিৎ। দুই চক্ষুর দৃষ্টি নিবিড় হয়ে উঠতে থাকে। তারপরেই প্রেমবিধুর কণ্ঠস্বরে আহ্বান করেন —মণিময় ভবনে নয়, আমার মনোভাব ভবনে এস সুতনুকা। প্রণয়দানে ধন্য কর আমার জীবন।

সপ্তস্বরা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় নারী। —একটি প্রতিশ্রুতি চাই নৃপতি পরীক্ষিৎ।

—বল।

—আপনি জীবনে কখনও আমাকে সরোবরসলিল দেখাবেন না।

—কেন?

—অভিশাপ আছে আমার জীবনে, যদি আর কোন দিন কোন সরোবর সলিলে প্রতিবিম্বিত আমার এই মূর্তিকে আমি দেখতে পাই, তবে আমার মৃত্যু হবে সেই দিন।

—অভিশাপের শঙ্কা দূর কর সুযৌবনা। তুমি আমার প্রমোদভবনের ক্ষান্তিহীন উৎসবে চিরক্ষণের নায়িকা হয়ে থাকবে। কোন সরোবরের সান্নিধ্যে যাবার প্রয়োজন হবে না কোন দিন।

মণিদীপিত প্রমোদভবনের নিভৃতে পীরিক্ষিতের প্রণয়াকুল জীবনের প্রতি দিন-যামিনীর মুহূর্তগুলি সুশোভনার নৃত্যে গীতে লাস্যে ও চুম্বনরভসে বিহ্বল হয়ে থাকে। এই ভাবেই একদিন সেদিন বৈশাখী সন্ধ্যার প্রথম প্রহরে পূর্ণেন্দুশোভিত আকাশ হতে কুন্দধবল কৌমুদীকণিকা এসে প্রমোদভবনের ভিতরে লুটিয়ে পড়ে। সেদিন মণিদীপ আর জ্বাললেন না রাজা পরীক্ষিৎ। শান্ত জ্যোৎস্নালোকে প্রমোদসঙ্গিনী সেই মেঘচিকুরা নারীর মুখের দিকে মমতামথিত সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন। অনুভব করেন পরীক্ষিৎ, আকাশের ঐ শশাঙ্কচ্ছবির মত এই মুখচ্ছবিও কম সুন্দর নয়। পূর্ণচন্দ্রের মাঝে মৃগরেখার মত এই বরনারীর ললাটেও কৃষ্ণচিকুরের ভ্রমরক সুনিবিড় ছায়ালেখা অঙ্কিত ক'রে রেখেছে।

সযত্নে নারীর ললাটলগ্ন ভ্রমরক নিজ হাতে বিন্যস্ত করতে থাকেন পরীক্ষিৎ। সুশোভনার হাত ধরেন; মৃদুস্বন শঙ্খের অস্ফুট নিঃশ্বাসধ্বনির মত নারীর কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে আহ্বান করেন পরীক্ষিৎ—প্রিয়া !

প্রমদা নারীর চক্ষু মণিদীপের মত হঠাৎ প্রখর হয়ে ওঠে। —কি বলতে চাইছেন রাজা?

—তুমি আমার মনোভাব ভবনের নায়িকা নও প্রিয়া, তুমি আমার জীবন ভবনের অন্তরতমা। আমার কামনার আকুলতার মধ্যে এতদিনে এক প্রেমসুন্দর প্রদীপ জ্বলে উঠেছে, তাই মণিদীপ নিভিয়ে দিয়ে শুধু হৃদয় দিয়েই দেখতে পাই, তুমি কত সুন্দর।

কৌতুকিনীর অধর সুস্মিত হয়ে ওঠে। এতদিনে আন্তরিক হয়েছেন রাজা পরীক্ষিৎ। প্রমাদাতনুবিলাসী নৃপতির আকাঙ্ক্ষা আন্তরিক প্রেমে পরিণাম লাভ করেছে। অপরিচিতা নারীকে হৃদয় দিয়ে চিরজীবনের আপন করে নিতে চাইছেন পরীক্ষিৎ।

পরীক্ষিতের হাত ধ'রে প্রমদা নারী হঠাৎ আবেগাকুল হয়ে ওঠে—চন্দ্রিকাবিহ্বল এমন বৈশাখী সন্ধ্যায় আজ আর ঘরে থাকতে মন চাইছে না প্রিয়। তোমার উপবনে চল।

নবকাশসন্নিভ সুশ্বেত ক্ষৌম পট্টবাসে সুতনু সজ্জিত ক'রে, শ্বেত স্ফটিকোপলকণিকায় খচিত শ্বেতাংশুকজালে কবরী আচ্ছন্ন ক'রে শ্বেত পুষ্পের মালিকা কণ্ঠলগ্ন ক'রে, জ্যোৎস্নালিপ্ততনু সুধবলা কলহংসীর মত উৎফুল্লা হয়ে নৃপতি পরীক্ষিতের সঙ্গে উপবনে প্রবেশ করে সুশোভনা। পরীক্ষিতের মুখের দিকে তাকিয়ে আবেদন করে—আজ আমার মন চাইছে, রাজা, কলহংসীর মত জলকেলি ক'রে আপনার দুই চক্ষুর দৃষ্টি নন্দিত করি।

—তাই কর প্রিয়া।

উপবনের এক সরোবরের তটে এসে দাঁড়ালেন রাজা পরীক্ষিৎ, সঙ্গে সুশোভনা।

মৃণালভুক মরাল আর কলহংসের দল অবাধ আনন্দে সরোবরসলিলে সন্তরণ ক'রে ফিরছে। উৎফুল্লা কলহংসীর মত হর্ষভরে জলে নামে সুশোভনা। কয়েকটি মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপরেই হর্ষহীন বেদনাবিষণ্ন মুখে পরীক্ষিতের, দিকে তাকায়।—আমাকে এই সরোবরসলিলের সান্নিধ্যে কেন নিয়ে এলেন রাজা পরীক্ষিৎ?

—তোমারই ইচ্ছায় এসেছি প্রিয়া।

—আপনার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করুন রাজা।

প্রতিশ্রুতি? চমকে ওঠেন, এবং এতক্ষণে স্মরণ করতে পারেন পরীক্ষিৎ, প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে তিনি তাঁর জীবনপ্রিয়াকে সরোবরসলিলের সান্নিধ্যে নিয়ে এসেছেন।

সুশোভনা বলে— আপনি ভুল ক'রে আমাকে আমার জীবনের অভিশাপের সান্নিধ্যে নিয়ে এসেছেন রাজা। সলিলবক্ষে আমার প্রতিচ্ছবি দেখেছি। এখন আমাকে বিদায় দেবার জন্য প্রস্তুত হোন।

পরীক্ষিৎ বলেন—তোমাকে বিদায় দিতে পারব না প্রিয়া, এই জীবন থাকতে না।

ভগ্নহৃদয়ের আর্তনাদ নয়, অসহায়ের বিলাপ নয়, সংকল্পে কঠিন এক বলিষ্ঠের দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

চমকে ওঠে সুশোভনা। জীবনে এই প্রথম শঙ্কাতুর হয়ে ওঠে শঙ্কাহীনা কৌতুকিনীর মন।

সুশোভনা —আবার ভুল করবেন না রাজা। দৈব অভিশাপের কোপ মিথ্যা করবার শক্তি আপনার নেই।

পরীক্ষিৎ — সত্যই অভিশাপ, না অভিশাপের কৌতুক?

পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনে সুশোভনার বুকের ভিতর নিঃশ্বাসবায়ু হঠাৎ ভীরুতায় কেঁপে ওঠে।

পরীক্ষিৎ এগিয়ে যেয়ে সুশোভনার সম্মুখে দাঁড়ালেন।—এস প্রিয়া বাহু বন্ধনে তোমাকে বক্ষোলগ্ন ক'রে রাখি সর্বক্ষণ, দেখি কোন্ অভিশাপের প্রেত আমার কাছ থেকে কেমন ক'রে তোমার প্রাণ হরণ ক'রে নিয়ে যেতে পারে।

সভয়ে পিছিয়ে সরে দাঁড়ায় সুশোভনা। —অনুরোধ করি রাজা পরীক্ষিৎ, কাছে আসবেন না। আমাকে এই স্থানে একাকিনী থাকতে দিন।

পরীক্ষিৎ —কতক্ষণ?

সুশোভনা —কিছুক্ষণ।

পরীক্ষিৎ—কেন?

সুশোভনা —বুঝতে চাই, ঐ অভিশাপ সত্যই একটি মিথ্যার কৌতুক। বিশ্বাস করতে চাই মিথ্যা হয়ে গিয়েছে অভিশাপ । সরোবরতটের নির্জন একান্তে দাঁড়িয়ে আমাকে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করবার সুযোগ দান করুন নৃপতি।

পরীক্ষিৎ —কিসের প্রার্থনা?

সুশোভনার কণ্ঠস্বর অদ্ভুত এক আকুলতায় কাতর হয়ে ওঠে। —তোমারই প্রেমিকা মৃত্যুশঙ্কা পরিহার করবার জন্য প্রার্থনা করতে চায়, সুযোগ দাও প্রিয় পরীক্ষিৎ।

মিথ্যা ভয়ে বিহ্বলা নারী যেন এক ব্রত পালন ক'রে তার মিথ্যা বিশ্বাসের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে চাইছে। নারীর এই করুণ অনুরোধের অমর্যাদা করলেন না পরীক্ষিৎ। সরোবরতট থেকে সরে এসে উপবনের আম্রবীথিকার ছায়ায় বিচরণ ক'রে ফিরতে থাকেন।

আম্রমঞ্জরী হতে ক্ষরিত মধুবিন্দু ললাটচুম্বন ক'রে যেন সান্ত্বনা দেয়; মত্ত কোকিলের কুহুকূজনে ধরণী সঙ্গীতময় হয়ে ওঠে, তবুও মনের উদ্বেগ ভুলতে পারছিলেন না পরীক্ষিৎ। সত্যই কি এক অভিশাপের কৌতুকে এই এক বৈশাখী যামিনীর চন্দ্রিকা তাঁর জীবনে প্রিয়াহীন শূন্যতা সৃষ্টির জন্যই দেখা দিয়েছে?

এই উদ্বেগ সহ্য হয় না, পরমুহূর্তে ত্বরিতপদে ফিরে গিয়ে আবার সরোবরতটে এসে দাঁড়ান পরীক্ষিৎ। —প্রিয়া ।

ডাকতে গিয়ে আর্তনাদ ক'রে ওঠেন পরীক্ষিৎ । শূন্য ও নির্জন সেই সরোবরতটে কোন প্রার্থনার মূর্তি নেই; শ্বেতাংশুকজালে কবরীর শোভা পুষ্পিত ক'রে কোন নারীর মূর্তি নেই।

পরীক্ষিতের দুই চক্ষুর দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ সায়কের মত চারিদিকের শূন্যতা ভেদ ক'রে ছুটতে থাকে। সরোবরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সন্দেহ করেন, সরোবরের খলসলিল বুঝি তাঁর প্রিয়াকে গ্রাস করেছে। পরক্ষণে দেখতে পেলেন, সরোবরের অপর প্রান্তে যেন এক মৃতা কলহংসীর জ্যোৎস্নানুলিপ্ত দেহপিণ্ড তটভূমি স্পর্শ ক'রে ভেসে রয়েছে। কতগুলি প্রেতচ্ছায়া এসে মুহূর্তের মধ্যে সেই সুশ্বেতা কলহংসীর মৃতদেহ তুলে নিয়ে চলে গেল।

বিশ্বাস করতে পারেন না। সমস্ত ঘটনা ও দৃশ্যগুলিকে সন্দেহ হয়। বুঝি তাঁর উদ্বিগ্ন চিত্তের একটা বিভ্রম, ব্যথিত দৃষ্টির প্রহেলিকা।

কিন্তু আর এক মুহূর্তও কালক্ষেপ করলেন না পরীক্ষিৎ। উপবনের প্রহরীদের ডাক দিলেন,

সরোবরের বাঁধ ভেঙে দিয়ে সরোবর জলশূন্য করলেন। কিন্তু নিমজ্জিত কোন নারীদেহের সন্ধান পেলেন না।

ছুটে গিয়ে রাজভবনের মন্দুরায় প্রবেশ করেন এবং রণাশ্বের মুখে রজ্জুযোজিত ক'রে প্রস্তুত হন পরীক্ষিৎ। পরমুহূর্তে অশ্বারূঢ় হয়ে সরোবরের প্রান্ত লক্ষ্য ক'রে ছুটে চলে যান।

কিন্তু প্রান্তর আর বনোপান্তের সর্বত্র সন্ধান ক'রেও সেই নারীমূর্তির সাক্ষাৎ কোথাও পেলেন না পরীক্ষিৎ। হতাশ হয়ে তাঁর শূন্য বিষণ্ণ ও দীপহীন মনিভবনের দিকে ফিরে যেতে থাকেন। যেমন ক্লান্ত অশ্বের অঙ্গ হতে স্বেদজলের ধারা, তেমনই পরাক্রান্ত পরীক্ষিতেরও দুই চক্ষু হতে অবিরল অশ্রুধারা ঝরে পড়ে।

আবার উপবনের পথে প্রবেশ করেন রাজা পরিক্ষিৎ। হঠাৎ দেখতে পান, গোপনচর চরের মত এক ছায়ামূর্তি যেন বৃক্ষান্তরালে দাঁড়িয়ে আছে। কটিবন্ধ হতে খড়্গ হাতে তুলে নিয়ে গোপনচর ছায়ামূর্তির দিকে ছুটে যান পরীক্ষিৎ। কিন্তু ধরতে পারলেন না। সেই ছায়ামূর্তিও দৌড় দিয়ে এক সলিল-প্রবাহিকায় ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু চরের মূর্তিটাকে স্পষ্ট দেখে ফেললেন পরীক্ষিৎ। এক মণ্ডুক।

মণ্ডুকরাজের শৈবালবর্ণ শিলানিকেতনের কক্ষে রাজপুত্রীর কিঙ্কিণীক্বণলাঞ্ছিত চরণ তেমন ক'রে আর নৃত্যায়িত হয়ে উঠল না। সফল অভিসারের আনন্দ ও মাধুকীবারিতে তেমন ক'রে আর মত্ত হতে পারল না। কপটাভিসারিকা সুশোভনা যেন কন্টকবিদ্ধ চরণ নিয়ে ফিরে এসেছে।

অপরাহ্ন কাল। মণ্ডুক জনপদের বাতাস হঠাৎ আর্তনাদে আর হাহাকারে পীড়িত হয়ে উঠল। প্রাসাদকক্ষের বাতায়নপথে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত আর্তনাদের রহস্য বুঝতে চেষ্টা করে সুশোভনা, কিন্তু বুঝতে পারে না। মনে হয়, এক ধূলিলিপ্ত ঝঞ্ঝা যেন এই বৈশাখী অপরাহ্নকে আক্রমণ করার জন্য ছুটে আসছে।

—এ কোন নতুন সর্বনাশ করেছ রাজপুত্রী?

বাইরে নয় কক্ষের ভিতরেই আর্ত কণ্ঠস্বরের ধিক্কার শুনে চমকে ওঠে সুশোভনা। মুখ ফিরিয়ে দেখতে পায়, রূঢ়ভাষিণী কিংকরী সুবিনীতা এসে দাঁড়িয়েছে। ভ্রুভঙ্গী উদ্ধত ক'রে সুশোভনাও রুষ্টস্বরে প্রশ্ন করে। — কি হয়েছে কিংকরী?

—পরাক্রান্ত পরীক্ষিৎ মণ্ডুক-জনপদ আক্রমণ করেছেন। শত শত মণ্ডুকের প্রাণ সংহার ক'রে ফিরছেন। রাজ্যের প্রজা আর্তনাদ করছে, আর রাজা আয়ু অশ্রুপাত করছেন। শোণিতে ও দীর্ঘশ্বাসে ভরে উঠল মণ্ডুকজনসংসার। কোন্ নতুন কৌতুকসুখে রাজ্যের এই সর্বনাশ করলে নির্মমা? পরাক্রান্ত পরীক্ষিতের কাছে কেন তোমার পরিচয় প্রকট ক'রে দিয়ে এসেছ কপটিনী?

—মিথ্যা অভিযোগ করো না বিমূঢ়া। নিমেষের মনের ভুলেও নৃপতি পরীক্ষিতের কাছে আমি আমার পরিচয় প্রকট করিনি।

কিংকরী সুবিনীতা অপ্রস্তুত হয়। —আমার সংশয় মার্জনা কর রাজপুত্রী, কিন্তু.....।

—কিন্তু কি?

—কিন্তু ভেবে পাই না, মহাচেতা পরীক্ষিৎ কেন অকারণে অবৈরী মণ্ডুক জাতির বিনাশে হঠাৎ প্রমত্ত হয়ে উঠলেন? ...... আমি রাজসমীপে চললাম কুমারী।

যেন মণ্ডুকরাজ আয়ুকে এই সংবাদ প্রদানের জন্য ব্যস্তভাবে চলে যায় কিংকরী সুবিনীতা।

কক্ষের বাতায়নের সন্নিকটে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে সুশোভনা। নিষ্প্রভ হয়ে আসছে অপরাহ্নমিহির। অদৃশ্য ও দুর্বোধ্য সেই বৈশাখী ঝঞ্ঝার ক্রুদ্ধ নিঃস্বন নিকটতর হয়ে আসছে। মনে হয় সুশোভনার, মণ্ডুকজনপদের উদ্দেশে নয়, এই প্রতিহিংসার ঝড় তারই জীবনের সকল গর্ব আক্রমণ করবার জন্য ছুটে আসছে।

হঠাৎ আপন মনেই হেসে ওঠে সুশোভনা। জীর্ণপত্রের আবর্জনার মত এই মিথ্যা দুশ্চিন্তার ভার মন থেকে দূরে নিক্ষেপ করে। দীপ জ্বালে, মাধুকীবারির পাত্রে ওষ্ঠ দান করে। কনকমুকুর সম্মুখে রেখে তিলপর্ণীর তিলক অঙ্কিত করে কপালে। জনপদের আর্তস্বর আর অদৃশ্য ঝঞ্ঝার ভ্রূকুটি আসবমধুসিক্ত অধরের উপহাস্যে তুচ্ছ ক'রে সুতন্ত্রিবীণা কোলের উপর তুলে নেয়। কিন্তু ঝংকার দিতে গিয়ে প্রথম করক্ষেপের পূর্বেই বাধা পায় সুশোভনা।

—রাজকুমারী।

সুবিনীতা এসে দাঁড়িয়েছে। বিরক্তভাবে ভ্রুক্ষেপ করে সুশোভনা —আবার কোন্ দুর্বার্তা নিয়ে এসেছ সুমুখী?

—দুর্বার্তাই এনেছি সুব্রতা রাজকুমারী। তোমার ছলনায় ভুলেছেন রাজা পরীক্ষিৎ; কিন্তু মণ্ডুকজাতির দুর্ভাগ্য ভোলেনি। দৈবের ইঙ্গিতে তোমার অপরাধ আজ জাতির অপরাধ হয়ে ধরা পড়ে গিয়েছে।

ভ্রূকুটি করে সুশোভনা —একথার অর্থ?

—নৃপতি পরীক্ষিৎ দূতমুখে জানিয়েছেন, দৈব অভিশাপে ভীতিগ্রস্তা তাঁর প্রিয়তমা যখন মূর্চ্ছিতা হয়ে সরোবরজলে ভেসে গিয়েছিলেন, সেই সময় দুরাত্মা মণ্ডুকেরা চন্দ্রোপলপ্রভাসমন্বিতা তাঁর জীবনবাঞ্ছিতা সেই নারীকে নিধন করেছে। তিনি স্বচক্ষে একজন মণ্ডুক চরকে পালিয়ে যেতে দেখেছেন।

সুতন্ত্রিবীণায় ঝংকার তুলে সুশোভনা বলে —তোমার সুবার্তা শুনে আশ্বস্ত হলাম কিংকরী।

—আশ্বস্ত ?

—হ্যাঁ, আশ্বস্ত ও আনন্দিত। এই অক্ষিতারকার কটাক্ষে, এই স্ফুরিতাধরের হাস্যে, এই মধুমুখের চুম্বনের ছলনায় প্রখরবুদ্ধি ও পরাক্রান্ত পরীক্ষিৎও কত মূর্খ হয়ে গিয়েছে।

—তুমি কৃতার্থা হয়েছ কৌতুকের নারী, কিন্তু তোমার প্রেমিক আজ তোমারই বিচ্ছেদের দুঃখে কত নিষ্ঠুর হয়ে নিরীহের শোণিতে যে ভয়াল উৎসব আরম্ভ করেছে, তার জন্য একটুও দুঃখ হয় না তোমার? এই অগ্নিদেহা দীপশিখারও হৃদয় আছে, তোমার নেই রাজকুমারী।

কিংকরী সুবিনীতা কক্ষ ছেড়ে চলে যায়।

সন্ধ্যা নামে গাঢ়তরা হয়ে। অন্তরীক্ষে অন্ধকার। বাতায়নের কাছে এসে দাঁড়ায় সুশোভনা এবং দেখতে পায়, জনপদপরিখার প্রান্তে শত্রুশিবিরে প্রদীপ জ্বলছে। শুনতে পায় সুশোভনা, শত্রুর খড়্গাঘাতে ছিন্নদেহ প্রজার মৃত্যুনাদ করুণ হয়ে সন্ধ্যার বাতাসে ছুটাছুটি করছে।

বাতায়নপথ থেকে সরে আসে সুশোভনা। কক্ষের দীপশিখা যেন আপন হৃদয় পুড়িয়ে অন্তরীক্ষের সেই ভয়াল অন্ধকারকে বাতায়নপথে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। কিন্তু আজ যেন অন্ধকারের মধ্যেই লুকিয়ে কিছুক্ষণের মত বধিরা হয়ে বসে থাকতে ইচ্ছা করে সুশোভনার।

আবার আর্তনাদ শোনা যায়। চমকে ওঠে সুশোভনা, যেন তার বক্ষঃপঞ্জরে এসে আঘাত করছে কতগুলি মর্মভেদী ধ্বনি, কতগুলি নিরপরাধ বিপন্ন প্রাণের বিলাপ। সহ্য হয় না এই বিলাপ । ফুৎকারে দীপশিখা নিভিয়ে দিয়ে কক্ষের বহির্দ্বারে এসে চিৎকার ক'রে ডাক দেয় সুশোভনা—সুবিনীতা!

কক্ষান্তর হতে ছুটে আসে কিংকরী সুবিনীতা। সন্ত্রস্ত স্বরে বলে —আজ্ঞা কর কুমারী।

সুশোভনা —আজ্ঞা করছি কিংকরী , এই মুহূর্তে শত্রু পরীক্ষিতের শিবিরে দূত প্রেরণ কর। জানিয়ে দাও, কোন মণ্ডুক তাঁর আকাঙ্ক্ষার নারীকে নিধন করেনি। জানিয়ে দাও, সে নারী হলো মণ্ডুকরাজদুহিতা সুশোভনা, যে এই প্রাসাদের কক্ষে তার সকল সুখ নিয়ে বেঁচে আছে। ছলপ্রণয়ে মুগ্ধ মূর্খ ও উন্মাদ নৃপতিকে এই সংহারের উৎসব ক্ষান্ত ক'রে চলে যেতে বলে দাও।

সুবিনীতা —জানিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজকুমারী। স্বয়ং মণ্ডুকরাজ আয়ু ব্রাহ্মণবেশে পরীক্ষিতের শিবিরে গিয়ে এই কথা জানিয়ে দিয়ে এসেছেন।

সন্ত্রস্তের মত চমকে ওঠে সুশোভনা, তার পরেই দুই কজ্জলিত খরনয়নের দীপ্তি যেন হঠাৎ উদাস ও করুণ হয়ে যায়। সুশোভনা শান্তভাবে হাসে —শুনে সুখী হলাম। পিতা এতদিন পরে আমার উপর নির্মম হতে পেরেছেন। ভাবতে ভাল লাগছে কিংকরী। আমার অপরাধ প্রকাশ ক'রে দিয়ে পিতা আজ প্রজাকে উন্মত্ত পরীক্ষিতের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছেন। এক নির্বোধ প্রেমিক আজ ছলসর্বস্বা কপটিনীকে ঘৃণা ক'রে চলে যাবে, আমিও সেই মূঢ়ের প্রেমের গ্রাস থেকে বাঁচলাম সুবিনীতা।

কিংকরী সুবিনীতার দুই চক্ষু হঠাৎ বেদনায় বিচলিত হয়—প্রজা বেঁচেছে রাজকুমারী, কিন্তু তুমি...।

সুশোভনা —কি?

সুবিনীতা—প্রেমিক পরীক্ষিৎ প্রতীক্ষার দীপ জ্বেলে তোমারই আশায় রয়েছেন।

চিৎকার ক'রে ওঠে সুশোভনা— না, হতে পারে না। এমন ভয়ংকর আশার কথা উচ্চারণ করো না কিংকরী। সে নির্বোধকে জানিয়ে দাও, আয়ুনন্দিনী সুশোভনার হৃদয় নেই, তার হৃদয় দান ক'রে পুরুষের ভার্যা হতে সে জানে না। সুশোভনাকে ঘৃণা ক'রে এই মুহূর্তে তাঁকে চলে যেতে বল।

সুবিনীতা —যদি তিনি ঘৃণা করতে না পারেন? তবে?

দীপশিখার দিকে তাকিয়ে স্থিরস্ফুলিঙ্গের মত দুই চক্ষুতারকা নিশ্চল ক'রে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে সুশোভনা। তারপর, নিজ দংশনে আহতা ফণিনীর মত যন্ত্রণাক্ত দৃষ্টি তুলে কিংকরী সুবিনীতার দিকে তাকিয়ে বলে—তবে সে নির্বোধের মনে ঘৃণা এনে দাও। নারীধর্মদ্রোহিণী কৌতুকিনী নারীর গোপন জীবনের সকল ইতিহাস তাকে শুনিয়ে দাও। সুশোভনার অপযশ রটিত হোক ত্রিভুবনে। জানুক পরীক্ষিৎ, মণ্ডুকরাজ আয়ুর চন্দ্রোপলপ্রভাসমন্বিতা তনয়া হলো এক বহুবল্লভা পরপূর্বা ও ভ্রষ্টা নারী।

অশ্রুসিক্ত নেত্রে কিংকরী সুবিনীতা বলে—এতক্ষণে বোধ হয় সেকথাও জানতে পেরেছেন রাজা পরীক্ষিৎ।

আর্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে সুশোভনা—কেমন করে?

সুবিনীতা —পিতা আয়ু আজ তোমার উপর সত্যই নির্মম হয়েছেন কুমারী; তিনি স্বয়ং অমাত্যবর্গকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষিতের শিবিরে চলে গিয়েছেন, ইক্ষ্বাকুগৌরবের কাছে নিজমুখে নিজতনয়ার অপকীর্তিকথা জানিয়ে দিতে। এ ছাড়া মহাবল পরীক্ষিৎকে তোমার প্রণয়মোহ হতে মুক্ত করার আর কোন উপায় ছিল না দুর্ভাগিনী কুমারী।

করতলে চক্ষু আবৃত ক'রে সবেগে কক্ষ হতে ছুটে চলে যায় কিংকরী সুবিনীতা।

মাধুকীবারিতে পরিপূর্ণ পাত্রে নীলগরলের বুদ্বুদ ভাসে। আজ এতদিন পরে সুশোভনার জীবনে শেষ অভিসারের লগ্ন দেখা দিয়েছে। বাতায়নপথে দেখা যায়, আকাশে ফুটে আছে অনেক তারা , সিদ্ধকন্যাদের সন্ধ্যাপূজার ফুলগুলি যেন এখনও ছড়িয়ে রয়েছে। এই তো ঘুমিয়ে পড়বার সময়।

অপযশ রটিত হয়ে গিয়েছে। জগতের কোন অন্ধও এই রঙ্গময়ী কপটিনীকে চিনতে আর ভুল করবে না। এত কালের সব গর্ব, সব উল্লাস আর সব সুযোগ হারিয়ে শূন্য হয়ে গেল জীবন। মৃত্যু তো হয়েই গিয়েছে। তবে আর কেন? একটা ঘৃণার কাহিনী মাত্র হয়ে এই পৃথিবীতে পড়ে থাকবার আর কোন অর্থ হয় না। ছলস্বর্গের অপ্সরীর মত ছদ্মচারিণী এক রূপের সর্পীকে,

দেহহীনা প্রেতিনীর চেয়েও ভয়ংকরী এক হৃদয়হীনাকে এইবার ঘৃণা ক'রে ফিরে যেতে পারবেন পরীক্ষিৎ। জগতের সকল চক্ষুর ঘৃণা সহ্য করার জন্য এবং বিনা হৃদয়ের এই জীবনটাকে শুধু দেবার জন্য আর ধরে রাখবার কোন প্রয়োজন নেই।

মাধুকীবারির পাত্রে গরলফেন টলমল করে, তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে সুশোভনার ওষ্ঠাধর। পাত্র হাতে তুলে নেয় সুশোভনা।

—রাজনন্দিনী!

কিংকরী সুবিনীতার আহ্বানে বাধা পেয়ে সুশোভনা মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

সুবিনীতা বলে—পরীক্ষিতের কাছ থেকে বার্তা এসেছে রাজকুমারী।

—কি?

—তিনি তোমার আশায় রয়েছেন।

—এ কি সম্ভব?

—এ সত্য।

—তিনি কি শোনেননি, আমি যে এক শুচিতাহীনা মসিলেখা মাত্র?

—সব শুনেছেন।

গরলপাত্র ভূতলে রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুশোভনা। বাতায়নের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখতে পায়, শত্রুর শিবিরে একটি প্রদীপ জ্বলছে, ধীর স্থির শান্ত ও নিষ্কম্প তার শিখা।

অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে সুশোভনা। শত্রুশিবিরের সেই প্রদীপের বিচ্ছুরিত জ্যোতি যেন সুশোভনার হৃৎপিন্ডের অন্ধকার স্পর্শ করছে। জাগছে হৃদয়, যেন মরু অন্ধকারের গভীরে নির্বাসিত এক মল্লীকোরক ফুটেছে। আর, যেন এই জাগরণের বিস্ময় আপন আবেগে সুশোভনার মৃদুকম্পিত অধরের ভীতি ভেদ ক'রে গুঞ্জরণ হয়ে ফুটে ওঠে।—কী সুন্দর শত্রু তুমি!

কিংকরী সুবিনীতা চমকে উঠে প্রশ্ন করে —কি বলছ রাজকুমারী?

সুবিনীতার কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে সুশোভনা। —আজ আমার জীবনে শেষ অভিসারের লগ্ন এসে গিয়েছে সুবিনীতা। সাজিয়ে দাও কিংকরী, আর সুযোগ পাবে না।

যেন এক নূতন আকাশের শ্রাবণী বেদনার ধারাবারিবিধৌত নবশেফালিকা, সুশোভনার অশ্রুলুপ্ত সেই সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায় কিংকরী সুবিনীতা। সভয়ে প্রশ্ন করে —কোথায় যেতে চাও রাজনন্দিনী?

সুশোভনা—ঐ সুন্দর শত্রুর কাছে।

সুবিনীতা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে—কি বেশে সাজাব?

সুশোভনা— বধূবেশে।

সুমুখ ও গুণকেশী

অবশেষে বাসুকিপরিপালিত ভোগবতী পুরীতে এসে আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল ইন্দ্রসারথি মাতলির ম্রিয়মান মন। এই সেই ভোগবতী পুরী, যে-স্থান শ্বেতাচলের মত কলেবর সেই মহাবল শেষ নাগের তপস্যায় পুণ্যময় হয়ে আছে। ঊর্ধ্বে মনিজালের দীপ্তি, আর নীচে শতশত প্রস্রবণের অবিরল ধারাসলিলে রত্নধাতুরেণুর প্রবাহ, এই ভোগবতী পুরীও বাসবের অমরাবতীর মত নয়নাভিরাম।

অনেক রাজ্য ঘুরে এসেছেন মাতলি, কিন্তু কোথাও এমন কোন রূপমান তরুণের সাক্ষাৎ পেলেন না, যাকে তাঁর রূপমতী কন্যা গুণকেশীর পরিণেতা হবার জন্য আহ্বান করা যেতে পারে। কি আশ্চর্য, যে অমরপুরে বাস করেন ইন্দ্রসখা মাতলি, পারিজাতের দেশ সেই অমরপুরেও গুণকেশীর পাণিগ্রহণের যোগ্য পাত্র খুঁজে পেলেন না।

গিয়েছিলেন পাতালের বারণপুরে, যেখানে জগতের হিতসাধনের জন্য মেঘের বক্ষে বারিনিষেক করছেন ঐরাবত। যে বারণপুরের সলিলচারী মীনও চন্দ্রকিরণ পান ক'রে সুন্দর হয়ে আছে, সেই দেশেও কোন সুন্দর তরুণের সাক্ষাৎ পেলেন না মাতলি। পুণ্ডরীক কুমুদ ও অঞ্জন, সুপ্রতীককুলের সকল প্রধানের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মাতলি। কিন্তু কাউকেই গুণকেশীর পাণিগ্রহণের যোগ্য বলে মনে হয়নি। মাতলিতনয়া গুণকেশী, পারিজাতের মালা যার কণ্ঠের স্পর্শে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে, সেই গুণকেশীর বরমাল্য গ্রহণ করার যোগ্য কোন সুকণ্ঠ সেই বারণপুরে নেই।

অবশেষে ভোগবতী পুরী। মণি স্বস্তিক চক্র ও কমণ্ডলুচিহ্নে খচিত বিবিধ রত্নময় আভরণ ধারণ ক'রে সভায় সমবেত হয়েছেন শত শত প্রবীণ নাগপ্রধান এবং তরুণ নাগকুমার। সভাস্থলের নিকটে এসে দেখতে পেলেন মাতলি, নাগপ্রধান আর্যকের সম্মুখে বসে আছে এক প্রিয়দর্শন কুমার। মনে হয়, দিব্যদেহ ঐ তরুণের মুখময়ুখের স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছে নাগসভাস্থলীর মণিজাল। গুণকেশীর জীবনের প্রতিক্ষণের নয়নানন্দ হতে পারে, ঐ তো সেই রমণীয়তনু তরুণের মূর্তি। কে এই কুমার?

প্রীতমনা মাতলি নাগপ্রধান আর্যকের কাছে এসে সাগ্রহে নিবেদন করেন— আপনার সম্মুখে উপবিষ্ট এই কুমারের পরিচয় জানতে ইচ্ছা করি নাগপ্রধান আর্যক।

আর্যক বলেন—আমার পৌত্র সুমুখ।

মাতলি বলেন— আমার কন্যা গুণকেশীর পাণিগ্রহণের যোগ্য কেউ যদি এই ত্রিভুবনে থাকে, তবে একমাত্র একজনই আছে। সে হলো আপনারই এই পৌত্র সুমুখ।

আর্যক—আপনার ভাষণ শুনে খুবই প্রীত হলাম ইন্দ্রসারথি মাতলি।

মাতলি অকস্মাৎ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন।—কিন্তু প্রীত হয়েও কেন হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে গেলেন নাগপ্রধান আর্যক? দেখছি, আপনার পৌত্র সুমুখেরও সুন্দর আনন যেন হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

ব্যথিত স্বরে নিবেদন করেন আর্যক — আপনার উদ্দেশ্য অনুমান করতে পারছি ইন্দ্রসখা মাতলি, তাই বিষণ্ণ না হয়ে পারছি না।

মাতলি —কি অনুমান করছেন আর্যক?

আর্যক — আপনার ইচ্ছা, আপনার কন্যা গুণকেশীর পানিগ্রহণ করুক আমার এই নয়নানন্দবর্ধন পৌত্র সুমুখ।

মাতলি — হ্যাঁ নাগপ্রধান আর্যক, সুরকামিনীর চেয়েও শতগুণ কমনীয়রূপা আমার কন্যা গুণকেশীর পতি হোক আপনার পৌত্র সুমুখ।

আর্যক—ইন্দ্রসখা মাতলির সঙ্গে সম্বন্ধবন্ধন কে না আকাঙ্ক্ষা করে? কিন্তু...?

মাতলি —তবু দ্বিধা কেন আর্যক?

আর্যক —সুমুখের আয়ু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

বেদনাহত মাতলি চমকে ওঠেন—আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, এই কথার অর্থ কি আর্যক?

অশ্রুসিক্ত চক্ষু তুলে আর্যক বলেন—আমার পুত্র চিকুরনাগকে সম্প্রতি হত্যা ক'রেও তৃপ্ত হতে পারেনি নাগবৈরী গরুড়। প্রতিজ্ঞা করেছে গরুড় এক মাসের মধ্যে আমার পৌত্র সুমুখকেও হত্যা না ক'রে সে ক্ষান্ত হবে না। আপনি জানেন মাতলি , বিষ্ণুকৃপার আশ্রয়ে উৎসাহিত গরুড় কি নিষ্ঠুর সংহারামোদে মত্ত হয়ে নাগজাতিকে ধ্বংস করে চলেছে। কি ভয়ংকর তার জাতিবৈরী। মাতৃক্রোড়ে সুখসুপ্ত নাগশিশুর বক্ষ বিদীর্ণ করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না গরুড়। আমার জীবনে আর একটি দুঃসহ শোকের আঘাত আসন্ন হয়ে উঠেছে বাসবসুহৃদ্ মাতলি। নাগদ্বেষী গরুড়ের হিংসার নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন হবে আমার জীবনের শেষ শান্তি এই প্রিয় পৌত্র সুমুখের জীবন। আপনার প্রস্তাব শুনে সুখী হয়েছি, কিন্তু প্রস্তাবে সম্মত হতে পারি না মাতলি। মৃত্যু যার আসন্ন, কি লাভ হবে তার জীবনে ক্ষণচঞ্চল এক উৎসবের আনন্দ আহ্বান করে? শুভরাত্রির দীপ নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যার জীবনের দীপ নিভে যাবে, প্রিয়ার প্রেমান্বিত আননের শোভা দেখে মুগ্ধ হবার জন্য একটি দিনের মত সময়ও যে পাবে কি না সন্দেহ, তার কাছে আপনার কন্যাকে সম্প্রদান করতে আমি কখনই বলতে পারি না মাতলি। এই আমার দুঃখ।

কিছুক্ষণ বিমর্ষভাবে আর চিন্তান্বিত হয়ে বসে থাকেন মাতলি। তার পরেই আশাদীপ্ত স্বরে বলে ওঠেন—আপনি সম্মতি দান করুন আর্যক।

আর্যক বিস্মিতভাবে বলেন—আপনার এই নির্বন্ধাতিশয্যের অর্থ কি মাতলি? আপনি কি আপনার কন্যার অচিরবৈধব্য কামনা করেন?

মাতলি — না আর্যক, আমি নাগজাতিদ্বেষী গরুড়ের নিষ্ঠুর দর্পের বিনাশ কামনা করি।

আর্যক —কিন্তু......।

মাতলি—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন প্রবীণ আর্যক, আপনার পৌত্র সুমুখের আয়ু রক্ষার জন্য আমি কোন প্রযত্নের ত্রুটি করব না। আশা আছে, দেবরাজ ইন্দ্রের সহায়তায় আমার প্রযত্ন সফল হবে।

আর্যক —তবে তাই করুন মাতলি।

মাতলি—কিন্তু আপনার পৌত্র সুমুখকে সঙ্গে নিয়েই আমি সুরপুরে যেতে চাই আর্যক।

আতঙ্কিত দুই চক্ষুর দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন আর্যক—সুরপুরী অমরাবতীর কোথায় আর কার আশ্রয়ে থাকবে আমার সুমুখ?

মাতলি—আমার আশ্রয়ে।

আর্যক—কিন্তু ভয় হয় মাতলি, নাগবৈরী গরুড় তবু তার সংহারবাসনা চরিতার্থ করবার সুযোগ পেয়ে যাবে।

বাধা দিয়ে বলেন মাতলি—দুশ্চিন্তা করবেন না আর্যক। আমার আশা আছে, এমন সুযোগ কখনই পাবে না গরুড়।

আর্যক— আশার কথা বলবেন না মাতলি, প্রতিশ্রুতি দিন।

অকস্মাৎ উৎসাহিত স্বরে সুমুখই বলে ওঠে --দেবরাজসখা মাতলির কাছ থেকে বৃথা প্রতিশ্রুতি চাইছেন কেন পিতামহ? আপনার এই ভোগবতী পুরীতে এমন কেউ নেই যে, গরুড়ের আঘাত থেকে আমার প্রাণ রক্ষা করতে পারে। এখানে থাকলে আমার প্রাণরক্ষার কোনই আশা নেই পিতামহ। অমর পুরীতে গিয়ে দেবরাজসখা মাতলির সহায়তায় তবু আয়ুলাভের আশা আছে। আশা আছে, দেবরাজ ইন্দ্র যদি তুষ্ট হন, তবে তিনিই অমৃত দান ক'রে আপনার পৌত্রকে অমর ক'রে তুলবেন। আমাকে সেই আশার রাজ্যে যেতে অনুমতি দিন পিতামহ।

আর্যক বলেন—এস।

অমরাবতীর পুরদ্বার পার হয়ে পারিজাতকাননের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে নাগকুমার সুমুখ। অম্লানকুসুম পারিজাত, সুরপুরের পুষ্পের রূপের মধ্যেও যেন অমরতার আনন্দ ফুটে রয়েছে। ঐ কল্পপাদপের পল্লব কখনও শীর্ণ হয় না। জরা নেই, জীর্ণতা নেই, স্বর্গনগরীর প্রাণে কোন বিরহ ও বিচ্ছেদের বেদনা নেই। এখানে সবই চিরজাগ্রত ও চিরপ্রস্ফুটিত। চিরমধুনিষ্যন্দ মন্দারের মতই যৌবন এখানে চিরসরসিত। অমরপুরীর সমীরে শুধু সুস্মিত অধরের হাস্যস্বরলহরী ভেসে বেড়ায়। অশ্রুবাষ্প নেই, ক্রন্দন নেই, বেদনাহীন অমরপুরীর সুধাসিক্ত হৃদয় চিরহর্ষে তরঙ্গিত হয়ে রয়েছে।

অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে সুমুখ, যেন তার কল্পনা এই অমরতায় ধন্য সুরনগরীশোভা পান করার জন্য পিপাসিত হয়ে উঠেছে। লুব্ধ ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে ক্ষণায়ু জীবনের উদ্বেগে ব্যথিত ভোগবতী পুরীর একটি প্রাণ।

সুমুখ বলে—আমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দান করুন অমরেন্দ্রসারথি মাতলি।

মাতলি—বল, কিসের প্রতিশ্রুতি চাও।

সুমুখ—আমি অমৃত চাই।

চমকে ওঠেন মাতলি —আমি কেমন ক'রে তোমাকে অমৃত দানের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি সুমুখ?

সুমুখ—দেবরাজ ইচ্ছা করলেই তো আমাকে অমৃত দান করতে পারেন।

মাতলি —হ্যাঁ, দেবরাজ পারেন।

সুমুখ—আপনি অনুরোধে দেবরাজকে তুষ্ট ও প্রীত ক'রে আমার জন্য অমৃত সংগ্রহ ক'রে দিন দেবরাজসখা মাতলি।

মাতলি —কিন্তু দেবরাজ যদি আমার অনুরোধ প্রত্যাখান করেন, তবে?

সুমুখ—তবে আমাকে বিদায় দান করবেন ইন্দ্রসারথি, আপনার কন্যার পাণিগ্রহণে আমার আর কোন আগ্রহ থাকবে না।

মাতলি বেদানাহত স্বরে বলেন—তোমার সংকল্পের কথা শুনে ব্যথিত হলাম সুমুখ।

সুমুখ—কেন?

মাতলি—গুণকেশীর পাণিগ্রহণে তোমার এই অনাগ্রহ দেখে দুঃখিত না হয়ে পারছি না সুমুখ।

হেসে ওঠে সুমুখ —আপনি কি চান ইন্দ্রসারথি?

মাতলি—আমি চাই, তুমি আয়ুষ্মান হও। আমি চাই তুমি গরুড়ের হিংস্র প্রতিজ্ঞার আঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে আমার কন্যা গুণকেশীর পতি হও।

সুমুখ—কে আমাকে আয়ু দান করবেন। গরুড়ের আঘাত হতে কে আমার প্রাণরক্ষা করবেন?

মাতলি—আশা আছে, আমার অনুরোধে দেবরাজ তোমাকে আয়ু দান করবেন।

সুমুখ—যদি না করেন? যদি আপনি বুঝতে পারেন যে, ভোগবতীর এই ক্ষণায়ু নাগকুমারের প্রাণ আর একটি দিনের মধ্যেই নাগবৈরী গরুড়ের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, তবে?

মাতলি— তবে কি?

সুমুখ— তবে কি আপনি আপনার কন্যাকে আমার কাছে সম্প্রদান করবেন? আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন ইন্দ্রসারথি মাতলি?

সহসা লজ্জিত হয়ে এবং কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দান করেন মাতলি —না।

সুমুখ আবার হেসে ওঠে —আমার কাছে আপনার কন্যার পাণি সমর্পণে আপনার এই অনাগ্রহ কেন দেবরাজসখা?

মাতলি বলেন— জানি না অদৃষ্টে কি আছে। আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম, তোমার জন্য

দেবরাজের কাছে অমৃত প্রার্থনা করব আমি। যদি সুযোগ পাই, তবে ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়েও বলব, আমার কন্যার জীবনসঙ্গী হবে যে প্রিয়দর্শন নাগকুমার, সেই সুমুখকে অমৃতদানে অমর করুন ভগবান।

তৃপ্তচিত্তে এবং আশাদীপ্ত নেত্রে সুমুখ বলে—আপনার এই চেষ্টার প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট। আমার বিশ্বাস, আপনার চেষ্টা সফল হবে ইন্দ্রসারথি মাতলি।

ভবনে প্রবেশ ক'রেই পত্নী সুধর্মার কাছে শুনলেন মাতলি, ভগবান বিষ্ণু আজ অমরাবতীতে অবস্থান করছেন। শুনে প্রসন্ন হলেন মাতলি, কিন্তু পরক্ষণেই শঙ্কাপন্নের মত দুশ্চিন্তিত হয়ে ডাক দিলেন—গুণকেশী!

কন্যা গুণকেশী এসে সম্মুখে দাঁড়ায়— আজ্ঞা করুন পিতা।

মাতলি—এখনি যে অভ্যাগত অপরিচিতকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে মন্দারকুঞ্জের নিভৃতে ঐ লতাবাটিকায় পৌঁছিয়ে দিয়ে এসেছ, তার পরিচয় অনুমান করতে পার কন্যা?

গুণকেশী—না।

মাতলি—ভোগবতী পুরীর নাগ আর্যকের পৌত্র আর বিগতাসু চিকুরের পুত্র সুমুখ।

গুণকেশী— পাতাল দেশের কুমার সুরপুরে কেন এলেন?

মাতলি—তোমারই পাণি গ্রহণ ক'রে তোমার জীবনের সহচর হবে যে , সে হলো এই নাগকুমার সুমুখ। কিন্তু...।

গুণকেশীর লজ্জারাগে আরক্ত কপোলের দিকে তাকিয়ে স্নেহবিবশ স্বরে মাতলি বলেন —কিন্তু সুমুখের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে।

যেন হঠাৎ এক মরুঝটিকার জ্বালাবায়ু এসে গুণকেশীর দুই চক্ষু আঘাতে পীড়িত ক'রে তুলেছে, ব্যাথাহত নেত্রে তাকিয়ে থাকে গুণকেশী। কপোলের রক্তাভ প্রসন্নতা এক মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যায়, আর নীরবে এই দুঃসহ বার্তার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে।

মাতলি বলেন—নাগবৈরী গরুড়ের সংকল্প , এক মাসের মধ্যেই সে সুমুখের প্রাণ সংহার করবে। তাই দুশ্চিন্তিত হয়েছি কন্যা। ভগবান বিষ্ণুর কাছে কিংবা দেবরাজের কাছে গিয়ে সুমুখের জন্য অমৃত প্রার্থনা করতে হবে। এখনি যেতে হবে।

গুণকেশী —আপনার প্রার্থনা সফল হোক পিতা।

মাতলি—কিন্তু শুনতে পেয়েছি, ভগবান বিষ্ণু আজ সুরপুরীতে অবস্থান করছেন। তাই নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারছি না কন্যা।

গুণকেশী—কেন?

মাতালি—ভগবান বিষ্ণু যখন এসেছেন, তখন তাঁর বাহন গরুড়ও নিশ্চয় এসেছে। ভয় হয়, যে কোন মুহূর্তে এসে আমার স্নেহাশ্রিত সুমুখের প্রাণ বিনাশ করে চলে যাবে ভয়ংকর জাতিদ্বেষপ্রমত্ত গরুড়, বিষ্ণুকৃপায় আশ্রিত দর্পোন্মাদ গরুড়। তাই নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারছি না কন্যা।

গুণকেশী—আপনি বিলম্ব করবেন না পিতা। নিশ্চিন্ত মনে প্রস্থান করুন।

মাতলি—যতক্ষণ না ফিরে আসি ততক্ষণ সুমুখের প্রাণরক্ষার ভার তোমার উপর রইল গুণকেশী।

গুণকেশী—হ্যাঁ, পিতা।

ইন্দ্রসন্নিধানে চলে গেলেন মাতলি, আর মন্দার কুঞ্জের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে বসে থাকে গুণকেশী।

এই তো কিছুক্ষণ আগে, যেন নিজেরই যৌবনান্বিত জীবনের এতদিনের সুস্বপ্ন দিয়ে রচিত একটি মূর্তিকে পথ দেখিয়ে ঐ মন্দারকুঞ্জের নিভৃতে রেখে এসেছে গুণকেশী।

কিন্তু কল্পনা করতে পারেনি গুণকেশী, সত্যই ঐ সুন্দরদর্শন তরুণ হলো ক্ষণভঙ্গুর সুস্বপ্নের মত সুন্দর এক ক্ষণায়ু মাত্র। বাহু প্রসারিত করেছে মৃত্যু, ঐ তরুণের প্রাণ লুণ্ঠন করার জন্য। তবু এসেছে প্রিয়া লাভের আশায়; সুরপুরনিবাসিনী গুণকেশীকে জীবনসহচরী ক'রে নিয়ে যাবার জন্য ভোগবতীর অতল হতে উঠে এসেছে এক সুন্দর বিশ্বাস।

অকস্মাৎ, যেন নিজের মনের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে গুণকেশী। হৃদয়ের গভীরে এক জলছলছল সরসীর বুকে ফুটে উঠেছে নাগকুমার সুমুখের মুখকমলশোভা। আরও বুঝতে পারে গুণকেশী, তার দুই চক্ষু হতে বারিধারা ঝরে পড়ছে।

এরই নাম বোধ হয় অশ্রু, এই বস্তু অমরপুরীর জীবনে নেই। তবে কোথা হতে আর কেন আসে এই অশ্রু সুরপুরনিবাসিনী গুণকেশীর নয়নে? প্রেমের প্রথম উপহার কি এই অশ্রু?

—অমর হও অথবা আয়ুস্মান হও, কিংবা ক্ষণায়ু হও, যাই হও তুমি, তুমিই মাতলিতনয়া গুণকেশীর প্রেমের পুরুষ। গুণকেশীর অন্তরে যেন এক সংকল্পের সঙ্গীত সুধ্বনিত হতে থাকে।—বিফল হবে না তোমার বিশ্বাস। যদি মৃত্যু তোমাকে কেড়ে নিয়ে যেতে আসে, যদি বরণমাল্য দান করবার সুযোগ নাই বা আসে, তবু গুণকেশী তার প্রেমাকুল এই দুই বাহুর মালিকা তোমার কণ্ঠে উপহার না দিয়ে তোমাকে বিদায় দেবে না। অমৃত নই আমি, প্রাণদায়িনী নই আমি, কিন্তু তোমার মৃত্যুকেই মধুর ক'রে দিতে পারি আমি। সুরপুর যদি তোমাকে বঞ্চিত করে, দেবরাজ যদি তোমাকে অমৃত দান না করেন, তবে দুঃখ করো না নাগকুমার। মাতলিতনয়া গুণকেশী তোমাকে বঞ্চিত করবে না। ভঙ্গুরপ্রাণ দীপশিখার মত সত্যই যদি নিভে যাও, তবে নিভে যাবার আগে তোমার বক্ষে বরণ ক'রে নিও তোমার প্রেমিকা মাতলিতনয়ার কামনাবিহ্বল নিঃশ্বাস।

গুণকেশীর মনের বেদনাময় ভাবনাগুলি যেন এই অদ্ভুত অশ্রুর স্পর্শে মধুর আর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিন্তু মন্দারকুঞ্জের নিভৃতেও কি এমনই কোন বেদনাময় ভাবনা অশ্রুর স্পর্শে মধুর ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে? জানতে ইচ্ছা করে, জেগে আছে না ঘুমিয়ে পড়েছে জীবনপ্রিয়ার মুখচ্ছবি অন্বেষণে ভোগবতী হতে অমরপুরে আগত ঐ পথিক।

ঘুমিয়ে পড়েছিল সুমুখ। যেন মন্দারকুসুমের সৌরভে অভিভূত স্বপ্ন দেখছিল সুমুখ। অমৃত দান করেছেন দেবরাজ, আর অমরত্ব লাভ করেছে চিকুরতনয় সুমুখ। শঙ্কা নেই, উদ্বেগ নেই, অশ্রুহীন চিরহর্ষের জীবন। বিদায় বেদনা নেই, বিরহে ব্যথা নেই, বক্ষে দীর্ঘশ্বাস নেই। জীর্ণ হয় না যৌবন, শ্রান্ত হয় না দেহ, মলিন হয় না কান্তি। কিন্তু হঠাৎ যেন কার কুন্তল সুরভির স্পর্শে মন্দারসৌরভে অভিভূত এই স্বপ্ন ভেঙে গেল। চোখ মেলে তাকায় সুমুখ।

সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে মাতলিতনয়া গুণকেশী। বিস্মিত সুমুখ বলে— তুমি? আজ এই অসময়ে এখানে কি উদ্দেশে এসেছ মাতলিতনয়া?

গুণকেশী— অসময় কেন বলছেন চিকুরতনয়? সন্ধ্যাতারকা যদি একটু আগে ফুটে ওঠে, তবে কি আকাশের হৃদয় ব্যথিত হয়? ঊষার অরুণাভা যদি একটু আগে জেগে ওঠে, তবে কি আপত্তি করে জলকমল? আপনি আমার পাণি গ্রহণ করবেন, আপনাকেই পতিত্বে বরণ করে ধন্য হবে আমার পারিজাতের মালা; শঙ্খধ্বনি ও মন্ত্ররবের উৎসবের মধ্যে আমাকে চিরকালের প্রিয়া করে গ্রহণ করবেন যিনি, আমি তাঁরই কাছে এসেছি।

সুমুখ —বল কি উদ্দেশে এসেছ।

গুণকেশী —জানতে ইচ্ছা করে, এতক্ষণ কি স্বপ্ন দেখছিলেন নাগকুমার?

সুমুখ—দেখছিলাম, যে বিশ্বাস নিয়ে এই সুরপুরে এসেছি, আমার সেই বিশ্বাস সফল হয়েছে।

ফুল্ল প্রসূনের মত অকস্মাৎ গুণকেশীর দুই নয়নও যেন এক বিশ্বাসের স্পর্শে উৎসুক হয়ে ওঠে। —কি বিশ্বাস নিয়ে সুরপুরে এসেছেন চিকুরতনয়?

সুমুখ —এসেছি অমৃতলাভের জন্য।

আর্তনাদের মত বেদনাশিহরিত স্বরে প্রশ্ন করে গুণকেশী—অমৃতলাভের জন্য?

সুমুখ —হ্যাঁ।

গুণকেশী —অমৃতই কি আপনার অভীষ্ট?

সুমুখ—হ্যাঁ, মাতলিতনয়া গুণকেশী। যদি অমৃত পাই, যদি সুরোপম অমরতা লাভ করি, তবেই তোমাকে আমার জীবনের সহচরী হতে আহ্বান করব গুণকেশী, আমার এই সংকল্পের কথা জানেন তোমার পিতা বাসবসুহৃদ্ মাতলি।

গুণকেশী —যদি অমৃত না পান, তবে?

অকস্মাৎ শঙ্কিতের মত বিষণ্ণ হয়ে ওঠে সুমুখ—এমন অশুভ বচন উচ্চারণও করো না গুণকেশী।

গুণকেশী—আমার প্রশ্নের উত্তর দিন চিকুরতনয়; যদি আপনার অমরত্ব লাভের স্বপ্ন বিফল হয়, তবে কি মাতলিতনয়া গুণকেশীর বরমাল্য প্রত্যাখ্যান করে চলে যাবেন!

সুমুখ—তুমি বল পারিজাতসৌরভবিলাসিনী সুন্দরী; যদি বুঝতে পার যে আর এক মুহূর্ত পরে চিকুরতনয় সুমুখের প্রাণ বিনাশ করবে হিংস্র ও ভয়ংকর নাগবৈরী গরুড়, তবে কি তুমি এই মুহূর্তে তার কণ্ঠে বরমাল্য দিতে পারবে?

গুণকেশী— পারব চিকুরতনয়।

বিস্ময়ে শিহরিত হয়ে সুমুখ বলে—এ কেমন প্রণয়রীতি কুমারী গুণকেশী?

গুণকেশী—এ অতি সহজ প্রণয়রীতি চিকুরতনয়। গুণকেশী ভালবেসেছে আপনাকে, আপনার অমরতাকে নয়। গুণকেশী ভালবাসে আপনার প্রাণকে, আপনার প্রাণের অনন্ততাকে নয়। আপনার আয়ুর চেয়ে আপনার হৃদয় আমার কছে শতগুণ বেশী লোভনীয় ও স্পৃহনীয় ও মূল্যবান, হে নাগকুমার। আমি প্রেমিকা, আমার কাছে আপনার ঐ বক্ষের ক্ষণিক স্পর্শ অনন্ত হয়ে থাকবে চিকুরতনয়, যদি আমার জন্য আপনার হৃদয়ে এক বিন্দু প্রেম থাকে।

সুমুখ—আমাকে ক্ষমা কর মাতলিতনয়া; যদি অমরতা লাভ করতে না পারি, তবে আমার আহত স্বপ্নের বেদনারুধিরে রঞ্জিত হয়ে যাবে আমার হৃদয়। সেই হতাশাব্যথিত হৃদয়ে প্রেমের পুষ্প কোনদিন ফুটে উঠবে না গুণকেশী।

গুণকেশী—চিকুরতনয়!

সুমুখ—বল মাতলিতনয়া।

গুণকেশী—প্রেমহীন নয়নেই একবার শুধু তাকিয়ে দেখ তোমার প্রেমকাঙ্ক্ষিণী এই সুরপুরনিবাসিনীর যৌবনচ্ছবি।

সুমুখ—দেখেছি গুণকেশী।

গুণকেশী —বল, কি বলে তোমার ঐ দেহের শোণিতকণিকার কামনা? পিপাসা জাগে না কি অধরে? চঞ্চল হয় না কি বক্ষের নিঃশ্বাস? বল, ভোগবতীর সলিলে লালিততনু নাগকুমার, এই সুরপুরললনার ললাটতিলকে অধর দান ক'রে মদামোদমধুর একটি মুহূর্তের বিহ্বলতা বরণ করে নেবার জন্য তোমার শান্ত বক্ষঃপঞ্জরের অন্তরালে কোন স্পৃহা উন্মুখ হয়ে ওঠে না?

শান্ত রত্নশৈলের মত সুন্দর ও অচঞ্চল সুমুখ বলে— না গুণকেশী, অমরতাহীন জীবনে এই ক্ষণচঞ্চল ও অতিনশ্বর কামনার উৎসব নিতান্ত এক বিদ্রূপ। সে বিদ্রূপ দেখতে সুন্দর হলেও তার জন্য আমার মনে কোন মোহ নেই।

নীরবে আর অবনতশিরে দাঁড়িয়ে থাকে গুণকেশী। পূর্ব আকাশের ললাটে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া দেখা দিয়েছে। মন্দারকুঞ্জের সৌরভ স্নিগ্ধ সমীরে আরও মদির হয়ে ওঠে।

নিজেরই মনের কল্পনার আবেশে অন্যমনা হয়ে দূরান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকে সুমুখ। মনে হয়, এতক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর প্রিয়সখা মাতলির প্রার্থনায় প্রীত হয়ে অমৃত দান করেছেন। নাগকুমার সুমুখের অমরত্বলাভের স্বপ্ন সত্য করাবর জন্য অমৃত নিয়ে আসছেন মাতলি। যেন

পদধ্বনি শোনা যায়, বুঝি আসছেন মাতলি। উৎকর্ণ হয়ে আর অপলক নেত্রে মন্দারকুঞ্জের পথরেখার দিকে তাকিয়ে থাকে সুমুখ।

সেই মুহূর্তে শঙ্কিত শিশুর মত করুণকণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে সুমুখ।

—রক্ষা কর।

কালানলের ঝটিকার মত যেন কা'র ক্রূরকরাল নিঃশ্বাস ছুটে এসে মন্দারকুঞ্জের নিকটে থেমেছে। লতাবাটিকার অভ্যন্তরে বাত্যাহত শীর্ণ বেতসপত্রের মত কেঁপে ওঠে সুমুখ। এসেছে, নাগবৈরী গরুড় তার ভয়ংকর প্রতিজ্ঞা চরিতার্থ করার জন্য এসেছে। অমরত্বপ্রয়াসী সুমুখের হৃৎপিণ্ডের সন্নিকটে মৃত্যুর নখর এসে পৌঁছে গিয়েছে।

গুণকেশী বলে —শান্ত হও নাগকুমার।

সুমুখ —শান্তি দাও মাতলিতনয়া।

গুণকেশী বলে—আমিই তো তোমার শান্তি।

সুমুখ —তুমি?

গুণকেশী—হ্যাঁ আমি।

সুমুখ— তুমি আমাকে মৃত্যু হতে রক্ষা করতে পারবে?

গুণকেশী বলে—আমি অমৃত নই চিকুরতনয়। আমি তোমার মৃত্যুপথে সহযাত্রিণী হতে পারি, আমি তোমার মৃত্যুর মুহূর্ত শুধু মধুর ক'রে দিতে পারি।

কালানলের ঝটিকার মত গরুড়ের নিঃশ্বাস যেন উদ্দাম আক্রোশে মন্দারকুঞ্জের পথের উপর দাঁড়িয়ে ছটফট করছে। গুণকেশীর মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করে সুমুখ—মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ মুহূর্ত মধুর ক'রে দিয়ে তুমি কোন্ আনন্দ লাভ করবে মাতলিতনয়া?

গুণকেশী—সেই মধুরতা অমর হয়ে থাকবে আমার জীবনে, আমার প্রাণের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

সুমুখ বলে —তুমি বিচিত্রহৃদয় এই জগতের এক অতি অদ্ভুত বিস্ময়।

গুণকেশী —আমি এই বিস্ময়ভরা জগতের এক অতি সাধারণ হৃদয়।

সুমুখ—তুমি সুন্দর।

গুণকেশী—তুমি যদি সুন্দর বল, তবেই আমি সুন্দর।

উদ্‌গত অশ্রুবাষ্প নিরোধ করতে চেষ্টা করে সুমুখ। ব্যথিতের আবেদনের মত বিহ্বল স্বরে বলে—আমার একটি অনুরোধ আছে মাতলিতনয়া।

গুণকেশী—আদেশ করুন চিকুরতনয়।

সুমুখ—গরুড়ের হিংসায় ছিন্নদেহ চিকুরতনয় যেন তার প্রাণের শেষ মুহূর্তে দেখতে পায়, সুরপুরনিবাসিনী গুণকেশীর নয়নে দুটি অশ্রুবিম্ব ফুটে উঠেছে।

চিকুরতনয়!

—বল সুন্দরহৃদয়া মাতলিতনয়া।

—অতিনশ্বর দু'টি অশ্রুকণিকার জন্য এই মোহ কেন চিকুরতনয়?

—বুঝতে পেরেছি, এই মৃত্যুর ছায়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বুঝতে পেরেছি গুণকেশী,অতিনশ্বর এই অশ্রুকণিকা অনন্ত হর্ষের চেয়েও কত বেশী মধুর। বুঝেছি মৃত্যুর মুহূর্তকে মধুর ক'রে দিতে পারে যে-বস্তু , তাই তো অমৃত।

অস্থির হয়ে উঠেছে সংহারব্যাকুল গরুড়ের ছায়া। লতাবটিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে আসছে অনলোদ্‌গারী দুটি চক্ষুর দৃষ্টি।

সুমুখের কণ্ঠে অসহায় আর্তস্বর ছলছল করে —অমরতার স্বপ্নে মুগ্ধ হয়ে ভুলে গিয়েছিলাম গুণকেশী, আজ গরুড়ের প্রতিজ্ঞার শেষ দিন। এই সন্ধ্যাই আমার জীবনের শেষ সন্ধ্যা।

আর্তস্বরে চিৎকার করে ওঠে গুণকেশী —কিন্তু তুমি মরণ বরণ করো না চিকুরতনয়।

মৃদু হাস্যে উত্তর দেয় সুমুখ—উপায় নেই গুণকেশী, বিষ্ণুর কৃপায় আশ্রিত ঐ ভয়ংকরের আঘাত হতে কেমন ক'রে আত্মরক্ষা করবে ভোগবতীর সলিলে লালিত নাগ?

—এ কেমন বিষ্ণু, আর এ কেমন তাঁর কৃপা? গুণকেশীর অন্তর মথিত ক'রে এক উদ্ধত বিদ্রোহ যেন কঠিন প্রশ্ন হয়ে জেগে ওঠে।

নিখিল সৃষ্টির রক্ষক ও পালয়িতা বিষ্ণুর কৃপা, সে কৃপায় লালিত হয় নিখিলের ক্রোড়ে আবির্ভূত সকল প্রাণ। অন্যমনার মত নিষ্পলক নেত্রে যেন ধ্যান সঞ্চারিত করে দাঁড়িয়ে থাকে আর চিন্তা করে গুণকেশী। তারপর, ধীরে ধীরে যেন এক নিগূঢ় সংকল্পের ছায়া গুণকেশীর ওষ্ঠাধর শিহরিত ক'রে কাঁপতে থাকে। তার ভাবনামগ্ন মূর্তি যেন অন্তরের গভীরে এক স্তবের ভাষা এবং শোণিতের কলরোলে এক প্রজায়িনী মহিমার সঙ্গীত উৎকর্ণ হয়ে শুনছে। —তোমার প্রাণপ্রিয় চিকুরতনয়ের প্রাণ হতে তোমার প্রাণের গভীরে নব প্রাণ আহ্বান কর মাতলিতনয়া। প্রাণের আবির্ভাব ধ্বংস করবে, বিষ্ণুর কৃপায় আশ্রিত কোন উদ্‌ভ্রান্ত ভয়ংকরের সে সাহস নেই, স্বয়ং বিষ্ণুরও সে অধিকার নেই।

হিংস্র গরুড়ের ছায়া একেবারে লতাবাটিকার দ্বারে এসে দাঁড়ায়। সেই মুহূর্তে উৎক্ষিপ্ত পারিজাতস্তবকের মত মাতলিতনয়া গুণকেশী তার যৌবনিত তনুশোভা অপাবৃত ক'রে সুমুখের বুকের উপর এসে লুটিয়ে পড়ে। —আমার স্বপ্ন সত্য ক'রে দিয়ে যাও প্রিয় নাগকুমার।

সুমুখ—নিজেকে এমন ক'রে শাস্তি দিও না কুমারী!

গুণকেশীর দুই চক্ষুর কোণে মুক্তাফলের মত দু'টি মধুর ও উজ্জ্বল অশ্রুবিম্ব ফুটে ওঠে।—প্রশ্ন করো না, বিস্মিত হয়ো না, কুণ্ঠিত হয়ো না গুণকেশীর প্রেমের পুরুষ চিকুরতনয়। গুণকেশীর পিপাসিত শোণিতে তোমার সন্তানের প্রাণ অঙ্কুরিত ক'রে দিয়ে যাও।

—গুণকেশী? মধুরসান্দ্র প্রণয়ার্দ্র স্বরে আহ্বান করে সুমুখ। সুমুখের মৃত্যুর মুহূর্তগুলিকে যেন মধুরতায় ডুবিয়ে দেবার জন্য সুমুখের বাহুবন্ধনে আত্মহারা হয়ে লুটিয়ে পড়ে এক অশ্রুবিধুর ও স্বপ্নমধুর পারিজাতের স্তবক।

নক্ষত্র জাগে আকাশে। নিশীথবায়ুর চুম্বনে তন্দ্রাভিভূত হয় মন্দারসৌরভ।

গরুড়ের নির্মম প্রতিজ্ঞায় উদ্বিগ্ন একটি মাসের শেষ দিনের মুহূর্তগুলি বিলীন হতে থাকে। এগিয়ে আসে রাত্রির শেষ যাম। সুমুখের বাহুবন্ধন বরণ ক'রে বিহ্বল হয়ে পড়ে থাকে কুমারী গুণকেশীর ফুল্ল যৌবনের উৎসর্গ।

উষাভাস জাগে আকাশপটে, জেগে ওঠে বিহগস্বর। সুমুখের বক্ষে নখরাঘাত করবার সুযোগ পেল না গরুড়। হতাশ হয়ে সরে যায় গরুড়ের ছায়া। মন্দারকুঞ্জের গন্ধমন্থর বাতাস দীর্ণ ক'রে বিফলমনোরথ গরুড়ের ধিক্কার ধ্বনিত হয়—ব্যভিচারিণী মাতলিতনয়া!

চলে যায় গরুড়। সুপ্তোত্থিত বিহগের কণ্ঠকাকলীর মত হেসে ওঠে গুণকেশীর কণ্ঠস্বর। সুমুখের বাহুবন্ধন হঠাৎ ছিন্ন ক'রে উঠে দাঁড়ায় গুণকেশী।

হাস্যস্বরে চমকে ওঠে সুমুখ, কিন্তু দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়, গুণকেশীর দুই চক্ষুর প্রান্তে সেই দু'টি অশ্রুবিম্ব ফুটে রয়েছে।—এ কি গুণকেশী?

গুণকেশী—তোমার প্রাণের বৈরী ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকেই ধিক্কার দিয়ে চলে গেল।

সুমুখ— সে নির্মম তোমাকে ধিক্কার দিয়ে গেল কেন?

গুণকেশী—আমিই যে বিফল ক'রে দিলাম সে নির্মমের প্রতিহিংসার সব আশা। তুমি নিরাপদ, তুমি মুক্ত।

—গুণকেশী! প্রাণদায়িনী গুণকেশী! বিস্ময়ের আবেগ সহ্য করতে না পেরে চিৎকার ক'রে ওঠে সুমুখ।

গুণকেশী বলে—সুরপুরবাসিনী এক প্রগল্‌ভার এক রাত্রির মূঢ়তাকে ঘৃণা ক'রে এইবার পাতাললোকে চলে যাও নাগকুমার।

দুই হাতে মুখ ঢেকে, যেন ঐ সুন্দর মুখেরই এক দুঃসহ বেদনাচ্ছবি আচ্ছাদিত ক'রে দ্রুতপদে চলে যায় গুণকেশী। আকুল আগ্রহে আহ্বান ক'রে সুমুখ —যেও না গুণকেশী।

ইন্দ্রসন্নিধান হতে ফিরে এসেছেন মাতলি। বিষণ্ণ হতাশ ও বেদনাভিভূত মাতলি। সুমুখের জন্য অমৃত দান করেননি দেবরাজ ইন্দ্র। শুধু অনুগ্রহ করে এইমাত্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, গরুড়ের কোপ হতে রক্ষা পাবে সুমুখ। দেবরাজসখা মাতলির কন্যা গুণকেশীর পাণিপ্রার্থীকে শুধু আয়ু দান করেছেন দেবরাজ।

হেসে ফেলে সুমুখ—আমাকে অমৃত দিতে পারলেন না, তবে আমাকে বিদায় দেবার জন্য এইবার প্রস্তুত হোন দেবারাজসখা মাতলি।

শূণ্যদৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন মাতলি। চলে যেতে চাইছে নাগকুমার সুমুখ। সুরপুরে এসে পারিজাতের চেয়েও সুন্দর মাতলিতনয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কোন মোহ জাগল না যার বক্ষে, কোন লোভ লাগল না যার চক্ষুতে, চলে যাচ্ছে সেই নিতান্তই এক অমৃতলোলুপ আকাঙক্ষার জীব,অকৃতজ্ঞতা ও অমমতার আশীবিষ।

আবার হেসে ফেলে সুমুখ —আমি একাকী ফিরে যাব না, বাসবসুহৃদ্ মাতলি।

হঠাৎ বিস্ময়ে অপ্রস্তুত হয়ে প্রশ্ন করেন মাতলি —কি বলছ সুমুখ?

সুমুখ—হ্যাঁ ইন্দ্রসারথি মাতলি, আপনাদের এই সুরপুরের সবই ছলশোভার পারিজাত, হৃদয়ের পারিজাত শুধু একটি আছে, আমার সঙ্গে তাকে চলে যাবার অনুমতি দিন।

—কে সে?

—আমার প্রাণদায়িনী সে। অমরপুরের অমৃত শুধু ছলনা করে ইন্দ্রসখা, কিন্তু মৃত্যুর মুহূর্তকেও মধুরতায় অমর ক'রে দিতে পারে তারই দুই চক্ষুর অতিনশ্বর দুটি অশ্রুবিন্দু।

—কা'র চক্ষুর অশ্রুবিন্দু?

—আপনার কন্যা গুণকেশীর।

ইন্দ্রসারথি মাতলির এতক্ষণের বিষণ্ণ বদন আনন্দে সুস্মিত হয়। অদূরের ভবনদ্বারদেশের পুষ্পমালঞ্চের একটি স্নিগ্ধচ্ছায় নিভৃতের দিকে তাকিয়ে প্রসন্নচিত্তে আহ্বান করেন মাতলি—কন্যা গুণকেশী।

গুণকেশী সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। মন্ত্র পাঠ ক'রে কন্যা গুণকেশীর পাণি সুমুখের হস্তে সমর্পণ করেন মাতলি।

আর অমরপুর নয়, অশ্রুহীন এই অনন্ত হর্ষের দেশ হতে ক্ষণায়ুব্যথিত ভোগবতী পুরীর পথে সানন্দে এগিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় সুমুখ। স্নিগ্ধস্বরে আহ্বান করে —এস প্রিয়া গুণকেশী।

গুণকেশীর ব্যথিত দুই নয়নের কোণে সেই মধুর অশ্রুবিন্দু আবার ফুটে ওঠে—বল, তোমার মনে কোন দুঃখ নেই।

সুমুখ —কিসের দুঃখ?

গুণকেশী—অমরপুরীতে এসেও অমৃত পেলে না।

সাগ্রহে গুণকেশীর হাত ধ'রে সুমুখ বলে— পেয়েছি গুণকেশী।

গুণকেশী—পেয়েছ? পিতা তবে এনেছেন অমৃত?

সুমুখ—তোমার পিতা আমাকে দিয়েছেন অমৃত।

গুণকেশী—কোথায় সেই অমৃত?

সুমুখ— এই তো আমার সম্মুখে।

গুণকেশী—কি?

সুমুখ—তুমি।

কিংবদন্তীর দেশে

সনকা ও মেনকা

বেশি দূরে নয়, সোমপুরের মহাবিহার। এই পথই সোজা চলে গিয়েছে সেই মহাবিহারের দিকে, যেখানে শত শত শ্রমণের জীবন বুদ্ধবাণীরই প্রদীপের মত আলোকিত করে রেখেছে শান্ত সংঘারামের নিভৃতকে, আর সম্যক শান্তির আনন্দ প্রতিমূর্ত ক'রে রেখেছেন এক জ্ঞানী মহাস্থবির : রত্নাকর-শান্তি।

এখানে শুধু সোমপুর মণ্ডলের অধিপতি পূর্ণপ্রভের প্রাসাদ আর সৈন্যভবন। ভারতের সকল প্রান্ত হতে আগত যাত্রিকেরা যায় এই পথে। কেউ জ্ঞানের, কেউ শান্তির এবং কেউ বা পুণ্যের অভিলাষী। সোমপুর মহাবিহারে এসে অন্তরের প্রার্থনা ধ্বনিত না করা পর্যন্ত যাত্রিকের আগ্রহ শান্ত হয় না। মাণ্ডলিক পূর্ণপ্রভের সৈনিক নির্বিঘ্ন ক'রে রেখেছে এই পথ। পথপ্রান্তের বিশ্রাম-বাটিকার প্রাঙ্গনে রত্নপেটিকা শিয়রের কাছে রেখে নিশ্চিন্ত মনে এবং অবাধ নিদ্রায় রাত্রিযাপন করতে পারে বণিক।

রাজপ্রাসাদের সম্মুখেই পথের অপর পার্শ্বে পাশাপাশি দুই উদ্যান, দুই উদ্যানেই দুটি দীর্ঘিকা এবং দুই দীর্ঘিকার কিনারায় রক্তপ্রস্তরে রচিত দুটি গৃহ। পুষ্পিত লতাজালে আচ্ছাদিত এই সুদৃশ্য দুই রক্তাভ গৃহকে দেখে মনে হয়, যেন দুই পক্ষিণীর দুই সুখপিঞ্জর।

কিন্তু সত্য সত্যই কোন দুই পক্ষিণী নয়; রূপের দুই নারী বাস করে এই দুই রক্তাভ প্রস্তর আর পুষ্পিত লতাজালের অন্তরালে। রাজনর্তকী সনকা আর মেনকা।

সনকা জানে, সেই শুভদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন নর্তকী জীবনের এই তুচ্ছ লতাজাল ছিন্ন ক'রে রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে গিয়ে সে ঠাঁই নিতে পারবে। তার প্রণয়ে মুগ্ধ হয়েছেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন। বৃদ্ধ মণ্ডলাধীশ পূর্ণপ্রভের মৃত্যুর পর মণ্ডলাধীশের পদে অভিষিক্ত হবার পরের দিনই পুণ্যরত্ন স্বয়ং এসে নর্তকী সনকার কণ্ঠে মাল্যদান ক'রে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবেন। পুণ্যরত্নের মহিষী হবে সনকা। এই বিশ্বাসেই বিহ্বল হয়ে আছে নর্তকী সনকার হৃদয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘিকার সোপানে বসে জলকমলের উপর পদভার সঁপে দিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে তাকিয়ে থাকে সনকা। দুঃসহ তৃষ্ণায় চঞ্চল হয়ে ওঠে তার দুই চোখের তারকা। আর কতদিন? বৃদ্ধ মণ্ডলাধীশ পূর্ণপ্রভের আয়ু যে ফুরিয়ে যেতে চায় না। আর কতকাল এইভাবে শুধু প্রতীক্ষায় দিনারাত্রির মুহূর্তগুলি সহ্য করবে সনকা? কবে সোমপুর মণ্ডলের অধিপতির আসনে উপবেশন করবেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন? সনকার রূপমুগ্ধ প্রণয়ী রাজকুমার পুণ্যরত্ন।

নর্তকী মেনকাও বিশ্বাস করে, সোমপুর মণ্ডলের ভবিষ্যতের অধিপতি পুণ্যরত্নের মহিষী হয়ে ঐ রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে গিয়ে দাঁড়াবার সৌভাগ্য তারই জীবনে দেখা দেবে একদিন। মেনকা জানে, রাজকুমার পুণ্যরত্ন, মুগ্ধ হয়েছে তারই রূপের মায়ায়। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন—সেদিন আমি নিজের হাতে তোমার কবরীর ঐ তুচ্ছ পুষ্পসজ্জা ছিঁড়ে দিয়ে পরিয়ে দেবো স্ফটিকের মালা!

রাজসভার সান্ধ্য প্রমোদের উৎসব হতে ক্লান্তপদে নিজ নিজ গৃহে ফিরবার সময় বৃদ্ধ রাজা পূর্ণপ্রভের প্রতি অভিবাদন জানাতে গিয়ে মনে মনে রাজার আয়ুকে ধিক্কার দেয় নর্তকী সনকা আর মেনকা। কিন্তু কল্পনাও করতে পারে না যে, রাজকুমার পুণ্যরত্ন তখন অন্তরালে দাঁড়িয়ে মিথ্যা স্বপ্নের ছলনায় প্রলুব্ধ দুই রূপের নারীকে দেখে হাসছেন। রাজকুমার পুণ্যরত্নের এক নিষ্ঠুর কৌতুকে মুগ্ধ হয়েছে আর লুব্ধ হয়ে উঠেছে দুই রূপের নাগিনী। প্রণয় নয়, প্রণয়ের অভিনয় করেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন। দুই নর্তকীর আকাঙ্ক্ষা আর উচ্চাভিলাষ পুণ্যরত্নের মিথ্যা কথার

বাঁশি শুনে নেচে ওঠে। দেখে কৌতুক অনুভর করেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন। কিন্তু সনকা আর মেনকা রাজকুমার পুণ্যরত্নের সেই কৌতুকোচ্ছল হাসিকে লুব্ধ মনের মোহে আর ভুলে এক প্রণয়ধন্য পুরুষের আনন্দিত হৃদয়ের হাসি বলেই মনে করে। সন্দেহ করে না, সন্দেহ করার কথা মনেও হয় না।

অপরাহ্ন বেলা, যখন গৃহনিভৃতে সুন্দর দেহের শোভা অবারিত ক'রে মুকুরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকে সনকা, তখন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ ক'রে সনকার অঙ্গে রঙ্গভরে গন্ধরেণু নিক্ষেপ করেন পুণ্যরত্ন। সুস্মিত হয়ে ওঠে নর্তকী সনকার সুন্দর চক্ষু।

অভিযোগ করে সনকা—এই প্রতীক্ষা যে আর সহ্য হয় না।

পুণ্যরত্ন—বল, কি প্রতিকার করতে পারি?

সনকা—পিতা পূর্ণপ্রভের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা না ক'রে তাঁরই অনুমতি নিয়ে কি আমাদের বিবাহ হ'তে পারে না?

পুণ্যরত্ন বলেন—না, পিতা কখনই অনুমতি দেবেন না।

চুপ ক'রে এবং বিষণ্ন মুখে তাকিয়ে থাকে সনকা।

পুণ্যরত্ন বলেন—একটি উপায় আছে।

সনকা —কি উপায়?

পুণ্যরত্ন —বৃদ্ধ পূর্ণপ্রভকে যদি গোপনে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা যায়, তবেই,...।

চমকে আর্তনাদ ক'রে ওঠে সনকা —এমন ভয়ানক উপায় কল্পনাও করবেন না রাজকুমার।

পুণ্যরত্ন বলেন—তাহলে কি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, আর বৎসরের পর বৎসর এইভাবে শুধু প্রতীক্ষার বেদনা সহ্য করবো?

সজল চক্ষে সনকা বলে—না, তাও যে দুঃসহ।

পুণ্যরত্ন—তবে আমার প্রস্তাবে সম্মত হও সনকা। বৃদ্ধ পুণ্যপ্রভ আমাদের মিলনের পথে কণ্টক হয়ে রয়েছে। সে কণ্টক অপসারিত করতে হবে। বল, সম্মত আছো?

আর্তনাদের সুরে সনকা বলে—আছি।

অকস্মাৎ হেসে ওঠেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন! মুগ্ধ এক নাগিনীকে কি ভয়ংকর এক লোভে লুব্ধ ক'রে তুলেছেন পুণ্যরত্ন! আশ্চর্য হয় নর্তকী সনকা, রাজকুমার পুণ্যরত্নের দুই চক্ষুতে কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে কেন? বুঝতে পারে না যে, নাগিনীর বিষাক্ত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আর একটু বিষ ঢেলে দিয়ে দেখছেন পুণ্যরত্ন, কেমন দেখায় সে নাগিনীর রূপ।

সনকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজকুমার পুণ্যরত্ন তেমনই কৌতুকের খেলায় মত্ত হয়ে নর্তকী মেনকার গৃহদ্বারে এসে দাঁড়ান।

অভিমানে আপ্লুত স্বরে প্রশ্ন করে মেনকা —সনকার সঙ্গে আপনার এই অন্তরঙ্গতার অর্থ কি রাজকুমার?

রূপের নাগিনীর দুই চক্ষু ব্যথিত হয়ে উঠেছে। দেখে কৌতুক অনুভব করেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন। সন্দেহ করেছে মেনকা, তারই প্রেমাস্পদ রাজকুমারকে কপট অনুরাগের জালে বন্দী করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সনকা। দেখছে মেনকা, প্রতি মধ্যাহ্নে উদ্যানের নিভৃতে বসে মালা গাঁথে সনকা। কার জন্য, কার কণ্ঠে সর্মপণের জন্য?

প্রশ্ন করে মেনকা—আমি সন্দেহ করি রাজকুমার, সনকা আপনারই প্রেম লাভের জন্য মাল্য রচনা করে প্রতিদিন, আর আপনি...।

পুণ্যরত্ন বলেন—আমি সনকার হাতের পুষ্পমালাকে ঘৃণা করি মেনকা, কিন্তু...।

মেনকা—বলুন।

পুণ্যরত্ন—কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, সনকা তোমাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা ক'রে তার প্রণয়পথ নিষ্কণ্টক ক'রে নিতে চায়।

চিৎকার ক'রে ওঠে মেনকা—এ সন্দেহে আপনি এখনো কেমন ক'রে সহ্য করছেন রাজকুমার?

পুণ্যরত্ন—বল, কি প্রতিকার করতে পারি?

মেনকা—দুরভিলাষিণী সনকাকে এই রাজ্য থেকে বিতাড়িত করুন।

পুণ্যরত্ন বলেন—তুমি যদি বল, তবে এই জগৎ থেকেই ঐ ঈর্ষারি সর্পীকে চিরকালের মত বিতাড়িত ক'রে দিই।

চমকে ওঠে মেনকা—বুঝলাম না রাজকুমার।

পুণ্যরত্ন— বিষপ্রয়োগে সনকাকে হত্যা করা ছাড়া সনকার অভিসন্ধি থেকে মুক্ত নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হবার আর কোন উপায় নেই মেনকা।

বেদনার্ত মুখে চুপ করে শুধু তাকিয়ে থাকে মেনকা।

পুণর‍্যত্ন বলেন—উত্তর দাও মেনকা।

মেনকা কম্পিত কণ্ঠে বলে —কি ভয়ংকর প্রস্তাব করেছেন রাজকুমার!

পুণ্যরত্ন—তবে আমাদের মিলনের আশা ছেড়ে দাও মেনকা। যে-কোন মুহূর্তে সনকার চক্রান্তের বিষে মৃত্যু বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকো।

মেনকা বলে— না, তা-ও সহ্য করতে পারবো না রাজকুমার। আপনি ব্যবস্থা করুন।

পুণ্যরত্ন — তাহলে আমার প্রস্তাব সমর্থন করছো?

মেনকা—কি প্রস্তাব?

পুণ্যরত্ন —আমি গোপনে বিষপ্রয়োগ ক'রে সনকার হিংসুক জীবন স্তব্ধ ক'রে দিতে চাই।

মেনকা বলে—তাই হোক।

অকস্মাৎ অট্টহাস্যে চঞ্চল হয়ে ওঠেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন। তাঁরই কৌতুকের ছলনায় ভয়ানক এক পাপ প্রস্তাবের বিষ গিলেছে নাগিনী। এই কৌতুককে একটু সন্দেহ করারও শক্তি নেই নাগিনীর।

দুই নাগিনীকে এইভাবেই মিথ্যা প্রণয়ে মুগ্ধ আর লুব্ধ ক'রে আনন্দ লাভ করেন রাজকুমার পুন্যরত্ন। শুধু আনন্দ নয়, গর্বও অনুভব করেন। তাঁর প্রণয় লাভের জন্য তাঁরই জীবনসঙ্গিনী হবার জন্য কি ভয়ানক ব্যাকুল হয়ে উঠেছে দুই রূপসী নারীর চিত্ত! ঘৃণ্যতম পাপের পথেও এগিয়ে যেতে দ্বিধা নেই, যদি সে পথে এগিয়ে গিয়ে রাজকুমার পুণ্যরত্নের প্রেম লাভ করা যায়। রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরের অধীশ্বরী হবার জন্য লুব্ধ হয়ে উঠেছে দুই রাজনর্তকী, দুই রূপের নাগিনী। হাস্য লাস্য ও ভ্রূভঙ্গীর দুই কুহকিনী এক মিথ্যার কুহকে অভিভূত হয়েছে। বহু বিলাসে অভ্যস্ত রাজকুমার পুণ্যরত্নের এই এক অভিনব বিলাস।

দিন যায় এবং নর্তকী সনকাই একদিনে বুঝতে পেরে বিস্মিত হয়, বিষপ্রয়োগের প্রস্তাব সত্যই কোন প্রস্তাব নয়, রাজকুমার পুণ্যরত্নের মনের এক বিচিত্র কৌতুকের বিলাস মাত্র।

প্রশ্ন করে মেনকা—তবে কেন বৃথা এমন ভয়ানক কথা বলেছিলেন রাজকুমার?

পুণ্যরত্ন বলেন—শুধু পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, আমার প্রেমের লোভে তুমি কত হীন হয়ে যেতে পারো।

যেন হঠাৎ অভাবিত ও অতি কঠোর এক আঘাতের বেদনায় স্তব্ধ হয়ে যায় সনকার চোখের হাসি আর মুখের ভাষা। তারপর বলে —আমার মনের হীনতা ক্ষমা করুন রাজকুমার। স্বীকার করি, আপনার প্রণয়ের লোভে মূঢ় হয়ে গিয়েছে আমার মন। ভালোমন্দ বিচার করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছি।

বাষ্পায়িত হয়ে ওঠে সনকার চক্ষু।

পুণ্যরত্ন বলেন—দুঃখ করো না সনকা। একটি নতুন প্রস্তাব অছে, শোনো।

সনকা—বলুন।

পুণ্যরত্ন—তুমি কি জানো যে, নর্তকী মেনকাও আমার প্রণয় কামনা করে।

সনকা—জানি না, সন্দেহ করি।

পুণ্যরত্ন—সন্দেহ নয়, সত্য কথা। কিন্তু আমি এখানো বুঝতে পারছি না, তোমাদের উভয়ের মধ্যে কার ভালোবাসা বেশি আন্তরিক।

সনকা—জেনে কি লাভ?

পুণ্যরত্ন—যার ভালোবাসা বেশি আন্তরিক, সে-ই হবে আমার জীবনসঙ্গিনী। আমি আমারও মনের দ্বন্দ্ব দূর ক'রে দিতে চাই সনকা।

সনকা—কি করতে হবে বলুন।

পুণ্যরত্ন —সেই প্রস্তাবই নিয়ে এসেছি। তুমি আর মেনকা, দু'জনেই দুটি পুষ্পমাল্য রচনা ক'রে কাল প্রভাতে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবে। যার রচিত পুষ্পমাল্য দেখতে বেশি সুন্দর হবে, তারই মাল্য আমি কণ্ঠে গ্রহণ করবো, আর সে-ই হবে আমার জীবনসঙ্গিনী।

প্রস্তাব শুনে চুপ ক'রে বসে রইল নর্তকী সনকা।

চলে গেলেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন।

নর্তকী মেনকাও শুনলো প্রণয়ের এই নতুন পরীক্ষার প্রস্তাব, এবং রাজকুমার পুণ্যরত্ন তাঁর এই নতুন কৌতুকের আনন্দ মনের মধ্যেই গোপন ক'রে রাজপ্রাসাদে চলে গেলেন।

সারারাত জেগে পুষ্পমাল্য রচনা করে নর্তকী সনকা ও নর্তকী মেনকা। কিন্তু কী আশ্চর্য, আজ এতদিন পরে যেন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে মনের সব লোভ আগ্রহ আর আকাঙ্ক্ষা। আনন্দ নেই এমন মাল্য রচনায়। মন দেখেও ভালোবাসা চিনতে পারে না যে, ফুলের মালার মধ্যে সে দেখবে ভালোবাসার পরিচয়?

সন্দেহ হয়, এই প্রস্তাব বোধ হয় রাজকুমার পুণ্যরত্নের আর এক কৌতুক। কে জানে, কাল প্রভাতে হয়তো পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে আর এক অপমানের সম্মুখে গিয়ে মাথা নত ক'রে দাঁড়াতে হবে।

প্রভাত হয়। পুষ্পমাল্য নিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে যেতেই পথের পাশে সরে দাঁড়ায় নর্তকী সনকা আর মেনকা। দেখতে পায়, প্রসন্ন প্রভাতের স্নিগ্ধতাকে যেন আরও স্নিগ্ধ ক'রে দিয়ে পথ হেঁটে চলেছেন এক সৌম্যমূর্তি জ্ঞানী, সঙ্গে কতিপয় শ্রমণ।

চলেছেন সোমপুর মহাবিহারের মহাস্থবির রত্নাকর-শান্তি। অপলক চক্ষে এবং বিস্ময়াপ্লুত অন্তরের সকল কৌতূহল শান্ত ক'রে দুই রাজনর্তকী দাঁড়িয়ে থাকে পথের এক পাশে। দেখতে থাকে, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন সেই সৌম্যমূর্তি। কী গভীর ও স্নিগ্ধ শান্তি উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে ঐ মুখমণ্ডলে!

পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে দুই নারী দাঁড়িয়ে আছে পথের পাশে। মহাস্থবির রত্নাকর-শান্তি নিকটে এসেই একবার থামলেন। দুই নারীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিনম্র ভঙ্গীতে হাত তুলে শান্তি প্রার্থনা করলেন এবং তার পরেই সোমপুব মহাবিহারের পথ ধ'রে এগিয়ে চললেন মহাস্থবির রত্নাকর-শান্তি।

পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে পথের উপর স্থির -পুত্তলিকার মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রাজনর্তকী সনকা ও মেনকা। যেন এক স্নিগ্ধ ও শান্তিময় জীবনের শোভাযাত্রা এই পথের ধূলিকে পবিত্র ক'রে দিয়ে চলে গেল। রৌদ্র প্রখর হয়, বাদ্যরবে মুখর হয়ে ওঠে রাজা পূর্ণপ্রভের সৈন্যভবন আর রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার। কিন্তু নর্তকী সনকা ও মেনকা তাকিয়ে থাকে দূরান্তরের পথরেখার দিকে।

ধীরে ধীরে যেন অবসন্নের মত সেই পথের ধূলির উপরেই উপবেশন করে সনকা ও মেনকা। ভুল হয়েছে, মস্ত ভুল হয়ে গেল জীবনে। ঐ সৌম্যমূর্তির পায়ের কাছে জীবনের সব

প্রশ্ন নিবেদন ক'রে দিয়ে আর শান্তিবাদ গ্রহণ ক'রে এই উদ্‌ভ্রান্ত আকাঙ্ক্ষার জীবন হতে চিরকালের মত দূরে চলে যাওয়াই যে ভালো ছিল। পথের ধূলির উপরেই পুষ্পমাল্য রেখে দিয়ে প্রণাম করে নর্তকী সনকা আর মেনকা। চোখের জলে সিক্ত হয় পথের ধূলি। যেন জীবনের অন্ধতা ঘুচে গেল এতদিনে। সব লোভ ভুল অপমান আর হীনতার স্পর্শ হতে মুক্তি লাভের পথ এতদিনে দেখতে পেয়েছে নর্তকী সনকা ও মেনকা।

মেনকার দিকে তাকিয়ে সনকা সহাস্যমুখে বলে—পথ দেখতে পেয়েছি আমি। বিদায় দাও ভগ্নী।

মেনকা উত্তর দেয়—আমিও যে পথ দেখতে পেয়েছি ভগ্নী। চল এক সঙ্গে যাই।

সোমপুর মহাবিহারের পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে নর্তকী সনকা আর মেনকা। পথের ধূলির উপর পড়ে প্রখর রোদে শুকিয়ে শীর্ণ হয় দুটি পুষ্পমাল্য, দুই রূপের নাগিনীর কামনাময় জীবনের পরিত্যক্ত দুটি নির্মোকের মত।

রাজকুমার পুণ্যরত্নর নির্দেশ অনুযায়ী দুই খঞ্জ ভিখারী সেই প্রভাতে এসে রাজপ্রাসাদের প্রবেশপথে বসেছিল। রাজপ্রাসাদের দ্বারে যেন কঠোর এক কৌতুক বসিয়ে রেখেছেন পুণ্যরত্ন। প্রহরীকে আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন পুণ্যরত্ন, দুই রাজনর্তকীর হাত থেকে পুষ্পমাল্য গ্রহণ করার জন্য যেন প্রণয়ীর ভঙ্গীতে কণ্ঠ অর্পণ ক'রে এই দুই খঞ্জ ভিখারী। রাজপ্রাসাদেরই এক বাতায়নপথের অন্তরালে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন পুণ্যরত্ন। দেখে আর হেসে হেসে তৃপ্ত হবে পুণ্যরত্নের অহংকার, ঐ কৌতুকের আঘাতে লাঞ্ছিত হয়ে দুই আকাঙ্ক্ষার নাগিনী পুষ্পমাল্য বুকে জড়িয়ে ধরে কেমন ক'রে ছুটে পালিয়ে যায়।

কিন্তু রাজপ্রাসাদের দুয়ারের কাছে গিয়ে পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে আর রাজকুমার পুণ্যরত্নের প্রণয়প্রার্থিনী হয়ে সেদিন আর দেখা দিলো না দুই প্রতিদ্বন্দ্বিনী নারীর মূর্তি। রাজপ্রাসাদের বাতায়নপথে দাঁড়িয়ে শুধু বৃথা প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন। মধ্যাহ্নের সূর্যও ক্রমে অস্তাচলের দিকে এগিয়ে চললো, কিন্তু মিথ্যা স্বপ্নের আহ্বানে মুগ্ধ দুই লোভবিহ্বলা নারীর বিব্রত মূর্তির দিকে তাকিয়ে কৌতুক অনুভব করবার সুযোগ পেলেন না পুণ্যরত্ন।

তবে, তবে কি পুষ্পমাল্য রচনা করতে ভুলে গিয়েছে সনকা আর মেনকা? তবে কি এখনো পুষ্পমাল্য রচনাই সমাপ্ত হয়নি? কৌতূহলী হয়ে এবং একটু বিস্মিত হয়েই রাজপ্রাসাদ হতে বের হলেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন।

কিন্তু বেশি দূর যেতে হয়নি। দেখলেন, পথের উপরেই তপ্তধূলির মধ্যে শুষ্ক ও শীর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে দুটি পুষ্পমাল্য। চমকে উঠলেন পুণ্যরত্ন। তবে কি দুই রূপের নাগিনী পরস্পরের দংশনে বিক্ষত হয়ে পথ থেকে ফিরে চলে গিয়েছে, আর প্রাণহীন হয়ে পড়ে রয়েছে ঐ দুই উদ্যানের লতাজালের অন্তরালে? কোথায় আছে সনকা আর মেনকা?

উদ্যানে ঘুরে ফিরে সন্ধান করলেন পুণ্যরত্ন। কিন্তু শ্মশানের মত স্তব্ধ হয়ে আছে উদ্যানের নিভৃত। রক্তপ্রস্তরের গৃহ নীরব। পুষ্পহীন লতাজাল ম্লান হয়ে গিয়েছে। মুকুরে কোন প্রতিবিম্ব হাসে না।

নূপুরের শিঞ্জন আর কঙ্কণের ধ্বনি যেন চিরকালের মত অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে এই দুই সুরভিত বাতাসের বক্ষ হতে।

সন্দেহ করেন পুণ্যরত্ন। এবং তারপরেই ছুটে এসে দাঁড়ান অদূরের এক ক্ষুদ্র চৈত্যগৃহের কাছে। বুঝতে পারেন, মিথ্যা নয় তাঁর অনুমান। চৈত্যগৃহের নিকটে পথের ধূলির উপরেই পড়ে রয়েছে ক্ষুদ্র দুটি রত্নাভরণের স্তূপ। রাজনর্তকী সনকা আর মেনকা পথের ধূলির উপর সব রত্নালংকার ফেলে রেখে চলে গিয়েছে। কিন্তু এমন ক'রে রিক্ত হয়ে কোথায় চলে গেল দুই লোভের নারী?

সন্ধান করতে করতে সোমপুর মহাবিহারের নিকটে এসে দাঁড়ালেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন। তখন সংঘারামের সন্ধ্যার দীপ জ্বলে উঠেছে। সংঘারামে প্রবেশ ক'রেই দেখতে পেলেন পুণ্যরত্ন, স্তূপপাদমূলে প্রদীপের আলোকে দাঁড়িয়ে ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করছে দুই ভিক্ষুণী।

হ্যাঁ, সনকা ও মেনকাই বটে। কিন্তু আরও নিকটে এগিয়ে গিয়ে সেই দুই নারীর ছায়ার কাছেও আর দাঁড়াবার সাহস হলো না পুণ্যরত্নের। নিঃশব্দে এবং ধীরে ধীরে ফিরে চলে এলেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন।

কে জানে, সেদিন রাজপ্রাসাদে ফিরে যাবার সময় রাজকুমার তাঁর নিজের মনের অহংকারের ভার সহ্য করতে পেরেছিলেন কি না। পুণ্যরত্নের সেই অহংকার আর মিথ্যার আর কৌতুকের নিষ্ঠুরতা মাটি হয়ে গিয়েছে এক হাজার বছর আগে।

সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ ধারণ ক'রে আজও রয়েছে রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর। পাহাড়পুরের নিকটেই আক্কেলপুর নামে একটি রেল স্টেশন হতে পাঁচ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে আছে একটি গ্রাম। সে গ্রামের নাম ক্ষেতলাল। পুণ্যরত্নের প্রাসাদ আজ এই ক্ষেতলাল গ্রামের মাটির সঙ্গে ধূলি হয়ে মিশে গিয়েছে। কিন্তু আজও আছে পাশাপাশি দুটি দীর্ঘিকা, মেঘের ছায়ায় কালো হয়ে ওঠে আর চাঁদের আলোকে সাদা হয়ে ওঠে যার জল। হাজার বছর আগের দুই রাজনর্তকীর নাম আজও জাগিয়ে রেখেছে পাশাপাশি দুই দীঘি, একটির নাম সনকা এবং অপরটির নাম মেনকা।

ক্যাকটাস

চেতনপুরার বিশপ হ্যাটো

চেতনপুরার যে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সুবর্ণরেখা নদীর একটা শাখাস্রোত, তার মানে একটা সরু চেহারার ঝর্ণা-নদী, বয়ে গিয়েছে, সে-জঙ্গলের উত্তরদিকের অর্ধেকটা পরগনাই তো বাবু কৃপাল সিংয়ের জমিদারি। আর দক্ষিণদিকের অর্ধেকটা হল ঠাকুরসাহেবদের জমিদারি। তসীলদার রামতনু আজ ছ'মাস হল এ জঙ্গলের যেখানে কাঠকাটা মুণ্ডাদের ছোট বস্তির কাছে একটা মেটেঘরের মধ্যে বসে খাজনা তসীলের হিসাব লিখছে সে-জায়গাটার নাম সিমারিয়া। সিমারিয়ার এই কাছারিতে আর যিনি এখন আছেন এবং আগেও ছিলেন, তিনি হলেন বাবু দানেশ সিং, এই কাছারির ভাণ্ডারী। আর যারা আছে, তারা হল কাছারির দুই বুড়ো সেপাই আর কানা চাকর জিতরাম। কী আশ্চর্য, সিমারিয়ার এই কাছারির ওই দুই বুড়ো সেপাইয়ের দুজনেরই থুতনিতে আর কপালে দুটো করে বড় বড় আঁচিল। আঁচিলের মোটা-মোটা চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। সিমারিয়ার সবাই বিশ্বাস করে, দুই বুড়ো সেপাইয়ের হাতের দুই বল্লম দেখে নয়, ঠাকুরসাহেবদের জমিদারির জঙ্গলে দশটা ডিহির সব প্রজা ওই দুই আঁচিলের চেহারার রকম দেখে ভয় পায় আর বকেয়া খাজনা ঝটপট শোধ করে দেয়।

ঝর্ণা-নদী ছুটলির দু'পাশে পাথরের খাঁজের মধ্যে টানা-টানা সিঁদুরের দাগের মতো লালচে রঙের দাগ দেখা যায়। ঠাকুরসাহেব একটি জরুরি চিঠি দিয়ে তসীলদার রামতনুকে সাবধান করে দিয়েছেন, খুব সাবধান রামতনু, চেতনপুরার পরগনাইত কৃপাল সিংয়ের কোনো ঠিকাদার যেন পাথর তুলতে গিয়ে ছুটলির কিনারের ওই লাল-রঙে-দাগা পাথরগুলিকেও নিয়ে সরে পড়তে না পারে। মনে রাখবে, এগুলো যেমন-তেমন পাথর নয়, পারদ-ভরা পাথর। কিন্তু ছুটলির ওপারে শিয়ালকাঁটা আর গুয়ো-গাঁদার ফুলে সারা শরীর ঢাকা দিয়ে বাংলো-চেহারার যে সাত-আটটা ছোট-ছোট পুরনো বাড়ির ধ্বংস দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলোও কি কোনো দামি ধাতুর চিহ্ন বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছে? ভাণ্ডারী দানেশ বাবু বলেন, হাঁ জী, হাঁ। এগুলি হল একশো বছর আগের ইংরেজ সাহেবদের যত সোনাকুঠির ঘরবাড়ির ভাঙাচোরা চিহ্ন। পরগনাইত বাবু কৃপাল সিং বিশ্বাস করেন, এইসব সোনাকুঠির ভাঙাচোরা দেহের কোথাও না-কোথাও সোনার তাল লুকিয়ে আছে। ইংরেজ মার্চেন্টরা হঠাৎ একদিন প্লেগের ভয়ে ভীরু হয়ে সোনা তোলবার সব কাজ ছেড়ে দিয়ে আর তড়বড় করে পালিয়ে গেল, কিন্তু কিছু সোনা কি তারা লুকিয়ে রেখে যায়নি? বর্ষাকালের সুবর্ণরেখার যে জলের ঢল অনেক বালু বয়ে নিয়ে এসে ছুটলির বুকে ছড়িয়ে দিত, সেই পাথুরে বালু থেকে অনেক সোনার বালু তোলা হত। সোনাকুঠির ইংরেজরা সেজন্য কয়েকশো মুণ্ডা ছেলেমেয়েকে সোনার বালু তোলবার কাজে লাগিয়েছিল। এপারের বস্তির কাঠকাটা মুণ্ডারা নাকি সেই সোনা-তোলা মজুর মুণ্ডাদের বংশধর। ভাণ্ডারী দানেশবাবু বলেন, চেতনপুরার কৃপাল সিংয়ের শখ যেমন বড়, স্বপ্নও তেমনই বড়। তিনি একদিন অনেক টাকার ডাক হেঁকে ছুটলি নদীর এদিকের শাল-সেগুনের বিরাট জঙ্গলটাকে কিনে নিয়েছিলেন, শাল-সেগুনের জন্য নয়, ওই ভাঙা-চোরা যত সোনাকুঠির জন্য।

ভাণ্ডারী দানেশবাবুর মুখের গল্প শুনতে-শুনতে যেমন চমকে ওঠে রামতনু, তেমনই মাঝে মাঝে হেসেও ফেলে। ভাণ্ডারী দানেশবাবু বলেন, বেচারা কৃপাল সিং অনেক লোক লাগিয়ে এই সব সোনাকুঠিকে অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করিয়েছিলেন। পূর্ণিমা-চাঁদের আলোতে ঝলমল এক সন্ধ্যায় তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন, প্রত্যেকটি সোনাকুঠির দেয়ালের ফাটলে সোনার চাপ ঝক্‌মক্ করছে। দিনের বেলা দেয়াল খুঁড়তে গিয়ে কৃপাল সিংহের সব লোক ভয় পেয়ে আর

শাবল-গাঁইতি ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। সোনা নয়, হায় হায়, সোনা নয়। দেয়ালের ফাটলে যত বুড়ো সাপের গায়ের আঁশ জ্বলছিল। তাই দেখে বাবু কৃপাল সিং...

হেসে ফেলে রামতনু, বাঃ এ যে একেবারে রূপকথার মতো চমৎকার আশ্চর্যের গল্প।

ভাণ্ডারী দানেশবাবু—কালের কী কৌতুক! ছুটলি নদীর ওপারে যেখানে একদিন বর্ষার জলের ঢল ছড়িয়ে পড়ে সুবর্ণরেখার বালুর সঙ্গে সোনার বালু ছড়িয়ে দিত, সেখানে এখন, বলুন তো সেখানে এখন কীসের রাজত্ব।

রামতনু—নেকড়ের?

—না।

রামতনু—শেয়ালের?

—না।

—তবে কি গঙ্গাফড়িংয়ের রাজত্ব?

দানেশবাবু—না মশাই, না। সেখানে এখন ছুঁচোর রাজত্ব।

রামতনু হেসে ফেলেন, আশ্চর্য হবারই কথা।

দানেশবাবু—একটি-দুটি নয়, বিশটি-পঞ্চাশটি ছুঁচোও নয়। আমাদের সবারই বিশ্বাস, অন্তত শ' তিনেক ছুঁচো ওখানে মাঠের এদিকে-ওদিকে চারদিকে বাস করে।

এইবার কথা বলতে গিয়ে ভাণ্ডারী দানেশবাবুও হেসে ফেলেন। আমাদের দুই বুড়ো বীর, দুই সেপাই একদিন সন্ধেবেলা ওই মাঠ ধরে আসবার সময় বাচ্চা ছেলের মতো কঁকিয়ে চিৎকার ছেড়েছিল, বাঁচাও বাঁচাও। বল্লম হাতে দুই সেপাই দৌড়ে এসে এই কাছারিবাড়ির দাওয়ার ওপর আছড়ে পড়েছিল, "কী ভয়ানক দৃশ্য হুজুর, হাজার-হাজার ছুছুন্দর ছুটোছুটি করছে।"

কিন্তু হাজার হাজার না হোক, শ' তিনেক ছুছুন্দর দিনের বেলায় কোথায় থাকে? দিনের বেলায় ছুঁচোদের কাউকে তো দেখতে পাওয়া যায় না। দানেশবাবু বলেন, "কী জানি মশাই! মনে হয়, ওরা ওপারের ওই মাঠের এদিকে-ওদিকে ওদের তৈরি যত সুড়ঙ্গের মধ্যে থাকে।"

কিন্তু, ওই মাঠেরই মধ্যে একটি বেশ পরিচ্ছন্ন চেহারার বাংলো-ধাঁচের যে মেটে-বাড়িতে রাত্রিবেলায় আলো জ্বলে, সে বাড়িটার কি ভয়ডর নেই? নিশাচর ছুঁচোর দলকে ছুটোছুটি করতে দেখে ওই বাড়িটার প্রাণ কি একটুও অস্বস্তি কিংবা অশান্তি বোধ করে না?

না, একটুও না। পরগনাইত বাবু কৃপাল সিংয়েরই এক কুটুম, নাম কুশল সিং, যিনি ওই পরিচ্ছন্ন বাড়িতে থাকেন, তিনি বলেন, "যত সব আজগুবি মিথ্যে কথা। হাজার-হাজার কিংবা শত-শত ছুঁচো এখানে রোজ রাতে ছুটোছুটি করে, এটা হল সিমারিয়ার ওই কাছারিবাড়ির ভাণ্ডারী দানেশবাবুর কল্পনা আর রটনা, যে লোকটা নিজের গরিবি দশার জন্য একটুও লজ্জিত নয়। দানেশবাবু নামে লোকটা বাবু কুশল সিংয়ের জীবনের ঠাটবাট দেখে হিংসে করে। তাঁকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবার মতলবে তাই সে তিনশো ছুঁচোর ছুটোছুটির গল্প তৈরি করেছে।"

রামতনুর কাছে ছুঁচো নামক প্রাণীর নিতান্ত নিরীহ জীবনের নানা কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলেন বাবু দানেশ সিং। —আমি কিন্তু সত্যি একদিন ভয় পেয়েছিলাম। ওঃ, ছুঁচোদের সে কী ফূর্তি আর সে কী নাচানাচি। সে-রাতে আমার হারানো গরুটাকে খুঁজতে গিয়ে ওখানে কুশল সিংয়ের বাড়ির সামনে ওই চাতালের ওপর একটু দাঁড়িয়েছিলাম। চাঁদের আলো ছিল। দেখতে পেলাম, শত-শত ছুঁচো মাঠের ওপর ঘুরে ফিরে কুয়াশায় ভেজা ঘাসের শিকড় খুঁড়ে বের করছে আর খাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে চাতালের ওপর এসে নাচানাচি করছে। চাতালের একধারে গন্ধরাজ লেবুর গাছ আর একটা কুয়ো। কুয়োর কাছে একটা সুড়ঙ্গের মুখ। হঠাৎ কোথা থেকে একটা বনবিড়াল ছুটে এল। এক মুহূর্তের মধ্যে সব ছুঁচো সেই সুড়ঙ্গের ভিতরে উধাও হয়ে গেল। আমিও ভয় পেয়ে একদৌড় দিয়ে...

রামতনু তাই বলুন, ছুঁচো দেখে নয়, বনবিড়াল দেখে আপনি ভয় পেয়েছিলেন।

দানেশ সিং—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তাই। ছুঁচো দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম আর বনবিড়াল দেখে ভয় পেয়েছিলাম। ...হ্যাঁ, ওই চাতালটার ইতিহাস জানেন?

রামতনু—না।

দনেশ সিং—ওটা সোনাকুটির সাহেবদের টেনিস খেলবার কোর্ট ছিল।

রামতনু হাসে।—ইতিহাসের এই শিক্ষাটাকেই কবিতা করে বলেছেন এক কবি ঃ

যেথা মন্ত্রিসাথ নরনাথ বসিতেন ধীর।
সেথা ফেরুপাল ফিরে ফিরে ফুকারে গভীর।।

দুই

কে এই কুশল সিং? তিনি চেতনপুরার নামকরা রহিস, পরগনাইত বাবু কৃপাল সিংয়ের কুটুম হন। তা হোন, কিন্তু এখানে কেন? এখানে থেকে কোন্ ইচ্ছার কোন্ কাজ করছেন ইনি? জঙ্গলের হাওয়া খেয়ে স্বাস্থ্য ভাল করছেন?

ভাণ্ডারী দানেশবাবু বলেন, "আমার তো তাই মনে হয়। একজন চাকর আছে, যার কাজ হল কুশলবাবুকে দুবেলা তেল মালিশ আর দলাই-মালাই করা। আর-একজন চাকর আছে, যার কাজ হল দু'বেলা রান্না করা ছাড়া কুশলবাবুর জন্য রাবড়ি তৈরি করা। কিন্তু কোন্ রোজগারের টাকায় কুশলবাবুর এই ঠাট-বাট নির্বাহ হয়?

ভাণ্ডীরীজী দানেশবাবু একদিন সকালে নদীর ওপারের মাঠ ধরে ভিন গাঁয়ে যাবার সময় কুশলবাবুকে দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়ান। দানেশবাবু কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার আগে কুশলবাবুই মুখ টিপে হাসেন আর জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি তো জাতে রাজপুত?"

দানেশবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কুশলবাবু—আমিও রাজপুত। কিন্তু...

দানেশবাবু—কিসের কিন্তু, বলুন?

কুশলবাবু—কিন্তু আমি একথা বলব না যে, আপনি একজন ছুঁচো। আমি বলব আপনার ভাগ্যটাই ছুঁচো। তা না হলে, আপনি জাতে রাজপুত হয়েও কুড়ি টাকা মাইনের ভাণ্ডারীগিরি করবেন কেন?

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বেড়ার কাছের একটা পেয়ারা গাছের দিকে চোখ তুলে হাঁক ছাড়েন কুশলবাবু, "কী রে ছুঁচোরা, পেয়ারা চুরি করতে এসেছিস?"

ঠিকই, পেয়ারা নেবার জন্যে দুটো মুণ্ডা ছেলে গাছের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। ধমকের হাঁক শুনেই পালিয়ে গেল।

এইবার দানেশবাবুকে আবার প্রশ্ন করেন কুশল সিং, "আপনাদের কাছারির তসীলদার ছোকরাকে আমি চিনি না। সে-লোকটাও একটা ছুঁচো কিনা আমি জানি না। আমি জানতে চাই, আপনাদের ঠাকুরসাহেবদের প্রজাগুলি তো নিতান্ত দরিদ্র অবস্থার যত ছুঁচো, খাজনা-টাজনা ঠিকমতো দেয় কি?"

দানেশবাবুর গলার স্বর সত্যিই যেন ভয় পেয়ে ছুঁচোর মতো কিচকিচ করে, "আপনি এখানে থেকে কী করেন?"

কুশল সিংয়ের দুই চোখ দপ করে জ্বলে ওঠে, "আমি কী করি, সেটা বুঝবার মতো মগজ এখানে কি কারও আছে? কোনো ছুঁচোর তো নেই জানি।"

এইবার ভীরু-নিরীহ চেহারায় মানুষটার, ভাণ্ডারী দানেশবাবুর দুই চোখের তারার ভিতর থেকে যেন একটা জ্বালার ফুলকি ঝরে পড়তে থাকে, "আচ্ছা চলি। আশা করছি, আবার একদিন দেখা হবে।"

চলে গেলেন ভাগুরীজী, দানেশবাবু। হোহো করে গলা ফাটিয়ে হেসে ওঠেন বাবু কুশল সিং। হেসে হেসে ডাক ছাড়েন, যেন তাঁর ভাষাটা আর হাসির শব্দটা বেশ ভাল করে শুকনো মুখ আর ভীরু ওই দানেশবাবুর কানে পৌঁছয়, "আজ খুব বেশি করে ঘি ঢেলে খিচুড়ি রাঁধবি রে রামবিলাস, যেন গন্ধটা সব ছুঁচোর নাকে যায়। কী সাহস, আমাকে সওয়াল করে।"

চাকর রামবিলাস বলে, "একটা ছুঁচোর কিন্তু খুব সাহস বেড়েছে, হুজুর।"

কুশল সিং—"অ্যাঁ কী ব্যাপার?"

"সন্ধ্যা হতেই একটা ছুঁচো রোজই ঘরের ভিতরে ঢুকে ছুটোছুটি করে আর কী ভয়ানক দুর্গন্ধ ছড়ায়।"

কুশল সিং—পিটিয়ে মেরে ফেল না কেন?

রামবিলাস—অনেক চেষ্টা করেছি, হুজুর। কিছুতেই মারতে পারছি না।

কুশল সিং—তুমি একটি নিষ্কর্মা ছুঁচো।

ব্যাপার দেখে একটা সন্দেহ বাবু কুশল সিংয়ের মনে বেশ ঘন হতে শুরু করেছে। তিনশো মিথ্যে ছুঁচোর গল্পটা শুধু নয়, এই সত্যিকারের দুর্গন্ধ-ছড়ানো ছুঁচোটাও নিশ্চয় একটা চক্রান্তের বস্তু। ওই ওরা, ছুটলির ওপারে সিমারিয়ার কাছারিবাড়ির ওই লোকগুলি ছুঁচোর ভয় দেখিয়ে তাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে। ওরাই এই দুর্গন্ধছড়ানো সত্যিকারের একটা ছুঁচোকে পাঠিয়েছে। হেসে-হেসে নিজের মনে বিড়বিড় করেন কুশল সিং—হায় হায়, বাঘকে দিয়ে নয়, ভালুককে দিয়ে নয়, একটা ছুঁচোকে দিয়ে কট্টর রাজপুত কুশল সিংকে ভয় পাইয়ে দেবার চেষ্টা! ওরা মূর্খ, ওরা আঁতুড় ঘরের শিশু।

কিন্তু কী ভয়ানক দুর্গন্ধ রে বাবা। ছুঁচোটা যদি এভাবে রোজই সন্ধ্যায় এখানে এসে ছুটোছুটি করে, তবে কুয়োর ধারের গাছে এত চমৎকার গন্ধরাজ লেবুও যে দুর্গন্ধরাজ লেবু হয়ে যাবে। দুই চাকরের দুটোই বোধহয় কুসংস্কারের ভূত, এদের মতে গণেশের ইঁদুর যা ছুঁচোও তা। পিটিয়ে মারলে দোষ হবে বলে ওরা মনে করে। বেশ তো ছুঁচোটাকে না হয় না-ই মারা হল, ছুঁচোর দুর্গন্ধটাকে মেরে ফেললেই তো হয়। ছেলে বেলায় কপচানো সেই ছড়াটাকে মনে পড়ে আর হেসে ফেলেন বাবু কুশল সিং—

দেখো দেখো বাহাদুর
    কেয়া মজেকা খেল।
ছুছুন্দরকা শির পর
    চামেলিকা তেল।।

চামেলি তেলের শিশিটাকে হাতে নিয়ে আলো-জ্বলা ঘরের ভিতরে বসে রইলেন কুশল সিং। আসুক ছুঁচো, আজ ছুঁচোত্বের গন্ধই তিনি বদলে দেবেন।

ভিতরে ঢুকেছে ছুঁচো। ছুটোছুটি করছে। দুর্গন্ধে বাতাস ভরে উঠেছে। ধীর-স্থির কুশল সিং মুখের দুরন্ত হাসিটাকে একেবারে ধীর-স্থির করে নিয়ে দেখতে থাকেন, ছুঁচোটা কখনো দেয়াল বেয়ে, কখনো বা ভোঁতা রকমের একটা লাফ দিয়ে দেয়ালের তাকের ওপর ওঠবার চেষ্টা করছে। কেন? দেয়ালের তাকে একটা ডালার মধ্যে মকাইয়ের কিছু দানা রাখা রয়েছে; ছুঁচো কি এই মকাইয়ের দানা খাবার লোভে এরকম আইঢাই করছে? না বেশিক্ষণ নয়। ছুঁচোটা বোধহয় একটু ক্লান্ত হয়েছে। খাটের পায়ার কাছে এসে থমকে রয়েছে। শিশিটা উপুড় করে ছুঁচোটার গায়ের ওপরে চামেলি তেল ঢেলে দিয়ে দুর্বার এক আহ্লাদের আবেগে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে কুশল সিং, "আরেঃ বাঃ, বাঃ, ছুছুন্দরকা শির পর চামেলিকা তেল।"

ছটফট করে ছুটে পালিয়ে গেল ছুঁচোটা, চামেলি তেল যেন বিষের জ্বালা নিয়ে ছুঁচোর গায়ে গড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, চামেলি তেলের স্পর্শে সুগন্ধিত ছুঁচোটা আর কোনো একটি সন্ধ্যাতেও কুশল সিংয়ের ঘরের ভিতর ঢোকেনি। ঘরের বাইরেও কোনো আনাচে-কানাচে ছুঁচোটাকে ঘুরতে-ফিরতে দেখা যায় না।

কুশলবাবু তাঁর এই মজেকা খেল-এর মহিমা দেখে যেমন পুলকিত তেমনই গর্বিত হয়ে চাকরদের সঙ্গে হাস্যালাপ করেন, "দেখলি তো, কী কায়দা করে ছুঁচোটাকে তাড়ালাম। এখন যদি ওটা ফিরেও আসে, তবু দুর্গন্ধের চোট সইতে হবে না।"

রামবিলাস বলে, "হ্যাঁ হুজুর, এই ভাল হল। গনেশজির ইঁদুরের মতো জীব ছুছুন্দরকেও মারতে নেই।

কুশল সিং—একটা কাজ করবি? ছুঁচোটার ওপর চামেলি তেলের এই খেলাটার খবর সিমারিয়ার কাছারিবাড়ির কাছে পৌঁছে দিতে পারবি? বুঝুক সিমারিয়ার ছুঁচোরা, বিশেষ করে ওই দানেশ ছুঁচো, কুশল সিংয়ের সঙ্গে বুদ্ধিতে এঁটে উঠবার জোর ওদের কারও নেই।

রামবিলাস—হ্যাঁ হুজুর। এখনই মজার খবরটা ওদের কানে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি।

তিন

রামতনু হেসে-হেসে জিজ্ঞেস করে, "কী খবর ভাণ্ডারীজী, লোকটার পরিচয় জানতে পেরেছেন কি?"

ভাণ্ডারী দানেশবাবুও হাসেন, কিন্তু সেই হাসির মধ্যেও যেন আগুনের ফুলকি হাসে। কথা বলতে গিয়ে দানেশবাবুর দুই ভুরু কুঁচকে ওঠে। "বিশেষ কিছু এখনও জানতে পারিনি। শুধু জেনেছি লোকটা জরির পাগড়ি মাথায় চড়িয়ে মাঝে মাঝে কোথায় যেন চলে যায়, আবার দু'একদিনের মধ্যেই ফিরে আসে। দেখা যাক...।

মুণ্ডা ছেলেরা এই কদিন হল ঘাস কাটতে ও কাঠ কুড়োতে গিয়ে মাঠের এখানে-ওখানে থমকে দাঁড়ায়, আর একটা করুণ দৃশ্য দেখতে থাকে। খবর শুনে ভাণ্ডারীও সে দৃশ্য একদিন দেখে এসেছেন।

সাত-আটটা ছুঁচো একসঙ্গে গুঁতো দিয়ে ঠেলে-ঠেলে ঠুকরে-ঠুকরে গায়ের মাংস কেটে দিয়ে একটা ছুঁচোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। বুঝতে অসুবিধে নেই, বিতাড়িত ছুঁচোটা হল চামেলি তেলের গন্ধলাগা সেই ছুঁচো, বাবু কুশল সিংয়ের মজেকা খেল যার জীবনের সর্বনাশ করেছে। চামেলি তেলের গন্ধ তো ছুঁচোর কাছে শত্রু-জীবের গায়ের উৎকট গন্ধ। বুঝতে পারেন ভাণ্ডারীজি, হতভাগ্য ছুঁচোটাকে যারা ঠুকরে-ঠুকরে ঠেলে নিয়ে চলেছে, তারা একই সুড়ঙ্গের মধ্যে আশ্রিত যতসব আপন জন। সুগন্ধিত ছুঁচোটা তার প্রতিবেশী আর ভাইবেরাদারদের কাছেই ধিক্কৃত, অবাঞ্ছিত ও সন্দেহভাজন একটা নতুন জীব।

পর-পর তিনটে দিন মাঠের ওপরে এই করুণ দৃশ্যটা ছুটোছুটি করে। তারপর একদিন দেখা গেল, চামেলি তেলের গন্ধলাগা ছুচোটা শিয়ালকাঁটার একটা ঝোপের কাছে মরে পড়ে রয়েছে।

আর ওদিকে বাবু কুশল সিংহের পরিচ্ছন্ন বাড়িটার বড় দরজার সামনে মিঠু মিয়াঁর রোশনচৌকির সানাই-নাকাড়া বাজছে। কী ব্যাপার? কোনো ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যাপার তো হতে পারে না, বাবু কুশল সিংহের ওই ঘরের আঙিনাতে তাঁর কোনো ছেলেমেয়েকে কোনদিনও দেখতে পাওয়া যায়নি, যদিও তিনি প্রায় দু'বছর হল এখানে আছেন। রামতনু একদিন একটা সন্দেহের কথা দানেশবাবুকে বলেছিল, "মনে হয় লোকটা পাওনাদারের ভয়ে এখানে এসে ঠাঁই নিয়েছে।"

দানেশবাবু দুই চোখ টান করে হেসেছিলেন, "আমার মনে হয় না।"

যাই হোক, সানাই বাজে কেন? কিসের হর্ষ? কিসের উৎসব? পরের দিন দেখতে পেয়ে আরও আশ্চর্য হয় রামতনু, রঙিন কাপড়ের শামিয়ানা টাঙিয়ে তার নীচে একটা আসর সাজানো হয়েছে।

কী ব্যাপার? দানেশবাবু বলেন, "এইবার বলতে পারি।"

"বলুন তবে।"

দানেশবাবু—ওই বাবু কুশল সিং রায়সাহেব খেতাব পেয়েছেন।

রামতনু—অ্যাঁ? এ আবার কীরকম ব্যাপার?

দানেশবাবু—এই ব্যাপারের দৃশ্য দেখাবার জন্যে নেমন্তন্ন করেছেন কুশল সিং, আপনাকে আর আমাকেও।

নেমন্তন্নের চিঠির লেখাগুলি যেন আষাঢ়ে গল্পের মতো একটা ঘটনার পরিচয়, বিশ্বাস করতে ইচ্ছেই করে না যে, বাবু কুশল সিং রায়সাহেব খেতাব পেয়েছেন। ওই শামিয়ানার নীচে রঙিন সাটিনের ঝালর দিয়ে ঘেরা আসরে বাবু কুশল সিংয়ের হাতে এস ডি ও উড সাহেব নিজের হাতে খেতাবের পত্র সঁপে দেবেন। আসছেন, সত্যিই কাল সকালবেলায় উড সাহেব এখানে উপস্থিত হবেন, সাবডিভিশন দিলদারনগরের এস ডি ও মিস্টার আর সি উড, রিচার্ড চ্যাপম্যান উড। আসল ব্যাপারটা এই যে, বাবু কুশল সিং রায়সাহেব খেতাবের পত্র পেয়েই গিয়েছেন। কিন্তু তিনি এস ডি ও সাহেবের হাত মারফত খেতাবের ওই পত্রটি হাতে নিয়ে ধন্য হবেন। থানার বড়বাবু কড়া মোচওয়ালা এক বাঙালি, অনুকূল দত্ত ইতিমধ্যে একবার এসে সংবর্ধনার সব ব্যবস্থার চেহারা দেখে গিয়েছেন।

চার

একশো বছর আগেকার সোনাকুঠির সাহেবদের সেই টেনিস কোর্ট, যেটা আজ নিতান্ত করুণ চেহারার একটা চাতাল, তারই ওপর রঙিন সামিয়ানা দাঁড়িয়ে আছে। গন্ধরাজ লেবুর গাছ আর সেই সুড়ঙ্গের মুখটার কত কাছে দাঁড়িয়ে আছে রঙিন সামিয়ানার প্রথম খুঁটি। সেই খুঁটির কাছে মখমলের একটা গালিচা পাতা হয়েছে। এই গালিচার উপর দাঁড়িয়ে কুশল সিং আজ এস-ডি-ও সাহেবের হাত থেকে রায়সাহেব খেতাবের পত্র গ্রহণ করবেন।

নিমন্ত্রিতেরা সবাই এসে সংবর্ধনার আসরে বসেছেন। কিন্তু একটা আশ্চর্যের ব্যাপার, তসীলদার রামতনু আর ভাণ্ডারী দানেশ সিং যেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হয়েছেন, সেখানে চেতনপুরার পরগনাইত বাবু কৃপাল সিং উপস্থিত নেই কেন? কুশল সিং এই দু' বছর ধরে যে পরিচ্ছন্ন বাড়িতে ঠাঁই নিয়ে রয়েছেন, সেটা তো চেতনপুরার পরগনাইত কৃপাল সিংয়েরই সম্পত্তি। তা ছাড়া সেই কৃপাল সিংয়েরই তো দূরসম্পর্কের কুটুম হলেন এই কুশল সিং।

এস ডি ও উড সাহেবের চেহারার মধ্যে তেমন কোনো ভারিক্কি ভাব নেই বটে, কিন্তু চোখের ভঙ্গিটা বেশ তীক্ষ্ণ। বাবু কুশল সিং কি মোটা টাকার তোড়া তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে এখানে আসতে রাজি করিয়েছেন? আসরের একঠাঁই পাশাপাশি বসে আর একটু চাপা স্বরে রামতনু ও ভাণ্ডারী দানেশবাবু এই কথা বলাবলি করেন। দানেশবাবু বলেন, "এটা বুঝতে অসুবিধার কী আছে? এ তো জানা কথা।"

রামতনু—কিন্তু এত টাকা এই কুশল সিং কোথা থেকে পাবেন? আপনিই তো বলেছেন, কুশল সিংয়ের কোনো কাজ কারবার নেই।

দানেশবাবু হাসেন, "সেই তো কথা। দেখা যাক।"

জরির পাগড়ি পরেছেন বাবু কুশল সিং। আচকান আর পায়জামাকে চামেলি আতরে যেন চুবিয়ে দিয়েছেন, সুগন্ধে বাতাস ভুরভুর করছে। আসরের ভিতরে এসে বসবার আগেই দূরে দাঁড়িয়ে বারবার মাথা ঝুঁকিয়ে আর কপালে হাত ছুঁইয়ে এস ডি ও উডসাহেবকে অভিবাদন জানাতে থাকেন বাবু কুশল সিং। প্রীত প্রফুল্ল মিস্টার উড বারবার ডাকেন, "আসুন, আসুন, বাবু কুশল সিং।"

মখমলের গালিচার ওপর এসে দাঁড়ালেন বাবু কুশল সিং। আরও কয়েকবার মাথা-ঝোঁকানো অভিবাদন জানিয়ে তারপর মিস্টার উডের হাত থেকে রায়সাহেব খেতাবের পত্রটি নেবার জন্য এগিয়ে যেতে গিয়ে যেই হাত বাড়িয়েছেন আর পা চালিয়েছেন বাবু কুশল সিং, সেই মুহূর্তে তিনি দুই চোখ বড় বড় করে আর্তস্বরে একটা চিৎকার ছাড়লেন। সারা আসরে

একটা ভয়াতুর বিস্ময়ের সোরগোল উঠল। এস ডি ও উড সাহেবের দুই চোখের তারা যেন এই বিস্ময়ের চমক সহ্য করতে না-পেরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

এই দৃশ্যটা অন্য সময় দেখতে পাওয়া গেলে বেশ একটা কৌতুকের হাসি সবার চোখে-মুখে চমকে উঠত নিশ্চয়। কিন্তু কে জানে কেন, এখানে এই আসরের মানুষগুলি বেশ গম্ভীর হয়ে দেখতে থাকে, ছুঁচোদের মস্ত বড় একটা দল সারি বেঁধে তর তর করে আসছে আর বাবু কুশল সিংকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরছে। পিছনের ছুঁচো তার সামনের ছুঁচোর লেজের ডগা কামড়ে ধরে রয়েছে, এটা নাকি ছুঁচোদের পথযাত্রার একটি শৃঙ্খলার নিয়ম।

শুধু গম্ভীর নন একটি মানুষ ওই ভাণ্ডারীজী, যিনি দু'চোখে মিটিমিটি হাসি নিয়ে রামতনুর কানের কাছে কথা বলেন, "ওটা সার্কাস নয়, ম্যাজিকও নয় রামতনুবাবু। আপনি দেখেননি, আমি অনেকবার দেখেছি, ছুঁচোরা যখন অনেক দিনের চেনা জায়গা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যায়, তখন এইরকম ভঙ্গিতে সারি বেঁধে ওরা চলে যায়। ওটা যেন পিছনের কোনো অভিশাপকে ধিক্কার দিয়ে চলে যাবার ভঙ্গি!"

কিন্তু ছুঁচোরা তো চলে যাচ্ছে না। বাবু কুশল সিংকে চার-দিক থেকে ঘিরে ধরে একই বৃত্তে ঘুরছে। আর বাবু কুশল সিংয়ের সারা শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে, চোখ দুটো আতঙ্কের আঘাত পেয়ে ঠিকরে বেরিয়ে যেতে চাইছে। বুকের দু'পাশের পাঁজর ধক ধক করে হাপরের মতো উঠছে আর নামছে।

বাবু কুশল সিংয়ের ভয় দেখে মিস্টার উডের দুই চোখের দৃষ্টি তীব্র হয়ে ওঠে। কী যেন সন্দেহ করেছেন মিস্টার উড। রামতনুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন উড সাহেব, "আপনি কি ইংরেজি বই-টই পড়েছেন?"

রামতনু—পড়েছি।

মিস্টার উড—আপনি কি কোনো হাই স্কুলের কিংবা কলেজের ছাত্র ছিলেন?

রামতনু— হ্যাঁ, ছিলাম।

উড সাহেব—তবে কবি রবার্ট সাউদির 'বিশপ হ্যাটোর' কবিতা নিশ্চয় পড়েছেন।

রামতনু—হ্যাঁ।

উড সাহেবের চোয়াল দুটো রাগ চাপতে গিয়ে কাঁপতে থাকে। "মনে হয় এই লোকটা সেই বিশপ হ্যাটোর মতো কোনো পাপকর্ম করেছে। তাই প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ইঁদুরের দল বিশপ হ্যাটোকে যেমন কুরে-কুরে খেয়েছিল, এই ছুঁচোরাও কি সেইরকম আক্রোশে এই লোকটাকে কুরে কুরে মেরে ফেলতে চাইছে? এরকম সন্দেহ করবার কি কোন কারণ আছে?"

রামতনু—আমি জানি না।

এইবার কথা বলবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন ভাণ্ডরী দানেশবাবু। মুখে সেই মিটিমিটি হাসি আর নেই। দুই চোখের দৃষ্টিতে আগুনের ফুলকি। "আমি জানি, আমি জানি।"

মিস্টার উড—বলুন, কী জানেন আপনি।

ভাণ্ডারীজী—রায়সাহেব খেতাব যদি দিতে হয়, তবে চেতনপুরার পরগনাইত বাবু কৃপাল সিংকে দেওয়া উচিত।

মিস্টার উড—কেন?

ভাণ্ডারীজী—এই প্রবঞ্চক হল বাবু কৃপাল সিংয়ের অনুগ্রহে লালিত-পালিত একটি কুটুম্ব। এই লোকটাই একদিকে কৃপাল সিংকে রায়সাহেব খেতাব পাইয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা শুনিয়ে দিয়ে, অন্যদিকে তাঁর সুনামগিরির সব কাজ ওর নিজের কাজ বলে আপনার কাছে রিপোর্ট করেছে। এই লোকটাই বাবু কৃপাল সিংয়ের যত ভাল কাজের সুনামকে নিজের নামে...

মিস্টার উড—অ্যাঁ? কমিশনার মিস্টার টেম্পলের বাঘ শিকারের সব ব্যবস্থা করেছেন আর খরচ দিয়েছেন কে?

ভাণ্ডারীজী—চেতনপুরার বাবু কৃপাল সিং।

মিস্টার উড—ফ্ল্যান্ডার্স ফান্ডে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছে কে?

ভাণ্ডারীজী—বাবু কৃপাল সিং।

মিস্টার উড—বড়দিনের সময় ডেপুটি কমিশনার মিস্টার ডানকানকে একজোড়া হরিণবাচ্চা, একঝুড়ি কাশ্মীরি আপেল, একজোড়া টার্কি আর একটা-একটা লেগহর্ন, রোড আইল্যান্ড ও মিনরকা কে পাঠিয়েছিল?

ভাণ্ডারীজী— বাবু কৃপাল সিং।

মিস্টার উড— কলেক্টর মিস্টার জ্যাকবের স্ত্রী সিলভিয়া জ্যাকবের সম্মানে সিলভিয়া গার্লস মাইনর স্কুল স্থাপন করতে আট হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে কে?

ভাণ্ডারীজী—বাবু কৃপাল সিং।

মিস্টার উড—আমার জন্মদিনে আমাকে দেড় হাজার টাকা দামের একটা পিয়ানো উপহার দিয়েছে কে?

ভাণ্ডারীজী—বাবু কৃপাল সিং।

অপলক দু' চোখের দৃষ্টি দিয়ে বাবু কুশল সিংয়ের জরির পাগড়ি-পরা মাথাটা আব মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকেন মিস্টার উড। কুশল সিং তখনো ঠক ঠক করে কাঁপছে। কোনো আপত্তি করে না, অভিযোগের কোনো প্রতিবাদ করে না, কুশল সিং। ছুঁচোদের চক্রটা যেন তাঁর আত্মাটাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলবার একটা অভিশাপের বলয়।

কুশল সিংয়ের রায়সাহেব খেতাবের পত্রটা ফরফর করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন মিস্টার উড, "আমি সব কথা গভর্নমেন্টকে জানিয়ে দিয়ে এই হীন লোকটার খেতাব বাতিল করিয়ে দেব। বিশপ হ্যাটোর মতো ক্ষুধার্ত মানুষদের পুড়িয়ে না মারলেও এই লোকটা কম পাপী নয়। জঘন্য ঠগ বিশ্বাসঘাতক।

ভাণ্ডারীজী—কিন্তু...।

মিস্টার উড—গভর্নমেন্টের কাছে চেতনপুরার বাবু কৃপাল সিংয়ের নাম সুপারিশ করব, যেন রায়সাহেব খেতাবটা তাঁকেই দেওয়া হয়। আর...ইউ রেচেড ফেলো, ইউ বিশপ হ্যাটো, তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি পেতেই হবে। তোমাকে এখনই থানার হাজতে পাঠাব।

থানার বড়বাবু অনুকূল দত্ত এগিয়ে এসে মিস্টার উডকে সালুট দেয়। "অর্ডার করুন স্যার।"

মিস্টার উড—উসকো বাঁধো আউর লে চলো।

সেই মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লেন ধূর্ত-প্রবঞ্চক কুশল সিং। কী আশ্চর্য, সবাই দেখতে থাকে, ছুঁচোদের সেই বৃত্ত আবার সরল রেখায় সার বেঁধে চলে যাচ্ছে। কোথায় চলে যাচ্ছে ওরা? না, দুরান্তের কোনো দিকে নয়, এই বাড়িরই উঠানের কুয়োর কাছে যেখানে গন্ধরাজ লেবুর গাছ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, সেইখানে একটা সুড়ঙ্গের মুখের দিকে ওরা এগিয়ে যেতে থাকে।

আসর ভেঙে যাবার পর, আসরের কাছে কিংবা ভিতরে যখন আর কেউ নেই, তখন রামতনু তার আসল বিস্ময়ের কথাটা বলে ফেলে, "কিন্তু ভাণ্ডারীজী, আমি তো বিশপ হ্যাটো কবিতা পড়লেও কিছু বুঝতে পারছি না।"

ভাণ্ডারীজী—কেন বুঝতে পারছেন না? পাপীকে শাস্তি পেতে হয়, এটা তো দুর্বোধ বিস্ময়ের কোনো ব্যাপার নয়।

রামতনু—না, তা নয়। কিন্তু ছুঁচোর দল কেমন করে সব বুঝতে পেরে, ঠিক সময়মতো এসে পাপীকে আটক করে ধরল, ঠিক বুঝতে পারছি না।

ভাণ্ডারীজী—কুশল সিংয়ের পোশাকের চামেলি আতরের গন্ধ পেয়ে সুড়ঙ্গের ছুঁচোরা সেই মুহূর্তে বুঝে ফেলেছে, ভয়ানক অবাঞ্ছিত একটা শত্রুজীব আবার এসেছে।

রামতনু—তাই কি?

ভাণ্ডারীজী—তাছাড়া আর কী?

শ্রীমতী নিনা ভরদ্বাজ ও হরিণী

কবিরা কল্পনা করেছেন, কস্তুরী মৃগ আপন গন্ধে আকুল হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। এখানে এসে দেখতে পেয়েছে রামতনু, চিতল হরিণ আর হরিণীরা শালফুলের গন্ধে আকুল হয়ে বনে-বনে ছুটে বেড়ায়। এই মৌজার নাম ছতরপুরা, তাই জঙ্গলটাকেও ছতরপুরার জঙ্গল বলা হয়। এটা ঠাকুরসাহেবদের জমিদারী। গত বছরও এখানে প্রায় মাস তিনেক থেকে মৌজার খাজনা তসীল করেছিল রামতনু। প্রজাদের মধ্যে বেশীর ভাগই আদিবাসী, বাকি সব কৈরী আর কুর্মি। দেখে আশ্চর্য হয়েছিল রামতনু, কোন প্রজা নগদ টাকায় বকেয়া খাজনা শোধ করে দিতে পারল না। টাকার বদলে তারা মুর্গী দিয়ে আর ছাগল দিয়ে খাজনা শোধ করে দিয়েছিল। যার কাছে দু' টাকা দু' আনা বাকি, সে প্রজাও তিনটে ছাগল এনে তসীলদার রামতনুর হাতের কাছে ঠেলে দিয়ে বলেছিল, হেই, লে যা বাবু।

তসীল কাছারিতে জমা করা সেই মুর্গী ও ছাগলের বিপুল সম্ভার নিয়ে রামতনুর বিশেষ কোন দুর্ভাবনায় পড়তে হয়নি। কারণ দুই জবরদস্ত ব্যক্তির দুইজন চাকর এসে নগদ টাকা দিয়ে সব মুর্গী ছাগল কিনে নিয়ে গিয়েছিল। ফৌজদারী দাঙ্গার কাজে ওই দুই জবরদস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর দুই লাঠিয়াল দলকে পেট ভরে মাংস আর মদ খাওয়াবার দরকার হয়েছিল। যতদূর সাধ্যি হিসেব করে খুব গরীব অবস্থার কয়েক শো প্রজাকে কিছু টাকা রিলিফ হিসাবে দিয়ে ফেলেছিল রামতনু। খবর পেয়ে এস্টেটের ম্যানেজার বেশ একটু অখুশি হয়ে চিঠি দিয়েছিল, দয়া ধরমকা মূল হ্যায়, নরক মূল অভিমান ঠিক কথা। ধর্মের মূল হল দয়া, আর নরকের মূল হল অহংকার—কিন্তু আপনাকে ওখানে দয়া আর খয়রাতি করবার জন্য আমরা পাঠাইনি। পাঠিয়েছি বকেয়া খাজনা পাই-পাই উসুল করতে।

এক বছর আগে সেদিন যে দুই জবরদস্ত মানুষ সব মুর্গী-ছাগল কিনে নিয়েছিল, তসীলদার রামতনু তাদের আজ আবার দেখতে পেয়েছে। দেখে আশ্চর্য হয়েছে ঃ এ কি? এই দুজনই কি সেদিনের, এক বছর আগের সেই দুজন? সেই জগদীশ আর দিবানাথ? জগদীশের চওড়া বুকটা চুপ্‌সে এতটুকু হয়ে গিয়েছে। আর, দিবানাথের গায়ের দুধে আলতা রং পুড়ে কাল্‌চে হয়ে গিয়েছে।

সত্যিই তো, একটা নিতান্ত অভাবিত ও অকল্পিত ঘটনার দৃশ্য। এক বছর আগে কোন মুহূর্তেও রামতনু ভাবতে পারেনি যে একই জায়গাতে একই সতরঞ্চির ওপর পাশাপাশি বসে, ঠিক একই রকমের চেহারার দুটি শালু-বাঁধানো খাতার ওপর প্রায় একই ভঙ্গীতে কলম চালিয়ে হিসেব লিখবে জগদীশ আর দিবানাথ। দানেশগঞ্জের সবচেয়ে বড় গোলাদার মহাজন ত্রিভুবন চৌধুরীর দুই অভ্রখনির আয়-ব্যয়ের হিসাব লেখবার চাকরি করছে জগদীশ আর দিবানাথ। বয়সে রামতনুর চেয়ে ওরা বড় হলেও খুব বেশী বড় নয়। ছোকরা তসীলদার রামতনুর বয়স এই বছরের মাঘ মাসে তেইশ পার হয়ে চব্বিশে পড়েছে। তবু ছতরপুরার তসীল কাছারির শুকদেববাবু ডাকেন, এ রামতনু, এ খোকাবাবু, আপনি কিন্তু ওই সাংঘাতিক দুই মানুষের সঙ্গে কখনও মেশামিশি করবেন না।

সে তো এক বছর আগেকার কথা। যখন ওরা সাংঘাতিক ছিল। আজ সেই দুটি মানুষকে দেখে একটুও সাংঘাতিক বলে তো মনে হয় না। এক বছর আগে অবশ্য মনে হয়েছিল যে, জগদীশ ও দিবানাথ, দানেশগঞ্জের দুই বড়লোকের দুই ছেলে যেন ভূতে-পাওয়া দুটি উন্মাদ। একদিন হঠাৎ কোথা থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে ছতরপুরার তসীল কাছারির সামনে এসে থেমেছিল জগদীশ। সঙ্গে একটা ভয়ানক রকমের জনবল। পঞ্চাশজন মানঝিকে মদ খাইয়ে মাতাল করে দিয়েছে জগদীশ। মান্‌ঝিদের হাতের টাঙি ফল্‌সা আর তীরধনুকও যেন মাতাল হয়ে টলছে

ঢলছে আর কাঁপছে। চেঁচিয়ে ডাক দেয় জগদীশ, আমাকে এখুনি গোটা দশেক ভাল লাঠিয়াল যোগাড় করে দিতে পারেন তসীলদারজী?

দেরী করে না জগদীশ, রামতনুর জবারের অপেক্ষায় না থেকে ছুটতে থাকে আগে আগে ঘোড়সওয়ার জগদীশ, পিছনে মারকুটে জনবল! দিবানাথের একটা সম্পত্তি, চুপরাতু নামে জঙ্গলটার ভিতরে একটা অভ্রখনিকে দাঙ্গা করে আজ দখল করবে জগদীশ।

সাতদিন পর ঠিক এই রকমই একটি দৃশ্য। দানেশগঞ্জ থেকে একদল গোয়ালা লাঠিয়াল, আর একদল রাজপুত জাতের লাঠিয়াল সঙ্গে নিয়ে ছুটে এসেছিল দিবানাথ। চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছিল, এ ভাই তসীলদার, কিছু লোক দিতে পারবেন? ফাটাফাটি করতে পারবে, এ রকম বিশ-ত্রিশজন মজবুত লাঠিবাজ?

রামতনু—কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

দিবানাথ—যাচ্ছি চান্দুয়া।

রামতনু—কেন?

দিবানাথ—জগদীশের সম্পত্তি ওই চান্দুয়া জঙ্গলটাকে আমি আজ আগুন লাগিয়ে পোড়াব। আর চান্দুয়া খাদের সব অভ্রও লুটে নেবো। কী ভেবেছে মোক্তারের বাচ্চা জগদীশ। উকীলের ছেলে দিবানাথ বুঝি ফৌজদারী করতে জানে না? শুনে রাখুন রামতনুবাবু, আমি ওকে কোনদিনও ক্ষমা করতে পারব না। আমার গায়ে যতদিন এক ফোঁটাও রক্ত থাকবে, ততদিন আমি ওর সর্বনাশ করতেই থাকব।

জগদীশের সম্পত্তি চুপরাতুর জঙ্গল আর খাদ যেমন দিবানাথের দলবলের হামলায়, দিবানাথের সম্পত্তি ওই চান্দুয়ার জঙ্গল আর খাদও তেমনই জগদীশের দলবলের হামলায় তছনছ হতে হতে তিন মাসের মধ্যে নিদারুণ রকমের একটা হতশ্রী অস্তিত্ব হয়ে পড়ে রইল।

ছতরপুরার জঙ্গলের শাল আজ ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছে, কিন্তু সত্যিই যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আজকের চান্দুয়া জঙ্গল ও চুপরাতু জঙ্গলের কোন শালে ফুল ফোটেনি।

শুকদেববাবু বলেন, শুধু দুটো শাল জঙ্গলকে নয়; ওরা নিজেদের দুটো জীবনকেও একেবারে নিষ্ফুল করে দিয়েছে।

জগদীশ আর দিবানাথের মধ্যে কে একটু বেশি এবং কে একটু কম এমনতর তুলনা বোধহয় সম্ভব নয়। আজ তো কোন তুলনাই চলে না, দুজনে যেন একই কঠোর অদৃষ্টের একটা পাথরের ওপর আছড়ে পড়েছে ও একাকার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেদিন, এক বছর আগেও কি ওদের দুজনের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল?

না, ছিল না, ওরা দুজনেই পাটনা কলেজের ছাত্র। দুজনেই বি. এ. পরীক্ষায় ফেল করে একই দিনে দানেশগঞ্জে ফিরে এসেছিল।

জগদীশের মোক্তার বাবা ছেলেকে অত্যন্ত ভালবাসেন। দিবানাথের উকীল বাবাও ছেলেকে অত্যন্ত ভালবাসেন। দানেশগঞ্জের সবাই জানে, দিবানাথ আর জগদীশ দুজনেরই টাকার অভাব হয় না। দুই বড়লোক বাবা দুই ছেলেকে তাঁদের ব্যাংকের আমানতের টাকা ইচ্ছা মত তোলবার অধিকার দিয়ে দিয়েছেন। দুজনেই বাপের এক ছেলে, তাই খুব আদুরে ছেলে।

শুকদেববাবু, ছতরপুরা তসীল কাছারির ভাণ্ডারীজী বলেছেন, সত্যি, বিশ্বাস কর রামতনু, দানেশগঞ্জের এই দুই নওজোয়ানের মধ্যে বড়ই অন্তরঙ্গতা ছিল। একবার ওরা ঠিক করেই ফেলেছিল যে, দুজনে বিশ হাজার টাকার মূলধন নিয়ে একটা তেলকল বসাবে—দিবানাথের দশ হাজার ও জগদীশের দশ হাজার। একটা মেশিন কোম্পানিকে বায়না করবার জন্য দুজনের একসঙ্গে কলকাতা যাবার দিনও ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু...।

কিন্তু হঠাৎ একটা নতুন রকমের ঘটনা যেন চমৎকার এক মায়াময় হাসির গুঞ্জন তুলে দুজনেরই কলকাতা যাবার সংকল্পটাকে একেবারে বিবশ করে টলিয়ে দিল। শুকদেববাবু গল্প

করতে গিয়ে বলেছেন, হ্যাঁ রামতনু, একটি সুন্দরী মেয়ের সুরেলা হাসির মিষ্টি শব্দ শুনে ওদের দুজনের প্রাণ উতলা হয়ে গেল।

রেলওয়ের এক রিটায়ার্ড অফিসার, মিস্টার ভরদ্বাজ, কে জানে কোথা থেকে এসে দানেশগঞ্জের একটি বাড়ির ভাড়াটিয়া বাসিন্দা হতেই জগদীশ আর দিবানাথের বন্ধুত্ব ভয়ানক রকমের বিচ্ছেদে পরিণত হয়ে গেল। ট্রেজারির খাজাঞ্চীবাবুর কাছ থেকে দানেশগঞ্জের সব উকীল মোক্তার সেই চমৎকার জ্ঞাতব্য তথ্যটি জেনে নিতে পেরেছিলেন। কত টাকা পেনসন পান মিস্টার ভরদ্বাজ? মোটে একশো দশ টাকা। তবে তিনি আর কি এমন মিস্টার? তবে ধুতি কোর্তার বদলে এত প্যান্ট-শার্টই বা পরবার অভ্যাস কেন? দুটো চাকর আর একটা বাবুর্চিই বা কেন? একশো দশ টাকা পেনসনের জোরে কি এ রকম স্টাইল করে দিন যাপন করা চলে? বাড়ি ভাড়াই তো পঁয়তাল্লিশ টাকা দিতে হয়। একটা উড়ো খবর ওদের কাছে পৌঁছেছে। মিস্টার ভরদ্বাজ নাকি গয়াতে দোকানীদের কাছে পাঁচ হাজার টাকা ধার রেখে দিয়ে হঠাৎ একদিন চুপচাপ এই দানেশগঞ্জে চলে এসেছেন।

শুকদেববাবু যে কথা বলেছেন, সেটা শুনতে অবিশ্বাস্য রকম বলে মনে হলেও সত্যি কথা, নিরেট বাস্তব অথচ অদ্ভুত এক ঘটনার কথা। মিস্টার ভরদ্বাজের মেয়ে, যার নাম নিনা ভরদ্বাজ, লক্ষ্ণৌ এর কোন্ এক কলেজের পড়া শেষ করে যে মেয়ে সেদিন দানেশগঞ্জে এসে প্রথম দিনই একটা সাড়া জাগিয়েছিল, সেই মেয়ের মুখের সুরেলা হাসির গুঞ্জনের চেয়ে চোখ মুখের চেহারাতে বুঝি অনেক বেশী মধুরতা ছিল।

ছোট একটি মহকুমা শহর হল এই দানেশগঞ্জ, যার চারদিকে জঙ্গল আর পাহাড়ের বলয়। এ হেন ছোট শহরে যদিও বড় বড় কারবারের সাড়া ও ব্যস্ততা আছে, কিন্তু নিনা ভরদ্বাজের মত সুহাসিনী মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে ও মিষ্টি সৌজন্যের মেয়ে একটিও নেই।

বাড়ির সামনের পথ দিয়ে জগদীশ আর দিবানাথকে একসঙ্গে হেঁটে যেতে দেখে নিনা যেন হঠাৎ খুশির আবেগে চঞ্চল হয়ে হেসে উঠেছিল আর ডাক দিয়েছিল, শুনছেন? আপনারা কি কখনও পাটনাতে ছিলেন?

হ্যাঁ, ছিলাম বইকি। কিন্তু কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন?

জামালপুরের টেনিস চ্যাম্পিয়ন মোহন ভরদ্বাজকে চেনেন কি?

না।

মোহন ভরদ্বাজ আমার খুড়তুতো দাদা। যাই হোক, আমাদের এখানে একটু চা খেয়ে যেতে কি আপনাদের কোন আপত্তি আছে? গায়ে পড়ে কথা বলছি বলে কিছু মনে করবেন না। মনের সুখে দুটো কথা বলব কিম্বা দু'মিনিট বসে মন খুলে একটু গল্প করব, এ রকম সোসাইটি তো এখানে পাচ্ছি না। কী যে অস্বস্তি হচ্ছে কি বলব!

নিনা ভরদ্বাজের বাড়িতে সেদিন দুই বন্ধু একটা টেবিলে পাশাপাশি বসে চা খেয়েছিল, তারপর এই দানেশগঞ্জের কেউই কোনদিন দুই বন্ধুকে একসঙ্গে দেখতে পায়নি, যারা ছিল দুই বন্ধু তারা হয়ে গেল দুই শত্রু। দানেশগঞ্জের ভদ্রলোকরা খুব বিরক্ত আর উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছেন, ছেলে দুটোর কি সত্যই মাথা খারাপ হয়েছে? মিস্টার ভরদ্বাজের মেয়েটা কি ওদের তুক করেছে?

এক মাসের মধ্যে নিনা ভরদ্বাজের প্রাণটা যেন নিগূঢ় অনুরাগের জটিল এক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেল বুঝি। দুজনকেই সমান আবেগে ভালবেসে ফেলেছে নিনা। তাই প্রশ্নটা হল, কাকে রাখবে ও—কাকে ছাড়বে নিনা? দিবানাথ আর জগদীশ সপ্তাহের মধ্যে অত্যন্ত দুটো ভিন্ন ভিন্ন দিনে এ বাড়িতে আসে। আর চা খেয়ে ও নিনার গলার গান শুনে চলে যায়। মিস্টার ভরদ্বাজ অন্য ঘরে বসে নিনার গানের সঙ্গে তাল রেখে আস্তে আস্তে হাততালি দিতে থাকেন। এবং নিনার আন্টি হন যে প্রৌঢ়া মহিলা, তিনি মিস্টার ভরদ্বাজের কাছে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসেন।

দিবানাথ যেমন এখানে একাই আসে, জগদীশও তেমনই একাই আসে। নিনার অভ্যর্থনার আর সৌজন্যের মধুর স্বাদ সব যেন পান করে নিয়ে ওরা চলে যায়।

খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন দিবানাথ আর জগদীশের দুই উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত পিতা, ব্যাঙ্কের জমা টাকার হিসেবটা ক্ষীণ হতে হতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। কোন সন্দেহ নেই, নিনা ভরদ্বাজ নামে ওই রূপসী মেয়েটার যত সাধ শখ আর ইচ্ছে ডাকিনীর পিপাসার মত ওই দুই ছেলের কাণ্ডজ্ঞানকে শুষে নিয়েছে। কি মনে করেছে ওরা, ওই মেয়ে ওদের দুজনের একজনকেও বিয়ে করবে?

বাবার সন্দেহের ভাষাটা একদিন একটু বেশী সরব হয়ে কানে পৌঁছতেই হেসে ফেলেছে দিবানাথ। দিবানাথ ভাল করেই জানে, সে নিনার চোখের জল দেখেই বুঝে নিয়েছে, নিনা তাকে ভালবেসে ফেলেছে। নিনার ভালবাসাকে নয়, জগদীশের মতলবটাকে সন্দেহ করে দিবানাথ। জগদীশও তেমনই নিনার অনুরাগের হৃদয়টাকে নয়, ওই দিবানাথের অভিসন্ধিকে সন্দেহ ও ঘৃণা করে। তার সন্দেহ ও ঘৃণার আবেগ এইবার যেন একটা জ্বালাময় প্রদাহ নিয়ে ফেটে পড়বে।

তাই হল। নিনা ভরদ্বাজ যেদিন একটু গম্ভীর আর বিষণ্ণ হয়ে, রুমাল দিয়ে সুন্দর মুখের আধখানা ঢেকে নিয়ে দিবানাথের সামনের চেয়ারে বসে রইল, সেদিন দিবানাথের বুকের পাঁজর যেন একটা দুর্যোগের আভাস পেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল। নিনা বলে, আমি ভেবে রেখেছিলাম তিনমাসের জন্য একবার লন্ডন বেড়িয়ে আসবার পর জীবনের আর প্রাণের সবচেয়ে সুন্দর ইচ্ছাটার একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলব।

কি বললে? হেস্তনেস্ত? তার মানে?

নিনা হেসে ফেলে।—তার মানেটা যদি না তুমি বুঝতে পারো, তবে কে আর বুঝবে? তুমি ছাড়া...।

দিবানাথ—তিন মাসের জন্য লন্ডন বেড়িয়ে আসতে কত টাকা লাগবে?

নিনা—কত আর লাগবে? বড় জোর পাঁচ হাজার।

দিবানাথ—কিন্তু...।

নিনা—না না, তুমি টাকার কথা ভেবে মন খারাপ করো না। যে করেই হোক, আমার বিলেত যাবার ওই সামান্য টাকাটা যোগাড় হয়েই যাবে।

বুঝতে এবং সন্দেহ করতে দেরি হয় না দিবানাথের, হতভাগা জগদীশ, শত চেষ্টা করেও যে নিনার ভালবাসার একটি ছিটেফোঁটাও পায়নি, সে এইবার সুযোগ বুঝে পাঁচটি হাজার টাকা এনে নিনার হাতে তুলে দিয়ে নিনার বিলেত বেড়াবার স্বপ্নটাকে সত্য করে দিতে সাহায্য করবে।

ঠিক এই রকম সন্দেহ ও দুর্ভাবনা নিয়ে, ঠিক একই রকম যুক্তি দিয়ে জগদীশও বুঝেছে, দিবানাথ এইবার পাঁচটি হাজার টাকা নিনাকে উপহার দিয়ে নিনার প্রাণের কৃতজ্ঞতা কিনে ফেলবে। না, নিনাকে এ রকম একটা ভুল পথে চলবার সুযোগ দেবে না জগদীশ। কি করে জগদীশ ভুলতে পারে যে, এই সেদিন জগদীশের চোখের কত কাছে মুখটা এগিয়ে দিয়ে কথা বলেছিল নিনা—তুমি কি আজও কিছু বুঝলে না?

জগদীশ—বুঝেছি, কিন্তু তুমি যদি একেবারে স্পষ্ট করে না বল তবে আমি কি করে বাবার কাছে বলতে পারব যে, আমার সঙ্গে তোমার...।

নিনা—চুপ চুপ! এত তাড়াতাড়ি ও কথাটা বলে ফেলতে নেই। যখন জানো যে নিনা তোমাকে...।

দেখতে পায় জগদীশ, নিনার দু'চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল চিকচিক করছে। এইবার শুরু হল দুজনের যত ভূসম্পত্তি বিক্রি করে দেবার মারাত্মক প্রতিযোগিতা। বিক্রি করতে কোন অসুবিধে নেই। দুই ছেলের দুই বাপ রাগ করে জমিজমা বিক্রী করবার অনুমতি লিখে দিয়ে কাশী চলে গিয়েছেন।

কিন্তু কি অদ্ভুত দুরদৃষ্ট দুজনের কারও হাতে পাঁচটি হাজার টাকা এল না। গোলাদার ত্রিভুবন চৌধুরী দুজনের দুই ভূ-সম্পত্তির দাম হিসাবে দুজনের প্রত্যেককে তিন হাজার টাকার এক পয়সাও বেশি দিলেন না।

দুজনেই শুভলগ্ন বুঝে ভিন্ন ভিন্ন দুটি দিনে নিনা ভরদ্বাজের বাড়িতে গিয়ে নিনার হাতে তিন হাজার টাকা তুলে দেয়। —আরও একটু সবুর কর নিনা। বাকি দুই হাজার...।

হেসে ফেলে নিনা।—হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। আর বেশি বলতে হবে না। আমি সবুর করব, কিন্তু তুমি দুশ্চিন্তা করো না।

জগদীশ ও দিবানাথ, দুই শত্রুর উতলা মনের বাতাস এইভাবে নিনা ভরদ্বাজের কথার এক একটি আবছা ইঙ্গিতেই শান্ত হয়ে যায়।

এর পরের অধ্যায়টা হল দুই প্রতিযোগী ভালবাসার দুরন্ত এক ফৌজদারী মত্ততার অধ্যায়। এক বছর আগে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর, এই দুরন্ত মত্ততারই কিছু দৃশ্য দেখেছিল রামতনু। টাকা নেই, টাকা সংগ্রহও আর সম্ভব নয়। নিনা ভরদ্বাজের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সাহসটাই যেন ভীরু হয়ে জগদীশের চওড়া বুকের ভিতরে লুকিয়ে পড়েছে। টাকার চিন্তায় দিবানাথের চেহারার দুধে-আলতা রংটা দিন দিন শুকিয়ে আর গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে।

ফৌজদারী মত্ততার কাণ্ডটা যেন টাকা যোগাড় করবার একটি করুণ অক্ষমতার বিদ্রোহ। কিংবা অক্ষমতার একটা আক্রোশ। কেউ কাউকে ইহজীবনে ক্ষমা করতে পারবে না। ক্ষমাহীন এই আক্রোশ। ফৌজদারী করে দুজনের অদৃষ্টকে শেষে সর্বনাশের টাঙি, লাঠি ও তীরধনুক দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে জয়ী হবার স্বস্তি ও শান্তি পেতে চাইছে।

শুকদেববাবু বলেন, ব্যস্, এখন ফৌজদারী মেজাজের সব আগুন ঠাণ্ডা। দুজনের এখন যে দশা হয়েছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছে। ত্রিভুবন চৌধুরীর উকীল নোটিশ দিয়ে দুজনকে সাবধান করে দিয়েছিল। ভুলে গিয়েছ কেন যে, চুপরাতু আর চান্দুয়ার দুই জঙ্গল ও দুই খাদ এখন আমার সম্পত্তি। সাবধান, কোনদিন আমার ওখানে গিয়ে কোন রকম হামলাবাজি করলে আমি মামলা দায়ের করব।...। কি অদ্ভুত দশা, ওরা আজ ত্রিভুবন চৌধুরীর মাইনে করা কেরাণী হয়ে সেই দুই খাদেরই লাভ লোকসানের হিসেব লিখছে, যে দুই খাদ একদিন ওদেরই সম্পত্তি ছিল।

দুই

ক'দিন ধরে অনেকবার একটা দুরন্ত চঞ্চলতার দৃশ্য রামতনুর চোখে পড়ছে। ছতরপুরার জঙ্গলের হরিণ আর হরিণীরা চঞ্চল হয়েছে। এরা সবাই চিতল হরিণ, কোন কোন কবির মতে চিত্রা হরিণ। একদিন তসীলের কাজে বের হয়ে জঙ্গলের পথে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় রামতনু। দু'চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওই তো, একটা ডুমুর গাছের তলায় সবুজ ঘাসের ওপর গলা এলিয়ে দিয়ে কি শান্তি আরামের ঘুম ঘুমোচ্ছে একটা হরিণী। কবি কালিদাস নিজের চোখে এ রকম একটা দৃশ্য দেখেছিলেন, তাই লিখেছেন ঃ নবীন শাদ্বলের উপর শায়িতা নির্মিলিতাক্ষী হরিণী।

ভেলাডিহিতে থাকতে কতবার দেখতে পেয়েছে রামতনু, চিতল হরিণ আর হরিণীর দল কচি শালের পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে, মাহাতোদের মকাই ক্ষেত তছনছ করছে। কিন্তু এই হরিণীটার গায়ের ছোপের মত এত ছোট ছোপ কোন হরিণ বা হরিণীর গায়ে কখনও দেখতে পায়নি। এই হরিণীর গায়ের ছোপগুলি যেন ছোট ছোট সাদা সাদা তারার আকারের ছবি। কে জানে কবে কোন্ এক কাঁটার সঙ্গে ঘষা লেগে হরিণীটার পেটের চামড়ার ওপর লম্বা একটা আঁচড় পড়েছিল। কাটা দাগের মত সেই আঁচড়ের লম্বা দাগ। হরিণীর পেটের ছোট ছোট তারা আকারের অনেকগুলি ছোপকে দু'ফালি করে কেটে দিয়েছে।

চমকে উঠল হরিণীটা। এক লাফ দিয়ে জঙ্গলের হাজার গাছের ভিড়ের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

খুব ভোরে শুকদেববাবু ডাক দিয়ে রামতনুর ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন।—শুনছ তসীলদার? একটা অদ্ভুত শব্দ কি শুনতে পাচ্ছ। খট্‌খট্ ঠোকাঠুকি শব্দ?

রামতনু—হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।

কিসের শব্দ বল তো?

কী করে বলি? বুঝতে পারছি না।

জঙ্গলের এক সুন্দরী হেলেনের দুই দাবিদার প্রেমিকের যুদ্ধ বেধেছে।

হেলেন তো একজনের বিবাহিত স্ত্রী ছিল।

ছিল তো ছিল। এখানে হেলেনকে এখনও কেউ বিয়ে করেনি। দুজনই হেলেনকে বিয়ে করতে চায়। কাজেই মারামারি শুরু হয়েছে।

কী ব্যাপার? কী বলতে চাইছেন শুকদেব? কট্‌কট্ ঠোকাঠুকির শব্দটা তো খুবই নিকটের শব্দ বলে বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে খেজুর আর বাঁশের দুই ভিড়ের মাঝখানে চোরকাঁটায় ভরা যে ছোট্ট এক টুকরো খোলা জমি আছে, সেই দিক থেকে শব্দটা আসছে।

শুকদেববাবু বললেন, চলুন, এখনই গিয়ে একবার দেখে আসি। কিন্তু খুব সাবধানে পা টিপে টিপে হাঁটবেন।

চোরকাঁটায় ভরা ছোট্ট এক টুকরো ফাঁকা জমির ওপর বিচিত্র এক ফৌজদারীর দৃশ্য। দুই চিতল হরিণ, তাদের দুই মাথায় প্রকাণ্ড দুটি শিং-এর ঝাড়। দুরন্ত আক্রোশের আবেগে ক্ষিপ্ত হয়ে দুই হরিণ মারামারি করছে। শিং-এ শিং-এ সংঘর্ষের উৎকট শব্দ বেজে উঠছে, কট্‌কট্ পট্‌পট্ কটর্।

শাল আর জংলী কদমের ছোট একটা ভিড়ের আড়ালে একটা পাথুরে টিলার ওপর দাঁড়িয়ে দৃশ্যটাকে বেশ স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায়। শুকদেব বলেন, এইবার ওই দিকে দেখ। মহুয়াটার তলায় ওটা কে দাঁড়িয়ে আছে? একজন হেলেন সুন্দরী নয় কি?

খুব ভুল কথা বলেননি শুকদেব। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হয়, যাকে হেলেন বলছেন শুকদেব, সে তো রামতনুর নিতান্ত অচেনা কোন হেলেন নয়। সেই চিতল হরিণীটা, যার গায়ের ওপর ছোট ছোট তারার আকারে ছোপ আর পেটের ওপর লম্বা একটা কাটা দাগ। সেই হরিণী একটু দূরে, ফাঁকা জমিটার শেষ প্রান্তে একটা মহুয়ার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। একটি চরম ঘটনার অপেক্ষায় যেন সময়ের মুহূর্তগুলিকে প্রাণের সব কৌতূহল দিয়ে গুনছে আর দেখছে হরিণীটা, তার প্রণয়ের দুই দাবিদারের মারাত্মক হানাহানির দৃশ্য। পরাজিত হয়ে, ভীত হতাশ হয়ে এক দাবিদার পালিয়ে গেলে তবেই নিষ্পত্তিময় শান্তি দেখা দেবে। জয়ী হরিণের সঙ্গিনী হয়ে চলে যাবে হরিণী।

না, আর কতক্ষণ? দুই হরিণের মারামারি শিগগির থামবে বলে মনে হয় না। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গিয়ে ওরা সকাল সন্ধ্যা ও রাত্রির সব মুহূর্তকে উদ্বিগ্ন করে লড়তেই থাকবে।

ঘরের ফেরবার পথে চলতে চলতে শুকদেব বলেন, আগে রাগ করে বলতাম, এখন বলতে গিয়ে বেশ দুঃখ হয়, রামতনু। জগদীশ আর দিবানাথ, দুটো ভাল ছেলে একটি মেয়েকে ভালবেসে কী ভুলই না করেছিল!

রামতনু হাসে।—যত কাব্য নাটক নভেল আছে, তার মধ্যে তো এই একই ব্যাপার শুকদেববাবু। ভালবাসাবাসির সব গল্পের শতকরা নব্বইটা গল্পই তো এই রকমের একটি মেয়ের জন্য ভালবাসার দুই দাবিদারের ঠোকাঠুকির গল্প।

জগদীশ আর দিবানাথের জন্য শুকদেব যেমন দুঃখ কষ্ট করেন আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রামতনুর আনমনা চিন্তায় মধ্যে এই রকম একটা দুঃখের ছোঁয়া লেগে থাকে, ছোঁয়াটা সামান্য হলেও তার মধ্যে কেমন যেন বেদনা আছে।

ছোড়দি চিঠি লিখেছেন, ভাই—তুমি কি চিরকাল বনবাসী হয়েই থাকবে। বিয়ে করবে না? লক্ষ্মী ভাইটি, একটিবার কি বনের মায়া ছেড়ে দিয়ে এখানে আসবে, আর আমার খুব চেনা একটি সুন্দর মেয়েকে দেখে যাবে? পছন্দ না হয় ইচ্ছে না হয়, বিয়ে কর না। বিয়ে না করতে তো কোন বাধা নেই, অসুবিধে নেই। কিন্তু একবার এসে অন্তত মেয়েটাকে একটু দেখে যাও।

মনে মনে ছোড়দির চিঠির জবাব দেয় রামতনু।—যতই প্রশংসা কর, তোমাদের চেনা-শোনা মেয়েরা তো দানেশগঞ্জের নিনা ভরদ্বাজেরই মত মেয়ে, এককাঠি বেশী কিংবা এককাঠি কম।

একটির পর একটি দিন পার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ছতরপুরার জঙ্গলের শালফুলের গন্ধ যেমন থামছে না, ওই দুই হরিণের মারামারির শৃঙ্গ-সংঘর্ষের শব্দও তেমনই থামছে না। শালফুলের গন্ধ যেমন বাতাসে ভেসে বেড়ায়, দুই হরিণের এই মারামারির শব্দটা না হোক, খবরটা যেন তেমনই জঙ্গলের বাতাসে ভেসে অনেক গাঁ ও ডিহির কানে পৌঁছে দিয়েছে।

প্রায়ই দেখা যায়, লোকের দল ব্যস্ত হয়ে ছতরপুরার তসীল কাছারির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, শব্দ শুনছে। তারপর ব্যস্ত হয়ে শব্দেরই দিকে ওরা ছুটে যায়। দুই হরিণের মারামারির দৃশ্য দেখে নিয়ে ওরা আবার ফিরে যায়। একদিন দুজন চেনা মানুষকে আসতে দেখে চমকে ওঠে রামতনু। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না, জগদীশ আর দিবানাথকে আসতে দেখে কেন চমকে উঠেছে।

এই ভাই রামতনু, ভাই তসীলদার, কোথায় কোন্ দিকে দুই হরিণের লড়াই চলছে সাত দিন ধরে?

আরো রোগা হয়ে গিয়েছে জগদীশ আর দিবানাথ। গায়ের জামাতে তালি, বেশ ময়লা জামা। এবং দুজনের ভাবভঙ্গীর রকম দেখলেই বোঝা যায়, দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের ছিন্ন ডোর জুড়ে গিয়ে আবার একটা অন্তরঙ্গতার চমৎকার রাখী-ডোর হয়ে উঠেছে। জগদীশ তার মুখের জ্বলন্ত সিগারেটের চেহারাটা পাঁচ টানে অর্ধেক পুড়িয়ে দিবানাথের হাতে তুলে দেয়। দিবানাথ সেই সিগারেটের ধোঁয়া টেনে মুখে আর বুকে যেন বন্ধুত্বের নতুন একটা সুখের স্বাদ পায়।

দুই হরিণের যুদ্ধ দেখবার জন্যে উৎসুক দর্শকের সমাগম ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। বারো-তের দিন তো হয়ে গেল। কী ব্যাপার শুকদেববাবু? এ কেমন মারামারি? এখনও তো মারামারি থামছে না।

চমকে ওঠেন শুকদেব। —তবে তো মরেছে?

কি বললেন?

এবার ওদের দুজনেরই মরণ ছাড়া নিষ্পত্তি হবে না।

ঠিকই, ভুলই সন্দেহ করেননি শুকদেব। পাথুরের টিলাটার ওপর শুকদেবের পাশে দাঁড়িয়ে একটা নিদারুণ নিষ্ঠুর-করুণ দৃশ্য দেখতে পায় রামতনু। দুই হরিণের শিং-এ শিং-এ এমনই জড়াজড়ি হয়েছে যে, দুই মাথার শত ঝাঁকুনি আর টানা-টানিতেও খুলছে না। মারামারি করবার সেই বিকট উত্তেজনা আর নেই। দুই হরিণের দুই জোড়া ডাগর চোখে দুঃসহ একটা ভয় যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। দুই মাথার দুই শিং-এর ঝাড়ে এইবার যে গিঁট পড়েছে সেটা নিষ্ঠুর এক মৃত্যুরই গিঁট। ওদের পক্ষে সরে যাওয়া কিংবা পালিয়ে যাওয়া এখন অসম্ভব। এইবার ওদের দুই জীবনের চরম অন্তিম জঙ্গলের ওই ছোট্ট ফাঁকা জমিটার চোরকাঁটার ওপর লুটিয়ে পড়বে।

শুকদেব বলেন, আমারও মনে হয়, আর আশা নেই। ওদের শিং-এর গিঁট আর খুলবে না, ঢিলেও হবে না। আর দশটা দিনের তেষ্টাও সহ্য করবার ক্ষমতা ওদের আছে বলে মনে হচ্ছে না। ওরা মরবে। মরতে বাধ্য।

কিন্তু কই? মহুয়া গাছের গাঁ ঘেঁষে সেই সুন্দরী হেলেন তো নেই। চলে গিয়েছে হরিণীটা। শুকদেব বলেন, হরিণীটা তো বুঝতেই পেরেছে যে, ওর প্রেমের দুই দাবিদারের মরণ ঘনিয়ে এসেছে।

তিন

মাঝরাতে বাঘের ডাক শুনতে পেয়ে রামতনুর বুকের ভিতরটা যেন ডুকরে উঠল। ছতরপুরার জঙ্গলে গত চার-পাঁচ বছরে কোন বাঘ আসেনি। ডোরাকাটা বাঘ নয়, গুলে বাঘ নয়, তেন্দুয়ার নয়, সোনাচিতা নয়, শুধু দুটো নেকড়ে এসে একবার মাহাতোদের একটা গরুকে মেরেছিল। ব্যস ওই পর্যন্ত।

শুকদেববাবুর ঘরে গলা খাকারির শব্দ শুনে বুঝতে পারে রামতনু, বাঘের ডাক শুকদেববাবুকেও ভাবিয়ে আর জাগিয়ে তুলেছে। না, আর কোন সন্দেহ নেই, দুই জীবন্ত হরিণকে এখন বাঘটা মনের সুখে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। শিং-এ শিং-এ গিঁট বাঁধা হয়ে অচল অসহায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী হরিণের দুই দেহ এখন বাঘের ভোজ্য হবার দুর্ভাগ্যে রক্তাক্ত হয়ে ছটফট করছে।

সকাল হয়। বাঘের গর্জন যখন আর নেই, ছতরপুরার শালজঙ্গলে মাথার ওপর যখন সোনালী রোদ ছড়িয়ে পড়েছে, তখন শুকদেব তাঁর ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন।—এ রামতনু, শুনছ, যা হবার ছিল তাই হয়েছে। বুঝতে পারছ তো। নিজের চোখে দেখতে চাও?

রামতনু—না।

কী আশ্চর্য, আর কেউ নয়, দুই বন্ধু জগদীশ আর দিবানাথ ব্যস্তভাবে হেঁটে এসে তসীল-কাছারির দরজার কাছে থামে।—কী ব্যাপার রামতনু ভাই, বাঘ কি হরিণ দুটোকে মেরেছে।

রামতনু—তাই তো মনে হচ্ছে।

জগদীশ—আপনি দেখেননি?

দিবানাথ—দেখতে যাবেন না?

জগদীশ—চলুন চলুন, একবার দেখে আসুন।

সকালবেলার সোনালী রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে কত শান্ত স্বরে কথা বলছে দুই বন্ধু জগদীশ আর দিবানাথ। সোনালী রোদের মধ্যে তবু একটু উত্তাপ আছে, কিন্তু এই দুই বন্ধুর রোগা ঝিরকুটে দুই করুণ মূর্তির গলার স্বরে ও বুকের ভিতরেও এতটুকু উত্তাপ নেই। কিন্তু দুই হরিণের শেষ পরিণামের ছবিটাকে চোখে দেখবার জন্য ওদের দুই প্রাণই বা এত উৎসুক হল কেন?

শুকদেব বললেন, বেশ তো, আপনারাই যখন দুই হরিণের শেষ পরিণামের ছবিটাকে দেখবার জন্য এত ব্যাকুল, তখন আমরাই বা কেন—চলুন, দেখে আসি। চল হে রামতনু।

শুকদেব বাবুর ব্যস্ততার ভাষা শুনে জগদীশ আর দিবানাথ ওদের শান্ত চোখ দুটোকে নিষ্পলক করে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করে। তারপরেই ডাক দেয়, চলুন তসীলদারজী, চলুন।

পাথরের টিলাটার ওপর দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যটাকে দেখবার আর দরকার হয় না। কারণ দুই জীবন্ত হরিণের মারাত্মক সংঘর্ষের জীবন্ত দৃশ্য নয়। এক জোড়া হরিণের এক জোড়া ভাঙা ছেঁড়া কঙ্কালের দৃশ্য। হাড় পাঁজরাও চিবিয়ে দিয়ে গিয়েছে বাঘটা। কিন্তু একজোড়া শিং তেমনই জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। বাঘটার থাবার মার খেয়েও দুই শিং-এর জট খোলেনি।

কি ধবধবে সাদা হাড়-পাঁজর। শুকদেব বলেন, মনে হচ্ছে বাঘটার পিছু পিছু শেয়ালেরও একটা দল এসেছিল। ওরাই বাঘে খাওয়া হরিণ দুটোর রক্ত-মাংসের শেষটুকু চেটেপুটে সব হাড়-পাঁজর সাদা করে দিয়েছে।

ও কে? মহুয়া গাছটার ছায়ার কাছে যেন একটা সুন্দর জীবন্তপানা হরিণীর ছবি দাঁড়িয়ে আছে। যেন শেষ দেখা দেখবার জন্য এক জোড়া মায়াময় চোখ নিষ্পলক করে একটা হরিণী দুই হরিণের দুই ধবধবে সাদা হাড়-পাঁজরের দিকে তাকিয়ে আছে।

রামতনু চেঁচিয়ে ওঠে, ও শুকদেববাবু দেখে বুঝতে পারছেন, কে এসেছে?

শুকদেব—হ্যাঁ, ওটা তো সেই হরিণীটা সেই ছোট ছোট তারার মত আকারের ছোপ, আর পেটের ওপর সেই দাগটা, আর...।

দিবানাথ আর জগদীশ একসঙ্গে আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, কি বললেন। সেই হরিণীটা?

শুকদেব হেসে ফেলেন—হ্যাঁ, শাল জঙ্গলের এক হেলেন-সুন্দরী। ওরই জন্যে মারামারি করে মরেছে যে দুই হরিণ, ওদের শেষ অবস্থার দৃশ্য দেখতে এসেছে হরিণীটা।

দিবানাথ—সত্যিই কি তাই?

জগদীশ—এটা কি সম্ভব? হরিণীটা দুই হরিণের শেষ দশার খবর নেবে?

শুকদেব—আরে ভাই, সত্যি হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে। কিন্তু এ রকম একটা গল্প তো তৈরী করা যেতে পারে।

হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে সরে গেল হরিণীটা। সবারই চোখের দৃষ্টি সেই মুহূর্তে চমকে ওঠে, একটু দূরে দুই শালের ফাঁকের ওপারে একটা হরিণও লাফিয়ে উঠেছে! সেই হরিণের মাথায় মস্ত বড় শিং-এর ঝাড় দুলছে।

শুকদেব বলেন, বা বা, ওই দেখুন, হরিণীর নতুন জীবনসঙ্গীর চেহারাটা একবার দেখে নিন। বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর বেশ খুশি মেজাজের হরিণ বলে মনে হচ্ছে। নয় কি?

খুশি মেজাজে হরিণটার সঙ্গে সঙ্গে আর দৌড়ে দৌড়ে হরিণীটা চলে গেল। শুকদেববাবু ঘটনার দৃশ্যটাকে বুঝবিচার করে যেন একটা গবেষণার ভাষা শোনাতে থাকেন।—এই খুশি মেজাজের হরিণটা নিশ্চয় একটা জয়ী হরিণ। হরিণীর চোখের সামনে আর এক দাবিদার হরিণের সঙ্গে মারামারি করে জিতেছে। হরিণীও খুশি হয়ে জয়ী হরিণটার গলার মালা পরিয়ে দিয়ে...।

কথা থামিয়ে হেসে ফেলেন শুকদেব।—যাই ভাবুন আর বলুন, জানোয়ারদের প্রেম-ট্রেমের নিয়ম-কানুনগুলি বড়ই কুৎসিত। দুটোকে মারিয়ে দিয়ে জীবন্ত একটা তৃতীয়ের সঙ্গে চলে যাওয়া! ছিঃ,

শুকদেবের কথা শুনে অস্বস্তি বোধ করে রামতনু। ইচ্ছে করে নয়, শুকদেববাবু নিজের যুক্তি-বুদ্ধির আবেগে কথাগুলি বলে ফেলেছেন। কিন্তু বুঝতে পারছেন না যে তাঁর কথাগুলিকে জগদীশের আর দিবানাথের শেষ দশার মত শোনাচ্ছে।

অদ্ভুত ও অভাবিত ব্যাপার—জগদীশ আর দিবানাথ, দুই বন্ধুর দুই চোখের দৃষ্টিটাও হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে হাসতে শুরু করেছে। গম্ভীর, বিষণ্ণ ও উদাস এই দুই বন্ধুকে এই ক'মাসের মধ্যে একদিনও হাসতে দেখেনি রামতনু। কিন্তু ছতরপুরার শাল জঙ্গলের ওই হেলেন-হরিণীর কাণ্ড দেখে ওদের দুজনের খুশি হবার কি আছে?

রামতনু—আপনারা কি দেখে এত খুশি হলেন?

জগদীশ হাসে—হ্যাঁ, দেখতে পেয়ে সত্যিই খুশি হয়েছি।

দিবানাথ হাসে—দেখতে খুব ভাল লাগল যে, হরিণীটা হরিণ দুটোর শেষ দশার একটু খবর নিয়ে গেল।

চার

ত্রিভুবন চৌধুরীর দুই অভ্রখনির কাজ কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। অভ্রের দর এখন ভাল নয়। তাই এখন কিছুদিনের মত অভ্রর কারবারের কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হবে। ত্রিভুবন চৌধুরী দানেশগঞ্জ থেকে নিজেই এসে বলে গিয়েছেন।—তোমাদের দুজনকে এখন আর পঞ্চাশ টাকা মাইনে নিয়ে পুষতে পারব না। শুনতে পাচ্ছ তো, বাবা জগদীশ, বাবা দিবানাথ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

শুকদেব শুনেছেন খবরটা। নিজের চোখে একবার দেখেও এসেছেন, চেয়ার টেবিল নেই। ত্রিভুবনবাবুর মাইকা অফিসের সেই মাটির বাড়ির দাওয়াতে একটা সতরঞ্জির ওপর বসে তাস খেলছে জগদীশ আর দিবানাথ। আরও রোগা হয়ে গিয়েছে ওরা। শুকদেব বলেন, দানেশগঞ্জের ত্রিভুবন চৌধুরীও একটা বাঘ। জগদীশ আর দিবানাথের সব স্থাবর সম্পত্তি ওই লোকটাই সস্তায় কিনে নিয়েছে। ওদের দুজনের ভাগ্যের রক্তমাংস একেবারে চেটেপুটে খেয়েছে ওই ত্রিভুবন চৌধুরী। যাই হোক, জগদীশ আর দিবানাথ এখন এখানে আর থাকবে কেন? থাকতে পারবেই বা কেন? থাকবার দরকারই বা কি।

শুনে আশ্চর্য হয়েছেন শুকদেব, এরা দুজনেই থাকবে। অন্তত আরও পাঁচ সাতটা দিন থাকবে।

রামতনু—কেন? আর এখানে থেকে ওদের লাভ কি?

শুকদেব—তাই তো বুঝতে পারছি না। তাই আশ্চর্য হচ্ছি।

একদল লোক সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে মাচান বাঁধবার জন্য দুই চৌকিদারকে যেতে দেখে শুকদেব ডাক দিলেন, কি ব্যাপার, কোথা থেকে কোন সাহেব শিকার করতে এসেছেন?

চৌকিদার—রেলওয়াইকা একঠো বড়া সাহাব।

শুকদেব—ইংরেজ সাহেব, না দেশী সাহেব।

চৌকিদার—দেশী সাহাব। ঔর উন্‌কা মেমসাহাব।

শুকদেব—দেশী মেমসাহেব, না বিলাতী মেমসাহেব?

চৌকিদার হাসে—দেশী, দেশী মেমসাহাব। চমকিলা শাড়ি পরেন, ডাক বাংলার বারান্দাতে বসে থাকেন।

দানেশগঞ্জ থেকে একটানা যে সড়কটা ছতরপুরার জঙ্গলের কাছে এসে থেমেছে, সেই সড়কের দু'পাশে শুধু ইউক্যালিপটাস গাছের সারি। অন্য কোন গাছ নেই। শিকারপ্রিয় ডেপুটি কমিশনার লিস্টার সাহেব এই সড়ক তৈরী করিয়েছিলেন, ওই ডাকবাংলাটি তাঁর আদেশে সৃষ্টি। শুধু ইংরাজ ব্যক্তি, আর খুব বড়-রকমের কোন পদস্থ ইন্ডিয়ান অফিসার ছাড়া এই ডাকবাংলাতে ঠাঁই নেবার অধিকার কারও নেই।

শুকদেব বুঝতে পারেননি, রামতনুও অনুমান করতে পারে না, জগদীশ আর দিবানাথ দুজনেই কেন আরও পাঁচ-সাতটা দিন ওই অসহায় দশার একটা সতরঞ্চির ওপর পড়ে থাকতে চায়!

খবর শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন শুকদেব, রামতনু। জগদীশ আর দিবানাথ দুজনেই আশা করছে যে, পাঁচসাত দিনের মধ্যে অন্তত একটি দিন সেই নিনা ভরদ্বাজের সঙ্গে ওদের দেখা হবে।

ওই ডাকবাংলাতে রেলওয়ের যে বড় অফিসার সস্ত্রীক এসে উঠেছেন, যাঁর শিকারের মাচান তৈরি করবার ভার নিয়েছে ছতরপুরার দুই চৌকিদার, তাঁর নাম হল মিস্টার সি কে মূর্তি। দানেশগঞ্জের সেই নিনা ভরদ্বাজ আজ এই মিস্টার সি কে মূর্তির জীবনসঙ্গিনী, বিবাহিতা স্ত্রী।

নিনা ভরদ্বাজের ভাগ্যে এ রকম একটা চমৎকার শুভোদয়ের খবর শুনে এই দুই বন্ধুর কেউই একটুও ভ্রূকুটি করেনি, বরং দুই বন্ধুর কথাবার্তার মধ্যে নিনা ভরদ্বাজের কথা মাঝে মাঝে বেশ স্পষ্ট করে যেন একটা চমক দিয়ে বেজে ওঠে। শুকদেববাবু একদিন নিজের কানে শুনে এসেছেন, দুই বন্ধুতে বেশ স্বচ্ছন্দে ওদের জীবনের স্মৃতিকথা বলাবলি করছে। নিনার জন্যে কে কত কাজ করেছে, কত টাকা খরচ করেছে, নিনা কবে কখন কত খুশি হয়েছে, হেসেছে, কিংবা চোখের জল ফেলেছে, সব ঘটনার স্মৃতি ওদের কথাবার্তায় মুখরিত হয়! খুব শান্ত ও শীতল রকমের একটা মুখরতা, তার মধ্যে একটুও সন্দেহময় কোন জিজ্ঞাসার উত্তাপ নেই।

কিন্তু কই? কোন দেশী সাহেব তো শিকার করবার জন্যে চুপরাতুর জঙ্গলে গেল না।

চান্দুয়ার জঙ্গলের দিকেও না। কোন দিকের জঙ্গলে যেতে হলে ছতরপুরা তসীল কাছারির সামনের এই পথ দিয়েই তো যেতে হবে।

দুই চৌকিদার একদিন ফিরে যাবার পথে তসীল কাছারির সামনে দাঁড়িয়ে খবর শুনিয়ে দিল—মিথ্যে হয়রানি। মিথ্যে এত মেহনত করে মাচান তৈরি করা হল। সাহেব শিকার করবেন না। সাহেব শুধু পাখির ফটো তুলবেন।

দশটা দিন পার হয়ে যাবার পর রামতনুর মনের ভিতরের প্রশ্নটা চমকে ওঠে, দিবানাথ আর জগদীশ ওদের শেষ দশার মধ্যে পড়ে আছে, না চলে গিয়েছে?

শুকদেব বলেন, চলেই গিয়েছে বোধহয়। চল, একবার দেখে আসি, আছে না চলে গিয়েছে।

হ্যাঁ, দৃশ্যটা চোখে পড়ে। এটা জঙ্গলের দুই হরিণের শেষ-দশার দৃশ্য নয়। জগদীশ আর দিবানাথ নামে দুই মানুষের শেষ-দশার দৃশ্য। মূল মাইকা অফিসের মাটির বাড়ির দাওয়াতে ময়লা সতরঞ্চির ওপর পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে রোগা ও রুগ্ন দুটি চেহারা, জগদীশ আর দিবানাথ। যেন দুটো ভাঙা বুকের হাড় পাঁজরের দুর্ভাগ্য জড়াজড়ি করে আর গিঁটবাঁধা হয়ে পড়ে আছে।

শুকদেব বলেন, আপনারা এখনও কিসের আশায় এখানে বসে আছেন?

জগদীশ—না, আর আশা করবার কিছু নেই।

দিবানাথ—নিনা ভরদ্বাজ চলে গিয়েছে।

রামতনু—কে?

জগদীশ—আপনি জানেন না, বললে বুঝবেনও না। ডাকবাংলাতে এসে ঠাঁই নিয়েছেন রেলওয়ের বড় অফিসার, যাঁর নাম মিস্টার মূর্তি, তাঁরই স্ত্রী হল নিনা ভরদ্বাজ।

দিবানাথ—কিন্তু বুঝতে পারছি না, নিনা আমাদের সব খবর জেনেও, এখানে এত কাছে এসেও, একবার কেন আমাদের চোখে দেখতেও এল না। নিনা তো কবেই জেনেছে যে, আমরা দুজন এখন এই জঙ্গলের ভিতরে বসে অভ্র খাদের লাভ-লোকসানের হিসেব লিখছি।

শুকদেব—তাই তো, অন্তত অতীতের কথা স্মরণ করে এখানে একবার এসে আপনাদের সঙ্গে দুটো শুকনো কথাও তো বলতে পারত নিনা ভরদ্বাজ। কিন্তু বুঝি না, এই সামান্য সৌজন্যটুকু দেখাতে পারল না কেন।

রামতনু—একটা কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না শুকদেববাবু, আপনারাও কিছু মনে করবেন না, জগদীশবাবু ও দিবানাথবাবু।

বলুন বলুন, সত্যি কথা কিংবা মিথ্যে কথা, যা-ই হোক না কেন, বলে ফেলুন, আমরা কিছুই মনে করব না।

রামতনু—নিনা ভরদ্বাজ তো আর এই শালজঙ্গলের হরিণীটার মত একটা জানোয়ার নয় যে, একবার ফিরে এসে দুজন চেনা মানুষের শেষদশার দুঃখটাকে দেখে যাবে?

জঙ্গলের বাতাসে কোন সৌরভের সামান্য ছোঁয়াও আর নেই। শালজঙ্গলের বসন্তদিন কবেই শেষ হয়ে গিয়েছে। হাত তুলে চোখ মুছে নিয়ে দিবানাথ বলে, হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন।

জগদীশ বলে, হ্যাঁ আমরা এখনি চলে যাব।

তিন পাহাড়ীর বুড়ো বট

তসীলদারী চাকরির এই এক বছরের জীবনে কত রকমেরই না জমিদারী জীবনের চেহারা দেখতে পেয়েছে রামতনু। নামে সবাই জমিদার, কেউ নিতান্ত সামান্য অবস্থার মানুষ, কেউ বা অত্যন্ত ধনী অবস্থার মানুষ। কেউ গরুর গাড়ি চড়ে জঙ্গলের পথ পার হয়ে সদর শহরের বাজারে ও কাছারিতে যান। কেউ বা হাতীর পিঠে চড়ে যাওয়া-আসা করেন। জঙ্গলে এক-একটা গাঁয়ের ভিতরে জমিদার-বাড়ির চেহারা দেখে তাদের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কারও চেহারায় গরুর গাড়ির মত একটা সামান্যতা, কারও বা হাতীর মত মস্ত রকমের একটা অস্তিত্ব। যেমন উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মস্ত গড়বাড়ি আছে, তেমনই মাটির দেয়াল, বাঁশের খুঁটি আর খাপরার চালা নিয়ে নিতান্ত ক্ষুদ্র চেহারার জমিদার-বাড়িও আছে। কিন্তু তিন-পাহাড়ী জমিদারীর মত কোন জমিদারী কোথাও দেখতে পায়নি রামতনু। জমিদার মশাই দেখতে যেমন অদ্ভুত, তেমনই তাঁর বাড়িটিও। শালজঙ্গলের মধ্যে বিরাট চেহারার এক বুড়ো বটের কাছে কুঁড়েঘরের মত একটা অত্যন্ত দীনহীন চেহারার ঘরে বাস করেন জমিদার বলবন্ত রায়। কিন্তু এমন নির্বলবন্ত চেহারা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। জিরজিরে রোগা শরীরের ওপর একটা ছেঁড়া গেঞ্জি, মাথার সব চুল সাদা, ধুতিটা হলুদ রং দিয়ে ছোপানো। সত্তর বছর বয়সের বলবন্ত রায়ের চেহারার মধ্যে যেন এক বনবাসী ঋষির চেহারা লুকিয়ে রয়েছে।

তিনপাহাড়ী জমিদারীর চেহারাটা আরও নির্বলবন্ত। আরও করুণ ও গরীব। পাশাপাশি তিনটে ছোট পাহাড়ের পায়ের কাছে ছোট-ছোট সাতটা কুঁড়েঘরে যে দশজন কাঠুরিয়া থাকে, শুধু তারাই বলবন্ত রায়ের প্রজা। এরা ছাড়া আর কোন প্রজা নেই। এরা এদিক-ওদিক জঙ্গলে কাঠ-কাটা ঠিকেদারের কাজ করে যা পায়, শুধু তাই হল এদের প্রতিদিনের জীবনের রোজগার। আর জমিদার বলবন্ত রায় তাদের কাছে থেকে খাজনা হিসাবে প্রতিদিন পাঁচ-সাত আনা যা পান, তাই হল তাঁর বৈষয়িক সম্বল।

কোয়েল নদীর একটা স্রোত পালামৌ জেলার সীমান্ত পার হয়ে যেখানে হাজারিবাগ জেলার ভয়ানক ঘন জঙ্গলের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে, সেইখানে ঠাকুর-সাহেবদের মানপুরা জমিদারীর বড় জঙ্গলটাও জেলার সীমা ছাড়িয়ে হাজারিবাগে ঢুকেছে। তসীল কাছারির দাওয়ার ওপর বসে সামনের তিনপাহাড়ী জমিদারীর একরত্তি শালজঙ্গলটার দিকে তাকিয়ে রামতনু মাঝে মাঝে বলবন্ত রায়ের দীনদশার কথা ভাবে। ভাবতে গিয়ে আর একজনের কথাও চিন্তার মধ্যে এসে যায়। এখানে বসে তাকে দেখতেও পাওয়া যায়। তিনপাহাড়ীর ছোট শালজঙ্গলের মধ্যে যে বিশালকায় বটগাছটা দাঁড়িয়ে আছে, তারই কথা। এই বুড়ো বটের বয়সের নাকি সীমা-পরিসীমা নেই। আরও যে-সব গল্প শোনা যায়, তা শুনে মনে হবে, ওই বট যেন কঠিন এক রহস্যের বট; বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, আবার মাঝে মাঝে খুব করে। বলবন্ত রায় একদিন নিজেই এসে তসীলদার রামতনুর সঙ্গে অনেক গল্প করে অনেক কথা শুনিয়ে গিয়েছেন। সন সাতান্নর সেই বলোয়া, অর্থাৎ আঠারোশ সাতান্ন সালের সেই বিদ্রোহের সময় ইংরেজের ফৌজের বিরুদ্ধে জীউজান ভিড়িয়ে দিয়ে লড়াই করেছিলেন যে রামাবতার রায়, তিনিই ছিলেন সেদিনের তিনপাহাড়ের জায়গীরদার। কর্নেল ডালটনের ফৌজ এসে আর তোপ দেগে দেগে তিনপাহাড়ীর ছোট গড়-কেল্লার ইঁট-পাথরের শরীরটাকে একেবারে গুঁড়ো করে দিয়েছিল। সেই গড়-কেল্লার ধ্বংস আজও ওখানে যেন শালজঙ্গলের মধ্যে মুখ লকিয়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। গড়-কেল্লার বিধ্বস্ত চেহারার ইট-পাথর নতুন শালজঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে। এই দৃশ্যটা দেখে বেশ একটু খুশিই হয়েছে রামতনু। সব জায়গায় দেখা যায় যে, ইট-পাথরের বস্তির মার খেয়ে জঙ্গলই মরেছে। এই প্রথম দেখতে পাওয়া গেল

জঙ্গল যেন নিজের জেদের জোরে এগিয়ে গিয়েছে; আর পুরনো গড়-কেল্লার আর পুরনো বসতির সব ঠাঁই জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু ওদিকে, মাত্র দু'মাইল দক্ষিণে রাঁচি-লাতেহার সড়কের যেখানে নিত্য-দিনের সার্ভিসের বাস থামে আর যাত্রী নামায়, শোনা যায় সেখানে দশ বছর আগের ভয়ানক জঙ্গলটার কোন চিহ্ন নেই। আজ সেখানে বিশ পঁচিশটা দোকান নিয়ে অনেক মানুষের বসতি। সেই বসতির নাম দারুচটি। দারু, তার মানে মদ। প্রথম যে-দোকানটি এখানে সড়কের পাশে ঠাঁই নিয়েছিল, সেটা ছিল দেশী মদের একটি দোকান।

পুরনো শালজঙ্গলটা মরে গিয়েছে। বিশ-পঁচিশটা দোকানঘর যেন শহরের জিনিস জঙ্গলে ঢুকিয়ে দেবার, আর জঙ্গলের জিনিস বাইরে চালান দেবার যত দালালগিরির বিশ-পঁচিশটা আড্ডা। সে আড্ডার সব মানুষই হল শহরের মানুষ, একজনও জংলী গাঁয়ের মানুষ নয়।

দারুচটির যে দুটি মানুষ প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার লাতেহারের বাজারে যায় আর পরের দিনই ফিরে আসে, তারা খুবই অন্তরঙ্গ দুই বন্ধু-মানুষ। সুখলাল আর জগদীশ। এই যাওয়া-আসার পথটি হল সাদা কাঁকর দিয়ে পেটানো সরু পথ, তিনপাহাড়ীর কাঠুরিয়াদের বস্তি ছুঁয়ে, মানপুরার তসীলদারির আঙিনা ছুঁয়ে লাতেহার পর্যন্ত চলে গিয়েছে। দুই বন্ধুর কাঁধের ওপর দুই ঝুড়ি। সবাই জানে ওই দুই ঝুড়িতে কোন্ পণ্য ভরে নিয়ে ওরা লাতেহারের বাজারে যায়। সুখলালের ঝুড়িতে থাকে গোটা কুড়ি জীবন্ত বাদুড়, আর জগদীশের ঝুড়িতে কিছু না। লাতেহার বাজার থেকে নানা চমকদার যে-সব সুন্দর জিনিস সুখলাল তার ঘরের সুন্দরী বউয়ের জন্য কেনে, সেগুলিকে খুব যত্ন করে জগদীশ তার ঝুড়ির মধ্যে তুলে নেয়। একদিন নয়, এক মাসও নয়; আজ প্রায় দুবছর হল এইরকম দুই একটা কারবার দুই বন্ধুকে ব্যস্ত করে রেখেছে। দারুচটির সবাই দুই বন্ধুর সম্পর্কের আর-একটা খবর রাখে। জগদীশ তো কোন কারবার করে না, তাই সুখলাল তার অন্তরঙ্গ বন্ধু জগদীশকে প্রতি সপ্তাহে ডাল-ভাত খাওয়ার মত দুটো টাকা দিয়ে সাহায্য করে। এর বেশি টাকা জগদীশের দরকারও হয় না। সুখলালের ঘরে যেমন সুন্দরী বউ আছে, জগদীশের ঘরে তো সে রকমের কেউ নেই। জগদীশ নিজেও কোনদিন সুখলালের কাছে এমন দাবি করে না যে, আরও দুই-এক টাকা বেশি দিলে ঠিক সাহায্য করা হয়। দেখে মনে হয়, জগদীশ যেন সুখলালের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেই সুখী। সুখলালের কাছ থেকে দু'তিনটা টাকার সাহায্য যদি নাই বা পায় জগদীশ, তবেই বা কী? জগদীশ শূন্য পেটের ক্ষুধা নিয়েই বন্ধু সুখলালের সাহায্যের জন্য যে কোন খাটনির কাজে খাটবে। জগদীশ বলে, পয়সার অভাবে না খেতে পেলে শুধু আমার পেটটা শূন্য হয়ে থাকবে, কিন্তু আমার আত্মা তো ভরে থাকবে।

কথাটা সুখলালের সুন্দরী বউ মোহিনীর সামনেই দাঁড়িয়ে সুখলালকে কতবার শুনিয়ে দিয়েছে জগদীশ। সুখলাল আর মোহিনী, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুশি হয়ে হেসেছে।

মোহিনীকে খুশি করা, মোহিনীর প্রাণটাকে সমস্তক্ষণ হাসিয়ে রাখাই যে সুখলালের ধ্যান-জ্ঞান আর সাধনা। প্রতি মাসে একটি না একটি রুপোর গয়না লাতেহার বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে মোহিনীর খুশি প্রাণ আর খুশি চোখ দুটোকে হাসিয়ে দেয় সুখলাল।

দুই

বুড়ো বলবন্ত রায় খুবই উদ্বিগ্ন ও করুণ মূর্তি নিয়ে মানপুরার তসীল কাছারিতে রামতনুর কাছে এসে দাঁড়ালেন। অভিযোগ করলেন—সুখলাল আমার বটগাছের বাদুড় ধরে নিয়ে লাতেহারের বাজারে বিক্রী করে। আমার কোন আপত্তি গ্রাহ্য করে না। বরং আমাকে অভদ্র ভাষায় ভয় দেখায় যে, আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।

হঠাৎ বলবন্ত রায়ের দুই চোখ জলে ভরে যায়। কেশে নিয়ে গলার ভিতরের বদ্ধ একটা ব্যথার বাতাসকে যেন সরিয়ে দিয়ে আবার কথা বলেন—আরে বাবা, আমার ঘরটা কি পুড়িয়ে

ছাই করে দেবার মত একটা ঘর! জায়গীরদার রামাবতার রায়, যিনি একদিন ইংরেজ ফৌজকে মেরে এই পরগণা থেকে দূর করে দিয়েছিলেন, তাঁরই বংশধর এই বলবন্ত রায়ের চেহারাটা একবার দেখুন।

প্রতিশোধ নিতে এসে ইংরেজের ফৌজ এই তিনপাহাড়ী দলের নেতা বাবু রামাবতার রায়কে গুলি করে, আর বাড়ির সব পুরুষমানুষকে ওই বটগাছের ডালে-ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে মেরেছিল। আমার ঠাকুরদার বয়স তখন দশ বছর। তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্য টেনে নিয়ে গিয়েও কর্নেল তাঁকে রেহাই দিয়েছিলেন। বললে আপনি কি বিশ্বাস করবেন তসীলদারজী, তাদের আত্মা আজও ঐ বট-গাছের ডালে ডালে ঝুলছে? শুধু তাদের আত্মা নয়, পালামৌ জেলার সব গাঁয়ের আর গড়ের পুরুষমানুষদের আত্মা, যাদের ধরে নিয়ে গিয়ে আর গাছে গাছে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়ে মেরেছিল ইংরেজের ফৌজ, তাদের সবারই আত্মা আমার ওই বুড়ো বটগাছে আশ্রয় নিয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

কী বললেন?

হ্যাঁ, আমাকে একটা পাগল বলে মনে করুন, আমি কিন্তু সত্যি বিশ্বাস করি, ওরা বাদুড় হলেও ওঁরা আমাদের এই পালামৌ জেলার সেই সব মানুষেরই আত্মার রূপ, যাঁরা সেদিন ইংরেজের দড়ির ফাঁসিতে মরেছিলেন। ঠাকুরদাদা বলতেন, আমিও বিশ্বাস করি তসীলদারজী, এই বটগাছ কোনদিন শূন্য থাকবে না।

তার মানে?

তার মানে, মানুষ হোক বা বাদুড় হোক, কেউ না কেউ এই বটের ডালে ঝুলে থাকবেই থাকবে। কখনও শূন্য থাকবে না।

জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিয়ে আবার কথা বলেন বলবন্ত রায়।... আপনি কি কখনও আমাদের বুড়ো বটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন?

না, দূর থেকে দেখেছি।

দূর থেকে দেখলে কিছুই বুঝবেন না। একবার কাছে গিয়ে দেখুন। সকালবেলা দেখলে আপনারও মনে হবে, যেন শত শত বালখিল্য মুনি মাথা নীচু-মুখী করে ঝুলছেন আর সকালবেলার আলো পান করছেন। পড়েছেন তো, পুরাণ-কাহিনীর বালখিল্য মুনিদের কথা?

বলতে বলতে হেসে ফেলেন বলবন্ত রায়। সাদা চুলে ভরা মাথাটা দুলতে থাকে। হঠাৎ বলবন্ত রায়ের দুই চোখের চেহারা কাঁপতে কাঁপতে অদ্ভুত হয়ে যায়ঃ আমি সুখলাল নামে বাদুড়চোর লোকটাকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করে দিয়েছি। আর নয়, এবার থাম। নইলে ভয়ানক প্রতিশোধ নেবে এই বুড়ো বট। জান না, বাদুরগুলি যে এই বুড়ো বটের পোষা সন্তানের মত।

রামতনু দুঃখিত স্বরে তার অক্ষমতার কথা বলে।—আমি তো মানপুরার তসীলদার; দারুচটির কাউকে কিছু বলবার এক্তিয়ার তো আমার নেই।

বলবন্ত রায়—ঠিকই বলেছেন। আপনার কিছু বলবার এক্তিয়ার নেই।...আচ্ছা চলি। যার এক্তিয়ার আছে, সে-ই একদিন বলবে আর দেখিয়ে দেবে। কী ভেবে নিয়ে, আর বেশ একটু ব্যস্ত হয়ে, তিনপাহাড়ীর এই নিদারুণ গরীব, ঋষি-ঋষি আর পাগল-পাগল বলবন্ত রায়ের সঙ্গে হেঁটে-হেঁটে বুড়ো বটের কাছে এসে দাঁড়ায় রামতনু। সত্যিই তো, কী রকমের একটা বিস্ময় যেন বটগাছটার ডালপালার ভিতরে ছায়াময় আবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। বুড়ো বটের ডালপালার স্তব্ধতা যেন নিঝুম হয়ে শত শত বাদুড়কে ঘুম পাড়িয়ে নিথর করে দিয়েছে। কল্পনার চোখ দিয়ে নয়, সাদা চোখে দেখলেই মনে হয় বুড়ো বট যেন তার সর্বাঙ্গের মায়া দিয়ে বাদুড়গুলিকে পুষেছে।

বলবন্ত রায় বলেন—আমার কেউ নেই তসীলদারজী। আছে শুধু এই বুড়ো বট। আমার বিশ্বাসের বাতিক বলুন, আর যা-ই বলুন, এই বটগাছ যেমন বাদুড়গুলিকে ভালবাসে, তেমনই

আমাকেও ভালবাসে। আরও বলে রাখছি, মনে রাখবেন তসীলদারজী, আমাকে এত দুঃখ দিয়ে আর এত অপমান করে আনন্দ করছে যে লোকটা, এই বটগাছই একদিন তার বিচার করবে।

বাদুড় ধরবার মস্ত বড় একটা জাল আর একজন লোক সঙ্গে নিয়ে এই সকালবেলাতেই বুড়ো বটের কাছে উপস্থিত হয় আর চেঁচিয়ে হাসতে থাকে দারুচটির সুখলাল।

এ কী ব্যাপার! ভয়ানক ক্ষুব্ধ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন বুড়ো বলবন্ত রায়।

সুখলাল হাসে। এবার দিনের বেলাতেও বাদুড় ধরব। এই জালে দিনের বেলাতেও বাদুড় ধরা যায়।

না, আর এসব চলবে না।

সুখলাল—আমি বলছি, চলবে।

এক হাত দিয়ে বুকের ওপর ভয়ানক শক্ত একটা অহংকারের চাপড় মেরে সুখলাল চেঁচিয়ে ওঠে। —আমি, দারুচটির সুখলাল বলছি। বুঝে-সুঝে কথা বলুন।

বলবন্ত রায়—আমি কিন্তু তোমাকে মিনতি করে বলছি সুখলাল, তুমি একাজ আর করো না। বাদুড় ধরা বন্ধ কর।

সুখলাল—আমি বলছি, কিছু টাকা নিন, আমি দিচ্ছি। কিন্তু এরকমের চেঁচামেচি আর করবেন না।

ফুঁপিয়ে উঠলেন বলবন্ত রায়—শুনলেন তো তসীলদারজী, একটা বাদুড়চোর আজ তিনপাহাড়ীর জমিদারকে, রামাবতার রায়ের বংশধরকে বকসিস দিতে চাইছে।

সুখলালও চেঁচিয়ে ওঠে—বুড়্‌ঢা পাগল নেহি তো। যাও না, থানাতে গিয়ে নালিশ কর, না হয় লাঠি-বল্লম হাতে নিয়ে ফৌজদারী কর।

রামতনুর পক্ষে এটা সহ্য করবার মত কোন দৃশ্য নয়। কিন্তু বাধা দেবারই বা অধিকার কোথায়? তসীলকাছারির তিনটে পেয়াদাকে এখনই ডেকে নিয়ে এসে এই বাদুড়চোর লোকটাকে লাঠিপেটা করে তাড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তাতে কি বলবন্ত রায়ের কোন উপকার হবে? একদিন রাত্রিবেলা ঘোর বন্য অন্ধকারের মধ্যে চুপি চুপি এসে বর্বর স্বভাবের সুখলাল যদি অসহায় এই বুড়ো মানুষটাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে যায়, তখন বাধা দেবে কে?

বলবন্ত রায়ের রোগা শরীরটা থর্ থর্ করে কাঁপে, যেন কাঁপছে তাঁর অসহায় গরীব আত্মাটা। —আমি এখন কী করি বলুন তসীলদারজী?

রামতনু বলে—আপনি এখন আমার সঙ্গে আসুন।

তিন

লাতেহার বাজারের চাঁদিবেচা মহাজন ভারতরাম সাধু বলেছে, এই দু'বছরের মধ্যে প্রায় দুই হাজার টাকার রূপোর গয়না কিনেছে দারুচটির বাদুড়বেচা সুখলাল। হাঁসুলি টায়ারা বাজুবন্ধ, বেঁকী ঝুমকা আর পাঁয়জোর, এবং আরও কতরকমের গয়না। না, এবার আর রুপোর গয়না নয়, এবার কয়েকটা ভাল রকমের সোনার গয়না কিনতে হবে। মাথার মধ্যে তাড়ির নেশা নিয়ে আর ডগমগ আহ্লাদের স্বরে ভারতরামের কাছে তার সুখের জীবনের অনেক কথা বলে ফেলেছে সুখলাল। তার বউ মোহিনীর মত সুন্দরী মেয়ে অন্তত এই লাতেহারের কোন ঘরে নেই। এই মোহিনীরই শখ হয়েছে, তার দুই হাতে সুখলালের গলা জড়িয়ে ধরে শখের কথাটাকে বলেও দিয়েছে মোহিনী—রুপোর জিনিস আর নয়, এবার কয়েকটা সোনার জিনিস হলে ভাল হয়।

দুই পেয়াদার মধ্যে এরকমের আলোচনার চাপা-চাপা ভাষা রামতনুর কানেও পৌঁছেছে। সেই সঙ্গে তিনপাহাড়ীর বুড়ো বলবন্ত রায়ের করুণ আক্ষেপেরও কিছু কথা জানতে পেরেছে রামতনু। আর ক'টা দিনই বা বাকি আছে, বুড়ো বটের শেষ বাদুড়টা সুখলালের জালে বন্দী হয়ে

আর বিক্রির মাল হয়ে লাতেহার বাজারে চলে যাবে। শূন্য শূন্য, একেবারে শূন্য হয়ে যাবে বুড়ো বট। সব সময় করুণ রকমের চিৎকার ছাড়ছেন বুড়ো বলবন্ত রায়।

দেখে বুঝতে পেরেছেন বলবন্ত রায়, আর দুই একদিনের মধ্যেই সব হিসেবের শেষ হয়ে যাবে। আর একটিও বাদুড়কে দেখতে পাওয়া যাবে না।

ঠিকই, আর তিনটে দিন পরে যেদিন বিকেল হতেই জাল গুটিয়ে নিয়ে চলে গেল সুখলাল, সেদিন দেখে চমকে উঠলেন বলবন্ত রায়। বুকের ভিতরে দুঃসহ একটা আর্তনাদ গুমরিয়ে উঠতে থাকে—বুড়ো বটের ডালে একটিও বাদুড়কে আর ঝুলতে দেখা যাচ্ছে না।

সেদিনই রাত্রিতে ভয়ানক ঝড়ের আবেগে বুড়ো বটের সব ডালপালা উত্তাল হয়ে উঠল। বিদ্যুতের ঝিলিক লেগে জঙ্গলের অন্ধকার ঝলকে যাচ্ছে। সত্যিই কি বুড়ো বটের প্রাণে ভয়নাক রকমের একটা প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা উতলা হয়ে উঠছে?

বৃষ্টির অবিরাম ধারার শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লেন বলবন্ত রায়। ভালই হবে, এই ঘুম যদি আর না ভাঙে। বুড়ো বটের ভয়ানক রিক্ত চেহারা দেখতে হবে না।

কখন বৃষ্টি থেমেছে, জানেন না বলবন্ত রায়। ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পারেন, চারদিকের জঙ্গলের মধ্যে কোন জলস্রোতের শব্দও আর বাজছে না। বুড়ো বটের ডালপালার সব চঞ্চলতা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

শুনে চমকে উঠলেন বলবন্ত রায়। বোধহয় কোন নতুন বাদুড় উড়ে এসে বুড়ো বটের বুকে ঠাঁই নিতে চেষ্টা করছে। বটগাছের একটা ডালের পাতার মধ্যে যেন নতুন একটা আগন্তুক শব্দ উসখুস করছে। কিন্তু বলবন্ত রায়ের জাগা প্রাণটা যেন আবার নিঝুম হয়ে যেতে চায়। কার কী লাভ হবে, আবার যদি বাদুড়ের দল এসে এই বুড়ো বটের গায়ে ঠাঁই নিতে থাকে। লাভ হবে শুধু ওই নিরেট নির্দয় লোকটার, যার নাম সুখলাল।

বটগাছের ডালপালার ভিতরে আগন্তুক উসখুস শব্দটা হঠাৎ যেন ঝুপ করে নীচে পড়ে গেল। আবার চমকে ওঠেন ঘুম-ভাঙ্গা বলবন্ত রায়। কী হল? এ কিসের শব্দ? রাত ফুরোবার আর কতক্ষণ বাকি?

ভোরের প্রথম পাখির মৃদুস্বরের ডাক বেজে উঠতেই ঘরের বাইরে এসে বটগাছের দিকে তাকিয়ে থাকেন বলবন্ত রায়। বিস্মিত হয়ে শিউরে ওঠে তাঁর দুটি শিথিল চোখের দৃষ্টি। বটগাছের একটা ডালের সঙ্গে জড়িয়ে বাঁধা ফাঁসির দড়িতে ঝুলে রয়েছে সুখলালের শরীরটা। ভয়ানক উগ্র স্বভাবের সেই সুখলালের চেহারাটা যেন বিনীত ভঙ্গীতে মাথা হেঁট করে ঝুলছে।

না; ঠাকুরদাদা একটুও মিথ্যে করে কিংবা বাড়িয়ে বলেননি। এই বটগাছের ডালের সঙ্গে কেউ না কেউ ঝুলে থাকবে, মানুষ হোক বা বাদুড় হোক। শূন্য হয়ে থাকতে পারে না এই বুড়ো বট। কিন্তু কী ভয়ানক প্রতিশোধ নিতে পারে!

দারুচটির অনেক লোক ছুটে এসে যখন বুড়ো বটগাছের কাছে ভিড় করে, তখন এদিক-ওদিকের আরও কয়েকটা জংলী-বস্তির মানুষও ছুটে আসে। দারুচটির বাদুড়ওয়ালা সুখলাল আত্মহত্যা করেছে, সবাই খবর পেয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে রামতনু আসে।

দারুচটির লোকেরা চেঁচিয়ে শোরগোল করে যে সব কথা বলতে থাকে, বুড়ো বটের পাতাগুলি যেন তাই শুনে হাসছে। সকালবেলার রোদ বটের পাতার ওপর পড়ে চক চক করছে।

এই বুড়ো বটের গাছের ওপর পাতা বাদুড়ধরা জাল গুটিয়ে নিয়ে দিনের বেলায় ঘরে ফিরবে সুখলাল, এটা তো কল্পনা করতে পারেনি সুখলালের সুন্দরী বউ মোহিনী, আর সুখলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু জগদীশ। ঘরের দরজার কপাটে হাতের ঠেলা দিয়েই বুঝতে পারে সুখলাল দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ঘুমিয়ে পড়েছে মোহিনী। মোহিনীকে বার বার নাম ধরে ডাকে আর হাতের ঠেলা দিয়ে বন্ধ দরজার কপাট দুটোকে বার বার কাঁপিয়ে দিতে থাকে সুখলাল। সুখলালের মনের ভিতরে একটা সন্দেহ প্রমত্ত হয়ে উঠতেই লাথি মেরে দরজার

কপাট ভেঙে ফেলে সুখলাল। ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াতেই নিদারুণ বিস্ময়ের একটা দৃশ্য দেখতে পায়। এলোমেলো বিছানার দুদিকে চুপ করে বসে আছে দুইজন, এদিকে মোহিনী, আর ওদিকে জগদীশ।

ঘরের এক কোণ থেকে টাঙি হাতে তুলে নিয়ে জগদীশের মাথার ওপর কোপ বসিয়ে দেবার জন্য জগদীশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সুখলাল। সেই মুহূর্তে মোহিনী ওর চোখের দৃষ্টিকে হিংস্র করে নিয়ে সুখলালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর টাঙিটাকে কেড়ে নেয়। মোহিনীর সোনার নাকফুল যেন আগুনের ফুলকির চেহারা নিয়ে জ্বলতে থাকে।

ঘরের বাইরে এসে ভয়ানক উন্মত্ত আক্রোশের স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে সুখলাল—আগুন লাগাও, আগুন লাগাও।

কিন্তু আগুন লাগিয়ে ঘরটাকে পুড়িয়ে দিতে পারে না সুখলাল। দারুচটির লোকজন ছুটে এসে বাধা দেয়। সুখলালকে সবাই মিলে জোর করে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দাওয়ার ওপর বসিয়ে দেয়। ঠেলে ঠেলে জগদীশকে ঘরের বাইরে বের করে দিতেও দেরি করে না। মারামারি কাটাকাটির একটা কাণ্ড আবার না বেধে যায়, তাই ঘরের ভিতরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মোহিনীর হাত থেকে টাঙিটাকে কে যেন কেড়ে নেয়। হ্যাঁ, রহস্যটা সবার আগে বুঝতে পেরে আর মুখ টিপে-টিপে হেসেছে যে বিভূতি মিশির, সে-ই মোহিনীর হাতের টাঙিটাকে নিয়েছে। তারপর কী হল বা না হল কেউ দেখতে পায়নি। বৃষ্টি শুরু হতে সবাই যে-যার ঘরের দিকে দৌড় দিয়েছে। আর রাত শেষ হবার পর ভোরের আলোতে সবার আগে দেখতে পেয়েছে বিভূতি মিশির, হেঁটে হেঁটে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে জগদীশ আর মোহিনী। মোহিনীর হাতে ছোট একটা বাক্স ঝুলছে, বোধহয় গয়নার বাক্স। রাঁচি যাবার যাত্রী নেবার জন্য ওই যে প্রথম মোটরবাস ছুটে সড়কের ওপর থেমেছে আর গর্ গর্ করে শব্দ ছাড়ছে, সেই মোটরবাস ধরবার জন্যেই কি ওরা দুজন হন্ হন্ করে হেঁটে চলে যাচ্ছে?

সকাল হতেই দারুচটির সবাই জানতে পারে, জগদীশ আর মোহিনী পালিয়েছে। আর সুখলালও ঘরে নেই। কোথায় গেল সুখলাল?

এই তো, মাত্র ঘণ্টা দুই আগে একজন কাঠুরিয়ার মুখ থেকে খবর শুনতে পেরেছে দারুচটির লোকেরা, তিনপাহাড়ীর বুড়ো বটগাছে একটা লাস ঝুলছে। তবে কি ওটা সুখলালের লাস! আত্মহত্যা করল নাকি সুখলাল?

তাই দারুচটির লোকজন ছুটে এসেছে। আর দেখতে পেয়েই হায়-হায় করে চেঁচিয়ে উঠেছে। সত্যিই তো, সুখলালেরই লাস ঝুলছে।

বুড়ো বটের বিরাট চেহারাটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে রামতনু। সত্যিই তো মনে হচ্ছে বুড়ো বট যেন বিরাট এক ব্যক্তি, চুপ করে এই শোরগোলর ভাষা শুনছে। রামতনুর কাছে এসে বুড়ো বলবন্ত রায় জিজ্ঞাসা করে—কী দেখছেন তসীলদারজী? এখন, বলুন, আমার এই বুড়ো বট প্রতিশোধ নিতে পেরেছে কি না?

রামতনু—পেরেছে।

একজন দ্বিতীয় জনমেজয়

এই সেই ভয়ানক বিখ্যাত জঙ্গল, যার নাম দানুয়া-ভালুয়া। হাজারিবাগ জেলার উত্তরে সীমা ছাড়িয়ে গয়া জেলার দক্ষিণের চার-পাঁচটে মৌজার সব ঠাঁই জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এই জঙ্গল। শাল সেগুন গাম্ভার ও গয়সার, মাঝে-মাঝে মস্ত ঢ্যাঙা এক-একটা পাকুড় আর দেওদার; এই দানুয়া-ভালুয়ার যত গাছের ছায়ার মধ্যেও যেন একটা ছমছমে ভয়ের আবেশ আছে। অনেকদিন আগে গল্প শুনেছিল রামতনু, দানুয়া-ভালুয়া জঙ্গলের কোথাও জলস্রোতের এমন কোন নালা নেই, যার কিনারাতে কাদা কিংবা বালুর ওপর বাঘের পায়ের দাগ গিজ গিজ করে না।

এ হেন এক জঙ্গলের ভিতরে যে মৌজাটা, ঠাকুর সাহেবদের এস্টেটের বড় রকম আয়ের একটা সম্পত্তি, সেটার নাম সিমারিয়া। এস্টেটের ম্যানেজার ত্রিভুবনবাবুর কাছ থেকে হুকুমের চিঠি আসতেই আর দেরি করেনি রামতনু, সেই ছোকরা তসীলদার রামতনু। সিমারিয়া মৌজার কিষাণদের অবস্থা এ-বছর বেশ ভাল হয়েছে, বেশ ভাল ফসল পেয়েছে ওরা, সুতরাং বেশ ভাল করে খাজনা তসীল করতে হবে।

দানুয়া-ভালুয়া জঙ্গলের ভয়াল পরিচয় রামতনুর কাছে মোটেই ভয়াল নয়। বদলির হুকুমের চিঠি পেয়ে বরং একটু খুশিই হয়েছিল রামতনু। কিন্তু সিমারিয়া তসীল কাছারির ছোট ঘরে এসে ঠাঁই নেবার পর প্রথম রাত্রিতেই ঘুমোতে না পেরে ছটফট করতে হয়েছে। যাত্রীবাহী রাঁচি গয়া মোটরবাস আর মালবাহী মোটরলরির ছুটন্ত হর্ষের আওয়াজ কানে আসছে। কারণ, বড় সড়কটা বেশী দূরে নয়। তার ওপর, সিমারিয়ার চেহারাটা একটুও জংলী নয়, যদিও নিদারুণ একটা জঙ্গলরাজ্যের মধ্যেই তার ঠাঁই। তিন সিন্ধী কারবারী এখানে থেকে ফেলস্পার আর কেওলিন চালান দেবার কাজ করে। তাদের হাতীর গলার ঘণ্টা সব সময় ঢং ঢং করে বাজছে। গয়ার বাজারের দুই মহাজনের আড়ত আছে এখানে, সিমারিয়ার সব মটর ছোলা আর অড়হর এই আড়তের মারফৎ গয়াতে চালান যায়। দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছে রামতনু, এখানে একটি মাটির বাড়িতে এক বাঙালী দম্পতি থাকেন। আরও অস্বস্তির ব্যাপার, স্বামী ভদ্রলোক এসে নেমন্তন্ন করে গেলেন—কাল সকালবেলা আমার ওখানে গিয়ে একটু চা আর এই সামান্য কিছু বাঙালী-খাবার খেয়ে আসবেন। তাছাড়া, খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধে হলে আমাকে বলবেন। আমি আমার যথাসাধ্যি সাহায্য করব। বাঙালীকে বাঙালী না রাখলে কে রাখবে, কথাটা তো মিথ্যে নয়। হ্যাঁ কি না, বলুন?

নেমন্তন্ন করে চলে যাবার সময় ভদ্রলোক তাঁর নাম-ধাম ও কাজের পরিচয় সংক্ষেপে শুনিয়ে দিয়ে গেলেন—আমি এখানে পুরো এক বছর ধরে কাজ করছি। আমার নিজের ব্যবসার কাজ। জঙ্গলের নানা জায়গা থেকে নানা রকমের ড্রাগ, নানা রকমের ওষুধের গাছ-গাছড়ার শিকড় পাতা ফুল ছাল সবই যোগাড় করি, আর কলকাতাতে চালান দিই। কাজে কষ্ট আছে বটে, তবে ইয়েটা, মানে লাভটা মন্দ নয়। একমণ কন্টিকারী যোগাড় করতে চার-আনা খরচ হয়, আর বিক্রী করে পাই তিন টাকা। হ্যাঁ, আমার নাম মধুসূদন ঘোষ, কুষ্ঠিয়ার শ্যামনগরের ঘোষ। আর একটা কথা, তুমি যখন বয়সে আমার চেয়ে যথেষ্ট ছোট, তখন আমি নিশ্চয় তোমার মধুদা। তাই না?

মধুদার কথাগুলি শুনতে খুব খারাপ না লাগলেও তেমন-কিছু উৎফুল্ল হয় না রামতনু। কিন্তু সকালবেলা মধুদার বাড়িতে চা খেতে এসেই রামতনুর মনটা অপ্রসন্ন হয়ে যায়। যাঁকে দেখে রামতনুর দুই চোখের দৃষ্টিতে একটা অস্বস্তিকর সন্দেহের ছায়া নিবিড় হয়ে ওঠে তিনি একজন সন্ন্যাসী। গলাতে সোনার চেনের সঙ্গে একটা রুদ্রাক্ষ ঝুলছে, গেরুয়া বসনের বেশ পরিপাটি সাজ, মাথায় চারটে বড়-বড় জটের বাবরী, পায়ে হরিণ-ছালের চটি; সন্ন্যাসী মানুষটা রামতনুর

মুখের দিকে তাকিয়ে যে-ভাবে হাসেন, সেই ভাবটা রামতনুর দুই চোখের সন্দেহ আরও ঘনিয়ে তোলে। রামতনুকে দেখে বেশ বিরক্ত হয়েছেন, তবু হাসতে চেষ্টা করছেন সন্ন্যাসী, যাঁর নামটাকেও বেশ চটুল ভাষায় একটা কারসাজি বলে সন্দেহ করতে হয়। সন্ন্যাসীর নাম, হাসু ঠাকুর।

কেন? এ রকমের একটা অদ্ভুত নাম কেন?

রামতনুর প্রশ্নের কথা শুনে হেসে উঠলেন সন্ন্যাসী—বাবু মশাই গো, আমি হলাম একজন সদাহাস্য মানুষ। তার মানে, সব সময় হাসি। দেখতেই তো পাচ্ছেন।

মধুদা বললেন, ঠাকুরের মুখে সব সময় হাসি, তিনি ভয়ের কথা, দুঃখের কথা, মরণ-মারণের কথা, দুর্ভিক্ষ বন্যা ভূমিকম্পের কথা শুনলেও হাসেন।

রামতনু—কেন?

মধুদা—সেটা ঠাকুরই জানেন।

এইবার ঠাকুর অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হাসতে থাকেন, খুব লজ্জিত ও খুব বিনম্র হাসি।

মধুদার স্ত্রী বলেন—আর একটা কথা শুনলে আপনি চমকে উঠবেন কিন্তু বুঝতে পারবেন, হাসু ঠাকুর সামান্য ঠাকুর নন। ঠাকুর একদিন ওই জবা গাছটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, কিন্তু হাসেন নি। এর পর কী হয়েছিল, শুনবেন কি?

—হ্যাঁ।

—জবা গাছে সে মাসে একটিও ফুল ফোটে নি।

সন্ন্যাসী হাসু ঠাকুর আরও লজ্জিত হয়ে হাসেন—কী যে বলে মনোরমা? শুনে সত্যিই আমার বেশ লজ্জা করছে।

মনোরমা বলে—আচ্ছা, আমার ছোড়দার সঙ্গে এক-কলেজে পড়তেন একজন রামতনু। আপনি কি সেই...

রামতনু—আপনার ছোড়দার নাম?

মনোরমা—সুমন্ত দত্ত।

রামতনু—হ্যাঁ সুমন্ত আর আমি এক-কলেজে পড়তাম।

মনোরমা উৎফুল্ল হয়ে হাসে—বাঃ, তবে তো আপনিও আমার দাদা।

সন্ন্যাসী হাসু ঠাকুরের মুখের হাসি হঠাৎ যেন একটু মিইয়ে যায়—আহা, তুমি সেজন্য এত দুঃখ করছ কেন মনোরমা? উনি বাইরে থেকে এসেছেন, বাইরেই থাকবেন। বার বার এখানে এসে তোমার ঝঞ্ঝাট বাড়াবেন না। তোমার দাদা হবার জন্য রামতনুবাবুর কোন গরজ নেই।

মধুদা বলেন—ঠাকুরকে কত অনুরোধ করছি, যাবেন না, যাবেন না, এখানে থাকুন, চিরকাল থাকুন। কিন্তু ঠাকুর বলছেন, না, আর বেশীদিন এখানে তিনি থাকবেন না। দিন বুঝে সর্পযজ্ঞটা সেরে দিয়েই চলে যাবেন।

রামতনুর দুই চোখে এইবার বেশ শক্ত একটা ভ্রূকুটি ফুটে ওঠে—সর্পযজ্ঞ মানে কী?

হাসু ঠাকুর চেঁচিয়ে হাসেন—জনমেজয় যেমন সব সাপ ধ্বংস করেছিল, আমিও তেমনই এই বাড়িটির সাপের ভয় একেবারে ধ্বংস করে দিয়ে তারপর চলে যাব।

ঠিক কথা, সাপের ভয় এই বাড়িটার শান্তি ও স্বস্তির পক্ষে একটা অভিশাপ। মধুদা বললেন—পৃথিবীতে যে এত রকমের সাপ আছে, এটা আমার জানা ছিল না। দিনরাত সব সময় অদ্ভুত রকমের নানা জাতের সাপ বাড়ির চারদিকে ঘুরে বেড়াত। ঠাকুর আসবার পর তিনবার তিনটে ছোট যজ্ঞ করে অনেক সাপ তাড়িয়েছেন। কিন্তু এখনও অনেক সাপ আছে। বিপদের ভয় কাটেনি। সবচেয়ে বড় ভয় এই যে, একটা অদ্ভুত রকমের চেহারার গোখরো সাপ প্রায়ই বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে, খাটের তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে। মেঝের ওপর শীতলপাটি পাতা থাকলে, সাপটা এসে তার ওপর শরীর এলিয়ে দেয়। চেঁচালে সরে যায় না, লাঠি ঠুকলেও

নড়ে না। এ এক ভয়ানক দুঃসাহসী সাপ। ওর গায়ের ওপর গরম জল ছিটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সাহস হয় না। মনোরমার ভয় সবচেয়ে বেশি। সাপটাকে দেখলেই মনোরমা যেন কাঠ হয়ে যায়। মাঝে-মাঝে সাপটাকে দিন পাঁচ-সাত দেখতে না পেয়ে ভাবে, আর বুঝি আসবে না। কিন্তু বৃথা আশা। সাপটা ঠিক আবার এসে ঘরের ভিতরে ঢুকবে।

মনোরমা বলে—ব্রতকথার গল্পে পড়েছি, এক ছোট বউয়ের আট ভাই ছিল—ঢোঁড়া, বোড়া, চিতি, আর পুঁয়ে, খুরসে, চেতুয়া, কেলে আর হেলে। কিন্তু গল্প শুনে তো একটুও ভয় পাইনি। মনে হত, সত্যিই তো ছোট বউয়ের কত মজার-মজার আটটি সাপ ভাই। কিন্তু এখানে আসবার পর ভয়ে-ভয়ে সব সময় প্রাণটা যেন থর থর করছে। দেখলাম, ছোট বউয়ের আট ভাই নয়, বিশ-পঁচিশ রকমের ভাই এই বাড়ির চারদিকের জায়গাতে আনাগোনা করছে। এর মধ্যে সব চেয়ে ভয়ানক হল...

মধুদা—হ্যাঁ, এই গোখরোটা। লোকে বলে, এটা হল একটা সন্ন্যেসী গোখরো। ওটার বয়স নাকি একশো বছর। সিমারিয়ার এক বুড়ো মাহাতো নাকি ছেলেবেলাতে এই সন্ন্যেসী গোখরোটাকে দেখেছিল। তবেই বুঝুন, বয়সের হিসাবে কত বুড়ো হয়েছে গোখরোটা। একদিন আপনিও দেখুন, তবেই বুঝবেন, ঠাকুর ছাড়া আমাদের জীবনের নির্ভাবনার কোন উপায়ই নেই। ওই সন্ন্যেসী গোখরোর একটি ছোবল খেলে সিন্ধী বাবুদের পোষা হাতিটাও এক মিনিটে মরে যাবে।

দুই

মধুদা আর মনোরমা যে বাড়িতে থাকেন, সেটা আজ সামান্য সাধারণ একটা মাটির বাড়ি বটে, কিন্তু অতীতে একদিন ওখানেই এক রাজপুত জমিদারের বিরাট বাড়ি ছিল। সে বাড়ির শেষ চিহ্ন কবেই ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছে, শুধু থেকে গিয়েছে কাঁচা ইঁটের বড় বড় কয়েকটা স্তূপ। সিপাহীদের সেই মিউটিনির দিনে সিমারিয়ার জমিদার কিশোর সিং-ও বিদ্রোহী হয়ে চৌপারন বাজারে ইংরেজের এক মিলিটারী চৌকির কাপ্তেন সাহেবকে গুলি করে মেরেছিলেন। তারপর একদিন প্রতিশোধ তুলতে আর একজন ইংরেজ কাপ্তেন সদলবলে এসে সিমারিয়ার কিশোর সিং ও তাঁর ছয় ভাইকে এবং দুই বুড়ো খুড়োকে যে বটগাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসির শাস্তি দিয়েছিল, সেই বট আজও আছে। জটার ঝুরিতে ভরা সেই বুড়ো বটের ছায়া আর ইংরেজের তোপ গর্জন করে কিশোর সিংয়ের যে বাড়িটাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, তার পচা-গলা কাঁচা ইঁটের ঢিবিগুলি নাকি সন্ন্যেসী গোখরোটার সবচেয়ে পছন্দের আশ্রয়। কেউ এখানে এসে ঘণ্টা তিন-চার অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবে, গোখরোটা হঠাৎ কোথা থেকে এসে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন একটা ঠাণ্ডা সুখের বুকের উপর গড়াচ্ছে।

তিন গাঁয়ের তসীল সেরে নিয়ে সিমারিয়ার কাছারিবাড়িতে ফিরে আসবার সময় একদিন ঘোড়া থামিয়ে বুড়ো বটের কাছে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতেই দেখতে পেল রামতনু, সত্যিই অদ্ভুত চেহারার একটা গোখরো। মাথার দু'পাশের আঁস ফেঁপে উঠেছে। দেখে মনে হয় যেন দুটো শিং। গোখরোটার গলাতে খোঁচা-খোঁচা কাঁটার মত একসারি রোঁয়া। ছবি তুললে ঠিক মনে হবে, যেন একটি ছোট জাতের ড্রাগন। কিন্তু শুধু এই একটা ড্রাগন ধরনের চেহারাওয়ালা গোখরোর নাম কি সন্ন্যেসী গোখরো? না, এটা গোখরোর একটা জাতের নাম? এরকম চেহারার গোখরো কী এখানে আর নেই? সত্যিই, কী চমৎকার চেহারার গোখরো!

বুড়ো মাহাতো বলেছে—কে জানে, ঠিক মনে পড়ছে না, ঠিক এই রকম চেহারার দ্বিতীয় কোন গোখরো কখনও চোখে পড়েছে কি না।

সিন্ধী বাবুরা বলেন—এই রকম লালচে রংয়ের গোখরো সাপ আমাদের দেশে দেখা যায়। আমাদের দেশেও এই জাতের গোখরো সাপের নাম সন্ন্যাসী সাপ।

বুড়ো মাহাতো বলেছেঃ যা-ই বলুন, আমি বিশ্বাস করি, এই সন্ন্যাসী গোখরো হল সেই সেদিনের সাপ, সে আজও বেঁচে থেকে মিউটিনির দলপতি ও ইংরেজের দুশমন সেই কিশোর সিংয়ের ভিটে পাহারা দিচ্ছে। এরকম সাপকে আমরা বলি ঘরবাবা, বাঙালী লোক বোলতা হ্যায়, বাস্তুবাবা।

হাসু ঠাকুর একদিন খুব রাগ করে হাসতে ভুলে গিয়ে আর চোখ পাকিয়ে মনোরমাকে শাসিয়ে দিলেন—খবরদার, সাপটাকে কখনও বাবা-টাবা বলে মনে করবে না। যাকে দেখে এত ভয় পাও, তাকে আবার বাবা বলা কেন? হ্যাঁ, রাত-বেরাতে যদি গোখরোটার কথা ভেবে কিংবা গোখরোটাকে দেখতে পেয়ে ভয় পাও, তবে তখুনি আমার ঘরে চলে আসবে। আমি তোমাকে সেই মুহূর্তে এক মন্তরের জোরে নির্ভয় করে দেব।

মধুবাবু বলেছেন, ঠিক কথা, ঠিক কথা। ঠাকুর থাকতে আমার-তোমার কারও ভয় নেই, মনোরমা।

আরও দু-চার বার মধুদার এই বাড়িতে এসে চা খেতে হয়েছে। শুনতে বেশ ভালই লাগে, মনোরমার কথাবার্তার মধ্যে চমৎকার একটা অকপট মনের রূপ এবং ভাব আছে। মনোরমা বলে—সত্যি বলছি রামতনুদা, আমাদের ঠাকুরের কাছে গিয়ে একবার বসলেই নির্ভয় হয়ে যাব, কোন ভুল নেই। তবু, সন্ন্যেসী গোখরোটা যখন ঘরে ঢোকে তখন ভয় পেয়ে আপনার দাদার হাতটাকেই জাপ্‌টে ধরি। দৌড়ে গিয়ে ঠাকুরের ঘরে ঢুকতে পারি না। বেশ লজ্জা করে। ইচ্ছেও করে না। মরি তো স্বামীর হাত ধরেই মরব। ঠিক কি না, রামতনুদা?

মধুদা বলেন—ঠিক, সবই ঠিক তবে ঠাকুরের চেয়ে বড় কে এমন আছেন যে, তোমাকে সব বিপদের ভয় থেকে রক্ষা করতে পারেন?

পাশের ঘরের ভিতর থেকে উঠে এসে কাশতে আর হাসতে থাকেন হাসু ঠাকুর। এর পর আমার আর কিছু বলবার নেই।...কিন্তু এই বাবুমশাইয়ের কাছে এসব কথা না বললেই ভাল হয়।

রামতনু—আপনি এখানে আসবার আগে কোথায় ছিলেন?

হাসু ঠাকুর—সন্ন্যেসী মানুষের পূর্ব আশ্রমের কোন কথা জিজ্ঞেসা করতে নেই। সে অধিকার আপনার নেই। আমি বরং জিজ্ঞেসা করতে পারি, আপনি এখানে আর কতদিন থাকবেন?

রামতনু—কোন ঠিক নেই।

—তাহলে তো ...তাহলে তো বলতে হয়...

শেষ পর্যন্ত কিছুই বললেন না হাসু ঠাকুর। কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

মনোরমা বলে—আর দেরি নেই, ঠাকুর শিগগিরই যজ্ঞ করে ভয়ানক গোখরোটাকে মেরে ফেলবেন।

মধুবাবু—হ্যাঁ, ঠাকুর বলছেন, তার আগে বাড়ির চারদিকে কার্বলিক অ্যাসিড ছড়াতে হবে। তারপর চৌপারণ বাজারের সাপুড়েদের কাছ থেকে একজোড়া বেজী কিনে আনতে হবে। ঠাকুর একবার দেখে নেবেন, কার্বলিক অ্যাসিড আর বেজী কতদূর কী করতে পারে। তারপর তাঁর হাতের শেষ মার, সর্পযজ্ঞ।

রামতনুর কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে ফিস-ফিস করেন মধুবাবু—ঠাকুর একটা কথা বলেছেন, তিনিই হলেন সেই জনমেজয়, আবার জন্মেছেন, মানুষের জীবন থেকে সাপের ভয় দূর করবার জন্য।

কলেজবন্ধু সুমন্তকে মনে পড়ে। কী সুন্দর দেখতে! সুমন্তর বোন এই মনোরমাও দেখতে খুবই সুন্দর। দেখে একটু আশ্চর্যই হয়েছে রামতনু, মধুদার কারবারের কাজে সাহায্য করতে গিয়ে কী খাটনিই না খাটছে এই অল্পবয়সের মেয়েটা, মনোরমা। চাকর বলতে কেউ নেই, ওষুধের গাছ-গাছড়ার যোগাড়ীদের কাছ থেকে হিসেব করে আর ওজন করে সব যোগাড় বুঝে

নেবার কাজ, দাম দিয়ে সবাইকে বিদেয় করা, আর রান্নার উনুন নিবিয়ে দিয়েই আবার গাছ-গাছড়াগুলিকে চিনে-চিনে ছালার মধ্যে ভরে ফেলা, সব কাজ এই মনোরমাকেই করতে হয়। মধুদা শুধু ছালার গায়ে কাগজ সেটে শিকড়-বাকড়ের পরিচয় লিখে দেন। বাসক কন্টিকারী কুকসিমে আর কুকুরশোঁকা। হাতীশুঁড়ো খলখলে কালকাসুন্দে আর বেণার মূল। সোনামুখী বনজিরা আর পাতালগরুড়ী। মাহাতোর একটি ছেলে এইসব মাল গো-গাড়িতে চড়িয়ে মাসের মধ্যে একটি দিনে একটানা কোডারমা রেলস্টেশনে গিয়ে কলকাতার ঠিকানায় সব চালান করিয়ে দেয়।

মধুদা বলেন—কী আর করব বল, ভাই। ইংরেজী লেখাপড়া শিখিনি, বাপের পেশা কবরেজীও শিখিনি। শুধু কিছু গাছ-গাছড়া চিনতে শিখেছি। তাই সাপের বাঘের আর ভালুকের ভয় সহ্য করে এখানে পড়ে আছি। কিন্তু জানি না আর কতদিন সহ্য করে টিকে থাকতে পারব, ঠাকুর যদি দয়া না করেন।

রামতনু—তার মানে, সর্পযজ্ঞ করে সন্ন্যাসী গোখরোটাকে না মারেন?

—হ্যাঁ। এই হাসুঠাকুর, বলতে গেলে একটা মস্তবড় আশীর্বাদের মত আমাদের ভাগ্যের ঘরে এসে ঠাঁই নিয়েছেন। কোথা থেকে হঠাৎ একদিন এসে, এই বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন, ভয় নেই, আমি এসেছি। মনোরমা জিজ্ঞাসা করেছিল—কিসের ভয়ের কথা বলছেন? হাসু ঠাকুর বলেছিলেন—সাপের ভয়।

মধুদা বলেন—আমাদের এই সাপের ভয়ের কথা তিনি যে কী ক'রে বুঝলেন, সেটা আমার কাছে একটা আশ্চর্য রহস্য। আমার মনে হয়েছে, হাসু ঠাকুর সত্যিই একজন অন্তর্যামী ঠাকুর। সিঙ্ঘীবাবুরা অবশ্য একদিন একটা বাজে কথা বলেছিলেন।

রামতনু—কীরকম বাজে কথা?

—হাসু ঠাকুর নাকি চৌপারণ বাজারে একদিন সিঙ্ঘীবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এক বাঙালীবাবু সস্ত্রীক এই জঙ্গলের ভিতরে কোথায় কোন্ গাঁয়ে থাকেন বলতে পারেন?

রামতনু—সিঙ্ঘীবাবু নিশ্চয় জবাব দিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ। সিঙ্ঘীবাবুর যে-কথাটা আমি সবচেয়ে অবিশ্বাস করি, সেটা খুবই বিশ্রী একটা কথা। হাসু ঠাকুর নাকি জিজ্ঞেসা করেছিলেন, বাঙালীবাবুর স্ত্রী দেখতে কেমন? বয়স কত? সে বাড়িতে কিসের ভয় আছে?

মনোরমা—ভয়? এ কী সামান্য ভয়! সহ্য করতে গিয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কী আর করি বলুন? এই মানুষটাকে এখানে একা ফেলে রেখে বাপের বাড়ি চলে যেতে তো পারি না। ভদ্রলোককে কে তাহলে ডাল-ভাত আর একটু ঝিঙ্গে-চচ্চড়ি তৈরী করে খাওয়াবে বলুন? কিন্তু আমার এসব কথা জানিয়ে দিয়ে আপনি ছোড়দাকে একটা চিঠি লিখে ফেলবেন না, রামতনুদা।

রামতনু—সর্পযজ্ঞ তাহলে সত্যিই হবে?

মধুদা—হ্যাঁ, অবশ্যই হবে। দেড় সের খাঁটি ঘি এনে রেখেছি। এক সের বেল-কাঠ যোগাড় করেছি। ব্যস্, ঠাকুর বলেছেন, ওতেই হবে, ওতেই হবে। ছোট যজ্ঞ করতে লেগেছিল আধ সের ঘি, বড় যজ্ঞ করতে এক সের। এই তো পার্থক্য।

তিন

কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে দেবার পর সাপেরা সত্যিই কোথায় যেন পালিয়ে গেল। ছোট-বউয়ের বিশ-পঁচিশ রকমের ভাইয়ের কাউকেই দেখা গেল না। কিন্তু সন্ন্যেসী গোখরো তার ড্রাগন-ড্রাগন চেহারা নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়। যেমন ঘরের বাইরে, তেমনই ঘরের ভিতরে দুপুর বেলা উঠোনের এক কোণে বসে এঁটো বাসন মাজতে মাজতে হঠাৎ একেবারে

স্তব্ধ হয়ে যায় মনোরমা। সন্ন্যেসী গোখরো মনোরমার পায়ের কাছে এসে যেন একটা আহ্লাদের স্বাদে বিলোল হয়ে লতিয়ে পড়েছে। ফণা তুলে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। হঠাৎ যেন চমকে উঠল ফণাটাই। দেখতে পেয়েছে সন্ন্যেসী গোখরো, সামনের নেড়া জমিটার ধুলোর ওপর মারামারি করছে দুটো চড়ুই। চড়ুই দুটোর দিকে ছুটে চলে গেল সন্ন্যেসী গোখরো। সত্যিই কী অদ্ভুত রং এই সাপটার। ইঁটের গুঁড়োর মত লালচে গৈরিক রং।

ভয় ভেঙে যাবার পর হেসে ফেলেছিল মনোরমা।—শুনছ? সাপটাকে সত্যিই যে একটি সন্ন্যেসী বলে মনে হচ্ছে।

পরের দিনই চৌপারণ বাজারের সাপুড়েদের কাছ থেকে একটা বেজী কিনে নিয়ে আসে বুড়ো মাহাতোর বড় ছেলে—এই লিন আপনার বেজী, এখনই দুধ খেতে দিন। নয় তো দু'চারটে মুরগি-বাচ্চা খেতে দিন।

সাতদিন পরেই লোক পাঠিয়ে খবর দিল মনোরমা। একবার এসে দেখে যান, রামতনুদা।

সব দেখে আর শুনে বুঝতে পারে রামতনু, বেজী সত্যিই কাজ করছে। ছোট বড় নানা জাতের সাপের কাটা-ছেঁড়া ধড় বাড়ির বাইরে আশেপাশে অনেক দেখতে পাওয়া গিয়েছে। আর, সন্ন্যেসী গোখরোও তার ভবলীলা সাঙ্গ করেছে।

রামতনু—সর্পযজ্ঞ হয়ে গিয়েছে নাকি?

মধুদা আর মনোরমা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে—হ্যাঁ।

—কবে?

—এই তো আজ। আজই সকালে ঠাকুর ঘি পুড়িয়ে সর্পযজ্ঞ করেছেন, মনে মনে একলক্ষ মন্তর জপেছেন, আর, আজই দুপুরে সন্ন্যেসী গোখরোটা মারা পড়েছে। সর্পযজ্ঞ সার্থক হয়েছে।

দেখতে পায় রামতনু, ঠিকই, সন্ন্যেসী গোখরোর সেই ড্রাগন-ড্রাগন চেহারাটা রক্তমাখা হয়ে নেড়া জমিটার ওপর পড়ে রয়েছে। একটা শকুন উড়ে এসে মরা গোখরোটার দশ হাত দূরে বসেছে।

রামতনু—যাক্, এবার তাহলে আপনাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ভয়টা সরে গেল।

মধুদা—ঠিক ঠিক। আঃ ভাবতে কী যে স্বস্তি বোধ করছি, কী বলব।

মনোরমা—এবার সত্যিই একেবারে নির্ভয় হয়ে গেলাম, রামতনুদা।

মধুদা—এবার আমি মাঝে-মাঝে মনোরমাকে একা রেখে দিয়ে হাটবাজারে যেতে, কিংবা ইচ্ছে হয়তো, একটা দিন-রাত কোডারমা'র হোটেলে কাটিয়ে দিয়ে আসতে পারি। জঙ্গল আর ভাল লাগে না রে, ভাই।

রামতনু—আপনাদের ঠাকুর কি আজই চলে যাবেন?

মধুদা—না না, তাঁর যেদিন ইচ্ছে হবে সেদিন যাবেন। তিনি থাকলেই তো ভাল। মনোরমাকে তাহলে আর একা থাকতে হবে না। সাপের ভয় না থাকুক, হায়েনার ভয় তো আছে।

রামতনু—আমার কথা শুনুন, মধুদা। মনোরমাকে একা রেখে একটি দিনের জন্যও দূরে কোথাও যাবেন না। আপনাদের ঠাকুর চলে যাক, তারপর আপনি একদিন কোডারমার একটা নোংরা হোটেলের চপ-কাটলেট যত খুশি খেয়ে আসবেন।

মধুদা আশ্চর্য হয়ে বলেন—এ আমার কেমনতর কথা হল, ভাই?

আর কোন কথা না বলে চলে গেল রামতনু।

একটা প্রশ্ন যেন রামতনুর মনটাকে কষ্ট দিয়ে কথা বলছে। বেচারা সন্ন্যেসী গোখরোটার জীবনটার এরকম একটা রক্ত-মাখা অন্তিম কি সত্যি সত্যি মধুদা আর মনোরমার জীবনের ভয় আর দুর্ভাবনার অন্তিম?

চার

সারা রাত ধরে বৃষ্টি হয়ে শেষ রাতের দিকে থেমে গেল। শুধু গাছের পাতা থেকে ঝরে পড়া ফোঁটা-ফোঁটা জলের শব্দও ফুরিয়ে গিয়েছে।

পুবের আকাশে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। আর কোন শব্দ নেই। ভোর হতে আর তো দেরি নেই!

ভয়ানক দানুয়া-ভালুয়া জঙ্গলের সব সাড়া-শব্দ বৃষ্টিতে ভিজে যেন চুপসে গিয়েছে। হঠাৎ একটা ভীত প্রাণের আর্তস্বর শেষরাতের সেই স্তব্ধতার বুকটাকে যেন শিউরে দিয়ে বেজে উঠল। যেমন করুণ, তেমনই তীব্র একটা চিৎকার। মেয়েলি গলার চিৎকার।---কী সর্বনাশ, কী সর্বনাশ! সাবধান সাবধান !

প্রথম জেগে উঠলেন সিন্ধীবাবুরা। তাঁরাই ডাক দিয়ে বলেন—শুনছেন তসীলদারবাবু? মধুবাবুর স্ত্রী ভয় পেয়ে চিৎকার করছেন।

সিন্ধীবাবু দুজন আর রামতনু উদ্বিগ্ন হয়ে আর দৌড় দিয়ে মধুবাবুর বাড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। মধুবাবুর সেই বাড়ির সেই বদ্ধ ঘরের জানালাটাকে ভেঙে দিল সিন্ধীবাবুদের হাতের লাঠির চারটে আঘাত, যে ঘরে মনোরমা থাকে। ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখতে পায় রামতনু, টিম টিম করে একটা তেলের পিদিম জ্বলছে। বিছানার ওপর বসে থর থর করে কাঁপছে মনোরমা। আর, যেন একটা বিভীষিকার দিকে তাকিয়ে আছে।

ঘরের ভিতরে মেঝের ওপর এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছেন হাসু ঠাকুর, আর ভয়ানক ক্রুদ্ধ রুষ্ট ও বিরক্ত সেই সন্ন্যেসী গোখরো ফণা তুলে হাসু ঠাকুরকে থমকিয়ে রেখেছে। এক পা এদিক-ওদিকে নড়তে পারছেন না হাসু ঠাকুর। নড়লেই ফণা তুলে ছোবল দিতে চায় নিষ্ঠুর দৃষ্টি সেই সন্ন্যেসী গোখরো।

এ কী ব্যাপার? কোথা থেকে এল সেই সন্ন্যেসী গোখরো? সে তো ছিন্নভিন্ন হয়ে মরেই গিয়েছে! রামতনুর বিস্ময়ের ভাষা শুনে সিন্ধীবাবুরা বলেন—আরে ভাই, ওটা অন্য একটা সন্ন্যাসী সাপের মরা চেহারা আপনি দেখেছিলেন। ঘরবাবা এই সন্ন্যেসী গোখরোকে কেউ মারতে পারে নি। ও নিজে না মরলে কেউ ওকে মারতে পারবে বলে মনে হয় না।

হাসু ঠাকুর বিড় বিড় করে কথা বলেন—ওগো মশাইরা, আগে এই যমটাকে কোনমতে সরিয়ে নিয়ে যান আপনারা। তারপর আমার কথা শুনুন।

ড্রাগন-ড্রাগন চেহারার সন্ন্যেসী গোখরোও কী সুন্দর ভঙ্গীতে ফণা তুলেছে। সন্ন্যেসী গোখরোর গলার রোঁয়ার সরু লম্বা রেখাটা করাতের দাঁতের মত শক্ত হয়ে গিয়েছে। গোখরোর জিভটা যেন একটা আক্রোশের আনন্দে লিক লিক করে খেলছে। হাসু ঠাকুরের দুই হাঁটুতে সেই জিভের ছোঁয়া না লাগলেও দুই হাঁটু কাঁপছে। দৃশ্য দেখে রামতনুর প্রাণটাও বোধহয় একটা আক্রোশের সার্থক আনন্দে উতলা হয়ে উঠেছে।

রামতনু—কী ব্যাপার? কী হয়েছে মনোরমা? কেন ভয় পেয়েছ?

মনোরমা কেঁদে ফেলে।--- দেখতেই তো পাচ্ছেন।

রামতনু--কে? এই সন্ন্যেসী গোখরোটা?

মনোরমা--না দাদা, ওই উনি। উনি কেন ঘরের বন্ধ দরজা ভেঙে আমার ঘরে ঢুকলেন?

রামতনু--কে? ওই হাসু ঠাকুর?

মনোরমা—হ্যাঁ। আপনার দাদা কোডারমা গিয়েছেন। কাল কিংবা পরশু ফিরবেন। কিন্তু উনি, যিনি একজন সন্ন্যেসী মানুষ তিনি বার-বার আমাকে বিশ্রী কথা বলেছেন---রাত্রিবেলা তোমার ঘরের দরজা খোলা রাখবে, মনোরমা। আচ্ছা বলুনতো দাদা কেন দরজা খোলা রাখব?

মাঝরাতে যখন বৃষ্টির শব্দে জঙ্গলের রাতটা ঝিম-ঝিম করছে তখন একটা শাবল দিয়ে মনোরমার বদ্ধ ঘরের কপাটটাকে ভেঙে ফেলেছেন হাসু ঠাকুর। ঘুমন্ত মনোরমার কানে সেই

দস্যুতার কোন আওয়াজ পৌঁছয়নি। কিন্তু শেষরাতে হঠাৎ জেগে উঠেছে মনোরমা-- কী সর্বনাশ, কী সর্বনাশ! আপনি এই ঘরের ভিতরে কেন? কপাট ভাঙলেন কেন?

সাবধান, আর এক-পা এগিয়ে আসবেন না।

সেই মুহূর্তে দেখতে পেয়েছেন দ্বিতীয় জনমেজয় এই হাসু ঠাকুর, সন্ন্যেসী গোখরো মনোরমার খাটের তলা থেকে বের হয়েই ফণা তুলেছে। সাপ তো নয়, যেন সাক্ষাৎ যম। ভয় পেয়ে বমি করে ফেলেছেন হাসু ঠাকুর আর এক পাও এগতে পারেননি।

এইবার বাড়িতে ঢোকবার প্রথম দরজার কপাট ভেঙে দিয়ে সবাই মনোরমার ঘরের কাছে এসে দাঁড়ায়। দাঁতে দাঁতে ঘষে কথা বলে রামতনু।—সন্ন্যেসী গোখরোকে ধন্যবাদ, মনোরমাকে একটা গোখরো সন্ন্যাসীর বিষাক্ত কামড় থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু...

কী আশ্চর্য, রামতনু এগিয়ে এসে হাসু ঠাকুরের একটা হাত ধরতেই সন্ন্যেসী গোখরো তার ফণা নামিয়ে নিয়ে আস্তে-আস্তে চলে যায় ঘরের বাইরে, তারপর উঠানে, তারপর নেড়া জমিটি পার হয়ে, বুড়ো বটের ছায়ার পাশে পুরনো একটা উইঢিবির ভিতর ঢুকে পড়ে।

রামতনু—চলুন ঠাকুর মশাই, আমার কাছারিঘরের ভিতরে দুটো দিন বন্ধ হয়ে পড়ে থাকুন। তারপর মধুদা আসবার পর একটা হেস্তনেস্ত করা যাবে।

হাসু ঠাকুরের হাস্যহীন চেহারাটাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে কাছারিঘরের দাওয়ার ওপর উঠতেই হেস্তনেস্ত হয়ে গেল। চৌপারণ থানার দারোগার সঙ্গে হাওড়ার সদর থানার দুই এস-আই এসেছেন। হাসু ঠাকুরকে দেখেই দুই এস-আই বলে উঠলেন হ্যাঁ, এই তো সেই সাংঘাতিক পাপীটি! দুটি বলাৎকার, তিনটি ডাকাতি, আর চার-পাঁচটি জোচ্চুরির এক পাকা শয়তান এই লোকটাকেই আমরা তিন বছর ধরে খুঁজছি।

হরেন বাবুর হরিণী মেয়ে

বড় ছাড়োয়া ও ছোট ছাড়োয়া, দুই নামে পরিচিত এই দুই জঙ্গল দুই ভিন্ন জমিদারের সম্পত্তি হলেও আসলে একই চেহারা ও একই স্বভাবের যত শাল সেগুন ঘোড়ানিম ডুমুর আর কাঁটা শিরীষের সমাবেশ। পার্থক্য শুধু এই যে, বড় ছাড়োয়ার জঙ্গলে দিনের বেলাতেও অন্ধকার। ছোট ছাড়োয়ার জঙ্গলের ভিতরে ওরকম ঠাসা আর জমাট অন্ধকার নয়, বেশ হালকা রকমের ছায়া-ছায়া অন্ধকার ছড়িয়ে থাকে। বেলে পাথর, লাল কাঁকর আর সিলিকা বালুর যত খোঁড়াখুঁড়ি কারবার ছোট ছাড়োয়ারই ছায়াছায়া অন্ধকারের মধ্যে প্রায় একশো লক্কড় গো-গাড়ি নিয়ে আনাগোনা করে। এই সব লক্কড় গো-গাড়ির চাকার শব্দ যেন করুণ রকমের একটা ক্যাঁচকেঁচে আর্তনাদ হয়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত যাওয়া আসা করে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠবার অনেক আগেই ঠিকেদারের এই সব গো-গাড়ি জঙ্গলের ছায়া-ছায়া অন্ধকারের ছোঁয়াচ থেকে সরে গিয়ে একেবারে এই এখানে এসে পৌঁছে যায়। এই জায়গাটা ছোট ছাড়োয়ার চৌহদ্দির ভিতরে জংলী পরিবেশের একটা অংশ বটে, কিন্তু জায়গার চেহারাটা বেশ নিরীহ রকমের, যেমনটি সেকেলে মুনিঋষিদের তপোবনের চেহারা ছিল। বলাই বাহুল্য যে ছোট ছাড়োয়ার জঙ্গলের এই তপোবন রকমের অংশটার কোন ঠাঁইতে কোন মুনিঋষিকে দেখতে পাওয়া যাবে না। যাদের দেখতে পাওয়া যাবে তারা হল ঠিকেদারের গোমস্তা বাবুদের তিন ঘর পরিবারের মানুষ, এবং শুধু একটি কাছারী ঘর, বদলি হয়ে ঠাকুরসাহেবদের জমিদারীর তসীলদার রামতনু এসে এখন যেখানে ঠাঁই নিয়েছে।

ছোট ছাড়োয়ার অনেক জায়গায় জঙ্গলের যেসব উইধরা শালের ভিড় কেটে চেঁছে সরষের আবাদ করা হয়েছে, সেগুলি সবই ঠাকুরসাহেবদের সম্পত্তি। তসীলদার রামতনুকে শুধু ছোট ছাড়োয়ার দশটা জংলী ডিহির মান্‌ঝিদের কাছ থেকে খাজনা উসুল করবার কাজ নয়, সরষে খামারের সব কাজও দেখাশোনা করতে হয়। ঠিকেদারদের তিন গোমস্তা সারা সকাল দুপুর ও বিকেল এখানেই জঙ্গলের সরু সড়কের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে। নজর রাখেন, কোন লক্কড় গো-গাড়ি যেন মাল না দেখিয়ে আর চিট্ না নিয়ে চুপচাপ সরে পড়তে না পারে। সবাই সব সময় দুই কান সজাগ করে রাখেন, শুনতে চেষ্টা করেন, কোন গো-গাড়ির চাকার ক্যাঁচকেঁচে আর্তনাদ জোচ্চুরি করবার ফিকিরে হঠাৎ কাঠবিড়ালীর গলার শব্দের মত মিহি হয়ে যায় কিনা। সবারই মনে আছে, গত চৈতের কালবোশেখী ঝড়ের উথাল পাথাল শব্দের সুযোগ নিয়ে সিলিকা বালুতে ভর্তি করে তিরিশটা গো-গাড়ি তাদের চাকার শব্দ ঢাকা দিতে আর সরে পড়তে পেরেছিল।

তিন ঠিকাদারের তিন গোমস্তার মধ্যে দুই গোমস্তাই হল বাঙালী। সেনবাবু ও হরেনবাবু। তৃতীয়জন হলেন গোমস্তা বলদেববাবু, লাতেহারে যার তিন পুরুষের বাস। সব মাল এই লাতেহারের এক মিনারেল কোম্পানীর আড়তে গিয়ে জমা হয়।

দেখে খুশি হয়েছে রামতনু তিন গোমস্তাবাবুদের তিনটে ছোট ছোট কাঁচা বাড়ি তসীলকাছারীর ঠিক গা ঘেঁসে তিনটে অস্তিত্ব নয়। একটু দূরে দেড় বিঘে আদা ক্ষেতের শেষ বেড়া পার হয়ে ওই তিন কাঁচাবাড়ির আঙিনা থেকে মাঝে-মাঝে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ের হল্লার শব্দ কানে এলেও সেটা দুঃসহ কোন অস্বস্তি ঘটাবার মত ব্যাপার নয়। ছোট ছাড়োয়া জঙ্গলের ভিতরে এই চারঘর মনুষ্য বসতির নামও ছোট ছাড়োয়া। আরও দেখে খুশি হয়েছে রামতনু, এখানে তপোবনের মত হালকা চেহারার জঙ্গলটা সব সময় যেন সুগন্ধময় নিঃশ্বাস ছাড়ছে। এবং মুনিঋষি না থাকুক, জঙ্গলের ভিতরে দীর্ঘ ও ঋজু চেহারার যেসব ইউক্যালিপটাস ছড়িয়ে আছে

তারা যেন দীর্ঘকায় ও সাদা-ফর্সা চেহারার যত মুনি-ঋষি। নিতান্ত অল্প ও মৃদু বাতাসেরই তাড়নায় বেঁকে গিয়ে আর হেলেদুলে এক একটা বাঁশের ঝাড় তার প্রতিবেশী ইউক্যালিপটাসের গায়ের ওপর পড়ে যেভাবে পাতাগুলিকে রগড়ে দেয়, তাতেই ইউক্যালিপটাসের মিঠে সুগন্ধ যেন উথলে ওঠে আর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। প্রফেসার চারুবাবু বলেছিলেন, বিশ্বাস কর রামতনু, গাছকে যদি ভাল লাগে তবে কোন জঙ্গলের নির্জনতাকে সত্যিই আর নির্জন বলে মনে হবে না। মনে হবে নিতান্ত নিরেট কাঠের মোটামোটা গাছ নয়, কত শত খাঁটি বন্ধু যেন তোমাকে ভালবাসতে চায়, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়. ঠিক, তাই তো মনে হয়। ছোট ছাড়োয়াতে বদলি হয়ে আসবার পর এই এক মাসের মধ্যে অন্তত পাঁচটা দিন রামতনুর মনের ভিতরে শান্ত ও শান্তিময় চিন্তার এই আবেশ যেন ইউক্যালিপটাসের সুগন্ধের আবেশে মিশে গিয়ে রামতনুকে বিহ্বল করে দিয়েছে। এমনও সন্দেহ করেছে রামতনু, এ বুঝি সেই চমৎকার আনন্দের আবেশ, উপনিষদে ও আরণ্যকে যার মহিমার কথা আছে।

সেদিন মনের মধ্যে এ ধরনের কোন আবেশ তখন ছিল না। তখন সরষের ওজনের হিসেব লেখবার কাজে ব্যস্ত ছিল রামতনুর হাতের কলম আর মন। শুনতে পায় রামতনু ঘরের বাইরের দাওয়ার ওপর উঠে কে-যেন ডাক দিয়েছে— তসীলদারজী বাড়িতে আছেন?

হ্যাঁ, আছি। ঘরের ভিতর থেকে উঠে এসে বাইরের দাওয়াতে উঠতেই দেখতে পায় ও বুঝতে পারে রামতনু, নিতান্ত অচেনা কোন লোক নয়, এই লোকটিকে অনেকবার কাছারী বাড়ির সামনের পথ ধরে যাওয়া-আসা করতে দেখেছে রামতনু। লোকটা ময়ূরের পালকের একটা বোঝা কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে প্রায়ই লাতেহার যায়।

রামতনু—কি ব্যাপার?

লোকটা বলে—আমি গোমস্তা হরেনবাবুর একজন গার্ড, সর্দার জিতরাম।

রামতনু—বেশ তো।

জিতরাম—আপনাকে মাতাজী একবার ডেকেছেন, বলেছেন—

কে বলেছেন? কি বলেছেন?

জিতরাম—মাতাজী বললেন, একবার গিয়ে তসীলদারবাবুকে এই কথা বল যে, কাকীমা ডেকেছেন। যেন নিশ্চয়ই একবার আসে।

রামতনু—তিনি কোথায় থাকেন?

জিতরাম—এই তো আদা ক্ষেতের ওদিকের প্রথম বাড়ি।

রামতনু—আচ্ছা একদিন যাব।

দুই

সন্ধ্যা হতেই হিসেব লেখার কাজ ছেড়ে ঘরের বাইরে এসে দাওয়ার ওপর দাঁড়াতেই দেখতে পায় রামতনু, ঝলমলে চাঁদের আলোতে আনন্দের নীরব আবেশের সুখে ছোট ছাড়োয়ার জঙ্গলের সব গাছ যেন হাসছে। জঙ্গলের সেই ছায়া ছায়া অন্ধকার যেন গলে গিয়ে আলো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ওকি! কিসের শব্দ?

সত্যিই একটা শব্দ, এবং সে শব্দ শুনে রামতনু যেমন আশ্চর্য হয়, তেমনই চমকেও ওঠে। কাছারী বাড়ির আঙিনার ওপারে ইউক্যালিপটাসের গোড়ার কাছে একটা লতাঝোপের কাছে কে যেন কিংবা কি যেন দাঁড়িয়ে থেকে ছটফট করছে, আর পটপট করে লতা ছিঁড়ছে। হ্যাঁ, ওটা জংলী জাতের লতানে জবার একটা ঝোপ। রোজ সকালে অজস্র ফুলে ঝোপটাকে ছেয়ে থাকে। সত্যি আশ্চর্য হবার কথা, এই সন্ধ্যায় এই জঙ্গলের ভিতর ঢুকতে আর লতানে জবার ফুল ছিঁড়তে কোন্ চোরের ইচ্ছে হবে কিংবা সাহস হবে?

ছোট ছাড়োয়ার এই তসীল কাছারীতে যথারীতি একজন ভাণ্ডারী থাকেন। সারা দিনে ও রাতে পাঁচবার জপ করেন, প্রত্যেকটি প্রায় এক ঘণ্টার জপ। বেশ শান্তশিষ্ট ও নিষ্ঠাচারী মানুষটি। প্রৌঢ় প্রবীণ এই ভাণ্ডারীজী, বাবু গিরিধর পাঠক।

—আরে ওটা কি? কে ওখানে ঝোপের লতা টানাটানি করে ছিঁড়ছে? কথা বলতে গিয়ে রামতনুর গলার স্বরে দুরন্ত বিস্ময়টা যেন চেঁচিয়ে ওঠে।

জপ থামিয়ে ও জপের থলি হাতে নিয়ে ভাণ্ডারী পাঠকজী দাওয়ার প্রান্তের এক কোণ থেকে উঠে আসেন আর হাসতে থাকেন। —আপনি বোধহয় খুব আশ্চর্য হয়েছেন, তসীলদারজী।

রামতনু—হ্যাঁ।

পাঠকজী—আপনি এই প্রথম দেখলেন, তাই এত আশ্চর্য হয়েছেন। আমি ছমাস ধরে রোজই দেখছি আর শুনছি, তাই আর আশ্চর্য হই না। ওটা একটা চিতল হরিণ। লতার ঝোপের ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে খেলা করছে। হরিণটা এই ছমাস ধরে রোজই রাত্রিবেলায় এদিক থেকে ওদিকে যায়।

রামতনু—ওই একই হরিণ? না ভিন্ন ভিন্ন হরিণ?

পাঠকজী—এই একই হরিণ। দলছাড়া একটা হরিণ একলা ঘুরে বেড়ায়, ওর কোন সঙ্গিনী নেই।

রামতনু—হরিণটা এদিক থেকে ওদিকে কোথায় যায়?

পাঠকজী হাসেন।—আমি আর কতটুকুই বা বলতে পারব? ঐ যে গোমস্তা হরেনবাবুর বাড়িতে আপনাকে ডেকেছেন তাঁর স্ত্রী, সেই বাড়িতে গেলেই সব ব্যাপার ঠিক ঠিক জানতে পারবেন।

ছোট ছাড়োয়ার জঙ্গলের একটি সুনাম এই যে, এই জঙ্গলে বাঘের আনাগোনা খুবই কম, নেই বললেই চলে। ওদিকে বড় ছাড়োয়া জঙ্গলেরও একটা সুনাম শিকারীদের প্রাণে প্রাণে আনন্দের গুঞ্জন হয়ে বেজে বেড়ায়। বড় ছাড়োয়ার জঙ্গলে বাঘ গিজগিজ করে। ডোরাকাটা রয়্যাল আর ছোপদার গুলে লেপার্ড, দুই জাতেরই বাঘের ডাকে বড় ছাড়োয়ার বাতাস সারা রাত ধরে গুমরে গুমরে বাজে।

কিন্তু ছোট ছাড়োয়ার হরিণেরা নিরাপদ কেন? বড় ছাড়োয়ার জঙ্গল থেকে বের হয়ে ছোট ছাড়োয়াতে ঢুকতে একটা বড় বাঘের পক্ষে বড় জোর দশ মিনিট সময় লাগবে, তার বেশি নয়। পাঠকজী বলেন স্বয়ং ধরিত্রী মাতা ইচ্ছে করে এখানে একটা বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে, কোন বাঘ সে বাধা পার হয়ে ছোট ছাড়োয়ার জঙ্গলে ঢুকতে পারে না। ওই যে এখান থেকে মাত্র এক ক্রোশ দূরে দুই জঙ্গলের মাঝখানে যে ছোট নদীটা গড়িয়ে গড়িয়ে শোনের বালিয়াড়ির কোলে গিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে, সেটা শীত গ্রীষ্মের সকল সময় বিচিত্র এক শব্দ করে বাজে,—বল্‌বল্‌ বল্‌বল্‌। টগবগে উষ্ণ জলের অনেক ছোট ছোট উৎস এই নদীর বুকের সব ঠাঁই ছড়িয়ে রয়েছে। কোন জানোয়ার বল্‌বলের জল খেতে সাহস পায় না। বাঘেরা তাই এদিকে আসেই না। তা ছাড়া বর্ষার জলের ঢলে যখন এই ছোট বল্‌বলের স্রোতের বেগ বেশ ভয়াল হয়ে ওঠে, তখন তো বাঘের পক্ষে সমস্যাটা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। বর্ষার বল্‌বলের প্রমত্ত স্রোত পার হতে বাঘেরা সাহস পায় না।

পাঠকজী বলেন—ধরিত্রী মাতার কথা না হয় ছেড়েই দিলেন তসীলদারজী, কয়লাখনির চিমনীর ধোঁয়া, পাথর ভাঙবার কলের ঘড়াং ঘড়াং আর করাতকলের কাঠ চেরাইয়ের ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ হল আর একটা বাধা। ছোট ছাড়োয়ার সীমা বরাবর এই সব খনি আর কারখানার লাইনটা বাঘের পক্ষে খুবই ভয় করবার আর বিরক্ত হবার একটা লাইন। তাই বড় ছাড়োয়ার বাঘেরা দূরে দূরেই থাকে, ছোট ছাড়োয়ার ভিতরে ঢুকতে সাহস পায় না। বিশ্বাস করুন তসীলদারজী,

ছোট ছাড়োয়াকে একটা তপোবন বলে ঠাট্টা করলেও তার মধ্যে কিছু সত্য থাকে। এই বনে হরিণের কোন ভয় নেই। আমার বিশ্বাস, হরিণেরা এই বনকে একটা খাঁটি শান্তির ঠাঁই বলে বুঝতে পারে।

চমকে ওঠে রামতনু। বেজে উঠেছে বন্দুকের গুলি ছোঁড়বার শব্দ। বেশি দূরে নয়, সামান্য দূরে বনের ভিতরে কে যেন বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে শান্ত জ্যোৎস্নার থমথমে হাসিটাকে জখম করে শিউরে দিয়েছে।—একী ব্যাপার।

লতানে জবার ঝোপটা আর ছটফট করে না। হরিণটা নিশ্চয় ছুটে পালিয়ে গিয়েছে। পাঠকজী বলেন—দুঃখের কথা কি আর বলবো তসীলদারজী, বাঘেরা এই জঙ্গলের কোন ভয় নয়। এই জঙ্গলের ভয় হলো একজন মানুষ। গোমস্তা সেনবাবুর একটা বন্দুক আছে, একটা দোনলা ম্যান্টন। আমাদের মালিক, তার মানে এই জঙ্গলের মালিক ঠাকুর সাহেবই সেনবাবুকে এই জঙ্গলে শিকার করবার হুকুমনামা দিয়েছেন।

তিন

আদা ক্ষেতের সীমা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানের এই কাঁচাবাড়ি অর্থাৎ মাটির দেয়ালের বাড়িটা হলো গোমস্তা হরেন মুস্তাফির বনবাসী জীবনের ঠাঁই, বেশ গরীব রকমের চেহারা নিয়ে একটা ঠাঁই। ঘরের চালার অনেক খড় উড়ে গিয়েছে। বাঁশের খুঁটির অনেকগুলিই হেলে পড়েছে। ছোট একটা উঠোনের চারিদিকে শুকনো শালের বেড়া। উঠোনের এক কোণে বেশ বড় চেহারার একটা সূর্যমুখী ফুলের ওপর ভোমরা উড়ে বেড়াচ্ছে। আর সূর্যমুখীর ছায়ার মধ্যে দূর্বা ঘাসের ওপর একটি প্রাণী শুয়ে রয়েছে, একটা চিতল হরিণী। হরিণীর চকচকে বাদামী রঙের গায়ের ওপর সাদার ছিট দেখে মনে হয়, হরিণী যেন বেশ দামী একটা বুটিদার শাড়ি গায়ে জড়িয়েছে।

উঠোনের বেড়ার কাছে এসে রামতনু দাঁড়িয়ে পড়তেই ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এলেন, প্রায়-প্রৌঢ় এক মহিলা। খুব রোগা আর খুব ফরসা চেহারার এই মহিলা খুব খুশীর স্বরে ডাক দেন—এসো বাবা এসো। আমি কিন্তু জিতরামের মুখ থেকে কথাটা শুনেও বিশ্বাস করিনি যে আমার মত কে-না-কে এক গরীব কাকিমার ডাক শুনে তুমি আসবে। আমি হলাম গোমস্তাপাড়ার তিন বাড়ির সব ছেলেমেয়ের কাকিমা, মনো কাকিমা! আমার নাম মনোরমা। তুমিও বাবা আমাকে মনো কাকিমা বলে ডাকবে।

এইবার মনো কাকিমা যে কথাটা শোনালেন সেটা রামতনুর পঁচিশ বছর বয়সের প্রাণটার পক্ষে সব চেয়ে মায়াময় বিস্ময়ের আবেশে ভরা একটা অদ্ভুত বৃতান্তময় কাহিনী। মনো কাকিমা বলেন : আজ বুঝতে পারছি বাবা, কি ভুলই না করেছি। বনের একটা হরিণীকে নিজের রক্তমাংসের সন্তানের মতো একটা সন্তান বলে মনে করেছি। নিজের মেয়ের মত মায়া করে পুষেছি, আর বড় করে তুলেছি। আগে বুঝতে পারিনি যে, এই মেয়েকে একদিন ছেড়ে দিতে হবে, আবার বনের কোলেই ফিরিয়ে দিতে হবে।

রামতনু উঠোনের সূর্যমুখীটার দিকে আঙ্গুল তুলে কথা বলে, ঐ বুঝি আপনার হরিণী মেয়ে।

—হ্যাঁ বাবা। বুড়ি, ও বুড়ি, এদিকে আয়। মনো কাকিমার ডাক শুনে হরিণীটা একটা লাফ দিয়ে উঠে এগিয়ে এল, মনো কাকিমার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।

আবার ডাক দিলেন মনো কাকিমা—ঘরের ভিতরে তুই কি করছিস রে, ওরে মনু এদিকে একবার আয় দেখি।

দেখতে বেশ ফুটেফুটে আর লাজুক, এরকম চেহারার একটা ছোট ছেলে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। মনো কাকিমা হাসেন ঃ এটা হলো আমার মানুষ ছেলে। শোন তবে সবটা

একটু খুলেই বলি। মাত্র কুড়ি দিন বয়সের মনুকে নিয়ে যখন আঁতুড়ে আছি, তখন আমার ওই চাকর জিতরামের শাশুড়ী জঙ্গলের ভিতরে এইটুকু একটা হরিণ-বাচ্চাকে কুড়িয়ে পেয়ে কাক-চিলের ঠোকরের ভয় থেকে বাচ্চাটাকে বাঁচাবার জন্য শাড়ীর আঁচল দিয়ে ঢেকে আর ছুটতে ছুটতে একেবারে আমার আঁতুড় ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালো। বললে, হেই মা, তু যদি না বাঁচাবি তবে এই বাচ্চাটা বাঁচবে না।

—কেন?

—দেখছো না, হরিণের বাচ্চাটা কত কচি। বুকের দুধ ছাড়া আর কোন কিছু খাওয়ার সাধ্যি নেই ওর। দূর্বা ঘাস নয়, কোন লতাপাতা নয়, ফুলের ছোট্ট পাপড়িও নয়।

—ওর মা কোথা গেল?

জিতরামের শাশুড়ী বলে—ভগবান জানেন কোথায় গেল! কেউ কেউ বলে, গুমস্তা সেনবাবুর বন্দুকের শব্দ শুনে ভয় পেয়ে মা-হরিণীটা পালিয়ে গিয়েছে আর ভুল করে একেবারে বড় ছাড়োয়ার জঙ্গলে গিয়ে পড়েছে আর বাঘের পেটে চলে গিয়েছে।

মনো কাকিমা বলতে থাকেন—বিছানাতে আমার এ পাশে মনু আর ও পাশে বুড়ি। এইভাবে মানুষের বাচ্চা আর হরিণের বাচ্চা আমার রোগা ডিগডিগে শরীরটার সব মায়া নিংড়ে-শুষে খেয়েছে আর বড় হয়েছে. তখন তো একটুও বুঝতে পারিনি যে, মায়ায় পড়ে হরিণীকে আমার নিজেরই মেয়ে বলে একদিন বোধ করতে হবে।

রামতনু—বোধ তো করেই ফেলেছেন। তবে আর কি? আর চিন্তা করবার কি আছে?

মনো কাকিমা—চিন্তা করার অনেক কিছু আছে বলেই তোমাকে ডেকেছি। একটা পরামর্শের জন্য একটু সাহায্যের জন্য তোমাকে ডেকেছি।

হাতে খেরো বাঁধানো একটা খাতা আধময়লা ফতুয়া আর ধুতি পরা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেড়ার আড় খুলে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন আর উঠোনের ভিতর এসে দাঁড়ালেন। হরিণী বুড়ি সেই মুহূর্তে একটা লাফ দিয়ে সরে গিয়ে আগন্তুক ভদ্রলোকের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। ভদ্রলোক কিন্তু হরিণীটার দিকে একবারও তাকালেন না।

প্রচণ্ড রুষ্ট স্বরে আর চেঁচিয়ে ধমক ছাড়েন মনো কাকিমা—কী রে গোমুখখু মেয়ে, তোর লজ্জা করে না? কিসের আশায় তুই কসাই বাপের গা ঘেঁষে দাঁড়াস?

মনো কাকিমা তাঁর হরিণী মেয়ে ওই বুড়িকে ধমকাচ্ছেন বটে, কিন্তু ধমকের ভাষার মধ্যে যে ধিক্কারটা খুব স্পষ্ট হয়ে বেজে ওঠে সেটা তো হরেনবাবুরই বিরুদ্ধে একটা কঠোর ভর্ৎসনার কর্কশ ধ্বনি। কিন্তু হরেনবাবু যেন এই ভর্ৎসনার একটি শব্দও শুনতে পাচ্ছেন না। তাঁর চোখে মুখে যেন অবিকার এক পরম নির্লেপের প্রলেপ। কাশলেন হরেনবাবু, ফতুয়ার পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরালেন, লম্বা-লম্বা সুখটান দিয়ে আরামের ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর উঠোনের ওদিকের একটা ঘরের ভিতর ঢুকে চৌকীর ওপর বসলেন। ঘরের চেহারা একটা খোঁয়াড়ের মতো। আর চৌকীটা হলো চার কোণে চার থাক ইঁটের ওপর বসানো একটা তক্তা।

মনো কাকিমা বলেন—দেখলে তো রামতনু, নিজর চোখেই তো দেখলে, লোকটা কত অভদ্র। তোমাকে দেখেও তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলে একটু আলাপও করলো না।...এই, এই সমস্যারই হেস্তনেস্ত করবার জন্য তোমার সাহায্য চাই।

রামতনু—আমি এর মধ্যে আপনাকে কীভাবে ও কেমন করে কী সাহায্য করতে পারি?

মনো কাকিমা—তুমি ওকে প্রতিজ্ঞা করাও, কবুল করাও যে, মেয়ের কথাটা একটু চিন্তা করবে, আর, আরও বড় কসাই ওই সেনবাবুর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখবে না। কাঁচুমাচু হয়ে সেনবাবুর সঙ্গে কথা বলবে আর বিড়ি খাবে, সে আর চলবে না। তারপর, তোমাদের মালিক

ঠাকুর সাহেবকে বলে সেনবাবুকে শাসিয়ে দাও, এই জঙ্গলে তার আর হরিণ শিকারের আমোদ চলতে দেওয়া হবে না।

রামতনু—আমাকে ক্ষমা করুন কাকিমা, এসব করবার কোন ক্ষমতা আমার নেই।

মনো কাকিমার দুই চোখ এইবার ছল-ছল করে। —শুনলে তুমি অবাক হবে রামতনু। বুড়ি একদিন সেনবাবুর বাড়ির উঠোনে পুঁই মাচার ওপর দুই পা তুলে দিয়ে, এই বড়জোর সাত-আটটা পাতা খেয়েছিল। তাই দেখে শুধু একা সেনবাবু নন, তাঁর ওই ধাড়ি মেয়ে নীতাও সপসপ করে বেত চালিয়ে বুড়িকে মেরেছে। বুড়ির ঠোঁটের মাঝখানটা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরে পড়েছে। যাই হোক, আমি ওদের দোষ দিই না। আমি বলি, এই কসাই বাপই আসল দোষী। যদি রোজ বুড়ির জন্য দু পয়সার ছোলা কিংবা মটর কিনে এনে বুড়িকে খেতে দিত, তবে বুড়ি এরকম হ্যাংলা হয়ে পরের বাড়ির পুঁই মাচাতে মুখ লাগাতো না।

রামতনু—আমি একটা কাজ করতে পারি, কাকিমা। বুড়িকে খাওয়াবার জন্য আমাদের সরষে খামার থেকে কিছু সরষে শাক আপাতত একটা-দুটো মাস রোজই আনিয়ে দিতে পারি।

মনো কাকিমা জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন। —তাই দিও। কিন্তু আসল সমস্যা এখন তা নয়, রামতনু।

—আসল সমস্যাটা কী?

মনো কাকিমা—বুড়ি বড় হয়েছে। ওর একটা গতি করে দেবার দায় আছে। ওকে চিরটাকাল আমার কাছে রেখে ওর ভাগ্যটাকে বঞ্চিত করে রাখা যে খুবই অন্যায় কাজ, সেটা তোমাকে বুঝিয়ে না বললেও নিশ্চয়ই বুঝবে।

হেসে ফেললেন মনো কাকিমা, আবার আঁচলের খুঁট তুলে দুই চোখ মুছতেও থাকেন।—আমি এই কথাই বলছি, বুড়িকে এখন পাত্রস্থ করতে হবে তো। আমার একটা মানুষ মেয়ে থাকলে তাকেও তো পাত্রস্থ করতে হতো।

রামতনু—তাহলে কি করতে চান? বুড়িকে একদিন মুক্তি দিয়ে জঙ্গলের ভিতরে ছেড়ে দিলেই তো পারেন।

মনো কাকিমা—না রামতনু, তা হয় না। সেটা হবার নয়। একটা হরিণ আজ ছ'মাস ধরে রোজই রাত্তিরে এখানে এসে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনও আমাদের চোখে পড়ে, কখনও পড়ে না। কিন্তু রোজ রাতে ঘরের ভিতরে বুড়ির ব্যবহারের রকম সকম দেখে বুঝতে পারি, হরিণটা এসেছে, নিশ্চয় বেড়ার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ভিতরে বুড়ি ছটফট করে বন্ধ দরজার গায়ের ওপরে মাথা ঘষতে থাকে, বুঝতে পারি বাইরে যেতে চাইছে বুড়ি।

রামতনু—বুড়িকে ছেড়ে দিলেই তো পারেন।

মনো কাকিমা-তাও করে দেখেছি। বেড়া খুলে রেখে বুড়িকে ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু বুড়ি শুধু বেড়ার কাছ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, বাইরে চলে যায় না।

—কেন?

মনো কাকিমা—বলতে পারি না, রামতনু। বুঝতে পারি না বুড়ির ইচ্ছেটা কি। আমার এই এক জ্বালা, ঠিক ঠিক কিছুই বুঝতে পারছি না।... আমার মনে হয় ভিকু যা বলে সেটাই ঠিক।

—কে?

মনো কাকিমা—গোমস্তা বলদেববাবুর ছেলে ভিকু। মাস তিন আগে বলদেববাবুর মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ভিকু বলে, আমার দিদির যেমন ঘটা করে বিয়ে হয়েছে, বুড়ির বিয়েতেও সেরকম ঘটা করতে হবে। ভদ্রলোকের বাড়িতে যেরকম করে মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়, বুড়িকেও সেই রকম করে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হবে, তবে তো বুড়ি চলে যেতে চাইবে। একটা বুনো প্রাণী বলে কি ওর প্রাণে কোন ইয়ে নেই।

রামতনু এইবার হেসে হরিণী-বোনের মানুষ-ভাই মনুর মাথায় হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করে। —বুড়ির বিয়ে দেবার জন্য কি করতে হবে বলো তো খোকা।

মনু মুখ টিপে অদ্ভুত এক লাজুক হাসি লুকিয়ে আস্তে আস্তে যে-কথা বলে, সেটা একটা উৎসবের পরিকল্পনার কথা। যে শুনবে তাকে উৎকট রকমের একটা কৌতূকের আবেগ দিয়ে হাসিয়ে দেবার মত কথা। মনু বলে—ভিকুদা বলছিল, রঙ্গোলি আঁকতে হবে, শাঁখ বাজাতে হবে, বুড়ির কপালে চন্দনের টিপ দিতে হবে।

রামতনু—খুব খাঁটি কথা, বলছে ছেলেটা, মনুর বন্ধু ভিকু।

মনো কাকিমা—কিন্তু ওসব করলে বন্দুকধারী বর্বরটা টের পেয়ে যাবে, বুঝে ফেলবে যে হরিণটা এসে দাঁড়িয়ে আছে। তখুনি তেড়ে আসবে আর গুলি ছুঁড়ে হরিণটাকে মেরে ফেলবে। এই দু'মাস ধরে সেনবাবু এই চেষ্টাই করে আসছে।

রামতনু—তবে, কি যে বলবো বুঝতে পারছি না। তবে এটুকু করতে পারি— সেনবাবুকে খুব অনুরোধ করে বলতে পারি, আপনি দয়া করে হরিণটাকে মারবেন না।

চার

হো হো করে হেসে উঠলেন সেনবাবু। —তুমি বোধহয় জানো না যে, হরিণের মাংসের কাবাব খেতে কত ভাল লাগে। বিশেষ করে সামনের দিকের রাং আর সনার মাংসের স্বাদ কাবাবে সবচেয়ে ভাল খোলে। আমি ছ'মাসের মধ্যে অন্তত সাতবার ঘোর রাতের অন্ধকারের মধ্যেই ঐ ব্যাটা লম্পট হরিণটার ওপর গুলি চালিয়েছি' কিন্তু প্রত্যেকবারই ব্যাটা পালিয়ে যেতে পেরেছে, একটুও ঘায়েল হয়নি।

রামতনু—আমার মনে হয় আপনার মত বিজ্ঞ মানুষের পক্ষে জঙ্গলের হরিণটরিন শিকার করবার শখ ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

সেনবাবু—বেশ তো ধরে নাও ছেড়েই দিলাম। তারপর কি করব? আদাক্ষেতের যত কেন্নো আর কেঁচোগুলিকে শিকার করবো? হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি কি লাতেহার অয়েল মিলের সামন্তবাবুকে চেনো?

—না।

—কম করে তিন লাখ টাকা জমিয়েছেন সামন্তবাবু। তাঁরই একমাত্র ছেলে রতন সামন্ত শিগ্‌গিরই আমাদের জামাই হবে। আরও একটা কথা। নীতা সেন নামে একটি মেয়ে কলকাতার একটা বড় কম্পিটিশনের আসরে ঠুংরী গেয়ে মেডেল পেয়েছে, এ খবরটাও কি কখনো শুনতে পাওনি?

—না।

—আমারই মেয়ে নীতা। কলকাতাতে মামারবাড়িতে থেকে পড়াশুনা করেছে আর ম্যাট্রিক পাশ করেছে। এখন এখানে আমাদেরই কাছে থাকে, গানের চর্চা ক'রে দিন পার ক'রে দেয়। নীতাকে সেই গানের কম্পিটিশনের আসরে প্রথম দেখতে পেয়ে রতন সামন্ত তখুনি নীতাকে পছন্দ করে ফেলেছিল। সেই রতনকে তুমিও হয়ত দেখেছ। প্রতি সপ্তাহে একবার না হোক, প্রতি মাসে তিনবার লাতেহার থেকে মটরসাইকেল ছুটিয়ে আমার এখানে আসে রতন সামন্ত। এখানে চা খায় আর নীতার গলায় ঠুংরী শুনে আবার লাতেহার ফিরে যায়।

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন গোমস্তা বলদেব প্রসাদ। তিনি একেবারে খোলাখুলি ভাষায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন! —লাখপতির ছেলে কিন্তু এই গোমস্তাবাড়ির নীতাকেই বিয়ে করবার জন্য যেন প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে। তাই সে এখানে এই ছ'মাস ধরে বার বার আসছে। বেচারা

তো ভালবাসারই টানে ছুটে আসছে। ভালবাসা এমনই জিনিস। আর আমাদের এই সেনবাবুর বাড়ির ভাগ্য ও তাঁর মেয়ের ভাগ্য দেবতার কৃপার মত আশ্চর্য জিনিস।

সেনবাবু—তোমাকে দেখে আমার মনে আর একটা শখ যেন প্রতিজ্ঞারই মত চেপে বসছে, রামতনু। নীতার বিয়ের দিনে যেন জামাই রতন সামন্তকে আর তসীলদার রামতনুকে টাটকা শিকার-করা হরিণের মাংস খাওয়াতে পারি। গর্দানের মাংসের সঙ্গে কিসমিস মিশিয়ে একটা মিষ্টি রকমের কারি হবে, আর পেছনের দুই টেংরীর মাংস দিয়ে রোস্ট। শিরদাঁড়ার নরম দিকটার মাংস দিয়ে তৈরী করব সামান্য একটু টক মেশানো ভিন্দালু।

কথার আবেগের সঙ্গে একটা চমৎকার গর্বের আবেগ মিশিয়ে দিয়ে হেসে ফেললেন সেনবাবু। —জঙ্গলে থাকতে হলে বাঘের মেজাজ নিয়ে থাকতে হয় আর খেতে হয়, রামতনু। দেখেছো তো, আমার ষাট বছর বয়সের চেহারাটা কত শক্ত। আর আমার চেয়ে দশবছর বয়সের ছোট হরেনের চেহারাও তো দেখেছো। কি বিশ্রী রোগা ও দুর্বল, একটা বাবিশ চেহারা। হরেনগিন্নীর চেহারাখানাও তো দেখেছো। কি আর বলবো, সত্যি কথা বললে ভালো শোনাবে না, যেন ডিগডিগে এক খ্যাংরা সুন্দরী।

পাশের ঘরের ভিতরে দুই মেয়েলী হাসির স্বর বেশ জোরে বেজে উঠলো। বেশ মোটা স্বরের হাসির সঙ্গে একটা পাতলা স্বরের হাসি। বুঝতে অসুবিধা হয় না রামতনুর, নিশ্চয় মা ও মেয়ের হাসি।

সেনবাবু—শুনলে তো, ওরাও না হেসে থাকতে পারলো না। যাই হোক, একটু কাণ্ডজ্ঞান ওদের আছে তো। একটা পোষা হরিণকে মেয়ে মেয়ে বলে চেঁচামেচি করে লোক হাসিয়ে লাভ কী? হরেনগিন্নীর কথায় আর ব্যবহারে একটা ন্যাকামি মার্কা আহ্লাদ এই ছ'মাস ধরে যেন উথলে উঠছে। হরিণী মেয়েকে নাকি পাত্রস্থ করতে হবে, পছন্দমত একটা পাত্রও পাওয়া গিয়েছে। এই ছ'মাস ধরে সেই পাত্র নাকি প্রায় রোজই রাত্তিরে আসে আর হরেনের বাড়ির উঠোনের দিকে তাকিয়ে থাকে! মাথাতে এক ঝাড় সিং, সেই পাত্র নাকি হরেনের বাড়ির পোষা হরিণীটাকে খুব পছন্দ করে ফেলেছে।

ঘরের ভিতরে আবার মা ও মেয়ের মিলিত হাসির শব্দ যেন একটা ঠাট্টার উল্লাসের মত ভঙ্গীতে কেঁপে কেঁপে বাজতে থাকে।

হরেনবাবু—তুমি বলো, এটা কি একটা নির্জলা মিথ্যের আষাঢ়ে গল্প নয়। ছোট ছাড়োয়ার একটা বুনো হরিণ, একটা জন্তু। সেটাও যেন আমাদের... এই এই ইয়ের মত একটা মানুষ।

গিরিধরবাবু কিন্তু চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন আর চেঁচিয়ে কথা বলেন—নেহি নেহি। কভি নেহি। জঙ্গলের জানোয়ার কখনো মানুষের মত, যেমন আমাদের লাতেহারের নওজোয়ানের মতো লাভার হতে পারে না। লাভ্ হলো তো হলো, না হয় না হলো, কিন্তু তার জন্তুনীকে ছেড়ে দেবেই দেবে।

ঘরের ভিতরে আবার দুই মেয়েলী হাসির মিলিত উচ্ছ্বাস কলকল করে বেজে ওঠে।

রামতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন সেনবাবু—বলো এইবার, যা বলতে চাও তুমি।

রামতনু—আমার যা বলবার তা তো বলেইছি।

সেনবাবু—আমিও তো আমার যা বলবার ছিল সবই বলেছি। আমি হরিণ শিকার না করে পারবো না।

রামতনু—আচ্ছা, আমি তবে যাই।

সেনবাবু—যাই না, বলো আসি। আশা করছি এই ফাল্গুনের মধ্যেই আমার নীতুর বিয়ের নেমন্তন্ন তুমি পেয়ে যাবে।

মনো কাকিমার ভয় দূরে যাবে এমন একটি কথাও সেনবাবুর কাছ থেকে আদায় করা গেল না। নিজের কাছারীতে ফিরে যাবার পথে আদা ক্ষেতের কিনারা ধরে চলতে চলতে রামতনুর হতাশ মনের ভার যেন আরও ভারী হয়ে ওঠে। হঠাৎ মনো কাকিমারই ডাক শুনে চমকে ওঠে রামতনু—একবার এসে শুনে যাও রামতনু।

মনো কাকিমা হাসছেন দেখে রামতনু খুশি হয়। মনো কাকিমা একটা মস্ত খুশির কথা শোনালেন। আজই বুড়িকে পাত্রস্থ করা হবে। যে-কথার সোজা সরল অর্থ হল বুড়িকে ছেড়ে দেওয়া হবে। মনো কাকিমার ইচ্ছে আর আশা পূর্ণ করে দিয়ে তাঁর হরিণী মেয়েটি তার পছন্দের পাত্রটির সঙ্গে ছোট ছাড়োয়ার জঙ্গলের গভীরে, কে জানে কোথায় কত গভীরে চলে যাবে।

মনো কাকিমার গলার স্বরটা বড়ই করুণ। —তুমি ঠিক জানো তো বাবা, এই জঙ্গলে বাঘটাঘ নেই?

রামতনু—তাই তো শুনেছি। সবাই তো তাই বলে।

মনো কাকিমা—কষ্ট করে আজ রাত্তিরে তুমি একবার এসো বাবা। আজই বুড়িকে বিদায় করে দেবো। তাই তোমাকে যেমন করে হোক একটা শক্ত কাজ করতে হবে। তুমি নজর রাখবে আর দেখতে পেলে বাধা দেবে, ভয়ানক মেজাজের সেনবাবু যেন বন্দুক নিয়ে তেড়ে আসতে আর গুলি চালাতে না পারে।

রামতনু—তা আমি নিশ্চয়ই দেখবো।

মনো কাকিমা—দেখ রামতনু, নিজের চোখে একবার দেখে নাও। কসাই বাপ কেমন নির্বিকার হয়ে আর আরাম করে বিড়ির পর বিড়ি খেয়ে চলেছে। সবই শুনেছে আর সবই জেনেছে ওই গোমস্তা মশাই, তবু ওর চোখে মুখে ও কথার মধ্যে একটুও কি মায়া দেখতে পাওয়া গেল? একটুও না। বুড়ি আজ রাত্তিরে বিদায় হবে শুনতে পেয়ে জিতরামের শাশুড়ীর মত বাইরের একটা মানুষ তবু বুড়ির জন্য এক গাদা পাকা ডুমুর দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তোমার এই অদ্ভুত স্বভাবের কাকাবাবু কি বুড়ির জন্যে দু-চারটে বটপাতাও এনে দিয়েছে? না, কিচ্ছু না। কি নিরেট প্রাণ, তার মধ্যেও একটুও মায়া-মমতার ছোঁয়াচ নেই। হোক না একটা হরিণী, তবু সে তো তোমারই ঘরের পোষা একটা জীব। বললে তুমি বিশ্বাস করবে না রামতনু, আজ এখনো বুড়ির দিকে একটিবার একটু মায়া করে তাকায়নি পর্যন্ত এই মানুষটা। যাই হোক, তুমি কিন্তু ভুলে যাবে না। অবিশ্যি আজ রাত্তিরে একবার আসবে।

পাঁচ

ব্যবস্থা মন্দ নয়। যে রকম ব্যবস্থা চেয়েছিল মনু, সেই রকমই ব্যবস্থা করেছে ভিকু আর মনু। মনু নিজের হাতে বুড়ির মাথাতে লাল চন্দনের একটা টিপ এঁকে দিয়েছে। উঠোনের ওপর বেশ বড় একটা রঙ্গোলি এঁকেছেন মনো কাকিমা। আর উঠোনের বেড়ার একদিকের তিনটে আড় বাঁশ নামিয়ে দিয়ে বুড়ির যাবার পথ একেবারে অবাধ ও মুক্ত করে দিয়েছে মনু। ভিকুর হাতে একটা শাঁখও আছে। ভিকু বলে, বাঙালীর বিয়েতে শাঁখ বাজাতে হয়।

কিন্তু ঠিকই, মনো কাকিমার রাগ দুঃখ আর অভিযোগ একটুও মিথ্যে নয়। হরেনবাবু তাঁর ঘরের ভিতরে সেই তক্তার ওপরে বসে বিড়ি খাচ্ছেন। ভিকু যে একটা ময়লা চেহারার লণ্ঠনকে সূর্যমুখীর কাছের ছোট আমগাছের ডালে ঝুলিয়ে দিল সে দৃশ্যটাও যেন হরেনবাবুর চোখে একটা নতুন কিছু বলে বোধ হচ্ছে না। উঠোনের ওপর এই রকম একটা ব্যস্ততার দৃশ্যকে যেন দেখবার মত একটা বস্তু বলেই মনে করছেন না হরেনবাবু। মনো কাকিমা বিড় বিড় করেন—ওর কাছে বুড়ি তো চিরকালই একটা আপদ বলে বোধ হয়েছে। লোকটা চিরকাল মনে মনে এই কামনাই করে এসেছে, বুড়ি যেন বাঘের কিংবা বনডাইনীর কামড় খেয়ে মরে।

রামতনু—যাক, এসব কথা এখন আর বলবেন না।

চুপ করলেন মনো কাকিমা। একেবারে নিথর নিশ্চুপ একটা অবসন্ন মূর্তি, দাওয়ার খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

ওদিকে রাত বাড়ছে। ছোট ছাড়োয়ার সব সেগুন আর ইউক্যালিপটাসের পাতার বুকে যেন উতলা হাওয়ার গান বাজতে শুরু করেছে। সেই হাওয়ার গায়ে গায়ে খুব মিষ্টি একটা সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

চমক লাগবার মত একটা দৃশ্য বটে। দেখে সত্যিই চমকে ওঠে রামতনু। একটা হরিণ এসে উঠোনে বেড়ার বন্ধন খোলা অবাধ পথের কাছে দাঁড়িয়েছে। মাথার এক ঝাড় শিং-এর সঙ্গে আটক হয়ে জংলী লতাপাতার দুটো লম্বা লম্বা টুকরো ঝুলছে।

ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেন মনো কাকিমা। —না দেখলে তুমি তো বিশ্বেস করতে না রামতনু। এইবার দেখে নাও, আমাদের বুড়ির বর যে সত্যিই রাজপুত্তুরের মতো মালা নিয়ে এসেছে।

ভিকু শাঁখ বাজালো। চলে গেল বুড়ি। ছুটে চলে গেল হরিণ বর আর হরিণী কনে সেই মুহূর্তে ছোট ছাড়োয়ার অন্ধকারের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। রঙিন রঙ্গোলির কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো মনু—বুড়ি চলে গেল মা, সত্যি চলে গেল।

যাক, সবই ভালয় ভালয় হয়ে গেল। সেনবাবু নিশ্চয় এই বাড়ির এই উৎসবের কোন সাড়া শুনতে পাননি। জঙ্গলের হরিণীটিকে মারবার জন্য দোনলা ম্যানটন হাতে নিয়ে তেড়ে আসেন নি। রামতনুরও কোন ঝামেলা সহ্য করবার দরকার হলো না।

আঁচল দিয়ে দুই চোখ চেপে অনেকক্ষণ এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইলেন মনো কাকিমা। হঠাৎ এই গরিব চেহারার ও মেটে দেয়ালের ছোট বাড়িটাই যেন একটা বুকফাটা চিৎকারের মত শব্দ করে কেঁদে উঠলো। কি আশ্চর্য কি ব্যাপার, চলে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় রামতনু। কে, কে অমন করে কেঁদে উঠলো?

ছোটো ঘরের ভিতরে তক্তার ওপর বসে সেই নির্বিকার হরেনবাবু তাঁর দুই হাত দিয়ে বুকটাকে চেপে রেখে আর আকুল হয়ে কাঁদছেন। মনো কাকিমাও আশ্চর্য হয়েছেন। চোখের ওপর চাপা আঁচল সরিয়ে দিয়ে ছোট ঘরের তক্তার ওপর হরেনবাবুর কান্নায় ভেঙ্গে পড়া মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। এ আবার কি ব্যাপার? মানুষটা কাঁদে কেন? কি হলো যে অমন করে কাঁদতে হবে!

বুঝতে পারা যায় বেশ অপ্রস্তুত আর আশ্চর্য হয়েছেন মনো কাকিমা।

হঠাৎ আবার চমকে ওঠে রামতনু। বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। বুঝতে পারে সব শেষে সেনবাবুর সঙ্গে একটা ঝামেলা করতেই হবে। হরিণটাকে মারবার জন্য বন্দুক হাতে নিয়ে তেড়ে আসছেন সেনবাবু, যদিও হরিণ চলে গিয়েছে, হরিণটাকে শিকার করবার বা না করবার কোন প্রশ্ন এখন আর নেই। তবু সেনবাবু তাঁর স্বভাবের আর মেজাজের অহঙ্কারে একটা ঝামেলা নিশ্চয়ই বাধাবেন। সেনবাবুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হবে, হয়ত হাতাহাতিও হবে।

এই দৃশ্যটা আরও অদ্ভুত। দুই চোখ অপলক করে দেখতে থাকে রামতনু। সেনবাবুর হাতে বন্দুক নেই। তিনি বাঘের মেজাজ নিয়ে তেড়েমেড়ে আসছেন না। খুব আস্তে আস্তে হেঁটে আসছেন। যেন একটা চরম ক্লান্তির ভারে অলস হয়ে গিয়েছে তাঁর প্রাণ আর শক্তপোক্ত ঐ শরীরটাও।

হরেনবাবুর বাড়ির উঠোনের ওপর উঠেই অদ্ভুত কথা বলেন সেনবাবু, মেয়েকে বোধহয় বিদায় করা হয়েছে?

রামতনু—হ্যাঁ।

সেনবাবু—আঁা, হরেন বুঝি খুব কাঁদছে? আমি জানি মেয়ের বিদায়ের সময় বাপের বেশী কষ্ট হয়। মায়ের চেয়ে বাপই বেশি কাঁদে।

ছোট ঘরটার ভিতরে ঢুকে সান্ত্বনা দেবার জন্য হরেনবাবুর একটা হাত ধরে চুপ করে বসে রইলেন সেনবাবু। যেন তিনি হরেনবাবুকে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না।

অনেকক্ষণ পরে একটা রাতপাখি অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করে চলে যাবার পর হরেনবাবুর কান্না শান্ত হলো।

এইবার সেনবাবু হেসে ফেললেন—আমার খুব শিগগির মেয়ে বিদায়ের কান্না কাঁদবার সৌভাগ্য হবে না।

রামতনু—এ কথা বলছেন কেন?

সেনবাবু—আজই বিকেলে একটা চিঠি পেলাম। লাতেহার থেকে আমার নিবারণ ভাইপো লিখছে রতন সামন্তর বিয়ে হয়ে গেল! কলকাতার এক অ্যাটর্নীর মেয়ের সঙ্গে রতনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

রামতনু—শুনেছিলাম, এই রতন সামন্ত আপনাদেরই পছন্দের পাত্র, আর আপনার মেয়ে নীতা হলো রতন সামন্তর পছন্দর পাত্রী। কিন্তু কই? এটা আবার কি হয়ে গেল? ব্যাপারটা এরকম করে উল্টে গেল কেন?

এইবার চমকে উঠলেন হরেনবাবু, সেনবাবুর একটি হাতকে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেন।—খুব দুঃখ করবেন না দাদা।

সেনবাবু—না, না, আর দুঃখ টুঃখ বোধ করে কোন লাভ নেই। এরকমটা হয়েই থাকে।

রামতনু—শুধু মানুষেরই স্বভাবে ও ব্যবহারে এরকমটা হয়ে থাকে, কাকাবাবু। জঙ্গলের হরিণ-টরিণের স্বভাবে নয়; ব্যবহারেও নয়।

সেনবাবু—ঠিক, তুমি খুব ঠিক কথা বলেছ রামতনু।

অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত